সূচিপত্র

পরিচয়

বর্ষ ৩৮ । সংখ্যা ৭-৮

মাঘ-ফাল্গুন । ১৩৭৫

প্রবন্ধ :

গল্প :

কবিতা :

পুস্তক-পরিচয় :

নাট্য-প্রসঙ্গ :

চলচ্চিত্র-প্রসঙ্গ

চিত্র-প্রসঙ্গ :

বিবিধ প্রসঙ্গ :

বিয়োগপঞ্জী :

উপদেশকমণ্ডলী

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

এস. ওয়াজেদ আলী এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

৪

বাঙলা গদ্যের বিরলগুণ প্রাবন্ধিকদের অন্যতম এস. ওয়াজেদ আলী বাঙলা জানতেন না! হাইকোর্টের মামলার ভিড়ে তাঁকে আবিষ্কার করলেন প্রমথ চৌধুরী। বাঙলা শেখালেন, নিয়ে এলেন আপন গোষ্ঠীতে। 'সবুজপত্র'-এ আত্মপ্রকাশ করল 'অতীতের বোঝা'। বাঙলা গদ্যের এক শক্তিমান শিল্পীর জন্ম হলো, যিনি বীরবলের অনুগ এবং স্ব-তন্ত্র।

শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়। ভাবনার ক্ষেত্রেও ওয়াজেদ আলীর রচনা রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী তথা রোমান্টিক শিল্পাদর্শের অন্তর্গত। 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' গ্রন্থে যে সাহিত্যতত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করেছেন—তার মধ্যে সেই প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রেম, সীমা-অসীম, সৃষ্টিলীলা, সামঞ্জস্য, স্মৃতিচারণ, ভূমা, সৌন্দর্যবোধ, এমন কি জীবনদেবতাও ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত, আবির্ভূত। এই তত্ত্ব প্রসঙ্গেও বিহিত আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু যে বিশেষ একটি বিষয়, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও সম্বন্ধকে মাঝখানে রেখে আমি জনাব আলীর রচনা পুনরেক্ষণ করছি, তার মধ্যে এই রোমান্টিক সাহিত্যভাবনার সঞ্চরণে কেন্দ্র-চ্যুতির সম্ভাবনা অনিবার্য। বিষয়টিকে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের জন্যে পৃথক ও মুলতুবি রেখে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি মাত্র উল্লেখ করছি।

ওয়াজেদ আলীর সাহিত্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মতোই রোমান্টিক, তাঁর জীবনতত্ত্বও রবীন্দ্রনাথ-সদৃশ, অর্থাৎ বাস্তবের সমীপ। তাই যখন তিনি বলেন: "মানুষ সাহিত্যের জন্য নয়, সাহিত্যই মানুষের জন্য। মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য"—তখন বাক্যগুলি নিছক রোমান্টিক মানবতার বাহন বলে মনে হয় না। "আমি যে মুসলমান সাহিত্যিকের কল্পনা করি,

সে এই জীবন্ত dynamic শ্রেণীর মানুষ হবে। সে বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না···সে হবে গতিশীল জীবনের মূর্ত একটা প্রতীক।"—এ উক্তি যে নিছক উচ্ছ্বাস নয়, তার প্রমাণ মেলে পরবর্তী মন্ত্রোচ্চারণে: "সাহিত্যের সাহায্যে উচ্চতর মানুষ গড়ে তুলতে হলে যেসব সংস্কার, যেসব সামাজিক ব্যবস্থা, যেসব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৎ সাহিত্যের সম্যক বিকাশের প্রতিকূলতা করে, সে-সবের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, সেসবের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করতে হবে।"

সামাজিক শক্তিরূপে সাহিত্যের এবংবিধ সংজ্ঞানিরূপণ ও প্রয়োগনির্দেশ লেখকের জীবন-চেতনারই প্রকৃষ্ট পরিচয়। বাঙালিয়ানাকে তিনি এনেছেন সাহিত্যের দরবারে, সাহিত্যকে নিয়ে এসেছেন জীবনেব মাঝখানে। ঘোষণা করেছেন: "সবচেয়ে বড় শিল্প হচ্ছে জীবনশিল্প।" সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক তিনি; কিন্তু সে উপাসনা বস্তুবিধৃত পথে: "তার জন্যে দরকার ত্যাগ. ধৈর্য, সংযম এবং সহানুভূতি।" শেষের সহানুভূতি শব্দটি লক্ষণীয়।

ওয়াজেদ আলী সুনিপুণ কথক। অবশ্য তাঁর মৌলিক সৃষ্টি সংখ্যালঘু, অধিকাংশ গল্পই আরব-পারস্যের 'কথাসরিৎসাগর' থেকে আহৃত এবং অল্প বয়স্কদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। গল্পগ্রন্থগুলি একসময়ে অত্যন্ত পরিচিত ছিল: 'মাশুকের দরবার', 'ইরাণ-তুরাণের গল্প', 'বাদশাহী গল্প'. 'গল্পের মজলিশ', 'দরবেশের দোয়া' ইত্যাদি। প্রত্যেকটি গ্রন্থই আকর্ষণীয়। জনৈক সমালোচকের ভাষায়: "এর জুড়ি পাই তুর্গেনেভের Prose Poems নামক রচনায়।"

তুর্গেনেভের সঙ্গে সমান্তরালতার প্রসঙ্গটি অবশ্য বিতর্কমূলক। কিন্তু সমালোচকদের মূল বক্তব্য বিষয়ে গল্প পাঠকের কোথাও মতানৈক্য ঘটবে না। আলীসাহেব গল্প তো বলছেন না, শোনাচ্ছেন। তার মধ্যে আনন্দ আছে, শিক্ষাও আছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 'আরব্যরজনী'র হুরী পরীর বা 'হাতেমতাই' শ্রেণীর গল্প এখানে আছে, কিন্তু তা নিতান্ত সংখ্যালঘু। লেখকের লক্ষ্য ছিল এমন গল্প নির্বাচন, যার সাহায্যে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু (এবং বস্তুত বঙ্গভাষী যে কোনো পাঠক-পাঠিকা) ইসলাম সংস্কৃতি ও মুসলমান জাতি সম্পর্কে সত্যভাবে অবহিত হতে পারে এবং একালের উপযোগী শিক্ষা লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে গল্পগুলি বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'র স্বজাতি।

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মুসলমান সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বাঙালি হিন্দুর মনে অনেক ভ্রান্ত বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা ধারণা জমে আছে। ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধ যেমন, তেমনি এই গল্পগুলি সেই অবাঞ্ছিত ধারণার অপনোদনে প্রভূত সাহায্য করে। অন্য পক্ষে 'বর্ণপরিচয়' ১ম/২য় ভাগ বা 'কথামালা' বা 'রামায়ণ'-'মহাভারত' বা 'রাজপুতকাহিনী' ইত্যাদি যেমন এ কালের ছেলেমেয়েদের মানসগঠনের সহায়ক, তেমনি আলীসাহেবের সংগৃহীত গল্পগুলিও। এরা এসেছে রূপকথা-উপকথা-ইতিকথার বিবিধ প্রান্ত থেকে এবং একই উদ্দেশ্যের তাগিদে। অথচ সেই উদ্দেশ্য কোথাও তীক্ষ্ণ উগ্র হয়ে ওঠে নি।

আলোচ্য গ্রন্থমালার কতকগুলি গল্প বীরত্ব ও দেশপ্রেম, বিশ্বাস ও ত্যাগের ছবি। যেমন আরভিং-এ 'দ্য কনকোয়েস্ট অফ গ্রানাডা' অবলম্বনে লেখা 'গ্রানাডার শেষ বীর', স্পেনের মুর সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির বেদনাদায়ক কাহিনী: "সমস্ত শক্তিকে পুঞ্জীভূত করে তারা এই প্রিয় ভূমিখণ্ডকে আঁকড়ে ধরেছিল; আঘাত, পরাজয়, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত এখান থেকে তাদের নড়াতে পারে নি। ক্ষোভ আর প্রেম এই যুগল ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা অবিচলিত অন্তরে যুদ্ধ করেছিল।" দেশরক্ষার জন্য সংগ্রামরত মুরদের মধ্যে উজ্জ্বলতম চরিত্র সৈনাধ্যক্ষ মুসা, যিনি শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে মৃত্যুবরণকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। তাঁর উক্তি 'মেঘনাদবধ কাব্য'র ইন্দ্রজিতের উক্তির প্রতিধ্বনি। তেমনি বিস্ময়কর চরিত্র রাজমাতা বীরনারী সুলতানা আয়েষা-তুল-হুররা। বিদায়বেলায় রাজার কান্না দেখে ভর্ৎসনা করে উঠেছিলেন: "যে রাজ্য পুরুষের মত তুমি রক্ষা করতে পার নি, তার জন্য নারীর মত অশ্রু-বিসর্জন তোমাতেই শোভা পায়!"

'পিতার সন্ধানে' সোহরাব-রুস্তমের পরিচিত কাহিনী, বীরত্ব ও ট্র্যাজেডির অপূর্ব সমন্বয়। 'কবির আমানত'এ আরব সর্দার শামুয়েল বিন আদী আর-এক চরিত্র, যিনি শিশুপুত্রের হত্যা দেখেও অবিচলিত কণ্ঠে বলেছিলেন: "প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না।"

মুসলমান রমণীও শৌর্যে সততায় চরিত্রে ন্যূন নন। সুলতান বাবরের পিতামহী ইসান দৌলৎ বেগম আত্মসম্মান রক্ষার্থে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও শত্রু সেনানীকে হত্যা করে রাজ্য দখলকারী শেখ জামালকে বলে পাঠিয়েছিলেন: "যদি ইচ্ছা হয়, আমাকে হত্যা করতে পারেন।" জামাল

হত্যা করেন নি, শ্রদ্ধার সঙ্গে বেগমকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যচ্যুত স্বামীর কাছে।

'হার-জিৎ' গল্পে মালেক আপোষে প্রতারণা করে সালেকের তেজী ঘোড়া নিয়ে নিলো। সালেক অনুনয় করল, এ কথা যেন কেউ না জানে। কেন? উত্তর হলো: 'যেভাবে তুমি প্রতারণা করেছ, তা জানতে পারলে মরুভূমির লোকেরা এরপর পথে আর্ত লোককে সাহায্য করতে ইতস্ততঃ করবে।" বলাবাহুল্য, মালেক হার স্বীকার না করে পারে নি। শুধু পুরুষ নয়, আরব নারীর আতিথেয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন বিধবা জয়নাব, যিনি শেষ উটটি দিয়ে ক্ষুধার্ত অতিথি সৎকার করেছিলেন। অন্যদিকে, আরব নারীর বীরত্বও অসীম—জায়েদা স্বয়ং বারংবার শক্তির পরীক্ষা নিয়ে তবেই খালেদের গলায় মালা দিয়েছিলেন। নর-নারীর সমান শক্তির এই কাহিনী মনে পড়িয়ে দেয় বাঙলা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের লাউসেন-কানড়া কাহিনীকে।

এমনিভাবে 'সুদে-আসলে' ন্যায় বিচারের, 'উৎকোচ গ্রহণকারী কাজী' সততার, 'পিপীলিকারাণীর কথা' ঐক্য ও বিবেকের, 'দাসের আত্মচেতনা' চরিত্রবলের, 'আশীর্বাদ' ধর্মপথের ছোট ছোট অথচ ঝকঝকে কাহিনী। এমন ভঙ্গিতে বলা, যা মনকে প্রগাঢ়ভাবে স্পর্শ করে এবং সৎ চরিত্রবান হতে অনুপ্রাণিত করে।

'দরবেশের দোয়া' আরবী পুরাণ-কাহিনীর সঙ্কলন। এখানেও সেই কথকতার মনোহারিণী ভঙ্গি এবং আদর্শের কান্তাসম্মিত আচরণ। 'দিদার নবী'তে হজরত মোহম্মদের বাণী: "নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে মিথ্যার বিরুদ্ধে, এবং অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার নাম হচ্ছে জেহাদ।·· অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমাকেও অবিরাম যুদ্ধ করতে হবে।" 'দরবেশের দোয়া'য়: "শরীর দিয়ে যখন আমরা কিছু করি, সেটা হয় কর্ম, আর অন্তর দিয়ে যখন কিছু করি, সেটা হয় প্রার্থনা। আমাদের স্বভাব উভয় রকমের সাধনারই সমর্থন করে।" এ বইয়ের গল্পগুলি বয়স্কদের উদ্দেশে নিবেদিত।

ছোট-বড়, যাদের জন্যেই হোক, ওয়াজেদ আলী প্রাচীন কথাগুলিকে যে বিশেষ উদ্দেশ্যেই সঙ্কলন করেছিলেন, গল্প পড়ে তা বোঝবার উপায় নেই; তার দিগ্‌নির্দেশ মেলে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'র 'চাঁদামামার ভরসা'য়। সেকালে ছিল সুন্দর জীবন, আজ তা সুদুর্লভ। মানুষের অন্যায় অনাচারই এই

দূরত্বের, বর্তমান দুরবস্থার কারণ। এই পটভূমিকায় চাঁদামামার উক্তি ঃ "যেদিন মানুষের মন, তোমাদের মতো অর্থাৎ শিশুর মতো সরল হবে, যেদিন তারা স্বার্থের কথা ভুলে সুন্দরের চিন্তায় মসগুল হবে, যেদিন তারা খারাপ কথা বলা, অন্যায় আবদার করা ছেড়ে দেবে, যেদিন তারা খোদা আর ফেরেস্তাদের হুকুম মানতে শিখবে, যেদিন তারা পীর পয়গম্বরদের, মুনি ঋষিদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না ডেকে, তাঁদের কাছ থেকে সত্যের, শ্রেয়ের আর সুন্দরের তত্ত্বকথা শুনতে চাইবে, সেদিন আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসবো।"

এই আশায়, এই বিশ্বাসে ওয়াজেদ আলী হারিয়ে যাওয়া বিগত কালকে বারংবার স্মরণ করেছেন—অতীতের আচ্ছন্ন মোহে নয়—এ-কালকে সে-কালের মতো আবার নতুন করে সুন্দর চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে। রেনেশাঁস-ব্যক্তি মাত্রেই এই স্বপ্ন দেখেন ও লেখেন আর তা ছড়িয়ে দেন পাঠকদের মনে মনে।

মধ্যযুগের অন্ধতা, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা, প্রশ্নহীন আনুগত্য, নিষ্ঠুর সমাজ-বিধান ও শাস্ত্রের দাপট থেকে মুক্তিলাভের ব্যাপারটিরই অন্য নাম রেনেশাঁস ঃ পুনরুজ্জীবন। এ-উজ্জীবন একজন-দুজনের নয়, সমগ্র জাতির। কিন্তু নানা বাস্তব ও ঐতিহাসিক কার্য-কারণে পলাশী যুদ্ধোত্তর গৌড়ীয় রেনেশাঁস সামগ্রিক হতে পারে নি, জাতীয়তার চেতনা সম্প্রদায়গত স্বার্থকে পরিপূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পারে নি। ফলে, উনবিংশ শতকের আন্দোলন মুখ্যত 'অভিজাত হিন্দু জাগরণ'-এর রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠেছিল এবং আজও তার ফলশ্রুতি নানা দিকে অব্যাহত। আন্দোলনকারীদের এক অংশ জ্ঞাতসারে হিঁদুয়ানির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এক অংশ করেছেন অজ্ঞাত-সারে, আর যাঁরা জাতীয়তাবাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ সেকথা উচ্চারণ করেছেন, কেউ কেউ অসহায়ের মতো বা প্রয়োজন মাফিক আত্মসমর্পণ করেছেন আর্যগন্ধী হিঁদুয়ানির কাছে।

একইভাবে, বাঙলায় মুসলিম জাগরণ ঘটেছে, যদিও ক্ষুদ্রতর পরিসরে, এবং তারও বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে সমজাতীয় বক্ররেখায়। ফলে, মধ্যযুগ ও আধুনিকতার জটিল মিশ্রণে বর্তমান বঙ্গসংস্কৃতি অর্ধনারীশ্বর;

সেখানে ইতি-নেতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়, ভেজাল আর বিরোধে তা পরিপূর্ণ।

এই পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে বিংশ শতকের মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সামনে দুটো বড়ো সমস্যা। এক: পশ্চাৎপদ স্ব-সম্প্রদায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; দুই: বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল হওয়া তথা হিন্দু-মুসলমানের মিলন। আপাতদৃষ্টিতে দুটো ব্যাপার স্ববিরোধী নয়; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে দেখা যায়, পদে পদে বাধা—ঘরে এবং বাইরে। হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই যখন এই বাধা ও স্ববিরোধ, তখন মুসলমান সমাজের সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে এই প্রবণতা ও সমস্যা আরও গভীর ও ব্যাপক তা বলা বাহুল্য। রেনেশাঁসের পক্ষে এ-লক্ষণ অশুভ। কিন্তু নির্মম সত্য।

মানসিকতার এই দ্বৈততা ওয়াজেদ আলীর রচনাতেও উপস্থিত। তবে তিনি স্বয়ং এবিষয়ে সচেতন ছিলেন, পুরাতন ভাবনাকে নতুনতর ভাষ্যে আলোকিত করে নিতে জানতেন। তাই অজ্ঞতা, উগ্রতার যে-ছিদ্রপথে এই দ্বৈত মানসিকতা মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের হিংস্র সঙ্কীর্ণ ফাঁদে পা দেয়, তা থেকে তিনি অনেক দূরে থাকতে পেরেছেন। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও সংস্কৃতি তাঁকে এমন এক ব্যক্তিত্ব দান করেছে, যা স্ব-সম্প্রদায়ের পক্ষে পরিপূর্ণ অনুকূল হয়েও চরিত্রে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক—যেন দীঘিতে ও সমুদ্রে তাঁর সচ্ছন্দ বিহার। পাশাপাশি দুটি দৃষ্টান্ত রাখছি: ১৯৩৯-এ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ'—'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী'।

মুসলমান সাহিত্যিকদের সম্মেলনে। মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা। স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও দেশ উভয়কে রক্ষার জরুরি প্রশ্ন। মুসলমান সাহিত্যিকদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণে, এই পটভূমিকায় ওয়াজেদ আলী সভাপতির আসন থেকে সহ-যোগীদের যুক্তিনিষ্ঠ নির্দেশদানের চেষ্টা করেছেন। ভাষণের কোথাও আবেগের আতিশয্য নেই, বুদ্ধির দীপ্তি সর্বত্র। কুরাণের সঙ্গে সঙ্গে প্লেটো থেকে কাণ্ট, বের্গস পর্যন্ত সমভাবে উদ্ধৃত, পরীক্ষিত।

ভাষণের সূত্রপাতে মানবচিত্তের বিস্ময়-আনন্দ-স্মৃতি এবং তদাশ্রয়ী সাহিত্যের উদ্ভব-লীলার ব্যাখ্যা: "মুখ্যত ভাবকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার।"

।ই ভাব নিছক কলা কৈবল্যবাদী : "শিল্প হচ্ছে মানুষের তার কাজ মানবমঙ্গল ও আনন্দ বিধান। এর জন্যে সাহি আত্মসচেতন ও আত্মনিমগ্ন হতে হবে এবং "নিজের ই সাধারণ মানুষকে প্রকাশ" করতে হবে। কে সেই সাধারণ মানুষ?

মানুষের যেমন ব্যক্তিপরিচয় আছে, তেমন তার জাতি পরিচয়ও আছে: "আমরা নিজেদের মুসলমান বলে মনে করি, নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করি, নিজেদের বাঙ্গালী বলে মনে করি, আর সর্বোপরি নিজেদের মানুষ বলে মনে করি।" সাহিত্যে এই সবগুলো বিশেষত্বই ফুটিয়ে তুলতে হবে, নইলে তাবৎ সাধনা ব্যর্থ। যেহেতু "গোঁড়ামি সর্বথাই বর্জনীয়, বিশেষতঃ সাহিত্যে।"

এইখানে আলীসাহেব সঙ্কীর্ণতাবাদীদের উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং বলেছেন: শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক হিন্দুর প্রতিভা বিকাশের অনুকূল, মুসলমানদের নয়। যেদিন এই আনুকূল্য ঘটবে, সেদিন মুসলমান-দেরও প্রতিভা বিকশিত হবে। প্রতিভা প্রসঙ্গে অধিকাংশ মুসলমানদের মনে যে মানসকুট রয়েছে, তাকে তিনি এইভাবে উৎখাত করার চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে হিন্দু জাগরণের কথাও বলেছেন। হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রাধান্যলাভের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন "জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে দেশপ্রেমের সম্বন্ধ। দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধের মতই নিবিড়।" একথা বঙ্কিম জেনেছিলেন বলেই নবযুগের আমদানী করেছিলেন এদেশে; এবং তার অভাবে, আবদুল হালিম শারর যথেষ্ট সার্বভৌম দৃষ্টিসত্ত্বেও "সমাজে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।" একই সঙ্গে তিনি গোঁড়া সঙ্কীর্ণদৃষ্টি মুসলমানদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যারা "ইসলামের অমূল্য আদর্শকে মুসলমান সমাজের আদর্শরূপেই দেখে, বিশ্বমানবের আদর্শরূপে দেখে না।" তাঁর মতে, সাহিত্যের কারবার এইসব আচারপন্থী মুসলমানদের নিয়ে নয়, "আদর্শপন্থী মুসলমানদের নিয়ে"।

জন্মলগ্নে ইসলামের মধ্যে এক বিরাট বিশ্ববোধ ছিল, সমগ্র মানব-সমাজের কথা ছিল। কিন্তু কালক্রমে, অন্তত ভারতে সে-বোধ অবসিত। আলীসাহেব নতুন যুগের উপযোগী করে তাকে জাগাতে চাইছেন।

জীবনসংগ্রাম অভিযোজন ইত্যাদি অস্তিত্বদ্যোতক বিষয়গুলি উত্থাপন করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, স্থবিরতার অর্থ মৃত্যু, চলমানতাই জীবন।

নতুন যুগে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে, অচলায়তন থেকে ক্রমাগত মুক্তি পেতে হবে। এমনকি "ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে নব নব সমস্যার নব নব সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।" মধ্যযুগীয় জড়তা জাতিকে পেছনেই টেনে রাখবে। প্রসঙ্গত ইকবাল প্রচারিত Pan Islamism বা বিশ্ব-মোসলেম রাষ্ট্রের আদর্শকেও তিনি খারিজ করেছেন, সামনে রেখেছেন Nationalism তথা জাতীয়তার আদর্শকে।

জাতীয়তার আদর্শ অর্থই সামবায়িক রাষ্ট্র, বিভিন্ন মত-পথ-সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, একের ওপর অপরের প্রভুত্ব নয়। সমান-অধিকার-সম্পন্ন বিভিন্ন জাতীয়তার একটি কেন্দ্রীয় সঙ্ঘ। ফলে, "আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের, আমাদের ধর্মগত এবং কালচারগত স্বার্থের কোন বিরোধ হবে না। উভয় সমাজ অকুণ্ঠিতচিত্তে দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারেন।" বলা বাহুল্য, "ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রই একমাত্র সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় আদর্শ।"

আলীসাহেবের রাষ্ট্রভাবনায় যাঁরা সায় দেবেন না, তাঁরাও স্বীকার করবেন, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে স্থিত হয়ে তিনি মুসলমান সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন, নতুন যুগের যোগ্যতালাভের সুস্থ পথ নির্দেশ করেছেন; ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে বার করে এনে বৃহত্তর জীবন ও কঠিন সংগ্রাম, জাতীয়তা ও দেশপ্রেম এবং বিশ্বমানবতার বিপুল বিস্তৃতির মাঝে তাদের স্থাপন করতে চেয়েছেন। এই বাঁচাকেই তিনি বলেছেন "ডাইনামিক"—যেখানে আছে ভাঙা-গড়া, ওপরে ওঠার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, নতুনের চিন্তা ও সাধনা; যেখানে আছে "জীবন্ত মানুষ," "জীবন্ত মানবতা"। অতএব "আমি যে মুসলমান সাহিত্যিকের কল্পনা করি, সে এই জীবন্ত Dynamic শ্রেণীর মানুষ হবে। সে বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না।···সে হবে গতিশীল জীবনের মূর্ত একটা প্রতীক।" ওয়াজেদ আলী বের্গসঁর 'ক্রিয়েটিভ এভল্যুশন' দর্শনতত্ত্বকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন জাতীয় জাগরণের কল্যাণী বাসনায়।

অসংখ্য কবিলা তথা উপজাতি-অধ্যুষিত এবং বিভিন্ন ধর্মের আবাস আরবভূমিতে সমবায়িক সংঘ-গঠনের ভাবনা হজরত মোহাম্মদের মনে ক্রমশ দানা বাঁধে। মক্কার কাবা মসজিদের অনুষ্ঠানে, মদিনায় পরিষদ গঠনে তার প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়। আকবরের রাষ্ট্রসাধনায় এই সমবায়

প্রথা সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছিল। সম্ভবত এই দুই উৎস থেকে ওয়াজেদ আলী তাঁর ভারত-রাষ্ট্রভাবনার রূপ-রেখা পেয়েছিলেন। আমরা বাঙলা-দেশের আর কোনো সাহিত্যিকের কাছ থেকে এজাতীয় চিন্তার এমন পরিপাটি চেহারা পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আর কোনো সাহিত্যিকই এমন জোরের সঙ্গে বোধহয় বলেন নি, যে, হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত বাঙলাদেশ থেকেই এই আদর্শের পরীক্ষা শুরু হোক।

১৯৩৯এর মে মাসের খর গ্রীষ্মে এই ভাষণ কজন শুনেছিলেন জানিনা, কিন্তু তাঁর আদর্শের—বাঙালিয়ানার—চূড়ান্ত পরীক্ষা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে, যেখানে "বাঙ্গলার স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে ফুটিয়ে তোলা"র প্রাণান্তকর চেষ্টা চলছে হিন্দু-মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমন্বিত সহযোগিতায় ও যৌথ সংগ্রামে।

কিন্তু কেবলমাত্র পয়গম্বর বা আকবর নন, ভারতের সমবায়িক মহারাষ্ট্র রূপের আদল আলীসাহেব পেয়েছেন প্রাচীন ভারত ও আধুনিক আরব ইতিহাসের কাছ থেকেও এবং তাকে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে। এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখ্য গ্রন্থ 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী'।

প্রথম নিবন্ধের নাম 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী'। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল পর্যালোচনা করে লেখক তার ঐক্য ও অনৈক্যের বীজ আবিষ্কার করেছেন। যে সামবায়িক রাষ্ট্রের ভাবনা তাঁর, যাকে বাঙলাদেশেই প্রথম পরীক্ষা করা যেতে পারে, তার সফলতার জন্যে তিনটি প্রকরণ প্রয়োজন: [১] হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য; [২] বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য; [৩] শুভবুদ্ধি ও জ্ঞানের উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণ। 'রাষ্ট্রের রূপ', 'রাষ্ট্র ও নাগরিক' এবং 'জাতীয় জাগরণ' নিবন্ধে তিনি আধুনিক জাতীয়তা, দেশপ্রেম, সমবায় সংঘ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর অভিমত, বর্তমানে দেশে প্রধান অভাব তিনটি: ব্যাপকতর রাষ্ট্রীয় জীবনের, অর্থনৈতিক সচ্ছলতার এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের গভীর গূঢ় আন্তরিক ভিত্তির। জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে কিভাবে এইসব এবং আনুষঙ্গিক অভাব মিটতে পারে, তারও তিনি যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন।

কোনো কোনো সূক্ষ্মদর্শী ওয়াজেদ আলীর 'অখণ্ড-এক-ভারত'এর বিরোধিতা করতে এবং তাঁর সমবায়িক মহারাষ্ট্রের পরিকল্পনায় ভেদবুদ্ধির সূত্র খুঁজে

পেতে পারেন। তাঁদের মনে রাখা দরকার (১) এ ভাষণ পরাধীন ভারতের সংশয়-সঙ্কুল পরিস্থিতিতে প্রদত্ত (২) এর লক্ষ্য—মুসলমান সমাজে অন্তর্নিহিত মানসকূট—যাকে আলীসাহেব বলেছেন "Inferiority complex বা হীনতাসূচক মনোবৃত্তি"—তার সমূল উৎপাটন (৩) রবীন্দ্রনাথও বলেছেন 'রাষ্ট্রিক মহাজাতি'র কথা; (৪) রবীন্দ্রনাথের মতো আলীসাহেবও এক মহামানবের প্রতীক্ষারত, যিনি যীশুখ্রীষ্টের মতো বলবেন: "Follow me, for I am the light, I am the law and the commandment।" (৫) ভারতের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্ত, এবং (৬) আলীসাহেবের স্বগতোক্তি: "তখন সন্ধ্যা সমাগত। মসজিদ থেকে আজানের আহ্বান শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আরতির শংখ এবং কাঁসর-ঘণ্টাও বেজে উঠল। এমন অপূর্ব ঘটনা ইতিপূর্বে কোথাও দেখি নি।··হায়, আমরা বাঙ্গালী যদি আজ এই প্রেমের ধর্মে অভিষিক্ত হতে পারতাম, তাহলে সৌহার্দ্যে, প্রেমে, আত্মার আত্মীয়তায় এদেশে কি শ্রেয়: কি কল্যাণই না বিরাজ করত!···স্বার্থান্ধ লোকের প্ররোচনা না থাকলে, বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মিলন খুবই সহজ ছিল এবং এখনও আছে, আর ভাবীকালেও থাকবে"—('প্রেমের ধর্ম')।

'হিন্দু-মুসলমান' বাঙলা সাহিত্যে এক অসাধারণ প্রবন্ধ। এই স্পর্শকাতর সমস্যাটিকে এমন প্রত্যক্ষভাবে বিশ্লেষণ এবং তার সমাধানের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংশ্লেষণ আর কোনো বাঙালি সাহিত্যিকের লেখায় দেখা যায় না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বড়ো প্রবন্ধ লিখেছেন একাধিক, প্রমথ চৌধুরী এবং আরও কয়েকজন আলোচনা করেছেন। কিন্তু এমন বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ, তথ্য ও যুক্তির এমন সমাবেশ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। অন্তত, এই একটি প্রবন্ধের জন্যই লেখক 'ভবিষ্যতের বাঙ্গালী'র কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ওয়াজেদ আলী প্রথমেই সমস্যার মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন: (১) দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান বিরোধের কারণ কি? (২) কিভাবে এই বিরোধ দূর হতে পারে? (৩) কি উপায়ে উভয়ের মধ্যে নিবিড় ঐক্য সৃষ্টি করা যেতে পারে? প্রশ্নের উত্তরসন্ধানকালে বিরোধের অনেক কারণ তিনি পেয়েছেন এবং তার অবসানের পন্থা বাতলেছেন: (১) ভ্রান্ত অর্ধসত্য ইতিহাস শিক্ষার বর্তমান প্রণালী উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধের কারণ, এই শিক্ষার আমূল পরিবর্তন দরকার যাতে এই রেষারেষির অবসান

হতে পারে। (২) ধর্মগুরুদের অবাঞ্ছনীয় প্রভাব জনচিত্তকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ রাখে, এ থেকে মুক্তি প্রয়োজন। (৩) সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের প্রচার, যা অচিরে বন্ধ করতে হবে। (৪) চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক আন্দোলনকে গণআন্দোলনে পরিণত করলে এই প্রতিযোগিতার কুফল থেকে নিষ্কৃতি মিলবে। (৫) বর্তমান রাজনৈতিক জীবনে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্য, গণশিক্ষা ও গণআন্দোলনের বিস্তার ঘটাতে হবে। (৬) মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের স্বপ্ন, আইনরচনা শিক্ষার বিস্তার আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে এই দুঃস্বপ্নের অকালমৃত্যু ঘটাতে হবে। (৭) বিভিন্ন ধরনের জীবন-প্রণালী, যুগধর্মের অনুসরণে সামাজিক মিলমিশের মাধ্যমে ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। (৮) সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মিলনের অভাব, এমন উৎসবের সূচনা করতে হবে যাতে ও যার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান একস্থানে মিলতে পারে পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে পারে। (৯) ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সামবায়িক আদর্শের অভাব, 'মৃত চিন্তাকে' নিহত করে জীবন্ত চিন্তাকে মানুষের মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। (১০) বাঙালির বর্তমান জীবনে অবাঙালির অতিরিক্ত প্রভাব, বাঙালিত্বের জীবনদায়ী আদর্শকে সামনে রেখে স্বদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে।

আলীসাহেব চান—সম্প্রদায় নয়—জাতি, মানুষ। কিন্তু "মুশকিল হচ্ছে, আমাদের সামাজিক জীবন মধ্যযুগীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অতীতমুখী, আর আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষাগত আদর্শ হচ্ছে আধুনিকযুগের এবং ভবিষ্যৎমুখী। এই অসামঞ্জস্যের দরুণই আমাদের জীবনে নানারকম বিরোধ এবং ব্যর্থতা এসে দেখা দিয়েছে।" আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় জীবনের ও মানসের এই স্ববিরোধ, এই "শ্মশান মানসিকতা"কে লেখক আবিষ্কার করেছেন এবং ততোধিক বলিষ্ঠতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন: "হিন্দুকে শ্মশান থেকে এবং মুসলমানকে গোরস্থান থেকে বাড়ীতে তুলে আনাই হচ্ছে এখন আমাদের কাজ।"

এই অতীতমুখী শ্মশান-মনস্কতা ও মৃত চিন্তার মোহ না পেরোতে পারলে হিন্দু-মুসলমানে মিল হবে না। এ মিল হবে ভেতর থেকে, এবং মনের মিল ছাড়া ভেতরের মিল হতে পারে না।

এই অন্তরের মিলনের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা এবং সাহিত্য। ভাষার ও

সাহিত্যের ঐক্য ছাড়া একটা সুসংবদ্ধ জাতি গড়ে উঠতে পারে না। বাঙলা সাহিত্যের একটা প্রচণ্ড দায়-দায়িত্ব এখানে রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজগুলি উপড়ে ফেলে মিলনের অঙ্কুর রোপণের কাজ বাঙালি সাহিত্যিকরাই নিতে পারেন। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার, গণ-আন্দোলনের প্রসার, পারস্পরিক পরিচয় ইত্যাদি সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটাতে হবে। এবং সে সাহিত্যের লক্ষ্য হবে ভবিষ্যতের অভিমুখে। যেহেতু, "যে-জাতির ভবিষ্যৎ নাই, তার অতীতের মূল্য কি, আর বর্তমানেরই বা মূল্য কি?"—('ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য')। আলীসাহেবের তাই আন্তরিক প্রার্থনা: "বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ হচ্ছে তরুণেরা, কবি এবং সাহিত্যিকরা; তাঁরা এদিকে সচেতন হলে ভাবীকালে জাতীয়তার রাজপথে সম ব্যথা-বেদনায় হাত ধরাধরি করে চলবার পক্ষে হিন্দু-মুসলমানের কোন বাধা বা সমস্যাই রইবে না"—('হিন্দু-মুসলমান')।

৮

বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী দুনিয়ার তাবৎ কালচারের খবর রাখে, শুধু ইসলাম সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে! দুর্গম বিষয়ে গবেষণা করে, কিন্তু 'বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে ইসলামের অবদান' সম্পর্কে প্রবল অনীহা বা ঔদাসীন্য পোষণ করে।

অন্যপক্ষে মুসলমান বুদ্ধিজীবী হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক বেশি জানে। এবং হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, উত্তর খোঁজে নানা জিজ্ঞাসার। জনাব আলীর 'ভারতবর্ষ' নিবন্ধই তার প্রমাণ।

তাই ওয়াজেদ আলী মার্কাস অরেলিয়াস-এর চিন্তাপ্রবাহে স্নাতক হয়ে বলেন: "জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের একই ধর্ম, তা তাঁরা যে জাতির, যে দেশের, যে যুগের এবং যে শ্রেণীর মানুষই হোন না কেন।" সেই ধর্ম বলে: "ধর্মের বাহ্যাবরণ দেখে আমাদের ভোলা ঠিক নয়। মানুষের অন্তরটা দেখা দরকার, আর সেই অন্তরের মাপকাঠি দিয়েই মানুষের যাচাই করা দরকার। মন তখন বলবে: "এ মসজিদে প্রার্থনা করতে সব জাতিই আসে। মুসলমানও আসে, আর খৃষ্টানও আসে, এহুদিও আসে, আর পারসিকও আসে, হিন্দুও আসে আর বৌদ্ধও আসে। এ মসজিদে প্রবেশ করবার অবাধ অধিকার প্রত্যেক মানব-সন্তানেই আছে।" এবং তখনই সত্য-দর্শন হয়: "দুই সভ্যতার মূল অংশ নিয়ে এক ব্যাপকতর এবং পূর্ণতর নূতন সভ্যতার গঠন করাই হচ্ছে আমাদের কাজ। আমাদের প্রকৃত পথ হচ্ছে মিলনের, বিরোধের নয়।"

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনা

অমলেন্দু ঘোষ

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচনা আজও আমাদের কাছে আদরণীয় হতে পারে, কারণ গ্রন্থ-সমালোচনার যে আশু উদ্দেশ্য গ্রন্থ-নির্বাচন এবং গ্রন্থ-প্রচারে সহায়তা দান এবং যে বৃহত্তর লক্ষ্য সামাজিক কল্যাণ, তা এই পত্রিকার সমালোচনাতে চরিতার্থ হয়েছে। সংবেদনশীল সমালোচকের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠক ও প্রকাশকের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া—অর্থাৎ একদিকে পাঠকের বোধশক্তিকে জাগ্রত ও উন্নত করা, অন্যদিকে প্রকাশককে সৎগ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করা। আর গ্রন্থ-সমালোচনার ক্ষেত্র যেহেতু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র, তাই এই ব্যাপারে তাদেরও সক্রিয় ভূমিকা আছে। আমাদের আলোচ্য বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা ১৮৫১ খৃঃ প্রথম প্রকাশ থেকেই এ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করে এসেছে।

মুদ্রণ যন্ত্র ও সাময়িক পত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নতুন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের দেশে চলে আসছে এবং শুধু বিজ্ঞাপন নয়, নতুন গ্রন্থের আলোচনা বা সমালোচনাও শুরু হয়েছে বেশ অনেক কাল আগে থেকেই। কিন্তু সুষ্ঠু গ্রন্থ-সমালোচনার সূত্রপাত হয় বিবিধার্থ-সংগ্রহেই—যদিও এর পূর্বে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় গ্রন্থ-সমালোচনা বেরোত, কিন্তু তা ছিল সংখ্যায় নগণ্য এবং তা-ও যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিচারধর্মী নয়। কিন্তু বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রথম থেকেই গ্রন্থ-সমালোচনার গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করেছে। এদিক থেকে পত্রিকাটির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে।

গ্রন্থ-নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের বিশেষ দায়িত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনার উপর নির্ভর করতে বাধ্য। অবশ্যই গ্রন্থপাঠ এবং গ্রন্থ-সমালোচনাপাঠ এক বস্তু নয়, কিন্তু গ্রন্থ-সমালোচনাপাঠের মধ্য দিয়েই শুধু গ্রন্থ-জগতের ব্যাপকতম সংবাদ গ্রন্থাগারিকের পক্ষে জানা সম্ভব হয়। এদিক থেকেও গ্রন্থ-সমালোচকের দায়িত্ব বেড়ে গেল, কারণ তাঁর নির্বাচন বা বর্জন বৃহত্তর পাঠক সমাজকে

চালিত করবে। এ প্রসঙ্গে বলাই বাহুল্য যে নিরপেক্ষ গ্রন্থ-সমালোচনাই কেবল সাহিত্য-জগতের ক্রমোন্নতির দিগ্‌দর্শন হতে পারে।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তাঁর সহযোগী কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি সাময়িক কালের লেখকদের তুলনায় অনেক নিরপেক্ষ ও উদার ছিল। বিশেষ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ভূমিকা ছিল অনন্ত—বলাই বাহুল্য শুধু গ্রন্থ-সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রথম সম্পাদকীয়তেই ঘোষণা করলেন, সাধারণ শিক্ষিত অগণিত দেশবাসীর সেবা ও কল্যাণ-সাধনই হবে তাঁর পত্রিকার লক্ষ্য। আর সাধারণ শিক্ষিতদের জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের অষ্টাদশ পর্ব-মহাভারতের অনুবাদ এবং বিনামূল্যে বিতরণ নিশ্চয় সকলের স্মরণে আছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে লোকহিতৈষণা ও সেবাব্রতের যে আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল, তারই প্রকাশ বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনাগুলি প্রথম দিকে (চতুর্থ পর্বের ৪২ খণ্ড, অর্থাৎ, আশ্বিন ১৭৭৯ শকাব্দ পর্যন্ত) স্বাক্ষরবিহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয়েছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এগুলি সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরই রচনা। পত্রিকার চতুর্থ পর্বের ৪৩ খণ্ড (কার্তিক ১৭৭৯ শকাব্দ) থেকে মাঝে মাঝে গ্রন্থ-সমালোচনার নিচে 'কা. প্র. সি.' স্বাক্ষর পাওয়া যায়। এই কা. প্র. সি.ই কালীপ্রসন্ন সিংহ, একথাও ধরে নেওয়া যেতে পারে। কালীপ্রসন্ন সিংহ যে বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন, তা তাঁর জীবনীগ্রন্থে [illegible] উল্লিখিত হয়েছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা তিন রকমের হতে পারে: প্রথমত, দীর্ঘ বিস্তারিত সূক্ষ্ম বিচারধর্মী সমালোচনা (এ ধরনের সমালোচনারই স্থায়ী মূল্য আছে); দ্বিতীয়ত, তথ্যমূলক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি (অধিকাংশ পত্রিকায় এরকম সমালোচনাই দেখা যায়) এবং তৃতীয়ত, কোনো লেখকের বা একাধিক লেখকের গ্রন্থ সম্পর্কে সর্বজনবোধ্য ও মনোরম ভাষায় লিখিত প্রায় বিজ্ঞপ্তি-ধরনের রচনা। বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় কিন্তু প্রথম ধরনের সূক্ষ্ম বিচারধর্মী সমালোচনাই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থ-সমালোচনায় কখনো সমালোচিত গ্রন্থের নাম, কখনো 'নূতন গ্রন্থের সমালোচনা' বা 'নূতন গ্রন্থের প্রকাশ' বা 'নূতন গ্রন্থের নামাবলী' ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত

ন্থের শিরোনামে প্রকাশিত সমালোচনাগুলি বিস্তারিত ও ,, 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন' কখনো সূক্ষ্মবিচারধর্মী, কখনো আংশিক বিজ্ঞপ্তিমূলক, কখনো সর্বজনগ্রাহ্য বা ওমনিবাস-জাতীয় এবং 'নূতন গ্রন্থের নামাবলী' একান্তভাবেই বিজ্ঞপ্তিমূলক আলোচনা।

বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকায় প্রথম বছর অর্থাৎ শকাব্দ ১৭৭৩-৭৪ সালে কোনো গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। দ্বিতীয় বছর ভাদ্র-সংখ্যায় প্রথম বের হয় 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচন'। সমালোচনাটি মোটামুটি ক্রিটিক্যাল। এর তিন মাস পরে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে (২য় বর্ষ, ২৩ খণ্ড) 'ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি' বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত ৪ খানা গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনা অংশত বিচারধর্মী এবং অংশত ওমনিবাস-জাতীয়। তৃতীয় বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় (১৭৭৫-৭৬, ৩২ খণ্ড) 'নূতন গ্রন্থের সমালোচন' এই শিরোনামে ৫ খানা বই ও ১ খানা সাময়িকপত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানা রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'। এই সমালোচনাটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞপ্তি-জাতীয়। আবার তৃতীয় পর্বের মাঘ সংখ্যায় (৩৫ খণ্ড) প্রকাশিত কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন' পুরোপুরি ক্রিটিক্যাল।

বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় প্রকাশিত ক্রিটিক্যাল বা সূক্ষ্ম-বিচারধর্মী গ্রন্থ-সমালোচনার কয়েকটির নাম করা যেতে পারে: 'শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত কর্তৃক অনুবাদিত বেণীসংহার নাটকের সমালোচন' (৪র্থ পর্ব, ভাদ্র, ৪১ খণ্ড), গো-বীজের বিবরণ' (৪র্থ পর্ব, ফাল্গুন, ৪৭ খণ্ড), 'রত্নাবলী নাটকের সমালোচন, (৫ম পর্ব, বৈশাখ, ৪৯ খণ্ড), 'পঞ্চতন্ত্র ও ঈসপের গল্প' (৫ম পর্ব, অগ্রহায়ণ, ৫৬ খণ্ড), মধুসূদন-প্রণীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের সমালোচনা (৫ম পর্ব, মাঘ, ৫৮ খণ্ড), মধুসূদন-প্রণীত 'একেই কি বলে সভ্যতা?' নাটকের সমালোচনা (৫ম পর্ব, চৈত্র, ৬০ খণ্ড), হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরববিয়োগ' নাটকের সমালোচনা (৬ষ্ঠ পর্ব, বৈশাখ, ৬১ খণ্ড), শ্যামাচরণ শর্মা-সরকার-প্রণীত 'ব্যবস্থা দর্পণ' ১ম খণ্ডের সমালোচনা (৬ষ্ঠ পর্ব, আশ্বিন, ৬৬ খণ্ড), মধুসূদন-প্রণীত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' গ্রন্থের সমালোচনা (৬ষ্ঠ পর্ব, অগ্রহায়ণ, ৬৮ খণ্ড), রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' এবং মধুসূদন-প্রণীত 'পদ্মাবতী'

নাটকের সমালোচনা (৬ষ্ঠ পর্ব, মাঘ, ৭০ খণ্ড), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'শরীরসাধনীবিদ্যার গুণোৎকীর্তন' (মৃত হেঞর সাহেবের স্মরণোপলক্ষে বার্ষিক বক্তৃতার কয়েকটি সংকলন) (৬ষ্ঠ পর্ব, মাঘ), দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', ফারসী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'হাতেম তাই', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র সমালোচনা (৭ম পর্ব, আষাঢ়, ৭৫ খণ্ড), 'কংসবিনাশ কাব্যের সমালোচন' (৭ম পর্ব, আশ্বিন, ৭৮ খণ্ড), 'রামবনবাস গদ্যকাব্যের সমালোচন' (৭ম পর্ব, কার্তিক, ৭৯ খণ্ড)। ৭ম পর্বের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (৮০ খণ্ড) কোনো গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সংখ্যার পর থেকেই বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকার প্রকাশ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

এই বিবৃতি থেকে একথা স্পষ্টতই জানা গেল যে, বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিমূলক ও সর্বজনগ্রাহ্য আলোচনা অপেক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিস্তারিত ও সূক্ষ্ম-বিচারধর্মী সমালোচনাই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকার প্রথম পর্বে কোনো গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হয় নি, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু পত্রিকার প্রথম পর্ব থেকেই গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশের ইচ্ছা যে সম্পাদকের ছিল, এ কথা পত্রিকার তৃতীয় পর্বের ভাদ্র সংখ্যার (৩২ খণ্ড) সমালোচকের জবানীতে সম্পাদকের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে জানা যায়: "আমরা বহুকালাবধি মানস করিতেছি যে মধ্যে মধ্যে নূতন গ্রন্থের মহিমা-বিষয়ক প্রস্তাব বিবিধার্থে প্রকটিত করিব, কিন্তু অবকাশাভাব-প্রযুক্ত সে কল্পনা অদ্যাপি সিদ্ধ করিতে পারি নাই, এবং ত্বরায় তাহা ফলিতার্থ করিবার উপায়ও দেখি না; অতএব নূতন গ্রন্থের গুণকীর্তন-পরিবর্তে অন্ধ-মাতুলন্যায়ে তাহার বিজ্ঞাপন করাই বিহিত বোধে এই প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের নামমাত্র প্রকটিত করিলাম।" অর্থাৎ নূতন গ্রন্থের গুণকীর্তন বা সূক্ষ্ম বিচার-ধর্মী সমালোচনার পরিবর্তে কেবলমাত্র গ্রন্থের বিজ্ঞাপন 'অন্ধমাতুলন্যায়', নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সমালোচনার এই গুণগত শ্রেণীবিভাগ প্রমাণসহ করার জন্য বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা থেকে দুটি গ্রন্থ সমালোচনা উদ্ধৃত করা গেল। সমালোচনা দুটির শিরোনাম ও পত্রিকায় প্রকাশকাল যথাক্রমে:

১। নূতন গ্রন্থের সমালোচন (৩য় পর্ব, ১৭৭৬ কার্তিক, ৩২ খণ্ড)।

২। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন (৩য় পর্ব, ১৭৭৬ মাঘ, ৩৫ খণ্ড)।

বলাই বাহুল্য প্রথম সমালোচনাটি বিজ্ঞপ্তিমূলক এবং দ্বিতীয়টি ক্রিটিক্যাল।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন

আমরা বহুদিবসাবধি মানস করিতেছি যে মধ্যে মধ্যে নূতন গ্রন্থের মহিমা-বিষয়ক প্রস্তাব বিবিধার্থে প্রকটিত করিব, কিন্তু অবকাশাভাবপ্রযুক্ত সে কল্পনা অদ্যাপি সিদ্ধ করিতে পারি নাই, এবং ত্বরায় তাহা ফলিতার্থ করিবার উপায়ও দেখি না; অতএব নূতন গ্রন্থের গুণকীর্তন-পরিবর্তে অন্ধ-মাতুল-ন্যায়ে তাহার বিজ্ঞাপন করাই বিহিত বোধে এই প্রস্তাবে নূতন গ্রন্থের নামমাত্র প্রকটিত করিলাম। ভবিষ্যতে অবকাশানুসারে ইহার কোন ২ গ্রন্থের গুণকীর্তন হইতে পারে।

১। নূতন গ্রন্থমধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শর্মার বাঙ্গলা ব্যাকরণ সর্বপ্রধান। গৌড়ীয়-ভাষায় তাদৃশ সুচারু ব্যাকরণ আর নাই। তৎপাঠ-ভিন্ন বঙ্গভাষার যথার্থ মর্ম কোনমতে বোধ হইতে পারে না। অতএব আমরা অনুরোধ করি, যে সকল মহাশয়েরা স্বদেশ ভাষার অনুরাগ করেন তাঁহারা ত্বরায় ঐ গ্রন্থের আলোচনা করুন।

২। বর্ধমানাধিপতি মহারাজের অনুমত্যনুসারে বাল্মীকী রামায়ণের এক নূতন অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে। অনুবাদকদিগের কল্পনা ছিল যে কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ হইতে পরিশুদ্ধ ভাষায় মহাকবি বাল্মীকের অদ্বিতীয় কাব্য ভাষান্তরিত করিবেন; কিন্তু কেবল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগেই উত্তম কবিতা জন্মে না; কৃত্তিবাসী রামায়ণের রস অভিনব গ্রন্থে সুদুরূহ প্রাপ্য।

৩। পতিব্রতোপাখ্যান। এই গ্রন্থ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা অদ্যাপি তাহা পাঠ করি নাই।

৪। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনচরিত্র। ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার মহাশয় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

৫। মনুসংহিতার প্রথম দুই অধ্যায়। এই গ্রন্থে মনুর মূল কুল্লুক ভট্টকৃত টীকা, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ, এবং জোন্‌স্ সাহেব-কৃত ইংরাজি অনুবাদ একত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় সম্পাদকেরা অনুবাদদ্বয় উত্তমরূপে সংশোধন করিতে যত্ন করেন নাই। জোন্‌স্ সাহেবের অনুগ্রহে প্রথম শ্লোকে যোগিপ্রধান ভগবান্ মনু অনায়াসে নব্যবাবুর ন্যায় তকিয়া হেলান দিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন, সম্পাদকেরা তাঁহাকে তদবস্থা হইতে অবস্থান্তর করিলে প্রশংসনীয় হইত। (Manu sat *reclined* & C. verse I)

৬। মাসিক পত্রিকা। এতদ্দেশীয় শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদ্বয় হিন্দু-বনিতাদিগের উপদেশার্থে উক্তাখ্যায় একখানি ক্ষুদ্রপত্র প্রকাশে বৃত হইয়াছেন। সংকল্প উত্তম, এবং ভরসা করি সফল হইবেক। পত্রের লিপি-প্রণালীর আদর্শ-স্বরূপ নিম্নে কতিপয় পংক্তি উদ্‌ধৃত হইল। —"মদের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রশ্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মাথায় কি পড়িল?" পরে শুনিলেন—প্রশ্রাব। তখন উত্তর করিলেন,—"তবে ভাল; আমি বোধ করিয়াছিলাম জল।"

"কথিত আছে যে অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা-বিসর্জনকালীন নৌকা হইতে রোদন করিয়া বলিলেন,—"আরে মা চল্‌লেন রে—মার সঙ্গে কেহ কি যাবে না? আমরা সকলে ব্যস্ত, আরে বেটা ঢাকি তুই যা"—এই বলিয়া ঢাকিকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন।" "আর শুনা আছে যে কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেয় ২ করিতে আরম্ভ করিল। মাতাল বলিলেন,—"শ্যালা জলের ঘটী তুই মেও ২ করিয়া কি বাঁচবি, তোকে অগ্রে খাবুই।" পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।" "আর এক ভক্ত-মাতালের কথা শুনা আছে, তাহাও বলা যাইতেছে। ঐ মাতালের নাম—সিংহ। আপন বাটীতে পূজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট যাইয়া কোপেতে পরিপূর্ণ হইলেন; সিংহকে বলিলেন,—"অরে বেটা সিংহ, তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন?"—এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্তা সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে বলিলেন, —"মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন?" —কর্তার নেসা ছুটিয়াছিল, সেস্থান হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া অধোমুখে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন,—"কর্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন, সিদ্ধবংশ।" —(৩য় পর্ব ৩২ খণ্ড, শকাব্দ ১৭৭৬ কার্তিক)।

কুলীন-কুলসর্বস্ব নাটকের সমালোচন

স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা, অন্যের ভাব, বা অন্যের রাগ দ্বেষাদি ধর্ম উজ্জ্বলরূপে মনে বিকসিত হইলেই সেই ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায়ঃ সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ প্রবৃত্তি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ ক্রিয়া মনুষ্যমাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা ইহাতে সর্বদা তৎপর; পিতৃমাতৃ বয়স্য পরিজন প্রভৃতিরা জীবনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন করে, বালকেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত অনুরত থাকে; তাহাদিগের অত্যন্ত প্রমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে ঐ অনুকরণ-কার্য্যই সর্বপ্রধান। ক্ষুদ্র গৃহের স্থাপনা করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি পদার্থদ্বারা কাল্পনিক অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, কাষ্ঠপুত্তলিকাকে পুত্রকন্যারন্যায় লালনপালন করা, তাহার বেশভূষা ও কল্পিত বিবাহাদি-সংস্কার সমাধা করা, অপেক্ষায় বালিকার পক্ষে প্রিয়তর ক্রীড়া কিছুই দেখা যায় না; ও বালকের পক্ষে গুরুমহাশয় হওয়া, রাজা হওয়া, চোর হওয়া, কল্পিত অশ্বারোহণ করা প্রভৃতি কার্য্যই অত্যন্ত প্রমোদজনক। বাল্যকালাবধি এইরূপ অনুকরণস্পৃহা বর্ধমানা হইতে হইতে অধিক বয়স্ককে অভিনয়ের সৃষ্টি করায়; ফলতঃ ইহলোকে সকল ঘটনা সর্বদা ঘটিয়া থাকে প্রমোদ জননার্থে তাহার অনুকরণের নাম 'অভিনয়'। (ভবেদভিনয়োহ বস্থানুকার:। অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই অভিনয়। সাহিত্য দর্পণে ৬ পরিচ্ছেদে ২৭৪ কারিকা।)

এই প্রকারে অনুকরণকে অভিনয়ের মূল বলিয়া স্বীকার করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে পারে যে, যে ঘটনাদি যে যে ব্যক্তি দ্বারা সমাহিত হয়, অভিনয়েও তত্তাবৎ ব্যক্তির উপস্থিতি থাকা আবশ্যক। ঐ সকল ব্যক্তির আকৃতি অবয়ব, গঠন, দীর্ঘতা, খর্বতা, বয়ঃক্রম, সৌন্দর্য প্রভৃতি যে প্রকার অভিনয়েতে সেই সকলের অবিকল অনুকরণ না হইলে সাতিশয় রসের হানি হয়। অপর প্রকরণবশতঃ অভিনয়েতব্য ব্যক্তিদিগের হাবভাব কটাক্ষ এবং বাকস্ফূর্তিরও অনুকরণ করা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের পরিচ্ছদ, বয়ঃক্রম এবং দেশাচারও অবিকল অনুকরণীয়; তাহা নহিলে কে রাজা, কে মন্ত্রী। কে সভ্য, কে প্রতীহারী, তাহার নির্য্যাস হওয়া কঠিন হয়; সুতরাং অভিনয়েরও বৈফল্য। এবম্প্রকার অভিনয়-নিস্পাদনার্থে রূপের আরোপ করিতে হয় বলিয়া সাহিত্যগ্রন্থে নাটককে 'রূপক' (রূপারোপাত্তু

রূপকং। সাহিত্যদর্পণে ৬ পরিচ্ছেদে ২৭৩ কারিকা।) শব্দে বিধান করে।

অনেক কবিতা আছে, যাহাতে ভাব ও ছন্দোলংকারের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই, অথচ তাহা রঙ্গভূমিতে পাঠ করিলে কাহার মনোরঞ্জন হয় না; অপর কতকগুলি কবিতায় ছন্দোলংকারের অনেক ব্যত্যয় আছে, তথাপি রঙ্গভূমিতে মনোরঞ্জনকারিতা গুণ অতি স্পষ্ট দেখা যায়। এই প্রযুক্ত সাহিত্য-কারেরা কাব্যকে 'দৃশ্য' ও 'শ্রব্য' (দৃশ্যশ্রব্য অভেদেশ পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। সাহিত্যদর্পণে ৬ পরিচ্ছেদে ২৭২ কারিকা।) এই দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন; তন্মধ্যে দৃশ্যকাব্য 'রূপক' বা 'অভিনয়' নামে বিখ্যাত। ঐ অভিনয়রূপকবিতার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে তাহার কবিত্ব ও অভিনয়ত্ব উভয়গুণের আলোচনা করিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে নাটকের অধিকাংশ গদ্যে রচিত, তাহাতে কি কবিত্ব থাকিতে পারে? অতএব বক্তব্য যে কবিত্ব শব্দে ছন্দ ও অলংকার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কালিদাস ও বররুচি যে ছন্দে কাব্যরচনা করিয়াছেন, ও যে অলংকারের ব্যবহার করিতেন, এইক্ষণকার অনেক কবি তদ্রূপ করিয়া থাকে, অথচ তাহাতে কেহই কালিদাস হইতে পারেন নাই। মেঘদূতের ছন্দঃ প্রবন্ধাদি সকল লক্ষণের অনুকরণে কোন নব্য কবি 'পদাঙ্কদূত' রচিত করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্যবৎ ভেদ রহিয়াছে; মেঘদূতের রমণীয় সুন্দর রস পদাঙ্কদূতের কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে; অতএব কহিতে হইবে রসই (বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। সাহিত্যদর্পণে ৩ কারিকা।) কবিতার প্রাণ; তদ্‌ভিন্ন কদাপি উত্তম কবিতা হইতে পারে না। কেবল ছন্দোলংকারে কবিতা ও মৃত্তিকানির্মিত মনুষ্যমূর্তি, উভয়েই সমান, প্রকৃতির অনুরূপ বটে, কিন্তু প্রকৃত পদার্থ নহে। রূপকে এই ভাবরক্ষার নিমিত্ত আদৌ যে আখ্যায়িকা-ঘটিত নাটক রচনা করিতে মানস হয়, তাহাতে কেবল ঐ সকল প্রসঙ্গ একত্রিত করা আবশ্যক, যাহাতে হাস্য, করুণা, বীর, রৌদ্র, ভয়ানকাদি রসের উদ্দীপন হইতে পারে—সামান্য কথায় মুখ্যকল্পের ব্যাঘাত না হয়; ফলতঃ কবিদিগের প্রধান চাতুর্য এই যে সামান্য কথার পরিহার-পূর্বক কেবল মুখ্য কথাসকল এপ্রকারে একত্র করেন, যাহাতে আখ্যায়িকার কোন অংশ অসঙ্গত ও অসম্ভব বোধ না হয়। আখ্যায়িকা মিথ্যা হউক, বা সত্য হউক, তাহাতে

কোন হানি হয় না; কিন্তু মনুষ্যের যে অবস্থায় যে ভাব উদয় হয়, বাক্যদ্বারা তাহার আবিষ্কার ও অবিকলরূপে তত্তদাকারের উৎপাদন করাই কবিদিগের মুখ্য কল্প; তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যত্যয় হইলেই রসের হানি হয়।

অসাধারণ ক্ষমতা ভিন্ন সর্বত্র এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া নাটক রচিত হইতে পারে না; সুতরাং শুদ্ধভাবান্বিত রূপক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসরাবধি এতদ্দেশে অনেক কবি অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়াও শকুন্তলার সদৃশ রূপক উৎপাদন করিতে পারেন নাই। স্পেনদেশে লোপ ডি বেগা নামা একজন কবি ১২৭০ খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একখানিও সহৃদয় মহাশয়েরা পাঠ করিতে উৎসুক নহেন।

সমস্ত আমোদজনক পদার্থজাত মধ্যে এবম্প্রকার রূপকের দর্শন সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট; ইহাতে মন ও বুদ্ধির সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় সন্তৃপ্ত হইয়া থাকে; গীতনৃত্যাদি অন্য কোন আমোদে তাদৃশ সুখের সম্ভাবনা নাই। এই প্রযুক্তই প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে গ্রীকজাতি, রোমীয় জাতি, চীন জাতি এবং হিন্দুজাতীয়েরা রূপক দর্শনে অত্যন্ত সমুৎসুক ছিলেন, এবং স্ব স্ব দেশে যে কোন উৎসব হইলেই ঐ রূপকের প্রচার করিতেন। প্রাচীন হিন্দুদিগেরও এবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহারা ইহাতে যৎ-পরোনাস্তি সমাদর করিতেন, এবং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি অগ্রগণ্য মহাকবিরা উৎকৃষ্ট রূপক রচনায় যত্নশীল ছিলেন। তাহাতে ঐ মহানুভাবদিগের যত্নও ব্যর্থ হয় নাই; তত্তৎ কর্তৃক শকুন্তলা বীরচরিতাদি নাটক রূপক রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল আশ্চর্য রচনায় কবিদিগের অদ্ভুতকৌশলে বাক্যদ্বারা লৌকিক ঘটনাসকল এমনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে তৎস্মরণে বুদ্ধির ব্যত্যয় হইয়া তাহাতে সত্যের ভাণ হইয়া থাকে; ভূতকালের ব্যাপার বর্তমান হইয়া উঠে, মিথ্যা সত্য হয়, এবং চিত্রিত পদার্থের অনুকূলে মন কামক্রোধাদি রসে আর্দ্র হয়। কবিদিগের কি আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা! তদ্বারা তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অলীক কল্পিত গল্পদ্বারা দর্শকমাত্রের বুদ্ধিকে জড়ীভূত করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে অনায়াসে তাহাদিগের মনকে কখন হাস্য, কখন মধুর, কখন বা করুণারসে মুগ্ধ করিতেছেন, ও অনেককে ক্রন্দন করাইয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন!

এই মনোহর বিনোদ দুর্দান্ত যবনদিগের রাজ্যকালে এতদ্দেশে একেবারে বিলুপ্ত হয়। কবি ও পণ্ডিতেরা দুই একখানি উৎকৃষ্ট রূপক রক্ষা করিয়া-

ছিলেন ; কিন্তু সাধারণ জনগণের মনে তাহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে এইক্ষণে ঐ দুরবস্থার লোপ হইতেছে। এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করনার্থে যত্নবান হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্মল চন্দ্রোদয়ের আদি কিরণ বলিলে বলা যায়। পূর্বে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে ; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটকখানিতে রূপকের অনেক ধর্ম রক্ষিত হইয়াছে ; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্র সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন ; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। আমরা স্বয়ং উপঢৌকনস্বরূপে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তৎপাঠে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর গ্রন্থকারের নিকটে প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। উক্ত গ্রন্থের পাঠাবধি তাহার গুণ-বর্ণনেও আমাদিগের বিশেষ আকাংখা হইয়াছিল ; কিন্তু মহোদয় ব্যক্তিরা, উপকৃত ব্যক্তিকৃত উপকারের প্রতি প্রশংসাবাদ অপেক্ষায়, পক্ষপাতবিহীন ব্যক্তির মনোগত অভিপ্রায় অধিক শ্রবণে পরিতৃপ্ত হন, এই কারণ এবং সহৃদয় আত্মীয়গণের বিশেষ অনুরোধবশতঃ, কেবল স্বাভিমত তদ্‌গুণ বর্ণন না করিয়া "কুলীন কুলসর্বস্ব" পাঠসময়ে তদ্‌গুণ বিষয়ে আমাদিগের মনে যে যে স্থানে যে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা নাই বটে, পরন্তু বোধ করি, আত্মীয়বর্গ, গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ সুতৃপ্ত হইবেন। "বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন-কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে" অভিনয় দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপকরচনা সর্বদাই করিতেন। "ধূর্তনর্তক" "কৌতুক সর্বস্ব" প্রভৃতি রূপক সকল

এই অভিপ্রায়েই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগদীশ নামা একজন কবি, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞদিগের অধর্মোৎসেদার্থে "হাস্যার্ণব" নামে একটি রূপক প্রস্তুত করেন। যদিচ তাহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে; তথাপি তাহা কুলীন-কুলসর্বস্বের আদর্শ স্বরূপ বলিলে বলা যায়। তাহাতে অন্যায়সিন্ধু-রাজা আপন নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্বী স্ত্রী, গেহিস্নুমুরক্তস্বামি, ধর্মের সমাদর, অধর্মের অবহেলা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে যাহাতে ব্রাহ্মণে পাদুকা প্রস্তুত করে, ও অন্যান্য সংপ্রথা স্থাপিত হয়, তদর্থে এক বারাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হন। পরে তথায় বিশ্বভাণ্ড নামা এক শৈব যোগী ও তাহার শিষ্য কলহাঙ্কুর আসিয়া এক বেশ্যার নিমিত্ত কলহ উত্থাপন করে। অপর রাজার প্রিয় চিকিৎসক ব্যাধিসিন্ধু, যিনি জিহ্বায় তপ্তশলাকা বিদ্ধ করিয়া শূলরোগের প্রতিকার করেন, ও তাঁহার সাধুহিংসক কোতোয়াল, যিনি সমস্ত নগর চোরদিগকে সমর্পিত করিয়া পরম হর্ষান্বিত হন, ও তাহার রণজম্বুক সেনাপতি প্রভৃতি পারিষদগণ উপস্থিত হইয়া কার্য্য সমাধা করে।

সাহিত্যকারদিগের মতানুসারে এবম্প্রকার রচনার নাম "প্রহসন"। এবং তাহাতে দুই অঙ্ক মাত্র থাকা উপযুক্ত*। বিজ্ঞবর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষডঙ্ক-সম্পন্ন পাঠকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য অনুভূত হইতেছে না; বোধ হয়, বঙ্গভাষায় রূপকের প্রভেদ রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তদ্রূপ করিয়া থাকিবেন; পরন্তু সে সন্দেহ পাঠকদিগের মনে বহুকাল স্থান পাইবার নহে; নটীর সুললিত গানে মোহিত হইয়া অবিলম্বেই তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। এতদ্দেশীয় কবিরা প্রায়ঃ বৃত্তচ্ছন্দেই কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, এবং মধ্যে মধ্যে নাগবিলাস, চম্পকলতা প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টিও করিয়া থাকেন, কিন্তু অত্যল্প লোকে পূর্বপ্রসিদ্ধ মাত্রাছন্দে কবিতা রচনা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার "সুকণ্ঠ নির্গলিত সুসঙ্গীতটি" পাঠমাত্রেই জয়দেবের ভুবনবিখ্যাত গীতগোবিন্দের স্মরণ হয়। আমাদিগের এ অভিপ্রায়ের সাক্ষিস্বরূপ উক্ত গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।—

* ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈর্বিনির্মিতং ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতং॥ —সাহিত্যদর্পণে ৬ অঙ্কে ৫৩৩ কারিকা।

চূতমুকুলকুল, মঞ্জুলদলিকুল,
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতিনর্ত্তন, বিরসবিকর্ত্তন,
শুভ-ঋতুরাজ-সমাজে।
নব নব কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত,
ধীরসমীর বিরাজে॥

প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকার কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য নাই ; কৌলীন্য মর্য্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূর্ব দিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরদিন এক অতি বৃদ্ধ কুলীন পাত্রে আপন কন্যাচতুষ্টয়কে সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য্য ; পরন্তু সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরমচাতুর্য্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত্র অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যাকর্তা কুলপালকই প্রসঙ্গবিধায়ে সর্বপ্রধান ; তাঁহার বর্ণনা পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত অথচ কুলাভিমান রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্তি মনোমধ্যে অবিকল উদিত হয় ; কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। পরন্তু নাটকের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রধান নায়ক তিনি নহেন, তদ্বিষয়ে অমৃতাচার্য্য চূড়ামণিই সর্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে। ঘটকের জাতীয় ধর্ম রক্ষার্থে তিনি সকল ঘটেই বর্ত্তমান ; বোধ হয়, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অনেক প্রযত্নে উহার চরিত্রের বিন্যাস করিয়া থাকিবেন ; পরন্তু তৎপাঠানন্তর আমাদিগের অল্পবুদ্ধিতে স্বভাবতঃ ধূর্ত্ত ঘটকের অবিকল প্রতিমূর্তি অনুভূত হইল না ; কোন পরিচিত পদার্থের চিত্র-পটের স্থানে স্থানে অসংলগ্ন বর্ণবিন্যস্ত থাকিলে যদ্রূপ নয়নের অতৃপ্তি জন্মে, ঘটক-রাজের চরিত্রে তদ্রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নাটককার তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঘটক-চূড়ামণির চরিত্র কি প্রকারে বর্ণিবেন, তাহার সঙ্কল্প এই বাক্যে করিয়াছেন ;

তদ্যথা,

"আসিল পরের জাতি কুলনাশ হেতু।
বিবাহ নির্বাহ বিধি জলধির সেতু॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্তধর্মকর্ম্মা।
চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অমৃতাখ্য শর্ম্মা॥"

এই প্রতিজ্ঞানুসারে সর্বত্রই তাহাকে অত্যন্ত ধূর্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু যেব্যক্তি অর্থের লালসায় নিরন্তর শঠতায় অনুরত, তাহার মুখে আপন পিতৃনামের অজ্ঞতাসূচক নিম্নোদ্ধৃত সংলাপ মাদৃশ অকিঞ্চনদিগের অল্প বিবেচনায় কোন মতে সংলগ্ন বোধ হয় না। আমাদিগের বোধ আছে যে. সৎ কি অসৎ, বিজ্ঞ কি অজ্ঞ, বঙ্গদেশীয় কোন ঘটক এ প্রকার বাক্য কখন মুখে আনয়ন করে না। শুক্রাচার্য্যের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি মনে করিলেও এ বাক্য উপযুক্ত বোধ হয় না।

"শুভাচার্য্য। আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

অমৃতাচার্য্য। আঁ কি বল্যেহে? কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

অমৃ। বড় মশা।

শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

অমৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই. পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক ইহলোকের কথা কেন?

অমৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবে তো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে?

শুভ। কে আছ হে—শুনিলে? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃ নামও বিস্মৃত হন! কিন্তু অন্যের পিতৃপিতামহের নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্তি, সে সময়ে একটিও ঠেকে না।

অমৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি? যাহা আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সে কথা থাকুক—তুমি কোন ব্যবসায়ী?"

এই কথোপকথনের কিঞ্চিৎ পরে শুভাচার্য ঘটকের লক্ষণ জিজ্ঞাসিলে অমৃতাচার্য কহেন।

অমৃ। হাঁ, বাপু হে পথে আইস, আমার নিকটে শুনিবে? শুন।

"প্রবঞ্চনা পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন,
ধর্মাধর্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু, ক্ষোদর পূরণে পটু,
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ॥

বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতিকুল করে নষ্ট,
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদসম, মূর্তিমান যেন তম,
হয় নয়-বল সুধীবর।"

"বেল্লিক পুরাণের মাতলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপু হে এসকল জানতে হয়, এসকল শিক্তে হয়, পেটে থেকে পড়িয়াই ঘটক হইলে হয় না। আমি এসকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই "ঘটক চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ-গৃহে কত শত কৈবর্তকন্যা চালাএছি; শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সন্তানে পদ্মরাজ দুহিতা ঘটাএছি; আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এসমস্ত তো আমার শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়ীবাটীর কচিরাম চক্রবর্তীর কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ অপরূপ চাতুর্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে?"

এ উক্তির প্রথম ভাগ অমৃতের মুখে স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয় না, সুধীরের মুখে অতি পরিপাটী হইত। কেহ কেহ মনে করেন, শেষ ভাগও অন্য কোন নটের মুখে থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু, আমাদের বোধে, সাক্ষাৎ দম্ভাবতার ঘটকের পক্ষে একথা নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান হয় না।

শুভাচার্য অমৃতের পরোক্ষে কহেন।

"শুভ। (জনান্তিকে) ওহে ভাই সুধীর, একি? উঃ, বেটা কি দাম্ভিক! বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহামাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে!"

কিন্তু একথা রক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থকার চূড়ামণির মুখে কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ কথা দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা থাকিলে উত্তম হইত। অমৃতাচার্যের সত্যের

বিপর্যয়ে তৎপর বটেন, কিন্তু ব্যাকরণের সহিত তাঁহার বিশেষ বিবাদ বোধ হয় না। অপর কুলপালকের সম্মুখে তিনি যে কৌশলে গৃহাচার্যকে দূরীকৃত করেন, প্রকৃতলোকযাত্রায় কোন বিজ্ঞ কন্যাকর্ত্তার প্রত্যক্ষে কেহ তাহা অবলম্বন করিতে পারে না।

কুলপালকের গেহিনী "ব্রাহ্মণীর" বাক্যালাপে বোধ হয়, তিনি পূর্ণবয়স্কা প্রৌঢ়া; "জামাইবেটা কত কথা জানে" তাহা শুনিতে, "ছিটে ফোটা তন্ত্র মন্ত্রে" তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখিতে, ও যাহাতে "সুখের কামাই" না হয়, ইত্যাদি নানাভিলাষে বিলক্ষণ অনুরক্তা, কোন মতে আতুরা বৃদ্ধার ন্যায় নহেন; পরন্তু কুলপালকের বাক্যানুসারে, তাঁহার চারি কন্যা, তন্মধ্যে বড় কন্যার "অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; মধ্যমটির সকল কেশও পক্ক হয় নাই; তৃতীয় কন্যাও প্রায় মধ্যমটির মত; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে।"

এই কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া জাহ্নবী ও শাম্ভবী আপন বয়ঃক্রমানুসারে সশ্লেষে মাতৃসহিত বিবাহের আলাপ করে; কিন্তু কামিনীটি তাদৃশ শান্ত নহে। তাহার বয়স প্রায় মধ্যমটির মতন, "সকল চুল পাকে নাই" অথচ আবদারে পরিপূর্ণ। এই মায়ের কথায় বিশ্বাস হয় না, আবার বরের বয়েস শুনতে চায়, অথচ "যা হোক বিবাহ হইলেই হয়" (৩২ পৃষ্ঠে) আবার বলে "ওমা, সত্যি বর কি এসেছে? বাসা দিছিস্ কোথায় মা? চুপি চুপি দেক্‌তে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা? ওদিগে গোপনে গিয়া বর দেখিয়া (১০৮ পৃষ্ঠে) "বড় দিদির কপাল ভাল, যেমন দেবা তেমনি দেবী" দেখে, তথাপি যে বরং পদে আছে, তাহার কনিষ্ঠা কিশোরী তাহা হইতেও এক কাঠি অধিক। "বাছা পৌষ মাসে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে", এবং কবিতায় বসন্ত ও বিরহ বর্ণনেও অপটু নহে, তথাপি মার বিবাহ দেখিতে উন্মত্ত। তাহার ভাবে বোধ হয়, কুলপালক আপন দুহিতাদিগের বয়ঃক্রম বর্ণিতে ভুলিয়াছেন; প্রথমা ৩৫ বৎসর, দ্বিতীয়া ২৫, তৃতীয়া ১৪ এবং কামিনী ৮ বৎসর হইলে সকলের কথা সংলগ্ন হইত। এ বিষয়ে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহার মাতৃসহিত কথোপকথন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্লেষোক্তি বলিয়া ইহার অভব্যতা কাটান যাইতে পারে কি না।

"কিশোরী। (সোৎসুকা)

প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল,
অনুকূল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন, সদা করে আকিঞ্চন,
বল্লালির দিবে বিসর্জন।
কুলে কালি দিয়ে কালী, বলে চলে যাব কালি,
ঘটকালী কে করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গো বিতরণ
নাহি ভয় থাকিবে কাহার॥"

"কে রে আমায় ডাকলে?

কামিনী। মা ডাকচে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাকলি?

ব্রাহ্মণী। তুই কালি অবধি কোথায় রে? দেক্‌তে পাইনে কেন?

কিশোরী। ও মা, ও মা, আমি ও পাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেলতে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর এমন যেয়োনা, ডাগোর ডোগোর মেয়ে, যেতে আছে? লোকে যে নিন্দে কর্বে, ছি!

কিশোরী। ওমা, কেন নিন্দে কর্বে মা? কর্বে না, হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়ো না, আজি এক কর্ম আচে।

কিশোরী। কি কম্ম মা?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম হবে।

কিশোরী। ওমা, কি শুভকম্ম, বল্‌না মা? হে মা বল, কি শুভ কম্ম? বল্‌বিনে বল্‌বিনে?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বলবো না কেন? আজি তোদের বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ওমা, বে' কাকে বলে মা?

ব্রাহ্মণী। বে' কাকে বলে তাও জানিস নে বাছা? 'প্রধান সংস্কার'।

কিশোরী। ওমা, তাকি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা বে' কি খেতে হয়? বাঙাবর আসবে, তোদের বে'

কবে', কতো ঘটাঘটি হবে, সেকি বাছা কিছুই জানিস্‌নে ?

কিশোরী। হাঁ হাঁ, সেই বে' ? তা আমি জানি, তা কার হবে মা ?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ওমা, তবে তোর হবে না ?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা, তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বলতে আছে ? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ বুঝেছি তোর হয়ে গেছে, ওমা কার সঙ্গে হয়েছে, বল না মা ?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমায় ব্যস্ত করিস নে, মত্তিচি নানান্ জালায়, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা।"

তৃতীয়াঙ্কের প্রধান প্রক্রিয়া কামিনীগণের জলসওয়া ; তাহার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই ; মোহিনীর প্রবেশ অবধি সকল কর্ম সুপরিপাটীরূপে নির্বাহ হইয়াছে। মহিলাগণের আপন আপন স্বামী-সম্বন্ধে বিলাপ-পাঠে অনেকের মনে ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থস্থ সুন্দর-দর্শনে কামিনীগণের উক্তি মনে পড়িতে পারে, কেহ বা এই অঙ্কের কবিতার বাহুল্য-বিষয়ে সাহিত্যকারদিগের নিষেধ স্মরণ করিতে পারেন, পরন্তু নিম্নোদ্ধৃত গর্ভাঙ্কের পরম-সৌন্দর্যের ও অবিকল স্বভাব সাদৃশ্যের প্রশংসা অবশ্যই করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"মোহিনী। এই তো বে বাড়ি, কৈ কে কোথা গো ? কাকেও যে দেক্‌তে পাইনে। ওমা সে এ কি গো ? ঐ যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়া পড়সীর"।

ভামিনী। মরণ, ও কি হলো ? মিললো কৈ লো ?

মোহিনী। আর ভাই, মেলে কৈ ?

ভামিনী। গুণ থাকলেই মেলে, "যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম নাই"। দেক্‌দেকি মিল্লো কিনা ?

মোহিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকেও যে মেলে না, তার কি বল্‌না ?

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ি, অচ্চ কিছুই দেক্‌তে পাইনে। বাদ্দি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই ; সে কি, আঁ, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব !

হেমলতা। এই যে ভাই একটা কলাগাচ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাছ কত দিকে আচে, আসল কৈ লো। বাড়িল্লোক কৈ ?

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্ল মুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এস, এস, আসবে বৈকি ; তোমাদের কর্ম্ম, কর্ব্যে কম্মাবে, খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে ; তোমরা না কল্যে কে কর্ব্যে ? জাতি বল, গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠানদিদি বলি একি লো ? মেয়েদের বে দিতে বসেছিস্ তা সব ফাকিজুকি, ঘটাঘটি কৈ। কিছুই যে দেখিনে ?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই 'ঘটা', কুলীনের মেয়ের 'বে' ঘটাই, আবার 'ঘটা' পাবো কোথা বোন ? তবে তোরা এসেছিস এই ঘটাই 'ঘটা'।

কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্নে বড় গিন্নীর সব ফাকি, নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন ?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা কি বলতে আছে ? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি ? যা, তোরা সকলে মিলে জুলে জলসৈতে যা দেখি ?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেছে।

(বাটীমধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান)

তার জন্যে জলসৈতে হবে না, তাকে 'জল সৈ' কল্লিই ভাল হয়—শুনে গেলিনে মাগি ?"

এই অভিনয়ের কিঞ্চিৎ পরে (৫২ পৃষ্ঠে) যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমত পাষাণ-হৃদয় কেহই নাই, যে একেবারে মহাপাপিষ্ঠা কৌলীন্যপ্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয় ; তদুক্ত জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমণ্ডলে আর আছে ? পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই মনে করিতে পারেন, যে সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত কর্তৃক অধ্যাপক-ভট্টাচার্য্যের বর্ণন অবশ্যই উত্তম হইবে, কিন্তু যদবধি তাঁহারা প্রস্তাবিত গ্রন্থস্থ ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের বর্ণনা না পড়েন, তদবধি বর্ণনাদ্বারা কি পর্য্যন্ত প্রকৃতের প্রতিমা মনে উদিত হয়, তাহার অনুভব করিতে পারিবেন না। ধর্মশীলকে লৌকিক-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রে একাগ্রচিত্ত, অথচ অর্থাভিলাষী অধ্যাপকবর্গের আদর্শস্বরূপ বলিলে বলা যায়।

কুলীন-কামিনীদিগের দুঃখবর্ণন—করণান্তর তাহাদের দুঃখদাতা কুলীন-কলিপুত্রদিগের মূর্তি চিত্রিত করিতে অনায়াসেই স্পৃহা হইতে পারে; তর্কসিদ্ধান্ত বিবাহ বণিক, অধর্মরুচি, ও উত্তম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রেই অতি পরিপাটীরূপে সে স্পৃহা নিবৃত্ত করিয়াছেন। কুলীন-কুলসর্বস্ব-দ্বেষী ীন "কলির চেলা" এমত কেহই নাই, যে সে চরিত্রের কোন অংশে ার্থ দোষারূপ করিতে পারে। বিবাহবণিক (৭২ পৃষ্ঠে) "১২৫২ শালের ৩রা মাঘ বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালঙ্কারের কন্যাকে" বিবাহ করিয়া কি প্রকারে ১২৬১ সালে "এককালে কুড়ি বৎসরের ছেলে" প্রাপ্ত হইলেন, াহা সন্দেহজনক মনে হইতে পারে; পরন্তু বণিকজীর 'ফর্দে' বিশ্বাস কি? তাঁহার 'লেখাপড়া' কুলধনের কন্যার ঠিকুজির (৬ "বয়েস বড় অধিক নয়, সেদিন ঠিকুজি খুলিয়া দেখিলাম, বলি দেখি দেখি মেয়েটার বয়েস কত, ভাই বুঝিতে পারিলাম না, ঠিকুজি খান জীর্ণ হয়েছে, আঁকর বোঝা যায় না, তা নাই গেলো, সে এই বড় পিসীর বইসী।" কুলীন-কুলসর্বস্বে পৃষ্ঠে)। ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া থাকিবে, বা বণিগ্‌বর ১২৪২কে ১২৫২ পড়িয়া াকিবেন।

অতঃপর কন্যাপ্রসূ গর্ভবতীর দুঃখ, কন্যাবিক্রয়ের দোষোদ্‌-ঘোষণ, ফলারের লক্ষণ, বিরহি পঞ্চাননের যাতনা, ও অভব্যচন্দ্রের পরিচয় প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে তর্কসিদ্ধান্ত এতদ্দেশীয় অনেক ব্যাপারের সুবর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু এ অল্পায়তন পত্রে তাহার আলোচনা করায় নিরস্ত হইতে হইল; পরন্তু এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্বে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য, যে বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুলীন কুলসর্বস্বই রঙ্গভূমিতে অভিনীত হওয়ার উপযুক্ত; তাহার অভিনয় যাদৃশ মনোহর-বিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদৃশ সদ্‌বিনোদ অধুনা বঙ্গভাষায় াছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে না। প্রস্তাবিত নাটকপাঠেও প্রায়ঃ সকলেই পরিতুষ্ট হইবেন; অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি যে, পাঠকগণ সকলেই "কুলীন কুলসর্বস্ব" আলোচনায় লাভ করুন। —(৩য় পর্ব ৩৫ খণ্ড; শকাব্দ ১৭৭৬, মাঘ)।

আমার মায়ের জন্য

অশোক মুখোপাধ্যায়

দিন কি রাত বোঝার উপায় নেই।

একটানা ঝিঁ ঝিঁর শব্দ। মাঝে কিছুক্ষণ থামে। আবার ডাকে।

আজ তিন দিন ধরে ট্রিগারে হাত পড়েনি মুয়েনের। অথচ বুকে বন্দুক চেপে প্রতিটি মুহূর্ত সে সজাগ। কিন্তু হেড ফোনের ক্রিস্ট্যাল তাকে কিছুই বলেনি। সন্দেহজনক কোনো কিছুই পড়ে নি তার নজরে। তবে কি মানুষ-খেকো ইয়াঙ্কিগুলো ভিয়েতনামের মাটি ছেড়ে পালিয়ে গেলো? কিন্তু তাই বা কি-করে হয়? এই তো কিছুক্ষণ আগেও টহলদার ইয়াঙ্কি বিমানখানা আকাশের প্রশান্তি ভঙ্গ করে উড়ে গেলো একশো সতের ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের দিকে। কাঁপতে লাগল গাছের পাতাগুলো থর থর করে।

সতের ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ। উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের সীমা। সে সীমা আজ নিজেই ভেঙে দিয়েছে আমেরিকা। মনে মনে একটু হাসল মুয়েন। ওরা ভিয়েতনামের অখণ্ডতাকে অক্ষাংশ দিয়েই ভাগ করতে চায়। ওরা জানেনা ভিয়েতনামের মানুষের একমাত্র পরিচয় ভিয়েতনামী।

সপ্তাহখানেক আগে বুইলাম এসেছিল সায়গন থেকে। খবর এনেছিল ইয়াঙ্কিদের কড়াপাহারায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের কনস্টিটুশন পাশ করাচ্ছে তাঁবেদাররা। মনে মনে কাই সরকারের মুণ্ডুপাত করল মুয়েন।

কখন একটা জোঁক এসে বসেছে কানের কাছে। উত্তেজনায় টের পায়নি সে। এখন সেটা কুট্ কুট্ করছে। সন্তর্পণে ট্রিগারের ওপর থেকে আঙুল কটা সরিয়ে জোঁকটাকে টেনে আনল মুয়েন।

—"রক্ত খেয়েছে।"

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরল কাটা জায়গা থেকে। একটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরল মুয়েন। মাটিতে পড়ে জোঁকটাও খানিকটা রক্ত বের করে দিলো পেট থেকে। কিরিচখানা বের করে জোঁকটাকে টুকরো টুকরো করে কাটবে কিনা তাই চিন্তা করছিল সে। কিন্তু জোঁকটা তার দেশের মাটির। ওরা বংশ পরম্পরায় আনাম-টংকিং-এর মাটিতেই

বাস করে আসছে এতাবৎকাল। সুতরাং খাদ্যের দাবিতে তার রক্তে ওর অধিকার আছে। কিন্তু ইয়াঙ্কিদের কি আছে! কিছু নেই।

নেই বলেই তারা লুঠেরা।

সমৃদ্ধিশালী মেকং বদ্বীপের উৎপন্ন ফসল তারা লুটে নেয়। কেড়ে নেয় চাষীর হাত থেকে আবাদী ধানের জমি। পাকা ধানে তারা সাঁজোয়া গাড়ির মই চালিয়ে খোঁজে 'মুক্তি-সৈনিক'দের—বিদ্রূপের গলায় একসময় যাদের নাম দিয়েছিল ভিয়েতকঙ। আজ সেই বিদ্রূপের নামটাই হয়ে উঠেছে তাদেরই বুক কাঁপানো ভয়ের শব্দ।

ভিয়েতকঙ……ভিয়েতকঙ!

কয়েকবার অস্ফুটে উচ্চারণ করল নুয়েন। সারা শরীরে কেমন রোমাঞ্চ খেলে যায়। ভিয়েতনামের যারা আসল মানুষ, তারাই আজ মুক্তিযোদ্ধা। তাঁবেদাররা দিনকে দিন কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। তাদের সুরক্ষিত দেয়ালের চারপাশে পড়েছে 'ভিয়েতকঙ ভূতের ছায়া'। সে ছায়া যতই দীর্ঘতর হচ্ছে, এই মার্কিন চোরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ভাড়া করা দারোয়ানটির হৃৎকম্পন ততই দ্রুততর হচ্ছে।

একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল নুয়েন।

এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে তার মাথাটাও ধীরে ধীরে কেমন গরম হয়ে উঠছিল। টুপ করে কোথায় একটা পাতা পড়ার শব্দ হলো। চমকে উঠে রাইফেলটা শক্ত করে বুকের কাছে বাগিয়ে ধরে। নিবিড় অরণ্যানীর নিচে পাতা-চাপা অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে শিকার-সন্ধানী জাগুয়ারের মতো।

এক দুই তিন করে মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। আর কোনো শব্দ নেই। আবার একখানা ইয়াঙ্কি প্লেন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় আকাশ কাঁপিয়ে। মধ্যভিয়েতনামের গহন অরণ্যানীর নিবিড় পত্রপুঞ্জ কাঁপতে থাকে থর থর করে। দাঁতে দাঁত চেপে মাটিতে বুক রেখে পড়ে থাকে মুক্তিযোদ্ধা নুয়েন। তার ডাইনে বামে কি আছে সে জানে না। কে আছে—তাও না। কিন্তু তার পায়ের তলায় ভিয়েতনামের মাটি আছে। মাটির সঙ্গে মিশে আছে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সৈনিক। ম্যারিকান সাম্রাজ্যবাদ যেখানে তার শেকড় চালাতে অসমর্থ।

কিন্তু শিরদাঁড়ার মজ্জার ওপরটা এত ভারি লাগছে কেন ?

একটা চলমান অনুভূতি অনেকদিন পরে যেন টনটনিয়ে ওঠা কোমরের ওপর সস্নেহ ম্যাসেজের মিষ্টি ছাপ এঁকে চলেছে। আরামের আতিশয্যে চোখ দুটো যেন বুজে আসতে চায়। ধীরে, অতি ধীরে, সন্তর্পণে ঘাড়টা একবার বাঁকিয়ে দেখলে নুয়েন।

সর্বনাশ ! একটু নড়লেই বিপদ।

প্রকাণ্ড একখানা পাইথন চলেছে কোমরের ওপর দিয়ে। রাজকীয় চালে গজেন্দ্রগমনে চলেছেন নাগরাজ। কোনোদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। ভিয়েতনামের অরণ্যচারী অরণ্য-পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। বন্ধুর পথ পরিক্রমায় এটুকু ব্যারিকেড গাছের শেকড় কিংবা টুকরো পাথরের সামিল। ইয়াঙ্কিদের তুলনায় দেশপ্রেমিকদের কাছে ওরাও আজ পরম মিত্র।

কিন্তু সামনেই এক অসামান্য সাফল্যের ইঙ্গিত পেয়েছে নুয়েন। বাতাসে যেন একটা ভাবী সুমঙ্গলের আভাস পাচ্ছে। সায়গনের এক বৃদ্ধার কাছে শুনেছিল সে, অজগরের মুখ থেকে যে মানুষ বেঁচে আসে, সামনে থাকে তার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত। সেই আসন্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গন্ধ পাচ্ছে সে। সায়গনের কথা মনে হতেই, কোমল বিষণ্ণতার কুয়াশা তার বুকের ওপর চেপে বসে। প্রাচ্যের প্যারিস সায়গন।

ছায়াবৃত রাজপথের পাশেই ছবির মতো তার বাড়িখানা। স্বপ্নের মতো তার সহচরী। ত্রিন খি নু। টকটকে তাজা গোলাপের মতো লে ভান হুয়ান। রাফায়েলের জীবন্ত ম্যাডোনার রূপ দেখেছিল নুয়েন ভিয়েতনামের ধূলিপটে। কিন্তু বরাতে সইল না তাই। দিগন্ত ছেয়ে এলো ঝড়। নীল আকাশে দেখা দিলো কালোমেঘের ঘনঘটা। অনেকদিন পরে নিজেকে আবিষ্কার করল নুয়েন—সে এন. এল. এফ. হয়ে গেছে।

তার বয়েসী ছোঁড়াগুলো অনেকে ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো সায়গন কিংবা চোলন-এর তু দো স্ট্রীটের আধো আলো আধো অন্ধকারে কোনো ভিয়েতনামী ছুঁড়িকে বাহুলগ্ন করে গান ধরেছে লা···লা···লা···। লে লোই এভিনিউয়ের কোনো খদ্দের-সন্ধানী হয়তো হেঁকে হেঁকে বলছে, "হে, চার্লি, কামিয়ার! মি হ্যাভ নাম্বার ওয়ান গার্ল।" কিংবা নাইট ক্লাবের কোনো এক মিষ্টি সন্ধ্যায় জাজসঙ্গীতের ঝাঁঝাঁল সুর মাতাল হয়ে লুটিয়ে পড়ছে রঙীন বীয়ার-সমুদ্রের কূলে এসে।

আর সে? মুক্তিযোদ্ধা হুয়েন? সায়গনের স্বপ্নরঙিন দিনগুলো ফেলে হোন্‌সন্ পাহাড়ের জঙ্গলে এসে মশা তাড়াচ্ছে। সত্যি সত্যি এক ঝাঁক মশা এসে ভন্ ভন্ করছিল তার মুখের সামনে। কয়েকটা তো নাকেই ঢুকে পড়েছিল প্রায়। আর একটু হলেই হেঁচে ফেলেছিল সে।

বনের অন্ধকার তলায় একটা মৃদু সর্ সর্ শব্দ। পাইথনটা বোধহয় চলে যাচ্ছে। মাটিতে কান পেতে চুপ করে পড়ে রইল হুয়েন। ক্রমেই শব্দটা যেন এগিয়ে আসছে। তবে কি পাইথনটা তার দিক্‌পরিবর্তন করেছে?

"নাঃ, জ্বালালে দেখছি।"

কিন্তু কি করবে কিছুই ভেবে পেলো না সে। পাইথনটা যদি আসেই মুখোমুখি! গুলী? কিন্তু বুলেটের যে অনেক দাম। ইয়াঙ্কি পিছু একটার বেশি বুলেট অপব্যয়। সে রকম শিক্ষা পায়নি দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। বেয়নেটটা সে বাগিয়ে ধরে শক্ত হাতে। ক্রমেই শব্দটা দ্রুততর হচ্ছে। কাছে। আরও কাছে। এক দুই তিন···মুহূর্ত গুণতে থাকে সে। চোখ দুটো তার জ্বলছে, পাইথনের চেয়ে ক্রূর।

অন্ধকারের বুক ঠেলে দুটো চোখ যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার সামনে। হাত দুয়েকের ওদিকে। চোখদুটো আবার স্থির হয়ে গেলো। পাইথনটা বোধহয় ভাবছে। ভাবছে তার শিকারখানা কেমন করে জড়িয়ে ধরলে বেহাত হবে না কিছুতেই। হাত দুখানা ক্রমেই শক্ত হয়ে ওঠে হুয়েনের। পাইথনটা ক্রমেই এগুচ্ছে। এক দুই তিন—পেছনের ছড়িয়ে রাখা পা দুখানা সামনে এনে তড়াক করে হাঁটু মুড়ে বসে হুয়েন। আশ্চর্য! পাইথনটাও যেন তাকেই অনুসরণ করল। আর, তারও হাত থেকে এগিয়ে এলো একখানা-চকচকে ধারাল বেয়নেট। আর সেই মুহূর্তেই কোথায় যেন ব্যাঙ ডেকে উঠল কট্ কট্ করে। তদ্দণ্ডেই হুয়েনও তার জানান দিলো অনুরূপ শব্দ করে।

ব্যস্! ভাব হয়ে গেলো।

হাতে হাত মিলিয়ে নিলো দু-জন দেশপ্রেমিক।

গভীর আবেগে দুজনে জড়িয়ে ধরল দুজনকে। আর সেই আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই হুয়েন প্রথম বুঝল সে যাকে জড়িয়ে ধরেছে—সে পুরুষ নয়, রমণী। দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সে সাহসিকা সৈনিক।

সাধারণভাবে সেও 'ভিয়েতকঙ'। মধ্যভিয়েতনামের অরণ্যানী যেন যুগ যুগ ধরে এতকাল প্রতীক্ষা করে এসেছে তারই পদপাতের। হোন্‌সন্ পর্বতমালা তারই প্রতীক্ষায় কাল গুণেছে অনন্তকাল।

ত্রিন থি মু ঠিকই চিনতে পেরেছিল গুয়েনকে।

আলিঙ্গনের উষ্ণস্পর্শই তাকে বলে দিয়েছিল অজ্ঞাত অরণ্যচারী মুয়েন ছাড়া আর কেউ নয়। তাই সে বিনা দ্বিধায় থ্রিপয়েন্ট এইট ভি বাল্‌বটায় ড্রাইসেলের কানেকশান দিয়ে দিলো। অসূর্যম্পশ্যা অরণ্যানীর তলদেশে অন্তহীন অন্ধকারের পাঁজর ফাটিয়ে ক্ষীণ বিজলী আলোয় অনেককাল পরে তাদের শুভদৃষ্টি হলো! বিস্ময়ের ধাক্কাটা কেটে যেতেই মুয়েনের গলা দিয়ে স্বর বেরুল—"ত্রিন থি মু!" ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে "চুপ" বলেই ব্যাটারির কানেকশানটা অফ্‌ করে দিলো ত্রিন থি মু।

অ—নেক, অনেক পরে।

নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আরও চারখানা ইয়াঙ্কি প্লেন টহল দিয়ে উড়ে চলে গেলো মাথার উপর দিয়ে। গাছের পাতাগুলো অকারণ আশঙ্কায় কাঁপল থর থর করে। কিন্তু নিবিড় বন্ধনে হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধা দম্পতির হৃদয় কাঁপলনা একটুও।

ফিস্ ফিস্ করে বলল ত্রিন থি মু —"আমি জানতাম, এ তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।"

—"কি করে বুঝলে?"

অন্ধকারে একটুখানি হাসল ত্রিন থি মু। সে হাসি দেখতে না পেলেও কথাগুলো শুনতে পেলো মুয়েন।

ত্রিন থি মু বলছে, "আমরা মেয়েরা, আমাদের একটা সহজাত শক্তি আছে, যা দিয়ে আমরা অঁাধারে মানিক চিনতে পারি। জঙ্গলেও খুঁজে পাই হারানিধি। তর্ক করো না। তার প্রমাণ আমি নিজেই। বলো, একটুখানিও কি ভুল করেছি? পারিনি তোমাকে চিনতে?"

—"কিন্তু খোকা? আমাদের খোকা? ভান্ হুয়ান?"

—"খোকাকে আমার সইয়ের কাছে রেখে দিয়েছি। সে বেশ ভালোই আছে। কিন্তু তোমার মনটা কি ছোট হয়ে গেছে মুয়েন। তুমি খালি তোমার খোকার কথাই ভাবছ। ভিয়েতনামের হাজার হাজার খোকাকে আজ তোমার বলে ভাবতে পারছ না কেন মুয়েন?"

—"আমি আমার কথাই ভাবচি ত্রিন থি মু। আর একজন তার কথা ভাবছে। আমরা প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ, প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষের আবর্তে চিন্তা করছি। এমনি করে সবগুলো একক মিলে আমরা এক। শরীর যখন ঝিমিয়ে আসে, হাত-পা যখন নেতিয়ে পড়ে—তখন খোকার কথা স্মরণ করেই তো মনে জোর পাই, বুকে বল আসে। নইলে ভিয়েতনাম আর কাদের জন্য?"

—"উঃ! কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলো তো?"

—"আমি তো ভেবেছিলাম দেখাই আর হবে না।"

—"আমি কিন্তু জানতুম দেখা ঠিকই হবে।"

—"বাজে কথা বলোনা। দৈবক্রমে দেখা হয়ে গেছে, তাই। নইলে তুমি কিছু আমাকে খুঁজতে আর মধ্যভিয়েতনামের জঙ্গলে আসোনি।"

—"বটেই তো। কেবলমাত্র তোমাকে খুঁজতে মধ্যভিয়েতনামের জঙ্গলে আসার কোনো মানেই হয় না। এতবড় বোকামি করতে আমি নিশ্চয়ই আসিনি। আর সে সময়ও আমার নেই।"

খানিকক্ষণ পরে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস অস্ফুট শব্দ করে বেরিয়ে এলো নুয়েনের বুকচিরে।

চকিতে সাপিণীর মতো ফুঁসে উঠল ত্রিন থি মু।

—"তোমাদের ব্যাটাছেলেদের ঐ একটা মহৎ দোষ। কিছুতেই নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝোনা। যেই বলেছি তোমাকে খুঁজতে আসিনি, অমনি রাগ হয়ে গেলো। অথচ এই তুমি, দিব্যি নিশ্চিন্তে আড়াইবছর আগে আমাকে আর খোকাকে ফেলে রেখে দিয়ে তো চলে এলে মুক্তি-ফৌজে নাম লিখিয়ে। মানুষখেকো ইয়াঙ্কিদের হাতে পড়ে আমাদের যে কি দশা হলো, কই এ্যাদ্দিন তো ভাবোনি সে কথা?"

—"ভেবেছি বইকি ত্রিন থি মু, ঠিকই ভেবেছি। ভেবেছি বলেই তো আজ আমি হোনসন্ জঙ্গলের মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তুমি? তুমি এলে কেমন করে?"

কৌতুকের এতবড় সুযোগটা হাতের মুঠোয় পেয়ে স্থান-কাল-পরিবেশ বিস্মৃত তরুণী ত্রিন থি মু চোখের কোণে ভুবন ভোলানো কটাক্ষ হেনে, ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি টেনে বললে, "যদি বলি, যে পথ দিয়ে তোমারই প্রিয় চরণ গেল চলিয়া?"

—"তাইতো সন্দেহ করি প্রিয়তমা। নইলে পিতা যার ম্যারিকান তাঁবেদার কাই-সরকারের বশংবদ দাসানুদাস, পদোন্নতির নিশ্চিত আশ্বাসে যিনি জামাতাকে তুলে দিতে চেয়েছিলেন মানুষখেকো ইয়াঙ্কিদের হাতে, তাঁর কন্যাকি নির্ভেজাল দেশানুরাগের দীক্ষা নিয়েই এসেছে এপথে, না আর কিছু আছে?"

—"জানোয়ারের মতো কথা বলোনা নুয়েন। লজ্জা করে না তার—যার স্ত্রীকে স্বামীর দেশপ্রেমের খেসারত দিতে ইয়াঙ্কিদের হাতে ধর্ষিতা হতে হয়?"

—"ত্রিন-খি-নু! তু-তু-তুমি ধর্ষিতা?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর্ষিতা! চীৎকার করে আকাশটা ফাটিয়ে এই কথা তোমায় যদি আজ জানিয়ে দিতে পারতাম, তাহলে অনেকটা শান্তি পেতাম। আর তা তোমারই জন্যে।

—"তুমি রাগ করোনা ত্রিন খি নু। দুঃখু করোনা। সত্যিই আমার দোষ হয়ে গেছে। আমি না বুঝে তোমাকে আঘাত দিয়েছি। তুমি ধর্ষিতা! তুমি লাঞ্ছিতা! যুগে যুগে ধর্ষিতা ধরিত্রীর মতোই তুমি মহিমান্বিতা। আমার ধর্ষিতা মাতৃভূমির সঙ্গে তুমিও গৌরবান্বিতা। তুমি আমার গৌরব।"

গভীর আবেগে ত্রিন খি নুর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয় নুয়েন। জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের দুর্ধর্ষ সৈনিক রমণীটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে নুয়েনের বুকে মুখটা গুঁজে দিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে। দাম্পত্যকলহের মেঘটা কেটে গেলে নুয়েন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে :

—"খোকা কত বড় হয়েছে ত্রিন খি নু?"

মুহূর্তে এক ঝলক হাসি ফুটিয়ে ত্রিন খি নু বলে, "খোকা? তা অনেক বড়ই তো হয়েছে সে। আগামী খ্রীষ্টমাসে পাঁচ বছরে পা দেবে। আর জানো, এত দুষ্ট হয়েছে না, সে তোমাকে কি বলব। নিজের চোখেই দেখো। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম অনেকদিন পরে। কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। ঘুমিয়ে পড়তে পালিয়ে এসেছি। কষ্টে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। কিন্তু আর না। অনেক দেরি হয়ে গেলো। খবরটা আমাকে যেমন করেই হোক আজকের ভেতরেই পৌঁছে দিতে হবে।"

—"কোথায়?"

—"জানতে চেয়োনা। মিলিটারি সিক্রেট। মনে নেই, জানতে চাওয়াটা মুক্তি-সৈনিকদের মানা!"

—"কিন্তু তুমি…একলা যাবে? এগিয়ে দেবো খানিকটা?"

হেসে উঠল ত্রিন খি হু।

—"না, তা হয়না। তোমার কর্তব্য তুমি করো, আমারটা আমি। তাছাড়া", একটু রহস্যময় হাসি হাসল ত্রিন খি হু, "শুভ খবর একটা হয়তো পেতে পারো শিগ্‌গিরই।"

শেষবারের মতো তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। গভীর আবেগে দুজনে জড়িয়ে ধরল দুজনকে। অপলকে চেয়ে আছে হুয়েন। এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিন খি হু। এক পা এক পা করে সে হারিয়ে যাচ্ছে অরণ্যানীর অন্তরালে। আর ঠিক তখনই…সেই মুহূর্তে…গরম সীসের একটা টুকরো এসে ভেদ করে গেলো হুয়েনের হৃদপিণ্ডটা। হাতের বন্দুকটাও তুলবার সুযোগ পেলোনা হুয়েন। টলতে টলতে তার দেহটা ভিয়েতনামের মাটিকে শেষবারের মতো রক্তে রাঙা প্রণতি জানাল। চোখদুটো বন্ধ করবার আগে হুয়েন দেখল অন্ধকারের পেট চিরে চিরে ডজন খানেক ইয়াঙ্কি জানোয়ার উদ্যত রাইফেল হাতে এগিয়ে এসেছে। মুখে তাদের পৈশাচিক উল্লাস। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার পবিত্র দেহকে নোংরা হাতে স্পর্শ করবার আগেই বৃক্ষান্তরাল থেকে নিক্ষিপ্ত ত্রিন খি হুর মর্টারগুলো মারণ-যজ্ঞের ধ্বংসলীলায় মেতে উঠল। আর সারা হোন্‌সন্‌ পাহাড়ের বুক জুড়ে জেগে উঠল ব্যাঙ ডাকার কটকটে আওয়াজ। দুদ্দাড় করে এগিয়ে আসছে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের সৈনিকেরা।

জ্বলন্ত আক্রোশ বুকে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শেষবারের মতো নিষ্প্রাণ স্বামীর শিরে চুম্বনের রেখা এঁকে গেলো মুক্তিযোদ্ধা প্রেয়সী। নতজানু হয়ে স্বামীর বুকে মুখ রেখে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় সে হয়ে উঠল দুর্জয়। তাকে যেতে হবে অনেক দূর। সাতচল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে খবরটা তাকে পৌঁছে দিতেই হবে।

তখনই, সায়গনের তুদো স্ট্রীটের সবচেয়ে সাজানো বাড়িটায় আগামী খ্রীষ্টমাসে পাঁচ বছরে পা দেবে যে ছেলেটা, পকেট থেকে ধূলিমলিন একটুকরো বিস্কুট বার করে সগর্বে তার খেলার সাথীকে দেখিয়ে সে বলছিল, "জানিস, আমার মায়ের জন্তে রেখেছি।"

নায়ক

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

I am not Prince Hamlet, nor was meant to be—.

অথচ সে মরেও মরে না।
ঠেকে-ঠেকে শেখে শুধু,
কিসে ভালো
আর মন্দ বলে কাকে,
এ সংসারে কী চাল চলে না।

তবু কি আশ্চর্য ত্থাখো!
এত জেনে শুনে
পদে পদে ভুল হয়,
ভুলের মাশুল দিতে
ভাঁড় সেজে
সকলের তামাসার খোরাক জোগানো
পেশা তার;
অথচ কৃপণ সব মানুষেরা
দেখেও দেখে না।
তবুও অবুঝ প্রাণ
প্রতিদিন কেঁদে কেঁদে পরকে হাসায়।

মনে করো,
এ-নাটকে আমিই নায়ক!

মাইকেলের সমাধিস্থলে

পরিমল চক্রবর্তী

নীরবতা, নীরবতা, চতুর্দিকে গাঢ় নীরবতা
বিরাজিত এইখানে ; একজন কবির হৃদয়
এখানে ঘুমিয়ে আছে, জীবনের সব জ্বালা ভুলে
শুয়ে আছে মাথা রেখে প্রকৃতিমাতার শান্ত কোলে।

ব্যাকুল হাওয়ার খেলা দেখে দেখে অতীতের কথা
বিদ্যুল্লেখার মতো জ্বলে ওঠে প্রাণে, স্বপ্নময় ;
চতুর্দিক অন্ধকার লতা গুল্ম ঘাস ফল ফুলে
পুণ্যময় এই তীর্থে এলে মন সব গ্লানি ভোলে।

মৃত্যুর উল্লাস নেই মৃত্যুত্তীর্ণ কবির হৃদয়ে
এ-মুহূর্তে ; জাগতিক ঐশ্বর্যের দাম্ভিক মহিমা
অর্থহীন মনে হয় বুঝি তাই এইখানে এলে।

পৃথিবীর ক্রূরতায়, জীবনের রণে, রক্তক্ষয়ে,
চিরদিন হেরে গিয়ে, কবি আজ মরণের সীমা
পার হয়ে নিদ্রারত, বিষাদের স্থির শিখা জ্বেলে ॥

যুদ্ধ

রত্নেশ্বর হাজরা

প্রাচীন শহরের উপকণ্ঠে হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘোড়ার মূর্তি
তার নিচে ব্রোঞ্জ
অসি হাতে

কালো মুখোশে ঢাকা
প্রতিদ্বন্দ্বী
দু-পা এগিয়ে
এক পা পিছিয়ে
দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে
ডাইনে হেলে বাঁয়ে হেলে মোক্ষম মারগুলো এড়িয়ে
গণ্ডীর মধ্যেই

সোজা লাফিয়ে ওঠো কিংবা ডাইনে সরে যাও
মাথার চুল সরিয়ে দাও চোখের উপর থেকে
বর্মের ডানদিকের খাঁজে চালাও তরোয়াল

পা টলোমলো
মাথা হেলছে
কালো মুখোশ
ধারালো অসি
এক পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে চার পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে
সামনে দাঁড়ানো
কে কার ?
উপকণ্ঠে
হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘোড়ার মূর্তি।

বৃক্ষের প্রতীক

অনন্ত দাশ

গভীর জলের নিচে ছায়া ক্রমে দীর্ঘতর হয়
কতলক্ষ বছরের পরমায়ু শুক্তির নিঃশ্বাসে
আমি এক বৃক্ষের প্রতীক
খাড়া রৌদ্রে দিন গুণে যাই।

শীতের শুরুতে ঐ পাতাগুলি ঝরে যায়
বসন্ত আসার আগে মেরুকাণ্ডে ঘুণ ধরে
যৌবনের রাজপথে ধুলো
মাটির ভিতরে ছায়া দীর্ঘতর হয়।

কখনো বুকের মধ্যে রক্তমেঘ, তালুতে ঝড়ের
আলোড়ন
দুহাতে বাকল ছিঁড়ে তোমার বয়স জেনে নিই
প্রশ্বাসের কতখানি অক্সিজেন
কতটা রোদের রশ্মি তোমার শরীরে নিয়ে আছ
অন্ধকার রাতে
বিষ বাষ্প আমি শুধু বাতাসে ছড়াই

উল্টোপাল্টা হাওয়া বয়, সবুজ পাতায় ক্রোধ জমে
দামাল রৌদ্রের টোটা হাতে নিয়ে
শিকড় সন্ধানে ছুটে যাই।

দুই অন্ধের গল্প

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধের খোঁজ করছিল　　একই পথে
হাজরা থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত ঘুরপাক খেলো
একশ বার
মাঝে মাঝে একজনের পায়ের ছাপে
আরেকজন রাখল পদধ্বনি
তবু কেউ কাউকে চিনতে পারল না　　সারাদিন
খোঁজাখুঁজি করল ভয়ঙ্কর অস্থিরতায়

প্রতিক্ষণই ট্রামের শব্দ হলো, পাখি ওড়ার।
মানুষ চলাচল করছিল ফুটপাত দিয়ে।

তখন মনে পড়ল, এককালে অন্ধ ছিল না তারা—
এককালে দৃষ্টি ছিল তাদের
আলো
চোখের মধ্যে।

একজন ফিরে এলো, হাজরা থেকে রাসবিহারীর দিকে
আরেকজন রাসবিহারী থেকে হাজরার।
মাঝপথে একজনের ছায়া স্পর্শ করল আরেকজনকে।

বহু মানুষের কোলাহলে মনে পড়ল, মিছিলের মুখ।
মনে পড়ল, পুরীর সমুদ্রগর্জন ও কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে ওঠার কঠিন
শপথ।

তবু কেউ কাউকে চিনতে পারল না
বহুক্ষণ
পাশাপাশি থেকেও।

কী যেন নাম ছিল তাদের?—দীপক, দীপেন, দিলীপ…
এমনি সব বিভিন্ন নামে ডাকতে…ডাকতে…
অবশেষে সঠিক নামটি মনে পড়লেও
বুঝতে পারল না: এই ডাকাডাকির অর্থ কি?
একই নামে তো থাকতে পারে অন্য কেউ!

তখন মনে পড়ল, কণ্ঠস্বরের উত্তাপ, যেন এমনটিই ছিল
উচ্চারণের ভঙ্গি ও আন্তরিকতার স্পর্শ।
অনুভব করল: এই তো সেই ঝর্নাতলার দিন
কোলাহল করছে বুকের মধ্যে
এই তো সেই উদ্ধত নাক ও বলিষ্ঠ বাহুর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত
রক্তের সঙ্গীত
এই তো সেই গর্জনমুখর স্তব্ধতা!

একজন অন্ধ আরেকজনের মুখোমুখি বসল
নিবিড় হয়ে
ডাইনে-বাঁয়ে বহু মানুষের পদশব্দ…

এই দেশ, আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের প্রতিমা

অমিয় ধর

ঝড়-জলে ধুয়ে যায়,
এই দেশ,
আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের প্রতিমা।
দেহাতি গৈরিক নদী
ঢলনামা রক্তের মাদলে
ঘুণধরা বাঁধ ভাঙে
বেনোজল চষাক্ষেতে সর্বনাশ ডাকে।
ক্ষুৎ আর পিপাসায়
কাতরতা
আর্তনাদে বুকডোবা মাটি।
একান্ত দেশজ গন্ধ
পচাপাতা,
প'চে-গ'লে
ভ্যাপসা জলের বাষ্প
প্রতিমায়
স্যাঁতাপড়া দাগ ধ'রে গেছে।
ডুবে গেছে গ্রাম-গঞ্জ
বোধনেই বিসর্জন
মেনকার চোখে জল আড়ং-এর মাঠে।

যদিও বুকের মধ্যে
ঝড়-জলে ধুয়ে যায়।

ইচ্ছার গভীরে তবু
দো-তারায়,
আবার সে হয়ে ওঠে
চিন্ময়ী-মৃণ্ময়ী
জননী সে জন্মভূমি
আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের প্রতিমা :
যামিনী রায়ের ছবি
ধানসিঁড়ি নদী আর
রূপকথা বাঙলা
মুখুজ্জে কবির দেখা
পরণকথার মতো—
সারি সারি লক্ষ্মীর পা !

অসমাপ্ত বিপ্লব ও স্বকাল-সঙ্কট

বীরেন্দ্র নিয়োগী

বিংশ শতক মধ্যাহ্নগগন পার হয়ে গেছে। অথচ আক্ষেপের বিষয়, আজও আমাদের বুর্জোয়া ভাববিপ্লব সম্পূর্ণ হল না। এই অসম্পূর্ণতার লক্ষণ আমাদের ভাবদেহের প্রতিটি অঙ্গে এখনো বেদনাদায়কভাবে প্রস্ফুট। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সামাজিক ধ্যানধারণা, ট্রাডিশন, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কার—প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই বিপন্নরূপের ছায়াভাগ। দীর্ঘায়িত মধ্যযুগের মানসপরিমণ্ডলের ছায়ার মধ্যে আধুনিক যুগকে আংশিকভাবে আহ্বান করতে গিয়ে অপুষ্টি এবং বিকৃতিই অধুনা সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। ফলত এক ব্যাপ্ত বিচ্ছিন্নতার সঙ্কটের দ্বারা আমাদের আধুনিক যুগ আক্রান্ত।

এক

আমাদের ট্রাডিশনাল ভারত বহুকালের। এশীয় সামন্তবাদ এক সুদূর অতীত থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত তার দীর্ঘবাহু প্রলম্বিত করে রয়েছে। নিশ্চল ও বদ্ধ অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা বিধৃত এই মধ্যযুগীয় সমাজ-মানস জড়ত্বের সুকঠিন ঐতিহ্য সৃষ্টি করে এতকাল পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে দুই নিষ্ঠুর হাতে ঠেকিয়ে এসেছে। বিশেষ করে বাঙলাদেশেই তার এক বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত।

আদিম ট্রাইবাল ব্যবস্থা বাঙলাদেশে ছিল মূলত কৃষিতান্ত্রিক। শ্রেণী-বিভক্ত বৈদিক সভ্যতার অভিঘাতে এই ব্যবস্থার গতিশীল এবং প্রাগ্রসর রূপটি বিকৃত হয়ে যায়, কিন্তু বিধ্বস্ত হয় নি। অসম্পূর্ণ ট্রাইব্যাল সমাজ কিছু বিকৃত আকারে বাঙলার গ্রামীণ সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে আজো বিদ্যমান। এর অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমি জাতি-পংক্তি-বিভক্ত এক লৌহনিগড়া-বদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিব্যবস্থা। আর্য সমাজোদ্ভূত বর্ণব্যবস্থা ট্রাইব্যাল সমাজের উপর আরোপিত হয়ে আমাদের প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজের বিকৃতি সাধন

করে। যেহেতু আর্য সংস্কৃতি পূর্ণভাবে এই সমাজকে বিলুপ্ত করতে সক্ষম হয় না, কিন্তু শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজের ধ্যান-ধারণা বহুলাংশে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে, তাই এক নিশ্চল বদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয় ভাবপরিমণ্ডলে। অবশ্য এর মৌলিক উপাদান বদ্ধ কৃষিব্যবস্থা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ। অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সমাজ স্বভাবতই গতিশীলতা হারিয়ে ফেলে এবং উন্নয়নের গতিবেগ স্তব্ধ হয়ে যায়। ওদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম যেহেতু এক-একটি ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক ইউনিট—, সুতরাং সহজে সন্তুষ্ট গ্রামজীবন উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের তাগিদও অনুভব করে না। তাছাড়া, বহু ব্যাপক জাতি-বর্ণ-ব্যবস্থা একধরনের কর্মবিনিয়োগের গ্যারাণ্টি স্বরূপ থাকায় বেকারত্ব প্রচ্ছন্নভাবে ছাড়া অন্য কোনোরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। এই অসংখ্য শক্ত ও ছোট ছোট অংশে বিভক্ত সমাজ স্ব স্ব কোটরে সন্তুষ্টির সুখনিদ্রায় নিমগ্ন থাকতে পারে বহুকালাবধি। বিদ্রোহের প্রশ্নও ওঠে না, কেননা ভাববাদী আর্য চিন্তার ফসল হিসেবে এই সমাজের ভাবদেহে কর্মফল ও পুনর্জন্মের ধারণা অনায়াসেই ঢুকিয়ে দেওয়া গেছে।

তারই ফলে এদেশে মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শের আবহাওয়া বহুকালাবধি আমাদের ভাবপরিমণ্ডলকে কলুষিত করে রেখেছে।

আঘাত দিয়েছিল বিদেশীরা এই অচলায়তনে। তারা স্বপ্রয়োজনে নিশ্চল দেহে আঘাত করল, পুরনো দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সেই একই প্রয়োজনে যেহেতু তারা পুরনোকে ধূলিসাৎ করে তার উপর নতুনকে গড়ে তুলতে পারে না, তাই তারা কিছু কিছু সংস্কার করে, কিছু পরিবর্তন করে, কিন্তু আমূল পাল্টাতে পারে না। কেন না সামন্তবাদের অবশেষকে নিশ্চিহ্ন করার পূর্বশর্ত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বদ্ধ অর্থনীতির বদলে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইংরেজরা তা করে নি।

তাই একদিকে শহরের নল দিয়ে মুক্ত চিন্তার প্রবেশ ঘটেছে এদেশে, কিন্তু তা আবদ্ধ থেকে গেছে শহরাশ্রয়ী নবোত্থিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানসের মধ্যে। অন্যদিকে গ্রাম যে তিমিরে সেই তিমিরে রয়ে গেছে। সীমাবদ্ধ বৈদেশিক প্রয়োজনোদ্ভূত একচেটিয়া ভাবাপন্ন শিল্পায়ন এবং তার সহগামী নগরীভবন বাঙলাদেশে ক্ষুদ্র ইতস্তত দ্বীপের মতো নিজের পরিধিকে সীমিত রেখেছে, পুরনো আর্থিক কাঠামোকে বিধ্বস্ত করে নবন্যাস ঘটায় নি। এরই আনুষঙ্গিক ভাববিপ্লবও তাই অসম্পূর্ণ।

নবীনযুগ যখন তার যুক্তিমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে মধ্যযুগের দুর্গে আঘাত হানল, ভগবানকে হটিয়ে মানুষকে সব কিছুর কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করতে চাইল এবং সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক পুনর্গঠনের আন্দোলন জোরদার করতে ব্রতী হল; তখন গ্রামনগরের বিচ্ছেদ ঘুচে নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠল না। বরং নাগরিক উন্নাসিকতায় উন্নত শহর ও পশ্চাদ্‌পদ গ্রামের মধ্যে বিচ্ছেদ গেল আরো বেড়ে। দেখা গেল, কলকাতা এদেশে থেকেও যেন বিদেশেরই একটা টুকরো। প্রগতির ধ্যান-ধারণা, আন্দোলন, সংস্কার—যা কিছুরই ঢেউ কলকাতায় উঠুক না কেন, সে ঢেউ শহরের পাথর বাঁধানো রাস্তাকেই শুধু প্লাবিত করে, গ্রামের মেঠো পথের উপর দিয়ে তার জলধারা গড়িয়ে যায় না। তাই বিদ্যাসাগরের বৈপ্লবিক সংস্কারসূচী আজো অসমাপ্ত। বিকৃতভাবে লালিত সামন্তবাদী পরিমণ্ডলে বিদ্যাসাগরের বুর্জোয়া ভাববিপ্লব আছড়ে পড়ে নিজেকেই চূর্ণ করেছে। বিধবা বিবাহ আজো স্বাভাবিক সামাজিক ব্যবস্থার রূপ নিতে পারল না। কেন না, বিদ্যাসাগরেরও যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তা স্বকালোদ্ভূত। শিল্পায়নের অভিঘাতে গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা চুরমার হয়ে নতুন শ্রেণী ও শ্রেণীচেতনা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। তাছাড়া এগুলো ছিল শুধু নবোদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য। নিশ্চল গ্রামীণ অর্থনীতিতে আবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকশ্রেণীর কাছে এগুলোর তখন কোনো আবেদন ছিল না। তাই বিদ্যাসাগরের মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের চেতনা ও সংগ্রামশীল প্রাগ্রসর মনোভাব থেকে উদ্ভূত সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাও শেষাবধি অর্ধ সমাপ্ত থেকে যেতে বাধ্য হয়। এইসব বৈদ্যুতিক চিন্তাধারা শুধু গ্রামের প্রান্তদেশ ছুঁয়েই শেষ হয়েছে তাই নয়, নাগরিক সভ্যতার স্বরূপেও মিশ্র বিকৃতির সঞ্চার করেছে। সামন্তবাদের শেষ রশ্মির আলোকে দীপ্ত বুর্জোয়া ভাবধারা একাধারে সূর্যের প্রখর দীপ্তি ও মাটির প্রদীপের মুমূর্ষু রশ্মিচ্ছটায় ভাবদিগন্ত আলোকিত করেছে। মধ্যযুগের রোগাক্রান্ত অথচ গ্রাম-বিচ্ছিন্ন শহরের এমন পরিণতিই স্বাভাবিক। তাই আজও কোট-প্যান্টের তলায় যা কালীভক্ত হৃদয় লুকিয়ে থাকে, লরেটোয় পড়া ছাত্রীর মনে নবগ্রহের পুজো দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা জাগে না, সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রও 'সপ্তাহের রাশিফল', চকিত চোখে অনুধাবন করে সংশয় সন্দেহ আশা ও নিরাশার দোলায় আন্দোলিত হতে থাকে এবং প্রায় বামপন্থী সাহিত্যবিলাসীও কখনো বা

হুর্জ্ঞেয়ের রহস্যময় টানে শেষাবধি দেওঘর-মার্কা ঈশ্বর-সন্ধানে ব্যাপৃত হতে থাকেন।

অর্থাৎ একই পাত্রে এখনো আধুনিক এবং মধ্যযুগের খিচুড়ি সেদ্ধ হচ্ছে।

দুই

অথচ এমনটি হবার কথা ছিল না। ইংরেজরা যা পারেনি, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার তা নিশ্চয়ই পারত, অথবা পারা উচিত ছিল তাদের পক্ষে।

বস্তুত এই কাম্য বিপ্লব এই দীর্ঘ দুই দশকের মধ্যে ঘটানোর পরিবেশ প্রস্তুত করা হয়নি। বরং বিকৃতি আমদানী ও তার বৃদ্ধিতেই সাহায্য করা হয়েছে অর্ধসচেতন এবং অচেতনভাবে, বিশেষত আর্থিক ও বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে।

পরিবর্তনকামী জনগণের উদ্দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা বৃহৎ পরিবর্তনের সহায়ক। ইংরেজদের ভারতভূমি ত্যাগের অব্যবহিত কালে জনগণের মধ্যে এক ব্যাপ্ত উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বদেহে জনগণের বহু লালিত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে এবং জনসম্মতি ও গণসহযোগিতাভিত্তিক এক বৃহৎ অর্থনৈতিক যজ্ঞ দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে, এমন আশা নিয়েই সাধারণ মানুষ উজ্জ্বল চোখে নবগঠিত সরকারের দিকে তাকিয়েছিল। ১৯৪৭-এর সামগ্রিক পটভূমি বহুলাংশে বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণের পক্ষে প্রকৃতই অনুকূল ছিল। দেশব্যাপী শিক্ষিত জনমানসে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা তখন অত্যন্ত উঁচু পর্দায় বাঁধা। এ চেতনা জাতীয় সংহতি ও কর্মোদ্যোগের পক্ষে সহায়ক। গ্রামভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সর্বত্র সমতালে যুক্ত না হলেও মোটামুটিভাবে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। ফলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মনোভাব নিয়েই স্বাধীন ভারতের যাত্রারম্ভ।

মনে রাখা দরকার, যুগব্যাপী অনড় ও নিশ্চল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অভিঘাতে দুমড়ে গিয়েছিল। এই গ্রাম-সমাজে বিকৃতি বহু পূর্বেই পুঞ্জীভূত হয়েছে। ট্রাইব্যাল সমসমাজমূলক আদিম ব্যবস্থায় যে সংস্কার আচার-ব্যবহার ও মূল্যবোধ বাঁচার সংগ্রামের সহায়ক, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যদি উৎপাদন পদ্ধতির মৌল পরিবর্তন না ঘটে, তবে সেই প্রাচীন ধ্যানধারণা টিকেই যায়, তার প্রগতিমূলক রূপটি পরিবর্তিত হয়ে বিকৃতির সৃষ্টি করে এবং সমাজ বিবর্তন ও সুস্থ অগ্রগতির অন্তরায়

হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর বৃটিশ আর্থিক ব্যবস্থা বিপুল আঘাত হেনেছিল। কিন্তু উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতির মৌল পরিবর্তনে সাহায্য না করায় বিকৃতির উচ্ছেদ ঘটল না, গ্রামের ভাবমানসে মধ্যযুগ টিকেই গেল। তবু শহর থেকে আমদানী করা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন এই মানসজগতে শেষপর্যন্ত কিছুটা নাড়া দিয়েছে।

সর্বাধিক নাড়া দিয়ে যায় অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দাঙ্গা-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমাগমজনিত সামাজিক প্রক্ষোভ। চল্লিশের দশক বাঙলার ভাবাকাশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মূল্যবোধের জগতে দ্রুত ও আকস্মিক আঘাত এসে যুগলালিত নিশ্চিন্তিবোধকে বিপর্যস্ত করে। যুদ্ধকালে ব্যাপকভাবে গ্রামাঞ্চলের বহু অংশে রাস্তাঘাট, এরোড্রোম প্রভৃতি গড়ে ওঠে, ব্যবসাবাণিজ্যের চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ছোঁয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতি নাড়া খায় এবং গ্রামের নিম্নশ্রেণীর বহু মানুষ ব্যাপকভাবে সৈন্যদলে যোগ দেয়। ঠিক এই সময়েই বাঙলাদেশ কবলিত হয়েছিল এক তীব্র দুর্ভিক্ষের। এর আঘাত সুদূরপ্রসারী হয়ে গ্রামীণ অর্থ-নীতির উপর পড়েছিল। এই সময়ে জমিহস্তান্তর, গ্রামের শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটে। গ্রামবাঙলার বুকে যেমন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আলোড়ন তোলে, শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যেও অনুরূপ এক বৃহৎ আলোড়ন দেখা দেয়। পুরনো মূল্যবোধের উপরে বিপুল আঘাত এসে পড়ে। চেতনার দিগন্ত সহসা প্রসারিত হয়ে যায়। বিশ্বের সঙ্গে মধ্যবিত্ত মানসের যোগাযোগও বেড়ে যায়। একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসার ও কালোবাজারী লোভের হীনমূল্য ভাবধারার আত্মপ্রকাশ ভাবপরিমণ্ডলে এক আপাত-বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। ঠিক এই কালেই সমাজপ্রক্ষোভ যখন দানা বাঁধছে, রাজনৈতিক চেতনার বিপুল প্রসারও ঘটে। সর্বশেষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন উত্তাল ঢেউ-এর আকার ধারণ করে। এরই চূড়ায় দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমাগম, দেশবিভাগ ইত্যাদি দেশকে ঝুঁটি ধরে নাড়া দেওয়া বিভিন্ন ব্যাপার পর পর ঘটে গেল। সমাজ-জীবনের মধ্যতলায় অস্থিরতা, অস্বস্তি ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। গ্রাম সমাজও বহুলাংশে এই অস্থিরতার অংশভাক হয়। প্রমাণ, তেভাগা আন্দোলন।

অর্থাৎ, স্বাধীনতার সমকালে বাঙলাদেশে অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং তার ফলে চেতনার উপর-কাঠামোয় পরিবর্তনের এক আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।

একে এক সংক্রান্তিকালীন পর্ব বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এই সময়ে অমৃত এবং গরল দুই-ই উঠবারই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মৌলে পরিবর্তনটা মোটামুটি কাম্য থাকে। এই ব্যাপক ধ্যানধারণার পরিবর্তনের পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন।

কিন্তু নতুন সরকার কি পরিবর্তন আনলেন? প্রতিশ্রুত উজ্জ্বল জীবনের কি স্বাদ বয়ে নিয়ে এল নতুন যুগ? এ ইতিহাস খুবই সাম্প্রতিককালের, সুতরাং প্রায় সবারই জানা। সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদ্‌পসরণ বুর্জোয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করবার সুযোগ এনে দেয়। সামগ্রিক জাতীয় ঐক্য এর সহায়ক। শ্রেণীসংঘর্ষ এই কালে তীব্র আকারে দেখা দেয় না। গণ-চেতনা যুগসঞ্চিত দারিদ্র্য ও হতাশা মোচনের দ্রুত অভিলাষী। ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, সংস্কার ও কাঠামো পরিবর্তনের এই হচ্ছে বাঞ্ছিত কাল। দ্রুত শিল্পায়ন, মৌলিক ভূমিসংস্কার, দ্রুত মূলধন গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে এক দ্রুত পরিবর্তনের পথে এগুনো যায়।

কিন্তু আমাদের দ্বৈতচেতনা-সম্পন্ন শাসকশ্রেণী দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হলেন। অর্থনীতির পুনর্গঠন চাইলেন কিন্তু বৃহৎ বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোষের মাধ্যমে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মিশ্র ও দ্বৈত অর্থনীতি এই দ্বিধাযুক্ত নীতিরই ফসল। ফলে যে-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হল, তাতে একচেটিয়া পুঁজির দ্রুত বিকাশের সুযোগ খর্ব না করে তাকে সাহায্যই করা হল। গ্রামে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটল। কিন্তু নতুন আকারে বড় জোতদারশ্রেণী জেঁকে বসল। শিল্পায়ন যে হারে হলে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে, তা হল না। জাতীয় আয় বাড়ল, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে ধনবণ্টনে বৈষম্যও। শিল্পের প্রসারও ঘটল, অথচ একই সঙ্গে বেকারবৃদ্ধি দেখা দিল। এইসব স্ববিরোধিতা শাসকশ্রেণীর দ্বৈতচরিত্রেরই পরিণতি।

এই বিশ বছরে দেশটা কি চেহারা নিয়েছে এর ফলে? দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। আর এই বৃদ্ধি সমহারে সমতালে ঘটেনি। বৃদ্ধি হয়েছে অসম একপেশে। কোনো কোনো সেক্টরের বৃদ্ধি দ্রুত, আবার কোনো কোনো সেক্টর মান্ধাতার আমলেই পড়ে রয়েছে। পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত দানবীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্রষ্টিকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, অথচ বিদেশী পুঁজি প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগের চাইতেও বেড়ে গেছে।

কৃষিপণ্যের মূল্য বেড়েছে, কিন্তু সাধারণ চাষী তার সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনি ঠিকমতো। স্কুল-কলেজ সংখ্যায় বেড়েছে, অথচ শিক্ষার হার সর্বস্তরে সমহারে বৃদ্ধি পায় নি। চাকুরীর সুযোগ বেড়েছে, কিন্তু বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে একই সঙ্গে। চারপাশে শুধু বৈপরীত্যের অস্থির দৃশ্য।

উন্নত জীবনযাত্রার ছবি তুলছে মানুষের চোখের সামনে। অবিরত প্রচার আর প্রতিশ্রুতির ঢক্কানিনাদ চলছে। অথচ হাত বাড়ালেও সহজে কাম্য উন্নত জীবন হাতের মুঠোয় আসতে চায় না, মরীচিকার মতো শুধুই সে ক্রমঅপসৃয়মান। শহরে প্রদর্শন-প্রতিক্রিয়ার ফলে ভোগের আদর্শ তীব্র হয়ে উঠছে। কিন্তু বিদেশের মতন এর জন্য চাই উর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা, এক কুশ্রী শ্বাসরোধী লালাসিক্ত প্রতিযোগিতা। কে কত বেশি নিজেকে প্রদর্শন করাতে পারবে, কে অন্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারবে—এই অস্থির প্রতি-যোগিতায় মধ্যবিত্তশ্রেণী অর্ধোন্মত্ত। গ্রামেও উন্নত মানের ভোগ-চেতনা শহরের খাল-বিল বেয়ে এসে ঢুকে পড়ছে। অসুস্থ প্রতিযোগিতা গ্রামেও কিয়ৎপরিমাণে শুরু হয়েছে। বিশেষত পরিকল্পনার সুযোগে গ্রামে যে শ্রেণী ক্ষমতায় ক্রমবর্ধমান, তারা এই ধরনের শহরমুখিন ভোগবিলাসী হয়ে পড়ছে।

দ্রুত, সুষ্ঠু ও ব্যাপক শিল্পায়ন হবার পূর্বেই এক লাফে ধনতন্ত্রের নিম্ন ও মধ্যস্তর পার হয়ে একেবারে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্কটজনক স্তরে এসে পৌছে গেছে আমাদের অর্থনীতি। তারি ফলে অর্থনীতির অসমবিকাশ ও বাধাগ্রস্ত বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত সঙ্কট।

বৃটিশ আমলের প্রাথমিক পর্বে নতুন আর্থিক অভিঘাতে ভারত এক বিকৃত অর্থনীতি উপহার পেয়েছিল। এগুলোর বদলে পিছিয়ে থাকা সামন্তবাদী ভূমিভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে ভারতকে আটকে রেখে তার সম্ভাব্য ধনতান্ত্রিক বিকাশকে রোধ ও বিকৃত করা হয়। আবার স্বাধীনতার আমলে বিকাশকে সঠিক পথে পরিচালিত না করে ধনতন্ত্রের সঙ্কটজনক স্তর একচেটিয়া পুঁজিবাদের জগতে আমাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল। এও এক বিকৃতি। এক বিকৃতি থেকে অন্য এক বিকৃতিতে উত্তরণই আমাদের সংক্রান্তিকালীন সঙ্কট প্রকটিত করে। প্রতিক্রিয়া তাই এই সঙ্কটকালে আরো শাণিত, পিছুটান আরো তীব্র, অবক্ষয় আরো ব্যাপক। মধ্যযুগ তাই শেষ হয়েও এদেশে শেষ হতে চায় না।

আভ্যন্তরীণ এই আর্থিক সঙ্কটের সঙ্গে এসে আবার সংযুক্ত হয়েছে সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির প্রভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীকাল প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের উন্নতির দিক থেকে বিস্ময়কর অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। ধ্বংস ও সৃষ্টি উভয় দিক থেকেই সম্প্রতিকাল ব্যাপকতায় অচিন্ত্যনীয়, এক যুগ-সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী। একদিকে যেমন মহাকাশ বিজয়ের নব নব অধ্যায় উন্মোচিত হচ্ছে অসম্ভাব্য দ্রুততায়, অপরদিকে তেমনি পারমাণবিক বোমার মতো গণ-মারণাস্ত্রের সংহার-ক্ষমতার প্রসার বিশ্বমানবমনকে বিমূঢ় করে দিচ্ছে। এই বিপরীতমুখী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার মৌল পরিবর্তনের সূচক। দেশকালের সীমা অধুনা ভেঙে পড়ছে। আমরা তাই যেন বর্তমানে একটা ছোট্ট একমুঠো বিশ্বের অধিবাসী। এই বিপুল বিশ্বের যে কোনো সুদূর প্রান্তে যখনই যে কোনো ঢেউ উঠুক না কেন, অবিলম্বে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। তাই বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা ও বিমূঢ়তায় আমরাও অংশভাক। এই অস্থিরতার কারণ প্রযুক্তিবিদ্যার অকল্পনীয় প্রসারে মানব-কল্পনার বিমূঢ়তা। ধ্বংসের ভয়াবহতা মানুষ অনুধাবন করছে। কিন্তু জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য তার বোঝার সীমার বাইরে। মহাবিশ্ববিজয় তাকে উল্লসিত করে, কিন্তু যান্ত্রিক জটিলতা তার বোধসীমার অতীত। এর সার্বিক ফলশ্রুতি এক বিমূঢ়তা এবং অনিশ্চয় অস্থিরতা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ঠিক একইকালে সঙ্কটময় দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। বিশ্বধনতন্ত্র ও বিশ্বসমাজতন্ত্র আজ মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ বিকাশশীল সমাজতন্ত্রের মধ্যে তার মৃত্যু পরোয়ানা দেখতে পেয়ে আতঙ্কনীল চোখে মরণ কামড় দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর ইতিহাস-বিরোধী প্রচেষ্টায় মত্ত। তার তূণীর থেকে সে সর্বরকম শর নিক্ষেপে উদ্যত। অনুন্নত দেশে সাহায্যের অছিলায় অনুপ্রবেশ, দেশে দেশে তাঁবেদার সামরিক একনায়কত্ব কায়েম করা, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে একজোটে সমাজতন্ত্রকে রোখার অপচেষ্টা, স্থানীয় যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি এবং এমন কি ব্রহ্মাস্ত্র পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের অভিসন্ধি—সব কিছুই ব্যবহার করছে এবং করতে ইচ্ছুক। এরই সঙ্গে ধ্যানধারণার জগতে ক্রমাগত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা আমদানীর অপচেষ্টা চলেছে।

আর্থিক এবং ভাবজগৎ—উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের দেশ সম্প্রতি মার্কিন মহাপ্রভুদের মৃগয়াক্ষেত্র। দেশী একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা

এবং ভাব ও চিন্তারাজ্যে দ্রুত অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার এই উভয় পদ্ধতিতে প্রতিক্রিয়াশীল মার্কিন চক্র আমাদের দেশে অশুভ সর্বগ্রাসের কালো ছায়া বিস্তার করে চলেছে।

ফলে, কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধনে দেশী সরকারের ব্যর্থতা এবং সঙ্কটসঙ্কুল বিশ্ব পরিস্থিতির প্রভাব উভয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভাবপরিমণ্ডলে সুস্থ সূর্য আজো উঠতে পারল না। পরিণতিতে বরং মূল্যবোধের বিপর্যয়ই দেখা গেল। এখান থেকেই উদ্ভূত সমকালীন সঙ্কট।

তিন

দেখা গেল, ইংরাজরা এ দেশে সামন্তবাদ ধ্বংস করে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেনি। স্বাধীন ভারতের বুর্জোয়া প্রভুরা অন্যদিকে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক স্তবানুযায়ী বিকাশ না ঘটিয়ে একলাফে একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল যুগে আমাদের দেশকে উত্তীর্ণ করতে সাহায্য করে চলেছে। এর ফলে সামন্তবাদী ধ্যানধারণা নিয়েই ভারত অসম্পূর্ণ পুঁজিবাদের জগতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। সামন্তবাদের অসম্পূর্ণ বিলোপ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের অসম্পূর্ণ সৃষ্টি এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। এর সঙ্গে অস্থির বিশ্ব পরিস্থিতি এসে যুক্ত হয়ে এক বিপর্যয়কর অবস্থার স্রষ্টা হয়েছে। মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির জগতে এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলন ঘটছে।

সামন্তবাদ দেশকে মধ্যযুগীয় মানসিকতার বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চায়। ধর্মীয় সংস্কার. প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, যুক্তি ও চিন্তা-বিরোধিতা, দাস্যভাব প্রভৃতি সামন্তবাদী চিন্তার ফসল। নতুন যুগ যেহেতু মধ্যযুগীয় অর্থনীতিকে চূর্ণ করে আত্মপ্রকাশ করেনি, বরং বিকৃত একচেটিয়া পুঁজিকে আহ্বান করবার সময় সামন্তবাদকেও টেনে এনেছে নতুন আসরে; সেহেতু মধ্যযুগীয় ভাবাকাশের সে ম্লান পরিবেশ স্বতই আমাদের আচ্ছন্ন করবে, করছেও। তবে নতুনভাবে—এক ককটেলের আকারে। উগ্রশোষণকামী সঙ্কোচনবাদী একচেটিয়া অর্থনীতি স্বপ্রয়োজনে সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। জনগণের বৈপ্লবিক চেতনাকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট এবং বিরোধিতা ও হতাশায় আচ্ছন্ন করে দেবার জন্য সে কোনো হাতিয়ার ব্যবহারেই কুণ্ঠিত নয়। আর এ ব্যাখ্যার তার একটা বড় হাতিয়ার হল ভাবজগতে বিমূঢ়তা অবক্ষয় ও প্রতিক্রিয়াকে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উৎসাহ দান। বিশ্বপরিস্থিতি

থেকে উদ্ভূত বিমূঢ়তাকে যেমন সে আধুনিক ও সাম্প্রতিক হাল-ফ্যাশানের চিন্তা বলে লেবেল লাগিয়ে বুদ্ধিজীবীদের সুকৌশলে বিভ্রান্ত করবার অপচেষ্টা চালিয়ে যায়, তেমনি পিছিয়ে থাকা কিন্তু সংগ্রামশীল জনমানসে সামন্তবাদী ধর্মীয় কুসংস্কারকে গণপ্রচারের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে ফাটল সৃষ্টি করে এবং সংগ্রামী ঐক্যকে ভাঙতে সচেষ্ট হয়। এই দুই আপাত-বিরোধী হাতিয়ারের মৌল উদ্দেশ্য অবশ্য একই—প্রগতি-শিবিরের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি। এই ফাটল বিভিন্ন আকারে দেখা দেয়, গ্রাম-শহরের ভাবজাগতিক দ্বন্দ্ব, সমাজ-অনীহা ও সামাজিক কুসংস্কারের পরিবেশ, ব্যক্তি-নির্জনতার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি যুক্তিহীন মোহ, প্রাদেশিকতার উৎকট আত্মপ্রকাশ, পেটিবুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া চেতনার সঙ্গে স্বাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টা এবং ধর্মীয় উগ্রতার সাম্প্রদায়িক আত্মপ্রকাশ।

এই হচ্ছে আধুনিক ভাবজগতের ডাস্টবিন। এই ডাস্টবিনে একই সঙ্গে সামন্তবাদী ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী পুতিগন্ধময় মূল্যবোধের আবর্জনা এসে জড়ো হচ্ছে এবং তারই তীব্র কটু গন্ধে একালের ভাব-আবহের ঝাঁঝাল মূল্যবোধের জগতে এই পরিস্থিতি বিশেষ কতকগুলি সমস্যার স্বতই সৃষ্টি করে এবং সাংস্কৃতিক জগতে তার অনিবার্য প্রতিফলন দেখা দেয়।

বাঙলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির মহলে এই সংক্রান্তিকালীন সঙ্কট কিভাবে আত্মপ্রকাশ করছে? কি এর ডায়ালেকটিকস? এক কথায় বলতে পারা যায় শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার চেতনা এবং তার বিপরীতে সমাজ-সচেতন সংগ্রামমুখী মানবতাবাদী শিল্পসৃষ্টির অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস। বর্তমান যুগের এই হল ডায়ালেকটিকস।

বিচ্ছিন্নতার সাম্প্রতিক রূপ সম্পর্কে সর্বাগ্রে আলোচনায় আসা যাক। বিচ্ছিন্নতার চেতনার মূলে যে অসমাপ্ত ভাববিপ্লব অর্থাৎ বিকৃত সামন্তযুগকে সাথী করে বিকৃত একচেটিয়া পুঁজির আত্মপ্রকাশ, তা অবশ্য আমরা পূর্বেই বলেছি। যেহেতু একচেটিয়া পুঁজি বিশ্ব-একচেটিয়া পুঁজিব্যবস্থারই অঙ্গ, অতএব বিদেশের সঙ্গে দেশী পুঁজির অবৈধ বিবাহ এবং তাদের সম্মিলিত আক্রমণের ফ্রন্ট সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। এই আক্রমণের সম্ভাব্য পরিণতি আধুনিক মানসের ভাবপরিমণ্ডলের বিকৃতি। বিচ্ছিন্নতা, হতাশা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং সুস্থ মূল্যবোধের বিকৃতি—এক কথায় বহির্বাস্তব-বিচ্ছিন্নতা এই আক্রমণের ফলশ্রুতি।

দৈহিক এবং মানসিক শ্রম যেকাল থেকে পৃথকভাবে বিবেচনা করবার সুযোগ এনে দিয়েছে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তখন থেকেই বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সূত্রপাত। ব্যক্তি-চেতনা এবং সমাজ-চেতনার মধ্যে ফারাক আত্মপ্রকাশ করেছে এবং সচেতন ও সংবেদনশীল শিল্পী হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শিল্পের মাধ্যমে এই বিচ্ছিন্নতাকে উত্তীর্ণ হবার সুস্থ আকাঙ্ক্ষায়। সেকালে সমাজ ছিল বহুলাংশে কম জটিল। কিন্তু কালে জটিলতা বেড়েছে এবং সম্প্রতিকালে বিমূঢ় শিল্পীর চেতনায় জটিল সমাজব্যবস্থা এমন এক আকার ধারণ করেছে, যেখানে অসংখ্য সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ সমাজসম্পর্কের সূত্রগুলো জড়িয়ে গিয়ে তাকে বিমূঢ় করে তুলেছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এই ধরনের জটিলতাই সৃষ্টি করে। অসংখ্য জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝখান থেকে সহজে স্বচ্ছ বিরোধের রূপটি সরাসরি চোখের সামনে ভেসে উঠবার সুযোগ দেয় না। জটিল যন্ত্র, জটিল শহর-ব্যবস্থা, জটিল আর্থিকবিধি, সামাজিক আইন-কানুন—সব কিছুই এমন দানবীয় যে মানুষের মন ঠিকরে যায়, বিমূঢ় করে তোলে তার চেতনা, পর্বে পর্বে অসঙ্গতি দেখে সে অর্থহীনতার বোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সর্বত্রই অসঙ্গতি, দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা। তাই আধুনিক মন এই বাইরের জগতের জটিলতায় পাক খেয়ে হাঁপিয়ে উঠে শেষপর্যন্ত ডুব দিতে চায় নিজের মনোজগতে। কিন্তু সেখানেও চেতন-অচেতনের লীলা। বাস্তব-অবাস্তবের ও সত্য-কল্পনার দ্বন্দ্ব। ফলে আধুনিক মানসে সর্বগ্রাসী একচেটিয়া পুঁজিবাদের বাস্তব প্রতিফলন হিসাবে মানসজগতে অতীত অপেক্ষা অনেক তীব্র আকারে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে। আমাদের শিল্প ও সাহিত্যে তারই স্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া।

বিকৃত সামন্তবাদ ও খণ্ড একচেটিয়া পুঁজির যুগপৎ মিলন প্রচেষ্টায় উদ্ভূত অস্থির সাম্প্রতিক সমাজব্যবস্থায় সচেতন শিল্পিকুল কয়েকটি স্ববিরোধ ও বৈপরীত্য দেখে মুহ্যমান। তাদের চোখের সামনে বিগত দুই দশকে প্রতিশ্রুত ধনবৈষম্য হ্রাসের বদলে ক্রমাগত ধনবৈষম্য বেড়েই চলেছে। সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবার বদলে অন্যায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটে চলেছে। সুস্থ নীতি ও সবল পরিচ্ছন্ন প্রশাসন চালু হবার স্থলে ব্যাপক দুর্নীতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার ঢাক সমানে বাজছে। অথচ প্রতিমুহূর্তে হিংস্র ধর্মান্ধতা সর্বস্তরে তার নখদন্ত বিস্তার করে সুস্থ যুক্তি ও বুদ্ধিকে গ্রাস করতে উদ্যত হচ্ছে। সুস্থ সমাজসচেতন মূল্যবোধ পুঁথির পাতা ছাড়া বাইরে কোথাও সমাজদেহে প্রকৃত ঠাঁই পাচ্ছে না। একচেটিয়া

পুঁজির দাপট এইরূপ বিকৃতির মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করছে। এর সামগ্রিক পরিণতি সংবেদনশীল শিল্পীমনের বিচ্ছিন্নতা ও বিমূঢ়তা।

মূল্যবোধের উপর একচেটিয়া পুঁজির এই সর্বাত্মক অভিযানের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে স্বকালোদ্ভূত সংক্রান্তিকালীন অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা পুরনো মূল্যবোধ দ্রুত অপস্রিয়মান। কিন্তু তার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সেটাকে ভরাট করবার মতো সুস্থ মূল্যবোধ যেহেতু একচেটিয়ার সচেতন প্রতিবন্ধকের ফলে সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে পড়েছে সেহেতু দেখা দিচ্ছে চিন্তা-জগতে নৈরাজ্য, হতাশা, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা। বৃটিশ আমল পর্যন্ত এদেশে ছিল ব্যাপ্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা। বৃটিশদের মহাপ্রস্থানের পরে স্বভাবতই জাতীয় বুর্জোয়ার বিকাশের কালে যুক্তি, জ্ঞান ও ব্যক্তি-চেতনার সুস্থ বিকাশ ঘটতে পারত। এবং দ্রুত শ্রেণী সৃষ্টির মধ্যে সে শ্রেণী-চেতনার বিকাশ ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু আর্থিক বিন্যাসের উল্লম্ফনের ফলে এ ফাঁক ভরাট করা যায় নি। চল্লিশের দশকে সমাজ-সচেতনতার যে লক্ষণীয় আবির্ভাব শিল্পদিগন্তে দেখা দিতে শুরু করে, পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে পৌঁছবার পূর্বেই স্তব্ধ ও বুদ্ধিহীন অর্থনীতির কৃপায় তার মোড় ফিরে গেছে। এই যুগে আবির্ভূত নবীনসমাজ একদিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার অংশীদার হবার সুযোগ না পাওয়ায় এবং অন্যদিকে নবোদ্ভূত বিকৃত একচেটিয়া পুঁজির ভাবাদর্শের আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ায় স্বভাবতই বিপর্যস্ত ও বহুলাংশে হতাশাকবলিত হওয়ায় বিক্ষিপ্ত। তাছাড়া একচেটিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট এস্ট্যাব্লিশমেন্টের হাতছানি এই চঞ্চল ও অস্থির পরিমণ্ডলে কম লোভনীয় নয়। যেহেতু সমাজ এঁদের কোনো সুস্থ মূল্যবোধ উপহার দিতে সর্বত্র সবলভাবে সক্ষম হয় নি, অথচ সামাজিক অস্থিরতা ও সংক্রান্তিকালীন পরিবর্তমান মূল্যবোধের ঝোড়ো মেঘ আকাশে সঞ্চরণগামী, তাই এঁদের কেউ সহজেই এস্ট্যাব্লিশমেন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করে বিনিময়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুযোগ পেয়ে সুখী, কেউবা সমাজকে চিনবার গভীর সুযোগাভাবে সমাজের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী এবং বিচ্ছিন্নতার ধ্বজাধারী।

দেশবিভাগের পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে একাধারে যেমন অবসিত সামন্তযুগের প্রকোপ অব্যাহত ছিল, তেমনি তার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা সাহিত্যমানসে দানা বেঁধে উঠছিল এবং শেষের কালে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও বিশ্বপরিস্থিতির দ্রুত পটপরিবর্তনের ফলে সেখানে

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। শরৎচন্দ্রের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের জগৎ যেমন একশ্রেণীর সাহিত্যিককে উদ্বুদ্ধ করেছে, তেমনি নতুন যুগের কণ্ঠও শোনা গিয়েছে এই একই কালে। ফলে একই সময়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ এবং জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিং বিচিত্র আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং বনফুল-এ মূলত শরৎচন্দ্রীয় ঐতিহ্যের স্বকালবাদী বিস্তার ঘটল, প্রেমেন্দ্র মিত্র ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবিত্ত নাগরিক চেতনার প্রবক্তা হিসেবে সমাজ-সচেতনার পথে অর্ধেক পা বাড়ান, এবং সুবোধ ঘোষ ও মনোজ বসুর সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাগরিক ও মধ্যবিত্ত চেতনার অভিব্যক্তি দেখা যায়। পরিবর্তিত কালের সংঘাতময় প্রকাশ ঘটে তারাশঙ্কর-এর সাহিত্যকৃতিতে। পুরনো জগতকে ঠেলে ফেলে নতুন জগতের আবির্ভাব ও উভয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর সংঘাতময় উপন্যাসে ও নাটকে বিধৃত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা জলন্ত ও দুঃসাহসিক এক অভিনব প্রচেষ্টা রূপায়িত হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-প্রতিভায়। তিরিশের যুগের সর্বব্যাপী মন্দার ব্যক্তিমগ্নদার্শনিক হতাশা থেকে তাঁর সাহিত্য পূর্ণ সমাজ-সচেতন রূপের প্রতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বাঁকে বাঁকে স্বকীয়তার বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রেখে গেছে। মনোবিকলন থেকে সমাজ-বিকলন, ব্যক্তিচিন্তা থেকে সমষ্টিরূপ—তাঁর সাহিত্য-উত্তরণ জটিল, তর্ক-সমাচ্ছন্ন ও বিস্ময়কর। কবিতার দেহেমনেও নতুন রূপ দেখা দিয়েছিল একালে। নির্জন ব্যক্তিবিলাস ও বৃহৎ সময়মগ্নতা থেকে জীবনানন্দ স্বকাল-সঙ্কটের বক্তব্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন, গঠনশৈলীর ঋজুতা এবং বক্তব্যের নাগরিক স্পষ্টতায় সাম্প্রতিক কালের জিজ্ঞাসাকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিধৃত করেছেন এবং চল্লিশের কবিরা এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পার হয়ে স্পষ্টত সমাজবাস্তবতার খর-স্রোতে নেমেছেন। ব্যাপ্ত জনজীবন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও শোষণবিরোধিতা—সব কিছুই তীক্ষ্ণ ঋজু কখনো বা বিশিষ্ট বিদ্রূপের আকারে সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেন প্রভৃতির কাব্যজগতে আত্মপ্রকাশিত।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকেই আমাদের সামনে সাহিত্য

একচেটিয়ার তর্জনিশাসনে ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। আর্থিক ও সামাজিক বিন্যাসে জটিলতা, বিশ্ব-পরিস্থিতির মৌল ভারসাম্যের পরিবর্তন, আণবিক বিধ্বংসের মুখোমুখি সময়-চেতনা ও বিশ্বদর্শনের অস্থিরতা এবং অস্তিত্বের সূচীমুখ সঙ্কটময় প্রশ্নজাল—সব কিছুই একালে উত্তাল ও সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু তার চাইতে বহুগুণে বেশি যা হয়েছে তা সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজি-দুষ্ট আক্রমণজনিত বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও ব্যবস্থা। একদিকে সীমাহীন বাণিজ্যিক লোভের হাতছানি ও প্রতিক্রিয়ার রক্তচক্ষুশাসন, অন্যদিকে স্ফীতকায় সামাজিক ও আর্থিক জটিল বিন্যাস—এদের মুখোমুখি হয়ে সাহিত্যিকরা আত্মবিক্রীত, প্রতিক্রিয়ার দোসর হয়; নয়তো হয় নির্জন বিচ্ছিন্নতার একক সামাজিক বিদ্রোহে লিপ্ত। ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ তাই নতুন করে আসর জাঁকিয়ে বসেছে, একচেটিয়ার বিকৃতি দেখা দিয়েছে কারো মধ্যে, আর উন্নাসিক ব্যক্তি-বিদ্রোহ ও সমাজবিরোধিতা ও সমাজ-অনীহা দেখা দিয়েছে প্রবীণতর ও সাম্প্রতিকতমদের চেতনার কূলে-উপকূলে। তাই বনফুল সাম্প্রদায়িকতার তল্পিবাহক, নিরপেক্ষ-প্রায় তারাশঙ্কর দুর্জ্ঞেয়র সন্ধান-অভিমুখী হয়ে ঈশ্বর-বিলাসী, প্রমথ বিশী কম্যুনিস্ট-বিরোধিতার বিষোদ্গারে শাণিত জিহ্ব, অবধূত বীভৎস রসের পূজারী, মনোজ বসু সমাজ-বিরোধী চোরকে মহিমান্বিত রূপ দেবার জন্য ব্যস্ত এবং বিমল মিত্র-শংকরের দল শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকাদের মর্ডান আপ-টু ডেট ড্রেস পরিয়ে পাঠক ভোলাতে ব্যস্ত। সর্বোপরি, এককালের প্রগতির পতাকাবাহী সমরেশ বসু অধুনা কৃত্রিম অস্তিত্বের সঙ্কটের ভুয়োদর্শনবাজির নামে যৌনতা ও খুনের পটভূমিকায় আচ্ছাদনের নয়া কায়দার ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনায় মগ্ন। অর্থাৎ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এইসব এস্ট্যাব্লিশমেণ্টভুক্ত সাহিত্য-তারকার দল চুটিয়েই বিকৃত একচেটিয়া মূল্যবোধের পদলেহনে অধুনা মত্ত।

অন্যদিকে হালের তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীও সেই একই কাজ করে চলেছেন। এঁদের কালে স্বভাবতই এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেই গর্ত ভরাট করছেন এঁরা কিছু আমদানীকৃত ও কিছু স্ব-সমাজ-সৃষ্ট বিপর্যয়কারী মূল্যবোধের সাহায্যে। এঁরা কেউ অতি-নির্জন, ব্যক্তির মগ্ন-চৈতন্যে অবগাহন করে নিশ্চিন্ত, কেউ বা সমাজের উপরেই ক্ষুব্ধ, বিদ্বিষ্ট ও ক্রুদ্ধ। আর কেউ সুস্থ দর্শন ও মূল্যবোধ খুঁজে না পেয়ে মনে করছেন এ-সমাজে তাঁদের ক্ষুধা মিটবার নয়। রাজনীতি ও সমাজনীতি দুইই এঁদের কাছে সমান অনীহার বস্তু।

এঁরা মনে করেন, এক অনিশ্চিত বিশ্বে ব্যক্তি এসে ছিটকে পড়েছে। সে বহিরাগত, এই বিচিত্র বিশ্ব ও চলমান সমাজে সে নেহাতই আগন্তুক। তার নিজস্ব চালচলন ও ধ্যানধারণা তাই প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। সেজন্য বাস্তব-জগৎ-বিমুখ হয়ে এঁরা চৈতন্যের স্রোতে অবগাহন করতে ইচ্ছুক হন এবং সেখানেও শুধু উদ্ভটত্বের লীলাখেলা দেখে উদ্ভটতাবাদী হয়ে পড়েন, বা শেষাবধি মানববিরোধী। এবং প্রত্যক্ষে অনেকে এস্ট্যাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও পরোক্ষে এঁরা এস্ট্যাব্লিশমেণ্টেরই সঙ্গী। তাই প্রায়ই এঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ রাবণমার্কা রাম-বিরোধিতার অস্ত্রে দ্রুত এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট-স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তাই দেখা যায়, গীতল-কবিতার আড়ালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পশ্চাদ্‌মুখী এবং রবীন্দ্র-জগতে প্রবেশে আগ্রহী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় নির্জন বিষণ্ণতায় অভিষিক্ত হয়ে বিজনকে বেশ্যা-বাড়ির মাধ্যমে অস্তিত্বের এক অগভীর ও কৃত্রিম প্রশ্নের সম্মুখীন করেন। হালকা বহু-প্রেমিকতার বেঁড়েমি দিয়ে তারাপদ রায় জীবনের লঘুতাকেই শুধু পরিহাস-প্রবণভাবে প্রকাশ করেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অশক্ত নপুংসক ও উদাসীন যৌবনের মুমূর্ষু গায়ক হয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

পঞ্চাশের মধ্যদশক থেকে সাহিত্যরাজ্যে এই যে প্রতিক্রিয়া ও অবক্ষয়ী মূল্যবোধের ম্লান ছায়া ক্রমঘনায়মান—এ স্বকাল-সঙ্কটেরই প্রতিফলন। মূল্য-বোধের উপর একচেটিয়া পুঁজির সর্বাত্মক অভিযানের এই হচ্ছে একদিককার ফলশ্রুতি। শিল্প ও সংস্কৃতির সর্বদেহেই এই একই বিচ্ছিন্নতা ও অবক্ষয়ের প্রকাশ। সঙ্গীতে হালকা যৌনতাবোধ থেকে শিল্পের এ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ এবং নাটকে এ্যাবসার্ড ধারার আমদানী—সব কিছুকেই আমরা মোটামুটি এই এক পর্যায়েই ফেলতে পারি।

চার

কিন্তু ডায়েলেকটিকসের অবশ্যই অন্য দিকও রয়েছে। এবং তা হচ্ছে সুস্থ ও প্রকৃত সমাজচেতনার নববিন্যাস ও প্রসার। বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে একই কালে রয়েছে সমাজচেতনা, সমাজ-অনীহার বিপরীতে সুস্থ সংগ্রাম-লিপ্সা এবং মানব বিরোধিতার স্থলে ব্যাপ্ত মানবতাবাদ। এবং এ সব কিছুরই পেছনে রয়েছে অন্যের জীবনের সংগ্রামমুখিনতা।

সামন্তবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা একচেটিয়া পুঁজির দ্রুত বিকাশের চমকে ওপর তলায় মূল্যবোধ দ্রুত বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় যে জনগণ শেষাবধি বহুলাংশে নেমে এসেছিল, তাদের সংগ্রাম কিন্তু স্তব্ধ হয়নি। তাদের মূল্যবোধের জগতে সামন্তবাদলালিত বহু ধ্যানধারণা এখনো টিকে রয়েছে; কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, ব্যাপ্ত গ্রাম-বাঙলার সাধারণ সরল মানুষ অনড় সমাজ থেকে প্রাপ্ত কিছু সৎ মূল্যবোধ যা আজো টিকিয়ে রেখেছে, তার সাহায্যেই অতীতেও সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বিরুদ্ধে বাস্তব সংগ্রাম করেছে এবং বর্তমানে একচেটিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশীদার হয়েছে।

যে সরল আত্মবিশ্বাস এবং জীবনকে রক্ষা ও বর্ধিত করবার প্রাণময় প্রচেষ্টা মানবসত্তার চিরকালীন বৈশিষ্ট্য, তদুপরি রূঢ় বাস্তবকে বাস্তব হিসেবেই স্বীকার করে নিয়ে বিরোধী অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া যে অপরাজেয় মানবসত্তার চিরকালীন ধর্ম—সর্বকালেই সেই মানবসত্তার সংগ্রামচেতনা গুপ্ত সুপ্ত বা ব্যক্ত আকারে দেখা দিয়ে থাকে। বাস্তবের মানুষের এই শ্রেণী-সচেতন সংগ্রামই ইতিহাসের পটভূমির পরিবর্তনে সহায়ক। বাঙলাদেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষও এই দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামেরই গুপ্ত ও ব্যক্ত অংশীদার।

এই চিরায়ত সত্যকে সাম্প্রতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ও কলুষ-প্লাবনের ফলে আমাদের নাগরিক-চেতনা-সমাচ্ছন্ন শহরবিলাসী বুদ্ধিজীবীর দল অনুধাবন করতে ভুলে গিয়েছিলেন। বিপুল দুর্নীতির স্ফীতকায় রূপ দেখে যখন তাঁরা হতাশাগ্রস্ত, সমাজের ওপরতলার বিভ্রস্ত হালকাপনা ও অসুস্থ প্রতিযোগিতার দাপটে যখন তাঁরা আচ্ছন্ন, গ্রাম-নগরের মহাবিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হয়ে যখন তাঁরা কফি-হাউসের স্বর্গলোকে বন্দী, ওপর মহলের সমাজের চাকচিক্য প্রলোভন দুর্নীতি ও ক্লেদের যুগপৎ আকর্ষণে ও বিকর্ষণে যখন দোলায়মান, এবং যখন সমাজ-অনীহভাবে মগ্নচৈতন্য ভাববাদ আগন্তুকবাদ ও কলাকৈবল্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত ও এইসব পচাগলা অবক্ষয়ী ও প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থাকে সহনীয়ভাবে চিরন্তন ধরে নিয়ে এস্টাব্লিশমেণ্টের প্রসাদভিক্ষু—ঠিক তখনই বিপুল বিস্তৃত গ্রাম-বাঙলার বুকে ধূমায়িত হচ্ছিল এই সব কিছু অবিচার দুর্নীতি ও দুরপনেয় সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বহ্নি। শহরের সাধারণ খেটেখাওয়া মানুষেরাও এই অসন্তোষের

অংশভাক ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনার অংশীদার হচ্ছিলেন। এরই প্রলয় প্রকাশের পূর্বাহ্ন পর্যন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতস্তত ও অনিশ্চিতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে মাঝে মাঝে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন ও বিক্ষোভের আকারে। খাদ্য আন্দোলনকে স্বরূপে চেনা যায়, চেনা যায় 'দমদম দাওয়াই'-এর স্বরূপ। কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভ বা প্রায় অকারণে ট্রেন আটকানো যে সমগ্র সমাজে অন্তর্নিহিত চাপা বিক্ষোভেরই অতর্কিত স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ, তা সেকালে অনেকেই বুঝতে ইচ্ছুক হন নি। তবু স্বীকার করতেই হবে, বৃহৎ পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষ তার সংগ্রাম এইভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল। সে রূপ একচেটিয়ার দুর্নীতির ধূম্রজালাচ্ছন্ন আকাশে অনেকেরই চোখে ধরা পড়েনি।

বাস্তব সংগ্রামের যখন এইরূপ, তখন সংস্কৃতির রাজ্যেও অবক্ষয়ী ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে সমানেই আর-এক লড়াই অব্যাহত গতিতে চলেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতির ক্রীতদাসী পত্রপত্রিকা এবং তাদেরই লোভাতুর অথচ দুর্বল সহযোগী বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকার অবিরত প্রচারের তীব্রনাদে কর্ণপটাহ বধির বলে সংচিন্তার দুর্বল কণ্ঠ বহুলাংশে ক্ষীণ হয়ে বেজেছে এবং অনেকাংশে ব্যর্থ বলে প্রতিভাসিত হয়েছে। কিন্তু সুস্থ সমাজচেতনামুখী মানবিক চিন্তাধারার ফল এঁরা এই অস্থির অবস্থাতেও ফোটানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুস্থ সাহিত্যিকরা এই কঠিন অবস্থার মধ্যেও সংগ্রামী মানব-চেতনার পথ-নির্দেশক। এঁরাই এবং এঁদের অনুগামীর দল সংগ্রামী সমাজমুখিন শিল্প-সাহিত্যের আলোকবর্তিকা দৃঢ় হাতে ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং লেখক-পাঠক বিচ্ছেদ ঘোচাবার সুকঠিন দায়ভার গ্রহণ করেছেন।

গণসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যা ছিল স্ফুলিঙ্গ, বিগত চতুর্থ সাধারণ এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে তা বিস্ফোরণের আকারে আত্মপ্রকাশ করল বহুকাল পরে। সংগ্রামী গণচেতনার লাভাস্রোতের মতো এই আত্মপ্রকাশ সমস্ত অবক্ষয়ী মূল্যবোধের জগতের উপর এক নিদারুণ আঘাত এবং তা আশা করি বুদ্ধিজীবীদের বহুকাল পরে নাড়া দেবে তাঁদের লালিত ধ্যানধারণার পুরনো ভিৎ কাঁপিয়ে।

বিচ্ছিন্নতার যুগ এবারে শেষ হতে চলেছে। নতুন বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ক্রান্তিকালে আমরা উপস্থিত। শহর যখন অবসিত ও ক্ষীয়মান মূল্যবোধের

পুতিগন্ধে ক্লান্ত, তখন গ্রাম-বাঙলার সজীব দমকা হাওয়া চিন্তার জগতে নতুন কাঁপন তুলবার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের আজ তাই নতুন করে আত্মসমীক্ষার পর্বকাল এসেছে। একদা আমরা তত্ত্বের দিক থেকে জনগণের সংগ্রামের অংশীদার হতে চেয়েছিলাম। তার ভিতরে ফাঁক ছিল। ফলে শিল্প-সাহিত্য মার খেয়েছে নিদারুণভাবে। একচেটিয়ার সর্বগ্রাসী থাবার সামনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল শিল্প-সাহিত্য। আজ উত্তাল গণচেতনার স্রোতে অবগাহন করে শুদ্ধ হতে হবে। হৃদয়ের দিক থেকে এগিয়ে এসে গণচেতনার অংশীদার হতে হবে, শুকনো তত্ত্বকে হৃদয়রসে ভিজিয়ে সার্থক সমাজসচেতন শিল্প রচনা করতে হবে। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আজ আর বুদ্ধিজীবীরা নিঃসঙ্গ নন, একচেটিয়ার রাঙা চোখের সামনে রুখে দাঁড়ানোর অসংখ্য সঙ্গী তাঁদের চারপাশে। এই সার্থক জনযোগচেতনা শিল্পীর নতুন ভরসা ও বল। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রকৃত উৎস এই মহৎ সংগ্রামী মানুষ। পায়ে পা, হাতে হাত মিলিয়ে চললে নিঃসঙ্গতা ঘুচবে, বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যাবে।

সাম্প্রতিক কালের ডায়েলেকটিকসের এই বলিষ্ঠ ও ক্রমবর্ধমান প্রধান দিকটির দিকে আশা করি বাঙলাদেশের সংস্কৃতিসেবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। সংগ্রামী মানুষ এবং তার ঐক্য-চেতনায় সৃষ্ট নতুন ঐক্য-বদ্ধ ফ্রণ্ট আজ গণমানসে আশাবাদের বিপুল নিরুদ্ধ জলধারাকে মোচিত করেছে। এ আশা নিশ্চয় অসঙ্গত নয় যে, এই বিরাট আশাবাদের স্রোতধারা এযাবৎকাল সঞ্চিত সামন্তবাদী পুরনো ধ্যান-ধারণাকে এবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে এবং একচেটিয়া ধ্যানধারণার সঙ্গে সার্থকভাবে যুঝবার ক্ষমতা খুঁজে পাবে।

এই সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের পরম কাম্য নতুন সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি গণমানসের স্বার্থক আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত এবং বলিষ্ঠ মানবতাবাদের হৃদয়গ্রাহী স্বাক্ষরে ভাস্বর। এই নতুন সংস্কৃতিই অসমাপ্ত ভাববিপ্লবকে সম্পূর্ণতায় উত্তীর্ণ করতে পারে এবং স্বকাল-সঙ্কটের সমাধান আনতে পারে। তাই এই নতুন মানবমুখী সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম সংস্কৃতিসেবীদের পক্ষ থেকে অবিলম্বে শুরু করা আবশ্যক।

* নিবন্ধটি বিতর্কমূলক। এ-সম্পর্কে আমরা পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি।

—সম্পাদক।

পুস্তক-পরিচয়

বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। নৃপেন্দ্র গোস্বামী। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য পনের টাকা।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী মহাশয় প্রণীত 'বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ পড়িয়া উপকৃত হইলাম। ছাপা বাঁধাই ভালো। মূল্যটিও সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রায় সাধ্যায়ত্ত। এরূপ গ্রন্থ সর্বদা সহজপাঠ্য হওয়া সম্ভব নহে, তবে ইহা একটি সুপাঠ্য গ্রন্থ।

এমন গ্রন্থ পাঠান্তে দুই-চারিটি প্রশ্ন অথবা মীমাংসা প্রসঙ্গতই তবুও পাঠকের মনে জাগে। সেগুলির আলোচনাতে আমাদেরও সন্দেহাদির নিরসন হইবে; এবং, লেখকও যদি উচিত মনে করেন, তবে, ঐসব প্রশ্নাদির মীমাংসা সম্বন্ধে উত্তরালোচনা করিয়া ভবিষ্যতেও গ্রন্থটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন পরিমার্জন করিতে পারেন—এই আশাতেই সেগুলির অবতারণা করিলাম।

গ্রন্থের আলোচ্য বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। এবিষয়ে যাঁহারা সামান্য-মাত্রও পড়াশুনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ব্যাপারটি কত কঠিন। লেখকও তাই আরম্ভে বলিয়াছেন "বৈদিক যুগের আলোচনায় ছক-আশ্রয়ী-পদ্ধতির কার্যকারিতা নিতান্তই প্রশ্নের বিষয়।" লেখক নানাদিক হইতেই "বৈদিক মানসিক স্তরটি" বিবেচনা করিয়াছেন!

সমগ্র গ্রন্থটি দুই খণ্ডে লিখিত। প্রথম খণ্ডে প্রধানত মর্গান, ব্রিফো, গর্ডন চাইল্ড, কার্ল মার্কস-এর বিভিন্ন আলোচনা-পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়বস্তুর তথ্যগত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোচনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনটি পরিচ্ছেদ। উহার মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক আর্য-অনার্যের ভাষা, গোষ্ঠী ও ভাবনার বিরোধ ও সমন্বয় দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মূলত বৈদিক সভ্যতার প্রশ্ন ও বৈদিক মানস এবং প্রস্তাবিত মর্গানবাদী ব্যাখ্যাসূত্র দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে বৈদিক সমাজ-সংগঠন বর্ণিত হইয়াছে। আর্য পিতৃতন্ত্র, গোত্র ও টোটেম, গোত্র ও প্রবর এবং আরও কয়েকটি অধ্যায়ে আর্যদের সামাজিক বিন্যাস দেখানো হইয়াছে। সর্বশেষে আছে পরিশিষ্ট ও পরিভাষা, আর

গ্রন্থারম্ভে সংক্ষেপ-সঙ্কেত। পরিভাষা প্রভৃতি ব্যবহারিক অর্থে প্রয়োজনীয়, এই কথা আমাদের অনেক গ্রন্থকার বিস্মৃত হন।

লেখক মর্গান, ব্রিফো, গর্ডন চাইল্ড এবং মার্কস-এর বিচারপদ্ধতি স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত করিয়াছেন এবং সংক্ষেপে বিচারও করিয়াছেন। নিজে আলোচনা কালে কাহারও বিশেষ মতবাদের তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এরূপ স্বাধীন আলোচনার দোষগুণ দুইই আছে। তবে গুণই বেশি। মতবাদ পক্ষপাত-দুষ্ট নহে, ইহা নিশ্চয়ই গুণ। কিন্তু লেখক নিজে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া বিচার করিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার না হইলে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। আমাদের মনে হয় লেখক মোটামুটি Social anthropology-র যুক্তিসহ পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে বর্তমানে আমাদের গবেষক ও অধ্যাপকগণ বেদ ও ভারতীয় দর্শনাদির পুনরালোচনায় তৎপর হইয়াছেন। একথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে, এপথে বিগত শতাব্দীর য়ুরোপীয় পণ্ডিতসমাজই পথিকৃৎ। কিন্তু কোনও কথাই তো শেষ কথা নহে। অথবা, একটি বিষয়কে কত নূতনভাবে দেখা যায়, কত বিষয়ের সহিত মিলাইয়া বুঝিয়া লওয়া (assimilation) যায়, সে সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার বিরাম নাই। সুতরাং আমাদের পণ্ডিতসমাজ এই দিকে অবহিত হইয়াছেন, ইহা সত্যই একটি আশার কথা।

প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থা, জীবনযাত্রা, আর্থিক-পারমার্থিক সংগঠন ইত্যাদির বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাহার ভিতর এদেশীয়দের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীই অগ্রগণ্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। শ্রদ্ধেয় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ঐতিহাসিক দৃষ্টিও সমাধানযোগ্য। তৎপরে পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ণ মহাশয়, ডঃ কোসাম্বী, শ্রীডাঙ্গে এবং অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত উপাদান-গুলিকে আধুনিক দৃষ্টিতে আর্থিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে সাজাইয়া পাঠকসমাজে পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীনৃপেন্দ্র গোস্বামীর গ্রন্থ সেই পর্যায়ে আরো একটি মূল্যবান সংযোজন নিশ্চয়ই। বিচারভঙ্গির দিক হইতে দেখিলে বলিতে হইবে লেখক সতর্ক ও মননশীল দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ বিচার ও সংযত প্রকাশের পরিচয় দিয়াছেন। এই বইখানির একটি বিশেষ গুণ ইহাই। উপরন্তু তিনি রাহুলজী

শ্রীডাঙ্গে এবং অধ্যাপক দেবীপ্রসাদের পথ অনুসরণ না করিয়া বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত আলোচনা ধারায় (academic tradition) অগ্রসর হওয়াতে তাঁহার বিচারভঙ্গি সহজে বোঝা যায়। বইখানির বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি জানেন কোন দূর অতীতের উপাদান লইয়া তাঁহার কাজ এবং সেজন্য কতখানি চমক লাগাইবার লোভ সম্বরণ করিলেন, তবেই সেই উপাদানগুলির সম্বন্ধে একটা সুস্থির নিষ্কর্ষ বাহির করা যায়।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বেদের পঠনপাঠনক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করার পক্ষে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। সুতরাং আলোচনাকালে ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে। তবু এরূপ আলোচনা দ্বারা নিজেরই লাভ হইতে পারে এইরূপ চিন্তাই আমাকে একার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। তাই মনে হয় যে, পুরাতন অতীতকে যত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই আলোচনা করা যাক, তাহাতে কতকগুলি ফাঁক থাকিবার কথা। সে ফাঁকগুলি সুদূর অতীতের অনিশ্চয়তাজনিত ফাঁক। তাহার যথাযথ পরিপূরণ সম্ভব না জানিয়াই বৈজ্ঞানিক আলোচনাসূত্রেই যথাসম্ভব নিশ্চিত হইবার চেষ্টা করে। আর, বিজ্ঞান কখনও শেষ কথা বলে না। ক্রমেই যথাসম্ভব হইতে সম্ভবতর, অধিকতর সম্ভব—এই সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয়। তবে বিজ্ঞান যেটুকু প্রমাণ করিতে চাহে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে মানিয়াই তাহা করে; তাহার বেশি অনধিকারচর্চা করে না। এ কারণেই সম্ভবত গোস্বামী মহাশয় শ্রীডাঙ্গের এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনেক মতের সমর্থন করিতে পারেন নাই।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে একথাও বলা যায় যে দূব অতীতের উপাদানগুলি সম্বন্ধেও মতানৈক্য থাকিবেই। কারণ, ঐ দূরের ফাঁক ভিন্ন ভিন্ন লোকে নিজের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা অনুসারেই যুক্তিযোজনা করিয়া পূর্ণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্যক্তিগত ভেদানুসারেই মতও কতকাংশে গড়িয়া ওঠে। তথাপি এই ক্ষেত্রে একটা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করা যায়। সতর্কতা দ্বারা নিজেদের প্রবণতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাও সম্ভব। উহার একটি উপায় মর্জির কাছাকাছি অর্থটা গ্রহণ করা, অন্তত যে অর্থটা লইয়া সন্দেহ অথচ যেটা স্থাপিত করার আধার নাই, সেটাকে বেশি ঘোরপ্যাচের মধ্যে না টানিয়া উহার নিকটতম সহজ অর্থটি গ্রহণ করিলে কিছুটা দূর পর্যন্ত কাজ চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। যেমন উদাহরণস্বরূপ ঋগ্বেদ-এর (১।৮৯ দ্রষ্টব্য) 'বিশ্বদেবসূক্তম্' উল্লেখ করা যাইতে পারে :

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদব্ধাসো

অপরীতাস উদ্ভিদঃ।

দেবো নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো

রক্ষিতারো দিবে দিবে॥

দেবানাং ভদ্রা সুমতি ঋজুয়তাং দেবানাম্

রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাং।

দেবানাং সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ

প্রতিরন্তু জীবসে॥" ইত্যাদি

এই অংশের মোটামুটি অর্থ ঃ সর্বদিকা হইতে অস্মৎসমীপে কল্যাণকর নিরুপ-দ্রুত অবিরুদ্ধ নিঃশত্রু ক্রতু বা যজ্ঞোদ্দিষ্ট (দেবগণ) আগমন করুন। সেইরূপে সংরক্ষক দেবগণ, অস্মৎসদৃশ রক্ষিতব্যকে অপরিত্যাগী দেবগণ, নিত্যদিন আমাদের শুভবিধায়ক হউন। দেবগণ ঋজুপক্ষানুসারক হওয়াতে আমাদের প্রতি নিরন্তর সুমতি ও দাক্ষিণ্য রক্ষা করুন—দেবগণের সখ্য আমাদের প্রাপিত করুন—দীর্ঘায়ু অধিকতর বর্ধিত করুন॥ ইত্যাদি।

এই অংশটিকে বুঝিতে হইলে এইটুকু মনে করিলেই চলে যে তাৎকালিক আর্য ঋষিগণ দেববিশ্বাসী ছিলেন ঠিকই। সে বিশ্বাস তাঁহাদের জীবনের অগ্রগতি ও সম্ভূতির আধার ছিল। দেবতাগণ তাঁহাদের পার্থিব উন্নতি বিধান করুন—এই-ই তো এ-স্থলে তাঁহাদের প্রার্থনা। সেক্ষেত্রে সেই কালের সমাজ কেমন ছিল জানিতে হইলে বেশিদূর যাইবার কি দরকার? একথা কি বলা যায় না যে, এই সূক্তের ঋষির সময়কার বেশির ভাগ লোকের মনোভাব ছিল এই যে দেবগণ সহায়ক শক্তি—বাঁচিবার জন্য এবং আরও ভালোভাবে বাঁচিবার জন্যই, শক্তি বাড়ানোর জন্যই, তাঁহাদের প্রয়োজন! এরূপ প্রার্থনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের আর যাই হউক কেবল অধ্যাত্মধর্মী বলাও ভুল হইবে। আবার তাঁহারা শুধুমাত্র অবাস্তব কল্পনাধর্মী ট্রাইবাল লোক ছিলেন—এমন অভিমত দেওয়াও নির্দোষ হইবে না। তাহা হইলে ১ম মণ্ডলের প্রাচীন অংশের প্রবক্তৃগণ যে-আর্যসমাজে ছিলেন তাহার রীতিনীতি কতকটা বাস্তবানুগামী (Realistic), অগ্রগামী (Progressive), সামাজিক সুস্থিরতায় বিশ্বাসী (Social security); শক্তিমান—কিন্তু সে-শক্তি কেবল পশুশক্তি নয়, শত্রুভীত, —তবে শত্রুকে সরাইতে বদ্ধপরিকর, এইরূপ অনুমানমাত্র করা চলে।

পূর্বোক্ত এই সহজ পথকে মানিয়া আরও কিছুটা অগ্রসর হইলে আমরা

দেখিতে পাই যে, ১০ম মণ্ডলের রচনার দিকে আর্যগণ ন্যায্য কারণেই আর পূর্বেকার মত নাই। 'বর্ণাশ্রম' তাঁহাদের সামাজিক স্থিরতার পরিচায়ক। শূদ্র-শাসন তাঁহাদের উচ্চবর্ণদের স্বাভাবিক অধিকার। কদাচিৎ দুটি-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে উহাকে তাঁহারা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত করিতেন—যেমন ধরা যাক 'সত্য-কাম জাবাল'-এর ক্ষেত্রে, কিংবা, এই সমাজের পুরোধা ব্রাহ্মণগণ ক্রমেই ক্ষত্রিয় বাহুবলের আশ্রয়ে স্থিত হইতেছিলেন এমনও বলা যায়। তখন দেখি ক্ষত্রিয় রাজন্যগণ—বিশ্বামিত্র, জনকাদিই—ব্রাহ্মণ্যশক্তির সন্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। এভাবে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয়ত্ব ঘুচিয়া দ্বিজত্বপ্রাপ্তির ঘটনা, অথবা জনক রাজর্ষির রাজ্য পালন ভূমিকর্ষণ ও ব্রহ্মবাদ বিশ্লেষণ—এসবের পুনর্বিচার করা সম্ভব। মনে হয় একদিকে ব্রাহ্মণ-বর্ণের শক্তিহ্রাস ও অপরদিকে অন্য বর্ণের উত্থান হইতেছিল! একদিকে ক্ষত্রিয় হইয়াও বিশ্বামিত্র 'দ্বিজত্ব' প্রাপ্ত হইলেন—এজন্য সংঘর্ষ কম ঘটে নাই। ঐ 'দ্বিজত্ব' 'ব্রাহ্মণত্ব' ক্রমশই ভাববাচক (abstraction) হইয়া উঠিতেছিল!

অতঃপর ১০ম মণ্ডলের 'নাসদীয় সূক্তম্' এবং 'পুরুষ সূক্তম্' (যথাক্রমে ১০।১২৯ ও ১০।৯০ দ্রষ্টব্য) সূক্ত দুইটিকে এই সহজদৃষ্টিতে বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রথমটিতে বহুদেববাদের পরিবর্তে দেবধর্মগন্ধহীন 'এক' বা বীজীভূত কারণ-এর দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে, দ্বিতীয়টিতে একেশ্বরবাদের মূল সূত্রটি পাওয়া যায়। উক্ত 'পুরুষ' বা মূলসূত্রটি যেন সৃষ্টিতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব, নীতি ও সমাজতত্ত্বের আধার রূপে কল্পিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে কি বলা চলে না যে, প্রথম যুগের আর্য-সমাজ ভারতের উর্বরাভূমিতে কালক্রমে স্থায়িত্ব লাভ করে, স্থিরতা ও অপেক্ষা-কৃত আরামের মধ্যে অভ্যস্ত হইয়া ওঠে। তখন তাহাদের সমাজনীতি ও রাজ-নীতি ক্রমশ দৃঢ়বদ্ধ হইতে থাকে—উহার প্রতিফলন ঘটে তাহাদের মানসচিত্রে এবং ধর্মে। বহু সর্দারের স্থানে একরাজা অথবা বহু দেবগণের স্থলে 'একশক্তি' অথবা 'একেশ্বর'-এর কল্পনা করিয়া আর্যসমাজ সেদিনে সুগঠিত হইবার আশাই ব্যক্ত করিয়াছে, এমন কথা বলিলে অতি প্রসঙ্গদোষ ঘটিবে না। অবশ্যই একথা বলা প্রয়োজন যে, বেদের বিশদ আলোচনা সামান্য এই দুই-একটা উদাহরণ দ্বারা প্রস্তাবিত হইবার মত নহে।

এইদিক দিয়া আমাদের মনে হয় যে গোস্বামী মহাশয় এই বিশাল বেদ-বারিধিমন্থন করিয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি আরও দীর্ঘায়ত পরিসরে সাজাইলে ভালো হইত। পুস্তক দীর্ঘতর হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু 'বৈদিক সমাজ' ও

'বৈদিক সংস্কৃতি'র পরিস্ফুটন ঘটিত। এই দুইটি বিষয়কে পৃথকভাবে আলোচনা করিবার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তিনি যদি প্রসঙ্গত মর্গান, ব্রীফো, গর্ডন চাইল্ড ও মার্কস-এর ততটুকু উল্লেখ করিতেন, সেটি আমাদের মতে আলোচ্য গ্রন্থের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইত। সেইদিক দিয়া ৯৬পৃঃ পর্যন্ত একটু অপ্রাসঙ্গিক লাগে। এরূপ ইহার অর্থ নয় যে উক্ত অংশ সুলিখিত নহে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত অংশ পরিবর্দ্ধিত করিয়া অন্য গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী 'ঋত' শব্দের প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন (পৃ ২১৭)। মনে হয় আদিতে ঋি, ঋিজ্ ঋিষ্ ঋিত এগুলি পর্য্যায়বাচী ছিল। ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এ-আলোচনায় কিছু অধিক ফল হওয়া সম্ভব। ঋগ্বেদ-এর শান্তি-বচনে "ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি" পঠিত হয়। সুতরাং 'ঋত' ঠিক যুক্তির 'সত্য' নয়, তদতিরিক্ত কিছু অর্থাৎ নীতিরও দ্যোতক। 'ব্রহ্ম' এবং 'ব্রাহ্মণ' (পৃঃ ২১৩, ২৬৭-৬৯) কে 'কমিউন' বা 'সাম্যবাদী সংগঠন বলার সমর্থক যুক্তিই যে নাই—একথা গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকাব করেন। একটা যজ্ঞানুষ্ঠানে অবশ্যই বহুলোকের বহুবিধ কাজে বহুভাবে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন ঘটিত। যজ্ঞও একরূপ ইষ্টিযজ্ঞই ছিলনা। প্রাণযজ্ঞ, কৃষিযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, প্রজাপতি যজ্ঞ ইত্যাদি কেবল নাম 'মীমাংসা দর্শনে' 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'য় এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও পাওয়া যাইবে। যে কোনও কর্মেই ব্যক্তি ও তৎকালীন সমাজ একত্রিত হইতে বাধ্য হইত। সে সকল কর্মকে বিশ্লেষণ করিলে একটা 'উৎপাদন সম্পর্ক'-র আধারও ঠিক পাওয়া যাইবে। কিন্তু তা বলিয়া তত্ত্বের দিক হইতে সেই কাজটির বিচার তখন কেবলমাত্র উৎপাদন-সম্পর্ক দ্বারা করিতে গেলে ভুলই হইবে। এক্ষেত্রে কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাইতে হইলে ভাষাতাত্ত্বিক নজিরেরই সাহায্য লইতে হয়। √বৃষ √বৃহ √বৃধ √ব্রহ √ভূ প্রভৃতি ধাতু সম্ভবত এক সময় আদিতে সমবাচী অর্থে প্রয়োগ করা হইত। পরে উহা হইতে বৃহৎ ও ব্রহ্ম শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছিল। উহার অন্য এক দিকের অর্থে বৃদ্ধি স্বীকৃত হইতে পারে—অর্থাৎ যাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং যাহা বৃহৎ। এই অর্থেই 'সামষ্টিক' রূপ দেওয়াও যাইতে পারে। তবে উহা অনেকাংশে কষ্টকল্পনা সন্দেহ নাই।

সুধী পাঠক অবশ্যই এ-পুস্তক পাঠের দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন। শ্রীনৃপেন্দ্র গোস্বামী যে-পরিমাণ আন্তরিকতা ও তথ্যনিষ্ঠাসহ এ পুস্তক-লেখার শ্রম স্বীকার করিয়াছেন—তাহা উল্লেখযোগ্য, তিনিও ধন্যবাদার্হ।

অরুণা হালদার

স্পেনের কবিতা। অনুবাদক: শিবেন চট্টোপাধ্যায়। মেরিট পাবলিশার্স। মূল্য দু-টাকা।

কবিতার অনুবাদ-কর্মে কবির দাবিই সর্বাগ্রে। কেননা একজন কবি খুব সহজে তাঁর সমধর্মী আর-এক কবির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। শিবেন চট্টোপাধ্যায় কবি। হিস্পানী কবিতার অনুবাদ অনেকক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন, সন্দেহ নেই; তৎসত্ত্বেও বলা চলে, একাধিক কবিতা অনুবাদে শিবেনবাবুর স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য চোখে পড়ে।

বিশ শতকের শুরুতে রুবেন দারিও, মিগেল দে উনামুনো, আনতোনিও মাচাদো, হুআন রামোন হিমেনেথ প্রমুখদের প্রবল প্রয়াসে হিস্পানী কবিতার আঙ্গিক বিষয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়—পরবর্তীকালে তা 'মোদের্নিস্মো' নামে প্রসিদ্ধ। ভ্যার্লেন-ভক্ত দারিও ও সমকালীন 'মোদের্নিস্তাস্'দের কাব্যচর্চায় ফরাসীস পারনাসীয় ও প্রতীকী কবিদের প্রভাব প্রকটিত। যদিচ দারিওর প্রতিভা এবং বস্তুত ছন্দোপ্রকরণ ও আলঙ্কারিক কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁর অনন্ত অনুসন্ধিৎসা তথা পরীক্ষানিরীক্ষা ['পাদ্রে ই মাএসত্রো মাখিকো' (জনক ও সুনিপুণ জাদুকর) দ্রষ্টব্য] ভ্যার্লেন ও সমসাময়িক যে কোনও য়ুরোপীয় কবিতেই বুঝি বা বিরল, প্রশংসনীয়।

জেনারেশনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মহামতি হোসে ওর্তেগা ই গাস্সেতের নির্দেশ শিরোধার্য করে বলা যায়—পেদ্রো সালিনাস্, হেরারদো দিএগো, ফেদেরিকো গার্থিআ লোর্কা, দামাসো আলোনসো, ভিথেনতে আলেইক্সানদ্রে, এমিলিও প্রাদোস্, লুইস্ থের্নুদা, রাফাএল আল্বের্তি, মানুএল আল্তোলা-গির্রে প্রমুখেরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। উপর্যুক্ত কবিরা মুখ্যত আন্দালুসীয়। আর হিস্পানী কবিতার বিশাল ঐতিহ্যে কাস্তিলে ও অধুনা আন্দালুসিআর অবদান অনস্বীকার্য। এবং এদেশের ঐতিহ্যময় কাব্যধারায় একটি বিষয় স্মর্তব্য। মতবাদে চূড়ান্ত ব্যত্যয় সত্ত্বেও এক কবিগোষ্ঠী অপর কবিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা করেন নি; পক্ষান্তরে আধুনিক হিস্পানী কবিতা-আন্দোলনের পরম পুরোধা দারিও থেকে অধুনাতন যেসব বহুধাবিচিত্র বাদের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে, সাম্প্রতিককালের কবিরা প্রবল পরিশীলনের মাধ্যমে সেগুলিকে যথাযথ আত্মস্থ করে তাঁদের কবিতার ঐশ্বর্যবর্ধনে বদ্ধপরিকর। অতএব লোর্কার জেনারেশনের, বা বলা যেতে পারে 'খেনেরাথিওন দে লা দিক্তাদুরা'র কবিরা, শুধুমাত্র 'মোদের্নিস্তাস'দের অনুশীলনেই যত্নবান

হন নি; গোন্থালো দে বের্থিও থেকে গুস্তাবো আদোল্কো বেক্কের পর্যন্ত বিস্তৃত পঠনপাঠনে প্রয়াস পান।

এই জেনারেশনের কবিদের মহার্ঘ কাব্যচিন্তায় মনঃসংযোগ করাকালীন ফ্রাঁসে স্যুর্রেআলিস্ত্ আন্দোলনের সমৃদ্ধি সূচিত হয় এবং ভালেরির দৃষ্টান্ত ও ভাষ্যসমেত 'লা পোএজি প্যুর্'-এর তাত্ত্বিক বিচারবিশ্লেষণে সমগ্র য়ুরোপের কবিকুলই মেতে ওঠেন। প্রসঙ্গত বলা চলে, ওর্তেগা ই গাস্সেত সম্পাদিত 'রেভিস্তা দে ওক্থিদেন্তে' তখন 'লা নুভেল রেভ্যু ফ্রাঁসেজ' ও 'ক্রাইটেরিয়ন্' পত্রিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মানবিক অস্তিত্বের প্রধান বিষয়বস্তু—প্রেম, প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যু—'দিক্তাদুরা'র কবিদের গীতিকবিতায় সুপরিস্ফুট। এই জেনারেশনের চমকপ্রদ কবিপ্রতিভা পাঠকদের পদে পদে বিস্ময়াবিষ্ট করে।

হিস্পানী কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়ার অপেক্ষা রাখে। মানুএল্ হোসে ওতোন থেকে আলি চুমাথেরো পর্যন্ত সতেরজন কবির উনিশটি কবিতার একটি ছোট অনুবাদ সঙ্কলন (ভূমিকা সহ) শিবেনবাবু আমাদের উপহার দিয়েছেন। এজন্যে নিঃসন্দেহেই তিনি ধন্যবাদার্হ।

ভূমিকায় শিবেনবাবু লিখেছেন: "স্পেনের কবিতার মাধুর্য আমাকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। নিজে তার রস আস্বাদন করতে গিয়ে কিছু কিছু অনুবাদ করবার ইচ্ছা জাগে।" যদিচ এই 'মাধুর্য'কে মর্যাদা দেওয়া যে অতীব আয়াসসাধ্য—সে বিষয়ে শিবেনবাবু সম্ভবত সচেতন নন। অনুবাদকের (বিশেষত কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে) মূল ভাষায় প্রবেশ অনিবার্য। সর্বোপরি প্রবল পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মূল কবির মেজাজ, তাঁর বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক নৈপুণ্যকে অনুধাবন করতে হয়। অন্যথায় অনুবাদে কবিব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, এদেশে এবংবিধ বিভ্রান্তি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে ইদানীংকালের অনেক অনুবাদককে প্রচণ্ডভাবে লালন করেছে। কার্যত শিবেনবাবুও এক্ষেত্রে সেই আদি ও অকৃত্রিম 'ত্রাদুত্তোরি, ত্রাদিতোরি' গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত।

সিলেন্থিও, লোব্ রেগেথ, পাভোর্ ত্রেমেনদোস্
কে ভিএনে সোলো আ ইন্তেরুরুম্পির আপেনাস্
এল্ গালোপে ত্রিউনফাল্ দে লোস্ বের্রেনদোস্।

এবং এখানকার দানাবাঁধা স্তব্ধতা—ভয়—অন্ধকার
হঠাৎ চমকে দিতে ছুটে আসে আশ্চর্য হরিণ
লাফায়, আনন্দে নাচে, তারপরে নেমে আসে আরো নিরবতা (সিক্)।

শিবেনবাবুর অনুবাদ-সঙ্কলনের শুরুতে ওতোনের 'মির্আ এল্ পাইসাখে : ইন্মেন্সিদাদ্ আবাখো'র অনুবাদ। ক্লেশকর দৌর্বল্য অনুবাদে সুপ্রকটিত। ফলত, শিবেনবাবুর শেষ পঙ্‌ক্তিটি পাঠান্তে পাঠকের এমনতর ভাবনাও বোধহয় অস্বাভাবিক নয় যে—এটি নিছকই অনুবাদকের মস্তিষ্কজাত, যার আশ্লেষ বলা বাহুল্য মূলে মেলে না।

পক্ষান্তরে থের্নুদার 'প্রিমাভেরা ভিএখা' অনুবাদে শিবেনবাবু মূলানুগ :

আওর্আ, আল্ পোনিএন্তে মোরাদো দে লা তার্দে,
এন্ ফ্লোর্ ইআ লোস্ মাগ নোলিওস্ মোখাদোস্ দে রোথিও,
পাসার্ আকেলিআস্ কালিএস্, মিত্রনএাস্ ক্রেথে
লা লুনা পোর্ এল্ আইরে, সের্আ সোনিআর দেস্পিএর্তো।

আজ এই রক্ত-রঙ সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়
ফুটে ওঠে ম্যাগনোলিয়া ভিজে গাছে শিশিরের জলে
আকাশের চাঁদখানা ধীরে ধীরে আরো বড় হলে
জীবন্ত স্বপ্নকে নিয়ে আমি হাঁটবো এই পথ দিয়ে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর আকাশ। সুভাষ সিংহ। স্তালিয়া প্রকাশনী।

ফ্লাই লিফ থেকে উদ্ধৃতি : "নায়ক হবার উপযুক্ত কোনও গুণই বিনয়ের নেই, অথচ উপন্যাসের সেই মুখ্য চরিত্র, ক্লীবতা হীনমন্যতা ভীরুতা আর অমোঘ যৌন চেতনার আবর্তসঙ্কুল ঘূর্ণিতে অশান্ত ক্লান্ত উদ্দেশ্যহীন।" সম্প্রতিকালের কিছু কিছু লেখক নিজেদের সৃষ্ট চরিত্রবিষয়ে এইসব শব্দ বহু ব্যবহারে বিরক্তি-কর করে তুলেছেন। সুভাষ সিংহ ব্যতিক্রম হতে পারলেন না দেখে দুঃখবোধ করছি। এসব শব্দ (বিশেষ করে "অমোঘ যৌন চেতনার আবর্তসঙ্কুল ঘূর্ণি"

ইত্যাদি) কি বিক্রয়ের সুবিধার্থে ? এ ধরনের 'ক্লিশে' ব্যবহারের অন্য কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। ধীরোদাত্ত নায়কের যুগ বোধহয় আমরা পেরিয়ে এসেছি। বিশেষ গুণান্বিত না হয়েও বিনয়ের নায়ক হতে বাধা আছে নাকি যে ফ্লাই লিফেই সুভাষ সে কথা আমাদের জানিয়ে রাখলেন ?

'ধূসর আকাশ' সাম্প্রতিক বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধা-সত্য আধা-মিথ্যা একটি চিত্র। সুভাষ যদি ইনিয়ে বিনিয়ে 'গল্প' লিখতেন, যেমন অনেক সাহিত্যব্যবসায়ী করে থাকেন, আমাদের কিছু বলার থাকত না। যেহেতু তিনি একটি শ্রেণীচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন—তাই একদেশদর্শিতার অভিযোগ না করে পারছি না। তিনি এই শ্রেণীর মানুষদের চরিত্রের ক্ষয়িষ্ণু দিক কিছুটা দেখেছেন, কিছুটা বা দেখেছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে। অর্থাৎ বহুশ্রুত, বহুকথিত এবং বহুপঠিত নানা ভাবনা-চিন্তা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ওপর চাপিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এদের চরিত্রে যে বিরাট পজিটিভ দিক রয়েছে, যার প্রকাশ আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, সে বিষয়ে সুভাষ প্রায় নীরব। অথচ যৌনচেতনার মতো অমোঘ (!) বিষয়, যার অমোঘত্ব নতুন করে প্রমাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আর নেই, ঘুরে ফিরে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই উপন্যাসে এসেছে, এবং এ জন্যে একটা সাফাই গেয়ে রাখার হাস্যকর প্রয়াসও দেখা গেছে শুরুতেই। এসব কথা বলার প্রয়োজন এ কারণে যে সুভাষ অঙ্ক-মেলানো গল্প লেখেননি, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু মানুষকে তাদের সমাজ-অর্থ-নৈতিক পটভূমিতে, জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে, আঁকতে চেয়েছেন। অংশত পেরেছেনও।

প্রয়োজন আরও একটা কারণে। সুভাষের দেখার চোখ আছে, অনেক সময় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয় আন্তরিকতা মনকে স্পর্শ করে। অর্থাৎ সুভাষ সম্ভাবনাহীন নন। দাঁড়কাক ধার করা ময়ূরপুচ্ছে সজ্জিত হলে তার অর্থ বোঝা যায়, কিন্তু ময়ূর যখন দাঁড়কাকের পুচ্ছ ধার করে অঙ্গসজ্জায় প্রয়াসী—তখন কি বলব ! জানি তুলনাটা বহু পুরনো, তবু আমার বক্তব্য বোধহয় এতেই পরিষ্কার হতে পারবে। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে একটা বিশেষ প্রিজমের মধ্য দিয়ে জীবনের খণ্ড, ভগ্ন, বিকৃত ছবিটা দেখার 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজীয়' প্রবণতা আর পারছে না নতুনত্বের চমকে মুগ্ধ করতে, মেকি দার্শনিকতার মুখোসটাও দ্রুত খসে পড়ছে। সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতা, সংশয়, হতাশার ছবি নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু সমগ্রতার শর্তকে পালন করে, তা নইলে একদেশদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ

গুরুতর অভিযোগও এসে পড়বে। সে অভিযোগ লেখকের ভ্রষ্টতার, শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হয়ে যাওয়ার।

সুভাষের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্যই করছি না। কিন্তু বিকৃতির মধ্যে যে অন্ধ মোহের আকর্ষণ—তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেননি। এই মোহ তাঁর আন্তরিকতাকে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন করেছে। এটা দুঃখের।

পুনরায় বলছি, প্রক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সুভাষের রচনায় প্রাধান্য পায়নি। তাঁর চরিত্রেরা 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজীয়' কৃত্রিম যন্ত্রণার শিকার নয়, তাদের যন্ত্রণা বাস্তব, দৃষ্টি-বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহ্য। প্রলোভনে যেটুকু তিনি করেছেন, সেটা তাঁর স্বভাব নয়, ব্যতিক্রম। আশা করি ভবিষ্যৎ রচনায় এই ব্যতিক্রমের প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন, পারবেন জীবনের সামগ্রিকতাকে মর্যাদা দিতে।

গল্প টেনে নিয়ে যাওয়ার হাত সুভাষের মন্দ নয়, যদিও ভঙ্গি মাঝে মাঝে বিরক্তিকর, আড়ষ্ট। শব্দপ্রয়োগে নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়, তেমনি শ্রুতিকটু প্রয়োগও কম নয়।

প্রচুর ছাপার ভুল। বানানের ভুলও বেশ কিছু, যার সবই মুদ্রণপ্রমাদ বলে ভাবা যায় না।

চিত্ত ঘোষাল

'চলাচল'-এর 'ধনপতি' গ্রেপ্তার

উমানাথ ভট্টাচার্য রচিত 'ধনপতি গ্রেপ্তার' 'চলাচল' নাট্যগোষ্ঠীর পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ নাটক। বাস্তব-অবাস্তব ঘটনার মিশ্রণে রচিত এই ব্যঙ্গরসের নাটকটিতে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মুখোশ উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে। মূল কাহিনীটি এই রকম—ধনপতি মুখার্জি ব্যবসায়ী, কালা ব্যবসার জন্য পি. ডি. অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, ছাড়া পেলেন তাঁর রাজনীতিক বন্ধু নিত্যানন্দর প্রভাবে। নিত্যানন্দ, ধনপতি ও সাঙ্গো-পাঙ্গরা—মুক্তির আনন্দে বাড়িতে একদফা পানের আসর বসিয়ে আর একটা ফুর্তির লোভে বেরিয়ে যায়। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ পেয়ে ঘটনা-ক্রমে সেই সন্ধ্যাতেই এক এক করে প্রবেশ করে ছটি চোর, যারা কোনো না কোনোভাবে পূর্ব পরিচিত। ধনপতির দেরাজ হাতড়ে তারা পায় কিছু দলিলপত্র ও কয়েক বোতল মদ। মদ্য পান চলে, চলে আত্মকথন ও এক সময় বেসামাল নৃত্যগীত। গভীর রাত্রে ধনপতি, নিত্যানন্দ এণ্ড কোং ফিরে এলে মুখোমুখি দাঁড়ায় সমাজের উপরতলার ও নিচের তলার চোরেরা। উল্টো অবস্থার প্রকোপে চোরেরা বিচার শুরু করে ধনপতির, রায় হয় মৃত্যুদণ্ড। শেষে পুলিশের আগমনে চোরেরা পালায়। নেশাগ্রস্ত ধনপতির কাছে মনে হয় সমস্তটাই কেমন যেন বিভীষিকা।

কিছুটা ফ্যাণ্টাসির লক্ষণাক্রান্ত এই নাটকের প্রথমার্ধ চমকপ্রদ, দ্বিতীয়াংশ তুলনামূলক ভাবে দুর্বল। দুর্বল এই অর্থে যে কাহিনী ও প্রযোজনাগত ভাবে তা প্রথমাংশের অনুরণন মাত্র। এই অংশে নতুন তথ্য বা চমক কিছুই প্রায় নেই বললেই চলে। তা ছাড়া শেষ দৃশ্যে নিত্যানন্দর হঠাৎ ধনপতি-বিরোধী হয়ে ওঠা নিতান্তই অযৌক্তিক। মনে হয় নিত্যানন্দকে চোরেদের জেরাব মুখে কোনঠাসা অবস্থায় ধনপতি-বিরোধী দেখাতে পারলে ভালো হত। অর্থাৎ যে পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থার ওকালতি নিত্যানন্দ করতে উঠেছে, সেই ব্যবস্থার স্ববিরোধ বা কনট্রাডিকশন জেরার মাধ্যমে বের করে আনতে পারলে সেই ব্যবস্থার নির্মোক-রূপটি দর্শকের সামনে আরও পরিষ্কার হত। তাছাড়া পুলিশের চরিত্রটির উপস্থাপনও যথাযুক্ত নয়, কেননা এই শোষণব্যবস্থায় পুলিশ তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকাও কিছু কম নয়।

এই ধরনের কিছু সমালোচনা রেখেও বলা যায় 'ধনপতি গ্রেপ্তার'-এর মূল বক্তব্য, কাহিনীর বিস্তার এবং চরিত্রের বিন্যাস অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী। বেশি ভালো লেগেছে যা তা হলো মূলত হাসির নাটক হলেও এর বক্তব্য কখনও হারিয়ে যায়নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হাসির ফাঁকে ফাঁকে তা দর্শকের মনকে ছুঁয়ে গেছে। এর জন্য অবশ্য প্রযোজনার কৃতিত্বও কম নয়। কিছুটা পৌনঃপুনিকতার দোষ থাকলেও প্রযোজনায় মোটের উপর দক্ষ হাতের ছাপ পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে কয়েকটি জায়গা, যেমন ন্যাপার দুঃখে কাতর চোরেরা খাবার দেখে যখন মুহূর্তের মধ্যে সব ভুলে খাবার নিয়ে লোলুপ কাড়াকাড়ি শুরু করে, কিংবা নিত্য ও কানাই-এর তর্কাতর্কির চরমে যখন কানাই অসহায়ভাবে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অথবা শেষ দৃশ্যে কালু যখন বিচারকের সামনে এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রোশে ফেটে পড়ে। ধনপতিরা গ্রেপ্তার হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যটি স্থির হয়ে যায়—অত্যন্ত চমকপ্রদ ও সুপ্রযুক্ত স্থির দৃশ্য।

অভিনয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'চলাচল'-এর শিল্পিদের টিমওয়ার্ক। দলগত অভিনয় নৈপুণ্যের এক উঁচুদরের নমুনা এঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেল। ধনপতির চরিত্রে যদিও বিশেষ কিছু করার নেই, তবুও রবি ঘোষের অভিনয় নৈপুণ্যে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন উমানাথ ভট্টাচার্য ও গোরা চট্টোপাধ্যায়। অত্যন্ত সংযত অভিনয়। ভোলা দত্তের কালু বেশ হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু নিমাই ঘোষের অভিনয়ে হাস্যরসের অংশ ভালো হলেও করুণ মুহূর্তগুলি ফুটে ওঠে নি। হৃষি চক্রবর্তীর অভিনয়ে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ির ঝোঁক পাওয়া যায়, যা মূল অভিনয়ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একই কথা বলা যায় রঞ্জিত দেব অভিনীত বাগচীর ভূমিকা প্রসঙ্গে। প্রথম চোরের ছোট্ট চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন তপন রায়চৌধুরী।

প্রযোজনার অন্যান্য ক্ষেত্রে মঞ্চসজ্জা যথাযথ। কিন্তু সঙ্গীত ও আলোর ব্যবহার আরও উন্নতির দাবি রাখে। তবে 'বাবা গরু এলে' গানটি অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত ও সুগীত।

পরিশেষে আবার বলব 'চলাচল' গোষ্ঠী এই অভিনব নাটকটি পরিবেশনার জন্য ধন্যবাদার্হ, আরও ধন্যবাদ এই জন্য যে তাঁরা একই সঙ্গে দর্শককে আনন্দ দিয়েছেন এবং ভাবিয়েছেন।

আনন্দ সেন

"দিন যাপনের গ্লানি' ও 'বৃষ্টি'

'শিল্প ও শিল্পী' একটি ছোট অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী। এঁদের দুটি ছোট নাটক 'দিন যাপনের গ্লানি' ও 'বৃষ্টি'। দ্বিতীয় নাটকটি প্রথম নাটকের ঘটনার পরবর্তী অংশ। বিষয়—ছোট একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। বিবাহের বয়স বিগতপ্রায় মিনুর চাকরির টাকায় সংসার চলে। তার স্বপ্ন, ভাই খোকন চাকরি পেলেই সমরকে বিয়ে করে সে সংসার পাতবে। বাবা স্কুলমাস্টার ছিলেন—একটি দুর্ঘটনার পর অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ছোট ভাই ঝন্টু কলেজে পড়ে, চঞ্চল। নাটকের শুরুতে আছে খোকনের চাকরিতে যোগ দেবার প্রস্তুতি। মিনু সমরকে ডেকে পাঠায়। বিবাহের স্বপ্ন দেখে। খোকন চাকরিতে যোগ দিতে যায়। কিন্তু দেড়শো টাকার মাইনের চাকরিতে মাইনে সে পাবে একশো টাকা—সই করতে হবে দেড়শো টাকা বলে। খোকন প্রতিবাদ করে ফিরে আসে। বাবা ভেঙে পড়েন, মা হতাশ হয়ে যান। এমন কি মিনুও বিরোধিতা করে এই সিদ্ধান্তের। কিন্তু সমর খোকনকে সমর্থন করে। খোকনের বন্ধু অরূপও খোকনকে সমর্থন করে। শেষে মিনুও। মিনু আর সমর অপেক্ষা করে, আবার কবে খোকন কাজ পাবে। 'দিন যাপনের গ্লানি' গল্প এইটুকু, সাদা-মাটা। প্যাচ বর্জিত। নাটক যদি সমাজের আয়না হয়, বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সুখদুঃখের ছবি পাওয়া যাবে নাটকটিতে। আজকাল নাটক দেখতে গিয়ে প্রায়ই দেখি কতখানি তা বাস্তবতাবর্জিত, কতটা আলোর চমক, যন্ত্রের ধমক। এ নাটকে তা পাওয়া গেলনা। পেলাম শ্রীবিপুল ঘোষের রচনা ও নির্দেশনায় একটি বলিষ্ঠ চিত্রণ, পেলাম অপরাজিত মানুষের জীবনতৃষ্ণার কিছুটা স্বাদ। খোকনের ভূমিকায় নাট্যকার বিপুল ঘোষের অভিনয় মনে রাখার মতো। শ্রীমতী স্বপ্না মিত্র মায়ের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেছেন। মিনু (চিত্রা নাথ), সমর (নরেশ ভট্টাচার্য), ঝন্টু (অরুণ মুখোপাধ্যায়), অরূপ (আনন্দময় বিশ্বাস)-এর ভূমিকায় অভিনয় চলনসই। তেমনি বাবার ভূমিকায় অসীম ভট্টাচার্যের।

নাটকের দ্বিতীয়াংশে আছে মিনুর বিয়ে হয়েছে সমরের সঙ্গে। মর্যাদা-বোধের ফলে মিনুর কাছে আর্থিক সাহায্য নিতেও মা অসম্মত। ইতিমধ্যে খোকন শয্যাশায়ী। চিকিৎসা অসম্ভব। দারিদ্র্যের গভীরে নেমেছে পরিবার। ঝন্টু গৃহত্যাগ করেছে। খবর এসেছে মিনু কিছুদিনের জন্যে বাপের

বাড়ি ঘুরে যেতে চায়। ঋণ আর পাওনাদারের তাড়নায় বাবা ক্ষিপ্ত, অভাবে স্বভাব নষ্ট হবার মুখে। এমন সময় অরূপ এলো এলাহাবাদ থেকে। ভালো চাকরি করে সে। বন্ধু খোকনকে সে দেখতে এসেছে। বাবা মা পরিকল্পনা করে—অরূপের কাছে হাত পেতে সাহায্য চাইবে। এবার নাটকে আছে দুটি ব্যাপার। দর্শককে বেছে নিতে বলা হলো, কোনটা হওয়া উচিত। দেখানো হলো টাকা চাইবার পর, অরূপের যৎসামান্য আর্থিক সাহায্যটুকু নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেমন ঘৃণ্য কাড়াকাড়িতে মেতে উঠল। মা চাইছে ছেলেকে বাঁচাতে। বাবা চাইছে পরিবার বাঁচাতে। আবার দেখানো হলো, টাকা চাইতে গিয়েও চাইতে পারলনা। সেই গুমোটে বৃষ্টি এলো। অন্তত একবার যেন নিজের আত্মসম্মান বাঁচাতে পেরেছে তেমনি আবেগে বৃদ্ধ বৃদ্ধা বৃষ্টির স্বাদ পেতে চায়।

এই দ্বিতীয় অংশে অভিনয় করেছেন বাবা (অসীম ভট্টাচার্য), মা (স্বপ্না মিত্র) ও অরূপ (আনন্দময় বিশ্বাস)। নাটকের শেষ অংশ দুটির মধ্যে প্রথম অংশটুকু অমানুষিক মনে হলেও কনভিনসিং। দ্বিতীয়টা অতখানি নয়। নাটকদুটির পরম্পরা সুগ্রথিত। তবে নান্দীপাঠের কায়দায় 'নাট্যকার' ও 'দর্শকের' মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি দীর্ঘ, বহুলাংশে অবান্তরও। বেশ সুস্থ জীবন-বোধের নাটক 'দিন যাপনের গ্লানি' ও 'বৃষ্টি'-পরম্পরা। ১৭ই জানুয়ারি 'থিয়েটার সেণ্টার'-এ 'শিল্প ও শিল্পী' গোষ্ঠী নাটক দুটি অভিনয় করেছেন।

শুভব্রত রায়

'আপন জন'

তপন সিংহ বাঙলা ছবির বাজার বোঝেন, বাঙালি দর্শককে চেনেন ; তাই তাঁর ছবি সব সময়ই ভাবাবেগে ভরপুর। 'আপন জন'ও তারই উন্নত সংস্করণ। এর শুরু থেকে শেষ অবধি কাহিনীতে ঠাসা, আর সেই শুরু থেকে শেষ অবধি ভাবাবেগে ভরা। কাহিনীও আবার একটি-দুটি নয়—চার-পাঁচটি। আনন্দময়ীর প্রথম জীবন, আনন্দময়ীর শেষ জীবন, মণ্টু-লতু উপাখ্যান, বর্তমান রবি, অতীত রবি ; তার সঙ্গে ফাউ—দুটি অনাথ শিশু।

বৃদ্ধা আনন্দময়ীকে কেন্দ্র করেই 'আজকের ছন্নছাড়া যুগের ছবি' 'আপন-জন'। আনন্দময়ীর স্বামী, নেপু, বদ্‌রাগী। রাগে তিড়িং তিড়িং করলেও কিন্তু মানুষটির মনটা ছিল নরম। কিন্তু অকালে মারা গেল সে। আনন্দময়ী পাড়াগাঁয়ের যক্ষপুরীতে একা একাই বুড়ি হয়ে গেল। শেষ জীবনে কলকাতার জল খেয়ে, 'আপনজন'দের চিনে, পরিশেষে গুলিবিদ্ধ হয়ে বৃদ্ধা মারা গেল।

এই আনন্দময়ীর চারপাশে আছে মণ্টু-লতু-বিলু, রবি-ছেনো, চুনচুন-টুনটুন এবং এক ধরনের রাজনৈতিক নেতারাও। ব্যবহার দেখে মনে হয়, ঘটনা ও চরিত্রগুলি নিয়ে পরিচালক হিমসিম খেয়ে গেছেন। তপন সিংহের চিত্রগুলি চলচ্চিত্র হয় না, হয় কাহিনীচিত্র। তিনি একটি সুন্দর রুচিসম্পন্ন আবেগপূর্ণ গল্প বলার জন্যই চলচ্চিত্র-মাধ্যম গ্রহণ করেন। গল্পটা হৃদয়কে কতখানি আন্দোলিত করতে পারল, সেই দিকেই তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। কিন্তু 'আপন জন'-এর কাহিনী অত্যধিক প্যাঁচালো করে বলতে গিয়ে গল্পে অসঙ্গতির মাত্রাধিক্য ঘটেছে।

এক বৃদ্ধাকে আজন্মের ভিটেমাটি ছাড়িয়ে আনার পক্ষে ভাগ্নে মণ্টুর এককথাই যথেষ্ট হয়! এর জন্যে আরও জোরালো সিচ্যুয়েশনের দরকার ছিল না কি? বৃদ্ধাকে যে মণ্টু-লতু 'ছেলেধরা' কাজের জন্যই এনেছে—এটা তার মনে কস্মিন কালে উদয় না হলেও, পরিচারিকার কথায় মুহূর্তে আনন্দময়ীর দিব্যদৃষ্টিলাভ হলো। মণ্টু-লতু-বিলুর সঙ্গে 'আপন জন' শব্দটি নিয়ে বার বার তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি ঐ বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় নি। তাছাড়া বহুল

উচ্চারণে 'আপন জন' শব্দটির ধারও নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বিশেষত বিলুর সঙ্গে কথোপকথনের ভাষা ও ঢং একেবারে তামাশায় পরিণত হয়েছে। মণ্টু-নতৃ-বিলুর মাধ্যমে চাকুরীজীবী মহিলাদের যে চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে, তা না সত্য না সুন্দর। বি.এ. এম. এ.পাশ করা মহিলারা আপন জনের ভান করে মাসী-জ্যেঠি ধরে এনে, চাকরি করে, সিনেমা দেখে, ফূর্তি করে! এ চিত্রে বাস্তব ভিত্তি যদি থাকে তা এত নগণ্য যে 'এ যুগের ছবি' বলে তুলে ধরা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে বলা যায় না। আনন্দময়ীর মণ্টুর বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়া অংশের ঘটনা এবং সংলাপ যেমন বাস্তবানুগ, ছায়াদেবীর (আনন্দময়ী) অভিনয়ও হয়েছে তেমনই প্রশংসনীয়। কিন্তু এইটুকুই। ভাঙাবাড়িতে আস্তানা নেওয়া বাচ্চা দুটি এবং রবির দলের সঙ্গে এক আড্ডার অংশীদার হয়ে যাওয়া এবং মৃত্যু এতই অবাস্তব আর খেলো আবেগে পূর্ণ যে একটু চিন্তাশীল দর্শকের পক্ষে অসহ্য। "মানুষটা মাঝে মাঝে রাগে তিড়িং তিড়িং করলেও মনটা ছিল নরম" সংলাপ-এর খাতিরেই বোধহয় নেপুর বিয়ের রাত্রির বীররস এবং পুকুরঘাটের করুণ-রসের অবতারণা। কিন্তু চরিত্রটির রচনায় কোনোরকম যৌক্তিকতা বা পারম্পর্য না থাকায়, দুটি অংশই হয়েছে হাস্যকর। এ দুটি অংশে চিন্ময় রায়ের এমন ব্যর্থ অভিনয়ের কারণও চিত্রনাট্যের দুর্বলতা।

চুনচুন টুনটুনই বা কী সৃষ্টি। তাদের বাপ-মা- ঘর-বাড়ি নেই, এক ভাঙা বাড়িতে একা থাকে, অথচ তারা ভালো জামা-প্যাণ্ট পরে। লেড়ো বিস্কুট আর মুড়ি খেয়ে দিন কাটায়, তবু তারা সজীব। তাদের চেহারা-বেশ-বাস-কেশ পরিপাটি। একটা লোককে পাঁচজনে মিলে মেরে রক্ত বইয়ে দিচ্ছে দেখে দুটি শিশু আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচে। রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনে চুনচুন বিদ্রূপের হাসি হাসে। এ দুটি শিশুকে দিয়ে শ্রীসিংহ কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন? শুধুই দুটি কচি মুখ দেখিয়ে দর্শক-চিত্ত জয় করা?

*মস্তান রবি সর্বদুঃখহর রবিনহুড'। অনাথ বাচ্চাদের সহায়, তাদের মুখ দেখেই বুঝতে পারে আজ কিছু খাওয়া হয়নি। চায়ের দোকান, রেশন শপ রবিবাবুর নাম করলেই সব দিয়ে দেয়। ঠাকুমার দুধ-খৈ-ফলফুল জোগান দেয়। শিশু দুটি ব্রাহ্মণ, সুতরাং ঠাকুমা তাদের সঙ্গে খেতে পারেন—সে খেয়ালও আছে। ছাত্রজীবনে পুজা-উৎসবের সুযোগে প্রেম, একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে মারামারি, রাতের আঁধারে প্রেমিকার দ্বারে টোকা দেওয়া, জেল খাটা, জুয়া খেলা, লাঠি-ছুরি-ছোটমাল-পিস্তলের যথেচ্ছ ব্যবহারের পরে, ঠাকুমা!

একদিনের একটা ছোট ভুলে সারা জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল—সংলাপের মাধ্যমে রবির প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং সহানুভূতি গভীর করতে রবির অন্যান্য কার্যকলাপের অবতারণা। তার ফলে ছেলেদের বখে যাবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাওয়া, বাবার খিটিমিটি, মা-র সন্দিহান স্বভাব। কিন্তু চিত্রে এগুলির বাস্তব ভিত্তি কিছু নেই। গুণ্ডাদলের মধ্যে আবার পক্ষপাত আছে। স্কুল-কলেজে পড়া গুণ্ডা আর না-পড়া গুণ্ডা এক নয়। ছেনো যে রবির থেকে খারাপ, তা বোঝাতে মদ এবং মেয়েমানুষসহ এক হোটেলের ঘরে তাকে দেখানো হয়েছে। রবির দলের মানু বলে—"হেন কুকাজ নেই যা আমরা করিনি," "বলব নাকি তোর সেই মেয়েটার কথা", সন্তে -"তুইও তো ভাগ চেয়েছিলি"। কিন্তু ঠাকুমা এসব বিশ্বাসই করেন না। বলেন "অনেক ভাগ্য করলে তোদের মতো ছেলে পাওয়া যায় রে" "তোদের চাঁদপানা মুখ দেখে ইচ্ছে হয় তোদের মতো একগোটা ছেলে যেন আমার থাকে।" কিন্তু এ উক্তির কারণ প্রতিষ্ঠা করার কোনো চেষ্টা করেন নি তপন সিংহ।

দুই ভোটপ্রার্থীর মাধ্যমে বর্তমান রাজনৈতিক চিত্রও আঁকা হয়েছে। এ-কালের গুণ্ডামির ওপিঠে সেকালের স্বদেশী ডাকাতের গল্প আছে, আছে এ-কালের নেতার পাশে সেকালের সি. আর. দাশ-এর বর্ণনা। রবির নিজেদেরকে 'কিং মেকার' বলে বর্ণনা করা এবং শাসকশ্রেণীর ক্রমবিবর্তন বোঝাতে হারু চক্রবর্তীর (রবি ঘোষ) উক্তি "···আমাদের সরাবার চেষ্টা করছে কারা জানো? তোমরা। গুণ্ডারা।" —জাতীয় বিভ্রান্তিকর দিগ্‌নির্দেশের ঔচিত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে।

প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যে কতিপয় কৌশল প্রয়োগ করেছেন তপন সিংহ, তা খুব সার্থক বলা যায় না। আনন্দময়ীর অতীত জীবন বর্ণনায় হরদম ফ্ল্যাশ ব্যাক-এর আতিশয্য ভালো লাগে না। জাম্পকাট-এর ব্যবহার অবশ্য আধুনিক এক পদ্ধতি, কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তি মসৃণ হয়নি। মনে হয়, দর্শককে চমক লাগানোই একমাত্র উদ্দেশ্য। নায়ক রবিকে দেখি চায়ের দোকানের ভিতরের দিকে, মুখ পত্রিকায় ঢাকা। পত্রিকা সরালে দেখা যায় চোখে রঙিন চশমা। দৃশ্যটি বিসদৃশ লাগে। স্বপ্ন দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন। চুনচুনের মনে রাজনৈতিক নেতা রাক্ষস বা দানবের রূপ নিয়েছে? বড় বেশি হাস্যকর। এ দৃশ্যটি রচনায় প্রতীকী দৃশ্যসজ্জা, একটি দুয়ার খোলা, প্রতিধ্বনিত ধ্বনি, দোলনা থেকে শট নিয়ে চুনচুনকে দোদুল্যমান দেখানো ইত্যাদি স্পষ্টতই অনুকর্ম। তাতে ক্ষতি ছিল

না যদি প্রয়োগকৌশল বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হতো। এ যেন জোর করে অভিনব ফর্ম দেখাব বলেই স্বপ্ন দৃশ্যটি দেখানো।

এ চিত্রে নতুন শিল্পীর আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। স্বরূপ দত্ত (রবি) এবং শমিত ভঞ্জ ইতিমধ্যেই নাম করেছেন। বিশেষ করে স্বরূপ দত্তর নরম নরম চেহারার মধ্যে বেশির ভাগ দর্শক তাঁদের ভবিষ্যত-নায়ক খুঁজে পাচ্ছেন। কিন্তু অন্তত এ-চিত্রে দেখলাম·· শ্রীদত্তর অভিনয়ক্ষমতা অতি সীমিত। পরিচালক-চিত্রনাট্যকার এদিকে বিন্দুমাত্র সচেতন বলে মনে হয় না। "এক দিনের একটা ছোট্ট ভুল" ইত্যাদি···বা "মারামারি করতে আর ভালো লাগে না ছেনো···" ইত্যাদি করুণরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে চোখ দুটি কোঁচকানো অসুন্দর, স্বর-ক্ষেপণ কৃত্রিম। বীর্য প্রকাশেও অক্ষমতা দেখা যায়। "ছেনো বেরিয়ে আয়··· কী তুই আসবি না···" ইত্যাদি অংশে যে গলাচিরে চীৎকার, ওটা হিম্মৎওয়ালা লোকের উপযুক্ত নয়। এ হুঙ্কারে গাম্ভীর্য থাকা উচিত ছিল। বিয়ের রাত্রের এবং পুকুরঘাটে স্বদেশী দাদার মৃত্যুর বর্ণনার দৃশ্যে চিন্ময় রায় (নেপু)-ও চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ছায়াদেবীর অধিকাংশ অভিনয়ই হয়েছে কৃত্রিম।যেমন— মণ্টু নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে "আমাকে? কোথায়?" "কলকাতায়? তোমাদের কাছে?"—এতগুলি কথার মধ্যে স্বরের বিন্দুমাত্র উত্থান-পতন নেই। মাইনে-দই-রাবড়ি প্রসঙ্গে অতি-অভিনয় ভালো লাগে না। মৃণাল মুখোপাধ্যায় (ঝণ্টু) প্রায় সব সময়, বিশেষ ভাবে প্রথম দৃশ্যে, হাত দুটির কৃত্রিম ভঙ্গি করেন। তাঁর অভিনয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ অভাব। রবি ঘোষের (হারু চক্রবর্তী) অভিনয়ে 'চ' 'ছ' 'জ' ইত্যাদির পূর্ব-বাঙলা-সুলভ উচ্চারণ সর্বদা রক্ষিত হয়নি। একমাত্র শমিত ভঞ্জ (ছেনো) তাঁর চোখমুখ-বাচনভঙ্গি দিয়ে চরিত্রটিকে সঠিকভাবে রূপায়িত করেছেন।

সঙ্গীত পরিচালনায় চিত্রের প্রয়োজনে বিশেষ ভাবব্যঞ্জক কোনো ধ্বনি বা অনুষঙ্গ-শব্দপ্রয়োগ নেই বললেই চলে। 'টাইটল'এ এবং পরে মাঝে মাঝে "কাণ্ডারী নাহিক কমলা"র সুর বেজেছে। বোধহয় থিম মিউজিক হিসেবে। ভানু ঘোষ এর (ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়) বক্তৃতার..."আপনাদের ডাকে এগিয়ে এসেছি"-কে সিনক্রোনাইজ করে কুকুরের ডাক দেওয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য বিচার করতে গেলে গোলমেলে ঠেকে। সুতরাং সুচিন্তিত কিছু নয় ভেবে ত্যাগ করাই ভালো। সঙ্গীত বলতে গান তিনখানি। তার মধ্যে "আলো আমার"-এর সিচুয়েশান শিল্পবোধবর্জিত। বাকি দুখানি সুগীত। ফটোগ্রাফির কাজ

মোটামুটি ভালো হলেও ত্রুটিশূন্য নয়। বিশেষ করে রবির মুখের শট নেওয়া এবং দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যা রচনায় আরও বিবেচনার প্রয়োজন ছিল।

ছায়াদেবীর রূপসজ্জায়, বিশেষত তাঁর চুলে, শিল্পবোধের বিশেষ অভাব। দৃশ্যসজ্জায়ও সাজানো ভাব প্রকট। ডিটেলের প্রতি পরিচালকের অপরিসীম ঔদাসীন্য। পরিচারিকার বাসন মাজা এবং তুলে রাখায় জলের ব্যবহার নেই। বাসনপত্র হাতাখুন্তি সব আনকোরা নতুন। নেপুর অভিনয় দেখতে যাবার সময় আনন্দময়ীর গায়ের শাল একালের। অনাথ চুনচুনদের ভাঙা বাড়িতে রান্নার বাসনপত্র সব আছে। রবি আনকোরা সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা খুলে, জামাপ্যান্ট না পাল্টেই শোয়। গুণ্ডারা ওরকম সম্মুখ সমর করে না। স্থানে স্থানে সময় বা স্থানের হিসেব রক্ষিত হয়নি। অনেকক্ষণ ধরে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সন্তেকে ছেনোর দল নিয়ে যায়, মানু শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দেখে, কিন্তু তাকে কেউ ধরে না। মানু কলেজ থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসলেও রবি স্টেডিয়ামে থাকবে তা জানে। বিকেলের দৃশ্যের পরে রবি যখন সন্তেকে ছাড়িয়ে আনতে যায়, তখন চড়া রোদ। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

প্রত্যেকটি মারামারির দৃশ্য, বিশেষ করে ছেনোকে মারা এবং রবির দলের মার্চ; চুনচুনদের এ্যাম্বুলেন্সের পেছনে দৌড়নোর দৃশ্য অসঙ্গতিপূর্ণভাবে দীর্ঘায়িত। বিশেষ করে ছেলেদের এক এক করে পুলিশভ্যানে তোলার সময় প্রত্যেকের ফিরে ফিরে ঠাকুরমার দিকে তাকানো মাত্রাজ্ঞানহীনতার এক চূড়ান্ত নজির।

কি সংলাপে, কি অভিনয়ে, কি দৃশ্যগ্রহণে শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দুর্লভ।

গুলিবিদ্ধ হয়ে বৃদ্ধার চোখে গাঁয়ের বাড়ি ভেসে ওঠার দৃশ্যটি রমণীয় হয়েছে।

মিন্টু রায়

কেথে কোলভিৎস-এর সাম্প্রতিক প্রদর্শনী

শেষবেলাকার রক্তিমাকাশের মতো দীপ্যমান হয়ে উঠল শীতের অন্তিম-কাল, যখন আফা গ্যালারিতে সর্বহারার শিল্পী কেথে কোলভিৎস-এর গ্রাফিক-কলা দেখলাম। গত ২২ শে থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রের বাণিজ্য-প্রতিনিধি-সংস্থা ও ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতির যুক্ত উদ্যোগে ঐ প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। কোলভিৎস-এর পরিচিতি আজ নিষ্প্রয়োজন। মনোলিথো ও মনোএচিং-এ ইনি আজও পথিকৃৎ এবং সম্রাজ্ঞী। মনে হয় যেন কোনো চার্কোল-এর স্কেচ অথবা তীক্ষ্ণ আঁচড়েব পেন্সিল স্কেচ দেখছি। প্রিন্টে এত নিখুঁত কাজ বিরল ও বিস্ময়কর, ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সালে এর বিবর্তন ঘটেছে চারটি মোটিফের কেন্দ্রে: আত্ম-প্রতিকৃতি, মা-শিশু, মৃত্যু ও শোষিত সর্বহারার সংগ্রাম। রোলাঁ লিখেছিলেন: "This woman with a bold heart has perceived this with her eyes and with her deep and tender love has taken the people into her motherly arms. She is the voice of the silent sorrow of the sacrificed people." রোলাঁর এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। প্রায় পঁচাত্তরটি একজিবিটের মধ্যে দর্শক ভুলে যান তাঁর দেশ-কাল এবং তাঁর নিপীড়িত স্বদেশের কথা। তাঁতী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, মহাযুদ্ধ, প্রালেতারিয়েতের অবস্থা প্রভৃতি নিয়ে তাঁর বহু প্রিন্ট আঙ্গিকে ও বিষয়-নির্মাণে অসামান্য। ঐ প্রদর্শনীতে সব থেকে কঠিন কাজ ছিল শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ। বস্তুত আমার কাছে তা অসম্ভবই মনে হয়েছে। অথচ কোলভিৎসকে শিল্পচর্চার জন্য আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক-এর পথ নিতে হয়নি। তিনি জীবন-যাত্রার পথ সবার নিচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন: "I want my work to be effective in my time." বিপ্লবী কার্ল লিবনেখত-এর মৃত্যুতে তিনি যে এচিংটি রচনা করলেন, তাতে শোক ও দুর্জয় দৃঢ়তাকে প্রতিবিম্বিত করলেন মৃতদেহের পাশে ঝুঁকেপড়া সার ব্যক্তির অধোমুখিন অভিব্যক্তিতে। ঐ এচিংটি সর্বকালের এক সর্বোত্তম শিল্পকর্ম। 'মা ও শিশু,' 'বিদ্রোহ,' 'মৃত্যু ও স্ত্রীলোক,' 'শ্রমজীবী,' 'রুটি,'

'দারিদ্র্য', 'মা তার শিশুদের রক্ষা করছে' প্রভৃতি এচিং ও লিথো বিশিষ্টতায় ভাস্বর। প্রিয় পুত্র পিটার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। শোকার্ত জননী তখন বিশ্বজননীর ভূমিকা নিয়ে রচনা করলেন যুগান্তকারী লিথোগ্রাফিক পোস্টার 'আর যুদ্ধ নয়'। তাঁর গ্রাফিকস-এ এক আশ্চর্য গুণ ছিল অন্যজায়গায়, অতিসূক্ষ্ম ও অল্পায়ত টোনাল সাজেশ্যান ছিল তার মধ্যে। শেষের দিকে কিছু প্লিপ্টিক ফর্মে মডেলিংও করেছিলেন। এর মধ্যে আত্মপ্রতিকৃতিও ছিল। প্রায় দশ-পনেরোটি বিভিন্নসময়ের 'আত্মপ্রতিকৃতি' দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি সংগ্রামের শরিক হয়ে যত দুঃখবরণ করেছিলেন, দৃঢ়তা ততই বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচকেরা বলেছিলেন "Clever, but concentrating on ugliness and the sordid," কিন্তু কোলভিৎস বিচলিত হননি, বরং অগ্নিস্বরূপ অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে মুক্তির অনিঃশেষ আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন।

চারুনেত্র

ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে

সাজো সাজো রব রাজনৈতিক পার্টিগুলির ছিল, ছিল যুক্তফ্রণ্টের অক্ষৌহিণী। কুরুপক্ষেও ছিল নানা সেনাপতি, ছিল মিথ্যার প্লাবন, অসত্যের ধস। শকুনি পাশার দান করে নির্ভুল ভাবে ফেলেছিল দল ভাঙানোর খেলায়, সে তখন স্বপ্ন দেখছিল, কুরুপক্ষের সঙ্গে কোয়ালিশনে মুখ্যমন্ত্রীর তক্ততাউস। অন্ধকারের শক্তিগুলি—সেই জনসংঘ, স্বতন্ত্র, আনন্দমার্গ-প্রাউটিস্ট-প্রগতিশীল মুসলিম লীগ-'আমরা বাঙালী'—সবাই সেই রণক্ষেত্রে তখন গৃধিনী-শৃগাল-হায়নার মতো লোলুপ। কোটিপতির দল, আর সাগরপারের মার্কিনী ঈগল তখন নখর আর চঞ্চু শানাচ্ছে। ঠিক তখন এসে রথের রশ্মি ধরলেন নর-নারায়ণ, জনগণ। যুক্তফ্রন্ট দেখলেন সেই মানুষ—যার অন্ত নেই, যার মধ্য নেই, যার শুরু নেই। মানুষ এবং মানুষ। ৯ই ফেব্রুয়ারি সেই অমর মানুষ কুরুকুলকে হারিয়ে দিলো। মনে পড়ল "তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছো নিজে"—এবং ইত্যাদি।

এমনটিই হবার কথা ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের নেতারাও তো এত সংখ্যাধিক্যে বিজয়ের কথা কল্পনাও করেন নি। যাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রচারের কাজে, তাঁরা জয়ের সম্ভাবনায় স্থিতধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের কল্পনাকে পরাস্ত করল বাঙলাদেশ। যে দেশ রামমোহনের, বিদ্যাসাগরের, রবীন্দ্রনাথের। "ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা, জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা"। এমন বিজয়ে সংশয় জাগিয়ে তোলার জন্য এদেশের একচেটিয়া মূলধনের পত্রপত্রিকার ভূমিকা বড় কম ছিল না। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী প্রভৃতি বাঙলাভাষার দৈনিক; স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রমুখ ইংরেজি দৈনিক—এরা যেন এক অসত্য প্রচারের বেসাতিতে নেমেছিলেন। জনগণ যেন ভোটাধিকার প্রয়োগে ব্যগ্র নয়। তারা যেন রাষ্ট্রপতির বকলমে রাজ্যপাল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার শাসন পছন্দ করছে কেউ ঢাক পেটালেন হুমায়ুন কবিরের, কেউ অতুল্যবাবুর। বসুমতী তো তার সম্পাদকের রচনা নষ্টই করে ফেললেন। যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে প্রচারের বেলুন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাঁরা দশদিক অন্ধকার করে দেবার দাখিল করলেন। কেবল

মাত্র দৈনিক কালান্তর সেই মিথ্যার আঁধির ঝড় দু-হাতে ঠেকিয়ে জনগণকে কালান্তরের পথের নিশানা দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার নকশালবাড়িপন্থী উগ্রমতাবলম্বীদের শক্তিকে বাড়িয়ে ধরলেন অনেকগুণ। বললেন, নকশাল-বাড়ির নিবাচন বয়কট ধ্বনিকে মদত দেবে এবার ভোটার। কংগ্রেসও একে তুরুপের তাস করে নিলেন। "সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ, দিনে নক্সালবাড়ি, রাতে কংগ্রেস"। রাত জুড়ে দেয়ালে দেয়ালে নির্বাচন বয়কটের পোস্টার পড়ল শহরে, গ্রামে। পাছে ভোটার ভোটকেন্দ্রে যায়, তাই আগেই ত্রাসের সঞ্চার করা হলো—রাজনৈতিক হত্যা চালিয়ে। যুক্তফ্রন্ট-কর্মীরা খুন হতে লাগলেন এখানে, ওখানে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজা-বাদশারাও বাঙলাদেশে বক্তৃতা দিতে এলেন। কি মানুষ কি মানুষ! ইন্দিরা গান্ধীকে দেখতে এসেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেখা হয়ে গেলে লোকজন ফাঁকা হয়ে গেল। কংগ্রেস দল ভাবলেন, যখন এত মানুষ প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে —তখন কি-ভোটই না কংগ্রেস পাবে; বস্তায় বস্তায়, সিন্দুকে রাখার ঠাঁই থাকলে হয়! হায়, তাঁরা তো জানেন না—সময়টা শীতকাল। এদেশে তখন সার্কাসের তাঁবু পড়ে। চাষী-বৌ স্বামীর পেছনে পেছনে শহরে আসে। সার্কাসের তাঁবুতে তারের উপর ছাতা হাতে নৃত্যপর তরুণীকে দেখে বাহবাও দেয়। ভারতের বাম-দক্ষিণের সংঘর্ষের মঞ্চে, ডান দিকে ঝুঁকেও ইন্দিরাজী কেমন ভাবে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন—সেই খেল তাঁরাও দেখতে আসছিলেন। আর টাকা। কোটিপতিদের টাকার বস্তা খুলে দেওয়া হলো যাতে পশ্চিম বাঙলায় কেন্দ্রের শাসকরা ভোটে জেতেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি কি যেন হয়ে গেল। বেলুন ফেটে চুপসে গেল।

তারপর "জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ", শোভাযাত্রা বাঙলা-দেশ জুড়ে। গ্রামে শহরে, পাড়ায় পাড়ায়, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আর রাতারাতি কোটিপতিদের সংবাদপত্রগুলির ভোল বদল হলো। প্রসাধনের তলায় তাদের বয়স্কা বারাঙ্গনার বলিরেখা, হাসিমুখের পেছনে তাদের বাঁকা ছুরির মতো শ্বা-দন্ত, আর ভদ্র আচরণের আস্তিনের তলায় লুকনো লোলুপ বিছুয়া। এদের আমরা চিনি—কিন্তু এদের জানি কতটুকু! যুক্তফ্রন্টের জয়ের গৌরবের তারাও যেন অংশীদার—এমন ভোল নিয়ে, যুক্তফ্রন্টের এক শরিকের সঙ্গে আর-এক শরিককে লড়িয়ে দিতে চাইল এই ভাঁড়ু দত্তর দল। কাউকে অহেতুক হাততালি দিয়ে, কাউকে একেবারেই উল্লেখ না করে,

তারা মানুষের ভাবাবেগের দুর্বল স্থানগুলিতে নাড়া দিতে চাইল। তারপর যাদের দীর্ঘকাল দেখা গেছে যুক্তফ্রন্টের শত্রু, এমনকি মার্কিনী তাঁবেদার হিসেবে; তারাও যুক্তফ্রন্টকে এই করতে হবে ঐ করতে হবে বলে নানা আবদার জানাতে শুরু করল। রাজ্যগত অবস্থানের ফলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে যেসব কাজ-কর্ম করা অসম্ভব—আর্থিক ও বর্তমান-রাষ্ট্রগত সংগঠনের দাক্ষিণ্যে—সেসব কিছু করার জন্য আওয়াজ তোলা হচ্ছে। জনগণের মধ্যে অকারণ অতি-আশার সঞ্চার করা হচ্ছে। অর্থাৎ, কিছুদিন পরেই যাতে আশাভঙ্গের কথা তুলে যুক্তফ্রন্টকে কায়দা করা যায়! যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ অবশ্যই বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেই তাঁরা কাজ করবেন। যে যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ আছে, সেই সুযোগগুলির তাঁরা সদ্ব্যবহার করবেন। বলছেন, মূল শক্তির কেন্দ্র পার্লামেণ্ট। সেখানে কংগ্রেসদল এখনও সংখ্যা-গরিষ্ঠ। একথা জনগণকে বুঝতে হবে। কিন্তু ভুল বোঝাচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির সেবক ব্যবসাদার সংবাদপত্রগুলি। ভুল বোঝাচ্ছে, তাদের ফিসফাস প্রচার। জয়ের শিবিরে এইভাবে চলেছে প্রতিক্রিয়ার চোরাগোপ্তা আক্রমণ।

যুক্তফ্রন্টের বিজয় সম্ভব হলো কেন? কংগ্রেসী কুশাসন তো বটেই—কেউ কেউ এমনও বলছেন, অগণতান্ত্রিকভাবে তাড়াহুড়ো করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে ক্ষমতার লোভে প্রথমে সংখ্যালঘু, পরে কংগ্রেস-পি. ডি. এফ. কোয়ালিশনের গঠন সাধারণ মানুষের নৈতিকবোধ ও ভাবনাকে ধাক্কা দিয়েছিল। তাই এবার কংগ্রেস হেরেছে, ধরাশায়ী হয়েছে দলত্যাগী বাঘা বেইমানরা। এ জয় বাঙলার নৈতিক শক্তির। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পুরো সত্য নেই। সত্য আছে যুক্তফ্রন্টের রাজনীতির মধ্যেই নিহিত। তাহলে যুক্তফ্রন্ট কি, সেটাই বুঝতে হবে।

যে যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গে ধরাশায়ী করেছে, তা প্রথমত বারোটি ছোটবড় রাজনৈতিক দলের ও কয়েকজন প্রগতিশীল ব্যক্তির যুক্তফ্রন্ট। তা ছাড়া পুরুলিয়ার লোকসেবক সঙ্ঘ তো বটেই, কয়েকজন প্রজাসমাজতন্ত্রী প্রার্থীও যুক্তফ্রন্ট-সমর্থিত ছিলেন। যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার দলগুলির ঐক্য কেবল নির্বাচনিক নয়। কেবল কংগ্রেসকে পরাজিত করে যেমন তেমন একটি এলোপাথারি ঐক্যের সংগঠন যুক্তফ্রন্ট নয়। বত্রিশ দফা কর্মসূচি তাঁদের ঐক্যের ভিত্তি। এই কর্মসূচি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, মধ্যশ্রেণী ও ছোট শিল্পপতির স্বার্থের কথা এতে আছে। খেটে খাওয়া

মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে সঙ্কল্প প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া উপজাতিক স্বার্থ—যা দীর্ঘকাল কংগ্রেসী শাসনে অবহেলিত হয়েছে, তাও রক্ষা করার প্রয়াসী এই যুক্তফ্রণ্ট। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সপক্ষে রয়েছে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচির সূত্রেই যুক্তফ্রণ্টের ঐক্য গ্রথিত। মনে রাখতে হবে, যে-রাজনৈতিক দলগুলি এই যুক্তফ্রণ্টের কুশীলব—তাঁরাও কোনো না কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধি। একচেটিয়া মূলধনের দাপট ও সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মার্গের প্রগতিশীল শ্রেণী—বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই যুক্তফ্রণ্টে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে—মূল শত্রুর বিরুদ্ধে এই শ্রেণীগুলির ঐক্য সাধিত হলেও, শ্রেণীগত বৈরিতাও স্বার্থের সীমাবদ্ধ জগতে সংঘর্ষও আনতে পারে। তাই এই ফ্রণ্টকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। আপাত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে শ্রেণীগুলিকে অনেকখানি। মূলশত্রুর বিরুদ্ধে সংহতি বজ্রকঠোর করে গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের বন্ধু একচেটিয়া মূলধন অত সহজে পরাজয় মানবে না। নিত্যনতুন তাৎপর্যে তাদের চক্রান্ত চলবে। এতটুকু দেশ ভিয়েৎনামে যারা অমানুষিক আক্রমণ চালাচ্ছে, তাদের আন্তর্জাতিক চক্রান্তের রণক্ষেত্রের ভেতরেই আছে ভারতভূমি। তীব্রতম সংঘর্ষ গড়ে উঠতে পারে এখানেও। তাই নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে এ রাজ্যে যে-ফ্রণ্ট গড়ে উঠেছে, তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা ভারতে বিভিন্ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে। ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বশেষ ক্ষমতা দখলের শেষ সংগ্রাম পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে রেখে। আর এ-দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ছাড়া কে বেশি পালন করতে পারে! তাদেরই বিশেষ দায়িত্ব এই মোর্চা গড়ে তোলার। ঔদ্ধত্যের উগ্র নিঃশ্বাসে যেন ভারতের আশার প্রদীপটি নিভে না যায়!

মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়ার কোমর ভেঙে গেলেও, সে মৃত নয়। মনে রাখতে হবে, এখনও পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর ভেতরে তার প্রভাব আছে। এবারও তারা প্রদত্ত ভোটের প্রায় চল্লিশ শতাংশ পেয়েছে। এমন নিষ্ঠা ও সচেতনতার মধ্যে যুক্তফ্রণ্টকে এগোতে হবে, যাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি তাকে কখনও নিজের অজানতে কায়দা করতে না পারে। মনে রাখতে হবে, উত্তর ভারতে বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তির অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে উত্তর প্রদেশে ও বিহারে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়েও মন্ত্রিসভায় ফিরে এসেছে। তবে,

জাগরণ ঐসব রাজ্যেও শুরু হয়েছে। তার প্রমাণ উত্তর-প্রদেশে জনসংঘের শক্তি হ্রাস ও কংগ্রেস দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পাওয়া। বিহারেও জনসংঘ যে সাফল্য আশা করেছিল, বিশেষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির লড়াইয়ের ফলে তা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবে সঙ্কীর্ণতাবাদীরা তক্তে বসেছেন। পশ্চিম বাঙলার পথ এখন ভারতের পথ। সে পথ বন্ধুর। প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থান-পতনের পথে একমাত্র ঐক্যের শক্তি আজ প্রগতিশীল যুক্তফ্রণ্ট।

কেন্দ্রেও যুক্তফ্রণ্ট সরকার গড়তে হবে—সেই আদর্শে কদম বাড়াতে হবে এখনই। এখন লক্ষ্য, যুক্তফ্রণ্টকে শক্তিশালী করা। আমাদের লক্ষ্য—চলো দিল্লী।

তরুণ সান্যাল

রক্তকরবীর মহড়া

যেন তাদের কেউ বরযাত্রীর নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসেছে। চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশ যে-ড্রামটার ওপর দাঁড়িয়ে দিনভর মানুষজনকে ডান-বাঁ শেখায়—তার ঠিক মধ্যিখানে একটা ফুটো আবিষ্কার করে, সেই ফুটোর মধ্য দিয়ে লাল-ঝাণ্ডার ডাণ্ডাটা সেঁধিয়ে, বার কয়েক গলা ফাটিয়ে ইনকিলাব আর যুক্তফ্রণ্টের জিন্দাবাদ দিয়ে তারা দঙ্গল বেঁধে আব্দার ধরে বসল—গাড়ি দাও, বাস বা ট্রাক, এখুনি চার দিকের সব গ্রামে এই খবর পৌছুতে হবে– আমরা জিতেছি, জলপাইগুড়িতে বিধানসভার সবচেয়ে পুরনো সভ্য কংগ্রেসের খগেন দাসগুপ্তকে হারিয়েছি; আর তামাম বাঙলায় একটার পর একটা আসন জিতে নিচ্ছি। এখুনি খবর পৌছুতে হবে, আমরা জিতছি। রাত দুটোয় খাঁ খাঁ চৌরাস্তায় হাঁকাবার জন্য গাড়ি চাই, বাস বা ট্রাক। আর সেই আব্দারের গাড়ি-ঘোড়াকে ডান-বাঁ বাতলাবার জন্য ট্রাফিক-ড্রামের মাথায় লাল পাগড়ির বদলে লালঝাণ্ডাটা অতগুলো মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাসেই যেন মৃদুমন্দ দুলছিল। পুলিশের পায়ের তলায় লালঝাণ্ডা সিঁধোবার মতো এত বড় একটা ফুটো ছিল—কে জানত!

যেন তাদের কেউ বরযাত্রীর নেমন্তন্ন করে এনেছে। অথচ সেই সকাল সাড়ে নটা থেকে ভোটগণতির শুরুতেই পায়ে পায়ে বারো-চোদ্দ-পঁচিশ-তিরিশ মাইল দূর থেকে লোক এসে জুটেছে জলপাইগুড়ির সদর কাছারিতে।

তারপর কংগ্রেসের বারোটা বাজার পর রাত বারোটায় কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করে পথ হেঁটেছে। পুরবাসীর ঘুম টুটে গেছে। অকাল ভোর। কাকলিতে নয়। কলগানে, শ্লোগানে। তারপর আব্দার—গাড়ি দাও, এখুনি খবর পৌছুতে হবে, আমরা জিতেছি।

গাড়ির কোনো পাত্তা হওয়ার ভাব নেই বুঝে তারা হাঁটা দিলো—বারো-চোদ্দ-পঁচিশ-তিরিশ মাইল পথ পেরুতে। চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশের ড্রামের মাথায় লালঝাণ্ডাটা যেন রাতটাকে মাথায় করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কদিন ধরে দিনরাত ঝাণ্ডাটা ওখানেই ছিল। ট্রাফিক পুলিশের সাধ্য হয় নি, ওর গায়ে হাত দেয়। ঝাণ্ডাটার নিচে মাটিতে দাঁড়িয়ে পুলিশ একবার ডানহাত, একবার বাঁহাত তুলে পথ বাতলাবার ভড়ং দেখিয়েছে। আর, রসিকতা করতেই যেন ঝাণ্ডাটা দুলে দুলে মাঝে মাঝেই পুলিশটার নাক-কান মলে দিয়েছে।

ঝাণ্ডার ওপর পুলিশকে সঙ সাজাবার বরাত দিয়ে যে মানুষগুলো রাত পেরুতে রওনা দিয়েছিল—তারা কোন পর্যন্ত এই খবর পৌছে দিয়েছে: আমরা জিতেছি, জিতছি? এই এলাকাটার, বস্তুত সারাটা পশ্চিমবাঙলার চারপাশেই তো পূর্ববাঙলা। সীমান্তের লাইন থেকে দু-তিন মাইল এলাকায় সন্ধ্যা থেকে সকাল কারফিউ থাকে। সূর্য ডোবার আগেই হাট ভেঙে যায়। ভোটের মিটিঙ এমন সীমান্ত এলাকায় করা বারণ। ভোটের আগে আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মীকে ফাঁড়িতে এনে সীমান্ত পুলিশ প্রায় ঠেঙিয়েছে—তাঁরা নাকি পাকিস্তানের দিকে মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন, সব কথা নাকি পাকিস্তানের লোক শুনে ফেলেছে। বাঙলায় শ্লোগান দিলে পূর্ববাঙলার লোক শুনতে পায়। চারপাশের এমন অজস্র সীমান্তের ধারেকাছে গিয়েই কি সেদিনের সেই বিজয়বার্তা—আমরা জিতেছি, আমরা জিতছি—থেমে গিয়েছিল! নাকি এপার থেকে হাঁক দিয়ে ওপারকে জানিয়েছে—আমরা জিতছি!

পরদিন, ১২ ফেব্রুয়ারি, সকালে রেডিয়ো খুলে খবর শুনলাম—আমরা জিতছি, জিতছি। আর, ঢাকায় বারো হাজার মহিলার মিছিল তার আগের দিন, ১১ ফেব্রুয়ারি, আয়ুবশাহিকে ধিক্কার জানিয়েছে। আরো খবর জানতে তাড়াতাড়ি ঢাকা ধরলাম। সংবাদের বদলে রিনরিন করে বেজে উঠল সবচেয়ে বড় সংবাদ—রবীন্দ্রসঙ্গীত। মাত্র দুদিন আগে, ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা রেডিয়োতে আবার রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে দিতে হচ্ছে। ১০ ফেব্রুয়ারি

সোমনাথ লাহিড়ী আর জ্যোতি ভট্টাচার্যের জয়ে আমরা যখন মিছিলের শহরে মিছিলে, ঢাকা রেডিয়োতে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের নবজন্ম। ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবাঙলার মহকুমা শহরগুলিতে যখন ভোট গণতিকেন্দ্রের বাইরে হাজারে হাজারে আমরা সংহত মিছিল, তখন ঢাকায় হাজারে হাজারে মা-বোন বহতা মিছিল। ১১ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ি শহর থেকে রাত দুটোয় আমরা জিতেছি খবর নিয়ে দশ-বারো-পঁচিশ-তিরিশ মাইল পেরুতে মানুষজন রওনা দিয়েছিল। তেমনি পূর্ববাঙলা থেকেও আমরা জিতছি খবর নিয়ে মানুষজন রওনা দিতে পারত। এখন তো দুই খণ্ডেই আমরা জিতছি!

ফেব্রুয়ারিতে পূর্বপশ্চিমে সর্বত্রই বাঙলাদেশটাকে মিছিলে পেয়েছে। সব মিছিলেই শ্লোগান, সব শ্লোগানই বাঙলায়। ঢাকা আর কলকাতার গান আর শ্লোগানের একটাই ভাষা—বাঙলা। বাঙলায় গান গাইতে গাইতে, বাঙলায় শ্লোগান হাঁকতে হাঁকতে, সারাটা ফেব্রুয়ারি জুড়ে এই বাঙলা—পুব-পশ্চিম-মেলা এই গোটা বাঙলা—মিছিলে মিছিলে পথ পেরিয়ে পেরিয়ে সেই অবধারিত তারিখটাতে এসে দাঁড়াল। ২১ ফেব্রুয়ারি। বাঙলাদেশের ইতিহাসে, ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কোনো স্তরে এর চাইতে উজ্জ্বল দিন আর নেই। পৃথিবীতে এমন কি কোনো ভাষা আছে, যার জন্য বুক ঢেলে রক্ত দিতে হয়েছে? কে জানত সেই পুণ্যতম দিন পতাকায় পতাকায় এত বড় মিল আনবে—এ-বছর। এ-বছর ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পশ্চিমবাঙলায় যুক্তফ্রণ্টের নেতা ঘোষিত হলেন। যুক্তফ্রণ্ট ২১ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভা গঠন করার পথে এগিয়ে গেল বাহান্ন সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যাঁরা ভাষার দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, ছাপ্পান্ন সালে বাঙলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলকাতায় ও অন্যত্র যাঁরা জেল আর লাঠি-গুলি বুক পেতে নিয়েছিলেন—তাঁরা এই গত প্রায় বিশ বৎসর ধরে একটা বাঙলাদেশকে ভেতরে ভেতরে লালন-পালন করেছেন। এবারের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙলার দুই খণ্ডেই সেই সবার মনের বাঙলার জন্মের যেন সূচনা।

·

অথচ দুই খণ্ডেই শত্রুর শক্তি কী প্রচণ্ড। পশ্চিমের বাঙলায় দেশীবিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা। তাদের বশংবদ কেন্দ্রের কংগ্রেস। তার মহাজন আমেরিকা। ভিয়েতনামে লাথি খেয়ে আমেরিকা কি ভারতকে আজকের পশ্চিমবাঙলার পথে যেতে দেবে? তার আগে রক্তাক্ত নখদন্ত বের করবে না?

পুবের বাঙলায় একদশকী স্থায়িত্বের আইয়ুব খাঁ। তার পেছনে আমেরিকা-মহাজন। ভিয়েতনামে লাথি খেয়ে আমেরিকা কি পাকিস্তানকে গণতন্ত্রের পথে যেতে দেবে? তার আগে রক্তাক্ত নখদন্ত বের করবে না? কিন্তু দেবার মালিক তো আইয়ুব খাঁও নয়, ইন্দিরা গান্ধিও নয়, আমেরিকাও নয় "তোমার টানাটানি চলবে না আর হবার যেটা সেটাই হবে।" আর হওয়াবার মালিক হচ্ছে মানুষ। দুইবেলা খেতে পাওয়া না-পাওয়া দুই হাত দুই ঠ্যাঙ-ওয়ালা আস্ত আস্ত মানুষ। সেই গোটা মানুষগুলো ভারতবর্ষে—তার মানে ভারতীয় ইউনিয়ন আর পাকিস্তান—আজ পথে। সেই ভারতবর্ষকে পথ বাতলাচ্ছে বাঙলাদেশ, তাব মানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আর পূর্ব পাকিস্তান। উভয় জায়গাতেই প্রধান শত্রু এক ও অভিন্ন—আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ। তাই দুই জায়গার লড়াইটা কায়দাকিসিমের নানা রকমফের সত্ত্বেও গোটা মানুষগুলিকে নামিয়ে দিচ্ছে পথে। মিছিলে। শ্লোগানে।

মিছে কথা বলে লাভ নেই। বাঙলাদেশ ভাগাভাগি হওয়ার পর দুই খণ্ডের মধ্যে যোগাযোগ প্রধানত আবেগের। যুক্তির নয়। অবস্থার বা ঘটনার সাম্য তো নয়ই। বরঞ্চ অবস্থা আর ঘটনার ফারাক দুই খণ্ডকে আরো গভীর খণ্ডিত করেছে। কিন্তু এখন এই প্রথম দেখা যাচ্ছে বাঙলার দুইখণ্ড লড়াইয়ে নেমেছে একটিমাত্র প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে। সুতরাং বাঙালির জাতীয় ভাবনার পক্ষে এ এক পরম লগন। সেই বাঙালিভাবনা যদি এ-লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে বাঙলার দুই টুকরো মনেমনে এক হয়ে যাবে যাবেই। মনে মনে যদি এক হয়ে যায় দুই খণ্ডের বাঙালি, ও তার নেতৃত্বে থাকে ভারত আর পাকিস্তান, তবে ইতিহাসে পাতা ওলটাবার সময় এসে যাবে। সেদিন আর আলাদা আলাদা ভাবে জিত নয়—একসঙ্গে জিত, আ—ম—রা জিতছি। তাই সারা বাঙলা জুড়ে রক্তকরবীর মহড়া চলেছে…

২২ নভেম্বর ৬৭-র ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে যক্ষপুরীর সর্দাররা ধ্বজাপূজায় মেতেছিল। যুক্তফ্রণ্ট কর্তৃক আহূত জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন বিশ্বনাথ মুখার্জি, অমর চক্রবর্তী, অরুণ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। চব্বিশ ঘণ্টা আগের মন্ত্রীদের ওপর পুলিশ লাঠিসোটা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যেন শিকারের উপর খ্যাপা কুকুর। আহত রক্তাক্ত বিশ্বনাথ মুখার্জি মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত তুলে আকাশ-ফাটানো চীৎকারে বলে উঠেছিলেন—"আমাদের মারতে পারবে না, আমরা আবার ফিরে আসব"।

বাঙলার দুইখণ্ডেই যক্ষপুরীর সর্দাররা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আরো বহুবার। প্রতিবার মার ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রতিবার ফিরে আসতে হবে। কারণ "রঞ্জন বেঁচে উঠবে,—ও কখনো মরতে পারে না।"

এই মৃত্যুঞ্জয়ী লড়াইতে বাঙলার দুইখণ্ড সামিল হয়ে "বাঙলা" হয়ে উঠবে। ওপারের পৌষ সেই পাকা ফসলের ডাক দিয়েছে। পুবের আর পশ্চিমের দুই-খণ্ড জুড়ে তো পাকা ধানের একই সোনারঙ। ধানিরঙে "বাঙলা" নন্দিনী।

"নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী,"

"না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের ওপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব।"

"একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে মনে ভাবি"

নন্দিনী আমার বাঙলা—

দেবেশ রায়

একশো বছর পরে মনোমোহন ঘোষ

এ বছর উনিশে জানুয়ারি কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের জন্মের শতবর্ষ পূর্তি হলো। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র মনোমোহন শ্রীঅরবিন্দর জ্যেষ্ঠাগ্রজ ছিলেন। উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত পরিবারগুলির মধ্যে ঘোষ পরিবার ছিল অন্যতম। পশ্চিমী ভাবধারা সম্পর্কে তাই মনোমোহনের সহজাত আকর্ষণ ও প্রবণতা ছিল। মাত্র দশ বছর বয়েসে তিনি বিলাত যান এবং ছাত্রাবস্থাতেই ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে রসজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'প্রিমাভেরা' নামে কাব্য সঙ্কলনের চারজন কবির তিনি ছিলেন অন্যতম। কবি তখনও অক্সফোর্ডের ছাত্র।

স্বদেশে ফিরে মনোমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। কবিত্ব, মার্জিত আচরণ ও বিদ্যাবত্তা তাঁর পঠনধারাকে সহস্র সহস্র ছাত্রের অতি প্রিয় করে তুলেছিল। কিন্তু ইংরেজিমনস্কতা ও স্বদেশী ধ্যানধারণার মধ্যে বৈপরীত্য তাঁর অনেক সময়েই ঘোচেনি। বহু-জনের মধ্যেও তাঁকে তাই একেলা হতে হয়। তাঁর জীবৎকালে তিনটি ছোট কাব্যসঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল। মৃত্যুর পর লরেন্স বিনিয়ন-এর সম্পাদনায় তাঁর

একটি নীতি-কবিতার সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালে তিনি ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করেন। ইংরেজি কবি-মনস্কতার ফলে ভারতীয় কবির স্বদেশে একাকীত্ব এতে হয়তো অনেকখানি কমত। কিন্তু ১৯২৪ সালের চৌঠা জানুয়ারি তিনি হঠাৎ মারা যান। ১৯৩৮ সালে মনোমোহনের কন্যাগণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেফাজতে তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমস্ত রচনার গ্রন্থস্বত্ব ও পাণ্ডুলিপি অর্পণ করেন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রিমাভেরা' (চারজন কবির মধ্যে অন্যতম), 'লাভ সং এ্যাণ্ড এলিজিস', 'দ্য গারল্যাণ্ড', 'সংস অব লভ এ্যাণ্ড ডেথ' (লবেন্স বিনিয়ন কর্তৃক সম্পাদিত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কমপ্লিট ওয়ার্কস অব মনোমোহন ঘোষ' প্রকাশ করছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধন-প্রয়াসী কবি মনোমোহন ঘোষের কবিতা-বিষয়ে ১৮৯০ সালে'পল মল গেজেট'-এ অসকার ওয়াইল্ড লিখেছিলেন, "তাঁর কবিতাগুলি···ইঙ্গিত দেয়—বাণিজ্য ও সামরিক শক্তিতে নয়—অন্য কোনো ধারায় ভারতের সঙ্গে আমাদের অন্যতম বন্ধন সুদৃঢ হয়ে উঠবে।" ইয়েটস তাঁর 'সং অব লাভ এ্যাণ্ড ডেথ' পড়ে লিখেছিলেন "যখন হঠাৎ এ রকম শব্দাবলী Your heart/Cradles august the pain/ The ancient primal woe of man/And aches to mother cain' পড়ি, দুটি চোখ আমার জলে ভরে যায়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আমি এ ধরনের মহিমা দেখতে পাই।" 'পরিচয়'-এর বিশিষ্ট লেখক, লোকান্তরিত অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় মনোমোহন ঘোষের শিক্ষণ-প্রণালী সম্পর্কে একদা লিখেছিলেন "কলকাতায় যখন অধ্যাপক ঘোষ কবিতার উপরে বক্তৃতা দিতেন ইওরোপীয় সংস্কৃতির বিপুল ও বর্ণাঢ্য জগত তাঁর মনের চোখের সামনে খোলা পড়ে থাকত।···একই সময়ে তিনি কবি এবং ধ্রুপদী সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন বলে বিষয়-বস্তুর একেবারে গভীরে প্রবেশ করার প্রত্যক্ষ সুযোগ ছিল তাঁর। ফলে, তাঁর ক্লাসে কবিতা কেবলমাত্র এ্যাকাডেমিক বিষয় হয়ে পড়ত না; হয়ে উঠত জীবন্ত সত্য।" পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোমোহনের ছাত্র ও

অনুরাগীর সংখ্যা এখনও খুব কম নেই। শ্রীমনোমোহন ঘোষের একটি কবিতার কথা আজ মনে পড়ছেঃ

একশো বছর। শব্দ ব্যঞ্জনায় অযুত কবর,' করে তা উন্মোচিত
তিন প্রজন্ম ওটুকু সময়ে যায় দূর প্রেত, যারা নিঃশ্বাস নিত, মৃত।
সময় ঝাঁকায় বালুঘড়ি পিছলাই খসছি আমরা মানববালুকা ধারা
ব্যর্থ একক পরমাণু, ঝরে যাই নাম ও স্মরণ থেকে। খেলা কিছু সারা,
দৈব ফসল কাটার হাঁসুয়া তার পলকা প্রজাতি শবাধারে ফোটে ফুল
মানুষ হা ক্ষীণ আপন অন্ধতার ভেতরে কি পায়, ভালোবাসা একচুল
কঠিন ফসল কাটুনির কাছে কই জোটে না, ঊর্ধ্ব' ঈগল পায় না জানি
অসীম দাহের একটি কণিকা বই বস্তুপুঞ্জ প্লাবনে নৌকাখানি
ভাসায় মানুষ, ছোট্ট সত্তালোক বৃথা ওড়ায় না, সন্ততিদের পথে
আরো উত্তর-সন্ততিদের চোখ পড়ে যাতে গড়ে তরণী ভবিষ্যতে।

ইকবাল ইমাম

কেথে কোলভিৎস

আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভ্যান গগ, রেনোয়া, পিকাসো, ব্রাক ইত্যাদির শিল্পকর্ম নিয়ে মাঝে মধ্যে আলোচনা হচ্ছে—এটা ভালো কথা। কিন্তু যাঁর সম্পর্কে তেমন কোনও আলোচনা এখনও আমার চোখে পড়েনি, তিনি হলেন আধুনিক জার্মানির সম্ভবত সবথেকে নামী শিল্পী শ্রীমতী কেথে কোলভিৎস (জন্ম : ৮ই জুলাই ১৮৬৭ সাল, মৃত্যু : ২২শে এপ্রিল ১৯৪৫ সাল)।

শ্রীমতী কোলভিৎস বিয়ে করেছিলেন ডাঃ কার্ল কোলভিৎসকে। ডাঃ কোলভিৎস-এর রোগীরা ছিলেন অধিকাংশই গরীব ঘরের লোক। এই গরীব মানুষদের সান্নিধ্য শিল্পী কোলভিৎস-এর চোখ খুলে দিয়েছিল। এবং ভবিষ্যৎ শিল্পীজীবনে এরাই হয়ে উঠেছিল তাঁর শিল্পের বিষয়।

নাট্যকার গেরার্ট হাউপ্টম্যান-এর 'তাঁতী' নামক নাটকটির থেকে প্রেরণা লাভ করে কোলভিৎস রচনা করেছিলেন 'তাঁতী বিদ্রোহ' চিত্রমালা। ১৮৯৮ সালের মাঝামাঝি সময় বার্লিনের এক প্রদর্শনীতে এই চিত্রমালাটি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আর সম্ভবত এই একটি চিত্র প্রদর্শনীই তাঁকে পরিচিত করে তুলতে পেরেছিল। তারপর ১৯১৫ সালের সমসাময়িককালে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'কৃষক বিদ্রোহ' চিত্রমালাটি। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এই 'তাঁতী বিদ্রোহ', 'কৃষক বিদ্রোহ' জাতীয় শিল্প-চিন্তা একটা মোড় নিল। বিশ্বযুদ্ধের অর্থহীন প্রাণহানি, যুদ্ধের ভয়াবহতা, যন্ত্রণা···তাঁর শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুকে যুদ্ধবিরোধী করে তুলেছিল। তিনি তাঁর এই সময়কার ছবিগুলির নাম দিলেন 'যুদ্ধ'। এই 'যুদ্ধ' সিরিজের মধ্যে শিল্পগত কাজকর্মের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলো 'জনসাধারণ', 'মা', 'যারা বেঁচে থাকল', 'স্বেচ্ছাসেবক' ইত্যাদি চিত্রগুলি। কোলভিৎস তাঁর শেষ উল্লেখ্য চিত্রকর্ম উপস্থিত করেছিলেন ১৯৪৩ সালে। এই চিত্রমালাটির নাম দিয়েছিলেন 'মা তার সন্তানদের বাঁচাতে চাইছে'।

কোলভিৎস ছিলেন মূলত গ্রাফিক শিল্পী। তাঁর সব চিত্রমালাই কাঠ-খোদাই, এচিং, লিথোগ্রাফ ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত। কালো আর সাদা দুটি বিপরীত রং তাঁর চিত্রমালাগুলির বক্তব্যকে প্রকাশ করতে বেশ সাহায্যই করেছিল। সমস্ত ধরনের বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য তিনি মানুষের দেহকেই ব্যবহার করতেন বেশি। যে মানুষ খেটে খায়, যে মানুষ আবার প্রতিবাদ করতে জানে, যে মানুষ যুদ্ধের শিকার হয়—তারাই তাঁর শিল্পের বিষয় ছিল। তাঁর আঁকার প্রত্যেকটি টানই ছিল মূল্যবান। কোথাও খুব ঘন করে তুলির টান দিয়ে আবার কোথাও একেবারেই তুলির টান না দিয়ে তিনি বিষয়বস্তুকে বেশ সহজভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। যুদ্ধের বীভৎসতার দিকটাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ছবির মানুষদের মুখগুলো হয়ে উঠেছিল একদিকে ভয়ার্ত আবার অপরদিকে ক্ষুব্ধ। তাঁর আঁকা মানুষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের মুখে এবং হাতে। আঁকা হাতগুলো প্রধানত হতো বলিষ্ঠ, আবার কোথাও কোথাও অতিমানব ধরনের। কোলভিৎস নিজে মহিলা ছিলেন বলেই সম্ভবত তাঁর আঁকার মধ্যে মাতৃস্নেহ অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে বর্তমান। 'মা তার সন্তানদের রক্ষা করতে চাইছে', 'মা ও তার সন্তান', 'খিদে পেয়েছে' ইত্যাদি ছবিগুলোতে এই মাতৃস্নেহ আবার ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া শিশুর সরল সহজ মুখ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবকে প্রকাশ করেছে। কখনও এই শিশুরা ক্ষুধার্ত, কখনও মাতৃস্নেহে গদগদ, আবার কখনও বা তারা বীভৎসভাবে চেয়ে আছে বাইরের জগতের দিকে।

ভাস্কর্যেও কোলভিৎস-এর দক্ষ হাত ছিল। তাঁর ভাস্কর্যগুলি অধিকাংশই স্তম্ভভিত্তিক। অবশ্য চিত্রশিল্পে তাঁর যেরকম খ্যাতি ছিল বা চিত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে তাঁর যেরকম একটানা জীবন ছিল—ভাস্কর্যকে কেন্দ্র করে সেরকমটি

ছিল না। তাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে সবথেকে উল্লেখ্য হিসেবে যেটিকে ধরা হয়ে থাকে, অধিকাংশ সমালোচকের মতে সেটি হলো তাঁর ছেলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত ভাস্কর্যটি। ১৯৩২ সালে রোগ সভেল্ড-এর মৃত সৈনিকদের কবরস্থানে তিনি সেই ভাস্কর্যটি উপস্থিত করেছিলেন। সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই ভাস্কর্যটির বিষয়বস্তু হলো: হাঁটুমুড়ে পাশাপাশি বসে থাকা ভঙ্গিতে দুটি স্ত্রী-পুরুষ, অর্থাৎ তারা বাবা ও মা। অনেকেই বলে থাকেন যে ঐ মায়ের মুখটি কোলভিৎস-এর নিজেরই বিষণ্ণ মুখ।

কোলভিৎস তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ের শিল্পীজীবনে বেশ সম্মান পেয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে তাঁকে শিল্প একাদেমির সদস্যা করা হয়। ১৯২০ সালে তিনি হন একাদেমির অধ্যাপিকা। ১৯২৮ সালে স্টুডিওর অধ্যক্ষাও হয়েছিলেন।

কিন্তু সম্মানের থেকেও অবিচার তাঁকে অনেক বেশি সহ্য করতে হয়েছিল। কোলভিৎস-এর প্রথম প্রদর্শনী ('তাঁতী বিদ্রোহ') দেখে তৎকালীন বিখ্যাত জার্মান শিল্পী আডোলফ মেনৎসেল তাঁকে রৌপ্যপদক পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কোলভিৎস সাধারণ মানুষের দুর্দশা এবং সংগ্রামকে চিত্ররূপ দিতেন বলে তৎকালীন প্রুশিয়ার সরকার সে প্রস্তাব মানেন নি। তাছাড়া কোলভিৎস যদিও কমিউনিস্ট ছিলেন না, তবু তাঁর শিল্পীসুলভ চিন্তাধারাই তাঁকে হিটলারী নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। ফলে নাৎসী আমলে ক্রমে তিনি একাদেমি থেকে বহিষ্কৃত হন। তাঁর চিত্রের প্রদর্শনী বে-আইনী ঘোষিত হয়। তাঁর স্টুডিওতে নাৎসী সৈন্যদের খানা-তল্লাসি শুরু হয়। এবং সর্বশেষে তাঁকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাঁটাতারের বেড়াজালে বন্দী করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন তাঁকে রোগে ভুগতে হয়। অবশেষে এই রোগভোগের ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার কিছু দিন পরে আটাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

কোলভিৎস-এর চিত্রকলা শুধুমাত্র তাঁর স্বদেশেই যে আবদ্ধ ছিল বা স্বদেশের মানুষকেই অনুপ্রাণিত করত—তা নয়। সেই ১৯৩০-এর মতো অত্যাচারের যুগেও তাঁর শিল্পের প্রদর্শনী সাংহাইতেও হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে তাঁর কয়েকটি কাঠখোদাই ও লিথোগ্রাফ দেখে চীনের তরুণ শিল্পিরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি, তৎকালীন চীনাশিল্পী জু-শি কোলভিৎস-এর মতো স্পষ্ট এবং তীব্র রেখার মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে তুলে ধরার

সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। একজন গণশিল্পীর দায়িত্ব কী ও শিল্পের বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত তা কোলভিৎস-এর কাছ থেকেই তাঁরা শিখেছিলেন—যা পরবর্তী-কালে চীনের শিল্পকলায় ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে বেশ কাজে লেগেছিল।

স্বপন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র পুরস্কার

পুরস্কারের স্বীকৃতি মহৎসাহিত্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় না হলেও, তার একটি ব্যবহারিক সার্থকতা গৌরব ও সম্মানের দিক অবশ্যই আছে। বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন লীলা মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল ও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। বাঙলা সাহিত্যের তিনটি ভিন্ন ধরনের সাহিত্যকৃতির জন্য—লীলা মজুমদার-এর 'আর কোন খানে', নারায়ণ সান্যাল-এর, 'অপরূপ অজন্তা' ও গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা'—গ্রন্থত্রয়ের রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত হওয়া নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ।

লীলা মজুমদার-এর 'আর কোনখানে' যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় স্মৃতির চিত্রশালায় প্রবেশ। শিশুসাহিত্য থেকে বয়স্কসাহিত্য পর্যন্ত যাঁর সৃষ্টিশীল ক্ষমতার অনায়াস প্রসার, মননশীলতা ও রসকল্পনায় যাঁর সমান দক্ষতা, বর্ণোজ্জ্বল ভাষা ও শিল্পসৌকর্যে যাঁর রচনা আশ্চর্য—সুন্দর: তাঁর স্মৃতিরোমন্থন-মূলক রচনা 'আর কোনখানে' একটি বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম। মাত্র চোদ্দবৎসর বয়সে জ্যাঠতুতো দাদা সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় রচনা শুরু করে অদ্যাবধি শ্রীযুক্তা মজুমদার শিশু ও বয়স্ক সাহিত্য মিলিয়ে প্রায় চল্লিশখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। লীলা মজুমদার-এর গ্রন্থের সঙ্গে অপরিচিত পাঠক বাঙলা-দেশে সম্ভবত দুর্লভ। স্মৃতিকাহিনীমূলক 'আর কোন খানে' রচনাটি যখন প্রথম 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়, তখনই তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখিকার শৈশব ও যৌবনের দিনগুলির স্মৃতি-কথায় বাঙলা সাহিত্যের বহু সুপরিচিত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং সমসাময়িক সমাজের বস্তুঘনিষ্ঠ পরিচিতি পাঠ করা যায়। ভাষা ও সাহিত্য-রসগুণে আত্ম-কথনের অন্তরঙ্গতায় স্মৃতিরোমন্থনজাত 'আর কোন খানে' গ্রন্থটি উজ্জ্বল।

'বিকর্ণ' ছদ্মনামে পরিচিত ও কথাশিল্পী রূপে সুবিদিত নারায়ণ সান্যাল-এর 'অপরূপ অজন্তা' সাহিত্য ও শিল্পের একটি মিশ্র-গ্রন্থ। যিনি বাস্তুহারা জীবনের চলমান বাস্তব পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন উপন্যাসে, তিনিই লুপ্তপ্রায় অজন্তা

গুহাচিত্রের প্রাচীন প্রতিলিপি অঙ্কন করেছেন 'অপরূপ অজন্তা' গ্রন্থে। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীসান্যাল গুহাচিত্রের প্রতিলিপি চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক রূপে জাতকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে। সাহিত্য ও চিত্রকলার সমন্বয়ে 'অপরূপ অজন্তা' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শাস্ত্রীয় দেবদেবীর পাশাপাশি বৃহৎবঙ্গের লোকসমাজে যে সমস্ত দেবদেবী আধিপত্য বিস্তার করে আছেন—তাঁদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে। ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং ধারাবাহিক রূপে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু যখন বাঙলার লুপ্তপ্রায় লৌকিক দেবতাদের পরিচয় প্রকাশ করছিলেন, তখনই বিদগ্ধ মহল থেকে তিনি সাধুবাদ লাভ করেছিলেন। সরেজমিন অনুসন্ধানে বাঙলার বিভিন্ন পল্লীঅঞ্চল পরিক্রমা করে সুপ্রচুর উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে শ্রীবসু আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর পরিচয়, তৎসংক্রান্ত লৌকিক কাহিনী, পূজাপদ্ধতি, বিভিন্ন দেবদেবীর ফটোচিত্র প্রভৃতিতে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানের আলোয় লেখক বর্তমান গ্রন্থে বাঙলার লৌকিক দেবদেবী ও তাঁদের পূজানুষ্ঠানের সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটনে সক্ষম না হলেও, একক প্রচেষ্টায় সরেজমিন অনুসন্ধানে যে বিপুল তথ্য তিনি সন্নিবেশ করেছেন—তার অবদান অনস্বীকার্য। কঠিন পরিশ্রমে বাঙলার লুপ্তপ্রায় লৌকিক দেবতাদের তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুঘনিষ্ঠ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে শ্রীবসু একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছেন। মোটের উপর গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' বাঙলা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা যায়।

রবীন্দ্র পুরস্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে স্বভাবতই এবারের আকাদমি পুরস্কারের কথা মনে জাগে। এবার আকাদমি পুরস্কারের তালিকায় বাঙলাদেশের কোনো লেখকের নাম না দেখে স্বতই বিস্ময় সৃষ্টি হয় এবং বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই জিজ্ঞাসা জাগে—বাঙলাদেশে কি আকাদমি পুরস্কারের যোগ্য কোনো গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়নি? নির্বাচনের মানদণ্ড বা তুলনামূলক আলোচনায় পুরস্কৃত গ্রন্থাদির উৎকর্ষ সম্পর্কিত বিতর্কে প্রবিষ্ট না হয়েও বলা যায়—এবারের আকাদমি পুরস্কার কি সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে যথাযথ বিচারের স্বাক্ষর বহন করে?

তুষার চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় সংহতি ও পশ্চিমবঙ্গের পথ

মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাত্র কদিন আগে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের জের ধরে কলকাতায় কোনো কোনো অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক প্রচারের জোয়ার বয়ে যায়। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা পশ্চিম বাঙলায় গণতন্ত্রের পক্ষাবলম্বী, এমন দোষ নিন্দুকেও তাকে দেবে না। বরং একচেটিয়া মূলধনের মুখপত্র স্বতন্ত্র দল-এর রাজনৈতিক ভাষ্যকার বলে অনেকেই তাকে চিহ্নিত করবে। কিন্তু সে পত্রিকাও লিখল, এই সাম্প্রদায়িকতার উসকানিদাতাদের মধ্যে আছেন কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসী। একদিকে 'স্টেটসম্যান'-এর সাম্প্রদায়িকতার ক্ষত বিষিয়ে তোলা, অন্যদিকে পর্যায়ক্রমে কংগ্রেসীদের ঘোলা জলে মৎস শিকারের কুৎসিত প্রয়াস— সব কিছু মিলে যখন ব্যাপারটা ঘৃণ্য রূপ ধরেছে—দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের জাগ্রত মানুষ শাসকশ্রেণীর চক্রান্ত হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারলনা। বরং কেন্দ্রের শাসকদলের বিপক্ষে তা বুমেরাং হয়ে গেল। কেন সে আগুন ছড়াল না ? কারণ, গ্যারান্টি ছিল পশ্চিম বাঙলার গণতান্ত্রিক মানুষের আন্দোলন।

এবার ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের দিকে তাকাই। সেই একই ফেব্রুয়ারি মাস, সাত থেকে এগারো তারিখ। ইংরেজিতে সংক্ষেপে যাদের এস. এস. বলা হয়, বোম্বাই শহরে খুদে ফুয়েরার বাল ঠক্কর-এর সেই শিব-সেনা দল তাণ্ডব নৃত্যে মেতেছে। মহারাষ্ট্রে প্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয়দের জান-মান-সম্পদ তো বটেই, প্রতিবেশী মহীশূর রাজ্যের অধিবাসীরাও এ আক্রমণ থেকে নিস্তার পায়নি। কিন্তু কেন ? শিবসেনা মহীশূরের একাংশ মহারাষ্ট্রের বলে দাবি করছে। আর, মারাঠী জাতীয়তাবাদের (?) প্রকাশ নাকি ঐ নন্দীভৃঙ্গীপন্থায় প্রকাশিত !

এস.এস. শব্দের মধ্যে হিটলার-এর ঝটিকা বাহিনীর আদ্যাক্ষরগুলির একটা মিল পাওয়া যায় না ? বাল ঠক্কর-এর আন্দোলনের মধ্যেও সেই একই সুর বেজে উঠছে না ? একদা জর্মানিতে জর্মান শ্রমিকদের বেকারত্বর জন্য দায়ী করা হতো ইহুদিদের, বলা হতো কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা ইহুদিদের দালাল। বলা হচ্ছিল জর্মানদের নিঃশ্বাস নেবার জন্য অঞ্চল চাই, লিবেনস্রাম। ঠক্কর সাহেব ভুল বুঝেছেন : এদেশটা ত্রিশের দশকের জর্মানি নয়, মহারাষ্ট্রও স্বাধীন রাষ্ট্র নয়, ভারতেরই অঙ্গরাজ্য। কিন্তু আচরণে এমন মিল কেন ?

ভারতে পশ্চিম বাঙলা ও মহারাষ্ট্রে শিল্পবিকাশ অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে ঢের

বেশি। পশ্চিম বাঙলায় দীর্ঘকাল ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনও গড়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, বোম্বাইয়ে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হলেও, পুনা-নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর দৌরাত্ম্য(শব্দগত মিল লক্ষ্য করুন, একেও বলা হয় আর.এস.এস.) বাড়ছে। একদল অন্ধকারের জীব, দুর্জ্ঞেয়তার রাজনীতি সামনে রেখে ধর্মান্ধতার প্লাবন বইয়ে দেবার জন্য সে রাজ্যে তৈরি হয়েই আছে। এইতো সেদিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের 'গুরুজী' গোলওয়ালকার বলেছেন, বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দুধর্মই সনাতন, তাকে মানতে হবে। গান্ধীজীর জন্মশতবার্ষিকীতে হরিজনদের বিরুদ্ধে এমন অভিযান বলদর্পী যশোবন্তরাও চ্যবন এর নিজ রাজ্যে ঘটছে, আমরা কিঞ্চিত উদ্বেগের সঙ্গে তা লক্ষ্য করছি। আর. এস. এস. দেরও আদর্শ শিবাজী। কেন? তিনি নাকি অখণ্ড হিন্দু রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শিবসেনারা আরেক অন্ধকারের শক্তি, আর. এস. এস. রতনকে চেনবার আরেক রতন সেই শিবাজীর নামে প্রতিষ্ঠিত দল। এঁদের মতে শিবাজী নাকি মারাঠী আধিপত্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সোনায় সোহাগা—ধর্মান্ধতার সঙ্গে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। একজন বিখ্যাত দেশপ্রেমিকের নামকে উর্ধ্বে তুলে ধরে, তুরুপের তাসের মতো ব্যবহার করে, ভারতের স্বাদেশিকতার অন্যতম লক্ষ্য ধর্ম ও বর্ণ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং অখণ্ড ভারতীয়তাকে চূর্ণ করার দেশদ্রোহিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া শুরু হলো। এই মা মনসাকে ধূপের ধোঁয়ার মদত দিলেন কংগ্রেস দল স্বয়ং।

বোম্বাই অঞ্চলে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সুতা ও বস্ত্রকলের ছড়াছড়ি। একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী বোম্বাই অঞ্চলের সুতাকল ও বস্ত্র কলগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা কখনোই পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা হতো না। অন্যদিকে বহু তাঁত ও কারখানা একচেটিয়া মূলধনপতিদের নির্দেশে বন্ধ। তাছাড়া, চতুর্থ পরিকল্পনার কাজ বন্ধ থাকায় ছোটখাট কারখানাগুলিতেও তালা ঝুলছে। বামপন্থীরা এইসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ছে। বোম্বাইয়ের প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখেছে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রুটি-রুজির লড়াই সচেতন পথ ধরলে, বোম্বাই থেকেও তাদের হটে যেতে হবে। একচেটিয়া শিল্পপতিদের চক্রান্তে যে রাজ্যে মধ্যশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বেকারী দেখা দিয়েছে, সেখানে সাধারণ মানুষকে ভুলপথে ঠেলে দেবার জন্য ফিসফাস প্রচার শুরু হলো দক্ষিণ ভারতীয়দের উপস্থিতিই মহারাষ্ট্রবাসী শ্রমিক-মধ্যবিত্তের বেকারীর কারণ। শ্রমিক ঐক্যকে এখনই রুখতে হবে,

কমিউনিস্টদের কোমর ভেঙে দিতে হবে। মার্কিন মূলধনের সঙ্গে কোলাবরেটার ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরা হাতের পাঁচ অস্ত্রটি পেয়ে গেলেন। সি.আই.এ.—চমৎকার সাবভারসনের সড়ক পেল বাল ঠক্কর, আর তার শিবসেনা।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন তাঁর পূর্বতন নির্বাচনী কেন্দ্রে দাঁড়ালেন। নায়েক পাতিল-চ্যবনরা তাঁকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। নায়েক-পাতিল-চ্যবনরা 'দক্ষিণ ভারতীয়' কৃষ্ণমেননকে হারাবার জন্য শিবসেনাকে মদত দিলেন। কৃষ্ণমেনন পরাজিত হলেন। শিবসেনা এবার ক্ষমতার রক্তের স্বাদ জেনেছে—তারা কমিউনিস্ট দলের অফিস ভাঙল, শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীদের মারপিট শুরু করে সন্ত্রাসের বন্যা বইয়ে দিলো। মহারাষ্ট্র সরকার চুপচাপ রইলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর ঘুমিয়ে রইলেন। তখন চ্যবন সাহেবের চক্রান্ত—কিভাবে পশ্চিম বাঙলার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙা যায়। বোম্বাই পৌর নির্বাচনেও এরা দাঁড়াল। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রজাসমাজতন্ত্রী দলকে ঠেলে দিলো শিবসেনার সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতের দিকে।

কিন্তু বাহাদুর বোম্বাইয়ের শ্রমিক। তাঁরা শিবসেনার আক্রমণ রুখছেন। এবার শিবসেনার নতুন চাল, মহীশূরের কিছু অঞ্চল মহারাষ্ট্রে ফেরত চাই। শুরু হয়ে গেল মারদাঙ্গা, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ। যতদিন না মহীশূর থেকে ন্যায্য পাওনা অঞ্চল মহারাষ্ট্রে ফেরত পায়, ততদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের তারা মহারাষ্ট্রে ঢুকতেই দেবেনা। এবার চ্যবন সাহেবের ওপরেও চাপ পড়েছে। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! ভারতে পরোক্ষে যিনি ফ্যাসিবাদের কথাবার্তা বলেন, কমিউনিস্ট দল বেআইনী করার কথা ভাবেন, সেই নিজলিঙ্গাপ্পার রাজ্যের অঞ্চলের ওপরে লোভ? ব্যস, ধরপাকড় শুরু হলো। নায়েক সাহেব বলছেন, শিবসেনা 'ফ্যাসিস্ত দল'! ততঃ কিম? শাস্তি দিতে হলে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শক্তমানুষটিও বাদ পড়বেন না। আর পাতিল ও নায়েক? তাঁরা তো বটেই!

সমস্যাটির বীজ রয়েছে একচেটিয়া মূলধনপতি ও তাদের বশংবদ অন্ধকারের শক্তিগুলির কাজকর্মের মধ্যে। কিন্তু যে বিস্ফোরণ শিবসেনার সাম্প্রতিক কার্যকলাপে প্রকাশিত, সেই বিস্ফোরণের মালমশলা অন্যান্য রাজ্যেও প্রচুর পরিমাণে রয়ে গেছে। তামিলনাদের কথাই ধরুন। একদা হিন্দীভাষার বিরুদ্ধতা সেখানে জাতীয় সঙ্কীর্ণতার সীমাও লঙ্ঘন করে উত্তর ভারতের

বিরুদ্ধে দক্ষিণী বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা এনেছিল। ডি. এম. কের নেতৃত্ব একসময় বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্গাতা হয়ে উঠেছিল। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক লক্ষ্য বিকৃত হয়ে উঠলে, এ-ধরনের প্রতিক্রিয়াপন্থী বক্তব্য নেতৃত্বে চড়ে বসে। এর প্রভাব সুদূরবিস্তারী। মনে পড়ছে জনৈক বিখ্যাত কৃষকনেতা মাদুরাই-কিষাণ কংগ্রেসের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে পরিতাপের সঙ্গে বলেছিলেন "দুনিয়ার কৃষক মজুর এক হও" ধ্বনিটি হিন্দীতে দিলে তামিলনাদুর কয়েকজন কৃষককর্মী ধমকে ওঠেন - এ শ্লোগানও হিন্দীতে দেওয়া চলবেনা।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশই কেবল নয়, রাজ্যের বহুপরিমাণ অটোনমি এবং শিল্প-বিকাশ আজ বিচ্ছিন্নতার দাবি ঠেকিয়ে দিতে পারে। মধ্যবিত্ত বেকারী এবং অসম অর্থনৈতিক বিকাশের কাঁটা আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক আন্দোলনকেও ভুল পথে রক্তাক্ত করে তুলছে। বিহার ও আসামে বিচ্ছিন্নতাবাদী রক্তাক্ত সংঘর্ষের পটভূমি, ঝাড়খণ্ডী সঙ্কীর্ণতা, লাচিত সেনার অন্ধতা—এসবই আলোচনা করে যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। পশ্চিম বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করার জন্য 'আমরা বাঙালী', বি. এন. ভি. পি., প্রোগ্রেসিভ মুসলীম লীগ ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভেকের আড়ালে কীলক ঢোকাবার চেষ্টা চলেছে। আর. এস. এস., জনসংঘ প্রভৃতির ধমকানিও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। যেমন চলেছে অন্ধ্রে 'তেলেঙ্গানা' আন্দোলনের নামে সঙ্কীর্ণতা।

বাঙলাদেশেও আট লক্ষ বেকার আছে। আছে অন্ধকারের শক্তিগুলির চক্রান্ত। বেকারের কর্মসংস্থান করতে হবে, উপযুক্ত বলিষ্ঠ সমাজদর্শনে তাদের দীক্ষা দিতে হবে। যুক্তফ্রন্টকে বিজয়ী করার জন্য যারা আপ্রাণ লড়েছে, সেই নওজোয়ানেরা অনেক আশায় যুক্তফ্রন্টের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের আশার উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য যুক্তফ্রন্টের আপ্রাণ চেষ্টাই বাঙলাদেশকে বাঁচাতে পারে। বাঙলাদেশে ছোট শিল্প বিকাশের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিল্পের বিকাশ, সম্প্রদায় ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি যুক্তফ্রন্টের আশু কর্তব্যের অংশ হতে হবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ বাঙলাদেশে ঐক্য গড়ে তুলেছে। গার্ডেনরীচের নির্বাচনী ফল তার প্রমাণ। সাম্প্রদায়িক প্রচারকে ব্যর্থ করে, যে বিধানসভা-কেন্দ্রে আশি শতাংশ মুসলিম, সেই গার্ডেনরীচে কমিউনিস্ট শ্রমিকনেতা অরুণ সেন জয়ী হলেন। আমরা শান্তিপুর অঞ্চলটিকেও লক্ষ্য করেছি। শান্তিপুর সনাতন হিন্দু-ধর্মের পীঠস্থান বিশেষ। এ অঞ্চলেও জয়ী হয়েছেন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী—মকসেদ

আলী। এই দুটি চিত্র পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সচেতনতার বায়ুমান বলা যেতে পারে।

ভারতের জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে পারে বিভিন্ন প্রগতিশীল শ্রেণীর যুক্তমোর্চার শক্তি। যুক্তফ্রণ্ট। যে পথ পশ্চিমবঙ্গ দেখিয়েছে – সেই পথেই সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা, ধর্মান্ধতা ও বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে ভারতের মুক্তি। যুক্তফ্রণ্টের দলগুলিকে ভুললে চলবেনা, বড় দুর্গম জাতীয় সংহতির রাস্তা; তবু সে পথ যুক্তফ্রণ্টকেই উত্তীর্ণ হতে হবে। নইলে কার দিকে আমরা আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকব?

শান্তিময় রায়

বিশ্বভূগোল কংগ্রেস

একবিংশতিতম আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেস গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো। দিল্লীতেই হলো বলা পুরো ঠিক হবে না। কারণ, কংগ্রেসের পুর্বে ও পরের দু-সপ্তাহ ধরে ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে এই উপলক্ষে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয়ের উপর আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে কয়েকমাস মৌলিক রচনা পাঠ ও আলোচিত হয়েছে; দেশের নানা অঞ্চলে ভৌগোলিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী ও ভারতীয় ভৌগোলিকদের যুক্তদল ভ্রমণ করেছেন; ভারতবর্ষে যে কয়েকটি ভূগোল-বিষয়ক পত্রিকা আছে, বিশেষজ্ঞদের রচনায় সমৃদ্ধ তাদের স্ফীতকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে; পৃথিবীর সমস্ত দেশে ভৌগোলিক বিষয়ে নতুন গবেষণার আলোকে বই রচিত হয়েছে। এক কথায়, সমস্ত পৃথিবীর এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের ভূগোল শিক্ষা, সমীক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই কংগ্রেস একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে একবিংশতিতম ভূগোল কংগ্রেসের গুরুত্ব বোধহয় খানিকটা বিশেষ ধরনের ছিল। কারণ, এশিয়াতে তো বটেই, এই তিন মহাদেশের বিশাল অঞ্চলে ভূগোল কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম। কাজেই এই অঞ্চলে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা বেশি, প্রতিনিধিও এসেছিলেন অধিকাংশ দেশ থেকে। তবে যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচ এত বেশি যে দূর দেশ থেকে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হয়নি। ইওরোপ ও উত্তর

আমেরিকার দেশগুলো থেকে তুলনামূলকভাবে প্রতিনিধিসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকেও যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। এই কংগ্রেসে সমগ্র বিশ্বের বহু খ্যাতিমান ভৌগোলিকের সমাবেশ হয়েছিল।

কংগ্রেসে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় ভৌগোলিকদের একটা বিশেষ সম্মানিত স্থান ছিল। প্রথমত, কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো এই দেশে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জি ভারতীয় ভৌগোলিকদের পুরোধা। আমাদের দেশে ভূগোল অপেক্ষাকৃত নবীন বিজ্ঞান হলেও, তিন শতাধিক ভারতীয় ভৌগোলিক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

ভারত সরকার অর্থ ও আরও নানাভাবে সাহায্য দিয়ে কংগ্রেসের প্রতি উৎসাহ ও সমর্থন জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু সে সাহায্য এসেছে এত শেষে এবং শৃঙ্খলাহীনভাবে যে তাতে তার কার্যকারিতা অনেক কমে গেছে। তাছাড়া যে-জাতীয় উদ্যোগ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তাও ছিল অনেকখানি উদ্যোগহীন।

প্রাক্ কংগ্রেস প্রস্তুতির সময় ভারত সরকারের অপর একটি নীতি নিয়ে বেশ খানিকটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এটি হলো দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালের প্রতিনিধিদের ভারতে প্রবেশের অনুমতি না দেবার নীতি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক দরবার সত্ত্বেও সরকার এই অনুমতি দেন নি। অবশ্য এতে কংগ্রেসের যে খুব ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে তা মনে হয় না।

যে সহস্রাধিক মৌলিক রচনা কংগ্রেসে জমা পড়েছিল, সেগুলিকে বিভিন্ন সেকশন ও কমিশনে ভাগ করেও মূল কংগ্রেসের নয় দিনে পড়া বা আলোচনা করা সম্ভব ছিল না, তাই অধিকাংশ রচনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রায় সমস্ত রচনার উপরই বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয়েছে। এইটিই বোধহয় এই কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব।

উল্লিখিত আলোচনা ছাড়াও দিল্লীর মূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। প্রথম আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভূগোলের ভবিষ্যৎ কর্মধারা ও প্রয়োগপদ্ধতি। দ্বিতীয় তৃতীয় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভূগোল ও উন্নতিশীল দেশগুলোর সমস্যা এবং ভূগোল ও ভারতের উন্নয়ন-সমস্যা। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সাধারণ আলোচনা

সম্ভব হয়নি। তবে, কয়েকজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক তার উপর বক্তৃতা করেছেন। এই আলোচনার খানিকটা বিস্তৃত বিবরণ কংগ্রেসের মেজাজ বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রখ্যাত রুশ ভৌগোলিক গেরাসিমভ ভৌগোলিকদের আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতার উপর বিশেষ জোর দিয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন। ভূগোলের অনেক শাখা এখনও নবীন ও অনুন্নত। পৃথিবীর অনেক অঞ্চল—বিশেষ করে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়—এখনও প্রায় অজানা। এইসব দেশের সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণের ব্যাপারেও অনেক কাজ বাকি। এই সব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ভৌগোলিকদের অবশ্য কর্তব্য। গেরাসিমভ একবিংশ কংগ্রেসের সংগঠক আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক ইউনিয়নের কাছে এই সহযোগিতার উদ্যোগ গ্রহণের আবেদন জানালেন।

মার্কিন প্রতিনিধি গিন্সবার্গ বললেন, অনুন্নত দেশগুলিতে একটা ধারণা হয়েছে যে উন্নত দেশগুলোতে তাদের শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হয়। এইসব শিক্ষার্থীরা দেশে ফিরে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে না। তাই তাঁর মতে এখন সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্রদের বিদেশে না পাঠিয়ে শুধুমাত্র উচ্চতর গবেষণার জন্যই বিদেশে পাঠাবার কথা ভাবা উচিত। তাছাড়া বিদেশের অর্থসাহায্যে অনুন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পঠন-পাঠনের উন্নতির চেষ্টা আশু কর্তব্য। পরিষ্কার ভাষায় না বললেও গিন্সবার্গ-এর প্রস্তাব আসলে সমস্ত অনুন্নত দেশে ভারত-মার্কিন শিক্ষা ফাউণ্ডেশন-এর মতো সংস্থা গড়ার প্রস্তাব, অর্থনৈতিক প্রকল্পের অন্তহীন গহ্বরে টাকা না ঢেলে শিক্ষায় টাকা ঢাললে সুফল হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

এই প্রস্তাবের উত্তর এলো ঘানা ও মেক্সিকো থেকে। ঘানার প্রতিনিধি বললেন যে অনুন্নত দেশগুলির সমস্যা প্রধানত পরমুখাপেক্ষিতার সমস্যা। সম্পদের অর্থকরী ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভরতাই অনুন্নত দেশগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দেখা গেছে বিশেষ করে আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যের নামে উন্নত দেশগুলি মূলতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

মেক্সিকো থেকে মস্ত বড় দল এসেছিল কংগ্রেসে। এঁদের মধ্যে বেশ কিছু ছিলেন তরুণ ভৌগোলিক। মেক্সিকোর প্রতিনিধি বললেন, অনুন্নতির সমস্যা ভৌগোলিক নয় এবং তাই তার সমাধানও মূলত ভৌগোলিকেরা করতে

পারে না। অনুন্নতির সমস্যা রাজনৈতিক। এতদিন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশ পরাধীন ছিল। সম্পদ অনুসন্ধান ও দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য তার ব্যবহার ব্যাহত হয়েছে রাজনৈতিক পরাধীনতার কারণে। এখন এইসব অনেক দেশই স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও দেশী কায়েমী স্বার্থ এই দেশগুলির অগ্রগতির বেগ স্তিমিত করেছে। তাই সর্বক্ষেত্রেই উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য বাড়ছে। এক্ষেত্রে ভৌগোলিকের কর্তব্য কি? ভৌগোলিককে স্থির করতে হবে তার বিজ্ঞান কার স্বার্থে সে ব্যবহার করবে—বিদেশী শোষক ও দেশী কায়েমী স্বার্থ, না অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ। বলা বাহুল্য, এ বক্তৃতায় বেশ উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কেউ কেউ অনুযোগও করেছেন, এ নাকি কংগ্রেসে রাজনীতির অনুপ্রবেশ। তবে, সাধারণভাবে অনেক প্রতিনিধিই খুশী হয়েছিলেন খাঁটি কথাগুলো স্পষ্ট করে বলায়।

এই সুযোগে প্রাসঙ্গিক একটি আলোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার এক অধ্যাপক-ভৌগোলিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, উন্নত দেশগুলি থেকে অনুন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনেক বিজ্ঞানী শিক্ষাদানের জন্য আসেন। শিক্ষাদান তাঁরা করেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের স্বদেশের বড় বড় কোম্পানির পক্ষে ব্যবসাও করেন। এইসব অধ্যাপকের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলোর পুস্তক প্রকাশক ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মায়ক অনেক সংস্থা ব্যবসার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে। কাজেই প্রায় সবটাই ব্যবসা। আফ্রিকার সেই অধ্যাপক হয়তো একটু বেশি তীব্রভাবেই বলেছিলেন!

পূর্বেই বলেছি কংগ্রেসের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন ছাড়াও কমিশন ও শাখা আলোচনায় সকল দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের আঞ্চলিক পরিকল্পনার সমস্যা বার বার উঠেছে!

আঞ্চলিক পরিকল্পনায় ভৌগোলিকদের অবদান সর্বদেশে স্বীকৃত। বিশেষ করে পরিকল্পনার অঞ্চল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভৌগোলিকের সাহায্য অপরিহার্য। এদেশে অবশ্য কিছুই অপরিহার্য ভাবা হয় না, যদিও স্বাধীনতার বিশ বছর পরে এবং তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পার করে আজও ভারতের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর সীমানা ও চরিত্র নির্ধারণের কাজ বাকি থেকে গেছে।

ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের মধ্যে অঞ্চল নির্ধারণের ভিত্তি নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ মনে করেন, পরিকল্পনা-অঞ্চলগুলো শাসনতান্ত্রিক অঞ্চলের কাঠামোকে একেবারে বাদ দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদের বণ্টনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। আবার অন্য একদল আছেন যাঁদের মতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অঞ্চলগুলোকে কার্যকরী হতে হলে বর্তমান রাজ্যগুলির সীমানা-ভিত্তিক হতে হবে। এই মতপার্থক্য শুধুমাত্র ভারতের ভৌগোলিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ বিতর্ক আন্তর্জাতিক। বিদেশী ভৌগোলিকদের মধ্যে যাঁরা ভারতবর্ষের পরিকল্পনা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রুশ ভৌগোলিকদের নাম প্রথম সারিতে। রুশ-ভারত যুক্ত প্রচেষ্টায় ভারতের অর্থনৈতিক আঞ্চলিকতার উপর কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে! কাজেই রুশ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য শুনতে অনেকেই উদগ্রীব ছিলেন। রুশবিজ্ঞানীদের মতে শুধুমাত্র পরিবেশভিত্তিক অঞ্চল নির্ধারণ হবে অবাস্তব। অন্যদিকে রাজ্যগুলির সীমানাভিত্তিক অঞ্চল হবে অকর্মণ্য। একাধিক রাজ্য নিয়ে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগসূত্রের অন্তরঙ্গতার ভিত্তিতে অঞ্চলের সীমানা আঁকতে হবে। কিন্তু এতেও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্ত-দেশে কিছু কিছু এলাকা থেকে যাবে যার উন্নয়নের দায়িত্ব একাধিক অঞ্চলকে সমবেতভাবে নিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুটি পূর্ণবিকশিত অঞ্চল, দক্ষিণ ভারতে একটি অর্ধবিকশিত অঞ্চল এবং মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে দুটি সদ্য অঙ্কুরিত অঞ্চলের সীমানা টানা যায়। বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে বারান্তরে 'পরিচয়'-এর পাতায় এ নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। আপাতত বোধহয় একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য অঞ্চল নির্ধারণের মৌলিক তত্ত্ব আলোচনায় ভূগোল কংগ্রেসের অবদান নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

ভূগোল কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিশন ও শাখাগুলিতে এবং প্রাক্-কংগ্রেসে ও কংগ্রেসোত্তর আলোচনাচক্রে যে সহস্রাধিক গবেষণামূলক রচনা দাখিল করা হয়, তার মূল্যায়ন এই স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের মতো ভূগোলের নানা শাখা-প্রশাখা ধরে গবেষণার দিগন্ত বিপুল প্রসার লাভ করেছে এবং অত্যন্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্র ধরে এমন এমন ক্ষেত্রে ভূগোল প্রবেশ করেছে যেখানে

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার সঙ্গে পার্থক্য খোঁজা শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, প্রায় অসম্ভবও বটে। অবশ্য ভূগোলের নিজস্বতা হলো প্রকৃতি ও মানুষের হস্তক্ষেপে গঠিত ভূত্বকের আঙ্গিক গতিশীলতার নিয়ম ও কার্যকারণ সম্বন্ধ অনুধাবন করা এবং এর বৈচিত্র্য ও আপাতদৃষ্ট বিশৃঙ্খলাকে ভৌগোলিক অঞ্চল-নির্ণয়ের মাধ্যমে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ছকের ভিতর নিয়ে আসা। ভূগোলের এই ব্যাখ্যায় স্বভাবতই সবাই একমত নন। এমনকি, ভূগোলের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের সীমানা নিয়ে এই কংগ্রেসেও বহুবার বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। অনেকে এখনও মনে করেন, উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে অঙ্ক, সংখ্যাতত্ত্ব, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি অথবা সমাজতত্ত্বের জটিলতায় ভূগোল এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে ভূগোলের নিজস্ব দায়িত্ব উপেক্ষিত হচ্ছে। বিতর্কের মীমাংসা এই কংগ্রেসে হয়নি।

মানচিত্র তৈরি করা বহুদিন ভূগোলের একচেটিয়া দায়িত্ব বলে বিবেচিত হতো। এখন অবশ্য মানচিত্র তৈরির কাজ অন্য বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একবিংশ ভূগোল কংগ্রেসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্ত-র্জাতিক কার্টোগ্রাফিকাল কংগ্রেস-এ সেই সব বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছিলেন। এখন মানচিত্র তৈরির কাজ মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিমান অথবা মহাশূন্যযান থেকে গৃহীত আলোকচিত্রের ভিত্তিতে সব ধরনের অতি নিখুঁত ও বিশদ মানচিত্র তৈরি শুরু হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে মানচিত্র তৈরির শিক্ষাকেন্দ্রকে ভূগোলের চৌহদ্দি থেকে বার করে পৃথক ইন্সটিটিউটে পরিণত করা হয়েছে। এখানে শিক্ষা লাভ করতে হলে অন্তত একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা প্রয়োজন। মহাশূন্য থেকে তোলা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র বড় করে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেখানো হয়েছিল। এই সব ছবিতে মাটির রং ও প্রকৃতি, চাষের তারতম্য, জমির ব্যবহার প্রভৃতির উপর মানচিত্র তৈরির পদ্ধতি দেখানো ছিল। সাধারণ অর্থে ভৌগোলিকের কাজ তাতে সামান্যই। মূলত তা হল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। ভৌগোলিকের কাজ অবশ্য রয়ে গেল সেইসব মানচিত্রের পাঠোদ্ধারের মধ্যে। বিভিন্ন দেশের মানচিত্র অঙ্কন পদ্ধতিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, তার তুলনায় সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কাজ উনবিংশ শতাব্দীতে পড়ে আছে ভাবা আশ্চর্য নয়। আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সংস্থার সম্পাদক হান্স বোশ বলছিলেন তাঁর দেশ সুইজারল্যাণ্ডে অনেক অর্থনৈতিক ম্যাপ আজকাল কমপিউটারে তৈরি হয়।

প্রতিটি উন্নত দেশে সমস্ত ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ ও তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রাখার কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে করা হয়। গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও সময়ের অপচয় ঐসব দেশে অনেকাংশে কমে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে এমনকি ছাত্রদের সংগৃহীত তথ্যও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পর যদি সঠিক বলে মনে হয়, তাহলে সযত্নে তা কেন্দ্রীয় তথ্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত থাকে। আমাদের দেশে এ তুলনায় অবস্থা একেবারেই প্রাগৈতিহাসিক।

ভূগোল কংগ্রেসে যাঁরা রাজনীতির অনুপ্রবেশ নিয়ে উত্তেজিত হয়েছিলেন, তাঁরাই সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক অধ্যাপক গেরাসিমভকে নতুন সভাপতি হতে দেন নি, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে আগত ভৌগোলিকদের রচনা-পাঠের ব্যাপারে অহেতুক বাধা সৃষ্টি করেছেন, এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার ভৌগোলিকদের রাজনৈতিক বিপ্লবী বলে ঠাট্টা করেছেন। যদিও লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিংশ কংগ্রেসের বেসরকারী সিদ্ধান্ত ছিল দ্বাবিংশ কংগ্রেস মস্কোতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত ভেঙ্গে ঠিক হলো চার বছর পরে কংগ্রেস হবে ক্যানাডার মনট্রিলে। আর এই কংগ্রেসের সুযোগে পশ্চিম জার্মানি থেকে যে মানচিত্র প্রদর্শিত হলো (পরে অবশ্য এই মানচিত্রটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল), তাতে 'বৃহত্তর জার্মান রাজ্য'র দাবি রাখা হলো। রাজনীতিবর্জিত বিশুদ্ধ শিক্ষা ও গবেষণার দাবি যাঁরা করেন, তাঁরা আসলে বিশেষ রাজনীতিতে যথেষ্ট দক্ষ ও উৎসাহী। একবিংশতিতম আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসেও তার নজির দেখা গেল।

সুনীল মুন্সী

মীর্জা গালিবের মৃত্যু-শতবার্ষিকী স্মরণে

এ-বছর ১৫ই ফেব্রুয়ারি দেশে দেশে উর্দুভাষার শ্রেষ্ঠ কবি মীর্জা আসদুল্লা খাঁ গালিবের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও এই উপলক্ষে গালিব-সম্পর্কিত নানাবিধ নিবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। দলমত নির্বিশেষে অসংখ্য সংস্কৃতিসেবীর স্বতঃস্ফূর্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি মৃত্যুর শতবর্ষ পরেও উৎসারিত হতে দেখে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, গালিবের ঐতিহ্য আজ বিশ্ব-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত। শুধু তাই নয়, এই ঐতিহ্যের শিকড় জীবনের এত গভীরে প্রসারিত যে, আমরা যারা নতুন যুগের নতুনতর প্রগতি-সংস্কৃতি

গড়ে তুলতে ইচ্ছুক, তারাও পারি আমাদের জীবন ও মনন গালিব-এর জীবন্ত ঐতিহ্যের রসধারায় এখনও সিক্ত করে নিতে।

কি সেই ঐতিহ্য? কোন মহান অবদান রেখে গেছেন গালিব তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য—এ-প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে তা স্মরণযোগ্য।

আমরা জানি, অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে গালিব ভারতবর্ষের যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে (১৭৯৭?) যে দরবারী আবহাওয়ায় বর্ধিত হতে থাকেন—সেই পরিমণ্ডল কোনো মহৎ প্রতিভা-বিকাশের পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। শৈশবে পিতৃহারা গালিব যে পিতৃব্য-পরিবারে লালিত-পালিত হন, সেই সৈনিক-পরিবারেরও ভাগ্য বাঁধা ছিল দিল্লীর আশেপাশে অবস্থিত ভারতের তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভুদের ভাগ্যের সঙ্গে। ভারতীয় উচ্চকোটি সমাজের এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ী পরিমণ্ডলে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে যুক্ত থেকেও দিল্লী ও আগ্রার বিদ্বৎসমাজের শ্রেষ্ঠ দান তিনি আকণ্ঠ পান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের প্রেক্ষাপটে জীবন-যুদ্ধের এই প্রাথমিক সাফল্য অকিঞ্চিৎকর না হলেও গালিব-এর মহত্ত্ব আমরা তখনি উপলব্ধি করতে পারব যখন দেখব কী অসীম সাহসে গালিব তাঁর স্ব-শ্রেণীর সমস্ত নৈতিক অধঃপতন, অন্ধ সংস্কার এবং সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে তাঁর কাব্য-সাহিত্যে প্রতিভার ঐশ্বর্যে মানব-মহিমাকে স্থাপন করেছেন সব কিছুর ঊর্ধ্বে। তাঁর সময়ের সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্য আর অবিচারের বিরুদ্ধে গালিব তাঁর অপূর্ব কাব্যশিল্পকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে মানবমুক্তির সংগ্রামকে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দিয়েছেন আত্মিক, বৈষয়িক এবং নৈতিক উপলব্ধির শীর্ষ চূড়ায়। এ কথা সত্যি যে, তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য ভারতীয় মনীষীদের মতো গালিব-এর পক্ষেও ভবিষ্যৎ সমাজ-রূপান্তরের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলি জানা বা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-পাঠের মাধ্যমে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, তিনি তাঁর সমকালীন জীবনের সীমাবদ্ধতাকে প্রবলভাবে উপলব্ধি করতেন। আর এই গ্লানিময় পরিবেশকে নীতিগতভাবে পরিবর্তনের বাসনা, আকাঙ্ক্ষিত নতুন মানুষ ও নতুন জগৎ সৃষ্টির প্রবল ইচ্ছা—এও তাঁর মননে ও চিন্তায় সজাগ ছিল।

পৃথিবীর সমস্ত মহৎ কবিদের মতোই গালিব-এর প্রেমের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবি-মনের চরম ও পরম স্ফূর্তি। এইসব প্রেমের কবিতায়

জৈবিক আবেগের আনন্দ-বেদনা, প্রেমাস্পদের অতুলন সৌন্দর্য ও আকর্ষণ এমন আশ্চর্য শিল্প-সৌকর্যে গালিব বিধৃত করেছেন যে, তা রসপিপাসু মনের গভীরে অতি সহজেই আলোড়ন তুলতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, গালিব-এর প্রেমের কাব্য মানবিক অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম ব্যক্তিত্ববোধের এক মহান প্রকাশ। তাঁর কল্পনা-প্রতিভা প্রেমের কাব্য রচনায় বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে যেভাবে ব্যবহার করেছে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীকের সাহায্যে যে কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, তার মৌলিকত্বে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

এই প্রেমের কবিতা উর্দু সাহিত্যে 'গজল' নামে পরিচিত। গালিব-রচিত প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ উর্দু গজলের সঙ্কলন 'দীওয়ানে-গালিব' বিশ্ব সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। গালিব তাঁর পূর্বসূরী মহান কবি হাফিজ এর মতোই এই গজলের আঙ্গিকেই রচনা করেছেন তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি। গজলের প্রতি দুই পংক্তির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও প্রতীকগুলি এত ব্যঞ্জনাময় ও অর্থপূর্ণ এবং এমন অননুকরণীয় তার ভঙ্গি যে, অন্য ভাষায় তা অনুবাদ করা সত্যিই কঠিন। গালিবকে বুঝতে হলে, তাঁর কাব্যের মানব-মহিমাকে অনুধাবন করতে হলে, যত দুর্বলই হোক, এই গজলগুলির কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় আমার জানা নেই।

এই দুনিয়ায় মানুষের ভূমিকাই যে প্রধান, এ-কথা উপলব্ধি করে গালিব বলেছেন :

> "এই দুনিয়ার আওয়াজ শোনো, শোনো হে হুঙ্কার
> তাকাও এরই বন্য-আবেগ উত্তেজনায়
> দৃশ্যটি কী ঝলমলে আর লেলিহ বিস্ফার
> তারপর এই ধুলোর পর্দা মানুষ রূপ পায়
> মানুষ হলো মূল কুশীলব তার।"

অন্য একটি কবিতায় মানুষই সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু—এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন গালিব :

> "মানুষ ছাড়া দুনিয়া গড়ার
> অন্য কোনো কারণ কিছু নাই,
> আমরাই তো কেন্দ্রবিন্দু
> বিন্দু ঘিরে সপ্ত ভুবন ঘুরছে জেনো তাই।"

গালিব তাঁর নানা কবিতায় বহুভাবে মানব-মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মক্কার কাবা মসজিদ মুসলমানদের পরম পবিত্রস্থান। এখানে এসে খোদাতালার কাছে সমস্ত মানুষই মাথা নত করে থাকেন। গালিব-এর পক্ষে মানবের মর্যাদা হানিকর এই অবস্থা মেনে নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তিনি মনে করেন, খোদাতালারও দেওয়া উচিত হবে মানুষকে তার ন্যায্য সম্মান ও মর্যাদা। তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় তাই তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন :

"আমরা খোদার জীব এ-কথা তো ঠিক
তবু আত্মগরিমায় মোড়া আমরা স্বাধীন
যদি না কাবার দ্বার মুক্ত হয়, না-ডাকে আমায়
সে-দ্বার পশ্চাতে ফেলে চলে যাব অন্য কোনো দিক।"

গালিব-এর সময় যে-অন্ধ ধ্যানধারণা ও কুসংস্কার মানব-মুক্তির পথে সবচেয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই ধ্যানধারণা এবং কুসংস্কারের মূর্তিগুলিকে তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি স্পষ্ট অনুভব করতেন, কুসংস্কারমুক্ত মনই পারে নতুন পথে ধাবিত হয়ে নতুন জীবনের পথকে আলোকিত করতে। তাই অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা গালিব-এর এই মুক্তি-তৃষ্ণাকে বাধা দিতে অগ্রসর হলে তিনি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতেন :

"হে যুবা, আমার সনে বাদ-প্রতিবাদে কিবা ফল
আজারের পুত্র (আব্রাহাম) করেছিল যাহা
সে-দিকে তাকাও
তিনি তো জ্ঞানের খনি, স্বচ্ছদৃষ্টি
তিনিই তো ভাঙলেন হায়,
তাঁর পুর্বপুরুষের ধর্ম আর মতের শৃঙ্খল।"

গালিব-এর স্বশ্রেণীর উচ্চকোটি মুসলমানেরা যখন অন্ধ অনুশাসন আর গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অ-মুসলমান সমস্ত মানুষকে 'কাফির' বলতে ইতস্তত করতেন না, গালিব-এর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হতো :

"মানুষ—মানুষ, তাকে ভালোবাসি আমি
হিন্দু-মুসলিম কিংবা হোক সে খৃষ্টান
যে-যার বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাক
আমি শুধু সকলকে ভাই বলে মানি।"

মৃত্যুর পরে যে বেহেস্তের কল্পনা করে অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সুখে মশগুল হতেন, গালিব আশ্চর্য সুন্দর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সেই বেহেস্ত-বিশ্বাসকে বিদ্ধ করে বলে উঠেছেন :

"বেহেস্তের সত্যরূপ খুবই জানা এবং অম্লান
গালিবের কাছে কিন্তু
দিল্‌কেই খোস্ রাখা প্রিয় এক ধ্যান।"

গালিব তাঁর শেষজীবনে রচিত একটি ফারসী কবিতায় স্বর্গের প্রেম যে কত ক্লান্তিকর আর একঘেয়ে তা অপূর্বভাবে ব্যক্ত করে এই পার্থিব প্রেমের প্রতিই ন্যস্ত করেছেন তাঁর সকল বিশ্বাস :

"বেহেস্তের প্রিয়া হুরী, অচেনা সে, সুখ দিতে পারে?
সে মিলনে হর্ষ কই, যে মিলন প্রতীক্ষিত নয়?
সে জানেনা অস্বীকার, পলায়ন, আলিঙ্গনে ডাক দিলে তারে
সে জানেনা প্রতারণা, যদি মানে প্রেম ও প্রণয়।
সে-তো শুধু অনুগতা, ক্রোধহীনা, সেবাপরায়ণা
অথচ হৃদয়ে নেই বহ্নিদীপ্ত বিদীর্ণ কামনা।"

এইভাবে গালিব তাঁর যুগের এবং সমাজের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে গালিব-এর ব্যক্তিজীবনেও বারংবার দেখা দিয়েছে নানা দুর্যোগ। গালিবকে এইসব ঘটনা পীড়িত করেছে, তাঁর কল্পনা-প্রতিভাও কখনো কখনো আচ্ছন্ন হয়েছে ব্যক্তিজীবনের অসংখ্য দুঃখ-যন্ত্রণায়; কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—গালিব শেষপর্যন্ত পরাজিত হননি, মানুষ ও জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারাননি কখনো। মুক্ত মানবাত্মার প্রতি তাঁর এই বিশ্বাস তাই বাণীরূপ পরিগ্রহ করে গেয়ে উঠেছে :

"তবুও রচনা করে তুলি
রক্তভেজা বিদ্রোহের বিপ্লবের গানগাথাগুলি
যদিও (সে দুঃসাহসী রচনায় শান্তি পাই আমি)
ওরা এসে কাটে সে-অঙ্গুলি।"

মোটকথা, যাঁরা প্রগতিসাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা যদি গালিব-এর বিপ্লবী ঐতিহ্যের প্রাণবন্ত ধারাকে আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের কাব্য-সাহিত্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হন, তবেই গালিব-এর মৃত্যু শত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন সার্থক হবে।

ধনঞ্জয় দাশ

প্রতিমা ঠাকুর

৫ই নভেম্বর ১৮৯৩—৯ই জানুয়ারি ১৯৬৯

১৯১০ সালের জানুয়ারি মাসে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী বিধবা প্রতিমাদেবীর বিবাহ বাঙলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা, ঠাকুর পরিবারে এই প্রথম বিধবা-বিবাহ। এই সূত্রে এই কথা স্মরণীয় যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারেও তিনি যে কতটা উৎসাহী ছিলেন, তার প্রমাণ শুধু পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ নয়, তাঁর প্রিয় শিষ্য অজিত-কুমার চক্রবর্তীর ঐ একই সময়ে বিধবা-বিবাহেও তিনিই ছিলেন উদ্‌যোগী।

বিবাহের পর নববধূর হাতে চাবির গোছা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "বউমা, তোমার উপর বাড়ির সবকিছুর ভার দিলাম।" কিন্তু প্রতিমাদেবী ভার নিয়েছিলেন শুধু গৃহস্থাশ্রমের নয়, গৃহের বাইরে ভুবনডাঙ্গার বিস্তৃত প্রান্তরে রবীন্দ্রনাথ যে দ্বিতীয় গৃহ রচনা করেছিলেন—সেখানকারও। তখনকার সেই বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে আশ্রয় ক'রে ক্রমে বিরাট বিশ্বভারতীতে পরিণত হলো, প্রতিমাদেবীর গৃহিণীপনার দায়িত্বও বাড়ল সঙ্গে সঙ্গে। এই দায়িত্ব তিনি জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত—যতদিন না অক্ষম হয়ে পড়েন—বহন করেছেন সচ্ছন্দ নৈপুণ্যের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের বউমা হয়েছিলেন আশ্রমবাসী সকলেরই শ্রদ্ধার ও আদরের বউঠান। স্বদেশে ও বিদেশে যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, প্রতিমাদেবীর মাধুর্যে মুগ্ধ হননি এমন কেউ আছেন বলে জানিনা। দার্শনিক শ্রীশচন্দ্র সেনের মুখে শুনেছি যে তাঁর গুরু জগৎবিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক অয়কেন প্রতিমা-দেবীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ীর পক্ষে শিল্পচর্চা স্বাভাবিক, মাতা বিনয়িনীদেবীরও আঁকার হাত ছিল যথেষ্ট, আর মাসিমা সুনয়নীদেবী প্রবর্তন করলেন ছবি আঁকার এক স্টাইল। ঘরের ও বাইরের নানা কাজের মধ্যেও তিনি স্বামী রথীন্দ্রনাথের মতন নিয়মিত শিল্পচর্চা করতেন। তাঁর আঁকা

কোনো কোনো ছবি শিল্পরসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। স্বামীর সাহচর্যে ও উৎসাহে তাঁর শিল্পচর্চা বিস্তৃত হয়েছিল উদ্যান রচনায়। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীর ছাপ রয়ে গেছে উত্তরায়ণের আশ্চর্য বাগানে।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনায় ও প্রচ্ছদসজ্জায় প্রতিমাদেবী ছিলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ করের সহযোগী। নৃত্যনাট্য সম্পর্কে তাঁর যে একটি স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—তার পরিচয় পাওয়া যায় নৃত্যনাট্য বিষয়ক তাঁর রচনায়। কিন্তু প্রতিমাদেবীর সব চাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা 'নির্বাণ'—যাতে আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের চরম অধ্যায়ের মর্মান্তিক বর্ণনা।

রথীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। তাঁর ভগ্নী মীরাদেবী ভগ্ন দেহ নিয়ে বাস করছেন কলকাতায়। রবীন্দ্র-পরিবারের ক্ষীণ দীপশিখা শান্তিনিকেতনে লালন করছিলেন প্রতিমাদেবী, আজ তারও হলো নির্বাণ। ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণে সে মহানির্বাণ ঘটেছিল। তারপর এই নির্বাণও আমাদের কাছে মর্মান্তিক। কেননা, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যোগসূত্র হলো সম্পূর্ণ ছিন্ন।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিমাদেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন জোড়াসাঁকোর ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বিখ্যাত বাড়িটির দক্ষিণের বারান্দার কথা—সে বাড়িটি ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা। এরই একটা দিক ছিল অন্দরের মতো, আর আরেকটা দিকে অতিথি-অভ্যাগতের সঙ্গে আলোচনা জমাতেন তিন ভাই গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ। বাঙলা সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসে এই বারান্দার অবিস্মরণীয় ছবি এঁকে গিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র উনষাট বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তাঁর মাসিমা প্রতিমাদেবীর মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই। মোহনলাল মানুষ হয়েছিলেন মাতামহের গৃহে। কিন্তু তাঁর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় আমাদের জানা নেই।

কিন্তু সাহিত্যিক পিতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর একাধিক বইতে পাওয়া যায় বিচিত্র রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয়। এর উপর তিনি ছিলেন পরিসংখ্যান বৈজ্ঞানিক। Indian sta-

tistical Institute-এ তিনি বহু বৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে চাকুরী করে গেছেন। মোহনলালের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিচয় যাঁরা পাননি, তাঁরাও তাঁর সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়েছেন।

মোহনলাল স্বল্পভাষী ছিলেন। কিন্তু অতি অল্প দু-একটি কথায় তিনি আসব জমিয়ে তুলতেন। তাই মোহনলালের মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো, তা শুধু বাঙলা সাহিত্যেরই নয়; একাধিক ঘরোয়া আসর বহুদিন তাঁর অভাব বোধ করবে।

হিরণকুমার সান্যাল

জন আরন্‌স্ট স্টেইনবেক

জন আরন্‌স্ট স্টেইনবেক-এর মৃত্যুসংবাদ দুঃখকর সন্দেহ নেই। তাঁর বিয়োগে আমেরিকা এবং পৃথিবী এ যুগের একজন প্রধান ঔপন্যাসিককে হারাল। ছোটগল্পের লেখক হিসেবেও তিনি স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছেন।

স্টেইনবেক-এর জন্ম হয় ক্যালিফোর্নিয়ার ফানিলাস-এ, ১৯০২ সালের ২৭-এ ফেব্রুয়ারিতে। একটি উপন্যাসের পর সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য আত্মপ্রকাশ ঘটে একটি গল্পের বই দিয়ে: 'দ্য প্যাসচার্‌স্ অব হেভেন' (১৯৩২)। স্টেইনবেক প্রধানত আঞ্চলিক লেখক—তাঁর পটভূমির জন-জীবন, তার দুঃখ-যন্ত্রণা—এগুলো ক্রমশ উদ্ভাসিত হতে থাকে তাঁর একটির পর একটি সফল ও বলিষ্ঠ উপন্যাসে: 'টরটিলা ফ্ল্যাট' (১৯০৬), শ্রমিক ধর্মঘট ভিত্তিক 'ইন ডুবিয়াস ব্যাট্‌ল্' (১৯৩৬) ইত্যাদিতে।

পৃথিবীর ক্ষুধিত ও সংগ্রামী মানুষের কাছে—তাদের প্রবক্তারূপে স্টেইনবেক-এর সর্বাধিক পরিচিতি ঘটে ১৯৩৯-এ প্রকাশিত তাঁর অনন্যসাধারণ উপন্যাস 'দ্য গ্রেপ্‌স্ অব্ র‍্যাথ্'-এর মাধ্যমে। স্বাভাবিক কাব্যস্পন্দিত অথচ প্রদীপ্ত ভাষায় রচিত এই উপন্যাসে পুঁজিবাদীদের দ্বারা বাস্তুচ্যুত একটি পরিবার—যারা জীবিকার সন্ধানে ছুটে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ায়—তাদের ক্রোধ-যন্ত্রণা-ক্ষুধা-সংগ্রামের একটি নিদারুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সর্বকালের অন্যতম উল্লেখ-

যোগ্য এই মহান উপন্যাস মার্কিনী শোষণবাদের মর্মকেন্দ্রে আঘাত দিয়েছিল, এর চলচ্চিত্র রূপ 'আন্-অ্যামেরিকান' ব'লে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর আর-একটি স্মরণীয় সৃষ্টি যুদ্ধের পটভূমিতে লেখা 'দ্য মুন ইজ ডাউন' (১৯৪২)—সেখানেও অপরাজিত জীবনের অভিনন্দন। বাঙলায় বইটি অনূদিত হয়েছে 'অস্তগামী চাঁদ' নামে।

স্টেইনবেক-এর শ্রেষ্ঠ গল্প-সংগ্রহ তাঁর 'দ্য লং ভ্যালি' (১৯৩৮)। বইটির বিখ্যাত গল্পগুলির সঙ্গে সাহিত্য-পাঠকমাত্রেই পরিচিত। তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য রচনা: 'অব মাইস অ্যাণ্ড মেন' (১৯৩৭), 'ক্যানারি রো' (১৯৪৫), 'দ্য পার্ল' (১৯৪৭) এবং 'বার্নিং ব্রাইট' (১৯৫০)।

শেষ জীবনে সংগ্রামী লেখক স্টেইনবেক বদলে গিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বেদনাদায়ক। কিন্তু আমেরিকা বিচিত্র দেশ। হাওয়ার্ড ফাস্ট আর রিচার্ড রাইটই তো তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

'পরিচয়' পত্রিকার বন্ধু, অধুনালুপ্ত 'পূর্বপত্র' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক, কবি নবেন্দু চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে আমরা মর্মাহত। তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রখ্যাত কবি, বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও 'পূর্বাশা' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। এই বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করার বাসনা রাখি।

প্রখ্যাত সাংবাদিক, ঔপনিবেশিক দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিশ্বস্ত বন্ধু কিংসলে মার্টিনকে হারিয়েও আমরা বেদনাহত। তাঁর স্মৃতির প্রতিও আমরা আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শেষ মুহূর্তে সংবাদ এলো মীরাদেবীর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। এই মহীয়সী রমণীর মৃত্যুতে "রবীন্দ্রবংশধারা" লুপ্ত হলো। কিন্তু আমরা জানি যতদিন বাঙলাদেশ আছে, ততদিনই রবীন্দ্রনাথ থাকবেন। থাকবে মীরাদেবীর স্মৃতিও। পরবর্তী কোনো সংখ্যায় যোগ্যতর কোনো সুধী মীরাদেবীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যথাযোগ্য ভাবে নিবেদন করবেন। —সম্পাদক

ছাপাখানার দুর্বিপাকে 'পরিচয়'-এর বর্তমান সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন যুগ্ম-সংখ্যারূপে প্রকাশ করতে বাধ্য হওয়ায় আমরা দুঃখিত। অবশ্য গ্রাহকগণকে ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। —কর্মাধ্যক্ষ, 'পরিচয়'

সূচিপত্র

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ । সংখ্যা ৯
চৈত্র । ১৩৭৫

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার । অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ।
গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ । সংখ্যা ৯
চৈত্র । ১৩৭৫

গর্কিকে লেখা লেনিনের একটি চিঠি

প্রিয় অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমিচ,

টনকভের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার এবং আপনার চিঠি পাওয়ার পূর্বেই আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কামেনেভ এবং বুখারিনকে প্রাথমিক শিক্ষার্থী শ্রেণীভুক্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দিয়েছি। যাকে যাকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে এই গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুল করা হয়েছে।

অবশ্য এটাও পরিষ্কার যে সাধারণভাবে এই সমস্ত 'শিক্ষার্থী' ও 'প্রাথমিক শিক্ষার্থী'দের গ্রেপ্তার করাটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এবং এর প্রয়োজনও ছিল।

যখন এই ব্যাপারে আমি আপনার স্পষ্ট মতামত জানতে পারলাম, তখন লণ্ডন কাপ্রি এবং অন্যান্য জায়গায় আমাদের পরস্পরের আলোচনার সময় আপনার একটি উক্তির কথা আমার মনে পড়ল। এই উক্তিটি তখন বিশেষভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছিল। উক্তিটি হচ্ছে, "আমরা শিল্পীরা হলাম অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি।"

অত্যন্ত খাঁটি কথা। কিন্তু আপনি হঠাৎ এত ক্রুদ্ধ হয়ে এই সমস্ত অবিশ্বাস্য কথাবার্তা লিখেছেন কেন? যেহেতু কয়েক ডজন (অথবা কয়েক শত) শিক্ষার্থী এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থী ভদ্রলোককে কারাগারে কয়েকদিন কাটাতে হচ্ছে। আর এদের জেলে পোরা হয়েছে কেন? ক্রাসনায়া গর্কার আত্ম-সমর্পণের মতো ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের পথ রুদ্ধ করবার জন্য। যে ষড়যন্ত্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের মৃত্যু ঘটতে পারত।

সত্যি, কি ভয়ঙ্কর ঘটনা। সত্যি, কি অবিচার। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের জীবন বাঁচানোর জন্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে মাত্র কয়েকদিন অথবা কয়েক সপ্তাহের জন্য জেল খাটতে হচ্ছে। "শিল্পিরা সত্যিই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি।"

জনসাধারণের বুদ্ধিজীবী অংশের সঙ্গে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মিলিয়ে দেখাটা অত্যন্ত অন্যায়। শেষোক্তদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি কোরোলেঙ্কোকে ধরতে পারি। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে রচিত তাঁর 'যুদ্ধ, পিতৃভূমি ও মানবজাতি' নামক পুস্তিকাটি আমি সম্প্রতি পড়েছি। কোরোলেঙ্কো 'প্রাথমিক শিক্ষার্থী'দের মধ্যে সর্বোত্তম এবং তাঁকে প্রায় 'মেনশেভিক' বলা চলে। অথচ তাঁর এই লেখায় সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে সমর্থন করবার কী হীন এবং ঘৃণ্য প্রচেষ্টাই না চালানো হয়েছে। বুর্জোয়া ভাবধারায় বন্দী একজন অন্তঃসারশূন্য বুদ্ধিজীবী ছাড়া একে আর কিছুই বলা চলে না। এই সমস্ত ভদ্রলোকের কাছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক কোটি লোকের নিহত হওয়া সমর্থনযোগ্য, কিন্তু জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত গৃহযুদ্ধে কয়েক লক্ষ লোক মারা গেলেই এঁরা আর্তনাদ করে ওঠেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

না। এই সমস্ত 'প্রতিভা'দের দু-এক সপ্তাহ জেলে আটকে রাখাতে কোনো অন্যায় হয় না। বিশেষ করে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটনের জন্য এবং লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বাঁচানোর জন্যই এদের কিছুকাল আটকে রাখা প্রয়োজন। আমরা অবশ্য এই সমস্ত 'শিক্ষার্থী' ও 'প্রাথমিক শিক্ষার্থী'দের মুখোশ খুলে দিয়েছি। এবং আমরা নিশ্চিত জানি যে 'প্রাথমিক শিক্ষার্থী' অধ্যাপকবৃন্দ প্রায় সর্বত্রই ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করছে। এটা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্য থেকে দ্রুত এক বুদ্ধিজীবীশ্রেণী গড়ে উঠছে। বুর্জোয়া ও তাদের সঙ্গীসাথী, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এবং পুঁজিবাদীদের অনুচরদের ধারণা যে একমাত্র তারাই হলো জাতির প্রকৃত 'মস্তিষ্ক'। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তারা মোটেই তা নয়। জনসাধারণের ভিতর থেকে যে নতুন বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটছে, তা ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করে একদিন এদের উৎখাত করবে।

যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী পুঁজিবাদের ভৃত্য হিসেবে কাজ না করে জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন—তাঁদের আমরা গড়পড়তা হারের চেয়েও বেশি বেতন দিই। এ তথ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁদের ভালোমন্দের দিকে আমরা নজর রাখি। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শত শত বিশ্বাসঘাতকের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে

হাজার হাজার অফিসার লালফৌজকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করে চলেছেন। এটাও একটা সত্যি ঘটনা।

আপনার মেজাজ এবং ধারণা বুঝতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। (কারণ, আপনি জানতে চেয়েছেন আমি আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পেরেছি কিনা?) কাপ্রিতে এবং তার পরে একাধিকবার আমি আপনাকে সতর্ক করে বলেছি যে আপনি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিকৃষ্টতম অংশের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন এবং তাদের নাকীকান্নায় সব ভুলে ফাঁদে পা দিয়েছেন। কয়েক শত বুদ্ধিজীবীকে আটকে রাখা হয়েছে বলে চারপাশে যে হৈ চৈ তোলা হয়েছে—আপনি তার দিকে নজর দিচ্ছেন, অথচ লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং কৃষকের কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে রাখার জন্য দেনিকিন, কোলচাক, লিয়ানোজভ, রদজিয়াঙ্কো, ক্রসনায়া গর্কা (এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীবৃন্দ) প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীরা চেষ্টা করছে—তা আপনার কর্ণগোচর হয় না এবং সেদিকে আপনার নজরও নেই। আমি বেশ বুঝতে পারছি, সম্পূর্ণভাবেই বুঝতে পারছি—এই পথে চললে কেবলমাত্র "সাদাদের মতোই লালেরাও জনসাধারণের প্রচণ্ড শত্রু" (অর্থাৎ মালিক ও জমিদারশ্রেণীকে উচ্ছেদ করবার জন্য যারা সংগ্রাম করছে, তারা নাকি জমিদার ও মালিকদের মতোই জনসাধারণের শত্রু)—এই কথাই লেখা যায় না, জারকে সর্বশক্তিমান পিতা বা ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবার ইচ্ছাও ধীরে ধীরে মনে জাগে। হ্যাঁ, আমি বেশ বুঝতে পারছি।

সত্যি কথা বলতে কি, যদি আপনি এখনও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে না নেন—তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশা করছি যে আপনি যথাশীঘ্র সম্ভব এদের কাছ থেকে সরে যেতে পারবেন। আন্তরিক অভিনন্দন সহ

আপনার

লেনিন

পুনশ্চ: অনেকদিন ধরেই আপনি কিছু লিখছেন না। ভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীদের নাকীকান্নায় ভুলে আপনি নিজেকে নষ্ট করছেন। আপনি কিছুই লিখছেন না। একজন শিল্পীর পক্ষে এর চেয়ে সর্বনাশের এবং লজ্জার আর কিছুই হতে পারে না।

[১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর লেনিন গর্কিকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন।]

অনুবাদ: বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

নৌ-বিদ্রোহের সেই রক্তরাঙা দিনগুলি

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৬ সালের শুরুতে যে কাহিনী লিখতে বসেছি, তার সূচনা হয়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর আগে। মনে পড়ছে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন। ফরিদপুরের পালং থানা দখল করতে গিয়েছিলাম, গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাকে। তখন আমার বয়স পনেরো। পুলিশী হামলার সম্মুখে সেই পনেরো বছরের নিরস্ত্র কিশোর স্বপ্ন দেখেছিল অন্য পথের, অহিংসা নয়, অস্ত্রের পথে ভারতের মুক্তি। আর সেই অস্ত্রের অদৃশ্য আহ্বানে ১৯৪৩ সালে নাম লেখালাম নৌ-বাহিনীর 'বয়েজ নেভি'তে।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। আমার বয়স তখন প্রায় ষোলো। প্রথম ছ-মাস এইচ. এম. আই. এস. 'দেলোয়ার'-এ শিক্ষানবিশী করলাম। 'দেলোয়ার' ছিল করাচি শহরের পুবদিকে এক উপকূল এস্টাব্লিশমেণ্ট। আর. ব্যাচ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কামান চালানোর কাজে 'ভেলিকো' বিভাগে O. No. 36170 নম্বর শিক্ষানবীশ ছিলাম। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য আমাকে এইচ. এম. আই. এস. 'বাহাদুর'-এ পাঠানো হল। বাহাদুর ছিল করাচির খুব কাছে 'মনোরা' দ্বীপে। 'মনোরা' দ্বীপটি সত্যিই খুব ছোট, কিন্তু সামরিক গুরুত্ব তার অসাধারণ। 'মনোরা' দ্বীপের নজর এড়িয়ে করাচি বন্দরে প্রবেশ করে, বা বন্দর ছেড়ে যায়, কার সাধ্য! এই ক্ষুদে দ্বীপটির পূবদিকে রয়েছে আরব সাগরের নীলাম্বু রাশি আর পশ্চিমে করাচির বিখ্যাত বন্দর 'কিমারী'। উত্তরে রয়েছে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত করাচি ফোর্ট। তা ছাড়া তখন দক্ষিণে ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় গানারি-কেন্দ্র এইচ. এম. আই. এস. 'হিমালয়'। আর মাঝখানে ছিল বিমানবিধ্বংসী ট্রেনিং কেন্দ্র এইচ. এম. আই. এস. 'চমক'। এ ছাড়া 'মনোরা' দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে আছে হিন্দুদের এক বিখ্যাত ধর্মমন্দির।

এবার আসল কাহিনীতে আসি।

১৯৪৫ সাল। দিল্লির লালকেল্লায় চলেছে আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর বিচার। সমস্ত ভারতভূমি তখন আন্দোলিত, উদ্বেলিত। বিচারের প্রহসনে ক্ষুব্ধ

মানুষ ফেটে পড়ছে গণবিক্ষোভে—কলকাতায়, বোম্বাইয়ে, দিল্লিতে—জানা-অজানা শহর-গ্রাম-জনপদে। আরব সাগরের স্ফুরিত তরঙ্গের লক্ষ করতালির শীর্ষে ভারতভূমির উত্তেজনার তরঙ্গ আমাদের বুকেও তখন স্পন্দিত। জনৈক শ্রীমেনন-এর তত্ত্বাবধানে পাঁচশো টাকা চাঁদা উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর মুক্তি-তহবিলে। ব্যাপারটা খুবই গোপনে সংগঠিত হল। আমাদের হাত-খরচা ছিল তখন মাত্র বারো টাকা, কোনো বেতন ছিল না আমাদের। তা থেকে ঐ টাকা সংগৃহীত হল। যুদ্ধ শেষ। ভারত তখন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিস্ফোরণের প্রত্যাশায়। আমরা নৌ-বাহিনীর লোকজনেরাও জড়িয়ে পড়লাম সেই মুক্তি-সাধনায়।

১৯৪৬ সাল। আমাদের আর. ব্যাচ-এর শিক্ষানবিশী তখন সাঙ্গ হয়েছে। এইচ. এম. আই. এস. যুদ্ধজাহাজ 'হিন্দুস্থান' নোঙর করেছে করাচি বন্দরে। আমাদের নিয়ে পাড়ি জমাবে সিঙ্গাপুরের দিকে। আমাদের ডাক দিচ্ছে সমুদ্র। আর ঠিক তখনই ডাক এলো অন্য আরেক সমুদ্রের। ১৯এ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা খবর এলো বোম্বাইয়ে নৌ-সেনারা বিদ্রোহে সামিল হয়েছেন। আমাদের মধ্যে বিদ্যুৎচমক খেলে গেল। অভ্যস্ত জীবন-ধারা বদলে গেল এক মুহূর্তে। কিন্তু বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌ-সেনারা রুখে দাঁড়িয়েছেন কেন? একই কাজে নিযুক্ত বৃটিশ আর ভারতীয়দের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আচরণের ফারাক ছিল আসমান-জমিন। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর সেনানীদের চেয়ে রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সৈনিকেরা অনেক ক্ষেত্রেই অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বৃটিশ অফিসাররা তা অনেক সময় মুক্তকণ্ঠে স্বীকারও করেছেন। তবু কেন এমন বৈষম্য, শুধু গায়ের রঙের তফাতের জন্য? আমরা মর্মে মর্মে বুঝলাম, এই অবিচারের জন্য দায়ী আমাদের পরাধীনতা। তারা রক্ষা করছে তাদের সাম্রাজ্য—কিন্তু আমরা লড়ছিলাম কেন? যুদ্ধ শেষ। তাদের পাওনা তো তারা পেয়েছে। আর আমরা? পরাধীনতার জ্বালায় তখন পুড়ছি। বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌ-সৈনিকরা দাবি করেছে, অবিলম্বে খাদ্য ও বেতনের ক্ষেত্রে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে হবে। উচ্চপদস্থ নৌ-অফিসাররা ভারতীয় নৌ-সেনানীদের মানুষ বলেই যেন গ্রাহ্য করত না। বিদায় দিতে হবে চিরকালের জন্য তাদের দুর্ব্যবহার। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নৌ-জোয়ানেরা বন্দুক তুলে নিয়েছে। খবর পৌঁছল আমাদের ডাঙার নৌ-শিবিরে, খবর পৌঁছে গেল

বন্দরে নোঙর ফেলা এইচ. এম. আই. এস. 'হিন্দুস্তান' ও 'তীর' যুদ্ধ জাহাজে। রাজকীয় ভারতীয় নৌবহরে কোনো ব্যাটল শিপ বা ক্রুজার ছিল না, ছিল ডেস্ট্রয়ার আর মাইন সুইপার। 'হিন্দুস্তান' ছিল প্রথম শ্রেণীর, আর 'তীর' ছিল দ্বিতীয় ধরনের।

১৯এ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬। সন্ধ্যা আটটায় রাত্রির খাবার-সঙ্কেত দেওয়া হল। ইনস্ট্রাক্টররা ডাইনিং হলে খাবার জন্য আমাদের ফল-ইন করার নির্দেশ দিলো। পাঁচশত রেটিং-এর মধ্যে একজনও জাহাজের পেটি-অফিসারের নির্দেশে সাড়া দিলো না। যে যার প্লেট-মগ নিয়ে ডাইনিং হলে চলে গেলাম। সামরিক শৃঙ্খলার সেই লোহার বেষ্টনী আমরা অবহেলায় ভাঙলাম। অফিসারদের চোখ ঠিকরে পড়ে আর কি! এ যে অভাবনীয়, এতে যে কোর্ট-মার্শাল পর্যন্ত হতে পারে! অফিসাররা ছুটলেন ক্যাপ্টেন টডের কোয়ার্টারে। ক্যাপ্টেন টড পঞ্চাশোর্ধ্ব। একেবারে লালমুখো ইংরেজ। সারাটা জীবন তিনি প্রায় যুদ্ধজাহাজেই কাটিয়েছেন। টড অফিসারদের হুকুম দিলেন, রেটিংদের বোঝাও। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করো। রাত দশটায় শয্যা গ্রহণের নির্দেশ জানিয়ে বিউগল ধ্বনি হল। কিন্তু কেউ শয্যা গ্রহণ করল না। অফিসাররা বহু মিষ্টি কথা বললেন। কিন্তু তাতে আর চিঁড়ে ভেজে না। আমরা মাস্ট-এর সামনের ময়দানে জমায়েত হলাম। আলোচনা চলল পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। অফিসাররা হাল ছেড়ে দিয়ে ঘটনার গতির দিকে নজর রাখলেন। রাত দুটো ত্রিশ মিনিটের সময় খবর এলো, বোম্বাইয়ের 'কাস্ট ব্যারাক'-এ তো বটেই, বন্দরের সমস্ত ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজে খাদ্য পাঠানো বন্ধ করা হয়েছে। হুকুম দিয়েছেন রাজকীয় নৌ-বাহিনীর ভাইস এ্যাডমিরাল গডফ্রে স্বয়ং। উত্তেজনা চরমে উঠল। তুমুল উত্তেজনায় রাত পোহাল। এলো সেই ইতিহাস খ্যাত ২০এ ফেব্রুয়ারি।

সকাল আটটা। এইচ. এম. আই. এস. 'বাহাদুর'-এর প্রশস্ত চত্বর। সেদিন ষোলো থেকে বিশ বছরের পাঁচশত তরুণ ভারতের স্বাধীনতার পাতায় রক্তের স্বাক্ষর দেবার জন্য তৈরি।

প্রাতরাশের জন্যে ফল-ইন-এর ডাক পড়ল। সমবেত হলাম মাস্টের সামনের ময়দানে। "লং লিভ দি কিং"-এর সুরে বিউগল বেজে উঠল। ইউনিয়ন জ্যাক মাস্তুলের মাথায় উঠতে লাগল। কিন্তু পাঁচশো দক্ষিণ-বাহু অভিবাদন জানাল না বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতীক ঐ পতাকাকে। অফিসাররা

হতবাক। এঁরা জন্মসূত্রে ভারতীয়—কর্মসূত্রে আধা-ইংরেজ। আমরা তখন চললাম ডাইনিং হলের দিকে।

সবে খাবার মুখে তুলতে যাচ্ছি। হঠাৎ সতেরো বছরের এক পাঞ্জাবী তরুণ টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠল। ডাক দিলো, "আপলোগ কো সরম নেহি হোতা হ্যায়, জানতা হুঁ আজ দো রোজসে বম্বাই সহরমে আপলোগো-কা ভাই ভুখা পড়া রহা হ্যায়। ফিক্ দো এ খানা।" মুহূর্তের মধ্যে পাঁচশো রেটিং মুখের গ্রাস ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ঝনঝন করে ডিসগুলি ভেঙে গেল ডাইনিং হলের মেঝের উপর। ষোলো থেকে বিশ বছরের পাঁচশো তরুণের ধমনীতে রক্ত ফুটছে তখন। বেরিয়ে এলাম ডাইনিং হল থেকে ছুটে, মাস্ট-এর দিকে। তখনও ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে মাস্তুলের মাথায়।

দুশো বছর ধরে যে পতাকা গর্বোদ্ধতভাবে উড়ছিল, আমরা তা নামিয়ে নিলাম। পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম সেই পতাকা। দ্বিতীয় লক্ষ্য আমাদের, অস্ত্রাগার—স্ট্রং রুম। যে কজন ইংরেজ অফিসার ছিল, তারা পালিয়ে গেল টড সাহেবের কোয়ার্টারে। ভারতীয় অফিসাররা তখনও আমাদের মাথা ঠাণ্ডা করতে বলছেন। আমরা বললাম, "আপনারা যদি সৎ আর আন্তরিকই হয়ে থাকেন, তাহলে অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দিন, আমরা হাতিয়ার চাই। আমরা আপনাদের আঘাত করতে চাই না।" কোয়ার্টার মাস্টার চাবি নিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই, বেয়নেটের আঘাতে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল। অফিসাররা প্রমাদ গুণলেন। বুঝলেন, তাদের বেইমানি এবার ধরা পড়ে যাবে। স্ট্রং রুম খোলা হল। রাইফেল, ল্যাণ্ড চেস্টার, মেশিন গান প্রভৃতি অস্ত্রগুলি প্রত্যেকটা পরীক্ষা করা হল। দেখলাম, ফায়ারিং-পিন গুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বুঝলাম, এরা আমাদের নিরস্ত্র অবস্থায় খুন করতে চাইছে। চালাবার মতো অবস্থায় রয়েছে চারটি রাইফেল, একটি ল্যাণ্ড চেস্টার গান, পাঁচটি পিস্তল ও একটি চার ইঞ্চি ব্যাসের কামান। তখন ঠিক হল, 'হিন্দুস্তান' জাহাজ থেকে অস্ত্র আনা হবে। 'হিন্দুস্তান' তখন সদ্য যুদ্ধ-ফেরত রণতরী। অফুরন্ত অস্ত্র রয়েছে তার অস্ত্রাগারে। বোট ইয়ার্ডে আমরা ছুটলুম। একটি বোটেরও পাত্তা মিলল না। আমাদের যাবার আগেই সেগুলি ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের উত্তেজনা তখন চরমে উঠেছে। ছুটে এলেন বাবা সাহেব। তিনি ছিলেন আমাদের সবারই শ্রদ্ধাভাজন ভারতীয় সাব-লেফটেনাণ্ট। তিনি অনুনয় করলেন আমাদের নিরস্ত হতে। আমরাও জানালাম, বাইরের

কোনও ফোর্স আনা হলে বা প্রতিশ্রুতি ভাঙলে তক্ষুণি আমরা অফিসারদের হত্যা করব।

ঠিক করলাম এবার আমরা 'চমক' হয়ে 'হিমালয়'-এ পৌছব। সেখান থেকে পৌছব রণতরী 'হিন্দুস্তান'-এ। সেখানে আছে প্রচুর গোলাবারুদ, অস্ত্রসম্ভার। আছে অব্যর্থলক্ষ্য সন্তযুদ্ধফেরত ভারতীয় গোলন্দাজ। কয়েক-জনকে আমরা রেখে গেলাম আমাদের এস্টাব্লিশমেণ্টে। বলা হল, অফিসাররা যেন পালাতে না পারে। প্রতিশ্রুতি ভাঙলেই বলপ্রয়োগ করতে হবে। সেই বন্ধুদের সঙ্গে রইল চারটি রাইফেল, একটি ল্যাণ্ড চেস্টার, দুটি পিস্তল, একটি মেশিন গান ও সেই চার ইঞ্চি ব্যাসের কামানটি। বেতার অপারেটরকে বোম্বাই ও 'হিন্দুস্তান'-এর সঙ্গে সংযোগ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হল। সিগন্যালারকে নির্দেশ দেওয়া হল, 'হিন্দুস্তান' জাহাজের সঙ্গে গোপন সংবাদাদি আদান-প্রদান করবার জন্ম।

রওনা হতে বেলা নটা বাজল। ডবল মার্চ করে চললাম 'চমক'-এর দিকে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, জিন্না প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নামে জয়ধ্বনি উঠল আকাশ-বাতাস জুড়ে। বলতে আনন্দ হয়, বোম্বাই থেকে করাচি পর্যন্ত এই বিপুল তটভূমি জুড়ে নৌ-বিদ্রোহের আগুয়ান সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার মতন বাঙালি। 'চমক'-এর অধিনায়ক ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীও অবশ্য বাঙালি ছিলেন। তিনি কিন্তু ছিলেন কর্তৃপক্ষের লোক। তাঁকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিতাম, কিন্তু কেবল ভারতীয় বলেই তিনি সেবার বেঁচে যান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অনেক। প্রথমত, তিনি আমাদের দু-জন গানারকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করে মৃতদেহ 'সেল'-এর মধ্যে রেখে দেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সেলের চাবিও আমাদের হাতে দিতে অস্বীকৃত হন। 'চমক'-এ পৌছেই দেখলাম, রেটিংরা ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীকে ঘিরে রেখেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, গুলি করে হত্যা করা হবে। এগিয়ে গেলাম তাঁর দিকে। পরিষ্কার বাঙ-লায় জিজ্ঞাসা করলাম "আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য কিনা"। ইংরাজিতে জবাব পেলাম "না"। "চাবি কোথায়?" জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তর, "কোয়ার্টার মাস্টার নিয়ে গেছে"। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সেল থেকে মৃতদেহগুলিও গায়েব হয়েছে। প্রমাণাভাবে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী অব্যাহতি পেলেন। জানিনা, এখনও তাঁর সেদিনের কথা স্মরণ আছে কিনা। আমা-

দের আছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম। স্বাধীন ভারতে চক্রবর্তী সাহেবকে ভাইস অ্যাডমিরাল করার প্রস্তাব হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ বা আমাদের কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সে যাই হোক। 'চমক'-এর সহকর্মীরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এবার এগিয়ে চললাম 'হিমালয়'-এর দিকে। বেলা তখন দশটা দশ মিনিট। 'হিমালয়'-এ পৌঁছলাম। সেখানে কামানগুলি আরব সাগরের দিকে মুখ ফেরানো। কিন্তু ফায়ারিং-পিন গুলো একটিতেও লাগানো নেই। আগের রাতেই সবকটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গেলাম বোট ইয়ার্ডে। সেখানে দুটি ল্যাণ্ডিং ক্রাফ্‌ট্‌ অক্ষত ছিল। দুটি দলে ভাগ হয়ে আমরা দুটিতে চড়ে বসলাম। সঙ্গে রইল দুটি ব্রেন গান, দুটি রাইফেল। সিগন্যাল পাঠানো হল 'হিন্দুস্থান'-কে। ইঙ্গিত এলো, একটু সবুর করো।

ইতিমধ্যে দুটি বৃটিশ গানবোট টহলদারিতে বেরিয়েছে। উদ্দেশ্য—'হিন্দুস্থান'-এ যাতে আমরা পৌঁছতে না পারি। আমরা ভাবছি, কি করা যায়! হঠাৎ মেঘগর্জন। 'হিন্দুস্থান'-এর কামান গর্জে উঠছে। গান বোট দুটি লেজ নামিয়ে দে দৌড়। অল ক্লিয়ার সিগন্যাল এলো। আমরা 'হিন্দুস্থান'-এর পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। সে কি উল্লাস, উৎসাহ, আনন্দ। তাঁরা আমাদের হাতে তাঁদের অস্ত্রাগারের রাইফেল তুলে দিলেন। 'হিন্দুস্থান'-এর নাবিকদের নায়কতায় আমাদের মোর্চা পুনর্গঠিত করা হল। ঠিক হল মিছিল নিয়ে শহরে যাব—জনগণকে আমাদের দাবির কথা জানাব, সমর্থন চাইব।

বেলা এগারোটা। অস্ত্র হাতে জাহাজ থেকে আমরা নামতে শুরু করলাম। হঠাৎ গুলির শব্দ। শত্রুদল অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করেছে। আমাদের রাইফেলগুলিও গর্জে উঠল। হুঙ্কার দিয়ে রুখে দাঁড়াল আমাদের চার ইঞ্চি কামানটি। শুরু হল বৃটিশ আক্রমণ।

গুলি বিনিময়ের সময় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম ক্রেনের থামের পিছনে। সেখান থেকে চলল গুলি। জাহাজ থেকে চলল গোলা। গুলি-গোলা থামলে দেখলুম, আমাদের এক কমরেড লুটিয়ে পড়ে আছেন, রক্তাক্ত। শহীদ কমরেডের মৃতদেহ তুলে আনলাম জাহাজের ডেকে। সামরিক প্রথায় তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হল। রাইফেলগুলি গর্জে উঠল এক সঙ্গে। শহীদের রক্তের মান রাখব বলে শপথ নিলাম। সবাই তখন বজ্রকঠিন প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত, প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

বরফ চাপা দিয়ে সিক-রুমে মৃতদেহটি রক্ষা করে, পদাধিকার অনুযায়ী যে-যার জায়গায় আমরা স্থান করে নিলাম। সেই চার ইঞ্চি কামানের চতুর্থ ক্রু হিসেবে আমিও কাজ পেলাম।

এবার জাহাজে নিশান ওড়াতে হবে। কোন পতাকা—কংগ্রেসের তেরঙ্গা না মুসলীম লীগের আল হেলাল। সমাধান এনে দিলেন 'হিন্দুস্তান'-এর এক কমরেড। মৃত কমরেডের রক্ত-রাঙা জামাটি তাঁর হাতে। বললেন, শহীদ কমরেডের রক্তে রাঙা পরিধেয়ই আমাদের পতাকা হবে। লাল নিশান। দুশো বছর ধরে যে ইউনিয়ন জ্যাক বিজয়দম্ভে উড়ছিল, তার স্থলে নীল-সমুদ্রের তরঙ্গ স্ফুরিত জলরাশির বিস্ফোরণের কেন্দ্রে একটি লাল পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে উড়তে লাগল লাল ঝাণ্ডা, মেহনতি মানুষের মুক্তিনিশান। কামান গর্জে উঠল—অভিবাদন জানালাম আমাদের ঝাণ্ডাকে।

বেলা বারোটা। আমরা মধ্যাহ্নভোজন সাঙ্গ করলাম।

দূরে দেখা গেল একটি সেলিং বোট। সিগন্যাল পাঠানো হল—বন্ধু না শত্রু! ইঙ্গিত ফিরে এলো—বন্ধু।

তাঁদের কাছে জানা গেল, 'বাহাদুর'-এর কমরেডরাও অস্ত্রধারণ করেছেন। ইংরেজ বীরপুঙ্গবেরা সশস্ত্র ভারতীয় নাবিকদের দেখে ভীত হয়ে ক্যাপ্টেন টড-এর আস্তানায় আশ্রয় নিতে ছুটছিল। বেয়নেট উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল নওজোয়ান ভারতীয় নাবিক। বেগতিক দেখে তারা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাবা সাহেবের আবেদনে তাদের গুলি করা হল না। আরো খবর ছিল। করাচির বালুচ রেজিমেন্ট, পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্ট, এমনকি গুর্খা রেজিমেন্টও আমাদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। গর্জে উঠলাম আমরা "লং লিভ দি আরমি এ্যাণ্ড ন্যাভাল ইউনিটি"—"লং লিভ লং লিভ"। শুনলাম খোদ বৃটিশ আর্মিকে দিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ চালানো হবে। ভারতীয় রেজিমেন্টের সৈনিকদের ওপেন অ্যারেস্ট করা হয়েছে। ভারতীয় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর মধ্যে এক বিপ্লবী ঐক্য গড়ে উঠল। স্বাধীনতার সড়কে ভারতীয় জনতার সঙ্গে কদম মিলিয়ে এগিয়ে এলো সামরিক বাহিনী। স্বাধীনতার এই লক্ষ্য কংগ্রেসী ও মুসলীম লীগের লক্ষ্য থেকে ছিল মৌলিক ভাবেই আলাদা। আর সে জন্তই এইসব তথাকথিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ নৌ-বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে উদ্যোগী হলেন। আমাদের বিদ্রোহের পতাকা তাঁরা চক্রান্তের কালো হাতে নামিয়ে নিতে চাইলেন। আমাদের সঙ্গে

বেইমানি করলেন তাঁরা। যে কদম কদম বিপ্লবের তুরঙ্গ সারা ভারতে গতি অর্জন করছিল, তাকে রাশ টেনে এক অবধারিত হোঁচট খাওয়া স্তব্ধতায় দাঁড় করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁরাই। সেই বেইমানির ফলেই দেশ হল বিভক্ত, বিভাগপূর্ব ভারতে হল এত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার তাণ্ডব, এত রক্তপাত।

যাই হোক, সব খবর শোনার পর 'বাহাদুর' থেকে আগত কমরেডদের রাতের জন্য সতর্ক থাকতে বলা হল। অনুরোধ করলাম, যদি সম্ভব হয়, কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দিতে। তারা 'বাহাদুর'-এ ফিরে যাবার পর আমাদের স্ট্রাইক কমিটির মিটিং বসল, সন্ধ্যা সাতটায়। বহু বাগবিতণ্ডার পর সিদ্ধান্ত হল, কেবলমাত্র 'হিন্দুস্থান' আর 'তীর'কে অবলম্বন করে করাচি বন্দরে থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না। আমাদের দ্রুত বোম্বাই পৌঁছতে হবে। সেখানে আছেন আমাদের বিদ্রোহী কমরেডরা। দ্বিতীয়ত, বোম্বাইয়ের স্ট্রাইক কমিটির দাবিগুলির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে তুলে ধরলাম। প্রথম দাবি, আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর অফিসার ও সৈন্যদের বিনা শর্তে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমান কাজের জন্য আমাদেরও ইংরেজ নাবিকদের সমান বেতন দিতে হবে। তৃতীয়ত, খাদ্যের মান উন্নত করতে হবে। চতুর্থত, ইংরেজ নাবিকদের মতোই ছুটির সময় যাতায়াতের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের ওয়ারেন্ট দিতে হবে। পঞ্চমত, ভারতীয় নাবিকদের প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে। তাছাড়া, ঊর্ধ্বতন অফিসারদের অন্যায় আচরণ বন্ধ করতে হবে। আরও কয়েকটি দাবি ছিল। সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হল।

রাত্রি সাড়ে নটায় জেনারেল ফল-ইন-এর নির্দেশ এলো। সেখানে স্ট্রাইক কমিটির বোম্বাই যাবার নির্দেশ জানানো হল। আর তখনই বেজে উঠল বেতার গ্রাহক যন্ত্র। 'বাহাদুর' নির্দেশ পাঠাচ্ছেন—বার দরিয়ায় পড়বার আগেই জাহাজ ডুবিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। 'মনোরা' দ্বীপ থেকে কামান দেগে জাহাজ উড়িয়ে দেওয়া হবে।

অথচ 'মনোরা' দ্বীপ এড়িয়ে সমুদ্রে পড়ব কেমন করে? সমস্যার আকাশ কালো হয়ে উঠল। ঠিক হল বাইরের দরিয়া নয়, বন্দরেই আমরা থাকব। ইংরেজরা আক্রমণ চালালে প্রাণ দিয়ে প্রতিরোধ করব।

রাত দশটা। বোম্বাই থেকে বেতারে খবর এলো, ভাইস অ্যাডমিরাল

গভর্ন্রের আদেশে 'ক্যাসল ব্যারাক'-এ জল সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। জানলাম, বোম্বাইয়ের সব জাহাজ হুঁশিয়ারি দিয়েছে, জল সরবরাহ চালু না করলে গোলাবর্ষণ করে বোম্বাই বন্দর গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেওয়া হবে।

আমরা বুঝলাম, এক রক্তক্ষয়ী লড়াই আমাদের সম্মুখে। রাত সাড়ে দশটায় খবর এলো ইংরেজ পিছু হটেছে। 'ক্যাসল ব্যারাক'-এ আবার জল সরবরাহ চালু হয়েছে। আরও খবর এলো। খোদ ইংলণ্ড থেকে একটি বৃটিশ নৌবহর দ্রুত এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে। গভর্ন্রে হুমকি দিয়েছেন, বন্দরে গোলাবর্ষণ করলে বিমান বাহিনী বোমা ফেলে বোম্বাইয়ের বিদ্রোহীদের চূর্ণ করবে।

ওদিকে বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক ও জনসাধারণের সঙ্গে গোরা সৈন্যদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে গেছে। 'ক্যাসল ব্যারাক' আক্রমণ করতে এসে প্রাণ হারিয়েছে বহু ইংরেজ সৈন্য। পরাজিত হয়ে ইংরেজ পুঙ্গবেরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। এ সংবাদে আমরা উল্লাসে ফেটে পড়লাম। জয় বোম্বাই-এর বাহাদুর শ্রমিক, জয় বোম্বাই-এর নৌসেনানী।

এমনি করে রাত গড়িয়ে গেল। ভোর। একুশে ফেব্রুয়ারি, উনিশশো ছেচল্লিশ।

বেলা বাড়তে, বন্দরের শ্রমিকেরা কাজে আসতে শুরু করল। দূর থেকে তারা আমাদের বজ্রমুঠিতে জানাল অভিনন্দন, অভিবাদন। প্রাতরাশের সময় স্টোর রুমে দেখা গেল রুটি নেই। তখন সকাল সাড়ে সাত। ঠিক হল, 'বাহাদুর' আর 'হিমালয়'-এ যে খাদ্যবাহী বোট যাবে, সেটিকে আটক করা হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোটটি এসে পড়ল। আমরা সিগন্যাল দিলাম। কিন্তু বেগ মন্থর না করে বোট তার বাঁধাধরা পথে দ্রুত এগিয়ে চলল। নিরুপায় হয়ে আমরা গুলির আওয়াজ করলাম। বোটটি দাঁড়িয়ে পড়ল ও সাদা পতাকা তুলে আত্মসমর্পণ করল। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য পেয়ে গেলাম।

বেলা সাড়ে আটটায় 'বাহাদুর'-এর ক্যাপ্টেন টড দুজন ভারতীয় লেফটেন্যান্ট সঙ্গে নিয়ে একটি গান বোটে 'হিন্দুস্তান'-এর দিকে এগিয়ে এলেন। আমরা বললুম, প্রথানুযায়ী টুপি খুলে 'হিন্দুস্তান'কে অভিবাদন জানাতে, বললুম 'জয় হিন্দ' বলতে। ক্যাপ্টেন টড অভিবাদন জানালেন বটে, কিন্তু 'জয় হিন্দ' বলতে রাজি হলেন না। আমাদের মধ্যে অনেকেই

'বাহাদুর' থেকে এসেছেন। টড বললেন, "মাই বয়েজ, কাম ব্যাক উইথ মি।" বললেন, "তোমাদের কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না, আমি গ্যারাণ্টি থাকছি। আমারও চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। শিগগিরই আমি ইংলণ্ডে ফিরে যাচ্ছি। বিদায়ের সময় এমন কোনো স্মৃতি আমি বয়ে নিয়ে যেতে চাইনা, যা আমার শেষজীবনকে দুঃখী করে তুলবে। দেশে আমার তোমাদের মতো ছেলে আছে। তোমরা আমারই তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশী করেছ। তোমরা আমার পুত্রপ্রতিম। তোমরা ফিরে চলো। যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তাতে রক্তক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। অথচ সেই বিভীষিকাময় দিন-গুলির কথা মনে করে ত্যাখো। ভারতীয় নাবিকেরা বৃটিশ নাবিকের সঙ্গে তখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাপান ও জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মাহুতি দিয়ে দুনিয়াকে ফ্যাসিজম-এর হাত থেকে রক্ষা করেছে। আর, আজ তারাই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে উদ্যত। তাদের রক্তেই রাঙা হবে আরব সাগরের নীল জল। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে? আমার সঙ্গে ফিরে চলো।"

আমরা বললাম, আমাদের দাবিগুলি মানুন। তিনি বললেন, অফিসারদের দুর্ব্যবহার তিনি বন্ধ করতে পারবেন, কিন্তু অন্য সব তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে।

আমরা তাঁকে ফিরে যেতে বললাম। বললাম, আমরা চাই আমাদের দাবিগুলি আপনারা মেনে নিন। ক্যাপ্টেন টড ফিরে গেলেন। মুখ তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট। বিমর্ষ। কেউ কেউ বললেন, এ হল টড-এর চালাকি। কিন্তু আমি জানি, টড-এর কথায় কোনো ফাঁক ছিল না। কিন্তু তাঁর কথা মানাও তো আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না!

বেলা দশটা বাজল। দেখলাম, ডক শ্রমিকেরা অবেলায় ঘরে ফিরে যাচ্ছে। বেলা দশটার সময় করাচিতে অবস্থিত 'রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভি'র সবচেয়ে বড় অফিসার কমোডর সাহেব আমাদের জাহাজে এলেন। আগে তাঁর আগমনে নাবিকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। আজ কেউ এগিয়ে এলো না অভিবাদন জানাতে। তিনি ভয় পেলেন। সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়েই তিনি কথা শুরু করলেন।

আমরা তাঁকে আমাদের সনদ পেশ করলাম। তিনি সনদটি পড়লেন। চোখে মুখে তাঁর বিরক্তি ফুটে উঠল। বললেন, যথাসময়ে কর্তৃপক্ষের কাছে

এই দাবিপত্র পেশ করা হবে। কিন্তু অবিলম্বে আমাদের অস্ত্রত্যাগ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। তিনি রূঢ়কণ্ঠে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন "বেলা দশটা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে, তাহলে সমস্ত ক্ষমতা নেভির হাত থেকে আর্মির হাতে চলে যাবে। প্রয়োজনবোধে যে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করতে তারা দ্বিধা করবে না।" আমরা সবিনয়ে জানালাম, "তবে গতকাল কার হুকুমে গুলি চলেছিল, কোন অপরাধেই-বা; এ কথার কি আপনি জবাব দেবেন?" তিনি বললেন, "কোনো কৈফিয়ত বা জবাবদিহির জন্য তিনি আসেন নি, তিনি সাড়ে দশটার সময়-রেখা সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি দিতে এসেছেন। বললেন, "শেষ বারের মতো চিন্তা করে দেখো।" কমোডর সাহেবের আচরণে যে অশ্লীলতা ও দম্ভ ফুটে বেরুচ্ছিল, নাবিকদের মধ্যে সেজন্য বিক্ষোভের ঝড় বয়ে গেল। কেউ কেউ তাঁকে 'নোকরি বেচনেওয়ালা' বলেও বিদ্রূপ করলেন। যারা নৌবাহিনীর সংবাদ রাখেন, তাঁরাই কমোডর-এর সামনে এমন উক্তি কতটা দুঃসাহসিকতা তা বুঝবেন।

কমোডর সাহেব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। চার ইঞ্চি ব্যাসের কামান দুটিকে এলিভেট করে পুব ও পশ্চিমমুখী করে রাখা হল। বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থাও হল। প্রতিটি নাবিক যে-যেমন অস্ত্র পেলেন, তাই নিয়ে তৈরি হলেন। আমাকে চার ইঞ্চি ব্যাসের কামানটির তৃতীয় গোলন্দাজ হিসেবে পাঠানো হল। বুকের মধ্যে গুরু গুরু স্পন্দন আর আরব সাগরের গর্জন স্বাধীনতার লড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের অভিষিক্ত করল।

বেলা সাড়ে দশটা। আমাদের সকলের তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। দূর থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এলো। আমরাও তৈরি। আমাদের চার ইঞ্চি ব্যাসের কামানটি অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। বন্দরের বৃটিশ বাহিনীর উপরে চলল গুলি। অল্প সময়ের মধ্যেই লড়াই রুদ্ররূপ ধারণ করল। জাহাজের আশে পাশে, জাহাজের মধ্যে বৃটিশ বাহিনীর গোলা এসে পড়ছে। চতুর্দিকে ধোঁয়া, ক্রুদ্ধ ভারতীয় নৌ-সৈনিকদের হুঙ্কার, গুলির শব্দ ও রণধ্বনি। হঠাৎ ~~গোলার আঘাতে~~ আমাদের প্রথম গোলন্দাজ লুটিয়ে পড়লেন। মুহূর্তে দ্বিতীয় গোলন্দাজ তার স্থান নিলেন। কামানে আমি শেলের পর শেল ভরে দিতে লাগলাম। তারপর কখন

যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, আমার দুজন সহকর্মী প্রথম ও দ্বিতীয় গোলন্দাজের দেহ গোলার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। অথচ তখনও গর্জন করছে আমাদের মেশিনগান, হুঙ্কার দিচ্ছে আমাদের চার ইঞ্চি ব্যাসের কামান। ধমক দিচ্ছে আমাদের আরলিকেন গান-রাইফেল-রিভলবার।

বেলা বেড়ে উঠছে। অভিমন্যু বধের জন্য ইংরেজ সৈন্য চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছে। বৃষ্টির ধারার মতো আমাদের উপর গুলিবর্ষণ চলেছে। ডেকের উপর নামা অসম্ভব হয়ে উঠল। হামাগুড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেলাম আমরা। একে একে চুপ করল আমাদের কামান, অরলিকেন গান, মেশিন গান। ডেক থেকে একজন এসে খবর দিলেন, জাহাজে আগুন ধরে গেছে। শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেছে কোয়ার্টার ডেক ও পুপ। এই অসম যুদ্ধের শেষ তখন। ডেকে উঠে এলাম আমরা। গোরা সৈনিকরা টমিগান উঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠল "ব্লাডি ইণ্ডিয়ান কুত্তীর ছানার দল, হ্যাণ্ডস আপ।"

চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছেন মৃত শহীদেরা। আহতের দল আর্তনাদ করছেন। গোলার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন অনেকে। রক্ত আর রক্ত। শত্রুপক্ষের মৃতের সংখ্যা যে আমাদের চেয়ে কম নয়, তাও আমরা বুঝলাম।

জানলাম আগের দিন রাতে সমুদ্র উপকূলের সমস্ত বাড়ি ইংরেজ বাহিনী জবরদখল করে নিয়েছিল। তারপর আশি মিলিমিটার ব্যাসের কামান ব্যবহার করেছে। চতুর্দিক ঘিরে ধরেছিল তারা। ঐ আশি মিলিমিটার হাঁ-মুখের কামান যদি তারা ব্যবহার করতে না পারত, তবে সে দিনের যুদ্ধে জয় হতো আমাদেরই। তারা ঘিরে ধরেছে। অথচ আমাদের জাহাজ ছিল স্থির। এমন সুবর্ণসুযোগ আক্রমণকারীরা পায় কজন?

একে একে মাথার উপর হাত তুলে সবাই ডাঙায় নেমে এলাম। পিছনে পড়ে রইলেন মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদবৃন্দ। রইলেন মুমূর্ষু ও আহতেরা। বেলা দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। নামালেই গুলি। রক্তচোখে প্রহরায় ঘিরে রয়েছে সাব মেশিনগান হাতে গোরা টমিরা।

ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসাররা এলেন বেলা সাড়ে পাঁচটায়। তাঁদের আসার আগে আমাদের মৃত সহযোদ্ধাদের দেহগুলি টেনে হেঁচড়ে অসম্মানকর

অবস্থায় নামানো হল। উত্তেজনায় ফুটছিলাম সকলে। কিন্তু আমরা তখন অসহায় এবং নিরস্ত্র। গুরুতরভাবে আহতদেরও টেনে হেঁচড়ে নামানো হল। বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হল খোলা আকাশের নিচে। যখন তাঁদের কেউ কেউ কাতর আর্তনাদ করে উঠছিলেন, গোরা টমির দল তখন অশ্রাব্য ভাষায় তাঁদের ধমকে উঠছিল। তখন আমরা ছিলাম যুদ্ধবন্দী। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা অন্ততর ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারতাম। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সিংহের লেজে পা পড়েছে, হিংস্র আক্রমণে তার পাশব নগ্ন চেহারা সমস্ত মুখোশ খুলে বেরিয়ে এসেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সেই নিষ্ঠুরতার কথা ভুলতে পারব না।

বেলা পাঁচটা। প্রতিটি বন্দীকে তন্ন তন্ন করে তল্লাসি করা হল। প্রায় তিন ঘণ্টা পর হাত মাথার উপর থেকে নিচে নামাবার সুযোগ পেলাম। আমাদের মধ্যে ছিলেন সর্বস্তরের নৌ-সেনা। লিডিং সী মেন, গান লেয়ার, গানার্স মেটস, রেঞ্জ টেকার, টরপেডো গানার্স মেটস, ভিস্যুয়াল সিগন্যাল মেন, ডব্লু. টি. অপারেটার, সাবমেরিন ডিটেকটার, টরপেডো কস্নোইন, আর্টিজান, আরমার্স মেট এ্যাণ্ড ক্রু, স্টুয়ার্ড, কুক্, টোপার্স, বিউগলার—ইত্যাদি ইত্যাদি। বেলা সাড়ে পাঁচটায় এলেন স্থলবাহিনীর মেজর জেনারেল।

হুকুম হল স্যালুট করো। একজন নাবিকও অভিবাদন জানালেন না। বিনা স্যালুটেই মেজর জেনারেল সাহেব আমাদের ইনসপেকশন করে ফিরে গেলেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পিছনে মৃত বন্ধুদের শব ও আহত সঙ্গীদের আর্তনাদ। মাথার উপরে মৃত্যুদণ্ড—আমরা একে একে অপেক্ষমান ট্রাকে গিয়ে উঠলাম। এলাম করাচির উত্তর প্রান্তে 'মালী' শিবিরে। এমন অঞ্চল—যেখানে একটি ঘাসও জন্মায় না, যতদূরে চোখ যায় শুধু নিষ্করুণ বালি আর বালি। মাথার উপরে ধূ-ধূ ধূসর আকাশ।

বন্দীজীবন শুরু হল। পেলাম একটি মগ, একটি থালা ও একটি কম্বল। খিদে মেটাবার উপকরণ এলো রাত দশটায়—দুটি শক্ত চাপাটি, এক হাতা কলাইয়ের ডাল। আমরা কম্বল বিছিয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম। তখনও আমাদের অসীম আশা। আমরা স্বপ্ন দেখছিলাম, কমিউনিস্টদের ডাকে বোম্বাই-এ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ সাড়া দিয়েছে। গর্জে উঠেছে দেশবাসী। জয় আমাদের সমাগত।

ভোর হল। আমাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে 'বাহাদুর'—'চমক'—'হিমালয়'-এর রেটিংদের সশস্ত্র প্রহরায় বন্দী করে আনা হল। তাদের মুখেই শুনলাম। জাগ্রত ভারতীয় বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়নি মুসলীম লীগ ও কংগ্রেস। বেইমানি করেছে তারা। সর্দার প্যাটেল নৌ-সেনাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছেন। লজ্জায় ঘৃণায় বিস্ফারিত বেদনায় আমরা শুনলাম: আমাদের—হিন্দু-মুসলিম শিখ-খৃস্টান সকল প্রদেশের মানুষের—ঐক্যবদ্ধ এ-আন্দোলনকে তিনি বলেছেন কিছু উচ্ছৃঙ্খল মাথাগরম ব্যক্তির কাযকলাপ। জয় হোক কমিউনিস্ট দলের। একমাত্র তাঁরাই আমাদের নির্দ্বিধ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ১৯৪৬ সালের সেই দিনগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা এখনও বহুক্ষেত্রে অনালোচিত। উপযুক্ত মূল্যায়ন আশু প্রয়োজন।

আমরা জানি, বীরের সে রক্তস্রোত ব্যর্থ হবার নয়। কিন্তু রক্তরাঙা সেই দিনগুলির কথা সত্যসন্ধ দেশবাসীর মনে আছে তো!

ক্রমাগত করতালি

অসিত ঘোষ

একটানা হাততালিতে চলমান জনতা খুশি না হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে আড়াল খুঁজতে শুরু করল। এমন সময় মানুষগুলি দেখে মনে হয় ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়েছে, অথচ স্তাবকের ভঙ্গি কারো নেই; একপ্রকার বিরক্তি সকলের চোখেমুখে। তবুও বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করে সকলেই আড়াল খুঁজতে তৎপর। আমি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মুখ তুলছিলাম। 'গাঁয়ের দিকে কিছু নেই!' 'কে বললে মশায়, খবর কাগজ পড়ুন!' 'পড়েছি, ববানগর পেরোলেই চাতকে জল পায় না!' এইসব মন্তব্যগুলি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা নিয়ে তর্ক বাড়িয়ে যাচ্ছে। ফুটপাতে যে ছেলেটি খড়ি দিয়ে আত্মজীবনী লিখে ভিক্ষে করতে বসেছিল, সেও পালিয়েছে কোথায়। লেখাগুলি এখন মুছে গেছে। জনবিরল ফুটপাত দিয়ে একটি কিশোরী উজ্জ্বল লাল ছাতা মাথায় এণ্টালির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি কুকুর কান ঝাড়তে ঝাড়তে রাস্তার ওপার থেকে এপারে আসতে গিয়ে দোতলা বাসের তলায় পড়ে গেল। সকলের আ-হা রবের ভিতরে একটু তীব্র চীৎকার অর্থাৎ আর্তধ্বনি এবং হঠাৎ নীরবতা। বাসটা দ্রুত এগিয়ে গেলে দেখলাম—কুকুরটার হাড়গোড় ভেঙে গেছে, মুখ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত বেরোচ্ছে। রক্ত রাস্তার ওপর জমছে না, ধারা হয়ে নালা বেয়ে চলে যাচ্ছে। রক্তগোলা জল আমার পায়ের কাছে এলে বিরক্ত হয়ে সরে দাঁড়ালাম। আকাশের দিকে মুখ তুললাম। করতালির শব্দে বৃষ্টিতে আমি ভিজে যাচ্ছি। তবু অন্যান্য সকলের মতো আড়ালে যেতে ইচ্ছে করছে না। অকস্মাৎ একটা বড় বোর্ড চোখে পড়ল। বিজ্ঞাপনের বোর্ড। লাল-নীল হরফে লেখা রয়েছে—

"রক্তহীন রোগীদের জন্য
রক্তদান করুন,
রক্ত দান করিলে—
শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।"

ক্ষতি হয় না ক্ষতি হয়। মনে পড়ে, আমার ধমনীর ভিতরে একটা ছোট সিলিণ্ডার, সিলিণ্ডারের সঙ্গে রক্তবাহী নল, নলের একদিকে পরিমাণ-জ্ঞাপক একটি বোতল, হাতের মুঠোয় শক্ত কাঠের বল—চাপতে হবে, আবার ঢিলা দিতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ: বাঁদিকে মুখ ঘোরানো চলবে না। আমার রক্তের প্রাচুর্য, ডাক্তারের লোভ, রোগীদের রক্তহীনতা—সমস্তই যন্ত্রণার মতো ধমনীতে আটকে আছে। বোতলটা ভরে উঠছে। ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে দেখছি তিনশ শিশির পরিবর্তে ছশ শিশি রক্ত বোতলে এলে ডাক্তারেরা খুব খুশী। হাতের শক্ত বলটা ফেলে দিলাম। একজন নার্স একটা বড় মর্তমান কলা, দুটো সন্দেশ আর এক কাপ কফি খেতে দিলে। বিদায়লগ্নে একটি দশটাকার নোট। আমার হাতে হাত মেলাল ডাক্তার। তখন আমার মাথা ঘুরছে, পা বাড়ালেই সামনে বিশাল খাদ চোখে পড়ে। হৃৎপিণ্ডটা খালি মনে হচ্ছে। রক্তের বদলে টাকা, টাকার বদলে হৃদয়—মানুষ সোনাদানা ছাড়া কিছুই দিতে পারে না, তাই কিছু চাইতে লজ্জা করে। রাস্তায় নেমে এলাম। ট্রাম লাইনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। পৃথিবী ঘুরছিল, মাথা ঘুরছিল, চোখ ঝাপসা দেখছিলাম। যে সকল আত্মীয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল, প্রথমত তাদের ভ্রূক্ষেপ করিনি। এখন তাদেরই একজন আমাকে রিক্সায় তুলে বাড়ি পৌঁছে দিলে। আমি সেই থেকে দুর্বল হয়ে আছি। রক্তহীন, শক্তিহীন, বেকার যুবক। আজো সেই যন্ত্রণা স্তিমিত হয়নি। মনে হয় দারুণ ঠকে গেছি।

কে-একজন কুকুরের লাশটাকে ফুটপাতে টেনে নিয়ে এলো। ওর আর রক্তের প্রয়োজন নেই, আমার আছে। আমি রক্তহীন রোগী রক্ত ফিরে পাই না। সেদিনের মতো চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। হাততালির শব্দ এখন আরো প্রবল। একই জায়গায় আর দাঁড়াতে পারছি না। যে ছেলেটি আত্মজীবনী লিখে ফুটে বসেছিল, সে আমার সামনে ছুটে এসে একখানা রুটির পয়সা চাইল। মুখ ঘুরিয়ে চলে এলাম। ও যেমন বাঁচতে চাইছে, আমিও তেমনি; তবে আমার ইচ্ছে খুব করুণ। নানাবিধ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। জীবনবীমার বিজ্ঞাপন আমাকে মৃত্যুর কথা ভাবতে প্ররোচিত করে। মৃত্যুর কথা ভেবেই বাবা আমার নামে জীবনবীমা চালিয়ে যাচ্ছে, হয়তো তা নয়। তবে আমি ভাবি—আমার অকালমৃত্যু অনিবার্য! তবু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—আমি বাঁচব না কেন, আমার একশ কুড়ি বছর আয়ু হবে না কেন? উত্তর পাই না।

সেই কারণে লড়াই করার স্পৃহা হয়। লড়াই করার নামে আমি যখন উত্তেজিত হয়ে উঠছি, তখন কে যেন কাঁধ চেপে ধরল। একি মৃত্যু, অতর্কিতে চেপে ধরল! আকস্মিক আক্রমণ। প্রতিপক্ষকে দেখার জন্যে মুখ ঘোরালাম। বরসাতি পরিহিত সমরেশকে চিনতে দেরি হল না। বৃষ্টির নামে খিস্তি করছে। পরে বলল, 'সেই লোকটা মারা গেল, চাঁদা দিলাম সবাই, বৌটা তোকে মনে করছিল!' আবার ব্যর্থতা, মনে হয় আমার মেরুদণ্ড নেই, বুকে ভর দিয়ে মাটি কামড়ে পথ হাঁটছি। কলকাতার মোড়ে মোড়ে ওষুধের দোকানের প্রাচুর্য দেখে ভেবেছিলাম লোকটা বেঁচে যাবে, কিন্তু বৌটি গায়ের সব গয়না খুইয়েও সোয়ামীকে বাঁচাতে পারল না। একমাত্র ছেলে বয়স পাঁচ, যুবতী বউ নিরাভরণ, অকালমৃত্যু অনিবার্য, লোকটি মারা গেল। অকালমৃত্যু ঠেকিয়ে রাখার কোনো উপায় নেই। বিষাক্ত দুধ খেয়ে দুধের বালক-বালিকা মারা যায়, চিকিৎসাহীনতায় রোগী মারা যায়, মোকাবিলার ব্যর্থতায় আমি মারা যাচ্ছি। রাগে দুঃখে সমরেশের গালে চড় কষতে চাইলাম। আমার শক্তিহীনতা বাধা দিলো। প্রসঙ্গ না পেয়ে সমরেশের সঙ্গে আমি কথা বললাম না। আমাদের উভয়ের নীরবতা ভেঙে একটা ক্র্যাকার ফেটে চৌচির হল। সমরেশ দৌড়ে পালাতে গেলে কলার চেপে ধরলাম। 'এই, ছিঁড়ে যাবে, ভিজে যাব!' আমি জানি এই মুহূর্তে ও শক্তিহীন, কেননা আজকাল মানুষ পলায়নে তৎপর। অক্ষমতাগুলি মেনি বেড়ালের মতো পুষে রাখে। ফুটপাতে যারা আড়াল খুঁজে দাঁড়িয়েছিল, তারা সকলেই ছুটে পালাচ্ছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাথার ওপর ছাদের প্রয়োজন, দুর্ধর্ষ গুণ্ডাদের কাছে রেহাই পাবার জন্যে দরকার নিরাপত্তা। আমার মনে হয়, নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। বাড়ি ফিরে গেলেও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার মতো গোলা-বারুদ নেই। যে কোনো মুহূর্তে কলার চেপে ধরবে। সশব্দে নয়, নীরবে। ঠিক বিশ গজ দূরে ছোঁড়াদের আর-একজন ক্র্যাকার ফাটানোর জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হচ্ছে। সমরেশ ধড়ফড় করে উঠল। 'ছেড়ে দে পালিয়ে বাঁচি!'

'পলায়নে মুক্তি নেই সমরেশ, সেই লোকটা পালাতে পেরেছে?'

'না, তবুও ছেড়ে দে!'

'মারণাস্ত্র সকলের জন্যে তৈরি। যাবে কোথায়?'

আমার পায়ের কাছে সমরেশ তার মাথা ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলো। 'ছেড়ে দে!'

আমি হাহা করে হেসে উঠলাম। আসলে ব্যঙ্গ করলাম। আরো একটা ক্র্যাকার আকাশ চৌচির করল যেন। আমার স্থৈর্যে কোনো বিকৃতি আসছিল না। সমরেশ পালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হচ্ছে, জানালা দিয়ে উঁকি মারছে গৃহস্থ মানুষেরা। আমি জানি এভাবে প্রতিমুহূর্তে পলায়নপর হলে হয়তো সংঘাত থেকে রেহাই পাব, কিন্তু বাঁচতে পারব না। পালিয়ে দেখেছি—পৃথিবী এত ছোট যে শেষ পর্যন্ত লুকোবার জায়গাও থাকে না।

কোনোপ্রকারে হাত ছাড়িয়ে সমরেশ দৌড়ে পালাল। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। মৃত্যুর দিকে অথবা মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে। কতিপয় দুঃসাহসী ছেলে সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল। ওদের পদপাতে মাটি-কেঁপে উঠল। পলায়নপর লোকগুলি দেখে ওরা হাসছিল, মস্করা করছিল। 'মার কেল্লা।' আরো একটা ক্র্যাকার ছুঁড়ে দিলে ট্রাফিক আইল্যাণ্ডের দিকে। আধখোলা ঝাঁপ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দোকানিরা এখন কুলুপ এঁটেছে। কাছে-পিঠে লোকজন আদৌ নেই। একজন ভিখিরি ভাঙা বাড়ির নড়বড়ে সিঁড়ির তলায় বসেছিল। সে হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'মজাক দেখেছ ছোড়াদের, বিষ্টির জ্বালায় থৈ পাচ্ছিনি—বোমা ফাটায়, থাকত যদি ক্ষুদিরামের মুরাদ।' আমি কাঁপছিলাম, হাসতে গিয়ে দাঁতে দাঁতে শব্দ উঠল। শরীরটা খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পায়ের পাতা ভিজে ব্লটিং কাগজের মতো রঙ নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে একখানা পুলিশের গাড়ি ছুটে গেল। ছোকরারা উধাও. ট্রাম ও মোটরগাড়িগুলি চলতে শুরু করেছে। করতালিতে বৃষ্টি স্তিমিত।

আমি আর দাঁড়ালাম না। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম একটা ট্রামের ওপর লাশ ঝুলছে। নাকীস্বরে কয়েকটি মেয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে। শুনলাম খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে লোকটি কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। কিছুদিন আগে খবরে পড়েছিলাম—চোলাই মদ খেয়ে মাতালের মৃত্যুসংবাদ, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু, মড়কে মৃত্যু, বন্যায় পীড়িত অঞ্চলে রোগের প্রাদুর্ভাব, ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব, সরকারী খাদ্যদপ্তরে চাল ও গমের টানাটানি, রেশন লাইনে তুমুল কলহ, অনাহারে সন্তানদের কূপে ফেলে দেওয়ার গল্প। আমি আজকাল খাদ্যে অরুচির মতো যে কোনো বিষয়ে রুচিহীন হয়ে পড়ছি। যখন গ্রাস তুলি, মনে হয় ভিতরে অখাদ্য চলে গেল। ঘটনাস্থলে দাঁড়াতে না পেরে

এবং নিজেকে শীতার্ত মনে হওয়াতে দ্রুত পথ অতিক্রম করছিলাম। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে সংশয় কাঁটার মতো উজিয়ে উঠছিল।

সামনে কৌতূহলী মানুষের ভিড় দেখে সচকিত হলাম। 'ড্রাইভারকে দিয়েছি দুঘা।' 'ছেলেটা দৌড়ে উঠতে গিয়েই তো মোলো!' আমি দেখলাম ছেঁড়া উর্দি পরে ট্রামচালক পাদানিতে পা দিচ্ছে। ট্রাম চলবে, সকলে উঠে বসল। কয়েকজন মাত্র গুনগুন করতে থাকল। 'আহা, পাটা একেবারে দুফালি!' 'অথচ কিশোর কিশোরীরাই ভবিষ্যৎ, দেশের তথা সমাজের। সেই এক কিশোর পঙ্গু হয়ে গেল। কত অবহেলায় ছেলেরা বড় হয়।' 'দুধ খেয়ে দুধের বালক-বালিকা মারা যায়!' ট্রামটা চলতে শুরু করল। আমি ঘটনাস্থল দেখতে চাইলাম। বিস্ফারিত চোখে কেবল আধখানা পা, জুতো-মোজা সমেত পা দেখলাম। বৃষ্টির জল আর রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে একটা এ্যাম্বুলেন্স ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো। একটা লোক নেমেই পা-টা লুফে নিল। 'শালা, এখনো কুত্তায় নিয়ে যায়নি!' ছেলেটির পঙ্গুত্ব ঘুচবে কি? আমিও যেন পঙ্গু হয়ে গেছি। আর হাঁটতে পারছি না। এখনি আবার বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা। ওঃ, হাততালি দিয়ে পশলা বৃষ্টি নামলে আমার সমস্ত কিছুই খারাপ লাগে। আড়ালে গিয়ে দাঁড়াবার ইচ্ছে হয় না। দাঁড়িয়েই বা কি হবে? আমার অজ্ঞাতে যেসব ষড়যন্ত্র চলছে, তা থেকে কি করে মুক্তি পাব? অথচ এই ষড়যন্ত্রের ফলেই যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ হবে—আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। যেমন ও লোকটা বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, বিষক্রিয়ার ফলে এ লোকটি মারা গেল। অতএব আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। খাদ্যে বিষ থাকা সত্ত্বেও আমি বেঁচে যাব, রক্তের অভাব সত্ত্বেও আমি অনুভব করব না—হৃৎপিণ্ড অনেকখানি খালি। অর্থাৎ অন্যায় বা ষড়যন্ত্র থাকবে—আমি বেঁচে যাব। আমার ভাবনার পারম্পর্যহীনতায় হাসি পেল।

খেয়াল হল আমি পাঁচমাথার মোড়ে পৌঁছে গেছি, এখান থেকে আমার গন্তব্যস্থল নির্ণয় করতে হবে; বাড়ি নয় অন্য কোথাও। কেননা বাড়িতে বাঁচার আকুতি এত প্রবল হয় যে শ্বাসরোধ হয়ে আসে। আমি যেখানটায় এসে দাঁড়ালাম, সেখানে কষা মাংসের গন্ধ, ওষুধের গন্ধ, পেচ্ছাব এবং বেলফুলের গন্ধ একসঙ্গে পাচ্ছি। অন্য একটা দোকানে পাঁউরুটি, পেস্ট্রি, ক্রিমরোল ইত্যাদি সাজানো রয়েছে। দেখে খিদে অনুভব করলাম। জানিনা

ওইসব খাদ্যেও বিষ আছে কিনা। একটি ভিখিরি মেয়ে আমার কোল ঘেঁষে দোকানটার সামনে দাঁড়াল। দেখলাম মেয়েটা অকস্মাৎ একটা পেস্ট্রি তুলে নিয়ে মুখে পুরে দৌড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু পালাতে পারল না, একজন ক্রেতা তড়িৎপ্রবাহের আকস্মিক ক্রিয়ার মতো হাত ধরে ফেলল। দোকানি কাউন্টার থেকে লাফিয়ে নেমে চুলের ঝুঁটি ধরল, কিল ঘুঁষি লাথি মারল। আশ্চর্য, মেয়েটা কোনো শব্দ করছে না। ওর কি যন্ত্রণাবোধ নেই। আমি কাছে গিয়ে দেখলাম হাঁ করে আছে মেয়েটা, মুখের ভিতরে পেস্ট্রিটা দেখা যাচ্ছে। ওর শ্বাসরোধ হয়ে গেল। পেস্ট্রিটা মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল—হিক্কা ওঠার মতো কেঁদে উঠল মেয়েটা। আমার চেতনায় চকিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর আত্মা আর্তনাদ করে উঠল "ছিনিয়ে খায় না কেন?" ছিনিয়ে খাওয়ার পরিণাম—হাতের মুঠো একগোছা জটাজুট চুল উপড়ে নিল। রক্তে ভরে গেল মাথাটা। এখনো ওর শরীরে রক্ত আছে! মেয়েটির কান্না কি মর্মস্পর্শী? "ছিনিয়ে খায় না কেন?"

আমার ক্ষুধার বিনিময়ে খাদ্য পাই না, যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্যে ছিনিয়ে খাই না। পরিশ্রমের বিনিময়ে পয়সা--পয়সার বিনিময়ে পেট ভরে না। মন ভরে না। রক্তের বদলে সোনা-দানা, সেই সোনা-দানার পরিবর্তে রক্ত পাই না। হৃৎপিণ্ড খালি রয়ে যায়। আসলে ষড়যন্ত্রকারীরা চতুর মুনাফাবাজ। আমার অলক্ষ্যে ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত। আমরা তাকে দেখি না, টুঁটি টিপে ধরার সাহস পাই না। সমবেত কণ্ঠে পলায়নী গীত গাই, ঈশ্বরের ভজন করি, ঈশ্বর সামনে আসে না। অথচ আমি জানি, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান না করলে বাঁচার কোনো অর্থ থাকে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঈশ্বরের লীলা দ্বিগুণ বিকশিত হচ্ছে। আমরা একে অপরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বাঁচতে চাইছি।

ভিখিরি মেয়েটি চলে গেছে, দোকানি কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করল। আমার সামনে দিয়ে এক ভদ্রলোক আস্ত একটা রুইমাছ নিয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে ট্রামে উঠল। আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখলাম আবার বৃষ্টি আসছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে মেঘটা ঝুলে পড়ল। রাস্তায় আলো জ্বলছে। কতক্ষণ জ্বলেছে অনুমান করতে পারলাম না। মনে পড়ল আগামীকাল প্রভাত থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার প্রতিবাদ দিবস। 'কালোবাজার অত্যন্ত বেড়েছে!' 'খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল!' 'ওষুধে ভেজাল!' 'রোগীর পথ্য উধাও!' 'কিশোর

বালককে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন্ধ্যা করে দেওয়া হচ্ছে।' 'শাসনব্যবস্থা মারাত্মক নিম্নশ্রেণীর।' 'অরাজকতা চরমে উঠেছে।' প্রতিবাদ দিবস। আটচল্লিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে আমাদের প্রতিবাদ করতে হবে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা সশস্ত্র—প্রতিবাদকারী আমি নিরস্ত্র। নির্যাতন রোধে আমারও অস্ত্র চাই। আমি অস্ত্র ধারণ করলে জানি অপপ্রচার বেড়ে যাবে, আমাকে নিপাত করার জন্যে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হবে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে হলে আগ্নেয়াস্ত্র বড় প্রয়োজন। বৃষ্টি তার মুখর হাততালিতে আমার ভাবনা চিন্তা হীন প্রতিপন্ন করছে। মনে হচ্ছে আমি এসব পারব না। রাস্তায় আলো, অথচ আমার ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি—করতালির সঙ্গে বৃষ্টি হা হা করে হাসছে, আমি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি। পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে।

তবু আলোর ইশারা আমি পাব, আগামীকাল প্রভাত। আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রতিবাদ দিবস। মুখর হয়ে উঠুক। সার্থক হোক। ক্র্যাকার ফাটুক। বন্দুক, বুলেট, টিয়ারগ্যাস···ক্রমাগত বিপর্যয় চলুক। বিপর্যয়ের মধ্যেই বোঝা-পড়া হোক কোনটা খাঁটি অথবা ভেজাল। প্রায় পাগলের মতো দৌড়তে লাগলাম। আগ্নেয়াস্ত্র বড় প্রয়োজন। অনেক আশা নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। পাল্লা দুটো দেওয়ালে জোরে বাজল। শব্দে আমি নিজেই চমকে উঠলাম। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কেউ কি বাড়ি নেই—এত শব্দ হল, তবু কাউকে দেখছি না কেন? সিঁড়ির মুখে দেখা হল। সুরমা নামছিল, আমি উঠছিলাম। অন্যকোনো কথা না বলে আগামীকালের প্রতিবাদ দিবসের কথা মনে করিয়ে দিলাম। 'হুঁ, পোস্টার লাগিয়েছে, আমার ঘরের জানালার সামনেই!'

'আমাদের বিরোধীরা সশস্ত্র!'

'স্বাভাবিক!'

'তোমার বাবার রিভলবারটা চাই!' সুরমা ঠোঁটের মাঝখানে তর্জনি উলম্বভাবে রেখে দাঁড়িয়ে রইল। 'জরুরি দরকার। আমি আত্মহত্যা করতে নিচ্ছি না, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে! জানো আমাদের সামনে কত খাদ তৈরি করছে শত্রুপক্ষ!'

'কিছুই বুঝলাম না!'

সুরমা কাছে সরে এলো। আমার চোখে চোখ রাখল। হয়তো চোখ খুব

লাল হয়েছে আমার। ভিজে পোষাক দেখল···অস্বাভাবিক। তারপর কপালে হাত রাখল। সুরমা নিরীক্ষায় অবিচলিত, আমি নীরব প্রস্তরমূর্তি।

'তুমি অসুস্থ!'

'না, মোটেই না, রিভলবারটা দাও, খুব জরুরি!' আমি শীতে কাঁপছিলাম।

আমার নির্দেশ অমান্য করল সুরমা। উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। হাত ধরে সিঁড়ি থেকে টেনে নিয়ে গেল। আশ্চর্য আমি, প্রতিবাদে ব্যর্থ হয়ে গেলাম। তবে কি আমি এতক্ষণ সুরমার সাহচর্য চাইছিলাম! সুরমাকে বাধা দিতে পারলাম না কেন! আমি পড়ে যাচ্ছিলাম, ও জব্দ করে ধরে রইল। শুকনো কাপড়-চোপড় নিয়ে এসে নির্দেশ দিল। 'পোষাক বদলে নাও।' আমি পালন করলাম। মনে মনে প্রতিবাদ তোলপাড় শুরু করছে, কিন্তু প্রতিবাদের সপক্ষে কিছু করতে পারছি না। আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ছি, দারুণ কাঁপছি, পেশিগুলো ফুলে উঠছে। সুরমা কি আমাকে ধরে রেখেছে? শুকনো শার্ট গলায় আটকে আছে। হাতটা আস্তিনের মধ্যে আধখানা ঢুকিয়েছি মাত্র! আমি কি পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু রিভলবারটা জরুরি দরকার। দুহাতে আমার শক্তি নেই। মৌখিক প্রতিবাদ সক্রিয় নয়। হাড় দিয়ে কিভাবে রণ করি! রক্ত নিঃশেষ, চর্বি-মজ্জা লোপাট। কঙ্কালটা পরীক্ষাগারের উপযোগী মাত্র। কিন্তু লড়াই করতে হবে। রিভলবার, কার্তুজ, বুলেট, কামান, গোলা, বারুদ, বোমা, তীর, ধনুক···সমস্ত রকমের অস্ত্র দাও। মৃত্যুর বিরুদ্ধে একবার নিক্ষেপ করি। সুরমা, দাও সেই রিভলবারটা, যেটা দিয়ে তোমার বাবা খেলার মাঠে নিরস্ত্র দর্শক হত্যা করেছিল। একবার মুখোমুখি দাঁড়াতে দাও। ওদের ছাউনিতে নানাবিধ অস্ত্র আছে—কোষাগার, বিজ্ঞানাগার, পরীক্ষাগার। অহরহ মারণাস্ত্র তৈরিতে লিপ্ত। বেঁচে থাকার সহযোগী কিছু আবিষ্কার করা হচ্ছে না—হলেও নিরন্তর অপ্রয়োগ কী পীড়াদায়ক!

আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। সুরমাদের কোকিলটা ডেকে উঠল। অর্থাৎ আমি সমস্তক্ষণ কি প্রলাপ বকে গেছি! বাইরে সুরমা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর তার। আমি জানালা দিয়ে উঁকি মারতে চাইলাম। বন্ধ রয়েছে। হয়তো করতালির শব্দ এখনো ব্যক্ত করছে। ঘরের ভিতর থেকে বুঝতে পারলাম না। সুরমার মা আমার কাছে এলো।

কি যেন বলল, খেয়াল করলাম না। অথবা আমাকে ডেকে জাগাবার চেষ্টা করল। আমি নীরবে পড়ে রইলাম। উঠে বসতে চাইলাম, চেপে ধরল সুরমার মা। তারপর সুরমা এসে গেল। 'দেখতো মা, ঝি এলো নাকি দেখি!' সুরমাকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। নিজেকে শক্তিহীন মনে হলেও জোর করে উঠে পড়লাম। টাল সামলে দাঁড়ানোর পর বুঝতে পারলাম ছুটতে কিংবা হাঁটতে পারব। সুরমা হায় হায় করে উঠল। 'তুমি খুব অসুস্থ, মারাত্মক অসুস্থ!'

'তুমি অকৃতজ্ঞ!'

প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। ভিজে রাস্তায় পা দিয়ে বুঝলাম চপ্পলটা ছেড়ে এসেছি, আর ফিরলাম না। এখনো রোদ্দুর স্পষ্ট নয়, রক্তিম আভা মিলিয়ে যাচ্ছে মেঘে মেঘে। টিপ টিপ বৃষ্টিও নেই। আমি টলছি, কিন্তু পথ অতিক্রম করতে কোনোপ্রকার কষ্ট অনুভব করছি না। এভাবেই বাধা অতিক্রম করতে হবে, অসুস্থ বললেও অসুস্থ নই। কে বলতে পারে আমি ছাড়া সকলেই সুস্থ! এত সকালে লোকজন বিশেষ নেই। কয়েকটা পুলিশভ্যান জল ছিটিয়ে গেল। কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম ফুটপাতের ওপর একটি ঢাকা দেওয়া মৃতদেহ। একজন বৃদ্ধ এক'দিকে চুপচাপ বসে। মৃতদেহের মুখটা খোলা। গুটিকয় পয়সা পড়ে আছে গামছায়।

ক্রমে ক্রমে ছেলে-ছোকরাদের ভিড় বাড়তে শুরু করল। ওষুধের দোকানের ঝাঁপ খুলল। কয়েকটা লাল যুক্তফ্রন্ট গাড়ি তীব্রবেগে চলে গেল। আরো এগিয়ে এসে দড়ির খাটের ওপর শব দেখলাম। শবযাত্রীরা বিড়ি ফুঁকছে। শবের মাথার কাছে খাটের বাজুর ওপর তিনটি বালক-বালিকা শবের মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। মাছি বসলে হাত নেড়ে দিচ্ছে। রাস্তায় প্রতিবাদ দিবসের অদ্ভুত নির্জনতা। মানুষের ভিড় দেখছি কখনো। কোনো এক দোকানি দোকানের ঝাঁপ খুলতে গেলেই ছোকরারা হামলে পড়ছে। 'মনে থাকে যেন, প্রতিবাদ দিবস!' আমি আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। একটা মিছিল লাল সালু হাতে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আমাদের শত্রু নিপাত যাক!'

'অরাজকতা চলবে না!'

'বাঁচতে হলে, বাঁচার মতো বাঁচতে হবে!'

আমার শক্তিহীনতাজনিত ভয় শিরশির করছে। একটা পুলিশভ্যান

প্রায় পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালে রোম খাড়া হয়ে উঠল। চকিতে ছুটে পালাবার ইচ্ছে হলেও ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলাম। অন্যান্য জনতার অংশ অলি-গলি হয়ে রাস্তা প্রায় খালি করে চলে গেল। পুলিশগুলো আমার সামনে টহল দিচ্ছে দেখে রাগ হচ্ছিল। আমাদের প্রতিবাদ-মুখরতাকে মৌন করে দেওয়াই ওদের একমাত্র কামনা। যে কোনো মুহূর্তে আমার গলা চেপে আওয়াজ বন্ধ করতে পারে। দেখে মনে হয় ওদের সংগৃহীত শক্তি যত তার চেয়ে প্রতিবাদে নিরুত্তাপ অনেক বেশি।

নিরস্ত্র জনতা সরিয়ে দিতে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে,
কাঁদানে গ্যাস এবং গুলি চালিয়েছে!
জনতা উত্তেজিত হয়ে দোকান লুট করে,
সোডার বোতল নিক্ষেপ করে,
ইট-পাটকেল যা পায় হাতের সামনে ছোঁড়ে!
কোথাও কোথাও পটকা ফাটানো হয়,
ক্র্যাকারও কয়েক জায়গায় ফেটেছে।
লালবাজারের পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা,
একখানা টাইম বোমা থানার লিফটে পাওয়া যায়!

কে যেন খবর বলছিল। খবরের সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়িতে আগুন লেগে গেল। ভ্যানগুলির ভিতর থেকে পুলিশ অতর্কিতে বেরিয়ে এলো। গামলায় জিয়োনো কই মাছের মতো লাফিয়ে ভ্যানের বাইরে এসে সমবেত জনতার ওপর লাঠি চালাল। কয়েকজন ছেলেকে অবিরাম ঠেঙাল। শেষে ভ্যানের ভিতরে সকলে মিলে ছুঁড়ে ফেলল। আবার এগিয়ে এলো পুলিশ। জনতা পলায়নে তৎপর। দূরে কাঁদানে গ্যাস চলার আওয়াজ। অকস্মাৎ দুজন পুলিশ আমার দিকেই লাঠি উঁচিয়ে এলো। রাগে আমি অস্ত্র খুঁজলাম। কিছু না পেয়ে উপড়ে ফেলার ভঙ্গিতে সামনের ল্যাম্পপোস্টটাকে আঁকড়ে ধরলাম। আমি আমার শক্তিহীন সত্তা ভুলে গিয়েছিলাম। ভুলেছিলাম সুরমা রিভলবারটা দেয়নি। ব্যর্থতায় পড়ে যাচ্ছি যখন, পুলিশ আমার পায়ে লাঠি মারল। আমি পালিয়ে যাচ্ছিলাম না, তবু পঙ্গু করার প্রয়োজনীয়তা বুঝলাম না। ছিটকে গিয়ে একটা চিঠির বাক্সের ওপর পড়লাম। ফুটপাথে এতবড় একটা বাক্স আগে কখনো ছিল কি! থাকলেও আমি লক্ষ্য করিনি কেন! আমার হাড়-গোড় মড়মড় করে উঠল। তৎক্ষণাৎ মাথায় লাঠি মারল।

যন্ত্রণা আমাকে অবশ করে দিল। রক্তপাত ঘটে গেছে বুঝতে পারছি। সমস্ত ভাবনাগুলি তালগোল পাকিয়ে কেবল যন্ত্রণায় শেষ হতে থাকল। আর কিছু ভাবতে পারছি না। পুলিশের টুঁটি চেপে ধরতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম। চারদিক রক্তে ভেসে যেতে লাগল। আমি কি সেই কুকুর? গতকাল যেটা দোতলা বাসের নিচে পড়ে রক্তঢেলে মারা গেল। আমার যন্ত্রণা লুপ্তপ্রায়।- তবুও বুঝতে পারছি করতালির শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত প্রতিবাদ দিবসকেই যেন ঠাট্টা করছে। পুলিশ আমাকে কোথাও ছুঁড়ে ফেলল, আমি অনেক উঁচু থেকে পড়ে গেলাম অনুভব করছি।

লেটার বক্সটা কি রক্তে আরো লাল হয়ে গেল! কে যেন আমাকে নিঙড়ে নিচ্ছে—আমার স্বাধীনতা, প্রতিশোধস্পৃহা নিঙড়ে নিচ্ছে। আমার ধমনীতে একটা ছোট সিলিণ্ডার ঢুকে আছে, সিলিণ্ডারের সঙ্গে রক্তবাহী নল, নলের বাইরের দিকের প্রান্তে একটা পরিমাণজ্ঞাপক বোতল, হাতের মুঠোয় শক্ত কাঠের বল—চেপে ধরছি ঢিলে দিচ্ছি। একটা বড় মর্তমান কলা, সন্দেশ, এককাপ কফি, দশ টাকার নোট। আমার রক্ত তিনশ শিশির পরিবর্তে ছশ শিশি। রক্তের পরিবর্তে রক্ত পাই না, দশ টাকার পরিবর্তে রক্ত পাই না, আমার হৃৎপিণ্ড খালি। কাঁদছ? কেন? তুমি সুরমা, অকৃতজ্ঞ! বাবা, জীবনবীমা বাবদ টাকার কথা মনে আছে? বুলেট, বন্দুক, কামান, গোলা, বর্শা, তীর, ধনুক সব চাই, সব দাও, আমি একবার শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করি। আমি মরে যাচ্ছি। সময় নেই। অস্ত্র নিয়ে বোঝাপড়ার সময় আর নেই।

পরিণাম

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

স্তম্ভিত জলের মর্মে চাঁদ ঝুঁকে আছে।
এ বড় বিখ্যাত সময়, কেননা এই পুকুর সকাল থেকে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বহু সন্তরণবিদ্ মানুষের
শরীরের ময়লা নিয়ে যেতে উঠেছিল;
তারা প্রতিবিম্বহীন জলের উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে
মাছের গভীরতার সংসারে চাঞ্চল্য ঘটিয়েছিল ; অথচ
এখন আকাশে কোনো রৌদ্র নেই, বয়সের রাহাজানি নেই,
ভিজে পোষাকের মধ্যে অটল ইন্দ্রিয়গুলি স্পর্শে
আর কোনো সম্প্রবার স্ফুট করছে না।
তুমি সমতল জলে একবার, শুধু শেষবার,
সন্ন্যাসীর মতো ফিরে এসে ভাবো কেন
জ্যোৎস্না হারাবার ভয়ে মাছেরা দুচোখ বুজে ঘুমাতে পারে না;
দ্যাখো, দর্পণ এসেছে ফিরে ; যেখানে প্রক্ষালন-পিপাসু মানুষ কখনো
মুখ ছাড়া অন্য কোনো তপস্যার পরিণাম দেখাতে পারবে না।

স্তম্ভিত জলের ধর্মে অবশেষে ঝুঁকে আছে চাঁদ।

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

মুকুল গুহ

যতক্ষণ কোনো রৌদ্র তোমাকে অস্বীকার করছে না
তুমি নিশ্চিন্ত থাকো তোমার কুটিরে
লাউমাচা তুলে দাও দাওয়ায়
লাল নীল ফুল ফোটাও বাগানে, আমি মুকুল গুহ
যতক্ষণ কোনো জীবন তোমাকে অস্বীকার করছে না
আমি আশ্রয় দেবো তোমাকে

আমার অশান্ত বুকে মাথা দিয়ে শুনতে পাবে
বাগানে অঙ্কুরোদ্গমের শব্দ, বীজধ্বনি
পতিত জমিতে সেচের জল নেমে আসছে তার শব্দ
গৃহনির্মাণ চলেছে উদ্বাস্তু এলাকা জুড়ে
ভরা জ্যোৎস্নায়
অশ্রুলিপূর্ণ ভালোবাসার কাহিনী
মাঠ আর মানুষের মধ্য দিয়েই আসতে হবে তোমাকে
আমার কাছে যেতে হবে তুলসীতলায়

আকাশরেখায় যে নক্ষত্রই দেখো সমস্তই ধ্রুবতারা
যে পথেই পা দাও শুক্ প্রভাতের আমেজ
সহস্র উদ্বাস্তু আর পতিত জমির হাহাকার
বেজে উঠলে শঙ্কিত হয়ো না
প্রিয় বোনটি আমার
যতক্ষণ কোনো রৌদ্র তোমাকে পরিত্যাগ করছে না
আমি তোমাকে হাত ধ'রে পৌছে দেবো
বারুণীমেলায়।

নিজস্ব শিবিরে

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আমারও তো বাসা ছিল, বন্ধুদের বুকে ভালোবাসা—
সেই কক্ষে কিছুকাল ; তারপর জনপদে পূর্ণিমা যেমন :
পদধ্বনি জেগে উঠল, ভোর ভেবে অসময়ে পাখি
কাকলিকল্লোলরোলে বার বার আলোর উল্লাসে কোলাহল
জাগায়, তখনই ফিরি, নিজেরই রুধিরে সেই বাসা :
ফিরে আসা তাকে বলি, তারই রঙে জলেছে পূর্বাশা।

তুমি ঘর খুঁজেছিলে জনস্রোতে, পড়শির দুয়ারে দুয়ারে
ফেরিতে উৎকণ্ঠ হাঁকে তোমার জটিল যাওয়া-আসা,
পেকে উঠেছিল ফল টলমল মুহূর্তের রসে—
যা ঝরে কেবলি ঝরে চ্যুতপত্র চৌচির নিদাঘে—
নতুন আধুলি হয়ে ফিরতে হয় বণিকের হাতে, পুরোভাগে
সহজে মেলে না বাসা, বাসি হয় ব্যবহৃত ভাষা।
ভাষার অতীত চিত্রে ধ্বনিময় বাণীবতী ছিল'
আমি তাকে স্নানঘরে দুপুরের ঝর ঝর ধারায়
সিক্ত পরিচ্ছন্ন দেখে শরীরে বধির কলরোল
শুনেছি , দেখেছি তার খোলা রূপ নির্মিত, অথবা
ক্রমশ ঘনিয়ে আসা মেঘে মেঘে তারই দেহ বিদ্যুৎ জোগায়,
যে কোনো উপমা তুমি দিতে পারো উপমাবতীকে—
কিংবা সে উমার মতো, আমি মহেশ্বর নই, নেহাৎ কেরানি—
কিন্তু দেহ ভাষাময়, কিছু স্বচ্ছ, কিছু বা ঘোলাটে স্রোত, তারই
তীরে ব'সে
পর্বতবাসিনী তার স্নানশেষে আমাকেই দর্পণ মেনেছে—
আমি সেই ভাষা, উচ্চারিত বন্ধু মুখে, কখনো বা স্খলিত অধরে
উষ্ণস্পর্শ মধ্যরাতে, কখনো বা পক্ককেশ স্থিতপ্রজ্ঞ কবির নির্বাণে।

ধানের চূড়ায়

গণেশ বসু

টুকরো দেশের চোখের জলে স্বপ্ন জাগে স্বাধীন স্বর
মুক্ত প্রমেথিউস জানে অন্ধকারের তীব্র বোধ
নোনতা নদী ফুঁসছে, দাপায়
উল্কি-আঁকা ভালোবাসার ডুকরে কাঁদা ক্রোধ।

জমাট বাঁধা রক্তে ঘোর পাঁজর ফাটা স্বাধীন স্বর
প্রতিশোধের ঝুঁটি আমার দৃপ্ত রূপকথার দেশ
আবার যেন গর্জে ওঠে প্রতিরোধের বিস্ফোরণে
অজ পাড়া গাঁ, রক্তে হাসে মায়ের হৃৎপিণ্ড চাঁদ অভিশাপের
রাঙতা মুড়ে।

চোখের জলে স্বপ্ন জাগে টুকরো দেশের স্বাধীন স্বর
বন্দী জানে নোনা চরের সর্বনেশে তীব্র বোধ
চাবুক মারে, গঞ্জে বাদায়
উল্কি আঁকা ধানের চূড়ায় ডুকরে কাঁদা ক্রোধ

চওড়া কাঁধে লাফায় গুলিবিদ্ধ বিকেল এসপ্লানেড,
কোথায় আমি কোথায় আমার সূর্যমাদল, রক্ত-ঋণ
হাঁক দিয়েছে পাক খেয়েছে শিরায় শিরায়, মরদ সব
আকাশমুঠো, সামনে পিছে তপ্ত পলাশ, ঘূর্ণি তোলে
প্রতিশ্রুতির মেরুকরণ।

স্বপ্ন জাগে চোখের জলে টুকরো দেশের স্বাধীন স্বর
থেঁতলে যাওয়া হৃদয় জানে যন্ত্রণারই ক্ষিপ্র বোধ,
কান্নাধোঁয়ায় চোয়াল চাঁড়াল,
শুকিয়ে যাওয়া রক্তে ফোঁপায় সর্বনাশা ক্রোধ।

আলোর ঝুমুর পায়ে এখন পাহাড়বুকে পাকল বোন
মাতলা নদী, চোখের কোণে বারুদ ঘন, দিন বদল
রূপকথার, উল্কিপরা বিষণ্ণতা যৌবনের
উপড়ে ফেলে স্রোতের মুখে হত্যাপাপ, অন্ধকারে ক্রুদ্ধ মরদ
কেশর ছেঁড়ে।

ভালোবাসায় টুকরো দেশের স্বপ্ন জাগে স্বাধীন স্বর
ক্ষিপ্ত প্রমেথিউস জানে বন্দীজ্বালা, তীক্ষ্ণ বোধ
চাবুক মারে, ফুঁসছে দাপায়
ধানের চূড়ায় রাজেশ্বরী ডুকরে কাঁদা ক্রোধ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি

সত্য গুহ

একখানা নৌকোর বারো বরযাত্রী
আপদবিপদভরা চারদিকে রাত্রি
কুয়াশা, মাঘের শেষ
যে-দিকেই চোখ পাতো বিবাহযোগ্যা সেই
কুচবর্ণ রাজকন্যা বিপুল আবেগে বাঁধে কেশ।

রাজবংশী বর ছিল কুবেরের জ্ঞাতি
পরণকথার মতো ছিল তার খ্যাতি
বিবাহের শর্ত ছিল ছেলে হবে সচ্চরিত্র
ভালোবাসা হবে তার রক্ষাকবচ
এমন কাণ্ডজ্ঞে পাত্র, পোশাক মুখোশ খসল, উড়ল পরচুল
উনপঞ্চাশ পবনে তার; চিলছাদে। অগত্যা নাকচ।

এবং গায়-হলুদ হওয়া মেয়ে নিয়ে
প্রজাপতি বিপদগ্রস্ত। লগ্ন পার হলে, এ যা মেয়ে
আত্মঘাতী হবেই যে জানা।
অতএব বরযাত্রীভরা নৌকো উঠেছে জোয়ারে
বেছে নাও, রাজকন্যা, সমস্যা অনেক শুধু বত্রিশ দফা না।

বিপদ-আপদ ভরা চারদিকে রাত্রি
সবাই বরপোশাকে বারো বরযাত্রী
পাখি সব করে রব: হোক না যৌথ বিয়ে হোক
কুন্তী দ্রৌপদী সতী (কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
অন্যলোক যা বলে বলুক আমরা) বিরাহহারা উজ্জ্বল যুবক

প্রথম ফাল্গুনে দেখছি কনের কপালে জ্বলছে সিঁদুরের টিপ।

উন্মোচন

অশোক ভট্টাচার্য

রোদ উঠলে সব কিছু যা আছে সমস্ত সব
উঠোনের আলোর উৎসবে
এখন সাজিয়ে দিতে খুব ইচ্ছে করে।
ছায়াচ্ছন্ন বুকের প্রদেশে প্রত্যন্তের লোভী ঊর্ণনাভ
রক্তেশব্দে জালবোনা সম্রাটের সচ্ছল গতিতে
হৃৎপিণ্ডের বড় কাছাকাছি;
স্যাঁতসেঁতে ছাতাপড়া ধুলো জমে ঝুলে অন্ধকার।
তাপ নেই অধরার ভিতে, বিছানায় তুষারকন্যকা;

দেখি না স্বপ্নেও মাঘমণ্ডলের ব্রত ;
লাগে না জাগ্রত দিন ভালো ; নিঃশ্বাসে বাষ্পের গন্ধ নেই,
বুকের গভীর ধুলে খুব ভিজে গেছি।
ছায়া ঝোলা ঝলমলে যাত্রার পোশাক
উত্তরায়ণের দিকে এতক্ষণে তাই
রজকের দেশীয় নগ্নতা ।

রক্তিম সকাল

স্থমিত চক্রবর্তী

রৌদ্রের বুকে খেলা করে রক্তিম সকাল।

কমরেড, এসো কণ্ঠ শানাই রাজপথে
পলাশের কোলে কিসের ইশারা তুলছে ঢেউ
(মিছিল ছন্দে এত উল্লাস শোনেনি কেউ)
সকল কংসনিধন যজ্ঞ দ্বৈরথে

(যেহেতু স্মৃতির মঞ্চে অটুট গণ-আকাল)।

যুগের বলয়ে বিদ্রোহী আশা তুমুল ঝড়

নিশানের শিখা আনে দুর্মব ঐক্য দিন
আকাশে দৃপ্ত নির্মেঘ ভাষা, মুক্তপ্রাণ
(মনের গুহায় প্রিয় সাথীদের আত্মদান)
প্রান্তরে ওঠে বাত্যাবিজয়ী জীবন-বীণ

(শাল-তমালের ছায়ায় প্রহর স্বনির্ভর)।

প্রাণের শিখরে নিবিড় স্বপ্নে লাগে প্লাবন
জনসমুদ্রে তাই আকাঙ্ক্ষা উচ্চারণ

(হাতের অস্ত্র শুধেছে রক্তক্ষয়ের ঋণ)।

ওরা কজন

কল্যাণ সান্যাল

ওরা কজন অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে সামনে এগুচ্ছিল,
কারণ ওরা এক মুঠো আলো চেয়েছিল।
ওরা কজন অন্ধকার কেটে কেটে সামনে এগুচ্ছিল,
কারণ ওরা একরাশ আকাশ চেয়েছিল।
ওরা কজন দুহাতে অন্ধকার সরিয়ে সামনে এগুচ্ছিল,
কারণ ওরা একতাল সূর্যকে নাগালের মধ্যে চেয়েছিল।

অবশেষে ওরা পথের প্রান্তে নিজেদের আবিষ্কার করল,
যেখানে আলো আকাশ আর সূর্য পাবার কথা।
কিন্তু নিষ্ঠুর অন্ধকার সেখানে সাম্রাজ্য গড়েছে অনেক আগেই
সেই প্রচণ্ড মুহূর্তে আলো আকাশ আর সূর্যের সাধ বুকে নিয়ে
ওরা আচ্ছন্নের মতো অন্ধকারকে ভালোবাসল।

চলো সাগরে

বিজন ভট্টাচার্য

[লোকটা উন্মাদ। তবে বাকপটুতা ও কথার উন্মাদনায় স্বতই যে বিভ্রান্তি ঘটায়, সেটা বোধ করি লোকটার এককালীন শিক্ষা-দীক্ষা ও দেশপ্রেমের সংগ্রামী এষণা সঞ্জাত।

পরনে পাগলের পোশাক। তেলকালি মাখা হাত-পা। লাল দুটো চোখ উদভ্রান্ত ; আপাত অসংলগ্ন কথাগুলোর মানে হলেও তা এলোমেলো। তবে বক্তব্য যে একটা বলতে চায়, সেটা সব কিছু সত্ত্বেও অনস্বীকার্য।

কোমরবন্ধে লাঠি সংলগ্ন লাল পতাকা। পিঠে বিরাট একটি বোঝা। অতি বিশ্বাস নিয়ে তারস্বরে নিজের কথাগুলো ঘোষণা করতে করতে প্রসেনিয়াম-এর সামনে থেকে মঞ্চে উঠে যায়।

বাঁ হাতে ন্যাপাম বোমার আধখানা খোলায় একটি মেয়ের মুখ আঁকা। সংলগ্ন কাঠে তার লাগানো। অনেকটা বাদ্যযন্ত্রের মতো ; ডান হাতে ডমরু। পিছনে সহকারী—ছোকরা।]

মাদারি : New men of the old world unite
All good men of all time unite
Workers of the world unite
(Slogans Thunder)

...Fundaটা কি ? What is primary ? Does consciousness runs counter to matter ? And thus gets lost ?

মার্কসীয় দর্শনটা কি ? কেন মানবো ? মানবো, কেন না—it seeks a solution of the funda—the relation of consciousness to being. কি করে, processটা কি ! How to determine this new knowledge ? প্রচণ্ড একটা জিজ্ঞাসা। শুরু হলো সমুদ্রমন্থন—churning of the stream of consciousness. ভাবতে ভাবতে বেরুল Dialectical Materialism বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—a scientific chopper, which disects and traces the relation of the one from the other in Cognition.

কি মনে হচ্ছে? জ্ঞান দিচ্ছি? না। অতটা casually অভিযোগ করবেন না। হ্যাঁ, তবে বকছি। কেন না, থ'কে গেছি। দারুণ থ'কে গেছি। তবে দড়ি ছাড়ি নি। Still I hold the rope round the horse's neck.

[...দুরন্ত ঘোড়ার সঙ্গে মাদারির দড়ির খেলা। হাত থেকে ছুটে যায় দড়ি। ঘোড়া পালিয়ে যায়।]

...হেরে গেলুম। পালিয়ে গেল ঘোড়া। পিঠের এই প্যাণ্ডোরার বাক্সটা ভীষণ একটা handicap ছিল। The cross was too heavy for me. কি কি আছে এই বাক্সের ভেতরে? স্বাভাবিক কৌতূহল। খুলে দেখাচ্ছি।...

[বাক্সের ভেতর থেকে কয়েকটা জিনিস বার করে সাজিয়ে রাখে সামনে।]

...পয়লা নম্বর, এটা হচ্ছে একটা হুড়কো। কাঠের হুড়কো। দু নম্বর, এটা হচ্ছে এক গাছা শনের দড়ি—কমরেড বিভূতি যাকে আশ্রয় করে পরিত্রাণ পাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন—সেই বিখ্যাত লাকলাইন। আর তৃতীয় দফা, এটি হচ্ছে—এটি হচ্ছে (আবেগময় কণ্ঠ) কালিন্দীর কেশপাশ —কালিয়ার কালিন্দী মা—আমার কালিন্দী (বুকে চেপে ধরে কেশপাশ। এই সময় "উঁচে হ্যায়, সবসে উঁচা, হামারা পিয়ারা হিন্দুস্থান। উঁচে হ্যায় সবসে উঁচা"· · গানটি যুগপৎ শ্রুতিগোচর হয়)। আর চতুর্থ দফা, শেষ দফা, এটি হচ্ছে—জুটমিল ওয়ার্কার নাগিনা মাহাতোর রক্তমাখা জামাকাপড়— আততায়ীর bomb charge-এ যাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

যাই হোক, এগুলো আমার বিশেষ সংগ্রহ। কষ্ট করে ঘুরে ঘুরে এইসব দুর্মূল্য জিনিসগুলি জোগাড় করতে হয়েছে। প্রত্যেকটি Collection-এর নিজস্ব ইতিহাস আছে। আপনাদের চৈতন্যবুদ্ধির দরবারে এই জড়পদার্থগুলি সাক্ষীসাবুদ। একটির পর একটি মামলা পেশ করে যাবে। বিচারকের আসন থেকে প্রত্যেকটি মামলার রায় দেবার অধিকার একমাত্র আপনাদেরই রইল। আমি মাদারি, শুধু শমন নটকে দিয়েই খালাস। (মঞ্চ অন্ধকার)

[মাদারি জোরে ডুগডুগি বাজায়। ছোকরার হাতে নেপথ্যে ঢোলক বাজতে থাকে। একটুক্ষণ বাদেই বাজনার শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসে। আলো ফুটতেই বিলিতি চটুল জ্যাজ-এর সঙ্গে বড়ো যন্ত্রের নাচের তালে tail coat আর top hat পরিহিত ছড়ি হাতে John Bull মঞ্চের আড়াআড়ি নেচে বেরিয়ে যান।

পিছনের পর্দা-সংলগ্ন ভারতের মানচিত্র কেঁপে ওঠে, তাকে ঘিরে প্রজ্জলিত আগুনের শিখা ওঠে, জিগির ওঠে চারিদিক থেকে—"আল্লা হো আকবর", "বন্দেমাতরম"—ধ্বনির মাঝখানে প্রচণ্ড এক যন্ত্রমন্ত্রে এই বহ্নুৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। পাখোয়াজের শব্দ মিলিয়ে গেলে আবার মাদারির ঢোলক ও ডুগডুগি ফেটে পড়ে।

ঢোলক ও ডুগডুগির বাজনা মিলিয়ে যেতে মাদারির গলা শোনা যায়।]

মাদারি : ছোকরা।

ছোক্রা : হাঁ।

: খেলা হোগা ?

: হোগা।

: আচ্ছা খেলা ?

: বহত আচ্ছা।

: হাড্ডিকা খেলা ?

: হাড্ডিকা খেলা।

: তু বাতায়েগা ?

: বাতায়েগা।

: ছোকরা ?

: হাঁ।

: আরে তেরা বচপন তো বীত গিয়া। ছোকরা বোলনেসে পুকারতা কিঁউ। তু তো বাচ্চেকা ফাদার হ্যায়।

: আরে সাদি না হোতে হুয়ে ফাদার ক্যায়সে বন যাঁউ—ইয়ে তো বাতাও মাদারি কা বেটা। তু মুঝে য়্যাসা ফালতু সমঝতা ? তু দুসরিকো বোলালে। হামসে খেলা নেহি হোগা।

: আচ্ছা আচ্ছা তো মাফহি মাঙতা।

: নেহি নেহি।

: তো কান পাকাড়তা।

: কান পাকাড়তা—দেবে করবে তো দো-রোটি। ঔর বোলেগা, বিচ্ছুবাজী বনকে চলো, চিড়িয়াবাজী বনকে চলো, হাওয়াগাড়িকা পাইয়া বনকে চলো, ঘূর্টিয়াবাজী

বনকে চলো, মৌর বনকে চলতে রহো—হামসে খেলা না হোগা।

মাদারি : আরে ভাই মৌর ঔর মোরেগা···

: হাঁ।

: মৌরকা পাসপার···

: হাঁ···

: উ-ও নাচতা হ্যায় পর পাথনেকা জোর, সিনেকা জোর, পাঞ্জেকা জোর, মৌর বনকে চলে য্যায়সান হো তো মর যায়।

: তো ফির কেয়া ?

: মোরেগা তো পিছু দেখেগা, পহলে হাড্ডিকা খেলা বাৎলাও।
—হোগা ?

: হোগা।

: তো চাক্কাবাজী বনকে দৌড়াও, কঙ্কর পাথরমে দৌড়াও, মিট্টি পানি হাওয়া মে দৌড়াও, দুঃখীয়োঁকা দরিয়ামে দৌড়াও, ইনসানকা খুন কা বদলা খুন হোকে ইনকিলাবি গুলগুল্লামে ইনসানিয়াৎকা জিন্দাবাদ পুকার। পহলে ইয়ে খিলকা সওয়াল—ফরিয়াদি ঔর গুনেগার, সব কৈ কো তুরন্ত হাজির করো। (মঞ্চ অন্ধকার)

[মাদারির ডুগডুগি ও ছোকরার ঢোলক তুলকি চালে বেজে ক্রমশ মিলিয়ে যায়। আলো ফুটতেই স্বরেন ডাক্তারের ডিসপেনসারি পরিদৃশ্যমান।]

* * *

[যৎসামান্য আসবাব। প্রবীণ হোমিওপ্যাথ স্বরেন ডাক্তারের ডাক্তারখানা। আড়াআড়ি একখানা পিঠওয়ালা বেঞ্চিতে বুড়ো-বুড়ী ও শিশু রোগীরা কাতরমুখে অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে দু-তিন জন অভিভাবক যাঁরা আছেন, তাঁদের মুখেও দুশ্চিন্তা। ডাক্তারবাবু কখন আসবেন তার কোনো স্থিরতা নেই। কম্পাউণ্ডার মন্মথ সঠিক কিছু বলতে পারছে না।

অপরিসর একখানা ঘর। মাঝখানে শুধু একটি পর্দার পার্টিশন। পর্দার ওপাশে মন্মথর ব্যবস্থাপনা। এপাশে রোগীদের বসবার বন্দোবস্ত। পাশে

একখানা টেবিল। কিছু ডাক্তারী বইপত্তরব্যাগ। আর হাতলভাঙা একখানা চেয়ার। পিঠে তোয়ালে ফেলা।

অপেক্ষমান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রোগী ও অভিভাবকদের সজাগ করে হঠাৎ কম্পাউণ্ডার মন্মথ বেরিয়ে আসে পর্দার ওপাশ থেকে। হাতে ইনজেকশন।]

মন্মথ : কই দিতাম। (সংশ্লিষ্ট রোগী বিব্রত হয়)···কই, বলে ডান হাত না বাও হাত।···গত দিন নিছিলা কোন হাতে ?

রোগী : ডান হাতে।

মন্মথ : তো বাও হাত বার করো। হাতা গুটাও···তাড়াতাড়ি করো, কাম আছে আমার। একৃগো রুগীরে লইয়া বইয়া থাকলে আমার চলতো না। (ইনজেকশন দেয়) লাগল ? —ইস্, এক্কেবে ফুলির ঘায়ে মূর্ছা যাও, এদিকে তো বাধাইয়া বইছ রাজরোগ।

রোগী : আর কটা ইনজেকশন নিতে হবে কম্পাউণ্ডারবাবু ?

মন্মথ : তার আমি কি জানি ? আমি ডাক্তর ? ডাক্তারবাবুরে শুধাইও।

রোগী : কম্পাউণ্ডারবাবু, সারবে তো আমার ব্যামো ?

মন্মথ : সে এক ব্যামোয় কইতে পারে। তবে কথা এই যে—নোলা সামাল ত্যাও। ত্যালেভাজা আর তেতুল গোলা ফুচকা—কইছে বলে ডিউডোনাল আলসার—এক দুধভাত ছাড়া তুমি কিছু স্পর্শ করবা না।

রোগী : শুধু দুধভাত ?

মন্মথ : তয় মরো গিয়া !　　　　(প্রস্থানোদ্যত)

অভয়বাবু (অভিভাবক) : মন্মথবাবু, ডাক্তারবাবু কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন ?

মন্মথ : না, কিছু কইয়া যান নাই। আসবেন, অপেক্ষা করেন।

(প্রস্থান)

অভয়বাবু : অপেক্ষা (আকাশে মুখ ছুঁড়ে মারেন হতাশায়)··· বিকেলের দিকে ডাক্তারবাবু তো বড় একটা বেরোন না।

পিয়ারীলাল : হাঁ সে এমনিতে বেরোন না ঠিকই, কিন্তু জরুরি কোনো

কলউল থাকলে, ডাক্তার মানুষ, বেরুতেই হবে। না তো আর বোলতে পারবেন না।

অভয়বাবু: না না, তখন তো নিশ্চয়ই যাবেন।

পিয়ারীলাল —সে বলুন।

অভয়বাবু: আজও তো শুনলাম গণ্ডগোল হয়েছে।

পিয়ারীলাল: mixed area হোলেই হোবে। এ মহল্লাটাও তো ভালো না। ডাক্তারবাবুকে কত করে বল্লাম—চলুন, আমাদের মহল্লায় চলুন, আমি সব বন্দোবস্ত করিয়ে দিচ্ছি। কুছু অসুবিধে হোবে না আপনার···

অভয়বাবু: তা, পাড়া ছেড়ে যাবেন কি করে?

পিয়ারীলাল: সেই তো মুস্কিল হলো। মক্কেল-ফক্কেল সব এখানে। তবে দেখুন যেখানে সিকিউরিটি ইন্ ডেঞ্জার, কোথায় কোন এক বদমাস আমাকে কি একটা ছুরিটুরি মেরে দিলো আর আমি মরে গেলাম—এটাও কোনো কাজের কথা হলো না।

অভয়বাবু: তা সে কথা যদি বলেন তো আমি বলব সিকিউরিটি আপনার কোনো মহল্লাতেই নেই। আপনি কি বলতে চান আপনার মহল্লায় গুণ্ডা-বদমায়েস নেই?

পিয়ারীলাল: আছে, অনেক আছে; তবে এমনটা তো আপনি দেখবেন না। ওখানে তো অখণ্ড হিন্দুস্থান!

অভয়বাবু: সেকুলার স্টেটে এ-কথাটা ভাবাও পাপ।

পিয়ারীলাল: এ তো কমিউনিস্ট-এর মতো কথা বল্লেন আপনি।

অভয়বাবু: না মশাই, আমার কোনো দলটল নেই। আমি একজন নেহাতই ছাপোষা ভদ্দরলোক।

পিয়ারীলাল: আপনার ভদ্রতা আপনাকে বাঁচাবে?

অভয়বাবু: অভদ্র হতে বলবেন? তাহলে গুণ্ডা-বদমাইসের সঙ্গে আমার আর ফারাকটা রইল কি? ওটা কোনো তরিকা হতে পারে না।

পিয়ারীলাল: কোনটা তবে তরিকা?

অভয়বাবু: সেটা আপনাকেও ভাবতে হবে। সবাইকেই ভেবে বার করতে হবে—যেটা কেউ কোনোদিন ভাবে নি। কথার

আড়ালে তাঁহা তাঁহা নেতারা পর্যন্ত যে পাপটাকে বরাবর জিইয়ে রেখে এসেছেন; গান্ধীজী যার প্রথম বলি। লালাজী, চোখ দিয়ে মন ঠারবেন না। পাপ আমার, পাপ আপনার। সাদা চোখে দেখতে চেষ্টা করুন ব্যাপারটাকে।

(মন্মথ বেরিয়ে আসে। পিয়ারীবাবুকে কয়েকটা পুরিয়া দেয়)

মন্মথ ঃ নেন, ওষুধ নেন। তয় কই কি, আপনেরও কিন্তু ডিউডিনালের একটা চান্স আছে।

পিয়ারীলাল ঃ কি বলছেন আপনি ?

মন্মথ ঃ হ, ঠিকই কই। এই অসুখটার কারণ কিন্তু আজও কেউ নির্ণয় করতে পারে নাই। তয় শুনি—যারা দুঃশ্চিন্তায় ভোগে, নিজের ইষ্ট সাধনায় পরের অনিষ্টের কথা দিনরাত চিন্তা করে, এই রোগটা তাগোই হয় বেশি। প্যাথলজিস্টগো কথা, আমার না।

(পিয়ারীলালের অসুস্থ রাজস্থানী স্ত্রী কঁকিয়ে ওঠে)

পিয়ারীলাল ঃ (কাছে গিয়ে) আঁই ! দরদ হোতা নি ? আঁই ? বহুত দুখতা ? ডাক্তারবাবু···আব ম্যাঁয় ক্যা করুঁ।···আরে এ কম্পাউণ্ডারবাবু ? কিসিকো পাতাই নেহি। কম্পাউণ্ডারবাবু ?

(আবৃত্তি করতে করতে সুরেন ডাক্তারের প্রবেশ)

সুরেন ঃ নববর্ষ এলো আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে—
(রোগীদের লক্ষ্য করে)···কি, তোমরা সব এখনও বসে আছ এখানে ? কি ব্যাপার ?

অভয়বাবু : আপনার জন্যেই তো সবাই···

সুরেন : (বিস্ময়ের ভানে) আমার জন্যে ? আমি কি করব ? আমি তো আর ডাক্তারি করব না।··· যে দেশে এইট্টি পারসেন্ট লোকের মাথা খারাপ, পাগল, সেখানে ডাক্তারি করবার কি স্কোপ আছে !··· এ দেশে দরকার এখন কতকগুলো 'এসাইলাম', 'লুনাটিক এসাইলাম'; ডাক্তার চাই সব সাইকিয়েট্রিস্ট। সব তো পাগল !

অভয়বাবু : তা একরকম ঠিকই বলেছেন।

সুরেন : না না, আপনারা সবাই communal, সবাই sectarian—

উন্মাদাগারেই আপনাদের চিকিৎসা প্রশস্ত হবে।… হুঃ, healer, ডাক্তার।…আর, স্বাস্থ্য ভালো হলেই তো আবার ধমনীতে উত্তেজনা বাড়বে—একজন আর-একজনের পেছনে আবার ছুরি নিয়ে তাড়া করে যাবে।…এই শুনে এলাম, পেয়ারাবাগানে আগুন জ্বলছে। বেলেঘাটা পদ্মপুকুরে ছুরি চলছে। এরপরও ডাক্তারি? (হন্তদন্ত কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণা : বাবা! (থতমত হয়ে যায়)

সুরেন : কি হয়েছে?…বলি হয়েছেটা কি?

কৃষ্ণা : দাদা এখনও ফেরেনি বাবা।

সুরেন : ফেরেনি—ফিরবে। হয়তো ফিরবে না। বাবা তার কি করবে?

কৃষ্ণা : না…

সুরেন : না, করণীয় বাবার এখানে কিছুই নেই—এক অপেক্ষা করা ছাড়া। যাও, ওপরে যাও। আমার কাজ আছে।

(কৃষ্ণার প্রস্থান)

সুরেন : (পিয়ারীলালের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে) কি হয়েছে আপনার! দেখি, হাত দেখি।

পিয়ারীলাল : পেটমে বহুৎ দরদ হোতা ডাক্তারবাবু! ফিরভি সেই দরদ। কাল রাতসে পুকারতি থী… পেটকা অন্দরসে লোহেকা বলকো মাফিক এক গোলি।

সুরেন : গল ব্লাডারের ব্যথা, ঐ রকমই তো হবে। তবে মরবেন না। থেকে থেকে কষ্ট পাবেন।… যাক, ওষুধ-পত্তর খাওয়াচ্ছেন?

পিয়ারীলাল : সেই আপনি যা দিয়েছিলেন…

সুরেন : তা সে তো ছ মাস হতে চলল…এর ভেতরে কি আর কখনও ব্যথা হয় নি? …ঝাল-জর্দা এখনও চলছে, না বন্ধ করে দিয়েছেন?

পিয়ারীলাল : থোড়াসা…

সুরেন : না, কোনো 'থোড়াসা'ই চলবে না। স্রেফ সেদ্ধ। (প্রেস-ক্রিপশন লিখে প্যাড থেকে কাগজ ছেঁড়েন)…মন্মথ!

(মন্মথ যথারীতি প্রেসক্রিপশন নিয়ে যায় ভেতরে)

…আপনার ?

অভয়বাবু: (রোগীকে ডেকে নেন) আমার ছেলের ডাক্তারবাবু আজ কয়েকদিন থেকেই জ্বর, আর তার সঙ্গে একটু একটু কাশি…

সুরেন: হুঁ। (ডাক্তার ছেলের বুকে স্টেথেসকোপ লাগায়) দেখছি…

(পরীক্ষা চলে। আলো আস্তে আস্তে কমে আসে। সবাই বেরিয়ে যায়। ক্ষীণ আলোয় সুরেন ডাক্তার বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আলো ক্রমশ বাড়ে। ডাক্তার তেমনই দাঁড়িয়ে। স্ত্রী শঙ্করীর প্রবেশ)

শঙ্করী: কই, নানু তো এখনও ফিরল না, শুনছ ?

সুরেন: তাই তো দেখছি।

শঙ্করী: বলছিলাম, এগিয়ে গিয়ে একটু খোঁজ-পত্তর করলে হতো না ?

সুরেন: কলকাতা শহরে খোঁজপত্তর ! একি তুমি তোমার হালিশহর পেয়েছ যে হয় ডিসপেন্সারি, নয় চা-এর দোকানে গিয়ে দেখব ছেলে তোমার আড্ডা মারছে ! কলকাতা শহর, পঞ্চাশ হাজার দোকান-পাট গাড়ি-ঘোড়া এখানে… (হল্লার শব্দ)

শঙ্করী: কি হলো ?

সুরেন: সন্ধ্যেও হলো কি বদমাইসিও শুরু হলো। কি দেখছ, যাচ্ছ কোথায় ? (ধমক দেন) যাও যাও, ভেতরে যাও। কৃষ্ণা কোথায় ? ছাতে তেল ফোটাচ্ছে না জল গরম করছে ?

(শঙ্করী ত্রস্তে ভেতরে চলে যান)

…নাঃ, এ দেখছি একেবারে পাগল করে ছেড়ে দেবে, পাগল করে দেবে।

(বোমা ফাটার শব্দ। ডাক্তারের প্রস্থান। শঙ্করীর প্রবেশ। ত্রস্ত পদচারণা। ছেলে নানুকে উদ্দেশ করে স্বগতোক্তি করেন)

শঙ্করী: শত্তুর, শত্তুর পেটে ধরেছিলাম। কতদিন কতবার করে বলেছি যে ত্যাখ নানু, রাত করে ফিরতে হলে বলে যাবি, কোনোদিনও শুনল না।

(হল্লার শব্দ। শঙ্করী আতঙ্কিত হন)

…মুখে সব বড় বড় কথা, তোমার জন্যে আমি ইয়ে করতে পারি, তোমার জন্যে আমি তা করতে পারি—সব মিথ্যে কথা। (ডাক্তারের প্রবেশ)

সুরেন : বলি কথাগুলো কি সে তোমার শুনতে পাচ্ছে এখান থেকে? খামখা চেঁচাচ্ছ ক্যানো?

শঙ্করী : জ্ঞান হওয়া থেকে ঐ ছেলে যেন দুঃস্বপ্ন। পাগল করে দিলে! আবার দেশমাতৃকার গর্ব করে! মা-কে যে ছেলে এমনি করে কষ্ট দেয়, তার আবার দেশভক্তি কি রে?

(হল্লা ও বোমা ফাটার যুগপৎ শব্দ। শঙ্করী ভিতরে ছুটে যান। কৃষ্ণার ত্রস্ত প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। কৃষ্ণা দরজা খুলে দেয়। নানুর প্রবেশ)

কৃষ্ণা : (দাদাকে দেখে) দাদা তুই! আমরা সবাই তোর জন্যে ভেবে ভেবে…আয়, ভেতরে আয়। শহরের খবর কি রে দাদা?

নানু : মোটামুটি ভালোই। তবে আজও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। বেলেঘাটার দিকটা মৌলালির মোড়ে দেখলাম একটা লোক খুন হয়ে পড়ে আছে।

কৃষ্ণা : কি কাণ্ড! রাত করে দাদা তুই কিন্তু আজ কখনো বেরুবি না। আমি বাবাকে তাহলে আজ ঠিক বলে দেবো।

নানু : ছেলেমানুষি করিস না তো। বেশ, বলে দিবি দিস। ঘরে আগুন লাগলে লোকে সব ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় না আগুন নেভাবার চেষ্টা করে? (শঙ্করীর প্রবেশ)

শঙ্করী : নানু এসেছিস! বাব্বাঃ, এদিকে আমি ভেবে ভেবে…

নানু : অত ভাবো কেন বলতো মা। কাজ-কর্ম বন্ধ করে দিয়ে তাহলে হাত-পা কোলে করে ঘরে বসে থাকি!

শঙ্করী : শোনো ছেলের কথা। আমি কি তাই বল্লুম।

নানু : না, অত ভাববে না। ওটা ঠিক না। দিনকাল পালটে গেছে। আঁচলের তলাটা যদি বড় না করো তো পারবে না তুমি তোমার ছেলেকে ধরে রাখতে।

শঙ্করী : বুঝলাম না।

নান্নু : না। নিজে ভাবো, নিজে বুঝতে চেষ্টা কর্রো। আমি বুঝিয়ে দিলেও তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে চাইবে না।…যাকগে খেতে টেতে দেবে না কি !

শঙ্করী : হুঁঃ, সেই বিকেল থেকে খাবার নিয়ে বসে আছি। আমি যে কি জ্বালায় পড়েছি না—নে আয়, খাবি আয়।

(শঙ্করীর প্রস্থান। কড়া নড়ে)

নান্নু : ভেতরে আস্থন।

(দুজন প্রতিবেশী মুসলমান ভদ্রলোকের প্রবেশ)

জসিমুদ্দিন : ডাক্তারবাবু আছেন ?

নান্নু : আপনারা বস্থন। আমি ডেকে দিচ্ছি। (নান্নুর প্রস্থান)

জসিমুদ্দিন : অহন রাজি হইলে হয়।

জমিরুদ্দিন : না গেলে তো মহামুস্কিলের কথা।

জসিমুদ্দিন : সে তো বুজি, কিন্তুক জোর তো আর করতে পারুম না· এই সময়।…আমি হইলে কি করতাম ? (ডাক্তারের প্রবেশ)

স্থরেন : কি ব্যাপার ?

জসিমুদ্দিন : ডাক্তারবাবু, আপনের তো একবার যাওন লাগে। বার কয়েক দাস্তবমি কইরা বউ তো দেখি এক্কেরে ন্যাতাইয়া পড়ছে। ভাবলাম বলে চারোতরফ এই গণ্ডগোল, হৈ হাঙ্গামা, রাতখান ভালয় ভালয় কাটলে সকালবেলা আপনেরে খবর দিমু অনে। তা দেখি সাড়-সম্বিৎ কিচ্ছু নাই, ডাকলে পরে সাড়া পর্যন্ত করে না, চক্ষু মেইলা চায় না…

স্থরেন : টেম্পারেচার আছে ? জ্বর ?

জসিমুদ্দিন : জ্বর…

জমিরুদ্দিন : জ্বর অল্পবিস্তর আছে বুল্যাই তো মনে হয়। ডাকলাম যখন হাতখানি যেন এট্টু ছ্যাঁক কইরা উঠল।

স্থরেন : হুঁ, কিন্তু এই গণ্ডগোলের মধ্যে যাওয়াও তো এক সমস্যা।

জসিমুদ্দিন : কিচ্ছু না। তার দায়িক আমরা আছি। আর মৈজুদ্দিন মিঞারে আমি জানান দিয়া আসছি। কইল বলে ডাক্তারবাবুর চতুঃসীমানার মধ্যে কোনো দুশমন আইত না। সে বিষয়ে আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন।…তাইলে গাড়ি আনি ?

সুরেন : আনো।

(উভয়ের প্রস্থান। সুরেন ডাক্তার তৈরি হয়ে নেন শঙ্করী ও নান্টুর প্রবেশ)

শঙ্করী : কোথায় যাবে?

সুরেন : এই কাছেই। যাব আর আসব—দেরি করব না।

শঙ্করী : না, তা তো বুঝলাম। কিন্তু কেন যাবে?

সুরেন : বেড়াতে।

শঙ্করী : ঠাট্টা রাখো।

সুরেন : ঠাট্টা আমি করিনি। ঠাট্টা যদি কেউ করে, সে তুমিই করেছ।

শঙ্করী : আমি!

সুরেন : হ্যাঁ। নইলে এই দুর্যোগের মধ্যে, একজন ডাক্তার, under what circumstances বেরিয়ে যায়, তুমি বুঝতে পারো না? জমিরুদ্দিনের বউয়ের অসুখ, কলেরা হয়েছে—অবস্থা খুব খারাপ। এ কথা শোনার পরও·

শঙ্করী : হোক, তুমি যাবে না। ওদিকে ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। ওরা আর কোনো ডাক্তারকে নিয়ে যাক।

সুরেন : না, সে হয় না। বস্তিতে ডাক্তারি করি এক আমি। আজ বিশ বছর ধরে আমি ওদের ওপর ডাক্তারি করে আসছি! আর হঠাৎ আমি আজ বলে দেবো—যাব না! না না, সে কিছুতেই হয় না। (নান্টুকে) কী, চুপ করে আছ কেন? তোমাদের Peace Committee-র ধম্মকম্মে কি বলে?

নান্টু : আমি যা বলব—বাবার কিন্তু একবার যাওয়াই উচিত।

শঙ্করী : তোর ঔচিত্যবোধ আমার জানা আছে। সব কথাতে কথা বলতে আসবে না তুমি।

নান্টু : বেশ, বলব না।

সুরেন : অকারণ উদ্বিগ্ন হচ্ছ। ওরা সবাই আমাকে escort করে ওদের বস্তিতে নিয়ে যাবে। And that to their interest—ডাক্তার না গেলে রোগী মারা যাবে। ওরা আমাকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলবে, কি করে এ-কথা ভাবতে পারছ তুমি?

শঙ্করী : ওরা না মারে, আর কেউ তো মারতে পারে!

সুরেন : তা, সে কেউ তো তুমি-আমি যে কেউ হতে পারি ; নিরাপত্তা তো আমাদের কারো কোথাও নেই। সেই তো হয়েছে বিপদ। আসল কথা কি জানো, মাথা—তা সে মাথারই যখন কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, তখন পড়েই মরলাম, না মরেই পড়লাম—সে কথা ভাববার তো কোনো দরকার দেখি না। (জসিমুদ্দিনের নেপথ্য কণ্ঠ)

জসিমুদ্দিন : ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!··· (উভয়ের প্রবেশ) ···ডাক্তারবাবু, গাড়ি আনছি। (চুপচাপ পরিবারবর্গকে দেখে) কি, কিছু বলবেন ?

সুরেন : এরা তো আমাকে ছাড়তে চাইছে না। এখন যদি পারো তো মুচলেকা দিয়ে তোমরা আমায় উদ্ধার করে নিয়ে চলো।

জসিমুদ্দিন : কিছু ভাববেন না মাঠান। কোন চিন্তা করবেন না। আল্লার কসম, জান থাকতে ডাক্তারবাবুর গায়ে আঁচরটুক পর্যন্ত লাগতে দিতাম না।

জসিমুদ্দিন : (আবেগে) ডাক্তারবাবুর জানের জিম্মাদার হইয়া আমি নয় এইহানেই আটক থাকতাম। এমুন তেমুন হইলে, আর কেউ না পারুক, আমি আমার হাতেই আমরারে কোরবানি করতাম।

নামু : (চমকে) একি বলছেন আপনি ? আপনি আপনাকে—সে তো দু-তরফে লোকসান হতো। বাবাকেও হারাতাম, আপনিও খুন হতেন। ওটা তো কোনো কাজের কথা হলো না। ওটা পাগলামি। তা নয়। আর, আপনাদের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসও যথেষ্ট আছে। বাবা নিশ্চয়ই যাবেন। তবে দেখবেন, অতর্কিতে কোনো খারাপ লোক যেন কোনো সুযোগ নিতে না পারে। তাহলে কিন্তু পরিতাপের আর সীমা থাকবে না।

জসিমুদ্দিন : যা ঘটছে, হেই বা কি কমী কয়েন ? দুই জন, দুই মুখ—কালা কইরা বইয়া আছি। কি খোদাতালা কি বেটাপুত—কারো কাছে আমাগো কোনো কৈফিয়ৎ দিবার নাই।

জমিরুদ্দিন : তাইহেলে ফতিমা মরুক ঐহানো। আমি নিমু না ডাক্তার-বাবুরে। পেরাচিত্তিরডা আমিই করি আমার জাতের হইয়া। (কেঁদে ফেলে)

জসিমুদ্দিন : বোঝলাম। কিন্তু ফতিমা কি দোষ করছে, এই ?

জমিরুদ্দিন : আমার কলঙ্কে ফতিমা কলঙ্কী—এই ভাবেই তার হিসাব-নিকাশ হোক।

সুরেন : কিন্তু দায়টা যে তখন আমার ওপর এসে পড়বে। লোকে বলবে, সুরেন ডাক্তারই ফতিমাকে মেরে ফেলেছে। তখন আমিই বা কি কৈফিয়ৎ দিতাম, বলো ?—নাও, ব্যাগটা নাও।

জসিমুদ্দিন : হাই আল্লা !

(জসিমুদ্দিন ব্যাগ নেয়। নানু ও কৃষ্ণা বাদে সকলের প্রস্থান)

নানু : (কৃষ্ণাকে) ছুরিটাকে কক্ষনো হিরো করে দেখিস না। সমাজের ভেতর এইসব লোক থাকতে গুণ্ডা-বদমাইসের দাপট কতখানি হতে পারে ? এখন চাই শুধু একজোট বাঁধা। একজোট হয়ে কাজ করে যাওয়া। যেখানেই পাপের ঘাঁটি, সেখানেই এক গোষ্ঠী ঋত্বিক। যা কিছু অন্যায়, যা কিছু পাপ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দেবে। অনেক কাজ কৃষ্ণা, অনেক কাজ—কাজটাই হয় না। ভয়, শঙ্কা, সংশয়—অথচ আমি জানি প্রত্যেক লোকটা কাচের মতো স্বচ্ছ। সংস্কার যদি না আচ্ছন্ন করে, একজন আর-একজনের ভেতরটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পারে। তা না, তুমড়ে ভেঙে কুঁকড়ে বেঁকে একটা লোক আয়নায় যে কি করে নিজেকে দাঁড়িয়ে দেখে—আমি ভাবতে পারি না। বীভৎসতার দিকে চেয়ে থাকতে বোধহয়—আমরা মানুষ, আমরাই পারি। জানোয়ার হলে ঠিক charge করত—ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত আয়না।

(নেপথ্যে হঠাৎ শান্তিকামী ঋত্বিকদের ঐকতান শোনা যায়)

ভাঙো ভাঙো ভাঙো
ভাঙো ভাঙো ভাঙো
ভেঙে ফেলো এই কারাগার

(সশ্রদ্ধ বিশ্বাস নিয়ে নান্টু ও কৃষ্ণা দূরাগত ঐকতান শোনে। নান্টু ইতিমধ্যে একটু ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়েছে। অল্প পরে কৃষ্ণা ধীরমন্থরে দাদার দিকে এগিয়ে যায়)

কৃষ্ণা : দাদা !

নান্টু : উঁ।

কৃষ্ণা : কি ভাবছিস ?

নান্টু : নাঃ, কিছু না। (অস্থির পদচারণা করে। কৃষ্ণা অধৈর্য হয়)

কৃষ্ণা : দাদা, কালকের মতো আজ কিন্তু তুই বাইরে যাবি না। মা তাহলে একেবারে খুনোখুনি করবেন।

নান্টু : তুই কি করতে আছিস তবে ? বাইরে গিয়ে কাজও করতে পারবি না, ঘরেও শান্তি বজায় রাখতে পারবি না—তুই বোঝাবি মাকে।

কৃষ্ণা : মাকে বোঝাব আমি ?

নান্টু : কেন পারবি না ? দাদার সঙ্গে Politics নিয়ে তো বেশ তর্ক করিস।

কৃষ্ণা : মায়ের সঙ্গে তর্ক চলে না।

নান্টু : না, অকারণ অতটা emotional হবার আর কোনো অবকাশ নেই। মাকেও আজ ব্যাপারটা বুঝতে হবে। এটাও একটা দায়।…কটা বাজল ?

কৃষ্ণা : সওয়া ন-টা।

নান্টু : আমাকে যেতে হবে। সাড়ে ন-টা থেকে আমাদের shift .

কৃষ্ণা : Shift মানে ?

নান্টু : পালা করে কাজ করতে হয় না ? আমি, অনল, বিকাশ, রজত—সবাই থাকবে, সবাই রাত জাগবে—রাতপ্রহরা।

কৃষ্ণা : কিন্তু বাইরে এই অন্ধকার।…

নান্টু : আমাদের প্রত্যেকের কাছে আলো থাকে—টর্চ।
(টর্চ লাইটের আলো চোখে লেগে বিব্রত বোধ করে কৃষ্ণা)
…কিরে। বাইরে রাস্তায় সবসময় বাঘ-ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাবিস, না ?

কৃষ্ণা : না, মানুষও আছে।

নান্নু : অগুণতি মানুষ। আর সব ভালো জাতের মানুষ। লড়াইটা করছে কে শয়তানের সঙ্গে ?

কৃষ্ণা : সেই বিশ্বাস রাখতেই তো চেয়েছিলাম দাদা।

নান্নু : সেই বিশ্বাস রেখেই চলতে হবে। এ ছাড়া আজ আর কোনো উপায় নেই, বুঝলি ?

(নান্নু অন্ধকারে বাইরে বেরিয়ে যায়। কৃষ্ণা দাদার যাত্রা-পথের দিকে একটু দাঁড়িয়ে দেখে ভেতরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল গণ্ডগোল ও হল্লা মাথায় নিয়ে আক্ষেপ-বিক্ষেপ করতে করতে সুরেন ডাক্তার বাইরে থেকে ত্রস্তে প্রবেশ করেন)

সুরেন : ও—হো—হো—হো…

(কৃষ্ণা ঘুরে আসে)

কৃষ্ণা : কি হয়েছে বাবা ?

সুরেন : ও—হো—হো—হো—হো…

কৃষ্ণা : বাবা, কিছু হয়-টয় নি তো তোমার ?

সুরেন : অন্ধকারে কতটা কি হলো বুঝতে পারলাম না। ছুটে আসছি, জসিমুদ্দিন দেখি অন্ধকারে শব্দ করে বসে পড়ল—আর জমিরুদ্দিন তাকে—ও—হো—হো—হো…

(আহত জসিমুদ্দিনের সঙ্গে ব্যাগ হাতে জমিরুদ্দিনের প্রবেশ। সঙ্গে বলবান আলতাফ হোসেন। সুরেন ডাক্তার আক্ষেপ করতে করতে আহত জসিমুদ্দিনের দিকে এগিয়ে যান)

সুরেন : ও—হো—হো—হো, বসো, বসিয়ে দাও, এ হে হে হে…এ যে দেখছি রক্ত পড়ছে…ও হো হো হো হো…কি সব অনাসৃষ্টি কাণ্ডবাণ্ড…সব ক্ষেপে গেছে রে, পাগল হয়ে গেছে…ও—হো—হো—হো। আমার ব্যাগটা ?

জমিরুদ্দিন : এই যে, নেন।

জসিমুদ্দিন : খোদাতালার অনেক দোয়া ডাক্তারবাবু যে চোটখান আমার মাথার উপুর দিয়া গেছে। [ক্রমশ]

লেনিন ও শিল্প

এন. ভইতকেভিচ

১৯০৫ সালে প্রায় রুশ বিপ্লবের যুগেই লেনিন একবার আনাতোলি লুনাচারস্কিকে বলেছিলেন: "শিল্পের ইতিহাস কি অপূর্ব মনোহর। একজন কমিউনিস্টের পক্ষে কতই না শেখার···। সত্যিই দুঃখ হয় যে শিল্পকলায় আত্মনিয়োগ করার সময় ও সুযোগ আমার হলোনা এবং হবেও না।"

বন্ধু ও সহকর্মীর কাছে কথাপ্রসঙ্গে বলা এই সামান্য মন্তব্যটুকু থেকেই বোঝা যায় যে, শিল্পসৃষ্টির ওপর লেনিন কতখানি গুরুত্ব দিতেন, সৃষ্টিকর্মকে তিনি কতখানি মূল্য দিয়েছেন। লেনিন ভালোবাসতেন সুন্দরকে। বিপ্লবী হিসেবে তিনি দেখেছিলেন নতুন জগৎ গড়ার সংগ্রামে শিল্পের ভূমিকা ও ক্ষমতা কী অপরিসীম। রাষ্ট্রনায়ক ও মানবতাবাদী হিসেবে তিনি জানতেন নতুন সমাজের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সর্বাঙ্গীনভাবে গড়ে তোলায় শিল্পসৃষ্টির কী বিরাট শিক্ষাদায়ক ভূমিকা রয়েছে।

ভ্লাদিমির লেনিন-এর শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে তাঁর অন্তরঙ্গ ও সহযোগীরা নানাসময়ে লিখেছেন।

লেনিন-এর একজন সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী ভ্লাদিমির বোঞ্চ ব্রুয়েভিচ তাঁর 'শিল্প ও বিপ্লব' বইটিতে এ সম্পর্কে লেখেন: "১৮৯৫ সাল···লেনিন সে সময়ে জারের পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বিদেশে আত্মগোপন করে আছেন। সে সময় বার্লিনে এক শ্রমিকদের ক্লাবে তিনি হাউফট্‌ম্যান-এর একটি নাটক দেখেন। নাটক ও তার অভিনয় দুই-ই তাঁর ভালো লাগে। ১৮৯৬ সালে হাউফট্‌ম্যান-এর এই নাটকটির অনুবাদ সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে গুপ্তভাবে ছেপে বার করা হয়। নাটকটি হলো 'দি উইভারস'। অনুবাদের সম্পাদনা করেন লেনিন নিজে ও সেটি প্রকাশ করেন তাঁর ভগ্নী আনা উলিয়ানোভা এলিজারোভা। অনুবাদের এক কপি আমি লিও তলস্তয়-এর কাছে পৌঁছে দিই। বইটির সুসম্পাদিত অনুবাদ ও সুন্দর প্রকাশনা দেখে তলস্তয় বিশেষ খুশি হন। বইটি জারের আমলে নিষিদ্ধ হয়।"

ম্যাকসিম গর্কিকে লেনিন একবার লিখেছিলেন: "শিল্পীর প্রতিভা

নিয়ে আপনি রুশ শ্রমিকান্দোলনের বিরাট কল্যাণসাধন করছেন, তাতে যে শুধুমাত্র রাশিয়ারই কল্যাণ হচ্ছে, তা নয়।"

লেনিন ছিলেন রুশ চিরায়ত কাব্যের অনুরাগী। বোঞ্চ ব্রুয়েভিচ লিখেছেন, লেনিন-এর ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিশেষ করে চোখে পড়ত পরিপাটি-ভাবে বাঁধাই-করা পুশ্‌কিন, নেক্রাসভ প্রমুখ কবিদের কাব্য। গীতিকবি ফিওদোর তিউতচেফ-এর কবিতার বইটি তো অনেক সময়ই তাঁর লেখার টেবিলের ওপর দেখা যেত। এইসব কবিতার বইয়ের পাতার ধারে ধারে লেনিন-এর স্বহস্তে লেখা নানান 'নোট' ও চিহ্ন দেখে বোঝা যেত এগুলি তিনি কত আগ্রহ নিয়ে পাঠ করতেন।

লেনিন-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি ও বহুদিনের একজন বলশেভিক শ্রীমতী এলেনা দ্রাবকিনা একটি সুন্দর স্মৃতিচিত্র উপহার দিয়েছেন। এটি মস্কোয় অনুষ্ঠিত এক বিথোভেন সঙ্গীতানুষ্ঠান সম্পর্কে। বিথোভেন-এর সঙ্গীত লেনিন-এর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীমতী দ্রাবকিনা লিখেছেন, "বিথোভেন-সিম্ফনি শোনার সময় লেনিন-এর ভাবান্তর দেখে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে যাই। বহুবার তাঁকে তো আমি রাজনৈতিক মঞ্চে বক্তৃতা দিতে, সভাপতিত্ব করতে, বৈঠক করতে দেখেছি। সেসব সময় লেনিনকে দেখা যেত সদা কর্মব্যস্ত সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল। কিন্তু সেদিনের সেই বিথোভেন সঙ্গীত-আসরে লেনিন যেন বসেছিলেন নিস্পন্দ, মনে হচ্ছিল তিনি যেন এখন অন্য জগতের মানুষ। সেই অপূর্ব সুরসৃষ্টির মধ্যে নিজেকে তিনি একেবারে সঁপে দিয়েছেন।"

শিল্পকলা সম্পর্কে লেনিন-এর শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। কিন্তু, একটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়। এরকম শিল্পকলা-প্রেমিক মানুষ হয়েও তিনি শিল্প সম্পর্কে নিজের মত কখনোই জোর করে অন্যের ওপর চাপাতে চাইতেন না, যদিও তাঁর সেরকম ভাবে কথা বলার সুযোগ খুবই ছিল।

শিল্পসৃষ্টির বিষয়টি সম্পর্কে লেনিন সব সময়েই খুবই বিনীত মত প্রকাশ করতেন। কেউ কোনো শিল্পরচনা সম্পর্কে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করলে তিনি খুবই সবিনয়ে শুরু করতেন, "দেখুন, শিল্প-ব্যাপারে আমি তো বিশেষজ্ঞ কেউ নই, আমার ব্যক্তিগত মতামতটাই মাত্র বলতে পারি"।

লেনিন-এর কথা থেকেই বোঝা যেত শিল্প-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্পর্কে তিনি কত গভীরভাবে মূল্য দিয়ে মত প্রকাশ করতেন। তিনি জানতেন

সার্থক শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটি আর-পাঁচটি ব্যাপারের মতো নয়। এ-এক অনেক জটিল ও নিগূঢ় প্রক্রিয়া।

সৃষ্টিশীল লেখক ও শিল্পিদের সম্পর্কে তাঁর এই মনোভাবের জন্যই ১৯০৮ সালে লেনিন একবার আনাতোলি লুনাচারস্কিকে লিখেছিলেন: "আপনি 'প্রলেতারি' পত্রিকাটিতে গর্কিকে দিয়ে যে নিয়মিত স্তম্ভ লেখাবার পরিকল্পনা করেছেন তা খুবই ভালো। তবে, আমার একটা আশঙ্কার কথাও বলে রাখি। গর্কি যে সৃষ্টিধর্মী লেখা নিয়ে ব্যাপৃত এবং তাতে তিনি যে গভীর মূল্যবান কাজ করছেন, তা থেকে তাঁকে নিয়মিত সাংবাদিকতার কাজে জড়িয়ে ফেলাটায় কি তাঁর আসল কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে না! আমার তো এরকমই বিবেচনা হয়।"

এরই কিছুকাল পূর্বে ১৯০৫ সালে লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'পার্টি-সংগঠন ও পার্টি-সাহিত্য' নিবন্ধটি লেখেন। সেই নিবন্ধে তিনি লেখক-শিল্পীর কাজ ও তাঁদের ব্যক্তিত্বের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে লিখেছিলেন:

"সাহিত্য এমন একটি বিষয় নয় যা যান্ত্রিকভাবে সমঞ্জস বা এক ছাঁচে ঢেলে ফেলা চলে, এ প্রশ্নই ওঠে না। এখানে সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর সংখ্যা-গরিষ্ঠের মতামত চাপানোর প্রশ্নই ওঠে না। এই ক্ষেত্রটিতে যে ব্যক্তিগত উদ্‌যোগ, ব্যক্তিগত প্রবণতা, চিন্তা, কল্পনা, আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর জন্য অধিকতর সুযোগ দিতে হয়—সে বিষয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না।" কিন্তু সাহিত্য ও শিল্প, লেনিনের মতে হওয়া উচিত এমনই, যা "মুষ্টিমেয় কয়েকজন অতিতৃপ্ত ব্যক্তির জন্য নয়," হবে "হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষের" স্বার্থানুযায়ী। কারণ "তারাই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শক্তি ও ভবিষ্যৎ।"

লেনিন আন্তর্জাতিক মহিলা আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রখ্যাত নেত্রী জার্মানির শ্রীমতী ক্লারা জেটকিন-এর সঙ্গে শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করেছেন। এক সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও তার শিক্ষায় শিল্পসৃষ্টির ভূমিকা যে কতখানি এবং সে সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মনোভাব যে কি হওয়া উচিত—শ্রীমতী জেটকিনকে লেনিন তাই বলেন।

লেনিন বলেছিলেন, "আপনি হয়তো জানেন যে, জার স্বৈরতন্ত্র এক অর্ধ-সাক্ষর রাশিয়াকে রেখে গেছে, রেখে গেছে প্রাক্তন জার সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে আরও নিরক্ষর কতগুলি অঞ্চল। সুতরাং শিল্পকে জনগণের আরও কাছাকাছি ও জনগণকে শিল্পের কাছাকাছি আনার জন্য

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অবশ্যই জনগণের সাধারণ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মান বাড়িয়ে তুলতে হবে।"

সর্বহারার শিল্পের কর্তব্য সম্পর্কে লেনিন লিখেছিলেন, "শিল্প কয়েক শত বা কয়েক সহস্র লোককে কি দিচ্ছে তা নয়, মোট জনসংখ্যার তুলনায় তা কতটুকু—সেটাই গুরুত্বপূর্ণ…শিল্প জনগণের বস্তু। শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে তাই শিল্পের শিকড় থাকা দরকার। এই ব্যাপকতম জনগণের দ্বারা সেটি উপলব্ধ হওয়া এবং তারা যাতে ভালোবাসা দিয়ে সেটি গ্রহণ করতে পারে, তাই দরকার। শিল্পকে এমন হতে হবে যা এই ব্যাপকতম জনগণের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ করবে ও তাদের জাগিয়ে তুলবে। তাদের মধ্যেও যে শিল্পীসত্তা আছে, তাকেও তা জাগিয়ে তুলবে এবং তার বিকাশ ঘটাবে…।" এর জন্য তিনি এক দ্বৈত পন্থার বিষয় বলেছিলেন: একদিকে ব্যাপকতম শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে জনগণ শিল্প ও বিজ্ঞানের চূড়ার দিকে এগিয়ে যাবে এবং অন্যদিকে শিল্পকে জনগণের ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে হবে।

এ সম্পর্কে আনাতোলি লুনাচারস্কি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন সোভিয়েত সরকারের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকেই সংস্কৃতির প্রশ্নে সরকারী ডিক্রিগুলি রচনার সময় লেনিন-এর সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর কিরকম আলোচনা হয়েছিল। লুনাচারস্কি সে সময় ছিলেন সোভিয়েত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী। বিখ্যাত চিত্র ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প দ্রষ্টব্যগুলির সংরক্ষণ, বিখ্যাত রুশ থিয়েটারগুলিকে সহায়তাদান, অতীতের বুদ্ধিজীবী ও শিল্পিদের প্রতি নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা প্রভৃতি প্রসঙ্গে লেনিন-এর সঙ্গে তাঁর অনেকগুলি আলোচনা হয়।

লুনাচারস্কি লিখেছেন, "ভ্লাদিমির ইলিচ আমার প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং উত্তরে এসব বিষয়ে কি কি পন্থা নিতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেন। শুধু একটি বিষয়ে তিনি আমাকে অবহিত হতে বলেন যে, সেইসঙ্গে বিপ্লবের প্রভাবে যে নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দিয়েছে—তার প্রতি সহায়তা দিতে আমি যেন না ভুলি।

"আমি বললাম, তাহলে, অতীতের শিল্পের যাকিছু অল্পবিস্তর সৎ—তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। শিল্প যাদুঘরের সামগ্রী নয়, যাকিছু সক্রিয় শিল্প—থিয়েটার, সাহিত্য, সঙ্গীত—এ সমস্তই কতকাংশে, স্থূলভাবে নিশ্চয়ই নয়, আমাদের বিকাশের প্রয়োজনগুলির উপযোগী করে যাতে বিকশিত হয়

সেদিকে অবহিত থাকতে হবে। নতুন প্রকাশগুলিকে বিচারমূলকভাবে দেখে উৎসাহিত করতে হবে···তাদের শিল্পগত গুণগুলি যাতে বিকশিত হতে ও প্রাধান্যলাভ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি ও সহায়তা দিয়ে যেতে হবে, তাইতো ?

"লেনিন উত্তর দিলেন, আমি মনে করি এই-ই হবে উপযুক্ত।

"এইসব ব্যাপারগুলি কি আমি সময়ে সময়ে আপনার দৃষ্টিগোচরে আনব ?" জিজ্ঞাসা করলাম। লেনিন বললেন, কেন, কি জন্য ? শিল্প-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ—এরকম ভাণ আমি মোটেই করতে চাইনা। আপনিই সংস্কৃতি মন্ত্রী, আপনারই কর্তৃত্বে এসব।"

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ. জি. ওয়েলস একবার লেনিনকে "ক্রেমলিনের স্বপ্নদ্রষ্টা" বলে অভিহিত করেছিলেন। ঠিকই, লেনিন স্বপ্ন দেখতেন।

সেই ১৯০১ সালে লেনিন তাঁর 'কি করতে হবে' বইটিতে লিখেছিলেন :

"মানুষ যদি স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতো···সময়ে সময়ে ঘটনাকে যদি সে মনে মনে অনেক আগে থেকে এক সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক ছবি হিসেবে দেখতে না পারত, তার হাত যাকে একটা আকার দিতে চলেছে—তার মানসিক ছবিটি যদি সে আগেই না কল্পনা করে নিতে পারত ; তাহলে আমি ভাবতেই পারিনা কোন প্রণোদনা থেকে মানুষ সৃষ্টি করত তার শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং তার সমস্ত ব্যবহারিক কাজকর্ম ও সৃষ্টি···

···যদি স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে কতকটা সংযোগ থাকে, তাহলে সবই ভালো।"

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিন লেখেন : "তা হবে স্বাধীন সাহিত্য, কারণ তা সহস্র লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের সেবা করবে, কারণ এরাই হলো দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার শক্তি ও ভবিষ্যৎ।"

লেনিন-এর স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে।

[লেনিন-এর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা উপলক্ষে সেই ঐতিহাসিক পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে আমরা এই নিবন্ধটি প্রকাশ করছি। আমরা আশা করি সাহিত্যবিষয়ে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ সম্পর্কেও এদেশে এই শতবার্ষিকী বৎসরে নতুন করে আলোচনা শুরু হবে। —সম্পাদক]

সঙ্কটের আবর্তে পাকিস্তান

প্রমথ ভৌমিক

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা !
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা !

কি যাদু বাংলা গানে,
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

এই আমাদের বাঙলা ভাষা। এই মধুমাখা ভাষা যারা বলে—তারা এক অখণ্ড বাঙালি জাতি। এই অখণ্ড বাঙালি জাতি সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে দ্বিজাতিতত্ত্বের শিকার হয়ে দুখণ্ড হলো। ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারা জাতির এই অঙ্গচ্ছেদ প্রতিহত করতে পারলেন না। পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। বাঙালি জাতির অর্ধাংশেরও কম রয়ে গেল সেই পূর্ব পাকিস্তানে। এই অঙ্গচ্ছেদের বেদনায় এখনও আমাদের বুক টন টন করে। যে যতবড় আন্তর্জাতিকতাবাদীই হোক না কেন, মন থেকে জাতিসত্তার বোধ কেউ মুছে ফেলতে পারে না। জাতিসত্তার বোধে যার মনে সাড়া জাগেনা, তার আত্মা মৃত। "এই আমার মাতৃভূমি," "এই আমার মাতৃভাষা"—একথা বলতে এমন কেউ কি আছে যার বুকে পুলক না জাগে ?

আমাদের বাঙালি জাতির অর্ধাংশেরও বেশি যেখানে বাস করে, সেই পূর্ব পাকিস্তান আজ গভীর সঙ্কটের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেখানে জারি হয়েছে সামরিক শাসন। অবশ্য শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই নয়, পাকিস্তানের উভয় অংশেই এখন সামরিক শাসনের দাপট। সামরিক শাসক ঘোষণা করেছেন, তাঁর শাসনের সমালোচনা পর্যন্ত করা যাবে না। সভা, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—স্বাধীন দেশের নাগরিকদের

এই মৌলিক অধিকারগুলি সবই অপহৃত হয়েছে। সামরিক শাসনের কঠোর নিয়মের এতটুকু বিচ্যুতি ঘটলেই ১৪ বৎসরের কারাদণ্ড, ৩০ ঘা বেত্রদণ্ড, এমনকি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে সমস্ত অপরাধের বিচার হবে সামরিক আদালতে!

ইতোমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রায় অর্ধ সহস্র মানুষ। পশ্চিম পাকিস্তানেও সমানভাবেই গ্রেপ্তার চলছে। করাচির শ্রমিক নেতারা সবাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। স্কুল-কলেজগুলি হুকুম দিয়ে খোলানো হয়েছে বটে, কিন্তু ছাত্রেরা আসেনি। সমস্ত শহরগুলির মোড়ে মোড়ে উদ্যত বেয়নেট নিয়ে রাইফেলধারী সৈন্যেরা প্রহরারত। সামরিক শাসনের তৃতীয় দিনে ঢাকা শহর দেখে একজন সংবাদদাতা বলেছেন—"ঢাকা একটা মৃত নগরী।" মানুষের কণ্ঠ রুদ্ধ, গতিও রুদ্ধ। এক শ্মশানের শান্তি নেমে এসেছে পাকিস্তানে। ঝড়ের আগে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল স্তব্ধ হয়ে যায়। এই শান্তি কি সেই ঝড়ের পূর্বাভাষ?

॥ দুই

কেন এমন হলো? এই দুর্দৈব কিসের পরিণতি? সেকথা বলতে হলে বিগত দুই দশকের কাহিনী বিবৃত করতে হয়। তার এখানে স্থানাভাব। সংক্ষেপে সূত্রাকারে বললে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় যে—যদিও পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধ্বজাধারীরা মুসলমান জাতির নামে দেশশাসনের ভার গ্রহণ করলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন মুসলমান ধনিক-বণিক ও সামন্ত-প্রভুদের স্বার্থের ধারক ও বাহক। যেমনটি ঘটেছিল ভারতে, এখানেও ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধনিকদের একটি নির্মম ও নির্লজ্জ শোষণতন্ত্র।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পাকিস্তানের এই শোষকগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিলেন অবাঙালি, পূর্ব পাকিস্তানের বাইরের লোক। পূর্ব পাকিস্তান প্রধানত ছিল কৃষিনির্ভর। যন্ত্রশিল্প এখানে সামান্যই ছিল। বাণিজ্য যেটুকু ছিল, তাও ছিল কৃষিজাত পণ্যের এবং ছিল প্রধানত অবাঙালিদের হাতে। তাই পশ্চিম অংশের শিল্পপতি ও বিত্তবানেরা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ঘাড়ে সহজেই চেপে বসতে পারল। শাসনযন্ত্রেও পশ্চিম অংশের অধিবাসীদের আধিক্য ছিল। কল-কারখানা ও যন্ত্রশিল্প—পূর্ববঙ্গে এই দুই দশকে যা গড়ে উঠেছে, তার অধিকাংশেরই মালিকানা

ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বণিকদের হাতে। এখানে ওদের যতটুকু শ্রমশক্তি দরকার, শুধু সেটুকু যোগানোর অধিকারই বাঙালিরা পেয়েছিল।

তাই প্রায় প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা অনুভব করতে থাকে যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের একটা উপনিবেশে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বিক্ষোভ ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। মাঝে মাঝে সেই চাপা বিক্ষোভাগ্নির স্ফুলিঙ্গ দেখা যেত বাঙালি-বিহারী বাঙালি-পাঞ্জাবী দাঙ্গায়।

একটা প্রকাণ্ড মূঢ়তা চেপে বসল পাকিস্তানী শাসকদের মনে। তাঁরা ঠিক করলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। লেখাপড়া, সরকারী কাজ—সবই চলবে উর্দুতে। উর্দু অর্থাৎ আরবি হরপ প্রবর্তন করতে হবে। এমনকি বাঙলা ভাষাও লিখতে হবে উর্দু হরপে। ইসলামী সংস্কৃতির নামেও বাঙালিরা এতটা সইতে পারল না। বাঙালি বাঙলা গান ভুলে যাবে—পাখি তার কাকলি ভুলে যাওয়ার মতোই তাদের কাছে এটা অসম্ভব ঠেকল। ফেটে পড়ল ছাত্রসমাজ। তারাই ছিল ওখানকার সমাজের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে শিক্ষিত, সবচেয়ে অগ্রণী অংশ। বেরুল ঢাকায় প্রকাণ্ড মিছিল। গুলি চালাল শাসকেরা। শহীদ হলেন ছাত্রনেতা বরকত ও আবদুস সালাম। ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন শ্রমিকেরা; বাঙলা গান গেয়ে ধানকাটে যে চাষীরা, দাঁড় টানতে টানতে বাঙলা গান গায় যে মাঝিরা—তারা; মেয়েরাও পিছিয়ে থাকলেন না। পুলিশের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা বললেন—করো গুলি। গুলির ভয় আমরা করি না। বাঙালি জাতির সর্বস্তরের সর্বশ্রেণীর মানুষ সামিল হলো সেই ভাষার সংগ্রামে। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে হলো শাসকদের। বাঙলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার করতে হলো।

কিন্তু শাসকশ্রেণীর দুর্বুদ্ধি ও অপচেষ্টার কথা ভোলেনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। এখনও ভাষা শহীদদের মাজারে তাঁদের স্মৃতিদিবসে হাজারে হাজারে বাঙালি সমবেত হয়ে ফুল দিয়ে ভরিয়ে দেয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ।

একটানা বঞ্চনা ও শোষণে জর্জরিত পূর্ব বাঙলার মানুষ ভেতরে ফুঁসতে থাকে। সাধারণ নির্বাচনে সেবার তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। পাকিস্তানের স্রষ্টিকর্তা মুসলিম লীগ নির্বাচনে একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেল। একটা পার্টি গঠনের মতো আসন-সংখ্যাও তারা লাভ করতে পারল না। বিজয়ী হলো যুক্তফ্রন্ট। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি লাভ করলেন কারাগার

থেকে। আশা জেগে উঠল মানুষের মনে—এবার প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু তখনও কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিছুদিনের মধ্যেই একটা বাজে বাহানা ধরে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার গদিচ্যুত হলেন। তারপর শাসনক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘকাল চলল ক্ষমতাভোগী ও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের কাড়াকাড়ি। তারই পরিণতিতে অনিবার্য ভাবে জনগণের ঘাড়ে চেপে বসল একটা সামরিক চক্র—যার প্রধান হলেন আয়ুব শাহ। প্রথম দিকে কিছু মানুষের মনে আশা জেগেছিল, হয়তো এবার একটা সুস্থ ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে। আয়ুব শাহ অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা! বর্তমান প্রধান সামরিক শাসক এহিয়া খাঁর মতো আয়ুবও ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ক্ষমতা দখল করে রাখতে চান না। একটা সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হলেই তিনি পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করবেন। কিন্তু সেই সুস্থ পরিবেশ আর সৃষ্টি হলো না। ধীরে সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে আয়ুব শাহ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে ডিক্টেটর হয়ে বসলেন। নিজেই নিজেকে উপাধি দিলেন ফীল্ড মার্শাল। 'এবডো' নামে এক আইন খাড়া করে পাকিস্তানের সমস্ত গণনেতাদের নির্বাচনে দাঁড়াবার ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। অনেককে একটা বিচারের অভিনয় করে এবং অনেককে বিনা বিচারেই কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থারও কিছুমাত্র পরিবর্তন হলো না। সেই অবাঙালি ধনিকদের শোষণ অব্যাহত রইল। শাসনযন্ত্রেও বাঙালিদের স্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে গেল। পরিবর্তন এইটুকু হলো যে অধিকাংশ মানুষ তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকুও তখনকার মতো হারিয়ে বসল। পাকিস্তানের উভয় অংশেই দেশশাসনে অংশ গ্রহণে সাধারণ মানুষের আর কোনো ক্ষমতাই রইল না। শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী সকলেই হলো নির্মম গণশোষণের শিকার। অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠল।

আয়ুব শাহ দেখলেন এমনভাবে বেশিদিন চালানো যাবে না। তিনি তখন 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক সোনার পাথুরে বাটি সৃষ্টি করে মানুষকে উপহার দিলেন। এতে মুষ্টিমেয় সম্পত্তিবানেরা মাত্র ভোটের অধিকার পেল। অঞ্চলে অঞ্চলে আয়ুবভক্ত ও সমর্থকেরা গড়ে তুলল 'মৌলিক গণতন্ত্র পরিষদ'। আয়ুব তাদেরি ভোটে নিজেকে আবার প্রেসিডেণ্ট রূপে নির্বাচিত করলেন।

'জাতীয় পরিষদ' নামে একটা পুতুল নাচের আসরও সৃষ্টি হলো। বলা বাহুল্য প্রেসিডেন্টের হাতেই সর্বময় ক্ষমতা। জাতীয় বা প্রাদেশিক পরিষদ নিতান্তই একটা বাগজালবিস্তার করার আসর মাত্র। কোনো ক্ষমতাই তাদের থাকল না।

এমনিভাবে চলল একটানা প্রায় দশ বছর। মাঝে অবশ্য আবার 'মৌলিক গণতন্ত্র'র একটা মেকি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এবারও 'করাতের গুঁড়োর' ফিল্ডমার্শাল হলেন প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ। এইসব অভিনয় কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন এতটুকু স্পর্শ করতে পারল না। তবে আয়ুব কিছু বিত্তবান দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতালোভী সমর্থক সৃষ্টি করতে পারলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে ধীরে ধীরে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ জেগে উঠতে লাগল। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠল। বড় বড় গণজমায়েত হতে লাগল। এই আন্দোলনকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না।

আয়ুব খাঁ তখন একটা বড় চাল চাললেন। শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হলো। অভিযোগ করা হলো : ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে মুজিবর রহমান ও পাকিস্তানের কয়েকজন সামরিক কর্মচারী লিপ্ত হয়েছেন। ভারত-বিরোধী প্রচার উদ্দাম হয়ে উঠল। তখনও পাকজনতার একটা অংশের মধ্যে ভারতের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হয় নি। তাই এই অপপ্রচারে কিছু ফল হলো। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে গণআন্দোলন সাময়িকভাবে হলেও খানিকটা পিছিয়ে গেল। এমনিভাবে আরও কয়েকটা বছর গড়িয়ে গেল।

আয়ুব শাহ আরও একটা ধূর্ত চাল দিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক চীনা সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করলেন। এতদিন পাক সরকার ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। মার্কিনী যুদ্ধজোট 'সিয়াটো' ও 'সেণ্টো'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী। শস্তা মার্কিনী পণ্য ও মার্কিনী গুপ্তচরে পাকিস্তান ভরে গিয়েছিল—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান। মার্কিন সরকার পাকিস্তানকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যও প্রচুর দিয়েছে। মার্কিন সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে এবং মুখ্যত তাদেরি প্ররোচনায় পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু এশিয়ায় মার্কিনী ক্রিয়াকলাপের ফলে, বিশেষ করে ভিয়েতনামে

নগ্ন মার্কিনী আক্রমণ ও বর্বরতায়, সর্বদেশের জনগণের মধ্যে মার্কিনী সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল। পাকিস্তানের মানুষের মনেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিরূপতা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

এই মার্কিন বিরোধিতা চাপা দেওয়ার জন্য আয়ুব-চক্র নতুন বন্ধুলাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। সে সুযোগও জুটে গেল। চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের ফলে, চীন ভারতের প্রতিবেশী ও ভারতদ্বেষী পাকিস্তানের সঙ্গে মিত্রতার প্রয়াসে এগিয়ে এলো। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র—এই সূত্র ধরে সমাজতন্ত্রী চীন সরকার ধনিকতন্ত্রী সামন্ততন্ত্রী পাকিস্তানের পরম মিত্র হয়ে দাঁড়াল। রাজনীতিতে কত বিচিত্র শয্যাসঙ্গীই না জোটে!

এক ঢিলে দুই পাখি মারা গেল। বামপন্থী আন্দোলন এই চৈনিক মিত্রতার ফলে বিভক্ত হয়ে গেল। পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী হয়েই ছিল। তার মধ্যেও একাংশ ভাগ হয়ে চীনাপন্থী হয়ে গেল! বামপন্থী মৌলনা ভাসানী চীন থেকে ফিরে এসে আয়ুবের সমর্থক হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি চীনের অনুরাগী—অতএব চীন সরকারের মিত্র আয়ুব শাহের বিরোধিতা কি করে করবেন! গণআন্দোলনেও সে বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিল। আওয়ামী পার্টি দুই ভাগ হলো—আওয়ামী ও জাতীয় আওয়ামী পার্টি। আয়ুবের সুখের শাসন আরও কয়েক বৎসর আয়ু লাভ করল। গণআন্দোলনের সমস্ত নেতা ও কর্মীদের এক এক করে ধরে জেলে পোরা হলো।

॥ তিন ॥

কিন্তু এত করেও শেষ রক্ষা হলো না। ইতিমধ্যে দুনিয়াটা অনেক বদলে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে পাকিস্তানের গণচেতনা। ফলে পূর্ব বাঙলার স্বায়ত্ত শাসনের দাবি আবার এক দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য রূপ ধারণ করল। সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়াল সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম কমিটি। তার সঙ্গে যোগ দিলো শ্রমিকশ্রেণী। গ্রামের কৃষকেরাও মদত দিতে লাগল। গঠিত হলো আট পার্টির গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি বা ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি ('ডাক')।

এই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি বা যুক্তফ্রণ্টে নরমপন্থী নূরুল আমিন, নবাবজাদা নসরুল্লা থেকে সমাজতন্ত্রী অধ্যাপক মুজফ্‌ফর আহমেদ প্রভৃতি সবাই ছিলেন। ছিলেন না কেবল মৌলনা ভাসানী। তিনি কতকগুলি উগ্রপন্থী অবাস্তব দাবি উত্থাপন করে আন্দোলন থেকে নিজেকে ও নিজের

দলকে পৃথক করে রাখলেন। বিশাল বিশাল সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। কয়েকটি সর্বাত্মক হরতাল এবং ধর্মঘটও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। এবার আর লাঠি ও গুলিতে কোনো কাজ হলো না। যত গুলি চলতে লাগল—ততই সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় আরও বেশি বেশি মানুষ সামিল হতে লাগল। সহসা যেন এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বন্যা-স্রোতের মতো মানুষ ছুটে এগিয়ে আসছে। এই অপশাসনের পাষাণকারা তারা ভাঙবেই। কে আগে প্রাণ দেবে যেন তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে যেন এক নবজন্ম বা রেনেসাঁসের যুগ এসে গেছে। সাহিত্যে ও সঙ্গীতে, কবিতায় ও প্রবন্ধে তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা দিলো।

এবারকার আন্দোলনের আর-একটা বৈশিষ্ট্য হলো এবার পশ্চিম পাকিস্তানেও একই সঙ্গে প্রচণ্ড গণআন্দোলন শুরু হলো। সেখানেও উত্তাল হয়ে উঠল ছাত্রসমাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীও। করাচী, লাহোর এবং রাওয়ালপিণ্ডি বড় বড় ছাত্র শোভাযাত্রা ও শ্রমিক ধর্মঘটে মুখর হয়ে উঠল। পাকিস্তানের উভয় অংশে এর পূর্বে আর কখনও একই সঙ্গে এতবড় গণআন্দোলনের জোয়ার দেখা যায় নি।

প্রমাদ গণলেন সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব শাহ। তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে একটা আপোষরফার জন্য এক গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব পেশ করলেন। ঘোষণা করলেন তিনি আগামী নির্বাচনে আর প্রেসিডেন্ট-পদপ্রার্থী হবেন না। কিন্তু বামপন্থীরা শেখ মুজিবর রহমানকে বাদ দিয়ে গোল-টেবিল বৈঠকে উপস্থিত হতে রাজি হলেন না। আয়ুব শাহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধ্য হলেন। সগৌরবে মুক্তিলাভ করলেন মুজিবর। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করলেন কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মনি সিং সহ সমস্ত আটক বন্দীরা। এ এক বিপুল জয়—জনতা যেন কারাগার ভেঙেই তাদের প্রিয় নেতাদের মুক্ত করে আনল।

তারপর গোলটেবিল বৈঠক। আয়ুব খাঁকে ঘোষণা করতে হলো—তুলে নেবেন 'মৌলিক গণতন্ত্র'র বিধান, সংবিধান পরিবর্তন করা [illegible]। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার দেওয়া হবে এবং পূর্ণ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হবে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য দেওয়ার দাবি সম্বন্ধে তিনি নীরব রইলেন। খুশী হতে পারলেন না মুজিবর রহমান ও অন্যান্য বামপন্থীরা।

কিন্তু ইতিমধ্যে সংগ্রাম কমিটির মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে যেমন ভীত হয়েছেন আয়ুব শাহ—তেমনি ভীত হয়েছেন নূরুল আমিন, নসরুল্লা খাঁ প্রভৃতি নরমপন্থীরা। ফলে আয়ুব শাহের ঐ স্বীকৃতি মেনে নিয়ে তাঁরা সংগ্রাম কমিটি ভেঙ্গে দিলেন। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলো। মৌলনা ভাসানী এই ফ্রন্ট থেকে বরাবরই পৃথক ছিলেন, এবার আরও অনেকে যুক্তমোর্চা থেকে সরে দাঁড়ালেন। গণআন্দোলনে এক বিভেদের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আয়ুব শাহ এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু তাঁর সম্মুখে একটা বিপদ দেখা দিলো। নিয়মতন্ত্র-সম্মত গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হয়ে আত্মরক্ষা করার মতো জনসমর্থন তাঁর ছিল না। তাঁর শাসনক্ষমতা বজায় রাখবার একটি মাত্র রাস্তাই খোলা ছিল। সে হচ্ছে সামরিক শাসন প্রবর্তন। কিন্তু এ পথে অগ্রসর হতেও তিনি ভরসা পাচ্ছিলেন না। মিলিটারির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে তাঁকেও সরে দাঁড়াতে হবে। ১৯৫৮ সালে যেমন ক্ষমতা হাতে পেয়েই তিনি তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জাকে নির্বাসনে পাঠান, তেমনি তাঁকেও যে এবার সেই পথেই যেতে হবে না—এ ভরসা আয়ুব পাচ্ছিলেন না বলেই একটু ইতস্ততের মধ্যে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে, যতদূর খবর পাওয়া গেছে, সমরচক্রের নায়কদের চাপেই সামরিক শাসন প্রবর্তনে সায় দিতে হয়েছে। নিজেকেও সরে দাঁড়াতে হয়েছে। যতদূর খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়—রক্ষণাবেক্ষণের নাম করে তাঁকে সামরিক পাহারায় গৃহবন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে তাঁকে তিন মাসের মধ্যে পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল প্রধান সামরিক শাসক এহিয়া খাঁ নিজেই নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট পদে বরণ করেছেন। সামরিক শাসনকর্তার ভার গ্রহণ করার পরে নিজে প্রেসিডেণ্ট হয়ে সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করতে আয়ুব সময় নিয়েছিলেন তিন সপ্তাহ। বর্তমান প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল এহিয়া সময় নিয়েছেন এক সপ্তাহেরও কম। সামরিক শাসন প্রবর্তনের ষষ্ঠদিনেই তিনি আয়ুবকে পদচ্যুত করে প্রেসিডেণ্ট হয়ে বসলেন। নিজের অনুসৃত পথেই আয়ুব শাস্তি পেলেন। শীঘ্রই হয়তো তাঁকে নির্বাসনে প্রেরণের খবর পাওয়া যাবে। বোধহয় ইতিহাস কখনও কাউকে ক্ষমা করেনা।

চার ॥

পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের একটা সমূহ অজুহাত সৃষ্টির সুযোগ জুটে গিয়েছিল। সত্যের খাতিরে সে কথাটা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাজবন্দীদের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের কাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলনের একাংশের মধ্যে একটা হঠকারী ও নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক দেখা দেয়। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা হতে থাকে। এটা অনেকটা চীনাদের নতুন রাজনীতির ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর অনুরূপ বলেই অনুমিত হয়। সেই ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে ভারতের ও অন্যান্য দেশের পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রচার চালানো হয়। সেই প্রচার সামরিক শাসন প্রবর্তনের পটভূমিকা রচনা করে। এই প্রচার যে সত্যিই অতিরঞ্জিত ছিল—তা এখন স্বীকার করা হচ্ছে।

পাকিস্তানে—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে—গণআন্দোলন যখন উত্তাল তরঙ্গ তুলে প্রতিক্রিয়াকে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে, সেই মুহূর্তে পশ্চিম-বঙ্গেও জনতা এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে একেবারে ধ্বসে যায় ভারতীয় ধনিকদের পার্টি—কংগ্রেস। এদেশে জনতার মধ্যে জেগে ওঠে এক প্রচণ্ড জয়োল্লাস। যেন একই সঙ্গে বান ডেকেছে গঙ্গা ও পদ্মায়। পশ্চিমবঙ্গের জনতার এই জয় পূর্ব পাকিস্তানেও নতুন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

ভারতের ধনিকশ্রেণীর সরকারও এই জনজাগরণে ভয় পেয়ে যান। তাদের তাঁবেদার পত্র-পত্রিকাগুলিতে সীমান্ত সংঘর্ষের নামে উগ্র পাকিস্তান-বিরোধী প্রচার চলতে থাকে। পাকিস্তানেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সশস্ত্র ভারতীয় সৈন্যের অনুপ্রবেশের নাম করে ভারত-বিদ্বেষী জিগির তোলা হয়। উভয় দেশের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একই উদ্দেশ্য। পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবর হুঁশিয়ারি জানান। যাই হোক, এইসব সাম্প্রদায়িক প্রচারে খুব বেশি ফল হয় না। এখানে আর-একটা কথা উল্লেখ না করলে চিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভারতের উপর দিয়ে আকাশ-পথে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য প্রেরিত হয়েছে। জেনেও না জানার ভান করেছে ভারতের শাসক কংগ্রেসী সরকার। বোঝা দরকার যে প্রতিক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই—তা সে যে দেশেরই হোক। সব দেশের প্রতিক্রিয়াই গণ-জাগরণকে ভয়ের চোখে দেখে। এখানে ভারত-পাকিস্তানে বা হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ নেই। বিপদের সম্মুখে একদেশের প্রতিক্রিয়া অন্য দেশের

প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করে—এই হলো ইতিহাস। এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন।

পাঁচ ॥

কোন পথ ধরে এগুবে জেনারেল এহিয়া খাঁর সামরিক শাসন? মিশরের নাসের-এর মতো প্রগতির পথে এগুবার কোনো সম্ভাবনাই কি এদের আছে? এই প্রশ্নটা কারও কারও মনে জেগেছে।

সকালের আবহাওয়া দেখে যেমন দিনটি কেমন যাবে—তা খানিকটা বোঝা যায়, তেমনি এহিয়া খাঁর প্রথম সপ্তাহের কার্যকলাপ দেখে কতকটা বোঝা যাচ্ছে—তাঁর গতি কোন দিকে।

সামরিক শাসন প্রবর্তনের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের বিত্তবানেরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। খবর এসেছে করাচির স্টক এক্সচেঞ্জে সামরিক শাসন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের দাম চড়ে গেছে এবং ক্রমাগতই চড়ছে। শেয়ার বাজারে নিশ্চয়ই মজুর-চাষী ও ছাত্রেরা কাজ করে না।

দ্বিতীয় খবর হলো, এহিয়া খাঁ এক নির্দেশ দিয়ে শ্রমিকদের বহু সংগ্রামের ফলে অর্জিত বেতনবৃদ্ধি রদ করে দিয়েছেন। কোনো প্রগতিপন্থী ও শ্রমিক-শ্রেণী বা মেহনতী মানুষের মিত্র এমন কাজ করে না।

তৃতীয়ত, পাকিস্তানে প্রধানত যাঁরা পেছন থেকে কলকাঠি নাড়েন সেই মার্কিন পক্ষ এখনও এতবড় একটা পরিবর্তন সম্বন্ধে নীরব। ওয়াশিংটন থেকে একটা কথাও কেউ এখনও বলেনি। এই নীরবতা কি সমর্থন-সূচক?

যদিও মৌলনা ভাসানী ইতিমধ্যেই এহিয়া খাঁকে একজন "সং ও সাধু সৈনিক" বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন—তবুও আমরা তাঁর ঐ সার্টিফিকেটে বিশেষ অনুপ্রাণিত হতে পারছি না। কিছুদিন পূর্বেও যে আয়ুবের তিনি একজন মস্ত সমর্থক ছিলেন—তাঁকে এখন বলছেন "দুর্নীতিগ্রস্ত ও দরিদ্রপীড়ক" এবং তাঁকেই বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী করছেন। ফলে, মৌলনা সাহেবের সার্টিফিকেটকে খুব একটা মূল্য দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে আমরা দুঃখিত।

তাহলে কি পাকিস্তানের মানুষের জীবনস্পন্দন সামরিক শাসনের রথচক্র দলে পিষে স্তব্ধ করে দেবে? সে বিশ্বাস আমরা করতে

পারি না। পাকিস্তানের—বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের—নবজাগরণ কিছুতেই স্তব্ধ হতে পারে না। অত্যাচারপীড়িত শোষণে জর্জরিত মানুষের জাগ্রত অন্তরের বহ্নিশিখা সপ্তসমুদ্রের জলেও নেভানো যায় না। পাকিস্তানে গণবিপ্লবের যে বহ্নিশিখার প্রকাশ দেখা দিয়েছিল—তা নেভাবার সাধ্য সামরিক শাসনের নেই। সেখানে সাময়িক যে পশ্চাদপসরণ ও স্তব্ধতা—তা আগামী ঝটিকার পূর্বাভাষ মাত্র।

পূর্ববঙ্গ সাড়ে চার কোটি বাঙালির মাতৃভুমি—কিন্তু এই বাঙলা মায়ের প্রশস্ত বুকে আরও অনেকের স্থান হতে পারে। পাঞ্জাবী, বিহারী, সিন্ধি···সকলকে স্থান দেবে বাঙালির মা। বাঙালি এদের ডেকে নেবে ভাই বলে। সেই ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দেবে পাঞ্জাবী ও পেশোয়ারী সৈনিক। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ওদের রাইফেল ঘুরে দাঁড়াবে। জনতার জয় হবেই! কারণ জনতা চিরদিনই অমর!

১লা এপ্রিল, ১৯৬৯

পুস্তক-পরিচয়

নৌ-বিদ্রোহ। বলাইচন্দ্র দত্ত। কম্পাস পাবলিকেশনস লিমিটেড। তিন টাকা।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতিহাস নতুন বাঁক নিলো। মূলধনতান্ত্রিক সঙ্কটের ফলে এক মহাযুদ্ধের জের মিটতে না মিটতে ঘনিয়ে এসেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কিন্তু প্রতিটি মহাযুদ্ধের শেষে জনগণের চোখের সামনে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তঃসার-শূন্যতা বেশি বেশি করে ধরা পড়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশে পুঁজিবাদকে চিরকালের জন্য নির্মূল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। দুনিয়া সমাজতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করল। আর সেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুষের সামনে অবধারিত এক ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরল। মহাযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একচেটিয়া পুঁজি-বাদের শোষণে জর্জরিত ঔপনিবেশিক দেশগুলির জনগণ আরও বেশি মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হলো। মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলির সংগ্রাম আসলে তো একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের দু-ধরনের ফ্রন্ট। তাই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর (এ-বছর তার পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী) দ্বিতীয় কংগ্রেসে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যার তত্ত্বমূলক বক্তব্যে স্বয়ং লেনিন বলেছিলেন: "অগ্রসর দেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলন নিছক ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই হয়ে উঠবে না, যদি না, মূলধনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণী মূলধনদ্বারা নির্যাতিত কোটি কোটি ঔপনিবেশিক দাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ ঐক্য গড়ে তোলে।" বলা বাহুল্য, এযুগের বৈপরীত্য মূলধনের সঙ্গে শ্রমের। মূল বিরোধ সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। আর, তৃতীয় আন্তর্জাতিক-এর লেনিন-এর সেই তত্ত্ব কার্যকরী করে তুলছেন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও সাহায্যকারী সমাজতন্ত্রী শিবির।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রয়োগগত ক্ষমতা প্রমাণিত হলো। মহাযুদ্ধ শেষ। চূর্ণ হয়েছে ফ্যাসিস্ত শক্তি। দুর্বল হয়েছে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ। আর সাম্রাজ্যবাদের উপরে সমাজতন্ত্রের প্রবল

চাপ ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতার সনদকে নিশ্চিত করে তুলছিল। লড়াই চলেছে গোটা এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে। বিভিন্ন পন্থায় লড়াই। কিন্তু মূল লক্ষ্য—সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের শাসন-শোষণের হাত থেকে অব্যাহতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দেশে দেশে বিশেষভাবে অবহেলিত মানুষ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নিতে থাকে। গ্রামের কৃষকেরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হেনেছে। কেননা, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচামাল ও শস্তা শ্রম লুঠ করার কাজে সামন্ততন্ত্র ছিল আড়কাঠির ভূমিকায়। আমাদের বাঙলাদেশ জুড়ে কৃষকসমাজ ঝাঁপ দিলো ভূমিবিপ্লবের দাবি নিয়ে, প্রত্যক্ষত তেভাগার আন্দোলনে। শহরের শ্রমিক-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের বিরুদ্ধেও গর্জে উঠল। এলো রশীদ আলি দিবস। কলকাতার রাস্তায় ব্যারিকেড উঠল। এরপরই এলো নৌ-বিদ্রোহের মতো গৌরবময় ঐতিহাসিক পর্ব। এসেছিল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক ধর্মঘটের ডাক। ছেচল্লিশের রশীদ আলি দিবস, নৌ-বিদ্রোহ, কৃষকের জমির লড়াই—এ-সব কিছুর সঙ্গে আমরা সারা ভারত জুড়ে ২৯শে জুলাই-এর ডাক-তার ধর্মঘটের কথা স্মরণ করি। মনে পড়ে যায় ভারতীয় স্থলবাহিনীর মধ্যেও ধূমায়িত বিক্ষোভ। মনে পড়ছে মাদ্রাজে বিমান বাহিনীতে বিদ্রোহ, পাটনায় পুলিশের বিদ্রোহ ইত্যাদি। লড়াই চলছিল শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী ও সৈন্যবাহিনীর—একই শত্রুর বিরুদ্ধে। সেই শত্রুর নাম সাম্রাজ্যবাদ। ভারতে তা বৃটিশ ঘরানার। যেমন ইন্দোচীনে তা ছিল ফরাসী ঘরানার, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ ঘরানার, ফিলিপাইনে মার্কিনি ঘরানার। আর ভারতে লড়াই যখন বৈপ্লবিক গুণগত রূপান্তরের পথে পা বাড়াচ্ছে, তখনই ক্যাবিনেট মিশন। তখনই সাম্রাজ্যবাদী-সামন্ততন্ত্রী-অন্ধকারের শক্তিগুলির চক্রান্তে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। সময়মতো পাশার চাল শকুনি ঠিকই খেলল। আমরা মাত হলাম। এলো বিভক্ত ভারতে স্বাধীনতা। ভারতীয় অংশে গদীয়ান হলো দেশের পুঁজিবাদী শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস দল। এখন সে দলেও ভাঙন। একচেটিয়া মূলধনপতিদের সেবাদাসে রূপান্তরিত হচ্ছে কংগ্রেস। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার উপরে অশুভ ছায়া পড়েছে মার্কিনি মূলধনী রাহুর। জাতীয় স্বাধীনতার শক্তিগুলিকে তাই আরও বলীয়ান করে তুলতে হবে। স্বদেশে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে আবার আমাদের নতুন করে সৈনিক হতে

হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ইতিহাসের কয়েকটি পুরনো গৌরবময় অধ্যায়কে 'নৌ-বিদ্রোহ' নতুন পরিপ্রেক্ষিতের আলোয় তুলে ধরেছে।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের গৌরবময় বিদ্রোহ-পর্যায়ের ইতিহাস খুব একটা লিখিতাকারে নেই। নেই নৌ-বিদ্রোহেরও। শ্রীবলাইচন্দ্র দত্ত ঐ নৌ-বিদ্রোহের অন্যতম অংশীদার ছিলেন। তিনি ছিলেন 'তলোয়ার' জাহাজের অন্যতম বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'রিভোলট অব দি ইনেনোসেন্ট' বইটি 'নৌ-বিদ্রোহ' নামে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বইখানিতে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্য সংযোজিত হওয়ায় রচনাটির রাজনৈতিক তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বইখানির মনস্তাত্ত্বিক পটভূমির আলোচনা প্রসঙ্গে বলাইবাবুর মন্তব্য মূল্যবান। লিখেছেন "আমার বয়স তখন বাইশ বৎসর। অক্ষত দেহেই আমি ফিরে এসেছি এক মহাযুদ্ধ সমাপ্ত করে। সেই যুদ্ধ ঘটিয়েছিল নাৎসি আধিপত্যের পরিসমাপ্তি। আমি নিজেকেই প্রশ্ন করতে শুরু করলাম, কি অধিকার ছিল বৃটিশের আমার দেশের ওপর রাজত্ব করার? জাতীয়তাবাদী ভারত বৃটিশকে বলেছিল, ভারতের ব্যাপার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে। সে ব্যাপারে বৃটিশরা ছিল তেমনি অনমনীয়! জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কাছে আমাদের পরিচয় ছিল একমাত্র ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে। আমার বোধ হলো আমরা তা নই সেটাই প্রমাণ করার ভার পড়লো আজ আমাদের উপর। যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি হয়ে পড়লাম একজন ষড়যন্ত্রকারী" (পৃষ্ঠা ১১)। ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে নৌ-বিদ্রোহ ও তার পরিপ্রেক্ষিতের অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন মার্কসবাদী বৃটিশ ঐতিহাসিক শ্রীরজনী পাম দত্ত "The naval rising in February 1946, the mass movement of support within India and the heroic stand of the Bombay working people constituted the signal of the new era opening in India and one of the great landmarks of Indian history. In those February days the friends and foes of the Indian popular advance stood revealed."

শ্রীবলাইচন্দ্র দত্তের এই স্মৃতিকথা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের স্মৃতিকথা (এ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ অনুরূপ একটি নাতিদীর্ঘ স্মৃতিকথা মুদ্রিত হয়েছে—সম্পাদক)

এবং তৎকালীন সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ থেকে নৌ-বিদ্রোহের উপরে একটি পরিপূর্ণ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারে।

শ্রীবলাইচন্দ্র দত্ত 'তলোয়ার' জাহাজের পনেরো শত তরুণ নৌ-জোয়ান রেটিংদের বিদ্রোহে যোগদানের কাহিনী লিখেছেন। রুশদেশের বিপ্লবের গৌরব-ময় ইতিহাসে 'পোটেমকিন' যুদ্ধজাহাজের ধূমায়িত বিক্ষোভ স্বাস্থ্যকর ও পর্যাপ্ত খাদ্যের দাবিকে উপলক্ষ করে ফেটে পড়েছিল। 'তলোয়ার'-এও ঠিক একই আপাত কারণ লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৬-এর ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁরা বিদ্রোহে সামিল হন। ক্যাপ্টেন দত্ত ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তিনি এই বিক্ষুব্ধ তরুণের আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সূত্রটি ধরিয়ে দেন। ফলে শ্রীদত্ত বন্দী হন। বন্দী বলাই দত্তকে বিদ্রোহী রেটিংরা মুক্ত করে আনেন। সেইসঙ্গে বিদ্রোহীদের দাবিগুলিতে গুণগত রূপান্তর আসে। ইংরেজের প্রতি ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' সেদিন বিদ্রোহীদের প্রচারের অন্যতম বাহন হয়ে ওঠে।

আরব সাগর জুড়ে ভারতের তটভূমিতে যেখানেই ভারতের নৌ-জোয়ান ছিলেন, সেখানেই বেজে উঠল বিদ্রোহের দামামা। করাচি বন্দরে সশস্ত্র-ভাবে তাঁরা বৃটিশ স্থল ও সাঁজোয়া বাহিনীকে মোকাবেলা করলেন।

বোম্বাই-এর নাগরিক-শ্রমিক-ছাত্র এই বিদ্রোহে সামিল হন। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী শ্রমিকশ্রেণী ও বোম্বাই-এর নাগরিকদের অভূতপূর্ব সমর্থন ও কমরেড দোন্দে-র আত্মদানের কথা গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন। বিদ্রোহীদের তিনি সর্বাত্মক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা রুইকর ও বামপন্থী নেত্রী অরুণা আসফ আলী বিদ্রোহীদের সমর্থন জানান। জাতীয় বুর্জোয়াদের দোদুল্যমানতা ও কংগ্রেস-লীগের ক্ষমতালিপ্সা এবং সাম্রাজ্যবাদের ভেদপন্থার চক্রান্তে নৌ-বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। কংগ্রেস-লীগ দেশের সমস্ত জনগণকে বিদ্রোহে ডাক না দিয়ে সরদার প্যাটেলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিদ্রোহীদের বললেন দাঙ্গাবাজ, মাথাগরম, হঠকারী ইত্যাদি। নৌ-বিদ্রোহীদের ধর্মঘট কমিটি তার শেষ প্রস্তাবে ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় জানালেন: "আমাদের জাতির জীবনে আমাদের এই ধর্মঘট এক ঐতিহাসিক ঘটনা। একটি মহৎ আদর্শের জন্য সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের রক্তধারায় রাজপথ রঞ্জিত হলো। আমরা যারা সৈনিক—তারা একথা কখনো ভুলব না, ভুলতে

পারি না। আমরা জানি আমাদের পরবর্তী কালের ভ্রাতা-ভগ্নীরাও এ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে হৃদয়ে গেঁথে রাখবেন। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক। জয় হিন্দ।"

ভারতে আবার যখন স্বাধীনতাঘাতী শক্তিগুলির অশুভ প্রভাববৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও এদেশে তাদের সঙ্গী-সাবুদ একচেটিয়া মূলধনপতিরা সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ফসল স্বাধীনতাকে চূর্ণ করতে উদ্যত—তখন ছেচল্লিশের বীর সৈনিকদের বারবার স্মরণ করি। "বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে" মানুষের সেই দিনগুলিকে স্মরণ করে মনে জোর পাই। সংগ্রামে অকুতোভয় হয়ে উঠি।

বলাইবাবুর বইখানির সময়োপযোগী প্রকাশকে তাই আমরা ধন্যবাদ জানাই।

শান্তিময় রায়

মধ্যরাত্রে ছুঁতে যাবার সাতমাইল। অমিতাভ দাশগুপ্ত। বীক্ষণ। ছ টাকা।
বিকল্প অরণি। অসীম সেন। নবপত্র প্রকাশন। দু টাকা।

দীর্ঘদিন, প্রায় এক যুগ ধরে, অমিতাভ দাশগুপ্ত কবিতা লিখছেন। আনন্দের বিষয়, সময়ের স্বাভাবিক অবদানের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার তিনি করতে পেরেছেন। অর্থাৎ, বক্তব্যে ছুঁতে পেরেছেন মননের স্থিতধী পরিণতি, প্রকরণে দেখিয়েছেন স্পষ্টরেখ অগ্রগতি। বস্তুত 'মধ্যরাত্র'…তে একটিও ছন্দছুট আলগা লাইন খুঁজে পাওয়া নিতান্তই ছিদ্রান্বেষীর কাজ। এর সমর্থনে উল্লেখ করতে পারি 'ফৈয়াজ খাঁর স্মৃতিতে'। (এখানে বেশ কিছু সাঙ্গীতিক পরিভাষা এবং উর্দু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার অজ্ঞতা সলজ্জে স্বীকার করি। তা সত্ত্বেও এর জমাট বাঁধুনি ও আবহ-সৃষ্টির সার্থকতার জন্যে কবিতাটি ভালো লেগেছে) আর—কবিতার অন্যতম শর্ত যদি হয় মর্মগ্রাহিতা, তবে চমৎকার উতরেছে 'ভাঙাবুকের তিরিশ গ্রীষ্ম', 'শীতলপাটি ছোঁয়া হলনা', 'এরকম হাওয়ায় হাওয়ায়'। ভাবতে ভালো লাগছে শ্রীদাশগুপ্ত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাতেও এগিয়ে এসেছেন। 'মৃত শিশুদের জন্য টফি'র রক্তগরম যৌবনের চীৎকৃত স্মার্টনেস থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন 'মধ্যরাত্র'র গম্ভীর অথচ অনায়াস সহমর্মিতার অমোঘ কবিত্বে।

একথা লিখতে গিয়ে কিন্তু তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'অরুণা…রুণা'র কথা ভুলে যাইনি। ভুলে যাইনি যে, এই ধরনের লেখা আজকাল বেশ চালু হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রায়ই মনে হয়েছে—দীর্ঘ কবিতা যেন পংক্তিবিন্যাসের ম্যারাথন দৌড়। ছন্দের তালফেরতায় শব্দ আর চিত্রব্যবহারের কসরতে জমজমাট তিলকে তাল গড়ার বাহাদুরি। কবিতাটি প্রায়ই—বিশেষত যেখানে মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের লঘু চালে বাঁধা—বেশ শ্রুতিরোচক, আবৃত্তিযোগ্যও বটে। কিন্তু সামগ্রিক অভিঘাত বলতে কিছুই পেলাম না, দুঃখটা এখানেই।

অথচ "শীতল সাপের মতো আমার রুগ্ন দুহাত ছড়িয়ে দিলাম / নয়ন তুলে দেখাল কে, এখানেইতো নিখিল বিশ্ব, / লহনা নয় খুল্লনা নয়, হৃদয়ে কাকে ধরেছিলাম / কোন পিপাসায় কেঁদে বেড়ায় ভাঙাবুকের তিরিশ গ্রীষ্ম?" অনেক ঘনিষ্ঠ আমার কাছে। অনেক জোরাল মনে হয়েছে 'রূপা সুধাংশুর খেলা নভে', কিম্বা 'শেষ ঘোড়া' অথবা নাম কবিতাটি। মাঝে মধ্যে "করুণ শিল্পের মতো কৃশ হাতে কতকাল ছুঁইনি তোমাকে" জাতীয় হঠকারী খামখেয়ালী বেসুরো লাইন তাঁর হাত ফসকে বেরিয়ে এসেছে, যা বর্তমান আলোচকের আদৌ ভালোলাগার কথা নয়। কিন্তু এই ত্রুটি ভুলে যেতে এমনকি ক্ষমা করে নিতে বিলম্ব হয় না—যখন দেখি, আলোচ্য বইখানির অধিকাংশ কবিতাই আন্তরিকতার স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল তৈরি করে সহজেই পাঠকসমাজকে অধিকার করে নিতে পেরেছে। শ্রীদাশগুপ্ত কখনো কখনো খুব স্মার্ট চোখা চোখা লাইন লিখে শহুরেপনা দেখালেও, আসলে তিনি ভীষণ নরম কাতর প্রেমার্ত কবি। সুতরাং "দুঃখ আমার জানলে তোমার বুক ফেটে যেত, সাততলা বাড়ি হুমড়ে পড়ত মাথার ওপর / টাটকা আপেল রয়ে যেও তুমি পরখের ছলে / হাত থেকে হাতে মলিন, নষ্ট হোক্ না"—এই হচ্ছে ওঁর কবিতার আসল চেহারা।

সবশেষে একটি কুণ্ঠিত নিবেদন আছে। "ভালোবাসার পিঁপড়ে হয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে গেল / সমস্ত রাত সপ্তদশী খুন করেছি সমস্ত রাত." অথবা, "কথা বলতে ভালো লাগে না, ভালো লাগেনা বোবা থাকতে / ভালো লাগেনা সারা সন্ধে মদের পাত্রে মুখ রাখতে," অথবা "ডেঁয়ো পিঁপড়ের সারি বসে গেছে তোমার শরীরে"—ধরনের লাইন শ্রীদাশগুপ্ত না লিখলেই পারতেন। এগুলিতে কি স্পষ্টতই তাঁর সমসাময়িক কোনো কোনো

কবির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না? অথচ কবিতার মধ্যে প্রাতিস্বিকতা, ইনডিভিজুয়ালিটি যাকে বলে, তার ছাপ তো তিনি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রাখতে পেরেছেন। এই কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কম কথা নয়।

অসীম সোম-এর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় কিছুদিন হলো তাঁর 'বিকল্প অরণি'র মধ্যস্থতায় স্থাপিত হয়েছে। বইটির প্রচ্ছদপটই শুধু সুন্দর নয় (এঁকেছেন সমীর সরকার), অন্তর্ভুক্ত অনেক কবিতাও আত্মীয়তা অর্জনে সক্ষম। সমসাময়িক পৃথিবী—ছোট করে বলতে গেলে এই কলকাতা, যেখানে "নিহত প্রেমের শব" কবির চোখে ভাসমান "গোলদীঘি-লালদীঘি জলে"—শ্রীযুক্ত সোমের কবিতার প্রেরণা। শহর কলকাতা তাঁকে কখনো ক্লেদাক্ত, নৈরাশ্যপীড়িত, বিষণ্ণ করেছে; আবার কখনো সঙ্গত কারণেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যাশাব্যঞ্জক লাইন লিখিয়ে নিতে পেরেছে ('অন্ধকারে রেখো হাত'): "···দেখ কোন মহত্তর ছবি নিরবধি কালের দর্পণে / শোনা যাবে / সমুদ্রের স্বর, ভোর হবে ভিন্ন সুরে অনন্ত দাক্ষিণ্য তার—/ প্রাণের নির্মাল্য নিয়ে সে ছড়াবে জীবনযৌতুক।"

অবশ্য, এর মানে এই নয় যে কবি তাঁর সমকালীন পরিপার্শ্বের বশংবদ ক্রীতদাস: বলতে চেয়েছি এর প্রতিক্রিয়ার কথা, অন্তর্জগতে এর ছায়াভাসের অবশ্যম্ভাবিতার কথা। আসলে লিখিয়ে নেওয়া এবং লিখতে চাওয়া—দুটো ব্যাপারইতো পারস্পরিক সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্য। প্রায় সব কবিতাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা, 'রাজনীতি' জাতীয় দু-একটি লেখা স্বরবৃত্তের হাল্কা চালে। কিছু কিছু জায়গায় শব্দব্যবহারে শ্রীযুক্ত সোম একটু সাবধান হতে পারতেন মনে হয়। যেমন: নাম কবিতার এক জায়গায় রয়েছে "বেদনা-লেগুন", শুনতে ভালো লাগছে? বা, "দর্পণে বিশীর্ণ মুখ", "শূন্যমুখে অমেয় এষণা," "স্নেহের জারকে ভেজা"—ইত্যাদি লেখার সময় তিনি যদি দুবার ভাবতেন, ক্ষতি হতো কি তাতে? ছন্দের ক্ষেত্রেও "জ্যাযুক্ত ব্যাধির পারে এই হৃদয়ে শ্মশান-শান্তি" গোছের পংক্তি তিনি নিশ্চয়ই মেরামত করতে পারতেন। কয়েকটি ত্রুটি এইজন্যেই কবির গোচরে আনতে চেয়েছি, কেবলমাত্র একটি ভরসাতেই যে, ভালো মর্মগ্রাহী কবিতারচনার ক্ষমতা তাঁর আছে; 'বিকল্প অরণি' বইখানি এই প্রতিশ্রুতিরই দলিল।

শিবশম্ভু পাল

চিত্রপ্রদর্শনী

আজকাল চিত্রপ্রদর্শনীতে যেতে আদৌ ইচ্ছে করেনা। শিল্পিরা দুটি বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন : এক, 'কম্যুনিকেটিভ ইমপ্যাক্ট' ; দুই 'মোটিফ'। অনেকের ক্ষেত্রেই শিল্পসাধনা বর্তমানে ইডিওসিনক্রেসির চয়ন। বৃষ্টিতে বা ঝড়ে-দুর্যোগে নেহাতই আটকে না পড়লে দর্শকেরা সাধারণত আর্ট গ্যালারিতে যান না। যাঁরা যান, তাঁরা আমারই মতো সহিষ্ণু এবং নগণ্য শিল্পরসিক। এই দুটি শিল্প-শর্তকে ভুলে যাওয়া যে কত বড় বিভ্রান্তি, তা কণামাত্র অনুধাবন করলে এঁরা উপকৃত হতেন। পক্ষান্তরে, তার উল্টোটাই ঘটছে। ফলত, বহু ক্ষতিকারক উপসর্গও দেখা দিচ্ছে। যেমন, পূর্ব পরিকল্পিত বিষয় বা রীতি অনুসরণ না করা (যার অর্থ শিল্পচিন্তা নামক অভিধার বিসর্জন দেওয়া), নেহাতই 'অ্যাকসিডেন্ট'-এ বিশ্বাস করা, শস্তা স্টান্টের মাধ্যমে নাম করার অপপ্রচেষ্টা প্রভৃতি। একজন বিদেশী বন্ধু আমার সঙ্গে এক প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেই ফেললেন : "ওয়েস্টেজ অফ পিগমেনটস"।

সত্যিকথা বলতে কি, এই সমস্ত চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যাপারে নির্দয় হবার সময় এসেছে। প্রদর্শনীর বেলায় নির্বাচনের প্রশ্ন আসে। নেহাত যেগুলো সমালোচনা না করলে নয়, সেগুলি সম্পর্কেই লেখা উচিত।

গত মাসে একটিও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী দেখিনি। দুটি প্রদর্শনীর কথা লেখা যায়। এই দুটি হলো : কুণাল কর-এর একক চিত্রপ্রদর্শনী ও 'ট্রানজিশন সেভেন' যৌথ প্রদর্শনী।

কুণাল কর কিছুকাল ধরে জলরঙ-এর কাজ করছেন। অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে তিনি দর্শকমনে ইতিপূর্বেই ছাপ রাখতে পেরেছেন। এঁর বৈশিষ্ট্য, গতানুগতিক 'ওয়াশ টেকনিক' বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ না করা। এঁর 'কালার কনসেপ্ট' মানানুগ। প্রধানত বড়ো আকারের ছবি আঁকেন। এবারের প্রদর্শনীতে ১৬টি ছবি ছিল। 'কম্পোজিশন'গুলির মধ্যে ৬নং ছবি ইমপ্রেশনিজম-ধর্মী, ৭নং ছবি (নাগরিক জীবনের উপমান, যদিও পপ আর্ট প্রভাবিত) ও ৯নং ছবি 'সিটিসেন্স', পেন ইঙ্ক-এর সূক্ষ্মকাজ সম্পন্ন।

আকৃষ্ট করে। 'বেসাল ড্রয়িং'-এর দিকে তাঁর নজর দেওয়া উচিত। এদিকে শিল্পীর দুর্বলতা দেখা যায়।

'ট্রানজিশুন সেভেন' সাতজন তরুণ শিল্পীর যৌথ প্রদর্শনী। এঁদের বেশির ভাগই শিক্ষান্তে সবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ।

পুস্তিকায় লেখা হয়েছে: "Will each become a great artist and create a new school some day?" দেখার পর এই উক্তিকে চটুল ও নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত বলে মনে হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, এঁদের অনেকেই দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। কিন্তু মৌলিক প্রতিভা এখনই কল্পনার অতীত। গ্রাফিকস বিভাগটি অত্যন্ত উন্নত। 'মিডিয়া' ও 'মেটিরিয়াল'-এর উপর এঁদের এই বয়সেই দক্ষতা এসেছে—সেটি আশার কথা। অখিলেন্দু ভৌমিক-এর মেৎসোটিণ্ট-এচিং 'ফায়ার ওআন', কালিদাস কর্মকার-এর পৌরাণিক মোটিফ-এ ইনট্যাগলিও 'কম্পোজিশুন সেভেন'-এর রৈখিক সৌষম্য ও মনোপ্রিণ্ট 'কম্পোজিশুন সেভেন' এবং রথীন রায়ের টোনাল স্কীম-এ নিপুণ ইনট্যাগলিও 'একসপিরিয়েন্স মিক্স' প্রশংসনীয়। গ্রাফিকস বিভাগের টিম-ওয়ার্কই প্রদর্শনীর মান উন্নত রেখেছে—যদিও এঁদের মধ্যে 'কনটেমপোর‍্যারি গ্রুপ-এর অনেকের প্রভাব দেখা যায়। তেল রঙের বিভাগটি গতানুগতিক এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তার মধ্যে টিনা মেহতার 'ফার্স্ট কিস' (ফোভিস্ট প্রভাবযুক্ত), বগলাচরণ দেওঘড়িয়ার 'ডিফায়েণ্টস' (মিশ্র আঙ্গিক, মোটিভ: ধ্বংসাবশেষ), অখিলেন্দু ভৌমিক-এর 'হাঙ্গার' ও কালিদাস কর্মকার-এর 'কম্পোজিশুন টু' (পল ক্লি প্রভাবিত) উল্লেখ্য। সবশেষে একটি কথা। এঁরা আগামী দিনের তরুণ শিল্পী, এঁদের কাছে আমাদের অনেক আশা। এঁরাও যদি গতানুগতির স্রোতে গা ভাসান—শিল্পরসিকরা তাহলে কার কাছে যাবেন? এই কথা ভেবে দেখলে এঁরা নিজেদের প্রতিও সুবিচার করবেন।

চারুনেত্র

'শৌভনিক' কর্তৃক 'আন্তিগোন'

'বহুরূপী'র 'রাজা অয়দিপাউস' এবং 'শৌভনিক'-এর 'আন্তিগোন' ছাড়া যতদূর জানা আছে ইদানিংকালে বাঙলা নাটকের জগতে আর কেউই বোধহয় গ্রীক নাটকের অভিনয় করেন নি। দুটি নাটকই সফোক্লেস রচিত। কোনোরকম তুলনামূলক বিচারে না গিয়েও একথা বলা যায় যে এ ধরনের ধ্রুপদী নাটক প্রযোজনা করার জন্য যে পরিমাণ নিষ্ঠা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়, 'শৌভনিক' গোষ্ঠী দুর্ভাগ্যবশত এখনও তা আয়ত্ত করতে পারেন নি।

'কোরাস' গ্রীক ট্র্যাজেডির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ, বিদ্বজ্জনেরা মনে করেন 'কোরাস' থেকেই গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎপত্তি। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এ-নাটক থেকে কোরাস বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তার বদলে আমদানি করা হয়েছে জনৈক সূত্রধারকে—যিনি সম্পূর্ণ আধুনিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে কাহিনী পরম্পরা বিবৃত করেন এবং মাঝে মাঝে ছদ্ম ব্রেশ্‌টীয় কায়দায় দর্শকদের বিয়োগান্তক নাটক সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন। এতেই, সার্বিক ভাবে তো দূরের কথা, একক ভাবেও কোনো দৃশ্যে ধ্রুপদী মেজাজ গড়ে ওঠে না; ক্বচিৎ কখনো যদিবা সে সম্ভাবনা দেখা দেয়, সূত্রধার মহাশয় তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে সে সম্ভাবনাকেও হত্যা করেন। আসলে গোটা নাটকের প্রয়োগ-পরিকল্পনায় ধ্রুপদী মেজাজ ও পরিবেশের এত অভাব যে মাঝে মাঝে ভাবতে কষ্ট হয় একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মঞ্চরূপ দেখছি; অথচ মঞ্চপরিকল্পনা ও আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে বাহুল্যবর্জিত হয়েও বেশ একটা পরিবেশ রচনা করা হয়েছে, যা এই নাটকের মেজাজের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। সঙ্গীতও মোটামুটি সুপরিকল্পিত—তবে কেন জানিনা সেটা একবার দক্ষিণ এবং একবার বামদিক থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। সঙ্গীতের এই দোদুল্যমানতা শ্রবণের পক্ষে মোটেই সুখপ্রদ নয়।

এই ধরনের একটি দুর্বল প্রযোজনার মধ্যেও যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো আন্তিগোন-এর ভূমিকায় শ্রীমতী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়। প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও তাঁর অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং তা ধ্রুপদী মেজাজের আভাস আনে। আর ভালো অভিনয় করেছেন প্রথম প্রহরীর ভূমিকায় শ্রীনিমু

ভৌমিক, যদিও কারাগারের দৃশ্যে তাঁর ভাঁড়ামো অবাঞ্ছিত। ক্রেমন ও হেমন উভয়ের অভিনয়ই প্রভূত উন্নতির অপেক্ষা রাখে। চরিত্র পরিকল্পনার ত্রুটি কিনা জানিনা, হেমন-এর অভিনয়ে রাজপুত্রসুলভ ব্যক্তিত্বের একান্ত অভাব। অন্যান্য স্ত্রী ভূমিকাভিনেত্রীদের প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।

আর একটি কথা। 'শৌভনিক'-এর স্মারকপুস্তিকায় দেখলাম নাটকের কৃতিত্ব বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা সাধারণের কাছে একটু পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত, কারণ শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কৃতিত্ব তো কেবলমাত্র বাঙলা রূপান্তরের—রচনার নয়।

স্বর্ণেন্দু রায়চে

দুটি নতুন নাটক: 'সমাধান' ও 'সামান্য অসামান্য'

[ব্রেশ্‌ট-এর 'সমাধান' ও গকির 'ইনসিগনিফিক্যাণ্ট' গল্প অবলম্বনে 'সামান্য অসামন্য']

'ঋত্বিক' গোষ্ঠী ইতিপূর্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটক দুটি পরিবেশন করেছেন। সম্প্রতি এঁরা নাটক দুটি 'মুক্তাঙ্গন'-এ মঞ্চস্থ করলেন।

প্রথম নাটকটি অনূদিত। অতএব মূল সংলাপের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু পটভূমিকা হিসেবে কুওমিনটাং চীনের বদলে ভিয়েতনামকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য এতে নাটকের কোনও ক্ষতি তো হয়ইনি বরং দর্শকের কাছে প্রযোজনার গুণে তা আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ব্রেশ্‌ট-এর এ-নাটকটি পুরোপুরি রাজনৈতিক। অতিবিপ্লবী হঠকারিতার উৎস ও পরিণাম-বিষয়ে একটি সমীক্ষা বলা যেতে পারে। না, কোনও তত্ত্বকথা আউড়ে যায় না নাটকের চরিত্রগুলো—যা আমরা হালে কিছু 'বৈপ্লবিক' নাটকে লক্ষ্য করছি। সমস্যাটি ব্রেশ্‌ট দেখেছেন একজন মার্কসবাদী কর্মীর চোখ দিয়ে এবং আমাদের দেখিয়েছেন ঠিক সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই। মূলত অনুভূতিকে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ঊর্ধ্বে স্থাপনই অতিবিপ্লবী ঝোঁকের উৎস। প্রাণপ্রাচুর্যের অভাব নেই সেখানে। আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, সর্বহারার সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য—এসব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মার্কসবাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টি কখনও খাটো হয়ে যেতে চায় তারুণ্যের

সংবেদনশীলতার কাছে, বিশেষত সঙ্কটের পূর্ব মুহূর্তে। তখনই উদ্ভব হয় অতিবিপ্লবী হঠকারিতার—যা শ্রেণীসম্পর্কের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও মূলত সংগ্রামী চেতনার প্রচার ও বিপ্লবের প্রস্তুতির আয়োজন বিঘ্নিত করে। ব্রেশ্‌ট-এর নাটকে অতিস্বল্প পরিসরে এ বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়েছে, দেখানো হয়েছে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যে মার্কসবাদীর কলাকৌশল। 'ঋত্বিক' গোষ্ঠী অনাড়ম্বর পরিবেশনায় নাটকটি মনোজ্ঞ করে তুলেছেন।

অভিনয়ের দিক থেকে প্রথমেই পরিচালক পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করতে হয়। সারা নাটকে প্রধান অংশ জুড়ে তাঁর অভিনয়। নিখুঁত স্বরক্ষেপণ, যথাযথ ভঙ্গি ও সংলাপের নিপুণ ব্যবহারে নাটকটি চিত্তাকর্ষক করে তোলার কৃতিত্ব মূলত তাঁরই প্রাপ্য। দুঃখের বিষয় সবকটি অভিনেতা সম্পর্কে এ উক্তি করা যাচ্ছে না।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এর সঙ্গীতাংশ। অংশ বিশেষের নির্বাচন সুচিন্তিত, কিন্তু প্রয়োগ যথাযথ হয়নি।

পরিচালনায় ছোটখাট ত্রুটি চোখে পড়ে। বিশেষত কোমরে গোঁজা টিনের পিস্তল বিসদৃশ।

দ্বিতীয় নাটকটির রচনাকৌশল নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। তিন রাজমিস্তিরি ও একটি পতিতাকে নিয়ে শ্রেণীবৈষম্যের শিকার নিচুতলার মানুষের দুঃসহ যন্ত্রণা ও বিক্ষোভ এ-নাটকে বলিষ্ঠভাবেই উপস্থিত হয়েছে। নাট্যকার এদের হাতে হঠাৎ বন্দুক ধরিয়ে দিয়ে বিপ্লবের নিশান ওড়াননি, বরং কি করে মানুষগুলো বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শ্রেণীশত্রুর স্বরূপ উপলব্ধি করল—তা-ই ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদেশী গল্প বা নাটকের ভাব অবলম্বনে রচিত এ-ধরনের নাটক সার্থক এই জন্যে যে—পরিপ্রেক্ষিতের বাধা দর্শককে পীড়িত করে না। পরিচিত পরিমণ্ডলে অপরিবর্তিত মূল ভাবটির বস্তুনিষ্ঠ ও শিল্পসম্মত উপস্থাপনা দর্শকের রসগ্রহণে কোনও বাধা সৃষ্টি করে না।

কান্তর ভূমিকায় অসীম রায় সুন্দর অভিনয় করেছেন এবং সারা নাটকটির গতিময়তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। গোবিন্দর ভূমিকাটিও সুঅভিনীত। বাকি কজনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সংলাপ ওলট পালট হতে দেখা গেছে। সম্ভবত প্রয়োজনীয় মহড়ার সুযোগ এঁরা পান নি।

কান্তি সেন

রুনকির সুবচনী

রুনকি ছোট্ট মেয়ে। শহরের বাঁধাগণ্ডী তার কাছে অসহ্য। সে চায় বাঁধনহীন ঘুরে বেড়াতে। চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এসে রুনকি যখন দেখেছে জীবজন্তু সব খাঁচায় পোরা; হাতির পায়ে বেড়ি; তখন তার মন চলে গেছে বনে জঙ্গলে। তাই শহরের রুনকির ভাবনার জগতে আছে এক গ্রামের রুনকি। তাই সে নানাভাবে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছে। ভাবনায়, ভাবনায়। অবশেষে পাখি হয়ে আকাশে উড়েছে, আর শুধু এই মুক্তিতেই সে পেয়েছে সব থেকে আনন্দ। বাস্তব থেকে কল্পনা, সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে বাস্তবে। এবার রুনকির বাড়ি ফেরার পালা।

মোটামুটি এই হলো 'শৌভিক' পরিচালিত 'রুনকির সুবচনী'র সারাংশ। ছবিটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের এবং এটি প্রযোজনা করেছেন 'এডুকেশনাল ফিল্ম ক্লাব।' ছবিটি যদিও মূলত শিশু মনস্তত্ত্বের ওপরই তোলা, তবুও এক্ষেত্রে শিশুটিকে অন্য শিশুদের থেকে কিছুটা আলাদা বলে ধরে নিতে হবে। একটি 'লিটিল' শট দিয়ে প্রথম দৃশ্য শুরু। বলা যেতে পারে রুনকির স্বাধীনতা যে সীমিত, সেটাই পরিচালক দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দেখতে পাই চিড়িয়াখানা যাওয়ার জন্য রুনকি একা একা একটি বাইনোকুলার ঝুলিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। ভাষ্যকার জানালেন "এটা তার বহুদিনের ইচ্ছে।" রুনকি একটু ভাবলেশহীন মুখে চিড়িয়াখানায় ঢুকল। এক্ষেত্রে মনে হয় রুনকির, এমনকি যে কোনো সাত-আট বছরের ছেলে-মেয়ের পক্ষেই কিছুটা খুশি মনে কি দেখব কি দেখব ভাব নিয়ে চিড়িয়াখানায় আসাটা অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক ছিল।

রুনকি চায় মুক্তি, চায় বাঁধনহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে। তাই সে আকাশে গ্যাস-বেলুন উড়ে যাচ্ছে দেখে অবাক চোখে বাইনোকুলারের মধ্যে দিয়ে দেখতে থাকে একটা ছোট মেয়ের হাত ছাড়িয়ে কতদূরে চলে যাচ্ছে সেটা। দৃশ্যটি চমৎকার। শহুরে রুনকির মন গ্রামের রুনকির মতো মাঠ থেকে মাঠে ছুটে বেড়াতে চায়। খাঁচার বাঘ দেখতে দেখতে শহরের রুনকি গ্রামের রুনকির কাছে চলে গেছে। গ্রামের রুনকি গ্রামীণ সরলতা আর কৌতূহল

নিয়ে জমিদার বাড়ির ভেতর ঢুকেছে; সেখানে দেয়ালে টাঙানো বাঘের মূর্তি তাকে ভয় দেখিয়েছে। তার মনে হয়েছে বনের মুক্ত বাঘের কথা। বনের দৃশ্যটি গ্রহণের কাজে ফোটোগ্রাফার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ দৃশ্যটি দেখতে দেখতে বিদেশী জীবজন্তুর ছবির কথা বিশেষভাবে মনে হয়। এই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটির সবচেয়ে মনে রাখার মতো দৃশ্য হাতিকে রুনকির ছোলা খাওয়ানো এবং তার পায়ের দিকে তাকিয়ে শিকল দেখে বনের হাতির কথা মনে পড়া। এ দৃশ্যটি সত্যিই মনে দাগ কাটে। যে কোনো শিশুর পক্ষেই—"ওর পা বাঁধা কেন?"—এ ধরনের চিন্তা স্বাভাবিক। এর পরের দৃশ্যে রুনকির ঘোড়ায় চড়া এবং কল্পনার ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধের যোগাযোগ স্থাপন তার বয়সের অনুপযোগী বলে মনে হয়েছে। এক্ষেত্রে রূপকথার গল্প মনে হলে অনেক স্বাভাবিক হতো। আর পরিচালক যদি আজকালকার ছেলেমেয়ের কথা ভেবে দৃশ্যপরিকল্পনা করে থাকেন, তবে তিনি আধুনিক যুদ্ধে ঘোড়ায় চড়া এবং আকাশ থেকে বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণ—এই দুইয়ের যোগাযোগ দেখিয়ে ভুল করেছেন। রুনকির সমস্ত ভাবনার কেন্দ্রে রয়েছে মুক্তির কল্পনা। আধুনিক যুদ্ধের মধ্যে একটি শিশু কোন মুক্তিকে দেখবে? পরিচালক এক্ষেত্রে শিশু নয়, প্রাপ্তবয়স্কের মনস্তত্ত্বকেই রূপায়িত করেছেন।

সর্বশেষ দৃশ্যে শহুরে রুনকির সঙ্গে তারই ভাবনার জগতে গ্রামের রুনকির দেখা। গ্রামের রুনকির শত আমন্ত্রণ সত্ত্বেও শহুরে রুনকির তার কাছে যেতে না পারার দৃশ্যটি সুন্দর।

পরিচালক দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছেন। ছবিটি যখন মূলত শিশুদের জন্যই তোলা, তখন কিছুটা জটিলতা-মুক্ত করলে ভালো হতো। ছবিটি দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে রুনকি চিড়িয়াখানায় একা না এসে কোনো অভিভাবক স্থানীয় লোকের সঙ্গে এলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হতো। সঙ্গীত ও সম্পাদনার কাজ নিঃসন্দেহে ভালো। ছবিটির একমাত্র শিল্পী শিশু মণিকার অভিনয় এককথায় চমৎকার।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য মহৎ। ভবিষ্যতে এঁদের কাছ থেকে আমরা আরও ভালো ছবি আশা করতে পারি।

পুনপুন মুখোপাধ্যায়

রুদ্র বসন্তের আরেক বাঙলা

রক্তের ভিতরে নদী। সে ফুঁসছে, দাপাচ্ছে। চূড়ায় চূড়ায় তার রৌদ্র-ঝুঁটি। স্বপ্ন। পারুল বোনের ডাকে সাত ভাই চম্পার চোখে তাই ঘুম নেই। চোয়ালগুলোয় রুক্ষ মাটির মেজাজ। হাতের মুঠোয় তাঁদের মুক্তির আকাশ। রৌদ্রপায়রার লুটোপুটি। তাঁরাই লড়ছেন। সংগ্রাম করছেন স্বেচ্ছাচারের যত ফণা গুটিয়ে ফেলতে, আর সাম্রাজ্যবাদের বিষদাঁতটাকে গুঁড়িয়ে দিতে। ইতিহাস মোড় নিচ্ছে। খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামে সামিল হলেন কবিরা। কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে রক্তের রাখী বেঁধে আয়ুবশাহীর দণ্ডনীতিকে কবর দিতে নেমে এলেন পথে। এই হলো পদ্মার ওপার।

এপারে আমরাও লড়ছি। রক্তের ওপর দিয়ে সামন্তবাদের আঁধির ঘোর কাটিয়ে ফেলতে, শোষণের সাঁড়াশি থেকে মুক্ত হতে। ওপারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি, এপারে হলো তাকে সুরক্ষিত করার সংগ্রাম। যেন একই লড়াইয়ের দুই চেহারা।

তবু কোথায় যেন বিরাট ফারাক।

এপারের বেশির ভাগ কবিই অন্ধকারে নিরুদ্দেশ। বৃহৎ এস্টাব্লিশমেণ্টের প্রসাদ কুড়িয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছেন বিন্দু বিন্দু করে। সূর্যমুখীর পাপড়ির মতো ঝরে যান জীবনের আলোর আড়ালে। শস্তা জনপ্রিয়তার মোহে লক্ষ্মীমন্ত হবার সাধনায়, নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়াতেও দ্বিধা। এক ধরনের নিরুপায় ক্লীবতা হয়তো কখনো কখনো চাবুক মারে। ব্যস, এই পর্যন্ত। এপারের অজস্র কবিতা তাই হয়ে উঠেছে জীবনজিজ্ঞাসাশূন্য এক ধরনের আঙ্গিকচর্চা। অসংখ্য পানসে কবিতায় ঢাউস কাগজগুলো অলঙ্কৃত।

শিল্পকে জনগণের কাছাকাছি আসতে হবে—লেনিনের এই নির্দেশ এপারের বেশির ভাগ কবির কাছেই যেন বিষবৎ পরিত্যাজ্য। কিছুতেই কমিটেড হতে চাইছেন না, আখের নষ্ট হবার অমূলক আশঙ্কায়। জনতার সংগ্রামের প্রতি, "ওরা লড়ছে লড়ুক, কবিরা কেন থাকবে তাতে"—গোছের মনোভাব নিয়ে এপারের অধিকাংশ কবিই জনজীবনের অন্তঃসারের দিকে যাত্রা করতে আঁতকে ওঠেন। এঁরা ভুলে যান কবিতা হচ্ছে বিশ্বজনীন

পার্টিজানশিল্পেরই নান্দনিক ফসল। মূল সৈন্যবাহিনী যেন রাজনৈতিক ফ্রণ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী জনগণ। কবি সেই লড়াই-এর কেবল মূল নীতিটি জানেন। রণকৌশল তাঁর নিজের। কবিও গেরিলা যোদ্ধা।

অথচ এটাই চেহারা নিয়েছে পদ্মার ওপারে। ফলে দেখা যাচ্ছে, কবিতার আত্মসচেতনতা, তার ভূমিকা, জনজীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কোন জাতের হওয়া দরকার—এ বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কবিরা অনেক বেশি দায়িত্ববান। বিবেকবান তো বটেই। পার্টিজান কবিদের মতো কত সহজেই তাই বলেন

আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম
সংগ্রাম চলবেই অবিরাম।
সংগ্রাম ছাড়া কিছু বুঝি না
সংগ্রাম ছাড়া কিছু খুঁজি না
এতে আজ নেই কোন ডান-বাম।
(সংগ্রাম : আখতার হুসেন)

বুকের মধ্যে সিংহের শিশু নিয়ে বসে আছেন বলেই, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব নেই—এই অনৈতিহাসিক ধারণাটি সেখানের কবিরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কত সহজেই। অবশ্য বলা দরকার, পূর্ব বাঙলার কবি-সহযোদ্ধারা সে জন্যে নিছক কর্তব্য-অকর্তব্যের কল্‌মা পরিয়ে সরাসরি ফতোয়া জারি করে কবিতার আর্টিস্টিক কালচারের ধর্ম থেকেও ভ্রষ্ট নন। যেমন

আমের বোলে ছড়ানো এ ফাল্গুনে
পলাশ ফোটা এ ফাল্গুনে
কোকিল ডাকা এ ফাল্গুনে
একুশের রক্তের ডাক আজ ঘরে ঘরে
(প্রতিদিন প্রতিদিন একুশ একুশ : সলিম)

কিংবা শামসুর রহমান-এর

যে-আলো তোমার চোখে নেচেছিলো
যে-আলো তোমার বুকে বেঁচেছিলো,
আমরা প্রার্থী তারই।

অর্থাৎ আকাঁড়া বাস্তবকে কোনোরকম ছন্দোবদ্ধ ভাবে পরিবেশনের বদলে, বাস্তবের অপ্রত্যক্ষান্বিত সৌন্দর্যময় প্রকাশই ঘট চ্ছেন কবিরা। যেমন

নয় নয় এ জীবন নিশ্চল নিশ্চুপ
কান্না ও পিছুটান মিথ্যে
এ জীবন চায় আজ সংগ্রাম
দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়তে।
(এ দৃশ্য আজকাল : আহমেদ মনসুর)

অথবা, হায়াৎ মামুদের কবিতায়

বাবলার কাঁটাও বেঁধে না,
প্রিয় সখিজনও পলাতক,
বিদেশ বিভুঁয়ে বসে
হৃদয়েই স্বদেশ দেখি :

.বাপের মায়ের দেশ।
তখন সমস্ত অস্তিত্বে যন্ত্রণার ছুট।

ওপারের কবিরা সামনে চলার পথ দেখালেন। জীবনের স্পন্দনে শোনালেন কবিতার ছন্দ। ডাক দিলেন, "তুলি-কলম-কাস্তে-হাতুড়ি এক করো।" কি দুঃসাহসিক আহ্বান, অথচ কত ঐতিহাসিক প্রয়োজন। আসলে, সত্যকে আবিষ্কার করেছেন বলেই, তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস সেখানের কবির রয়েছে। রশীদ সিনহার একটি ছড়া উল্লেখ করছি

উন্নয়নের দশ বছরের
সামলা ঠেলা সামলা
ট্যাক্সো দিতে বিক্রি হলো
ঘটি, বাটি, গামলা।

হোসেন মীর মোশারফ যখন লেখেন

হলো রাজার দেশে
হাসতে লাগে কর
কাশতে লাগে কর
করের ভয়ে কম্প দিয়ে
আসছে গায়ে জ্বর
মরবে তুমি শেষে
হলো রাজার দেশে।

তখন বুকের ভেতর থেকে জমাট-বাঁধা ক্ষোভ ফুঁসতে থাকে। আক্রোশে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে।

হাসতে মানা কাঁদতে মানা
হানার ওপর চলছে হানা
স্বাধীন দেশের আজব রীতি
মুখটা থেকেও রুদ্ধ বাক্ .
চিচিং ফাঁক হে চিচিং ফাঁক।

নিছক প্রতিরোধ, প্রতিবাদের কবিতা লিখেই চলছেন না সেখানের কবিরা। চারদিকের রুক্ষ বাস্তব ও সামাজিক উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মিশ্রণে প্রেমের কবিতাতেও আনলেন নতুন স্বাদ। টাটকা, সতেজ। প্রেমাশ্রিত কবিতার আদলে আর স্বভাবে এলো তাই মূল্যবোধের সঙ্কট। কবিরা ঠুলি পরে নেই। তাঁদের চোখে, ভালোবাসার যে বিশাল আকাশ সেখানে ওঠে ধুলোর ঝড়, চারদিকে কাঁকর আর বালির পাহাড়। গলা চিরে যখন রক্ত ঝরে, শেষ-রাতের শিউলির মতো তখন বলতে শোনা যায়

চলো না হয় তুমিও সেখানে
যেখানে
মৃত্যুভয়ের মৃত্যু ঘটানো
মিছিলের নীল নীল চোখে
ওরা বৃথাই খোঁজে
আপোষের ঘ্রাণ
এবং সাবধান

(তোমাকে : মনোজ বৈদ্য)

কবিতার ভাষা কি নেহাতই পোশাকী হবে, না, আটপৌরে নিতান্ত মুখেরও—এ জিজ্ঞাসারও জবাব দেন পদ্মাপারের কবিরা। যে ভাষার জন্যে তাঁরা পদ্মার বুকে ফোটালেন রক্তপদ্ম, তারই সাদাসিধে আদলটা মেলে ধরলেন নেকেই। ঠুন-ঠুন পেয়ালার মিঠে মিঠে বুলি, কিংবা পলকা হাওয়ার মতো বাস্তবে ভাষার কারিকুরি দিয়ে ওপরচালাকি পূর্ব বাঙলার কবিদের ধাতে সয় না। জীবন যেমন পোড়খাওয়া, কর্কশ, লড়াকু আর ভাঙচুরে ভরা ; তেমনি মাধ্যম হিসেবেও কেউ কেউ নিলেন কল-কারখানা, খেত-

খামারের ভাষা। এ ভাষা আমজনতার অনুভূতি প্রকাশের মিডিয়া বলে সর্বদাই সচল। যেমন

জান দিমু আইজ মান দিমু না এইতো সোজা শেষ কতাডা
হীরার মতন খাডি।
যতই মারো গুল্লী-বেনট আমগো কতা লরবো না আর
জ্যান্ত দিলেও মাডি।
(জান দিমু আইজ, মান দিমু না : রশীদ সিনহা)

ছন্দ এবং চিত্রকল্প নির্মাণেও পূর্ব বাঙলার কবিরা এমন এক নতুন বাস্তবতার দিকে চোখ ফিরিয়েছেন যা অভিনন্দনযোগ্য। পশ্চিম বাঙলার বেশির ভাগ কবির মতো চাপিয়ে দেওয়া জীবনযাত্রার বদলে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পাওয়া গ্রামবাঙলার আসল চেহারা যেমন ধরা পড়ে ওপারের কাব্যে ; তেমনি ধীরে ধীরে যে উপনিবেশ বসছে পদ্মার ওপারে, তৈরি হচ্ছে কল-কারখানা, অর্থাৎ একালের যন্ত্রকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা—কবিরা সেখান থেকেও উপমা চিত্রকল্প প্রয়োগ করে কাব্য-জগতের পরিধিকে বিস্তৃততর করেছেন, করছেন। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে শামসুর রহমান, জিয়া হায়দার, আবুবকর সিদ্দিকি, হাসান হাফিজুর রহমান-এর নাম উল্লেখ করতে হয়।

এপারের বেশিরভাগ কবিই যখন জীবনবিমুখ রূপকর্ম নির্মাণে ব্যস্ত, তখন সংগ্রাম, জীবনের ধর্ম আর তার দ্বন্দ্বগুলি নিরসনের দিকে সতর্ক নজর রেখে ওপারের কবিরা যে-ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন—তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক।

গণেশ বসু

কলকাতায় একটি সাঁওতালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আদিবাসী নরনারীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানবার জন্যে ইদানিং আমাদের মধ্যে কিছু আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবু সেটা এখনো এমন একটা পর্যায়ে পৌছয় নি যাতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ; অন্তত আমার ধারণা তাই।

ইংরেজ আমলে অতি মুষ্টিমেয় জনাকয়েক নৃতত্ত্ববিদ এবং কিছু আদিবাসী-প্রেমিক মানুষ ভারতের এই আদিম জাতিদের মধ্যে পড়ে থেকে তাঁদের জীবনধারাকে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁদের শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা এবং আরো নানা বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা করেছেন। আদিবাসীদের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ এই মানুষগুলি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করে গেছেন। সমাজের খুব কম সংখ্যক লোকই সেদিন এর যথাযথ মূল্য দিয়েছে। আর, ইংরেজ সরকার তো তার শ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ী সব সময় চেয়েছে আদিবাসীরা পাহাড়, জঙ্গল থেকে যেন কোনোদিন সভ্য জগতে না আসে। আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ যেন তাদের গায়ে না লাগে।

দেশ স্বাধীন হবার পর "আদিবাসীদেব জন্যে কিছু একটা করা দরকার" গোছের মনোভাব কেন্দ্র থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত দেখা গেল। যাকে বলে ট্রাইব্যাল প্রব্লেম নিয়ে রীতিমতো একটা মাতামাতি ব্যাপার। দিল্লী কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্য কেন্দ্রে ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি, ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট, ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ট্রাইব্যাল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেণ্ট প্ল্যান ইত্যাদি ব্যাপক আয়োজন গড়ে উঠল। এছাড়া লোকসভা ও বিধানসভায় ট্রাইব্যালদের জন্য সংরক্ষিত আসন, সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ইত্যাদি করা হলো। কেন্দ্রীয় সরকার 'আদিমজাতি সেবক সমাজ' নামে আধা-সরকারী সংগঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আদিবাসীদের সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এইসব কাজের মধ্যে যত বেশি ছিল আবেগ, ভাবপ্রবণতা ও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার বাসনা; সে তুলনায় অনেক কম ছিল আদিবাসীদের প্রকৃত সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা কিংবা আদিবাসীদের সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে সত্যি সত্যি কি বোঝায় সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা। ফলে প্রায় বিগত দুই দশক ধরে ট্রাইব্যাল প্রব্লেম নিয়ে সরকারীস্তরে যা করা হলো, আজকে তার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাবে—যোগের চেয়ে বিয়োগের পরিমাণই বেশি। অথচ এই কাজে সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং এখনো করা হচ্ছে। হাজার কয়েক সরকারী কর্মচারী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু আদিবাসীদের জমি, কাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এক কথায় মানুষের মতো বেঁচে থাকবার উপায়গুলির সমস্ত পথ—আজ এত দিন পরেও উন্মুক্ত হলো না। অথবা বলা যেতে পারে

সরকার যেভাবে পথ উন্মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, আদিবাসীরা সেটা গ্রহণ করলেন না। আদিবাসীদের সম্পর্কে সরকারের নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যপদ্ধতি—এর কোনোটাই যে সঠিক নয়, সে কথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, কিছু একাডেমিক রিসার্চ ওয়ার্ক এবং কয়েকটি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ছাড়া (অবশ্য এর মূল্য অনস্বীকার্য) সরকারের উল্লেখযোগ্য অন্য কোনো কাজ আমাদের নজরে পড়ে না।

কথাগুলো উল্লেখ করতে হলো এই কারণে যে, যে-পদ্ধতিতে দেশজুড়ে আদিবাসী উন্নয়নের কাজ চলছে—সেভাবে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। অতএব এখন কিছুটা থেমে বিগত কাজের সঠিক পর্যালোচনা করে নতুন পথে যাত্রা শুরু করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে দেশের বামপন্থী দলগুলির কথাও বলতে হয়।

অতি সাম্প্রতিক কালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং এস. এস. পি. (নাগপুর) ট্রাইব্যাল প্রব্লেমের উপর নজর দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় স্তরে আলাদা ভাবে ট্রাইব্যাল ডিপার্টমেণ্ট গঠন করে তাদের জীবন ও জীবিকার আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে তো মাত্র আজকের কথা। এর আগে কোনো বামপন্থী দলই আদিবাসীদের আলাদা-ভাবে সংগঠিত করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি। শুধু তাই নয়, তাদের মনোভাবটাই যেন ছিল ট্রাইব্যাল প্রব্লেম থেকে কম বেশি এড়িয়ে থাকা। অন্যান্য আরো দশটা সমস্যার মতো ট্রাইব্যালদের সমস্যাও যে একটা—সে কথা তাঁরা বোঝেন নি। ফলে সরকারের কাজের সমালোচনা তীব্র ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়েছে, কিন্তু নিজেরা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন নি। সুখের বিষয় কমিউনিস্ট পার্টি দেরিতে হলেও এ কাজে হাত দিয়েছেন।

সাঁওতালী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রসঙ্গত সমগ্র আদিবাসী সমাজের মূল সমস্যার কথাই লিখতে হলো। আশা করি পাঠকরা ক্ষুণ্ণ হবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরা মোট ৪১টি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের সংখ্যা মোট ২০, ৫৪, ০৮১ অর্থাৎ রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫'৮৮ ভাগ। জনসংখ্যা এখন নিঃসন্দেহে আরো বাড়ছে। আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গে

আদিবাসীদের সংখ্যা এখন ২৫ লক্ষের কম হবে না। সংখ্যায় আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালরা হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। ৬১ সালের জনগণনা অনুসারে তাঁদের সংখ্যা ১২,০০,০১৯ অর্থাৎ রাজ্যের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৫৮·৪২ ভাগ। এখন তো এই সংখ্যা আরো বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী সাঁওতালদের একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন একটি সাঁওতালী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান—নাম: আবোআঃ গাঁওতা। গত ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় লর্ড সিনহা রোডের শ্রীশিক্ষায়তন হলে এঁরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়—এটি তাদের 'তেসার সেরমা' অর্থাৎ তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান। ইতিপূর্বে তাঁরা নাকি কলকাতায় আরো দুটো অনুষ্ঠান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আদিবাসী কল্যাণ ও বন বিভাগের মন্ত্রী যথাক্রমে শ্রীদেওপ্রকাশ রাই ও শ্রীভবতোষ সরেন অনুষ্ঠানে সভাপতি ও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রধান অতিথি।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তারা জানালেন: শুধু নিজেদের আনন্দের জন্যই নয়, আপনাদের সঙ্গে এক জায়গায় মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করব—এই আশাই আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র অনুষ্ঠানই দর্শক, শ্রোতাদের বিপুল আনন্দ দিয়েছে। কলকাতার অভিজাত পাড়ায় আলো ঝলমল মঞ্চে একটা মেকানিক্যাল পরিবেশে যতটা আনন্দ পাওয়া সম্ভব তা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন নাচ এবং গানই ছিল প্রধান।

মেয়েদের বাহা নাচ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। গ্রাম পূজা 'বাহা', তার সঙ্গে মেয়েদের বাহা নাচ—যার আমেজ গাছে গাছে নতুন পাতার মতোই মনকে সবুজ করে তোলে। এর পর একে একে পুরুষদের নাটুয়া নাচ, করম নাচ, দাঁসায় নাচ আর মেয়েদের ডাহার নাচ, দং নাচ, লাঁগড়ে নাচ, সহরায় নাচ পরিবেশন করা হয়।

করম, দাঁসায়, বাহা নাচ মূলত ধর্মভিত্তিক। মাঘ-ফাল্গুন বিয়ের মাস উপলক্ষে দং নাচ। কার্তিক মাস আনন্দের মাস—পাড়ায় পাড়ায় পাঁচ দিন ধরে চলে সহরায় নাচ। নাচ ছাড়া বাঁশি ও একতারা সহযোগে অনেকগুলী সাঁওতালি গানও শোনানো হয়। মোট কথা, সমগ্র অনুষ্ঠানটাই

সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলা চলে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের আশাপূরণ হয়েছে কিনা, সে কথা বলতে পারি না। অ-আদিবাসী হিসেবে যত লোককে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তার বেশির ভাগই আসেন নি। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই কিছু পরে উঠে যান। কলকাতার সবগুলি দৈনিক সংবাদপত্রকে আমন্ত্রণ জানানো সত্বেও তাঁরা আসেন নি ('কালান্তর' ও 'যুগান্তর' ছাড়া), অতএব অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারও বিশেষ হয় নি।

এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই। কারণ এ থেকে আমাদের মনোভাবটাই ফুটে উঠেছে। লাভের মধ্যে এইটুকু যে, কলকাতার মতো শহরে সাহস করে একটি সাঁওতালী অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এবং তাতেও সুনীতিবাবুর মতো লোক সারাক্ষণ উপস্থিত থেকেছেন এবং সংখ্যায় কম হলেও বেশ কিছু সংখ্যায় অ-আদিবাসী নর-নারী তাতে যোগ দিয়ে আনন্দ পেয়েছেন।

আবোআঃ গাঁওতা একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। শিক্ষিত সাঁওতাল ভাই-বোনেরা এই সংগঠনে কাজ করেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা তো অতি সামান্য। আমাদের ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের সেইসব লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মানুষদের কি হবে? যাঁদের জমি নেই, ঋণভারে জর্জরিত, সুদখোর মহাজন আর জোতদারদের দ্বারা উৎপীড়িত, কয়লা-খনি চা-বাগান আর ফরেস্টে অমানুষের মতো পরিশ্রম করেন; কিন্তু দারুণ বঞ্চিতের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন—তাঁদের কি হবে? যাঁরা চাকুরী কিংবা শিক্ষার সুযোগ পেলেন না, সেইসব মানুষদের কি হবে?

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জীবন ও জীবিকার আন্দোলন যুক্ত করবার দিন আজ আসে নি কি? জীবনকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি নয়, আবার সংস্কৃতি ছাড়াও জীবনটা বাঁচে না। তার জন্যে চাই সর্বস্তরের জীবনের বিকাশ। তারই জন্যে চাই শক্ত মজবুত একটি আদিবাসী সংগঠন। সাঁওতাল, উরাও, মুণ্ডা, খেড়িয়া, লোধা, মেচ, লেপচা, ভুটিয়া—ছোট বড় সকল গোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষ যেখানে এসে সমবেত হবেন।

চিন্ময় ঘোষ

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার চল্লিশ বছর

প্রথম মহাযুদ্ধের পর গোটা দুনিয়ার রাজনীতির প্রেক্ষাপটই বদলে গিয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্ম হয়েছে উনিশশো সতেরো সালে। ইতিহাস মূলধনতন্ত্রের ভস্মশেষের উপর স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পতাকা তুলে ধরার আমন্ত্রণ জানাল। কিন্তু মূলধনতন্ত্রের শেষতম ধাপ, সাম্রাজ্যবাদ, তখনও ভারতে নখদন্ত নিয়ে স্বাধীনতার শেষ লড়াই ঠেকা দেবার জন্য নির্মম হয়ে উঠেছে। ঘটে গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে যুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলি সুখের হলো না। শনৈ শনৈ বৃটেন তখন আর্থনীতিক সঙ্কটের অতল গহ্বরের দিকে নামছিল। যত নামছিল, ততই শোষণের মাত্রা বাড়ছিল ভারতে। এমন কি, প্রথম ফিসক্যালনীতির মধ্য দিয়ে এদেশেও একদল তল্পিবাহক বানাবার কথাও তারা চিন্তা করছিল। সাম্প্রদায়িক বাজনীতির বিষ ঢোকাচ্ছিল দেশের বুর্জোয়া প্রভাবাধীন রাজনীতিতে। আর তখনই তৃতীয় আন্তর্জাতিক ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের অন্য দিগ্‌দর্শন রাখছিল। লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক আহ্বান করছিল—শ্রমিক-কৃষকদের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করার জন্য। সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে পারছিল, শ্রমিক-কৃষকের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্বের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে আমূল বদল এনে দেবে। আর তখনই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। সারা ভারত শুনল নতুন একটি শব্দ—কমিউনিস্ট।

এদেশের সংবাদপত্রে রুশ বিপ্লবের খবর কখনো-সখনো একটু-আধটু তখন ছাপা হতো। ছিল অদৃশ্য কড়া সেন্সার। আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে এমনভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের খবর থাকত, যেগুলি পড়ে সে-দেশ সম্পর্কে সত্য জানবার উপায় ছিল না বললেই চলে। লেনিনের মৃত্যুসংবাদও সেদিন জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রগুলির এককোণে সসঙ্কোচে স্থান পেয়েছিল। কিন্তু কি যেন হয়ে গেল ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে। গোটা ভারতে বিদ্যুৎচমক খেলে গেল। শোনা গেল কমিউনিস্ট। ১৯২৯ সালের বিশে মার্চ।

দেশবাসী জানল, বত্রিশজন কমিউনিস্ট নাকি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন মুজাফ্ফর আহ্মেদ, শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, গঙ্গাধর অধিকারী, পূরণচাঁদ যোশী, এস. এস. মিরাজকর, এস. ভি. ঘাটে, কে. এন. যোগলেকর, ধরণী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী, শওকৎ উসমানি, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীলাল ঘোষ, বেন ব্র্যাডলী, ফিলিপস্প্র্যাট ও আরও অনেক বিপ্লবী।

এর একবছর আগেকার ঘটনা। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর। নিখিল ভারত কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসেছে কলকাতায়। ঐ ডিসেম্বরের অধিবেশনে তুটো সুর চড়া হয়ে বাজল। তরুণ রাজনৈতিক কর্মী সুভাষচন্দ্র বসু আবেদন-নিবেদনের রাজনীতির তাকিয়া-ফরাস অধ্যুষিত অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব রাখলেন। কিন্তু সাইমন কমিশনের জবাবে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সূত্র ও প্রস্তাব। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, ভারতে কিঞ্চিৎ শাসনসংস্কার চাই। বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে ভারতীয়দের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ মাত্র। জাতীয় কংগ্রেস তখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্ল্যাটফর্ম ছিল। বড় বড় পুঁজিপতি ও ব্যবসাদার যাদের সঙ্গে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল, তারাও ছিল কংগ্রেসের মধ্যে। বড় বড় আইনজীবীরাও সামন্ততন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্বার্থের সূত্রে বাঁধা ছিলেন। এই নেতৃত্ব ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের চেয়ে বেশি ভাবতেই পারত না। জাতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী তখন। শ্রমিকশ্রেণীও। তাই কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে সমর্থন দিলেন, তার প্রস্তাবের হয়ে লড়লেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের কাছে সে-প্রস্তাব সামান্য ভোটে হেরে গেল। কিন্তু ঘটে গেল এক আশ্চর্য ব্যাপার। একদিন অধিবেশন-মণ্ডপ দখল করে নিলেন পঁচিশ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিক। মণ্ডপের প্রবেশমুখে তাঁরা কিছু বাধাও পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মণ্ডপ দখল করে নিলেন তাঁরা। এক অদ্ভুত দৃশ্য। ইংরেজি বুকনি ঝাড়া ফরাস তাকিয়া শোভিত 'হচ্ছে-হবে' ধরনের এক মঞ্চে জিগির উঠল 'তুনিয়ার মজতুর এক হও'। সেই নতুন একদল মানুষ ঘোষণা করলেন, প্রস্তাব নিলেন—দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। ভারতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে হবে—'সারা সন্সার হামারা হায়,

সারা সন্সার।' কি-অন্যায় কি-অন্যায়, এরা কারা? ইংরেজ শঙ্কিত হলো। খুঁজে বের করো এদের নেতাদের। বৃটিশ মূলধনে মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' লিখছিল "ভারতের শিল্পাঞ্চলে—মস্কোর প্রতিনিধিরা কাজ করছে।··· বাঙলাদেশের ধর্মঘটের সব নেতারাই···প্রকাশ্য কমিউনিস্ট"।

অবশ্য কমিউনিস্টদের কথা এর আগে এদেশেও কিছু কিছু শোনা গেছে। যেমন পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৩-এর কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। কিন্তু ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রমিক-দের ভূমিকা ও রেলপথ-সূতাকল-চটকলে সাধারণ ধর্মঘটের প্লাবন: ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন ও জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা —সব কিছু মিলে দেশ জুড়ে এক নতুন আগ্রহের ঝড় বয়ে গেল। কমিউনিজম কি? কমিউনিস্ট কাদের বলে? তারা কি চায়? বত্রিশজন কমিউনিস্টের ভয়ে বৃটিশ সিংহের থরহরি কম্প কেন? কেনই বা ভারতের এককোণে সৈন্য-ছাউনী-শহর মীরাটে এদের বিচারের ব্যবস্থা করা হল? জনগণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ তৈরি হলো। দেশের জনগণের প্রাণ-প্রবাহ থেকে কমিউনিস্টদের কে বিচ্ছিন্ন করে? এত সাধ্য কি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী আমলাদের ছিল? গড়ে উঠল ডিফেন্স কমিটি। সভাপতি স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি মতিলাল নেহরু। জহরলাল সাক্ষাৎ করে এলেন বন্দীদের সঙ্গে। সারা দেশ জুড়ে মানুষ পরম আগ্রহভরে মামলার খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। আদালত কক্ষে যেন মুখোমুখি দাঁড়াল ভারতীয় বিবেক ও সাম্রাজ্যবাদ। ভারতের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার ল্যাংফোর্ড জেমস সরকারের কৌঁসুলী হলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে লাগল। কাগজ-পত্রে ঘর ভরে গেল। সাড়ে চার বছর ধরে মামলা চলল।

সরকারের অভিযোগপত্রে বলা হলো "১৯২১-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে তাঁদের একটি শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকৎ উসমানি ও মুজফ্‌ফর আহমেদ আরও কয়েকজনের সঙ্গে যোগ দিয়ে কমিউনিস্ট সংস্থা গড়ে তুলে, মহামান্য সম্রাটকে ভারত সাম্রাজ্য থেকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।"

১৯৩৩-এর ১৬ই জানুয়ারি মামলার রায় বের হলো। মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ডাঙ্গে-ঘাটে-যোগলেকর ও স্প্র্যাটের হলো বারো বছরের

জেল। ব্র্যাডলী, মীরাজকর ও শওকৎ উসমানীর দশ বছরের কারাদণ্ড হলো। আপীল হলো এলাহাবাদ হাইকোর্টে। বৃটেনে পার্লামেন্টে লেবার সদস্যরা ভারতে বৃটিশ শাসনের নিন্দায় মুখর হলেন। কিছুকাল আগের জিনোভিয়েভ চিঠির জালিয়াতির ঘা তখনও দগদগে তাদের মনে। আপীলের ফলে নতুন রায় বেরোল। কারো কারো কারাদণ্ড এতে কমে গেল, কেউ বেকসুর খালাস পেলেন।

বিশে মার্চ এ-বছর মীরাট মামলার চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। "ইতিহাসে আমেরিকার মনি মামলা ও সাক্কো ভ্যানসেত্তি মামলা, ফ্রান্সের ড্রেফ্যুস মামলা এবং জার্মানীর রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ড মামলার সঙ্গে একই সারিতে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলারও স্থান"—লিখেছিলেন ইংরেজ রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানী ও সমাজতন্ত্রী হ্যারল্ড ল্যাস্কি।

কিন্তু মীরাটের দিকে ভারতের মানুষ তাকিয়েছিল কেন? ঐ বন্দীদের আদর্শের কাছে জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্য-এক ভূমিকা তাঁরা আশা করছিলেন। নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও শোষিত মানুষ তাঁদের আন্দোলনের পথে আশার আলো দেখেছিলেন। একথা ঠিক, আজ ভারতেও কমিউনিস্ট আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত। তা সত্বেও দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে তাঁরা মন্ত্রিসভায় তো বটেই, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও উদ্যোগের ক্ষেত্রেও অগ্রচারী। গোটা ভারত আজও মীরাটের বন্দীদের আদর্শের কথা ভাবে। ভাবে কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ কাজের কথা। ভারতে আজ রাজনৈতিক সঙ্কটে কমিউনিস্টদেরই জাতীয় স্বাধীনত রক্ষা ও শোষণহীন সমাজগঠনের সাংগঠনিক ফ্রন্ট গড়বার উদ্যোগ নিতে হবে। মীরাটের ঐতিহ্য ব্যর্থ হবার নয়।

শুভব্রত রায়

মহিয়সী ক্রুপস্কায়া

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৯, শ্রীমতী নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়া জন্মেছিলেন। এ বছর তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী। লেনিনের সহকর্মিণী ও সহধর্মিণী ক্রুপস্কায়া এক আদর্শ বিপ্লবী চরিত্র। ক্রুপস্কায়াকে শতবার্ষিকীতে স্মরণ করতে গিয়ে, এই মহিয়সী রমণীর বিপ্লবী সত্তাকে বিশেষভাবে মনে

পড়ছে—মনে পড়ছে যথার্থ অর্থেই তিনি বিশ্বের বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ লেনিনের সহধর্মিণী ছিলেন—ছিলেন ঘরণী, সহকর্মিণী, প্রেমিকা।

জন্মেছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। এই পিটার্সবুর্গই নভেম্বর বিপ্লবের পেট্রগ্রাদ: আধুনিক লেনিনগ্রাদ। তাঁর পিতা কনস্তানতিন ইগনাতিয়েভিচ্‌ ক্রুপস্কী ছিলেন সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ব্যবহারজীবী। জননীও উচ্চশিক্ষিতা। তিনি ছিলেন পাভলভস্কি ইনস্টিট্যুটের গ্র্যাজুয়েট। বাবা-মা দুজনেই ছিলেন জারতন্ত্রের সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে আশাবাদী, প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রের পূজারী। কন্যা নাদেজদার শিক্ষায় তাঁরা রাশ টেনে ধরেননি। গণতান্ত্রিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন নাদেজদা, চোখে তাঁর গণতান্ত্রিক রাশিয়ার স্বপ্ন।

১৮৮৩ সালে নাদেজদার পিতার মৃত্যু হয়। সেই দুঃখের দিনে নাদেজদা সংসারের হাল ধরলেন। পাণ্ডুলিপির অনুলিপি তৈরি করা ও শিক্ষিকার পেশা নিলেন। তখনও তিনি ছাত্রী। তারপর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক মহিলা শিক্ষাসদনে যোগ দেন। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে ঔৎসুক্য মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটায়। ১৮৯০ সাল থেকেই তিনি ছাত্রদের মার্কসবাদী পাঠচক্রে যোগ দিতেন। সেখানেই তিনি মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সমাজবিকাশের রূপরেখাটি সম্পর্কে অবহিত হন। 'জনবাদী' আন্দোলনে যে দুর্গতের মুক্তি নেই—মুক্তি মার্কসবাদের সুষ্ঠ প্রয়োগ ও শ্রমিক আন্দোলনে—একথা তিনি তখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন। এ সময় তিনি পড়লেন মার্কসের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি। বুঝলেন "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ বা তলস্তইর আত্মবীক্ষা ও নিজেকে নিখুঁত করে গড়ে তোলার আত্মসাধনার পথে নয়, সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের পথেই আছে মুক্তি।'

একুশ বছর বয়স থেকেই পিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে তিনি শ্রমিকদের মার্কসবাদী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে চাইলেন। রবিবারের সন্ধ্যায় শুরু করলেন তাদের বিদ্যাশিক্ষা দিতে। এই সময়ের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে ক্রুপস্কায়া লিখেছেন: "আর দেরি সইছিল না, শ্রমিক আন্দোলনে আমি তখন অংশ গ্রহণ করতে উৎসুক। মার্কসবাদী বন্ধুদের বললাম—আমাকে কোন শ্রমিক গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করা হোক। কিন্তু তখনকার দিনে শ্রমিকদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের যোগাযোগ

খুব ব্যাপক হয়ে ওঠেনি, তাই তাঁরা আমাকে কোনও শ্রমিক গ্রুপে পাঠাতে পারলেন না, তখন ঠিক করলাম, রবিবারের সান্ধ্যস্কুলই হবে শ্রমিকদের সঙ্গে আমার সংযোগ রাখবার কেন্দ্র।" এই স্কুলগুলির নাম ছিল—তখন 'স্মলেনস্ক স্কুল'।

লেনিন ১৮৯৩ সালে সেণ্ট পিতার্স বুর্গে এলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। সবুজ শষ্পপুঞ্জে রাজধানী শ্যামল হয়ে উঠেছে, ফুল ফুটেছে রঙ বেরঙএর। চব্বিশ বছর বয়স তখন লেনিনের। তিনি কিন্তু এসেছেন ঐ স্মলেনস্ক স্কুলগুলির মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ভেতরে মার্কসবাদী চিন্তার প্রচারের কাজে। এসেছেন ঐ কেন্দ্রগুলিকে বিপ্লবের গোপন কাজ চালাবার ঘাঁটি করে গড়ে তুলতে। ক্রুপস্কায়া আগে লেনিনকে দেখেননি কখনও, কেবল জেনেছিলেন "ভলগা অঞ্চল থেকে একজন খুব পড়াশোনা করা জ্ঞানী মার্কসবাদী এখানে এসেছেন"। দুজনের প্রথম দেখা ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক বৈঠকে। নাদেজদার বয়স তখন পুরো পঁচিশ, লেনিনের বয়স তখন প্রায় চব্বিশ।

কাজের চাপ বাড়ল। বিপ্লবী সাধনার সাধারণ লক্ষ্য দুজনকে অনেক ঘনিষ্ঠ করে আনল। এরপর থেকে তাঁদের প্রায়ই দেখাশোনা হতো। সে বছরেই লেনিন লিখলেন 'জনগণের বন্ধু কারা এবং সোস্যাল ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে কিভাবে তারা লড়ে'। যে ছোট ঘরে মাত্র কয়েকজনের সামনে লেনিন তাঁর পুস্তিকা পাঠ করলেন, সেখানে নাদেজদাও উপস্থিত ছিলেন।

লেনিন পিটার্সবুর্গের মার্কসবাদীদের সর্বস্বীকৃত নেতা হয়ে উঠলেন। লেনিন বললেন "রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সংগঠন ও বিকাশকে অগ্রসর করতে গেলে আন্দোলনকে···চালিকাশক্তির ধারণা বিহীন স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ, ধর্মঘট, 'হাঙ্গামা' প্রভৃতির অবস্থা থেকে পরিবর্তিত করতে হবে, সমগ্র রুশ শ্রমিকশ্রেণীর সুসংগঠিত সংগ্রামে···।" ক্রুপস্কায়া শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের জন্য পিটার্সবুর্গ ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠলেন। আর বিপ্লবীদর্শনের প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ-কর্মে ক্রুপস্কাইয়া লেনিনের বিশ্বস্ত সহযোগী ও সঙ্গী হলেন। ১৮৯৫ সালে লেনিনের উদ্যোগে স্মলেনস্ক্ স্কুলের মার্কসবাদীদের প্রচার চালাবার পদ্ধতি-বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সভা হয়। নাদেজদা ছিলেন তার অন্যতম

প্রধান উদ্যোক্তা। লেনিনের তখন বিদেশে চলে যাবার কথা। লেনিনের কাজের 'উত্তরাধিকারী' নির্বাচিত হলেন ক্রুপস্কায়া। কিন্তু ১৮৯৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর লেনিন তাঁর বহু সহকর্মীসহ গ্রেপ্তার হলেন।

১৮৯৬ সালের জানুয়ারিতে নাদেজদাও গ্রেপ্তার হন। লেনিন তাঁকে এ সময় জেলখানা থেকে অদৃশ্য কালিতে লেখা একটি চিঠিতে প্রেম নিবেদন করেন। তারপর লেনিন পূর্ব সাইবেরিয়ায় তিন বছরের জন্য নির্বাসিত হন। ক্রুপস্কায়াও নির্বাসিত হন উফায়। লেনিন সাইবেরিয়া থেকে নাদেজদাকে চিঠি দিলেন। বিবাহের প্রস্তাব। ক্রুপস্কায়া একটু ঠাট্টার সুরে উত্তর দেন "বেশ তা হলে স্ত্রী হতে হবে, তবে তাই হোক।" ১৮৯৮ সালের ১০ই জুলাই তাঁরা বিবাহিত হন। এরপর আমরা লেনিনের পাশে ক্রুপস্কায়াকে ঘনিষ্ঠ কমরেড, সহ-বিপ্লবী হিসাবে দেখছি। রাজনীতির, বিপ্লবের পথ সন্ধানের ব্যাপারে লেনিনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাঁকে লেনিনের সঙ্গে জেলখানায় যেতে হয়েছে, যেতে হয়েছে সুদূরে নির্বাসনে। দেশত্যাগ করে বিদেশে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘ দিন।

বোলশেভিক পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নাদেজদার ভূমিকাও কম ছিল না। বিপ্লবী সমাজতন্ত্র প্রচারের কাজে লেনিনের বেআইনী পত্রিকা 'ইসক্রা'র ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। নাদেজদা ছিলেন সে পত্রিকার সেক্রেটারি। বোলশেভিক পার্টি গড়ে তোলার জন্য পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অবদান অসামান্য। নাদেজদা ঐ কংগ্রেস সফল করে তোলারজন্য গুরুত্ব-পূর্ণ সাংগঠনিক কাজে ছিলেন। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে তিনি ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের সময় পার্টির বিশিষ্ট দায়িত্বে ছিলেন। আর দু-বিপ্লবের মধ্যবর্তী দীর্ঘ বছরগুলিতে প্রবাসে তিনি পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর তিনি রুশ দেশে ফিরে আসেন এবং বোলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট কাজের দায়িত্ব পান। অক্টোবর বিপ্লবের পর তিনি শিক্ষামন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি ঐ দপ্তরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। সোবিয়েত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া তিনি পার্টির ভাবধারা প্রচারের কাজে ছিলেন প্রথম শ্রেণীর প্রচারক।

আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য তাঁর নাম

আমরা সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করব। প্রথম মহাযুদ্ধের ঘোর ঘনঘটার মধ্যে ১৯১৫ সালে বার্ন-এ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি রুশ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। ১৯২১ সালে মস্কোয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ঐ সম্মেলন থেকেই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস-এর কমিউনিস্ট মহিলা-কর্মীদের কাজকর্মের দলিল প্রস্তুত করা হয়। লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বস্ত এই মহিয়সী রমণী লেনিনের মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পর ১৯২৪-এর ২৬শে জানুয়ারি, দ্বিতীয় সারা ইউনিয়ন সোবিয়েত কংগ্রেসে লেনিন সম্পর্কে বলেন: "কমরেডস, এই ক'দিন ভ্লাদিমির লেনিনের শবাধারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে আমি মনে মনে তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করছিলাম। আমি সে কথাই আপনাদের কাছে বলব। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, সকল অত্যাচারিতের জন্য তাঁর হৃদয়ে নিবিড় ভালোবাসা স্পন্দিত হতো। মুখ ফুটে সে কথা তিনি কোনোদিন বলেন নি। এর চেয়ে কম পবিত্র অন্য কোনো মুহূর্তে আমিও একথা আর কখনো সম্ভবত বলব না। এর কারণ হিসাবে বলব, রুশদেশের বীর বিপ্লবী আন্দোলন থেকে তিনি এই অনুভূতির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। সেই অনুভূতিই তাঁকে আবেগ ও নিবিড়তায় এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রণোদিত করেছে: শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি কোন পথে? মার্কসের কাছে তিনি পেয়েছিলেন তার সদুত্তর। গোঁড়া তত্ত্ববাগিশের মতো তিনি মার্কস অধ্যয়ন করেন নি। যন্ত্রণাদীর্ণ, তপ্তজাগর প্রশ্নের জবাব-চাওয়া উন্মুখ মানুষের মতো তিনি মার্কসের কাছে গেছেন। আর, তাঁর প্রশ্নেরও উত্তর সেখানে মিলেছে। সেই উত্তর নিয়ে তিনি গেছেন শ্রমিকদের কাছে…।"

নাদেজদা ক্রুপস্কায়ার জন্ম শতবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করি, স্মরণ করি বিপ্লবের দীপ্ত বহ্নিস্বরূপিণী এই রমণীর সঙ্গে চিরকালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ নিকোলাই লেনিনকেও।

ইকবাল ইমাম

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মাত্র দু-মাস আগে, গত ২রা ফেব্রুয়ারি রাতেও, তাঁর সেলিমপুর রোডের দোতলার জানালা থেকে শহর কলকাতার কলরব শুনেছেন কবি-সাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পরদিন তাঁর জন্মদিন। এবং জন্মদিনের স্তব্ধ দুপুরেই প্রিয়জনের শ্রদ্ধার আর ভালোবাসার ফুল বুকে নিয়ে তিনি শ্মশানের উত্তাপে নিঃশেষ হয়েছেন। ঢাকুরিয়া থেকে কেওড়াতলা পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কে তাঁর শবযাত্রার অনুগামী—কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী, আত্মীয়-পরিজন, শেষ-সংবাদ-এর জন্য কৌতূহলী সাংবাদিক।

অথচ জীবনযাপনের ইতিবৃত্তে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের চারদিকে কোনো কোলাহল ছিল না। অনাত্মীয়তা আর বিচ্ছিন্নতার একাকীত্বে নিঃসঙ্গ সাহিত্যচর্চাই তাঁর জীবনের শেষ বছরগুলির একমাত্র কাজ। ১৯৩২ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত একটানা একুশ বছর তাঁর সম্পাদনায় 'নিরুক্ত' (প্রেমেন্দ্র মিত্র-র সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায়) এবং 'পূর্বাশা'-কে কেন্দ্র করে যে তরুণ সাহিত্যিকরা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজে পেয়েছিলেন, সাম্প্রতিক সাহিত্যে তাঁদের অনেকেই আজ সাহিত্য-বণিক, অর্থে-'যশে' কৃতী। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের শত বিরোধ সত্ত্বেও, তাঁর ব্যক্তিত্বের সততায় আমরা নির্দ্বিধভাবে শ্রদ্ধাবান। চরমতম দারিদ্র্য বা সঙ্কটেও তিনি নিজেকে ক্ষুদ্র করে সাহিত্যের ধনপতি সওদাগরদের প্রসাদভিক্ষা করেন নি। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের বাঙলাদেশে মা-এর পারলৌকিক কাজ করার অস্বীকৃতিতে যে-বিশ্বাসের ঋজুতা ছিল, শিল্পী হিসেবে জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই দৃঢ়তাকে তিনি অক্ষুন্ন রেখেছেন। ইদানিং বাঙলাদেশে সোনার-হরিণ খোঁজার আহ্লাদকে প্রকাশ্যে নিন্দা করাই শ্রদ্ধেয়!

রবীন্দ্রনাথের সায়াহ্নে সঞ্জয় ভট্টাচার্য তরুণ কবি এবং কথাশিল্পী, আধুনিকতার সর্ববিধ ভাবনায় মগ্ন। মূলত জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে বামপন্থী ঝোঁকের প্রতি অনুরাগ তাঁর তৎকালীন উপন্যাস-ছোটগল্পকে প্রভাবিত করে—'রাত্রি', 'কল্লোল' সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য ভালো উপন্যাস। গ্রামীণ পূর্ববাঙলার এক অন্তরঙ্গ পরিচয় 'মরামাটি'। প্রথম-দিকের অন্যান্য গল্পরচনা—'বৃত্ত', 'কষ্মৈদেবায়', 'দিনান্ত', 'মৌচাক'

উপন্যাসগুলি এবং 'ফসল', 'ঋণ' ছোটগল্পগুলি। পরবর্তী সময়ে উপন্যাসের আঙ্গিক বা নির্মাণরীতির নিরীক্ষায় তিনি অধিকতর মনোযোগী হন এবং প্রচলিত ধারার বাইরে উপন্যাস বুদ্ধি-প্রধান হয়ে ওঠে। এই নবনিরীক্ষার প্রথম রচনা 'সৃষ্টি' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস 'প্রবেশ-প্রস্থান'। শেষ জীবনের অন্যান্য উপন্যাসগুলি—'স্মৃতি', 'কাচ', 'আহত সৈকত', 'প্রতিধ্বনি', 'নানারঙের দিনগুলি', 'মুখোস'। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য সর্বাধিক স্মরণীয় তাঁর প্রেমের কবিতাবলীতে। 'পদাবলী', 'উত্তরপঞ্চাশ', 'স্বনির্বাচিত কবিতা' কাব্যগ্রন্থের সে-সব আশ্চর্য ভালো কবিতাগুলি বাঙালি-পাঠকের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে বারবার ধ্বনিত হবে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যু ত্রিশের যুগের একজন বিশিষ্ট শিল্পীর জীবনাবসান। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

'বসন্তকুমারী' প্রসঙ্গে

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

পৌষসংখ্যা (১৩৭৫) 'পরিচয়' এবার অনেক দেরিতে আমার হাতে এসেছে। এই সংখ্যায় গুরুদাস ভট্টাচার্য লিখিত 'এস, ওয়াজেদ আলী (ইংরাজী 'এস'-এর পরিবর্তে পুরো নামটিই থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল) এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটিতে মীর মসাররফ হোসেন-এর 'বসন্তকুমারী' নাটক থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা পড়ে বিস্মিত হয়েছি। 'বসন্তকুমারী' নাটকটির একটি কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে এবং আমি একাধিকবার নাটকটি পড়েছি। নট-নটীর কথোপকথনের মধ্যে "অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে।"—এই লাইনটি নেই। অন্যান্য উক্তিও সঠিকভাবে উদ্ধৃত হয়নি। যতদূর জানি 'বসন্তকুমারী' নাটকের একাধিক সংস্করণ হয়নি। কাজেই জানতে ইচ্ছা করে গুরুদাসবাবু এই উদ্ধৃতি কোথা থেকে দিয়েছেন।

'বসন্তকুমারী' নাটকের প্রস্তাবনায় নট-নটীর কথোপকথন নিম্নরূপ :

নটী—ছি ছি ! ! এমন সভায় মুসলমান লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন !

নট—কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্থ হলো ?

নটী—তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয় ? একে মুসলমান, তাতে আবার উত্তরে বাঙ্গাল। জানতেই পাচ্ছেন।

ইতি

সুকুমার মিত্র
৩৭, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিসট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

৪। প্রকাশক— ঐ ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়; ৭৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

তরুণ সান্যাল, ভারতীয়; ৬০ এ, হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-১০

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা:

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিলডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল্, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১১৩,ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪২।৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৫, যাদবপুর সাউথ রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্ল্যাট ২, 'সী গাল', মিচেল রোড,, বম্বে-২৬ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯ ॥ ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প ১৬৫, পি ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩ ॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট নং বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯ ॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৬০এ, হরমোহন ঘোষ লেন, কলকাতা-১০ ॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট ২, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ৬ ॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬ ॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী, ২০০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

(স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
১০. ৩. ৬৯

পরিচয়

বর্ষ ৩৮ ॥ সংখ্যা ১০

বৈশাখ ॥ ১৩৭৬

সূচিপত্র

নাট্যপ্রসঙ্গ :

'অনামিকা'র 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ'। উমানাথ ভট্টাচার্য ১১২৮

বিবিধ প্রসঙ্গ :

এবারের রবীন্দ্রদিবসে। তরুণ সান্যাল ১১৩১ ॥ লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা প্রসঙ্গে। জ্যোতি দাশগুপ্ত ১১৩৪ ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-এর জয়ন্তী উৎসব। কমল সমাজদ্বার ১১৩৫ ॥ বিশ্বশান্তি সংসদের কুড়ি বৎসর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শান্তিসম্মেলন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দিবস। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ১১৩৯ ॥ গ্রহণ করতে হবে সময়ের চ্যালেঞ্জ। চিন্মোহন সেহানবীশ ১১৪৩ ॥ রাজ্য ক্ষেতমজুর সম্মেলন। গোলাম কুদ্দুস ১১৪৭ ॥ অতীতের কথা। ধরণী গোস্বামী ১১৪৯

বিয়োগপঞ্জী :

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন স্মরণে। দুটি মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ। ধনঞ্জয় দাশ ১১৫২ ॥ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলীপ বসু ১১৫৬

প্রচ্ছদলিপি

সত্যজিৎ রায়

প্রচ্ছদচিত্র

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

('কালান্তর' পত্রিকার সৌজন্যে)

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ । সংখ্যা ১০
বৈশাখ । ১৩৭৬

রাজা রামমোহন সম্বন্ধে

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

যতদূর মনে পড়ছে, বছর পঁয়ত্রিশ আগে রামমোহনের জীবনীকার-ঐতিহাসিকগণ 'ভক্ত' ও 'নিন্দুক' এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রামমোহন এত বিত্তবান হয়েছিলেন কি করে; তিনি পাটনায় ও কাশীতে পড়তে গিয়েছিলেন কিনা এবং কৈশোরে আদৌ তিব্বতে গিয়েছিলেন কিনা; তিনি পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন কিনা; তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অলকমঞ্জরীর সহমরণ তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁর এই উক্তির সপক্ষে কি প্রমাণ আছে, রংপুর থেকে এসে কলিকাতায় তাঁর স্থায়ী বসবাসের শুরু ১৮১৪ না ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ; রাজারাম তাঁর পুত্র অথবা পোষ্যপুত্র অথবা পুত্রস্নেহে পালিত মাত্র; তিনি ইংরাজি ভাষায় কথনে ও লিখনে কতদূর পারদর্শী ছিলেন (প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে জেরেমি বেন্থামের মতে রামমোহন জেমস মিল-এর চেয়ে ভালো ইংরাজি লিখতেন) এবং প্রেস আইন সম্বন্ধে তাঁর প্রতিবাদপত্র আর্নট সাহেবের লেখা কিনা; ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে এক বিশাল বিসংবাদ-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। তার মূল্য অস্বীকার করছি না, তবে তাতে বিশেষ রুচি নেই।

রামমোহন সম্বন্ধে আর-এক ধরনের বিতর্ক আছে যা কিঞ্চিৎ অধিকতর চিত্তাকর্ষক—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শগত তর্ক—উভয় পক্ষই যদিও 'প্রগতিশীল', 'বামপন্থী', 'মার্কসবাদী'। একটা কাল্পনিক বিতর্কের অবতারণা করি।

পূর্বপক্ষ। রামমোহন থেকেই শুরু বাঙলার তথা ভারতের 'রেনেসাঁস'—নবজাগৃতি। তিনি ভারতের সুদীর্ঘকালের তমোনিদ্রা ভাঙিয়ে প্রবর্তন করলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, শুরু করলেন ধর্মের ও জাতিভেদের বেড়া ভেঙে ভারতকে এক করার কাজ, সমাজ-সংস্কার, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন। তিনি ও দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই ছিলেন ভারতে শিল্পবিপ্লবের

প্রবক্তা, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত। রামমোহনের ধর্মসংস্কারমূলক আন্দোলনও ইউরোপের 'রেফরমেশন' আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়। 'রেফরমেশন'-এর আইডিয়লজি বিনা ইউরোপে ক্যাপিট্যালিজম ও শিল্পবিপ্লব অগ্রসর হতে পারত না।

প্রতিপক্ষ। কি বললেন? 'রেনেসাঁস'! বোগাস। কৃষকরাই ছিল জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ। আপনাদের তথাকথিত 'রেনেসাঁস' কৃষকজীবনকে স্পর্শ মাত্র করেনি। পরভৃৎ, অনুৎপাদক জমিদারশ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা ধার-করা অর্ধজীর্ণ বুর্জোয়া বিপ্লবী ভাবধারার বুলি কপচানো—এই কি 'রেনেসাঁস'! ইতিহাসে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা হলো সংগ্রামী কৃষকদের সঙ্গে মিতালি করে স্বৈরতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে ফেলা ও ক্যাপিটালিজমের বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা। রামমোহন তো মশাই স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসকদের মহাভক্ত ছিলেন। তিনি তো এই কুখ্যাত উক্তি করেছিলেন যে ইংরেজরা ভারতে এসেছে বিজেতা রূপে নয়, 'পরিত্রাতা' রূপে! 'পরিত্রাতা'! 'পরিত্রাতা'! কিসের থেকে আমাদের 'পরিত্রাণ' করল ইংরেজ? আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা থেকে, আমাদের শিল্পবাণিজ্য থেকে। কৃষকরা যে স্থায়ী রায়তী স্বত্ব ও অপরিবর্তনীয় খাজনার হার ভোগ করছিল তার থেকে তারা 'পরিত্রাণ' পেল। এটাই বোধহয় সব চেয়ে বড় 'পরিত্রাণ'! কি বলেন?

পূঃ। দেখুন, 'ডিমাগগি' এক জিনিস, বিজ্ঞান অন্য জিনিস। ভারতে ইংরেজদের লুঠেরাবৃত্তিকে ও 'শূকরজাতীয়' আচরণকে কার্ল মার্কস যেমন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তেমনটি আর কেউই করেন নি। কিন্তু তিনিও ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে বিচার করে ব্রিটিশ বিজেতৃগণকে বস্তুত বলেছিলেন ভারতের পরিত্রাতা। তিনি বলেছিলেন, ভারতের তিন হাজার বছরের অনড়, অচল গ্রামসমাজকে চুরমার করে এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলিকে ধ্বংস করে ইংরেজরাই ভারতের ইতিহাসে একমাত্র 'সামাজিক বিপ্লব' ('social revolution') সংঘটিত করল। তার ফলে উন্মুক্ত হলো উচ্চতর সমাজবিকাশের স্তর—পুঁজিবাদী বিপ্লবের স্তর। কার্ল মার্কস ইংরেজের ভারত বিজয়কে 'বিপ্লবী' আখ্যা দিয়েছিলেন। অস্বীকার করতে পারেন?

প্রঃ। মানছি। কিন্তু এই যে আপনারা অর্ধেক কথা বলেন আর

অর্ধেক কথা চেপে যান, এতেই ইতিহাস বিকৃত হয়ে যায়। কার্ল মার্কস একথা বলেছিলেন উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে, রামমোহনের মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পরে। তখনও ভারতের শিল্পায়ন শুরুই হয়নি। মার্কস মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন, রেলওয়ে স্থাপনের ফলে ভারতের শিল্পায়ন অবশ্যম্ভাবী। একটি ভারতীয় উদ্যোক্তাশ্রেণীর (Indian entrepreneurial class) উদ্ভবের সম্ভাবনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তারাই শিল্পবিপ্লব আনবে, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের বিতাড়িত করবে—এই রকম একটা সম্ভাব্য অর্থ মার্কসের ভারতবিষয়ক উক্তি সইতে পারে। কিন্তু কাযত দেখা গেল, ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ইংরেজদের তাঁবেদার হয়ে পড়ল। শ্রমিকশ্রেণীর স্কন্ধে ন্যস্ত হলো কৃষকদের সঙ্গে মিতালি করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার এবং ভারতের শিল্পবিপ্লবকে বুর্জোয়া স্তর থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তীর্ণ করার ভার। ইংরেজ ভারতে শিল্পবিপ্লব ঘটাবে, এমন একটা উদ্ভট কথা আপনারা মার্কসের মুখে বসান কেন?

পূঃ। না, আমরা তা করি না, ওটা আপনাদের কল্পনা মাত্র।

প্রঃ। তাহলে ইংরেজকে না তাড়িয়ে ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হতে পারত না, এটা মানেন?

পূঃ। 'সম্পন্ন' কথাটার আভিধানিক অর্থে মানি। তবে যদি বলেন, ইংরেজকে না তাড়িয়ে ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভই হতে পারত না, তাহলে মানি না।

প্রঃ। এটা তো হলো নিছক sophistry। ইংরেজ তাড়ানোর আরম্ভটাই তো গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরও আরম্ভ। কৃষকরাই এই কাজ শুরু করেছিল। রামমোহনের কালে শত শত কৃষক বিদ্রোহ বাঙলা প্রদেশে ঘটেছিল। আপনাদের 'বুর্জোয়া বিপ্লবী' রামমোহন কি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন? তা তো দূরে থাক, কৃষক বিদ্রোহীদের শৌর্যবীর্য, আত্মত্যাগ, দুঃখ, বেদনা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। আপনারা বলেন, রামমোহন ছিলেন একজন হিউম্যানিস্ট, একেবারে 'বিশ্বজনীন' হিউম্যানিস্ট। নেপলস-এ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাজয়ে তিনি শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন, স্পেন-এ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদে তিনি টাউন হলে ভোজদান করেছিলেন। খুব ভালো কথা। কিন্তু এটা কি ধরনের হিউম্যানিজম যে ভারতের পরাজয়ের গ্লানি,

ইংরেজ কর্তৃক ভারতলুণ্ঠনের কাহিনী, ঘরের পাশে কৃষকদের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করল না! আসলে তিনি ছিলেন মুৎসুদ্দি—জমিদারশ্রেণীর লোক। তাঁর শ্রেণীস্বার্থ ও ইংরেজ শাসকদের শ্রেণীস্বার্থ হুবহু এক ছিল। তাঁকে বুর্জোয়া শিল্পবিপ্লবের বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলার অর্থ মার্কসবাদকে বিসর্জন দেওয়া।

পূঃ। আপনারা গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করছেন। তখনকার কোনো কৃষক বিদ্রোহই স্বাধীনতা-যুদ্ধ ছিল না। রামমোহনের জীবনকালে ইংরেজ কর্তৃক ভারত বিজয় সমাপ্তই হয়নি, চলছিল। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময়ই তখন আসেনি। জমিদার, নীলকর ও স্থানীয় শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়া আপনাদের Pseudo-Marxist demagogy-র আর-একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইংরেজদের সঙ্গে রামমোহন সহযোগিতা করেছিলেন ঠিক কথা। কিন্তু শুধু কি সহযোগিতাই করেছিলেন? আর কিছুই করেন নি? ইংরেজদের কুশাসনের বদলে সুশাসন প্রবর্তিত করার জন্য রামমোহনের অক্লান্ত জীবনব্যাপী প্রয়াস, প্রেস আইন, ধর্মবৈষম্যমূলক জুরি ব্যবস্থা, ইউরোপীয় দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শাসকদের অনিচ্ছা ও দীর্ঘসূত্রতা, লাখেরাজ জমির পুনঃপ্রতিগ্রহ, মাথাভারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা—এই সবের বিরুদ্ধে রামমোহনের তীব্র ও যুক্তি-সিদ্ধ প্রতিবাদ—এইগুলির কি সেদিন কোনোই মূল্য ছিল না? এইসব বিষয়ে রামমোহনের লেখাগুলি সংস্কারমুক্ত চিত্তে পড়ে দেখুন। তাহলে বুঝবেন রামমোহনের মন নবাগত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারায় কতদূর অভিষিক্ত হয়েছিল।

প্রঃ। হ্যাঁ হয়েছিল। তবে পঙ্গু, খঞ্জ, ক্লীব বুর্জোয়া ভাবধারায়—যার মধ্যে নূতনকে স্বাগত জানিয়ে তাকে সিংহাসনে বসানোর উদ্দেশ্যে কোনো ভেরীঘোষ ছিল না, যার প্রধান সুরটি ছিল রাজভক্তি, অর্থাৎ কি করে ইংরেজ শাসনকে ভারতে কায়েম করা যায়। ওটাকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারা না বলে মুৎসুদ্দি-জমিদার ভাবধারা বললে অধিকতর সঙ্গত হয়।

পূঃ। তাহলে ধর্মসভার চাঁইদের ভাবধারাকে কি বলবেন? ওটাও তো মুৎসুদ্দি-জমিদার ভাবধারা। ব্রহ্মসভার ও আত্মীয়সভার সঙ্গে ধর্মসভার ঝগড়াটা কি শুধুই সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথা, কন্যাবিক্রয়প্রথা ইত্যাদি নিয়েই ঘটেছিল? উভয় ভাবধারার গুণগত প্রভেদটা এতই প্রকট যে সেটা আপনাদের চোখে না

পড়াটাই বিস্ময়কর। 'সম্বাদ কৌমুদী'-র সঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র দীর্ঘ ও স্থায়ী বিবাদটা ছিল শুধু সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের বিবাদই নয়, মূলত তা ছিল অবাধ বাণিজ্যবাদী বুর্জোয়া বিপ্লবীদের সঙ্গে কোম্পানিভক্ত সামন্ততন্ত্র-জমিদারতন্ত্রের বিবাদ। তখনকার ভারতীয় ইতিহাসের এক প্রধান চালিকাশক্তি ছিল শাসকশ্রেণীর নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব—একচেটিয়া কোম্পানির সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যওয়ালাদের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ কারখানাজাত দ্রব্য ভারতে অবাধে আসুক, চরিত্রবান ও মূলধনসম্পন্ন ইউরোপীয়েরা অবাধে ভারতে আসুক, মফঃস্বলে জমি কিনুক, বিজ্ঞানকে উন্নত টেকনলজিকে এবং নিজেদের Know-how-কে শিল্পে ও কৃষিতে প্রয়োগ করুক, তাদের কাছ থেকে ভারতীয়েরা এই-সব শিখে নিক, এই পথেই ভারতের প্রগতি—এই ছিল রামমোহনের বিশ্বাস। কার্ল মার্কস-এর দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে এটা কি এতই বেখাপ যে রামমোহনকে সামন্ততান্ত্রিক বলে প্রমাণ করতে না পারলে মার্কসবাদের সলিলসমাধি হবে?

প্রঃ। অর্থাৎ ইংরেজকে বলতে হবে, "হাত ধরে তুমি নিয়ে যাও সখা," তাতেই ভারতের মোক্ষলাভ। একথা বলতে চান বলুন। তবে এর মধ্যে মার্কস বেচারিকে আনছেন কেন?

পূঃ। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন প্রমুখ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা তো শ্রমিকদের হাত ধরেই সখার মতো বিপ্লবের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে কি প্রলেটারীয় বিপ্লবের জাত মারা গিয়েছিল?

প্রঃ। তাহলে বলতে চাইছেন যে নীলকর সাহেবরা গ্রামাঞ্চলে কুঠি স্থাপন করেছিল অজ্ঞান অবোধ কৃষকদের হাত ধরে সখার মতো তাদেরকে কৃষি-বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য? নীলকরদের দীর্ঘকালব্যাপী অমানুষিক অত্যাচারের যেসব কাহিনী পড়ি—তার সবটাই মায়া?

পূঃ। গ্রামাঞ্চলে ক্যাপিটালিস্ট কৃষির প্রবর্তন সত্যই এক ধাপ অগ্রগতি। রামমোহন ও দ্বারকানাথ সত্যই বিশ্বাস করতেন যে, নীলচাষের ফলে জমিদার-দের দ্বারা কৃষকদের বেগার খাটিয়ে নেওয়া বন্ধ হয়েছে, দিনমজুরদের মাইনে বেড়েছে, গ্রামীণ ইকনমির 'মনিটাইজেশন' হচ্ছে, কড়ির বদলে পয়সা চালু হচ্ছে, কৃষিপদ্ধতিতে একটা বিপ্লবী পরিবর্তন এসেছে। গোড়ার দিকে তাঁদের এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল না।

প্রঃ। বাঃ! চমৎকার! আপনাদের মার্কসবাদটা দেখছি সোজাসুজি

একেবারে নীলকরদের ফ্যাকটরি থেকেই বেরিয়ে এসেছে। নীলকরেরা যা করেছিল তা জমিদারি বেগার প্রথার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি অত্যাচারী ও ঘৃণ্য বেগার প্রথা, যা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ প্রচলিত দাসত্বপ্রথারই এক ভারতীয় সংস্করণ। কৃষকদের দাসত্বের উপর স্থাপিত ক্যাপিট্যালিস্ট কৃষি! চমৎকার! রামমোহন চেয়েছিলেন ভারতকে ইংরেজের 'প্ল্যাণ্টেশ্যন কলোনি'-তে পরিণত করতে, একথা ব্রজেন শীলও স্বীকার করেছেন। কিন্তু আপনারা করেন না। কৃষকদের প্রতি রামমোহনের হৃদয়হীন মনোভাব জমিদার হিসাবে তাঁর শ্রেণীচেতনারই অভিব্যক্তি।

পূঃ। রায়তী বেগার শ্রমের উপরই নীলচাষ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কথাটা ঠিক। এ ব্যাপারে রামমোহনের আংশিক অজ্ঞতা ও অন্ধতা স্বীকার করি। তবে নীলচাষের মধ্যে তিনি একটা নূতন কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন—

প্রঃ। নূতনের সন্ধান! বাঃ! বাঃ! যেমন, জোর করে নীলজমি দেগে দেওয়া চাষীদের কয়েদ করে নীল চুক্তিতে টিপসই দেওয়ানো, শ্যামচাঁদের মাহাত্ম্য!

পূঃ। কথাটা ঐতিহাসিকের মতো হলো না। অতীতে উৎপাদন-শক্তির প্রসারের সঙ্গে নূতন নূতন অত্যাচার-পদ্ধতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল, আবার তার ভিতর দিয়েই মেহনতী মানুষ ভবিষ্যৎ মুক্তির দিকে এগিয়েছে। কেবল বিভীষিকার পাঁচালি গাইলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না। সে যাই হোক, নীলচাষের অমঙ্গলটা রামমোহনের জীবনকালে যদিও অবিদ্যমান ছিল না, রামমোহনের মৃত্যুর পরই তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল, একথাটা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। জমিদারেরা শ্রেণী হিসাবে কি নীলকরদের সপক্ষে ছিল? না, ছিল না। গোড়ার দিকের কথাই বলছিলাম, কিন্তু আপনারা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তকেই একাকার করে ফেলছেন। তারপর ওই যে বললেন, রামমোহন কৃষকদের দুঃখ বুঝতেন না, একথা ঠিক নয়। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবল সমর্থক হয়েও কৃষকদের প্রতি করুণাপরায়ণ ছিলেন—

প্রঃ। 'মহাকারুণিক রামমোহন', প্রায় গৌতম বুদ্ধের মতো, অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক, নিজে একজন পরভৃৎ জমিদার ও তেজারতি ব্যবসায়ী। কম্বিনেশ্যানটা মন্দ নয়।

পূঃ। ঠাট্টাটা ইতিহাস নয়! পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে

রামমোহন যেভাবে কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনীকে বর্ণনা করেছিলেন, তা ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে চিরস্মরণীয়। তাঁর হিউ-ম্যানিজমের যদি অন্য কোনো প্রমাণ নাও থাকত, তবে শুধু এই প্রমাণটাই যথেষ্ট বিবেচিত হত। তিনি চেয়েছিলেন আইনের দ্বারা কৃষকদের খাজনাকে কমিয়ে দেওয়া হোক—

প্রঃ। এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিলেন জমিদারদের জমাকেও আনুপাতিক ভাবে কমিয়ে দেওয়া হোক।

পূঃ। তাতে কৃষকদের কিছু ক্ষতি হত না, সরকারের ভূমিরাজস্বই কমত।

প্রঃ। আবার জমিদারদের স্বার্থরক্ষাও হত।

পূঃ। কৃষকদের খাজনা কমানোর দাবি জানিয়ে রামমোহন সমস্ত জমিদারশ্রেণীর শত্রুতা অর্জন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যটিকে আপনারা উড়িয়ে দিতে চাইছেন।

প্রঃ। তাহলে আপনারা বলতে চান পরমকারুণিক ও দেশপ্রেমিক রামমোহন কৃষকদের ও অন্যান্য ভারতবাসীর দুঃখমোচন করার জন্য এবং ভারতকে স্বাধীন করার জন্যই ভারতে ইউরোপীয়দের অবাধ অধিবাসন চেয়েছিলেন। utter nonsense!

পূঃ। দুঃখ! দুঃখমোচন! এসব কি আবোলতাবোল বকছেন! পুঁজিবাদ ছিল ভারতে সমাজবিকাশের এক উচ্চতর স্তর। পুঁজিবাদের দ্বারা মানুষের দুঃখ দূর হয় না, বরং দশগুণ বেড়ে যায়, এটাই মার্কস শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবু তো তিনি নিজেই ব্রিটিশারদের ভারত বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ইউরোপীয়দের অবাধ আগমনের ফলে শুধু কৃষিতে নয়, শিল্পেও যন্ত্রভিত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক পুঁজিবাদী বিকাশ সম্ভব হবে, এইজন্যই রামমোহন চেয়েছিলেন কোম্পানির মনোপলির অবলোপ, অবাধ বাণিজ্য ও ইউরোপীয়দের অবাধ অধিবাসন।

প্রঃ। অর্থাৎ ইংরেজরাই ভারতে শিল্পবিপ্লব ঘটাবে। অথচ বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরাও বলে, ইংরেজ ছিল ভারতীয় শিল্পায়নের ঘোরতর শত্রু, তারা ভারতকে করে রেখেছিল শস্তা কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস এবং নিজেদের কারখানাজাত মালের বাজার। যতটুকু ভারতীয় শিল্প ইংরেজ আমলে গড়ে উঠেছিল, তারও মূলে ছিল অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা, 'প্রোটেক-শানিস্ট' নীতি।

পূঃ। এসব তো ইস্কুলের ছেলেরাও জানে।

প্রঃ। কিন্তু আপনারা তাও জানেন না বলেই মনে হচ্ছে।

পূঃ। দেখুন, কতকগুলি ঢালা কথা ও পচা বুলি আওড়ালেই আর গালি-গালাজ করলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না। ভারতের শিল্পবিপ্লব মাত্র কয়েক বছর হলো শুরু হয়েছে, তাও ক্যাপিটালিস্টশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং অল্পদিনেই এমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে যে তার ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল নয়। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারেনি, এটা আমাদের ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য। আজ শিল্পবিপ্লব সাধনের নেতৃত্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। এটাই আজকের দিনের ভারতীয় রাজনীতির সারমর্ম। শিল্পবিপ্লব সাধনে বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রমিক-শ্রেণীর অংশীদার হবে (কিছুকালের জন্য) অথবা তাঁবেদার হবে (তাও কিছুকালের জন্য), ব্যালট বাক্স না বন্দুকের নল, কোনটা শক্তির উৎস—এই সব নিয়ে বিসংবাদ উত্তাল। সুতরাং ইংরেজ আমলে ভারতের শিল্পবিপ্লব সাধিত করার প্রশ্নই ওঠে না। যখন আমরা বলি, রামমোহন ছিলেন ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রবর্তক—তখন আপনারা স্বাধীনতা-যুদ্ধ, কৃষক-বিদ্রোহের কথা তোলেন; আবার প্রশ্ন তোলেন বুর্জোয়া সমাজের 'economic base' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই কি করে 'superstructure'-এ বুর্জোয়া ভাবধারার উদ্ভব হলো? ভুলে যান, ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনা আরো বহু স্থলে ঘটেছে, যেমন জার্মানিতে। যখন আমরা বলি, রামমোহন ছিলেন ভারতে শিল্পবিপ্লবের প্রবক্তা, তখন আপনারা এই অবান্তর প্রশ্ন তোলেন যে, ইংরেজ আমলে কি ভারতের শিল্পবিপ্লব সাধিত হয়েছিল? ভুলে যান যে মার্কস নিজেই বলেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যেমন এক ধ্বংসাত্মক ভূমিকা ছিল, তেমনই একটা 'regenerating role'-ও ছিল। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে দিয়ে তার এই 'regenerating role' পালন করিয়ে নেওয়া। বিদেশী মূলধন, বিদেশী উদ্যোগ, বিদেশী 'know-how'-এর অবাধ আমদানি ব্যতীত ভারতে ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন প্রবর্তিত হতে পারে না, এই ছিল রামমোহনের বিশ্বাস। বিশ্বাসটা কি ষোল-আনাই ভুল ছিল? না, ছিল না। আপনারা এটা অস্বীকার করে চরম জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছেন। ইংরেজরাই ভারতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির গোড়াপত্তন

করেছিল, আবার তার অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপও হয়েছিল। এই গোড়াপত্তনের দিক থেকেই রামমোহনের মতামতের ও ইতিহাসে তাঁর ভূমিকার বিচার করা উচিত। সেদিনকার সেই গোড়াপত্তনের সঙ্গে আজকের এই অসমাপ্ত শিল্পবিপ্লবের যে একটা নিগূঢ় 'ডায়ালেকটিক্যাল' যোগসূত্র আছে, এটা বৈজ্ঞানিকের মতো যে বুঝতে পারে, সে-ই প্রকৃত মার্কসবাদী। নীলচাষ সম্বন্ধে আপনারা শুধু রায়তের নীল দাসত্বের কথাই তোলেন। ভুলে যান যে নীলকরদের 'নিজ' নীলচাষও ছিল এবং নীল নির্মাণের কারখানাও ছিল। এদের উৎপাদন-সম্পর্ক নিঃসন্দেহেই ছিল ক্যাপিট্যালিস্ট। রামমোহনের মতামতকে ও কার্যাবলীকে আপনারা একটা 'abstract dogma'-র দ্বারা বিচার করেন, তাকে 'concretely' বিচার করেন না; তার বহিরাবরণ ভেদ করে তার ভিতরকার 'content'-কে দেখতে আপনারা অক্ষম। আপনারা বলেন, রামমোহন মুখে বলতেন বিজ্ঞান-শিক্ষা চাই, কাজে করলেন বেদান্ত প্রচার, প্রস্থানত্রয়ের স্তুতি। ভুলে যান যে রামমোহনের একেশ্বরবাদী আন্দোলনটা মূলত ছিল 'secular state' স্থাপনের ও ভারতবাসীর 'emotional integration'-এর চেষ্টা। রামমোহনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রমাণের কি অভাব আছে? রামমোহনের এই বিখ্যাত উক্তি আছে: "Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful!" তিনি চেয়েছিলেন ভারতে নাগরিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা, আইনের সমতামূলক শাসন, ধর্মবৈষম্যের অবলোপ, পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, মন্তেসকিউর নীতি অনুযায়ী সরকারী ক্ষমতাগুলির পৃথককরণ, এমন কি, চাষীদের নিয়ে গঠিত 'people's militia'—

প্রঃ। People's militia! তাহলে রামমোহন ছিলেন প্যারিস কমিউন-এরও পূর্বাচার্য?

পূঃ। Provocative question। উত্তর দেবো না।

পুস্তক-সমালোচনা প্রসঙ্গে যে বামপন্থী মহলের একটা কাল্পনিক বিতর্কের সুদীর্ঘ বিবরণ দিলাম, এই বিধিবিগর্হিত কাজের জন্য গ্রন্থকারের ও পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি। আশা করি, আমার উদ্দেশ্য তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। রামমোহন বরাবরই একজন controversial figure। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন একই রামমোহনকে নানা জনে নানা ভাবে দেখেছেন এবং

আজো দেখছেন। মোটামুটি যাঁরা নিজেদেরকে 'ঐতিহাসিক বাস্তববাদী' বলে বর্ণনা করেন, তাঁদের মধ্যেও রামমোহন সম্বন্ধে গুরুতর মতভেদ আছে। এই মতভেদের যে কাল্পনিক চিত্রটি এঁকেছি, তা বইটি পড়ে অনেক পাঠকের মনে রামমোহন সম্বন্ধে কি কি প্রশ্ন উঠতে পারে তারই একটা আন্দাজ দেওয়ার চেষ্টা। তাতেই পুস্তক-সমালোচনার কাজটা অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে বলেই বিশ্বাস করি।

আরো অনেক প্রশ্ন ও সমালোচনা রামমোহন সম্বন্ধে আছে। যেমন কেউ কেউ বলেন, রামমোহন থেকেই শুরু হলো সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে একটা 'double-talk'-এর যুগ। রামমোহনকে দেখি—একদিকে যুক্তিবাদ প্রচার করছেন, সমসাময়িক হিন্দুদের কুসংস্কার পৌত্তলিকতা ও বিচারবুদ্ধিহীন অন্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন এবং অন্যদিকে মানিকতলার বাড়িতে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর সঙ্গে তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত আছেন। অন্যরা বলেন, রামমোহনকে নিয়ে তাঁর ভক্তেরা বড়ই বাড়াবাড়ি করে থাকেন। রামমোহন ছিলেন অসামান্য তার্কিক ও 'প্যাম্ফলেটিয়ার'। যেমন তিনি হিন্দু শাস্ত্রের উপর ভর করেই রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে এই যুক্তির অবতারণা করলেন যে, ফলকামনায় সহমরণে যাওয়ার চেয়ে বিধবার পক্ষে নিষ্কাম বৈধব্যসাধনই শ্রেয়স্কর, কেননা তাতেই মোক্ষলাভ। কিন্তু ইতিহাসের উপর রামমোহনের অভিঘাত (impact) কতটুকু ছিল? অনেকের মতে সামান্যই। সতীদাহ উঠেই যেত, রামমোহন আন্দোলন না করলেও। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে রামমোহন ছিলেন আরো অনেকের মধ্যে একজন। মেকলে রামমোহনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তার কোনও প্রমাণ নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়াত্বের উপর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল ইংরেজ অবাধ বাণিজ্যবাদীরা। এ ব্যাপারে রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল শূন্য। কেউ কেউ বলেন, রামমোহনকে বলা হয় একটা যুগ্মজাতির বা মহাজাতির ('composite nationality') এবং এক সমন্বিত সভ্যতার ('synthetic civilisation') স্রষ্টা, যেমন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে অনুসরণ করে অধ্যাপক অমিয় সেনও বলেছেন। এটা তো নিছক আইডিয়ালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি! ইতিহাসের দীর্ঘকালব্যাপী ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই ওই দুটো জিনিস সৃষ্টি হতে পারে। ভারতে গত দুইশত বৎসরের ইতিহাসের ফলে তা সৃষ্ট হয়েছে কিনা সন্দেহের বিষয়। রামমোহন নিজের মাথার ভিতর থেকে জিনিস দুটিকে বের

করলেন কি করে? তিনি তো আর ব্রহ্মা বা জুপিটার ছিলেন না! এমনও শোনা যায়, সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর সমন্বয়ের জন্য রামমোহনের যে প্রচেষ্টা, তারই ফলে সৃষ্ট হলো সেই সব মানুষ যাদের দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন "শশধর, Huxley and goose"-এর খিচুড়ি।

অমিয়বাবু জীবনীগ্রন্থ বলতে সচরাচর যা বোঝায় তা লেখেননি। তিনি করতে চেয়েছেন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের মূল্যায়ন। যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ও বিসংবাদে রামমোহন লিপ্ত ছিলেন, পর পর সুবিস্তারে তার বিবরণ দিয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নে রামমোহনের মতামতগুলিকে অমিয়বাবু সযত্নে, যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে, বিস্তৃত বিশ্লেষণ সহ যতদূর সম্ভব রামমোহনের নিজেরই ভাষায় উপস্থিত করেছেন এবং সেগুলির সপক্ষে যা কিছু বলার আছে বা থাকতে পারে তা নিপুণভাবে বলেছেন। অবশেষে পৌঁছেচেন শেষ অধ্যায়ে—'Rammohun, the Father of Modern India'। এই অধ্যায়টিতেই তিনি রামমোহনকে "Representative Man" বা "প্রতিভূ মানব" রূপে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শেষ অধ্যায়টিই সমগ্র গ্রন্থের সারস্বরূপ এবং বহুলাংশে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের 'Rammohun, the Universal Man' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তিকাটির দ্বারা প্রভাবিত। সমগ্র রামমোহন-সাহিত্য মন্থন করে বইটি লিখিত। পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রন্থটির সর্বত্রই আছে। তবে অমিয়বাবুর দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ অতি-সমন্বয়বাদী এবং আইডিয়ালিস্ট। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু অতিশয়োক্তিও করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আইন সম্বন্ধে রামমোহন মেইন-এর তত্ত্ব ও অস্টিন-এর তত্ত্ব, দুটিকেই 'anticipate' করেছিলেন এবং তাদের 'সমন্বয় সাধন' করেছিলেন। এই দুটি তত্ত্ব এতই পরস্পর-বিরোধী যে স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও এই কাজ অসাধ্য ছিল। রামমোহনের ভাবধারার সঙ্গে নানক, কবীর ও দাদুর ভাবধারার মিল ছিল বটে। তিনি একাধারে ছিলেন 'জবরদস্ত মৌলবী', ইউনিটেরিয়ান খ্রীস্টান ও সগুণব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক, এটাও মানতে কোনো বাধা নেই, অবশ্য কিছুই না বুঝে। অধার্মিক লোকের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাঁকে 'Father of Modern India' বললেও আপত্তি করব না, কেননা ওটা কয়েকটি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি মাত্র—একটা নির্দোষ খেলা। কিন্তু একথা ঠিক যে মূলত তাঁর চিন্তাধারা ছিল নূতন যুগের চিন্তাধারা, পুঁজিবাদী চিন্তাধারা। এ বিষয়ে অমিয়বাবু সচেতন নন, যদিও

তাঁর বইটিতে তার যথেষ্ট পরিচয় আছে, যেমন, 'Rammohun as a Jurist' নামক অধ্যায়ে। সে যাই হোক, যদি রামমোহনের সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্ম কোনো একটিমাত্র বইয়ের নাম করতে হয় তবে নিঃসংশয়েই এই বইটির নাম করা যেতে পারে। এদিক থেকে অমিয়বাবু আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

রামমোহন সম্বন্ধে অধ্যাপক সেনের শেষ কথা এই: "His conceptions of the secular state, of emotional integration, of international relations have a vitality all their own. They live for all time!" এর সঙ্গে ভিন্নমত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রামমোহন সকল আন্তর্জাতিক বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ দেখিয়ে-ছিলেন, পাসপোর্ট প্রথা অবলোপ করতে বলেছিলেন এবং ভবিষ্যতের এক অবিচ্ছিন্ন মানবসমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটাই এই পরমাশ্চর্য পুরুষটির ভাবধারার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক। এ সবই কি ইতিহাসের জঞ্জালস্তূপেরই বৃদ্ধিসাধন করবে? কি জানি।

Raja Rammohun Roy: The Representative Man, by Amiyakumar Sen, Calcutta Text Book Society, 1967, pp. 529. Price Rs. 12·00

বাঙলা কাব্যে গদ্যরীতি ও বঙ্কিমচন্দ্র

নির্মল গুপ্ত

তেরশ উনচল্লিশ সন। আশ্বিন মাস। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলো। ভূমিকায় কবি লিখলেন, "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেননি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।"

'পুনশ্চ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা অলোড়ন পড়ে গেল। কবি স্বয়ং 'গদ্যছন্দ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, "…কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বেঁধেছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যেপদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এককালের খাতিরে অন্যকালকে অস্বীকার করা যায় না।" ('বঙ্গশ্রী' ১৩৪১ বৈশাখ)

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ১৯৩৫ মে ১৭ তারিখে লেখা চিঠিতে বললেন, "গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী বলে কল্পনা কর তাহ'লে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি সর্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে, পাথর ডিঙিয়ে ঝরণার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সে সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দেওয়া চলে।…আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে।"

উত্তর তিরিশের আধুনিক কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টি ও আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত হলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এই গদ্যরীতির প্রশংসা করে সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন, "তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্বনাশের সূত্রপাত।" ('স্বগত' ১৩৪৫), বুদ্ধদেব বসু এই গদ্যছন্দ গ্রহণ করে লিখলেন 'নতুন পাতা'।

মোটামুটি এ-রকমভাবেই বাঙলা কাব্যে গদ্যরীতি প্রবর্তনের ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে এবং উপরিলিখিত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বাঙলা কাব্যে গদ্যরীতি প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে জ্ঞানত কোনো পূর্বসূরী ছিল না। কোনো কোনো অনুসন্ধিৎসু গবেষক অবশ্য 'পুনশ্চ' বা 'লিপিকা'র আগের কালে দৃষ্টিপাত করেছেন।

'কবিতার বিচিত্র কথা'য় হরপ্রসাদ মিত্র লিখেছেন, "পদ্যই যে কাব্যের একমাত্র বাহন নয়, সে কথা নতুন নয়। ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকাতে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'কুসুম ও কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।...প্রবন্ধের পাদটীকাতে তিনি আরো জানিয়েছিলেন—'গদ্য ও পদ্যের প্রভেদ কেবল ছন্দে, যতি-স্থাপনে, ভাষা সংগঠনে বা লিপি-শরীরে, কবিত্বে ও কবিতায় নহে। গদ্য ও পদ্য উভয়ই, এ নিয়মে কবিতা বা কাব্য হইতে পারে।...গদ্য এ নিয়মানুরূপ অর্থাৎ সৌন্দর্যজ্ঞাপক ও সমুন্নত ভাবোদ্দীপক হইলে কাব্য হয়'।...এ হলো সেই ১৯১৪-র ঘটনা।...অবনীন্দ্রনাথের গদ্যবাহিত কাব্যও তিরিশের দশকের আগের ঘটনা।" (৩৭০ পৃ.)

বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে ভূদেব চৌধুরী কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অসংজ্ঞান ভাবনা'য় "গদ্যকবিতার পূর্ব সম্ভাবনা ছায়া মুকুলিত" হতে দেখেছেন। রাজকৃষ্ণ রায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'তীর্থদর্শন' পত্রিকায় 'বর্ষার মেঘ' নামে যে কবিতাটি লেখেন, তার আরম্ভ এই রকম—

"আকাশ নীল—অনন্ত নীল ;
মানবচক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্ত নীল।
দক্ষিণ দিক শোভিত দিগঙ্গনার অঙ্গুলি হতে
ধীরে ধীরে বায়ুস্রোতে
একখানি সূক্ষ্মমেঘ ভাসিয়া আসিল।"

এর পাদটীকায় রাজকৃষ্ণ লিখেছিলেন, "যে-সকল গদ্যে পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এইরূপ পদ্যপৌঙ্‌ক্তিক প্রণালীতে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নূতন অঙ্গ।" ভূদেববাবু এই মন্তব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন, "সেকালের পক্ষে এই আঙ্গিকচেতনা সত্যই বিস্ময়কর।"

কিন্তু "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। বাঙলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার আবির্ভাব এর আগেই হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ইতিহাসে উপেক্ষিত পুরুষ আর কেউ নন, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—"কবিতা পুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্যপ্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। বিষয়বিশেষে পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে; কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভাল। যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনাআপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেইস্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা একবার সং সাজিতে বসা। কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্যকবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।"

বাঙলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার এই হলো প্রথম ঘোষণা। খুবই আশ্চর্যের কথা, বঙ্কিমচন্দ্রের এদিকটি নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' প্রকাশেরও প্রায় অর্ধ শতাব্দীপূর্বে কি নির্ভুল আঙ্গিকচেতনা! রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন, "এই সহজ কথাটা বলতেই হবে, যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হলেও কাব্য, গদ্য হলেও কাব্য"—('কাব্য ও ছন্দ' ১৯৩৬), অথবা, "আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনোরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে এবং এই জন্যেই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি"—('গদ্যকাব্য' ১৯৩৯), তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপরিউদ্ধৃত বক্তব্যেরই কি প্রতিধ্বনি মেলে না? অবশ্য বঙ্কিমের

এই আত্মিকচেতনা বিস্ময়কর কিছু নয়। দার্শনিক চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রকে জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভাবিত করেছিলেন, সাহিত্যভাবনায়ও অনুরূপ প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। মিল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'Thoughts on Poetry and its varieties' প্রবন্ধে লিখেছেন—"That, however, the word 'poetry' imports something quite peculiar in its nature, something which may exist in what is called prose as well as in verse....we believe, is, and must be felt, though perhaps indistinctly, by all upon whom poetry in any of its shapes produces any impression beyond that of tickling the ear."

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' প্রকাশের প্রায় দুই দশক আগে মিল একথা লিখেছেন। মিলের এ লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের নজরে পড়েনি, একথা মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' কি রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়েনি? পড়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ এর সমালোচনাও করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের। ১২৮৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় তরুণ সমালোচক লিখেছেন—"বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন—কিছুইনা হইবে, তাহা আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

নবীন সমালোচকের সঙ্গে প্রবীণ স্রষ্টাও কিন্তু প্রায় একমত ছিলেন। 'কবিতা পুস্তক'-এর ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র আগেভাগেই জানিয়েছিলেন "অনেকে বলিবেন, এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই। সে কথায় আমার আপত্তি নাই.... এই গদ্য যেরূপ কবিত্বশূন্য, আমার পদ্যও তদ্রূপ। অতএব তুলনায় কোন ব্যাঘাত হইবে না।" আপন সৃষ্টির প্রতি বঙ্কিমের এই পরিহাস উপভোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নে তা যেন প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

'কবিতা পুস্তক'-এ বঙ্কিমচন্দ্র "কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণস্বরূপ" যে তিনটি গদ্যকবিতার সন্নিবেশ করলেন, সেগুলি হলো 'মেঘ', 'বৃষ্টি' ও 'খদ্যোত'। নিচে কবিতা তিনটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো:

[১] "আমি যখন মন্দগম্ভীর গর্জন করি, বৃক্ষসকল কম্পিত করিয়া, শিখিকুলকে নাচাইয়া, মৃদুগম্ভীর গর্জনে তখন ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালা দুলিয়া উঠে, নন্দস্থনুশীর্ষকে শিখিপুচ্ছ কাঁপিয়া উঠে, পর্বতগুহায় মুখরা প্রতিধ্বনি হাসিয়া উঠে।...

"যখন পশ্চিমগগনে, সন্ধ্যাকালে লোহিত ভাস্করাঙ্কে বিহার করিয়া স্বর্ণতরঙ্গের উপর স্বর্ণতরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করি, তখন কে না আমায় দেখিয়া ভূলে? জ্যোৎস্না-পরিপ্লুত আকাশে মন্দপবনে আরোহণ করিয়া কেমন মনোহর মূর্তি ধরিয়া আমি বিচরণ করি।...

"পৃথিবীতলে একটি পরম গুণবতী কামিনী আছে, সে আমার মনোহরণ করিয়াছে। সে পর্বতগুহায় বাস করে, তাহার নাম প্রতিধ্বনি। আমার সাড়া পাইলেই সে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করে। বোধহয়, আমায় ভালবাসে।" ('মেঘ')

[২] "পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া, মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব।" ('বৃষ্টি')

[৩] "যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষা হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে; চন্দ্র নাই, তারা নাই, আকাশের নীলিমা নাই, পৃথিবীর দীপ নাই—প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা পর্যন্ত নাই—কেবল অন্ধকার, অন্ধকার। সেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ স্পর্শ পীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসারের পরিবর্তে সংসার আর তুমি! জগতে অন্ধকার, আর মুদিত কামিনীকুসুম জলনিষেক তরুণায়িত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি।...যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার আমার নিত্যসম্বন্ধই তাঁহার ইচ্ছা, আইস, অন্ধকারই ভালবাসি। আইস, নবীন নীল কাদম্বিনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বমণ্ডলের করাল ছায়া অনুভূত করি, মেঘগর্জন শুনিয়া সর্বধ্বংসকারী কালের অবিশ্রান্ত গর্জন স্মরণ করি; বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া কালের কটাক্ষ মনে করি। মনে করি, এই সংসার ভয়ঙ্কর ক্ষণিক,—তুমি আমি ক্ষণিক,...আইস, নীরবে জ্বলিতে জ্বলিতে, অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে সকল সহ্য করি।" ('খদ্যোত')

"এই গদ্যে কোন কবিত্ব নাই" অথবা "নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন—কিছুই না"—উদ্ধৃতিগুলি সম্পর্কে এ মন্তব্য নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। "ইন্দ্রের হৃদয়ে মন্দারমালার দোলন, নন্দসূতের কেশচূড়ায় শিখিপুচ্ছের কম্পন, পর্বত-গুহায় মুখরা প্রতিধ্বনির হাসি"—এ সমস্ত কি "প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত?" রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন "সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে

দেওয়া”—এ হলো তাই। বঙ্কিম যদি লিখতেন—

“আছে গুণবতী এক কামিনী মর্ত্য আবাসে :
সে আমার মন করেছে হরণ,
গুহা গৃহে তার বাজে শ্রীচরণ,
মেঘরাগে তার বীণাখানি বাজে, চেয়ে রয় সে যে আকাশে ;
আমি তার বড় আপনার জন—
সাড়া পেলে এসে করে আলাপন,
মনে হয় যেন সে গুহাবাসিনী আমারে বড়ই ভালবাসে।”

তাহলে সে যুগের পক্ষে উত্তম কবিতা হত সন্দেহ নেই। অথবা যদি লিখতেন—

“গুণবতী কন্যা আমার মন করেছে চুরি ;
গিরিগুহার গিরিজা সে,
যখনি পায় সাড়া,
যেচে এসে আলাপ করে ;
সন্দ করি, ভালবাসে আমায়।”

তাহলে একালেও বোধকরি “মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে।”

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে যে আবেগ, যে কল্পনা এবং যে শব্দ-অবয়ব, তার দ্বিতীয়-বার দর্শন মেলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতায়। বৃষ্টি বলছে, “পৃথিবী ভাসাইব” ; নির্ঝর বলছে “আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া”। বৃষ্টি বলছে “পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব···মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব” ; নির্ঝর বলছে—

“শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।”

বৃষ্টির উল্লাস “তরঙ্গের পর তরঙ্গ মারিয়া”, নির্ঝরের আনন্দ “লহরীর পরে লহরী তুলিয়া।”

কেমন করে বলি, এ গদ্য কবিত্বশূন্য ?

‘খদ্যোত’-এর উদ্ধৃতাংশকে চরণান্তিক মিল ও পদ্যছন্দ সহযোগে রূপান্তরিত করলে প্রথাবদ্ধ পাঠকের কাছেও এর কাব্যগুণ ধরা পড়বে —

“যবে জগৎ রয়েছে নিশীথ মেঘের আচ্ছাদনে,
থেকে থেকে ঝরে বাদলের ধারা,

আকাশ হয়েছে চাঁদ-তারা-হারা,
নীলিমা তাহার হারাল চন্দ্র তারার সনে,
আকাশের দীপ নিভে গেল সব, মাটিতে প্রদীপ জ্বলেনা আর,
কোথা সুন্দর বিকচ কুসুম? অন্ধকার, অন্ধকার। ...
সেই রৌদ্রতপ্ত দীপ্ত রুক্ষ স্পর্শকাতর পৃথিবী নয়,
নয় কঠোর শব্দে শব্দায়মান অসহ্য সংসার,
আছে রহস্যময়ী সংসার আর তুমি, আর আছে অন্ধকার,
আঁধারের বুকে ঝরিতেছে জল মধুর কোমল শব্দময়।
কামিনী-কলিকা অভিষেক ঘট সিঞ্চন করে বারি,
সুরভিস্নিগ্ধ সজল পরশে
তরুণায়িত বৃক্ষ হরষে,
আপনাকে তুমি দাও প্রসারিয়া পাতায় পাতায় তা'রি।...

এসো, ভালবাসি আঁধার—মোদের নিত্যকালের সঙ্গী.
হেরি কাদম্বিনীর নবনীল কায়া
অনুভবে আনি সে করাল ছায়া—
অসীম জগৎ বিশ্বের মাঝে হেরি সে ভীষণ ভঙ্গী।
মেঘগর্জনে সর্বধ্বংসী কালগর্জন স্মরি,
বিদ্যুদ্দামে কটাক্ষ তার,
ভীষণ ক্ষণিক এই সংসার,
অনেক জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে নীরবে সহ্য করি।

—এই পদ্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল রচনাকেই পদ্যছন্দে দোলায়িত করা হয়েছে। উভয়ত একই বাক্‌বিভূতি, একই রূপকল্প, একই কল্পনা-আবেগ। লক্ষণীয় এই যে, বঙ্কিম পদ্যছন্দ বর্জন করেছেন এবং টানা লাইনে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'ও টানা লাইনে লেখা। লাইন না ভেঙে লিখলে গদ্যকবিতার কাব্যত্ব নিশ্চয় ব্যাহত হয় না! রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"এই জাতের কবিতায় গদ্যকে কাব্য হতে হবে।" সাম্প্রতিক কালের কোনো কোনো গদ্যকবিতাও টানা লাইনে লেখা হয়েছে।

মনে হয়, স্ব-কালের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। তাই

"কাব্যের গদ্যের উপযোগিতার উদাহরণ" স্বরূপ তিনটি গদ্যকবিতার এই নমুনা প্রদর্শনী সেকালে কোনো কবিকে আকৃষ্ট করতে পারল না—বঙ্কিমের স্নেহভাজন তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকেও নয়। কাব্যে গদ্যরীতির প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূর্তি "the beautiful and ineffectual angel heating in the void his luminous wings in vain"—এরই মতো গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু নিঃসঙ্গ করুণ। এক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতা আরো মর্মান্তিক এই কারণে যে, গদ্যরীতির এই দেবশিশুর আঁতুড়েই মৃত্যু ঘটল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই কীর্তি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল।

গদ্যকাব্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করতে পারেন নি। হয়তো বিস্মরণই এর জন্য দায়ী। অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের তরুণমন যাকে অকিঞ্চিৎকর বলে বর্জন করেছিল, তা তাঁর মন থেকে ক্রমশ মুছে গিয়েছিল এবং পরিণত বয়সে তিনি তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

কিন্তু আজও কি বঙ্কিমচন্দ্রের এই কীর্তি বিস্মৃত থাকবে?

শিশুসাহিত্য ও বর্তমান বাঙলাদেশ

শিবানী রায়চৌধুরী

শিশুসাহিত্যের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন আমি করতে বসিনি। তার ত্রুটিবিচ্যুতির তালিকা করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তবে, যে-মানসিক প্রস্তুতি ও মৌলিক-গুণ শিশুসাহিত্যে নিহিত—তা খুঁজে দেখার বাসনা আছে। অপ্রিয়ভাষণ হলেও বলি—সমস্ত লেখাই যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি ছোটদের জন্যে লিখলেই তা সবসময় শিশুসাহিত্য হয়ে ওঠে না। একথা শিশুসাহিত্যের 'অক্লান্ত সেবক'দের একবার বোঝা দরকার। বর্তমান বাঙলাদেশে শিশুসাহিত্যের ভাগ্য প্রায় "ঘোলা জলের ডোবার মতো"। বিশুদ্ধ, সরল ও সাবলীল লেখা নির্ভেজাল শিশুপথ্যের মতোই দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বাঙলাদেশে এমন একটা সময় ছিল, যখন শিশুসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটাতে গুণীজনের অভাব হয়নি। পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা জন্মেছেন. তাঁদের ভাগ্যকে ঈর্ষা করি। ছোটবেলায় তাঁরা একই সঙ্গে পেয়েছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, দক্ষিণারঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ আর বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবারের অফুরন্ত দাক্ষিণ্য। তারপর বাঙলাদেশে অনেক পালাবদল হয়েছে। আমরা ঘরে ঘরে রেডিও কিনেছি, পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা হল বসেছে, আমাদের অনেকের ছেলেমেয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বসে আইসক্রিম খেতে পাচ্ছে, রাস্তার দুধারে ছবির বইয়ের ছড়াছড়ি। এসবের মধ্যে সেই উজ্জ্বল স্বতন্ত্র সাহিত্য-ধারাটি হারিয়ে গেছে—যার স্বপ্নে বহু বাঙালি পাঠকের ছেলেবেলা মধুর হয়ে আছে। আমরা এই পূর্বসূরীদের স্মরণ করেই শিশুসাহিত্যকে চরিতার্থ করছি। এর পদস্খলনের পশ্চাৎপট একবার উন্মোচন করা প্রয়োজন। অনেকেই হয়তো বলবেন, সময়ে সবকিছুরই বিবর্তন স্বাভাবিক। সাহিত্যই বা বাদ যাবে কেন? বিবর্তন যখন উৎকর্ষের দিকে যায় না, তখনই সংশয় জাগে। বাঙলা শিশুসাহিত্য আজ সেই দ্বিধার সম্মুখীন।

সাহিত্য থেকে আলাদা হয়ে শিশুসাহিত্য অনাথ জীবন যাপন করে না। শিশুসাহিত্য চিরকালীন সাহিত্যেরই অংশ, সেই অর্থে সমালোচনার তুলাদণ্ডে বিচার দরকার। কালোত্তীর্ণ সাহিত্য বা 'ক্লাসিক'-এর বিচারে আমরা যে-মৌলিক নীতি মেনে চলি, শিশুসাহিত্য-বিচারেও তাই মেনে চলতে হবে।

ছোটদের জন্যে লেখার সবচাইতে বড়কথা ছোটরা কি পড়তে চায় আর কেন

পড়তে চায় তা ভালো করে জানা। শিশুসাহিত্যের লেখক শিশুরা নয়। তাই তারা নিজেদের চাহিদা নিজেরা মেটাতে পারে না। লেখকের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানেই লেখকের ক্ষমতা ও দক্ষতা ধরা পড়ে। লেখক কতটা পাঠকের কাছাকাছি আসতে পারেন তার ওপর তাঁর সাফল্যের ভিত্তি তৈরি হয়। এখানে পাঠক ও লেখকের মানসিক দূরত্ব শুধু বয়সের দূরত্বে নয়, দু-জগতের দূরত্বে। এই দু-জগতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে শিশুসাহিত্যের অকালমৃত্যু ঘটে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। অনেকেই হয়তো ভাবেন, সহজ করে লিখলেই শিশুসাহিত্য হয়। কিন্তু শুধুমাত্র ভাষার সারল্যই শিশুসাহিত্যে কাম্য নয়, বিষয়-বৈচিত্র্য ও কল্পনাশক্তির সজীবতাই অভিপ্রেয়। ছোটদের জগতের সঙ্গে লেখকের পরিচয় থাকা একান্তই প্রয়োজন। তাদের জগত বড়দের জগত থেকে আলাদা, জীবন-বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও তাদের মাননির্ণয় আলাদা। তাদের সমস্যা বড়দের তুলনায় সরল। এ বিষয়ে লেখককে সচেতন হতে হবে। অথচ সাবালক সাহিত্যে এ অসুবিধা দেখি না, লেখক সহজেই পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। শিশুসাহিত্যের লেখক তাঁর পাঠকের জগতে যদি নিজেকে নিয়ে আসতে পারেন, তবেই তারা কি চায় আর কেন চায় তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ছোটরা যা পড়তে চায় না তা তাকে পড়তে বাধ্য করতে পারে এমন কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই। এই শিশুপাঠকরা সবসময়েই খুব দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ বাঁচিয়ে চলে। এ ব্যাপারে তাদের বিচারবুদ্ধি কদাচিৎ যুক্তি মেনে চলে। তাই তারা অনেক সময়েই বলতে পারে না কেন কোনো একটা বই তাদের বারবার পড়তে ইচ্ছে করে, আবার কোনো বই একেবারে খুলে দেখতেই ইচ্ছে করে না। তাদের পছন্দ একটা বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়ার ওপর নির্ভর করে। যে আনন্দের কোনো সংজ্ঞা নেই। সেইজন্যে খুব জোরগলায় ছোটদের পছন্দ-অপছন্দ বলা শক্ত। তবে নীরস ও অসার্থক লেখা ছোটরা পড়তে চায় না। লুই ক্যারল-এর এ্যালিস-এর গল্পে, অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল'-এ, কি উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির গল্প'-এ শিশুরা কেন বিভোর হলো এ কথা ভেবে দেখতে হয়। এই সব লেখায় একধরনের যাদু আছে, এই যাদুমন্ত্রে শিশুপাঠকেরা সম্মোহিত হয়। হ্যামেলিন-এর বাঁশিওয়ালার মতো লেখক তাদের ভুলিয়ে নিয়ে চলেন। গল্পের সঙ্গে পাঠকের স্বপ্ন একাকার হয়ে যায়। লেখকের গল্পবলার ভঙ্গিতে, ঘটনাসৃষ্টির ক্ষমতায়, বর্ণনার চিত্রগুণে ও কল্পনার

মৌলিকতায় এই ইন্দ্রজাল জন্ম নেয়। এক-একটি সর্থিক শিশুসাহিত্য সম্ভব হয়।

শিশুসাহিত্যের ভালো লেখক মাত্রেরই সব সময়েই কিছু বলার থাকে। তাঁর বলার ভঙ্গি বিভিন্ন হতে বাধা নেই—রূপকথার ঐশ্বর্যেই বলুন, সাদাসিধে ঘরোয়া ভাবেই বলুন, কি হাস্য-কৌতুক-ব্যঙ্গের আড়ালে লিখুন—লেখকের দুষ্প্রাপ্য প্রকাশভঙ্গির 'লাবণ্যগুণ'ই তাঁর লেখাকে স্মরণীয় করে রাখবে। বিস্মৃতপ্রায় ছোটবেলার অসহ্য আনন্দ, অবর্ণনীয় সুখ-দুঃখ-ভয়-বেদনা মনে রাখতে পারার ক্ষমতা শিশুসাহিত্য রচনার একটি বড় সম্পদ। মুহূর্তের এক ঝলক আলোয় লেখক যদি অনুভব করতে পারেন সেই অল্পবয়সে প্রথম খরগোশ দেখার আনন্দ, কি চৈত্রের ঝড়ে আমবনের উল্লাস—তবে সে লেখক আমাদের 'পথের পাঁচালী' উপহার দিতে পারেন।

মনের মতো বই হলে ছোটরা পড়তে ভালোবাসে। একবার তারা ছাপার অক্ষরে আনন্দ পেলে বুঝতে পারে এ-এক ধরনের দুর্লভ অভিজ্ঞতা—যা অন্য কোনোভাবে পাওয়া অসম্ভব। তাদের সীমিত গণ্ডীর বেড়া ডিঙিয়ে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে আসার উত্তেজনা তো কম নয়! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠে ছুটে চলা, সাগরের দুশো হাজার লীগ তলার রহস্যভেদ, কি 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর স্বপ্ন বই ছাড়া আর কোথায় মিলবে? এই সব রচনা ছোটদের কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করে। শৈশবকে যদি গড়ে ওঠার সময় বলে মনে করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে ছোটরা সবসময়েই মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন খোঁজে। এর অভাব হলে তারা বই পড়তে চায় না। বইতে আনন্দ না পেলে তখন অন্য কোনো মাধ্যমের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। তাই ছোটবেলার পড়া-টাকে আনন্দময় করে তুলতে হবে। এই বই পড়ার আনন্দ তাকে সারাজীবন পড়তে সাহায্য করবে।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, সুস্পষ্ট কাহিনী, নিখুঁত শব্দচয়ন ও কল্পনার সজীবতা শিশুসাহিত্য রচনায় উল্লেখযোগ্য উপাদান। কাহিনীর অস্পষ্টতা, ঘটনার জটিলতা ও একাধিক অপরিচিত শব্দের ব্যবহার ছোটদের মনকে ভারাক্রান্ত করে। বইপড়া আনন্দময় না হয়ে বিভীষিকা হয়ে ওঠে। আমাদের পাঠ্যবই-গুলি অনেক সময়েই এই কারণে ছোটদের মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। 'শিশুপাঠ' লেখা ব্যর্থ হয় 'নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডী' লিখতে পারি না বলে।

আমরা অনেক সময়েই জানি না ছোটদের একটা নিজস্ব ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গি আছে। এই ভাষা ও ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে লেখক উৎকৃষ্ট

শিশুসাহিত্য রচনা করতে পারেন না। শিশুসাহিত্য ছোটদের মনের ভাষাতেই লেখা হলে শিশুপাঠক ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অপরিচয়ের দূরত্ব থাকে না। বাঙলা শিশুসাহিত্যে এই গুণটির অধিকারী খুব কম লেখকই। যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায় ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় লেখক ছাড়া একমাত্র লীলা মজুমদারই এই বালভাষণে সিদ্ধ। এত বলশালী বালক-জনোচিত ভাষা লীলা মজুমদারের পর বাঙলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নি।

বর্ণনার চিত্রগুণ শিশুসাহিত্যের আর-একটি বড় লক্ষণ। এমনিতেই ছোটদের বইয়ে ছবির বাহুল্য আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। ছোটরা চোখে দেখেই বেশি আনন্দ পায়। মানসিক তৃপ্তির চেয়ে দৃষ্টিসুখ শিশুপাঠকদের বেশি মুগ্ধ করে। কিন্তু লেখকের বর্ণনার গুণে যদি সমস্ত ছবিটি পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তবে সে-কাহিনী পাঠকের মনে অভিজ্ঞান হয়ে থাকে। বর্ণনার এই সম্মোহন-ক্ষমতার একটি উদাহরণ এখানে তুলে দিলাম: "ঝুর ঝুর করে মোমলতার ফুল ঝরে পড়ছে, তাই দেখে ছেলেটা আহ্লাদে আটখানা। মুঠো মুঠো তুলে মুখে পুরতে চায়! শিমুগাছে দলে দলে বুনো হাঁস এসে বসেছে, দেখে মনে হয় বুঝি বড় বড় সাদা ফুলে গাছ ভরে গেছে। তাই দেখে খিল খিল করে ছেলেটা হেসে ওঠে। অমনি যেন নিশানা পেয়ে হাসের ঝাঁক একসঙ্গে আকাশে উড়ে পড়ে। আকাশের দিকে দুই হাত তুলে ছেলেটা কাঁদতে থাকে।" ('হলদে পাখীর পালক': লীলা মজুমদার)

কৌতুক বা হাস্যরস শিশুসাহিত্যের একটি মুখ্য উপাদান। শিশুসাহিত্যে বিশুদ্ধ হাস্যরসই প্রার্থনীয়, ভাঁড়ামি বা জোর করে হাসানোর প্রচেষ্টা নয়। অতি সামান্য ঘটনাতেও সক্ষম লেখক হাসির আভাস লাগাতে পারেন। যেমন সুকুমার রায়ের হুলো বেড়ালের মনোবেদনা বর্ণনা:

"গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্ করে নিভে গেল বুক ভরা আশা।"

সুকুমার রায় বাঙলাসাহিত্যে অনন্য হাস্যরসিক। তাঁর সুযোগ্য উত্তরসাধক এখনো অদৃষ্ট।

দুই

বর্তমান বাঙলাদেশে শিশুসাহিত্য আয়তনে অনেক বেড়েছে, উপাদানের বৈচিত্র্যে, সংখ্যার প্রাচুর্যে, রূপায়ণের সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার মান

নিম্নমুখী। বাঙলা শিশুসাহিত্য যেন প্রেমেন্দ্র-শিবরাম-লীলা মজুমদারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই পূর্বসূরী লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এঁদের রচনা পাঠকসমাজ উপভোগ করেছেন ও করছেন। 'ঘনাদা' ও 'পদিপিশি'র আবির্ভাব বাঙলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে আলোড়ন-কারী ঘটনা। এই মুষ্টিমেয় প্রবীণ লেখকগোষ্ঠীকে বাদ দিলে বাঙলাদেশে শিশু-সাহিত্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা কি একবার ভেবে দেখা দরকার। কালোত্তীর্ণ সাহিত্য আমরা সর্বদা আশা করি না, কিন্তু আপাত চলনসই লেখাও দুর্লভ। আজকাল যেসব বই শিশুসাহিত্যের বাজার আলো করে আছে—সেগুলির সমাদরের কারণ সাহিত্যগুণ নয়, চিত্রগুণ। ছড়া, কবিতা, গল্প প্রায় কোনোটাই রসোত্তীর্ণ হয় না। বিশুদ্ধ ন্যাকামির রকমফের মাত্র অক্ষম লেখকের সাহিত্যকীর্তিতে পূর্ণ। সম্ভবত অতি-আধুনিক প্রেমকাহিনী লিখতে যাদের বিবেকে বাধে, তাঁদেরই কেউ কেউ শিশুসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরান। ভাবেন, ছোটদের জন্যে লেখা খুবই সহজ ব্যাপার। তাই তাঁদের নিষ্ঠাও থাকে না। সাহিত্যসেবীদের এই নিষ্ঠার অভাব শিশুসাহিত্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে।

শিশুসাহিত্য আজ নানা "নীতি ও জ্ঞানে" সমৃদ্ধ। সমাজসংস্কার, ভ্রমণ, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে নিমজ্জিত। মনে হয়—শিশুরা আর শিশু নেই, নিতান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের জন্যেই জন্মেছে: ছোটবেলার মন্থর দিনগুলো রূপকথা, ছড়া কি কৌতুক-কাহিনী শোনার দিন নয়। যুগটা যখন কর্মব্যস্ত ও বৈজ্ঞানিক, তখন তাদের "যুগোপযোগী" করে তোলাই কি আমাদের কাম্য? শিশু ও শিশুসাহিত্যের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে আমাদের শিশুসাহিত্য বিভ্রান্ত।

তবে দু-একটি ভালো লেখা যে গত কয়েক বছরে দেখিনি—এ কথা বললে ভুল হবে। সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা 'প্রফেশর শঙ্কু'র গল্প বাঙলা কিশোর সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'র গল্পের পর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর আপাত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সূক্ষ্ম হাস্যরসের ব্যবহার প্রশংসার দাবি রাখে। সত্যজিৎ-কৃত লিয়র-এর ছড়ার অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। এখানে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ আছে। সত্যজিতের ক্ষমতার খুব সামান্য অংশই সাহিত্যে নিয়োজিত হওয়ায় তাঁর পাঠকেরা ক্ষুধিত।

কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের 'চুহুলিকা'র গল্প রবীন্দ্রনাথের 'পুপেদিদি'র কথা মনে করিয়ে দেয়। কয়েকটি পুরনো গল্প এখানে নতুন করে বলা হয়েছে। গল্পবলার পরিচ্ছন্ন ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে বইটি সমৃদ্ধ। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাঘের ভয়ে' গল্পটির বিষয়বস্তু ও ঘটনাচক্রের অভিনবত্ব অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু গল্পবলার ভঙ্গি মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর মনে হয়। লেখার ভঙ্গি একটু সরস ও ঘটনার জাল সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হত। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ববির বন্ধু'তে যে উজ্জ্বল সাহিত্যকীর্তির স্বাক্ষর পাই, পরবর্তী লেখাগুলিতে তিনি সে-মান অক্ষুন্ন রাখতে পারেন নি। 'ববির বন্ধু'র লেখিকার সরস সরল ভঙ্গি, পশুপক্ষীর জীবন্ত চরিত্র রচনা আর জীবজন্তুর ওপর গভীর মমতাবোধ বাঙলাসাহিত্যে বিরল। 'হনু মানুষ' আর 'পিকলুর সেই ছোটকা'র মধ্যে দ্বিতীয় রচনাটির কিশোর চিত্তজয়ের অধিকতর ক্ষমতা আছে। সুখপাঠ্য কাহিনী হিসেবে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ল্যাম্পপোস্টে বেলুন' ও প্রসূন বসুর 'লাল্লু মহারাজ'-এর উল্লেখ করছি। এখানে আর-একজন লেখিকার কথা বলি। গৌরী চৌধুরী কোনো বিখ্যাত নাম নয়, কিন্তু আশা করি কিছু শিশু পাঠকের কাছে তিনি সুপরিচিত। তাঁর লেখা লাবণ্যগুণে ও শব্দচয়নে উৎকৃষ্ট।

মাত্র কয়েকজন লেখকের সম্পর্কে আলোচনাই সম্ভব হলো। প্রত্যেক বছর যে-পরিমাণে বই ছাপা হচ্ছে, সে সমস্ত বইয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে ওঠা অসম্ভব। সেই দিক থেকে দেখলে হয়তো কোনো উল্লেখযোগ্য রচনার আলোচনা এখানে অনুপস্থিত। ক্ষমতাবান লেখক নেই এ কথা বলা ভুল হবে। তবে অভিযোগ এই যে তাঁরা প্রয়োজনের তুলনায় কম লেখেন। এছাড়া বাঙলা শিশুসাহিত্যের বহুমুখী ধারার অনেকগুলোই প্রায় অবলুপ্ত। শিশুসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক দৈনিকপত্রের শিশুবিভাগ কি শিশুপত্রিকা। ভালো পত্রিকা নেই বললেই চলে। পাঠযোগ্য পত্রিকা মাত্র দুটি কি একটি। তাও তারা একটি নির্দিষ্ট মান অনেকসময়েই অক্ষুন্ন রাখতে পারে না। আর দৈনিক পত্রিকার শিশুবিভাগের একমাত্র সাহিত্যকর্ম জন্মদিন-মৃত্যুদিন ও দোলদুর্গোৎসব পালন। অথচ শিশুসাহিত্যকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে। এ বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে অনুরোধ করি।

ছোটদের বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের অভিভাবকদের। তাই ছোটদের রুচি-বিকাশের আগে তাঁদের রুচি-বিকাশ হওয়া দরকার।

তারা যদি শিশুসাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা দেন আর ছোটদের মানসিক বিকাশে নজর দেন, তাহলেই এটা সম্ভব। কিছু আধুনিক বাবা-মায়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শেখানোর শখ প্রবল হয়ে উঠেছে। ছোটবেলায় বেশি বাঙলা শিখে ফেললে পাছে ইংরেজি অবহেলিত হয়, তাই তারা অনেকে বাঙলা বই ছোটদের হাতে তুলে দিতে সাহস পান না। ছবির বই Picture Books) আর Comics ইত্যাদির মধ্যে সাহিত্যরসকে সীমিত রাখেন এর অবশ্যম্ভাবী ফল—শিশুসাহিত্যের বাজারে ক্রেতার অভাব, আর অন্যদিকে ছোটদের পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়া। প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ছোটদের আনন্দবর্ধনের অনেক আয়োজন হয়েছে। বই না পড়ে রেডিও শুনে কি সিনেমা দেখে তাদের গল্পের সঙ্গে পরিচয় হয়। শিশুসাহিত্যের একটা অংশ—যেমন ছড়া, রূপকথা ইত্যাদি—মুখে মুখেই তৈরি হয়েছে, লোকসাহিত্যের মতো একটা পুরো জাতি মিলেই হয়তো তৈরি করেছে। এদিকটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন সাধারণত ঠাকুমা-দিদিমার কাছে ছড়া কি ঘুমপাড়ানী গান শোনা আমাদের ছেলেমেয়েদের কপালে নেই। তাঁরা নানা কাজে ব্যস্ত। এইভাবে গল্প না শুনে, বই না পড়ে, আজকের ছেলেমেয়েরা অমনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী তো আমরাই।

আমরা লেখকদের অক্ষমতা দেখছি, কিন্তু তাঁদের অসুবিধাও অনেক। শিশুসাহিত্যের লেখক তাঁর বইয়ের প্রকাশক পান না। কারণ ছোটদের বইয়ের ক্রেতার অভাব। শিশুপত্রিকাগুলির একই অভিযোগ। তারাও আর্থিক বিপর্যয়ে পীড়িত। এর ফলে লেখকদের নৈরাশ্য। নিরাশ লেখক শিশুদের আর কত আনন্দ দিতে পারবেন! বিদেশেও শিশুসাহিত্যের মান নিম্নমুখী। কিন্তু সেখানে প্রকাশকেরও আর্থিক আনুকূল্যের সুযোগ আছে। লেখকরা আশা করি তৃপ্ত। নানা বৈচিত্র্যে তাঁদের শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ। তাঁদের বইয়ের অঙ্গসজ্জা আমাদের শিশুদের কাছে বিস্ময়।

সবশেষে বলি—শিশুসাহিত্য একটা পুরো জাতির সহযোগিতায় সৃষ্টি হয়। এর সমস্যা আমাদের সামাজিক শিক্ষার সমস্যা। শিশুকে যদি জাতির অঙ্কুর হিসেবে ধরি, তবে এই চরম অবহেলার কোনো কারণ দেখি না। এ-বিষয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সাহায্য কি আশা করা যেতে পারে না? এখানে হয়তো অনেকে পুরস্কারের কথা বলবেন। কিন্তু পুরস্কারের লোভে কোনো ভালো সাহিত্য রচিত হয় না। পুরস্কার কোনো-এক বিশেষ ব্যক্তি কি বিশেষ গোষ্ঠীকে তুষ্ট করতে পারে, পুরো সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করতে পারে না।

রাজ্য এবং কেন্দ্র, না কেন্দ্র বনাম রাজ্য

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

কেউ দেখতে পান আগে থেকে। কেউ পান না। কিন্তু, মোটের ওপর, ইতিহাস এমনি করেই গড়ায়। গড়ে ওঠে। পরশু যা ছিল নিতান্তই বিশেষজ্ঞদের কূটতর্কের বিষয়, কাল তা হয়ে উঠল বহু মানুষের মতামত-মতভেদের বস্তু। আজ সকালে দেখা গেল বুঝ-অবুঝ অনেক মানুষ—বেশির ভাগ মানুষ—তা নিয়ে উত্তেজিত, উদ্বেলিত, আন্দোলিত। দেশ ও জাতির ভাগ্য-ভবিষ্যত নির্ণীত হচ্ছে ঐ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে—কিংবা, হয়তো—উপলক্ষ করে।

বছর বারো-পনেরো আগেও ভারতবর্ষের সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি ছিল এমনি একটি প্রশ্ন। তারপর ঘটল "কেরালা"। বিধানসভায় কমিউনিস্ট দলের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তবু তাঁদের বার করে দেওয়া হলো সরকারী বাড়ি থেকে। ক্ষমতা-দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হলো তাঁদের হাত থেকে। নিলেন কেন্দ্রীয় সরকার। একটা অজুহাত অবশ্য ছিল: "বিশৃঙ্খলা"। বলা হলো এইটেই সংবিধান। মুহূর্তে প্রশ্নটি বিশেষজ্ঞদের মেধা-বিধৃত-অবকাশ-আসর থেকে নেমে এলো বহু-মানুষের ভিড়ে। মতামত-মতভেদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আজকের ভারতবর্ষে প্রশ্নটি আর নিছক মতামত-মতভেদের মধুরকষায় অবস্থাতেও নেই। ঘনঘন ক্রোধ আর ঘৃণা, চ্যালেঞ্জ ও সংঘাতের উৎস ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সময়ের মাপকাঠিতে বিচার করলে বলা যায়, স্পষ্ট করে এমনটি ঘটছে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ঠিক পর থেকেই। আর ঐসব বোধ ও বৃত্তিগুলিকে ক্রমাগত ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন দিল্লীর কেউ কেউ—অনেকেই—কেউ অজ্ঞতা থেকে, আর বেশির ভাগই অভিসন্ধি থেকে। কিন্তু সেকথা পরে।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। ইদানিং অনেকেই চাইছেন বহু-কেন্দ্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারত-কেন্দ্রের বিকাশ। অন্য কেউ কেউ বলছেন, ঐক্যের জন্যে কেন্দ্রিকতা। অর্থাৎ, দিল্লী থেকে ছিটিয়ে দেওয়া হবে ঐক্যের গঙ্গাজল। ওমনি গলাজড়াজড়ি করে হিন্দু কোরাণ মাথায় নিয়ে, মুসলমান গীতা বগলে করে, তামিলভাষী হিন্দী গান গেয়ে, হিন্দী-ভাষী তামিল সাহিত্য পড়ে,- শিবসেনা-লাচিতসেনা-বিজয়সেনাসহ যাবতীয়

ভারতীয় একতার তাথৈ তাথৈ নৃত্যে একটা তুলকালাম কাণ্ড লাগিয়ে দেবে। তুলকালাম কাণ্ড চলছে ঠিকই। কিন্তু ঐক্যের নয়, আর যা-ই হোক। আসলে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধারণা এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সম্পর্ক ও ক্ষমতার ব্যাপারটা নিয়েই টানাটানি। তাইতেই এমন সব ভাব-ভাবনার উদ্ভট জন্ম। দিনকয়েক আগে জনসংঘের একজন নেতা অভিযোগ করেছেন, কমিউ-নিস্টরা ভয়ানক পাজি। ওরা ভারতবর্ষকে মাল্টিন্যাশনাল দেশ বলে মনে করে। চ্যবনসাহেবের ধ্যানধারণাও অনেকটা এই রকম। তা হোক। আমাদের সংবিধানের ধারণাটা কি?

গতবছর শরতকালে এদেশের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও সংবিধান-বিশারদ শ্রীগজেন্দ্র গাদকার ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটুট অব সায়ান্স-এ একটি ভাষণ দেন। টাটা লেকচার। বিষয় ছিল: দ্য ইম্পারেটিভস অব ইণ্ডিয়ান ফেডেরালিজম। শ্রীগজেন্দ্র গাদকার কিছুটা আইনজ্ঞের, খানিকটা গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার গাঢ় স্বচ্ছতা ও বিশ্লেষণের চমৎকারিত্বের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। কিন্তু, উল্লেখযোগ্য, প্রায়-নিরপেক্ষ বিচারক হিসেবে তিনি গুটিকয়েক মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে ধরেছেন এবং কয়েকটি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন।

দুটি অভিজ্ঞতা: মার্কিন ও সোভিয়েত

ভারতবর্ষকে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্র। যুক্ত রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র দু-ভাবে গড়ে উঠতে পারে। অনেকগুলি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান মেনে নিয়ে, অথচ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, একটি রাষ্ট্রে মিলিত হতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায় কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। আবার উল্টোদিক থেকেও হতে পারে। একটি কেন্দ্রের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে, কেন্দ্রীয় অনুশাসনের অধীনে কিন্তু স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে, মিলিত হতে পারে। যেমনটি ঘটেছে ভারতবর্ষে। যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র প্রধানত নির্ভর করে কর্মে ও কথায় কতটুকু কেন্দ্রিকতা আর কতটুকু বিকেন্দ্রিকতা থাকবে তার ওপর। কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছে—এক থেকে বহু বা বহু থেকে এক-এর সূত্রে—তার ওপর নয়। আবার কেন্দ্রিকতা-বিকেন্দ্রিকতার সমস্যাটি অর্থনীতি-সমাজনীতি ও শ্রেণীনিরপেক্ষ নিছক সাংবিধানিক ব্যাপারও নয়। একটি উদাহরণ। বহু থেকে এক-এর সূত্রে গড়ে

উঠেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাজ্যগুলির পৃথক ও নিজস্ব সংবিধান, নিজস্ব মিলিশিয়া, নিজস্ব নাগরিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র তথা ইউনিটগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু যখন এসব ঘটে, তখন দেশটা ছিল পশ্চাৎপদ, কৃষিপ্রধান ও অনুন্নত। দিন কাটল। যুগ কাটল। শিল্পপ্রধান অতি-উন্নত পরিবর্তিত অর্থনীতি সমাজটাকেও দিল বদলে। মনোপলির পাল্লায় পড়ল সমাজ। নব্বইটি পরিবারের হাতে বেশিরভাগ উৎপাদন-সামগ্রী। তারা দাবি করতে আরম্ভ করল: এভাবে ব্যবসা চলে না, আর ব্যবসা না চললে দেশ এগোবে না, অতএব কেন্দ্র হস্তক্ষেপে করে সব রাজ্যে একই ধরনের আইন-কানুন গড়ে দিক। রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র, তাদের আইনও ভিন্ন ভিন্ন। আর তার ফলে সব রাজ্যে সমানভাবে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা যায় না। এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলটা কি হলো? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণরা আজ যেমন "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের" জন্যে লড়ছেন, তেমনি পাকাচুল বিশেষজ্ঞের দলও অভিযোগ করতে শুরু করেছেন: দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র আর বজায় থাকছে না। এককেন্দ্রিকতার প্রবল ঝোঁক সংবিধানের আসল সত্তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আসলে মার্কিন রাজনীতির কর্তারা—তা তাঁরা রিপাবলিকান কিংবা ডেমোক্রাট যা-ই হোন না কেন—ওই নব্বইটি পরিবারের আঙুল কোন দিকে নড়ছে, সেদিকে চোখ রেখেই দেশটাকে চালান। অতএব, "আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র" মার্কিন দেশেও এককেন্দ্রিকতার প্রেত। কাজেই প্রশ্নটি অর্থনীতি-সমাজনীতি-শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। অথচ মার্কিন দেশে আক্ষরিকভাবে সংবিধান মোটেই বদলায় নি বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না, যদিও ব্যবহারে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। যুক্তরাষ্ট্র বহু থেকে একের সূত্রেই গড়ে উঠেছিল। তবু এমনটি ঘটছে। ইতিহাসের নির্বন্ধ: এমনটি ঘটতে বাধ্য। অথচ অন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে একেবারে ভিন্ন চিত্র। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র। ক্ষমতা সেখানে ক্রমশ বেশি বেশি করে বিকেন্দ্রীভূত হচ্ছে। নেশনগুলির সুপরিকল্পিত ও স্বতন্ত্র বিকাশ ঘটছে। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র ক্রমাগত পরিস্ফুট হচ্ছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রটি এক থেকে বহুর সূত্রেই গড়ে উঠেছিল। জারের সাম্রাজ্যের ভস্ম থেকে একটি বহু-জাতিভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। কোন মন্ত্রে এমনটি ঘটা সম্ভব হলো? দুটি মন্ত্র। সমাজতন্ত্র এবং পরবর্তীকালে গণতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। দুটিই কাজ করে জনগণের স্বার্থে, কম-বেশি কয়েকটি পরিবার বা শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে নয়।

বিচারের দুটি মাপকাঠি

শ্রীগজেন্দ্র গাদকার এতো কথা বলেন নি। তাঁর কাছ থেকে তা আশাও করা যায় না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন। একটা দেশের কতটুকু যুক্তরাষ্ট্রীয় তা শুধু সে দেশের সংবিধান বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি দেখেই বিচার করা যায় না। সংবিধান বা সংস্থাগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে—তার ওপরই আসল বিচার নির্ভর করে। অর্থাৎ, তিনি রায় দেওয়ার আগে তাত্ত্বিক উপাদান বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক দিকটিও খুঁটিয়ে দেখতে চান। এবং ভারতবর্ষের সংবিধানের ও রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয়তা তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছেন। একই দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন অধ্যাপক উইলিয়ম লিভিংস্টোন :

"Federal Government is a device by which the federal qualities of the Society are articulated and protected···whether the operating constitution of a country may properly be called federal depends not so much on the arrangements of the institutions within it as it does on the manner in which these institutions are employed".

সাংবিধানিক ব্যবস্থাবলীর বিচারে দেখা যাবে এদেশের সংবিধান যেমন যুক্তরাষ্ট্রীয়, তেমনি এককেন্দ্রিক। সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম শ্রীআম্বেদকরের ভাষায় ভারতের সংবিধান হলো :

"···a Federal Constitution in asmuch as it establishes what may be called Dual Polity which will consist of the union at the centre and the States at the periphery, each endowed with Sovereign Powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution."

সংবিধান যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যাঁর ছিল, এ হলো তাঁর মত। উদ্ধৃতিটির দুটি কথার দিকে আমি পাঠকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই। Dual Polity এবং Sovereign। তবে, একথাও সত্য, এমন হাজারটি উদ্ধৃতি দিয়েও প্রমাণ করা যাবে না যে, ভারতীয় সংবিধান নিতান্তই যুক্তরাষ্ট্রীয়! তাই যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার পর শ্রীগজেন্দ্র গাদকারের যথার্থই মনে হয়েছে :

"...Though in form the constitution is federal, in substance it can become unitary."

এবং এরপরই প্রশ্ন: এহেন একটি সংবিধানকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? "এহেন", অর্থাৎ যা কিনা যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। একটু ঘুরিয়ে দিলেই পুরোপুরি এককেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে। আবার অন্যদিকে পরিচালিত করলে যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় হয়ে উঠলেও উঠতে পারে। আর ভারতের মতো বহুজাতিক, বিচিত্র রাষ্ট্রে তাই তো ছিল প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়। কাজেই প্রশ্নটা নিছক বিশেষজ্ঞের নয়। ইতিহাসের।

বিশবছরের পাপ

প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীগজেন্দ্র গাদকার। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হয়নি তাঁর। তিনি দেখতে পেয়েছেন কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটিমাত্র দলের দীর্ঘ-শাসন (প্রায় দলীয় একনায়কতন্ত্রের মতো) ও নেহরুর হিমালয়বৎ ব্যক্তিত্ব ভারতের পক্ষে একটি চমৎকার যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠার পথে কিভাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও, তাঁর চোখ এড়ায়নি, কেমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দিল্লীর ক্ষমতা। দিল্লী হয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্ত ক্ষমতার উৎস, সমস্ত সঙ্কটের ত্রাতা, সমস্ত দোষ ও অপরাধের আশ্রয়স্থল। নেহরুর ব্যক্তিত্ব ও একই দলের শাসন রাজ্যগুলির স্বাধীন বিকাশের প্রশ্নকে আমলই দেয় নি। প্রশ্ন কখনো কখনো উঠেছে। এক-আধটা রাজ্যসরকার প্রতিবাদ করেছে। এক-আধটা মামলাও হয়েছে এখানে-ওখানে, সুপ্রীম কোর্টে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব তীর্থের মহাতীর্থ দিল্লীতে সেই বিরোধ মিটে গেছে, কিংবা মিলে গেছে সব সঙ্কটের দাওয়াই। এইভাবে বিশবছর ধরে সংবিধানকে ও তদ্দ্বারা দেশকে সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্র করে তোলার কোনো সচেতন প্রচেষ্টা হয়নি। বরং একে ক্রমাগত এককেন্দ্রিক করে তোলার সচেতন, অবচেতন, অবহেলাভরা অথবা অভিসন্ধি-মূলক প্রয়াসের অভাব কখনো ঘটে নি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীগজেন্দ্র গাদকারের মন্তব্য:

"...The continuous enjoyment of political power by one political party inevitably led to commonplace and, in some cases, corruption."

নেহরুর আমলে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিগুলি কি নির্বিকারভাবে বিপর্যস্ত করা হয়েছে তা আলোচনা করে তিনি বলেছেন:

"... it cannot be denied that by and large the concept of federalism was forgotten and, under the overpowering influence of Nehru's personality, India was governed as a unitary State".

সন্তানদের স্বাধীনতা দিয়ে কিছু অভিভাবক তাদের নষ্ট করেন। তার চেয়ে অনেক বেশি অভিভাবক তাদের সর্বনাশ করেন কারণে-অকারণে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই দলের শাসন। তবু রাজ্য ও জাতিগুলিকে বিকাশের স্ব স্ব পথ বেছে নিতে দেওয়া হলো না। ইউনিট-গুলির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য, যা কিনা যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার মৌলিক নীতি, সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হলো। ফলে, রাজ্য ও জাতিগুলির মনে খাদ্য, ভাষা, অর্থ কিংবা যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রথমে অভিমান, তারপর একে একে হতাশা, শঙ্কা, ক্রোধ, ঘৃণা ও শেষপর্যন্ত চরম তিক্ততার সৃষ্টি হলো। ১৯৬৯ সালে বাঙলাদেশের যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যে অভিযোগ করছেন, তা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় করেছিলেন প্রায় এক যুগ আগে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষানীতির প্রতিবাদে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদত্যাগ করেছিলেন। তিক্ততা একদিনে গড়ে ওঠে নি। সেই তিক্ততার আগুনে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি যখন জ্বলতে শুরু করেছে, তখন চ্যবন সাহেবের দল চাইছেন আরো ক্ষমতা। যে-পথে বিশ বছর ধরে এই সর্বনাশ এলো, সেই পথেই আরো দ্রুত দেশকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওঁরা আরো শক্ত চাবুকের অধিকার চাইছেন। এই সর্বনাশের তুলনায় কত তুচ্ছ যুক্তরাষ্ট্র-এককেন্দ্রিকতার বিতর্ক। কিন্তু এই সর্বনাশ রোধের আপাত উপায় হিসাবেই আবার এই বিতর্কের এতো গুরুত্ব!

সংবিধান ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিল কেন্দ্র আর রাজ্যের মধ্যে। তারপর ব্যবস্থা করেছিল যাতে কখনো কখনো কেন্দ্র সর্বময় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আম্বেদকরের উপরোক্ত কথাগুলি থেকে বোঝা যায়, তাঁরা চেয়েছিলেন, অন্তত স্বাভাবিক সময়ে, রাজ্যগুলি তাদের আপনক্ষেত্রে "সার্বভৌম" হবে, হতে পারবে। কিন্তু এ তো তত্ত্বের কথা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেল—যেমন সংবিধান গড়া হয়েছিল ইংরেজের ১৯৩৫ সালের ভারত-আইনের ওপর ভিত্তি করে, এমন কি তার লাইনকে-লাইন হজম করে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও রয়ে গেছে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি। রাজ্যগুলিকে আমলে আনা হলো না। একে

তো দলের শাসন, তার ওপরে নেহরুর ব্যক্তিত্ব (এ হচ্ছে শ্রীগজেন্দ্রগাদকারের মত)। ধরা যাক রাজ্যপালের কথাই। প্রশাসনিক, আইনগত ও অর্থ নৈতিক ব্যাপারে সাধারণ সময়েও (জরুরি অবস্থাতে তো দেশে পুরোপুরিই অটোক্র্যাসি!) রাজ্যের ওপরে কেন্দ্রের খবরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। তার ওপরে শুরু হলো রাজ্যপালকে ধারাল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের পালা। যাঁর হওয়ার কথা রবার-স্ট্যাম্প গোছের একটা ব্যাপার, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন জবরদস্ত ছোটলাট।

রাজ্যপাল আসলে কে ?

সংবিধান বলছে, প্রায় উদ্ভটভাবেই, রাজ্যপালের দ্বৈত ভূমিকার কথা। তিনি রাজ্যের প্রধান। আবার তিনি কেন্দ্রের প্রতিনিধি। তাহলে তাঁর আনুগত্য কার প্রতি ? অ্যারিস্টটল-এর যুগেই কথাটা নিশ্চয় হয়ে গেছে। একই সময়ে একজন প্রশাসকের দুটি কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য থাকতে পারে না, সুশাসনের স্বার্থে থাকা উচিতও নয়। এটিই বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত সাংবিধানিক নীতি। শ্রেণীগতভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রেও একথা স্বীকৃত ও অনুসৃত। মার্কিন রাজ্যগুলির প্রধানরা নির্বাচিত হন রাজ্যেরই বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। অস্ট্রেলিয়া কিংবা কানাডার রাজ্য-প্রধানরা নিযুক্ত হন রাজ্য-সরকারের পরামর্শক্রমে, অন্তত তাঁদের পরামর্শের ভিত্তিতে। ফলে, আনুগত্য কার প্রতি এ-বিষয়ে তাঁদের মনে সংশয় নেই। কিন্তু ধরমবীররা লাঠি-ঘোরানোর সময় রাজ্যের প্রধান, আনুগত্যের ব্যাপারে দিল্লীমুখো। তাঁরা রাষ্ট্রপতির "প্লেজার", অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর দিলখুস তাঁদের চাকরির ভিত্তি। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও সংবিধানবিশারদ শ্রী পি. এন. সপ্রু সম্প্রতি একটি নিবন্ধে লিখছেন :

"A well known principle of constitutional theory is that a statesman in the position of governor cannot be responsible to the different authorities at the same time. He should not be responsible at the same time to the union Government and function as the constitutional head of State."

কিন্তু এ তো হলো জ্ঞানের কথা। ধর্মের বাণী। দিল্লীর এসব মানতে বয়েই গেছে। প্রয়োজন তাঁদের দল ও সেই দলের ভিত্তি যেসব শ্রেণী, তাদের

স্বার্থরক্ষা। রাজ্যপালদের অতএব দাবার গুটির মতো চালানো শুরু হলো। দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী অপশাসনের প্রতিবাদে মানুষ কংগ্রেসকে বাতিল করে দিল। নতুন পরিস্থিতি। ভিন্ন ভিন্ন দল ও ফ্রণ্টের হাতে ভিন্ন ভিন্ন সরকার। কিন্তু ক্ষমতায় থেকে থেকে কংগ্রেস ক্ষমতার ওপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। ক্ষমতাহীন কংগ্রেস মানেই প্রাণহীণ কংগ্রেস। অতএব শ্রীগজেন্দ্র গাদকারের ভাষায় :

"...The Congress began to feel that Political power was an end in itself; and that is why we saw the sordid spectacle of the crossing of the floor and the toppling of the Governments."

দলত্যাগ ও সরকারের পতন ঘটানোর পালা শুরু হলো। এ কি শুধু দলের পক্ষ থেকেই? না। দিল্লীতে দল এবং সরকারের মধ্যে আর প্রভেদ রইল না। অনেকদিন থেকেই ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থেকে আরম্ভ করে রাজ্যপালের পদ, সবকিছু যেভাবে হোক ক্ষমতায় টিঁকে থাকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু হলো। রাজস্থানের রাজ্যপাল কেমন চাতুরির মাধ্যমে সংখ্যালঘু কংগ্রেস দলকে সরকার গঠন করতে ডাকলেন, তারপর গণবিক্ষোভ বশত বিধানসভা স্থগিত রাখলেন (বাতিল নয়), কংগ্রেস নিরপেক্ষদের দলে পেল, কংগ্রেসী সরকার গঠিত হলো। এইসব ঘটনা বিশ্লেষণ করার পর শ্রীগজেন্দ্র গাদকার সবিনয়ে মন্তব্য করছেন :

"Therefore, the formation of the Congress Government in Rajasthan can prima facie be criticised on the ground that the exercise of the Union Government's Power in imposing the Presidential guide might have been inspired by partisan motives."

"পার্টিজাত মোটিভ" ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রকে বিশ বছর ধরে দংশন করার পর সাংবিধানিক গণতন্ত্রের বুকে বিষদাঁত বসাতে শুরু করল। সর্বত্র। মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, সবচেয়ে নগ্নভাবে পশ্চিম বাঙলায়। কিন্তু তার ফলে কি রক্ষা পেল পার্টি? দল ভেঙ্গে দ্রুত চৌচির হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বাঙলায় দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে। মার্কস বলতেন : বুর্জোয়ারা নিজেদের নাকের ডগার ওপারে কি আছে দেখতে পায় না। আমাদের দেশের অপরিণতবুদ্ধি বুর্জোয়াদের নেতারা কি নাকের ডগা পর্যন্ত দেখতে পান?

রাজ্যের ত্রক্রিয়ারে হস্তক্ষেপ

রাজ্যপাল তথা কেন্দ্রের এইসব ঐতিহাসিক কুকীর্তির যাথার্থ প্রমাণ করে (?) ওঁদের পক্ষ থেকে সাংবিধানিক আইনগত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। শয়তানের পাঁচটা আঙুল কিন্তু সেখানেই থেমে নেই। দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রেও অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারগুলির এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ এবং সেই হেতু সংঘাত প্রতিপদে সুরু হয়েছে। এমনটি হতে বাধ্য। যত দিন যাবে, এ-বিরোধ ততই বাড়বে।

খোদ দিল্লী নিয়োজিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন তাঁদের রিপোর্টে কবুল করছেন, রাজ্যের এক্তিয়ারে কেন্দ্র বড় বেশি হস্তক্ষেপ করছে। রিপোর্টটি পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়ঃ

"The Administrative Reforms Commission has noted that over the last 20 years the Ministries at the Centre have been encroaching upon the state sphere to quite an extent. ···these ministries should retrace their steps and confine themselves generally to coordination, research and such other matters as are agreed to between the states and the centre".

একটি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা শ্রীহনুমন্তায়া এই কমিশনের চেয়ারম্যান। পার্লামেণ্টে এই রিপোর্ট গত নভেম্বরে পেশ করা হয়। আর এখন মার্চ মাসে শ্রীচ্যবন পশ্চিম বাঙলায় কেন্দ্রীয় পুলিশ পুষে আইন রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। যদিও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবেই রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই, ভালো কথা বলা হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু ও পথ মাড়াবার তিলমাত্র বাসনা ওঁদের নেই।

ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে মোটের ওপর? একে তো সংবিধানের ধারায় ধারায় আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র। মাঝে মাঝেই পুরোপুরি এককেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে। তার ওপরে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবটুকু জোর গিয়ে পড়ল এককেন্দ্রিকতার ওপর। ঐক্যের নামে। ফলে ঐক্য আর সংহতি বিপর্যস্ত হলো। সব রাজ্যে একই দলের শাসন যতদিন ছিল, ততদিন ছাই দিয়ে আগুন চাপা দেওয়ার খেলা তবু চলতে পারছিল। অকংগ্রেসী, বিশেষত বামপন্থী ফ্রন্টের সরকার কোনো কোনো রাজ্যে গঠিত হওয়ার পরই সংঘাতটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ল, তীব্র হয়ে উঠল। তখন যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা হাতে রাখার জন্যে প্রয়াস চলল। রাজ্যপালকে দিয়ে, চাল বা টাকার থলে ব্যবহার করে। তাতেও সুবিধা না হওয়াতে কেন্দ্রের পুলিশ দিয়ে দুর্গাপুরে গুলি চালিয়ে।

সংঘাতের ভিত্তি শ্রেণীসংগ্রাম

৩১শে মার্চ পার্লামেণ্টে শ্রীচ্যবন বলেছেন, আসুন, আমরা সব রাজনৈতিক দলের নেতারা মিলেমিশে রাজ্যপালের ক্ষমতা স্থির করে দিই। জনসংঘের নেতা শ্রীবাজপেয়ী বলেছেন এ-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ নেওয়া হোক। শ্রীগজেন্দ্র গাদকার প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কনসেনশাসের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের পক্ষপাতী।

এর সবগুলিই করা যেতে পারে। কিংবা যে কোনো একটা। কিন্তু তাতে কোনো ফল হবে না। বিরোধ মিটবে না। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত নিজের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছেন। সমানুপাতে কমে চলেছে রাজ্যের ক্ষমতা। রাজ্যগুলি তা মেনে নেবে কেন? তারা এর বিরুদ্ধে লড়বেই। রাজ্যপাল তো রোগ নন। রোগের লক্ষণমাত্র। আজ রাজ্যপাল নিয়ে বিরোধ। তা মিটে গেলে ফিনান্স কমিশন নিয়ে বিরোধ বাধতে পারে। তারপর কর আদায়ের কায়দা নিয়ে।

কেন্দ্রীয় সরকার আজ এক বিশেষ শ্রেণীর ভার বইছেন। এবং বইতে তাঁরা বাধ্য। বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজ্য সরকারগুলি আরেক শ্রেণী-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এদের স্বার্থের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর দুই পৃথক সরকারের মধ্যেও সংঘাতহীন সম্পর্ক হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ। একচেটিয়া ধনিকগোষ্ঠী, ভূম্যধিকারী আর বিদেশী শিল্পপতিদের স্বার্থ চ্যবন-মোরারজী-নিজলিঙ্গাপ্পা রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর মাদ্রাজ-বাঙলা-কেরালার সরকারগুলি এইসব শ্রেণীর প্রতিপক্ষ শ্রেণীগুলির স্বার্থ, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-পেটিবুর্জোয়া ও জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়ার স্বার্থের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে নিয়ত যে সংঘাত—তারই সাংবিধানিক প্রতিফলন কেন্দ্র বনাম রাজ্যের সংঘাতে। বাহাত্তর সাল নাগাদ বোঝা যাবে পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকছে, ভারতবর্ষ কোন দিকে যাবে। দিল্লীওয়ালাদের হারাতে পারলে তবেই জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হবে। অন্যথায় নয়। লেনিন বলতেন, প্রতিক্রিয়াশীলদের হারিয়ে দিতে হবে সব ফ্রণ্টেই। কেন্দ্র বনাম রাজ্যের লড়াইটাও একটি ফ্রণ্ট। সচেতন মানুষদের তাই বেছে নিতে হবে—তাঁরা এ-সংগ্রামে কোন পক্ষে থাকবেন, কৌরব অথবা পাণ্ডব শিবিরে।

চলো সাগরে

বিজন ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্থরেন : বসো, বসে কথা বলো।

জসিমুদ্দিন : আই-আল্লা ! আর ভাবেন তো দেহি, ইটাখান যদি আপনের কপালপিচা পড়ত। ছি ছি ছি ছি, মাঠানের কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দিতাম অনে—কিরা কাইটা কসম খাইয়া গেলাম···

স্থরেন : আ-হা-হা-হা, এখনও রক্ত পড়ছে, তুমি স্থির হয়ে বসো জসিমুদ্দিন, আমাকে দেখতে দাও।··· কৃষ্ণা জল নিয়ে আয় এক গামলা, গরম জল···মন্মথটা আবার এই সময়···(কৃষ্ণাকে) চট করে, দেরি করবে না···

(স্থরেন ডাক্তার জসিমুদ্দিনের মাথার ক্ষতস্থান দেখতে থাকেন। তারপর জসিমুদ্দিনকে পরীক্ষা করেন। নেপথ্যে যুগপৎ গণ্ডগোল ও হল্লা বাড়তে থাকে। এক গামলা জল নিয়ে কৃষ্ণার প্রবেশ। হল্লা আরও বেড়ে যায়)

স্থরেন : কৃষ্ণা, তুই ভেতরে যা।···দেখি, মাথাটা ঠিক করে···

(কাঁচি দিয়ে চুল কাটেন। হল্লা বেড়ে যায়)

জসিমুদ্দিন : বড়ই গণ্ডগোল শুনি।

জমিরুদ্দিন : চাচা। ভাবে বুঝি attack করে।

জসিমুদ্দিন : (বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে ওঠে) কি attack করে? জসিমুদ্দিন জিন্দা থাকতে···ডাক্তারবাবু, আপনে ভিতরে যান।

স্থরেন : কি ভেতরে যাব ?

জসিমুদ্দিন : কই বলে—ভিতরে যান, কথা বোঝেন না আমার ? ভিতরে যান।

(একরকম জোর করেই জসিমুদ্দিন ডাক্তারকে ভেতরে ঠেলে দেয়। অতর্কিতে গুণ্ডাদলের প্রবেশ)

ইয়াকুব : বাড়িওয়ালা কাঁহা ?

জসিমুদ্দিন : ক্যান, সমুখখানের উপুরই খাড়াইয়া আছে। কিসের মতলব ?

ইয়াকুব : মতলব, ইয়ে তুমহারা মোকাম ?

জসিমুদ্দিন : তোমরার-আমরার কি বাত আছে ? আমাগো মহল্লায় হিন্দু-মুসলমান কোন বিরোধ নাই।

ইয়াকুব : উঁচে বাত মত করো—ইয়ে মোকাম তুমহারা হ্যায় কি নেহি ? (আলতাফ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এখন সামনে এগিয়ে আসে)

আলতাফ : ইয়ে মোকাম হামারা, লেকিন তু কোন হ্যায় ?

ইয়াকুব : ম্যাঁয় ইয়াকুব হুঁ।

আলতাফ : ইরানি বাগানকা মস্তান ? মগর ইয়ে খেয়াল কর লে তু ইয়াকুব, মেরা নাম আলতাফ। খতরনাখ হিন্দু-মুসলিম ঝগড়ে কি সওয়াল হাম দোনো বৈঠকে ওয়াপস কর লুঙ্গা—ইসমে তেরা কৈ বাত নেহি। কেঁউ কি তু মুস্লিম ভি নেহি, হিন্দু ভি নেহি। এক নাম তেরা—গুণ্ডে। তেরা কৈ জাতি-উতি নেহি। মহল্লা ছোড়কর আভভি তু চলি যা।

ইয়াকুব : (ছুরি বার করে) নেহি তো ?

আলতাফ : (হাত মুচড়ে ধরে) নেহি তো…(কঠিন হাতের চাপে ইয়াকুবের হাত থেকে ছুরি পড়ে যায়। আলতাফ বাঁ পায়ের আঙুলে সেটা তুলে নিয়েই এক ঝটকায় ইয়াকুবকে ফেলে ডান পা দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে। ধস্তাধস্তির পর ইয়াকুব উঠে পড়ে পালাতে যায়। আলতাফ ছুরি ছুঁড়ে দেয়। বলে)…ইয়ে লে লে। মেরা সাথ তুঝকো সমঝোতাকে লিয়ে কিস রোজ কৈ চমকসে তুঝে জরুরৎ হোগা, লেঃ! (ইয়াকুব ছুরি লুফে একবার আলতাফের দিকে বাঁকাচোখে তাকিয়ে দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। একটু পরেই হাত ঝেড়ে আলতাফ দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডাকে)…ডাক্তার সাহাব! ডাক্তারবাবু! (সাড়া না পেয়ে জসিমুদ্দিন-জমিরুদ্দিন এগিয়ে যায়। এমন সময় ডাক্তার ঢোকেন)

স্থরেন : কি ব্যাপার? আমি তো না-এদিকে না-ওদিকে—তোমরাও আমাকে কেউ ডাকছ না, মাথা ফেটে রয়েছে তোমার···

আলতাফ : এখুন দেখুন, এখুন দেখুন।

স্থরেন : নাও, শুয়ে পড়ো দেখি···(কাঁচি তোলেন গরম জল থেকে। জসিমুদ্দিনের মাথায় অস্ত্রোপচার করেন)

আলতাফ : জমানা বহত খারাপ হ্যায় ডাক্তারবাবু। আপকি মাফিক ভালে আদমিকে লিয়ে··

স্থরেন : বেশ তো, খতম করে দাও। চুকে যাক ল্যাঠা। আর সত্যি কথা বলতে কি, বাঁচতে আমার এতটুকু সখ নেই। এখন যাওয়াই মঙ্গল।

আলতাফ : নেহি, বহত আফশোস কি বাত। ম্যায় শীকায়েৎ হুঁ।

(ডাক্তার জসিমুদ্দিনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেন)

স্থরেন : মন্মথটা আবার এই সময়···(পর্দা সরিয়ে ভেতরে যান। কয়েক পুরিয়া ওষুধ আনেন)···প্রথম এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট অন্তর এই চার পুরিয়া— তারপর এক ঘণ্টা অন্তর এই চার পুরিয়া···কি বুঝলে?

জসিমুদ্দিন : পয়লা ঘণ্টা পনেরো মিনিট অন্তর এই পিলা পুরিয়া। তারপর বাকি রাইতখান এক ঘণ্টা অন্তর খাবে এই চার পুরিয়া।

স্থরেন : খেয়াল রেখো। ওষুধটা খাবে ফতিমা।···আর তুমি সকালে একবার দেখিয়ে যাবে কেমন থাকো না থাকো।

জসিমুদ্দিন : আইচ্ছা! সেলাম ডাক্তারবাবু।

স্থরেন : হুঁ!···(হঠাৎ সম্বিৎ আসে) ···নান্টুটা আবার বেরিয়ে গেল রাত করে!···(পায়চারি করেন। দাঁড়ান। কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণা : কত করে বললাম—দাদা, আজ আর বেরোস না। কিছুতেই শুনল না। বললে, বাবা বুড়ো বয়েসে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বস্তিতে রুগি দেখছেন, আর আমি জোয়ানমদ্দ হয়ে ঘরে বসে থাকব? Peace Committeeর কাজ তাহলে কে করবে শুনি?

স্থরেন : এই সব বললে?

কৃষ্ণা : আরও বললে, তোরও তো কাজ করা উচিত।

সুরেন : ঠিক, ঠিকই বলেছে।…তা গেলেই পারতিস তুই তোর দাদার সঙ্গে সাগরোত্তি করতে।

কৃষ্ণা : আমার বুঝি ভয় করে না ?

সুরেন : ভয় ? করে নাকি ?… (হঠাৎ বোমার শব্দ)

কৃষ্ণা : …ঐ বোমা ফাটল।

সুরেন : বোমা ? হ্যাঁ, সবাই তো আজ মুক্তিযোদ্ধা।…যাও। জানালা-দরজা সব বন্ধ করে দাও।

(হল্লা ও বোমার শব্দ। কৃষ্ণার প্রস্থান। শঙ্করীর প্রবেশ)

শঙ্করী : ওগো শুনছ, নান্টু তো এই গণ্ডগোলের ভেতরে আবার বেরিয়েছে।

সুরেন : এই তো, ওপরেই তো বললে আমায়। এক কথা আর কতবার করে বলবে তুমি ?

শঙ্করী : এখন কি হবে বলো তো !

সুরেন : কি জানি, গোনা তো শিখিনি, বলতে পারব না।

শঙ্করী : শোনো কথা !

সুরেন : তো আবার কি বলব ? গণ্ডগোলে এমনিতেই মাথা তালগোল পাকিয়ে আছে, তার ওপর পঞ্চাশবার এক কথা—নান্টু বেরিয়ে গেছে, নান্টু বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গেছে, তা কি করব আমি ?

শঙ্করী : হ্যাঁ, তা বলেছি তো কি হয়েছে ?

সুরেন : না, বলবে না। এক কথা দশবার করে বলে উত্যক্ত করবে না। আর-পাঁচটা লোকেরও মাথামন আছে, তাদেরও চিন্তা-ভাবনা হয়—শুধু তোমারই একার হয় না।

শঙ্করী : ওমা ! আমি কি সেই কথা বলেছি ?

সুরেন : না, বলবে না। কিছু বলবে না। চোখকান আছে। আমি সবই দেখতে পাই, সবই শুনতে পাই।…(হল্লা ও গণ্ডগোল ফেটে পড়ে)…সদর দরজা বন্ধ আছে তো ? কৃষ্ণা কোথায় ?… (শঙ্করী ত্রস্তে ভেতরে যান)…মাথামুণ্ডু নেই। কি সব যে হচ্ছে চারদিকে !…(হল্লা ও বোমার শব্দ)…ওদিকের আকাশটা আবার লাল হয়ে উঠল কেন ? আগুন-টাগুন দিলে নাকি ? (হন্তদন্ত কৃষ্ণার প্রবেশ)

কৃষ্ণা : বাবা, পাশের বাড়ি থেকে ইলেকট্রিক লাইট সব নিভিয়ে দিতে বললে। ওদের বাড়ির সব আলো ওরা নিভিয়ে দিয়েছে।

(কথার মাঝে শঙ্করীর ত্রস্ত প্রবেশ)

শঙ্করী : ওমা ! তা অন্ধকারে কি করে থাকব ?

সুরেন : আঃ, এমনিতেই ভারি আলোতে বসে আছি ! দাও, সব আলো নিভিয়ে দাও।···(কড়া নাড়ার শব্দ)···সুইচগুলো সব টিপে দে কৃষ্ণা। অন্ধকার করে দে।···(কড়া নাড়ার শব্দ চরমে ওঠে। দরজা ধাক্কাচ্ছে কে যেন। মঞ্চ অন্ধকার)

সুরেন : কথা বলো না।

শঙ্করী : দরজা ভাঙবে নাকি ?

(টিনের শব্দ। দরজার ওপর ইঁট পড়ার শব্দ)

কৃষ্ণা : ইঁট মারছে বাবা।

সুরেন : কথা বলবে না।

শঙ্করী : আমি বলি—আলো জ্বালিয়ে দাও !

সুরেন : জ্বেলে দেবো ?

কৃষ্ণা : দরজা ভাঙছে বাবা।

শঙ্করী : তবে থাক। জ্বেলো না আলো।

সুরেন : টেবিলটা দরজার সঙ্গে সেঁটে দেই। ধর কৃষ্ণা···টান।

(ফার্নিচার টানার শব্দ। ওদিকে দরজা ভাঙছে)

শঙ্করী : কৃষ্ণা, তুই লোহার হুড়কোটা ওঁর হাতে এনে দে।

কৃষ্ণা : দিচ্ছি। ···নাও, ধরো বাবা।

শঙ্করী : শক্ত করে ধরবে।

সুরেন : ঠিক আছে।···(দরজা ভাঙার শব্দ) ···কৃষ্ণা, টেবিলটা শক্ত করে চেপে ধরে থাক। তুমিও ধরো···(হুড়োহুড়ি। তিনজোড়া পা টানাপোড়েনে আগুপাছু হয়)

আর পারছি না। দরজা ভাঙছে।

সুরেন : ভাঙুক, আমি ধরছি।

শঙ্করী : না, তুমি হুড়কো।

কৃষ্ণা : দরজা ভাঙছে বাবা।

সুরেন : কৃষ্ণা সরে যা, হুড়কো লাগবে।

(মড় মড় শব্দে দরজা ভাঙতেই নান্নু ভেতরে ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আততায়ী ভ্রমে সুরেনবাবু ছেলের মাথায় লোহার হুড়কো বসিয়ে দেন। হুড়কো চালাবার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে)

নান্নু : (আর্তনাদ) আ-া-া-া

সুরেন : কে? — ক্, একি, কি হলো? নান্নু!

নান্নু : বাবা!

শঙ্করী : (আর্তনাদ করে ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন) না—নু…

কৃষ্ণা : এ কি হলো বাবা!

নান্নু : বাবা

(সুরেন ডাক্তার ছেলের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে পশুর মতো আর্তনাদ করেন)

সুরেন : খোকা!!

(এক মুহূর্ত মাত্র। মঞ্চ অন্ধকার)

[অন্ধকারে মাদারির ডুগডুগির বাজনা সমেত চীৎকার শোনা যায়। ঢোলকের বাজনাও ফেটে পড়ে]

মাদারি : ছোকরা!

ছোকরা : হাঁ।

মাদারি : হাড্ডিকা পহেলা খেলা দেখায়া?

ছোকরা : দেখায়া।

মাদারি : ঠিকসে বাতায়া?

ছোকরা : ঠিকসে বাতায়া।

মাদারি : ইমানসে দেখায়া?

ছোকরা : দেখায়া।

মাদারি : অব সব ফরিয়াদি ঔর গুনেগার কো ঠাণ্ডি ঘরমে বন্ধ রাখো। দুসরে-তিসরে মামলেকো শুনানি হোনেপর হাকিম লোগোকো রায় হোগা।

ছোকরা : বরাবর হোগা।

মাদারি : ছোকরা ?

ছোকরা : হাঁ।

মাদারি : পহেলা হাড্ডিকা খেলাকা সওয়াল কেয়া থা ?

ছোকরা : দো টুকরে।

মাদারি : কিসনে বনায়া ?

ছোকরা : জন বুলনে বনায়া।

মাদারি : অব উস্কা কেয়া হাল ?

ছোকরা : ভিখারিকো হাল।

মাদারি : ইনসানিয়াত্‌কা কেয়া খবর ?

ছোকরা : বিক্‌ দিয়া।

মাদারি : কিসকে পাস ?

ছোকরা : পাউণ্ড-ডলার-ওয়ালাকো পাস।

মাদারি : তো রুপেয়াকা কেয়া ভাও চলতা ?

ছোকরা : ম্যাচিসকা এক কাঠঠি বাঁচাকে রুপিয়া-নোটসে বিড়ি ধরাউ।

মাদারি : তো সমঝতা বহোৎ খারাবি হাল।

ছোকরা : বহৎ খুব।

মাদারি : ইসওয়াখত কুছ হাড্ডিকা খেলা হোগা ?

ছোকরা : হোগা।

মাদারি : আচ্ছা খেলা ?

ছোকরা : জী, বহত আচ্ছা।

মাদারি : তো ফরিয়াদি ঔর গুনেগার—যো কৈ হ্যায় ইস মামলেপর—সবকো হাজির করো। জলদি। (অন্ধকার)

দ্বিতীয় তরঙ্গ

[ডুগডুগি ও ঢোলক তুনে বাজতে থাকে। আলো জলতেই দেখা যায়—একখানা ঘর। আড়াআড়ি টানা একটা দড়ি। দড়িতে লাল শাড়ি এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের ফ্রক-পেনি শুকোচ্ছে।

ঘরে একটা খাট পাতা। বিছানা গুটনো। টেবিল-চেয়ার। একটা ছোট আলমারি। মাথায় পোস্টার-ফেস্টুন ঠাসা। লোকাল কোনো রাজনৈতিক পার্টির অফিস। দেওয়ালে পোস্টার, মার্কস ও লেনিন-এর ছবি। তিনটি ছেলে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে খবরের কাগজে পোস্টার লিখছে। একজন আঠা লাগাচ্ছে। পোস্টার দড়িতে শুকোনো হচ্ছে। সবাই বয়সে নবীন। ছাত্রকর্মী। গান করতে করতে বুঁদ হয়ে কাজ করছে। আঠা লাগাচ্ছিল যে ছেলেটি, সে হঠাৎ জ্বাল দেওয়া আঠার গন্ধে মজে মুঠো ভরে আঠা খেতে শুরু করে। ঘটনাটা অন্য একটি ছেলের নজরে পড়ে]

অনল : (অবাক হয়ে দেখে) এই? কি করছিস?

(ছেলেটি ভীষণ বিব্রত বোধ করে। থতমত খেয়ে বলে)

অসীম : খিদে পেয়েছিল।

অনল : খিদে পেয়েছিল তাই আঠাগুলো সব খেয়ে ফেলে দিলি? এখন পোস্টার লাগাব কি দিয়ে?

অসীম : (বিব্রত) দাঁড়া না, Manage করছি।

অনল : Manage করছি মানে? আঠা তুই পাচ্ছিস কোত্থেকে? বৌদির কাছে আর আটা নেই।

অসীম : দ্যাখ না, দ্যাখ না…

অনল : আর, খাবি একটু খা। হাবাতের মতো এক বাটি আঠা গোগ্রাসে খেয়ে ফেলে দিলি? নাঃ, পোস্টার-ফোস্টার আর লিখতে ইচ্ছে করে না। কেন পোস্টার, কিসের পোস্টার, কিজন্যে লেখা?

অসীম : চেঁচাচ্ছিস কেন? সামান্য একটু আঠা খেয়েছি তাই…

অনল : হ্যাঁ, সামান্য আঠা বলেই কথাটা উঠছে। খাবার মতো ভালোমন্দ দেব্য হলে বলতাম না।

অসীম : যাগগে, খেয়ে যখন ফেলেইছি…

অনল : খেয়ে যখন ফেলেইছি…। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস কখন?

অসীম : কাল তো বাড়িই যাইনি।

অনল : রাতে কোথায় ছিলি ?

অসীম : এইখানেই। নইলে অতগুলো পোস্টার লেখা হতো ?

অনল : খেলি কোথায় ?

অসীম : খেলাম—

অনল : খাসনি…। অনটনের সংসার, বৌদির কাছে হয়তো বলতে পারিস নি। বাইরে খেয়ে নিলেই পারতিস।

অসীম : পয়সা ছিল না। (সমবয়সী ছাত্রকর্মী প্রতুল ঢোকে)

অনল : এই প্রতুল, একটা কাজ করতে পারবি ?

প্রতুল : কাজ করবার জন্মেই তো আমার জন্ম হয়েছে—এলাম না সেরে !—কী কাজ, শুনি ?

অনল : বাড়ি থেকে চট করে একটু আঠা আনতে পারবি ? যাইবি, কলেজ আওয়ার্সের আগেই এই পোস্টারগুলো লাগাতে হবে, কিন্তু এদিকে…

প্রতুল : আঠা পাব কোত্থেকে ?

অনল : বাড়ি থেকে আনবি।

প্রতুল : বাড়িতে আঠা হয় নাকি ? আর তা ছাড়া, রেশনের যা কড়াকড়ি—ও বললেই মা চেঁচাতে শুরু করবে। আঠা-ফাটা পারব না।

অনল : এই শালা এস. এফ. করো ? আবার লম্বা লম্বা কথা— Peace, Unity, Solidarity.

প্রতুল : Simplify করিস না তো ! সবটাই শালা Infantile.

অনল : Infantile !

প্রতুল : না তো কি ? এই এলাম সেরে, না আঠা ! আর, আঠা তো ছিল একবাটি, Yes.

অনল : ছিল, খেয়ে ফেলেছে।

প্রতুল : কি করেছে ?

অনল : খেয়ে ফেলেছে। গোগ্রাসে একবাটি আঠা খেয়ে ফেলেছে।

প্রতুল : (অসীমকে) কি রে ?

অসীম : আমি দেখছি আঠা।…(অসীম বেরিয়ে যায়। কমরেড বিভূতির প্রবেশ। খালি গা। মাথা মুছতে মুছতে স্নান

সেরে ঢোকেন। অফিসের তাড়া। জামা-কাপড় ছাড়েন আর রাগতভাবে ছেলেদের সঙ্গে তর্ক করেন)

বিভূতি : কই, তোমাদের হলো ? ···Impossible ব্যাপার। আরে বাবা, একখানা তো ঘর। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বাস করি। তার ভেতরে আবার পার্টির দপ্তর, এস. এফ., পীস কমিটি··· তোমরা সব পেয়েছ কি ?

অনল : আপনি তো জানেন বিভূতিদা, বর্তমানে আমাদের পার্টির ভেতরকার যা অবস্থা, আর যা Strength···

বিভূতি : কিসের Strength ? Strengthটা কি শুধু আমার ওপর দেখাতে হবে ? ডিস্ট্রিক্ট কমিটিকে বলতে পারো না তোমরা ?

অনল : ডি. সি. ব্যস্ত ডি. সি.র কাজে।

বিভূতি : বেশ তো, তাহলে তোমরা Locally স্বতন্ত্রভাবে Organise করো। Local Committeeকে বলো।

প্রতুল : Local Committee বলতে, আপনি তো সবই জানেন বিভূতিদা।

বিভূতি : না, জানি না। জানতে চাই না। এভাবে কোনো কিছু হয় না। খালি Self deception আর Responsibility avoid করার চেষ্টা—Class করে কি হবে ? আমি আর তোমাদের ক্লাস-ফ্লাস নিতে পারব না। কাজ নেই কম্মো নেই, শুধু Theory কপচে কি হবে ?

অনল : বেশ, ডি. সি.কে জানিয়ে দেবো।

বিভূতি : হ্যাঁ, তাই দিও। সকাল থেকে রাত বারোটা অব্দি শুধু Politics আর Politics, তারপর Partyর যদি কোনো Local Meeting থাকল তো আর কথাই নেই। সে রীতিমতো একটা মেলা—Leaders আর Cadres—বাড়ির বাচ্চাগুলো পর্যন্ত রাতে শুতে পায় না, ঘুমোতে পায় না।

অনল : কিছু মনে করবেন না বিভূতিদা—এ কিন্তু আপনি পেটি-বুর্জোয়ার মতো কথা বলছেন। বিপ্লব না হওয়া তক একটা সুস্থ পারিবারিক জীবন আপনি কল্পনা করেন কি করে ? আপনি তো দেখছি একজন সাংঘাতিক Reactioneryর মতো

কথাবার্তা শুরু করেছেন ! আপনাকে Party থেকে সেন্সার করা উচিত।

প্রতুল : Your type of Comrade should see the lamp post first.

বিভূতি : বলছ ?

প্রতুল : হ্যাঁ, বলছি।

বিভূতি : একেই বলে Militancy. ছি ছি। তুলনার কথাই টানছি না, তবে বলছি—There the Romans too behaved with Jesus in the same way, and Jesus had to bear the cross. আমি তো কোন ছার, যীশুকেও শূলে চড়ানো হয়েছিল জানো ?

অনল : Present day world-এ Israel-এর বর্তমান ভূমিকার পরও আপনি এই ধরনের Analysis করবেন বিভূতিদা ?

বিভূতি : এর ভেতরে আবার Present day world-এর কথা উঠছে কোত্থেকে ?

অনল : উঠছে, সবটাই Dialectically দেখতে হবে। নইলে একজন Marxist-এর পক্ষে Perspective পাওয়া কঠিন ! তখন এই ইসরেইলি জ্যুদের ওপর কর্তৃত্ব করত রোম, আর এখন সেখানে গেড়ে বসেছে আমেরিকা।

বিভূতি : তাতে কি হলো ? যীশু তার ক্রসক্রস সমেত উল্টে গেল ? মিথ্যে হয়ে গেল প্যালেস্টাইনের ইতিহাস ? ন্যাজারিন মিথ্যে, আইকন বরবাদ ?

প্রতুল : Class Characterটা দেখবেন না আপনি ? Polarisation-এর ব্যাপারটা ধরবেন না ?

বিভূতি : Words are all jargons if they don't make any sense. কি বলতে চাচ্ছ ? Class Struggle-এর ব্যাপারটা ধরেই আমি যীশুর সম্পর্কে ঐ উক্তি করেছি—Jesus and his lakhs and lakhs of followers as opposed to the then ruling priesthood in tie with the reactionary Roman regime. আর তোমরা বলছ কি ?

অনল : History তে আমারও Honours ছিল বিভূতিদা এবং যতদূর মনে পড়ে একটা first Classও পেয়েছিলাম।

বিভূতি : That does not make a Marxist of a man. At the most তাতে করে একজন পরিশুদ্ধ Social Democrat বা Ultra Revolutionary হওয়া যায়—আজ যা দেখছি সব চারপাশে।

প্রতুল : চশমাটা পাল্টান আপনি বিভূতিদা। নইলে এরপর Marxism-এর ভূত দেখতে শুরু করবেন।

বিভূতি : হ্যাঁ, কিন্তু Class Struggle-এর পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু দেখা-শোনা যাবে, এমন লেন্স তো আজও খুঁজে পাচ্ছি না ভাই। সন্ধান পেলে খবর দিও, চশমাটা পাল্টে নেব।

অনল : And this is outright Revisionism.

বিভূতি : Yes. And that too in the process of revision—Revised Revisionism.

প্রতুল : সেটা আবার কি?

বিভূতি : Next Party thesis. সবটাই Dialectically দেখবার চেষ্টা করছি ভাই।

অনল : You are incorrigible. একটা Radical change লক্ষ্য করছি আপনার মধ্যে।

বিভূতি : হ্যাঁ, তা করতে পারো। And may be that for the worst.

অনল : আমারও তাই মনে হয়। তা সে যা হোক, আপনার মতামত আমি ভি. সি. কে জানিয়ে দেবো এবং সম্ভবত আমরা লিখিতভাবেই দেবো।

বিভূতি : সে তুমি যে ভাবেই দাও। তবে, দেরি করো না। Sooner the better. I am sick of you.

অনল : Really, you are so sick.

বিভূতি : স্বাস্থ্যবান জানোয়ারদের নিয়ে আর সত্যি পেরে ওঠা যাচ্ছে না।

অনল : কমিউনিস্ট বলব না, আপনি অত্যন্ত ইতরের মতো কথাবার্তা বলছেন।

বিভূতি : You please clear out of my room.
সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না বিভূতিদা।

বিভূতি : I say you clear out.

(অনল ঘরের খাট ধরে টানাটানি করে)

অনল : ধর তো, ধর···Clear Out-এর নিকুচি করেছে।
(সঙ্গে সঙ্গে বিভূতি খাট চেপে ধরে। চারদিক থেকে মালিকানার দাবিতে টানাটানি শুরু হয়)

বিভূতি : কি ধর, এ-খাট আমার শোবার খাট।

অনল : পার্টির খাট। Local Partyর পয়সায় এ-খাট কেনা হয়েছে।

প্রতুল : ঐ আলনাটা বাদে এ-ঘরে যা কিছু Furniture আছে সব পার্টির।

অনল : মাইনে তো পান মাত্র সওয়া দু-শ টাকা। পার্টির পয়সা ভাঙিয়ে সংসার চলে। আপনি তো একজন রীতিমতো জোচ্চোর মশাই। আমরা তো আপনার নামে আজই সেন্সার আনব।
বেরিয়ে যাও। বলছি, বেরিয়ে যাও।

(ধস্তাধস্তি। বিভূতির স্ত্রীর বেগে প্রবেশ এবং বাধাদান)

কল্যাণী : কি হচ্ছে কি। ছেড়ে দাও।

বিভূতি : সরে যাও তুমি।

কল্যাণী : কোথায় সরব? সরতে সরতে তো খাড়াই-এর ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। আরও সরতে বলবে?

বিভূতি : (উন্মত্ত) সরে যাও। (হাতের ধাক্কায় কল্যাণী ঘুরে পড়ে)

কল্যাণী : আ-া—া—া—া···

(মাটিতে লুটিয়ে পড়ার মুহূর্তে বিভূতি ধরে ফেলে)

বিভূতি : কি হলো? কল্যাণী···

কল্যাণী : (প্রায় অচেতন) খাদ, খাদ, খাদ।

(অন্য সবাই সমভাবে বিব্রত, বিমূঢ়)

বিভূতি : কল্যাণী, কল্যাণী···অজ্ঞান হয়ে গেছে!

অনল : এই প্রতুল, জল, জল।
(দৌড়ঝাঁপ। চোখে মুখে জলের ঝাপটা। গোঙানি।

ধরাধরি করে কল্যাণীকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এক মুহূর্তের জন্য মঞ্চ অন্ধকার। আলো জ্বলতে দেখা যায় বিভূতিবাবু আপস্টেজে দাঁড়িয়ে আছেন। সংশ্লিষ্ট পার্টি নেতার প্রবেশ। হাতে পোর্টফোলিও। কমরেড সময়োচিত গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলেন)

কমরেড : Local Committee ও District Committeeর পক্ষ থেকে Provincial Committeeর কাছে আপনার নামে লিখিত-ভাবে যে-দুখানা Petition করা হয়েছে, তার Contentsটা বোধকরি আপনি জানেন বিভূতিবাবু।

বিভূতি : কিছু কিছু।

কমরেড : জানেন এই কারণে যে ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে Local Committee ও District Committeeর কমরেডরা, সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং প্রকাশ্যভাবে আপনার বিরুদ্ধে তাঁরা যে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, আপনি তার একটারও সদুত্তর দিতে পারেন নি।

বিভূতি : প্রয়োজন বোধ করিনি।

কমরেড : যাই হোক, দেননি। এইটাই হচ্ছে Fact. দেননি, উপরন্তু Party Wayতে সেইসব অভিযোগ Thrash Out না করে আপনি Unlike পার্টিমেম্বার অত্যন্ত মধ্যবিত্তসুলভ মনোভাব দেখিয়ে কমরেডদের কাজের নিন্দে করেছেন, পার্টিকে Slander করেছেন এবং এমন-একটা দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন যে Provincial Committee শেষ পর্যন্ত আপনার ওপর সেন্সার আনতে বাধ্য হয়েছে। আপনি পার্টির একজন পুরনো কমরেড, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে অনেকদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, তাই অতি-কম এক বছরের জন্য আপনাকে পার্টি থেকে Suspend করা হলো। আপনার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপই···

বিভূতি : (পাগলের মতো চেঁচায়) ইনকিলাব···

কমরেড : (অবাক হন) আর ইদানিং দেখছি নিজের মাথার ওপরেও আপনার খুব-একটা এক্তিয়ার নেই।

বিভূতি : —জিন্দাবাদ।

কমরেড : (স্বগত) এ-স্লোগানের কি অর্থ হয় ? কেন স্লোগান ? কিসের জন্য স্লোগান ?

বিভূতি : ইন—ক্লাব···

কমরেড : আপনি আপনার পার্টিকার্ড ইতিমধ্যে পার্টি অফিসে জমা দিয়ে দেবেন। (কমরেড প্রস্থানোদ্যত। অনলের প্রবেশ)

অনল : কি ব্যাপার অবনীদা ?

কমরেড : মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট। যা হোক, আপাতত লক্ষ্য রেখো ! হ্যাঁ, কল্যাণী কেমন আছে ?

অনল : কল্যাণীদি···

কমরেড : ডাক্তার কে দেখছে ?

অনল : নারায়ণদা।

কমরেড : যদি কোনো দরকার হয়, পার্টি অফিসে দেখা করো।

(কথা বলতে বলতে উভয়ের প্রস্থান।

বিভূতি খানিকক্ষণ নিষ্পলক স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। ঘরের ভেতরে আড়াআড়িভাবে টাঙানো কাপড়-চোপড় মেলবার দড়িটা হঠাৎ একটানে খুলে ফেলে। খাটটা টেনে মাঝখানে আনে। তার ওপর চেয়ার লাগায়। তারপর সিলিং-এর হুক-এর সঙ্গে দড়ি খাটায়। nooseটা ঠিক করে। এবার গলায় দড়ি দেবে। ঝুলবে। ঝুলতে গিয়ে পায়ের নিচে চেয়ারটা পড়ে যায়।

আসল কারণটা কিন্তু অন্য। বিভূতি যখন গলায় দড়ি দেবে বলে nooseটা হুক-এর সঙ্গে খাটাচ্ছিল, তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকে অনল বিভূতির এই চিত্তবিভাবনা ও তৎসঞ্জাত আক্ষেপ-বিক্ষেপ লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে ছুরি হাতে সে ঘরের মটকায় উঠে যায়। এবং বিভূতি যখন ঝুলতে যাবে, তখন ঐ ছুরি দিয়ে অনল দড়িটা কেটে দেয়।

[বিভূতি যখন গলায় দড়ি দিতে যাবে তখন সামনের মঞ্চ এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকার করে একটা cut out, মাঝখানে অনল

আর দোদুল্যমান রজ্জুটিকে compose করে এই illusion সৃষ্টি করতে হবে]

সঙ্গে সঙ্গে বিভূতি ধড়মড় করে চেয়ার সমেত নিচে পড়ে যায়। মনে তার খটকা লাগে। nooseটাই তাহলে ভালো করে খাটানো হয়নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে বেপরোয়া হয়ে আবার গলায় দড়ি দিতে যায়। তার এবারের প্রক্রিয়া আরও মরীয়া, আরও সতর্কতাপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও অনল একই বিভ্রান্তি ঘটায়। ফলে হতক্লান্ত বিভূতি হতাশ হয়। তার গলায় দড়ি দেবার আর কোনো উৎসাহ থাকে না। হেরে গেছে সে। ফাঁস লাগানোর মতো শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। হাতে ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে মর্মান্তিক হতাশায় সামনের দিকে চেয়ে থাকে। এমন সময় অনল ঢোকে। দড়িতে টাঙানো শাড়ি ফ্রক পেনি মাটিতে লুটোচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে পেছন দিক থেকে বিভূতির গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে)

অনল : ঝুলছেন তো বুঝলাম, কিন্তু এগুলোর দায়িত্ব কে নেবে? কল্যাণীদির সঙ্গে আপনি না প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন? আর আপনার মনুষ্যত্ব? তারই বা আপনি কি জবাব দেবেন?···চুলোয় যাক পার্টি, বাদ দিন Communism, আপনি তো গোটা একটা মানুষ। ইঁদুরের মতো পালাচ্ছেন কেন? Now get up. Go ahead. Walk straight into the noose and hang down your head. Do it. (খাটের ওপর ছুরিটা ছুঁড়ে মেরে অনল বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ছুরিটা বিদ্ধ হয়ে কাঁপতে থাকে। নিরুপায় বিভূতি তখন লম্বা দড়িটা নিজের গলায় জড়াতে থাকে। পাকে পাকে দড়িটা মোটা হয়ে চেপে বসে। বিভূতির চোখেমুখে রক্ত ঠিকরে বেরুতে চায়। তারপর হাত শিথিল হয়ে আসে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে)

বিভূতি : (ভাঙা গলায়) কল্যাণী! কল্যাণী! কল্যাণী! (সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণীর প্রবেশ। কল্যাণী ঠিক নয়। কল্যাণীর প্রেত। কালো কামিজটা বিভূতিকে কেন্দ্র করে সারা ঘরে

নেচে বেড়ায়। বিহ্বল বিভূতি দেখে, ধরতে চায়, আর নাম ধরে ডাকে—কল্যাণী! কল্যাণী! উধাও হয়ে যায় কালো কামিজ। পরাহত বিভূতি সামনে ঝুঁকে পড়ে তেমনি বিষণ্ণ তাকিয়ে থাকে। ক্রমশ অন্ধকার)

[সঙ্গে সঙ্গে ডুগডুগি ও ঢোলকের সঙ্গতে মাদারির কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ে]

মাদারি : ছোকরা!

ছোকরা : হাঁ।

মাদারি : তুসরি হাড্ডিকা খেলা দেখায়া ?

ছোকরা : দেখায়া।

মাদারি : ঠিকসে বাতায়া ?

ছোকরা : ঠিকসে বাতায়া।

মাদারি : ইমানসে বাতায়া ?

ছোকরা : ইমানসে বাতায়া।

মাদারি : কেক্‌রা কেয়া বাতায়া ?

ছোকরা : ঝাণ্ডেকো কিস্‌সা বাতায়া।

মাদারি : আব উস্কা কেয়া হাল ?

ছোকরা : তিনো টুকরে।

মাদারি : জান্তা দো টুকরে—ঔর এক টুকরে কিধর গিয়া ?

ছোকরা : জঙ্গলমে ঘুসা।

মাদারি : কোনসা জঙ্গল ?

ছোকরা : হিম পাহাড়কা গোদমে।

মাদারি : যায়েগা ?

ছোকরা : যায়েগা।

[ডুগডুগি ও ঢোলকের বাজনা দুনে উঠে কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রুত হয় ঐকতান]

উচে হ্যায় সবসে উচা
হামারা পিয়ারা হিন্দুস্থান
হ্যায় সবসে উঁচা …

(ক্রমশ)

সামাজিক সহাবস্থান

নারায়ণ চৌধুরী

রাজনীতিতে সহাবস্থান আজ একটি বাস্তব সত্য। বিশেষত, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়মনের বেলায় সহাবস্থান একটি বিশেষ কার্যকর আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নীতির আনুগত্যের দ্বারা বহু অনাবশ্যক অশান্তি উপদ্রব সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে, এমনকি যুদ্ধের সম্ভাবনাও এই প্রক্রিয়ায় বহু পরিমাণে তিরোহিত হয়েছে। সহাবস্থান-তত্ত্বের মধ্যে যে পারস্পরিক সহনশীলতা, শান্তিপ্রিয়তা "নিজে বাঁচা ও অপরকে বাঁচতে দেওয়া"র মনোভাব নিহিত আছে—তার মূল্য অপরিসীম বলতে হবে।

সহাবস্থানের এই তত্ত্বকে রাজনীতির স্তরেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যায় না কি? গেলে আমাদের একের অপরের প্রতি মনোভাব আচরণ ইত্যাদি কত মধুরই না হতো! ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহনশীলতার চর্চার দ্বারা কত উপদ্রব দৌরাত্ম্য আর অযথা শক্তিক্ষয়ই না নিবারণ করা যেতে পারত! নাগরিক জীবনে, বিশেষত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা আর মতামতের পার্থক্য ব্যক্তিগত সম্পর্ককে আড়াল করে দাঁড়ায়। মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি যেখানে শ্রদ্ধা ভালোবাসা স্নেহ প্রীতির অভিব্যক্তি স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া উচিত, সেখানে দেখা যায় মতামতের উগ্রতা বড় হয়ে উঠে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা ও মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছে। এটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় আমরা সকলেই বুঝি, কিন্তু আমাদের ব্যবহার আমাদের বোঝার অনুরূপ হয় না। হয় না এ কারণে যে, আমরা প্রায়শ মতটাকে মানুষের উপরে স্থান দিই।

মানুষের ভালোর জন্যেই আমাদের যত কিছু চিন্তা-ভাবনা-কর্মতৎপরতা—সে রাজনীতির ক্ষেত্রেই হোক আর অন্যবিধ ক্ষেত্রেই হোক। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশ্বাস-বুদ্ধি মতো মানুষের ভালোর চেষ্টায় নিরত। অবশ্য জেনেশুনে-অন্যায়কারী কায়েমী স্বার্থবাদী, অপরিমিত মুনাফাগৃধ্নু ধনিক ও বণিক, দুর্বলের পীড়ক ও শোষক এবং পরের দুর্গতিতে আনন্দ-চেপে-না-রাখতে পারা দুরারোগ্য মনোরুগ্নদের কথা আলাদা। এদের বাদ দিয়ে অন্য সকলের

হিসাব নিলে দেখা যাবে— মানুষ প্রতিষ্ঠানগতভাবেই হোক আর ব্যক্তিগত স্তরেই হোক—নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সমাজের উন্নতিকামী, লোকহিতাকাঙ্ক্ষী। কী হলে সমাজের উন্নতি হয়, লোকহিতের শ্রেষ্ঠ পথ কোন্‌টা—এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বহুতর মতভেদ আছে। থাকাই স্বাভাবিক, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যই এই মতের বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী। কিন্তু তার জন্য পরস্পরের মানবিক সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলার আবশ্যকতা হয় না। কার্যত কিন্তু এ-জাতীয় তিক্ততাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের পরিণামফল হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ, নাগরিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেই যেন এমনতরো অভিশাপের প্রাবল্য বেশি। এতে যে কী-পরিমাণ ভুলবোঝাবুঝি শান্তিনষ্ট, মানসিক কষ্ট ইত্যাদি জনিত শক্তিক্ষয় সমাজমধ্যে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে তার আর লেখাজোখা নেই।

কিন্তু কেন এই শক্তিক্ষয়? একে কি নিবারণ করা যায় না? কোন উপায়ে এই শক্তিক্ষয়ের নিবারণ সম্ভব? এ সকল প্রশ্ন নিয়ে আমি অনেক সময় নিজের ভিতর তোলাপাড়া করেছি। এই সূত্রে যে সকল ভাবনা-চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হয়েছে তারই নিষ্কর্ষ আজ পাঠকদের সামনে উপস্থিত করব বলে লেখনী ধারণ করেছি।

আমার মনে হয়, শহর জীবনে, সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রায়ই যে অশান্তি আর ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ দেখা যায় তার মূলে আছে অপরকে নিজ মতের অনুবর্তী করে তোলবার নাতিস্পষ্ট ইচ্ছার ক্রিয়া। যখন এই ইচ্ছা অনতিস্পষ্টতার স্তর থেকে সক্রিয় চেষ্টার স্তরে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকেই বলি আমরা জুলুম—জবরদস্তি—'রেজিমেণ্টেশন' অর্থাৎ চিন্তাক্ষেত্রে জোর করে সমতাবিধানের উদ্যম। মানুষের মনে জুলুম-জবরদস্তির বিরুদ্ধে সহজাত প্রতিরোধের মনোভাব বর্তমান, সুতরাং সক্রিয়ভাবে কেউ কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বমতানুবর্তী করবার চেষ্টা করলে শান্তি ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। এই বিপত্তির সম্ভাবনা তো সব সময়েই আছে এবং বর্তমান সমাজস্থিতিতে—যখন মতামতের ভেদবৈচিত্র্য আর এক মত থেকে অন্য মতে 'কনভার্সান'-এর চেষ্টার রেওয়াজ খুব প্রবল—তাকে অবধারিত বলেও ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু সক্রিয় উদ্যমটাই তো একমাত্র ভাবনার বিষয় নয়, সূক্ষ্ম ইচ্ছার ঘাত-প্রতিঘাতও মানুষের মনে বড় কম তিক্ততার সৃষ্টি করে না। অপরের নিকট অনভিপ্রেত কোনো মত যদি আমি তার উপর অতি সূক্ষ্ম

উপায়েও চাপাবার চেষ্টা করি, তা হলেও সহজাত সংস্কারবশে সে তার প্রতিরোধ করতে বাধ্য। মানুষে মানুষে আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলাটা প্রায়শ মনস্তাত্ত্বিক স্তরে চলে, মনোগত ইচ্ছাকে সোচ্চারে জানান দেবারও প্রয়োজন হয় না। কে কার সম্পর্কে কী ইচ্ছা বা মনোভাব পোষণ করে তা আঁচ করে নিতে লোকের বেগ পেতে হয় না।

এই যদি লোকব্যবহারের নিয়ম হয় তবে কেন আমরা লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ সুন্দর শান্তির সহায়ক আদর্শ রূপে সহাবস্থানকে স্বীকার করে নেব না? কেন আমরা অযথা সংঘর্ষের পথে পা বাড়াব? সমাজে বিচিত্র ভাবের ও মতের আলোড়ন-বিলোড়ন চলুক, চলুক নানাবিধ দৃষ্টিকোণের অনুসন্ধিৎসু বিচার ও মন্থন। খোলা মন নিয়ে প্রতিটি চিন্তাদর্শকেই যাচাই করে দেখা হোক, পরস্পরবিরোধী মতামতের জটিলতা থেকে সত্যকে নিষ্কাশিত করে নেবার চেষ্টা হোক। সত্যসন্ধান আর সত্য প্রতিষ্ঠার এই অনুশীলনে শুধু শর্ত হওয়া চাই এই যে, যিনি যে-মতই প্রচার করুন-না কেন, তা তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মতো জনকল্যাণের সহায়ক হবে বলে তাঁর নিজের বিশ্বাস থাকা চাই। এই যদি প্রারম্ভিক সূত্র হয়, তবে আর অনাবশ্যক স্বার্থসংঘর্ষ মতসংঘাত একের-উপর-অপরের-জবরদস্তি করে-মত-চাপানোর দৌরাত্ম্য কেন?

কথাগুলি বিবৃতির স্তর থেকে উদাহরণের স্তরে নিয়ে এলে মন্দ হয় না। উদাহরণে অস্পষ্ট কথা স্পষ্ট হয়, নিরবয়ব চিন্তা অবয়ব পায়। বক্তব্য অনুধাবনে পাঠকের তাতে সুবিধা হয়।

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ প্রায়-একটানা কলকাতায় আছি। এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বহুতর মতের ও দলের লোকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়েছে। এই বিচিত্র সাহচর্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আর-কিছু শিখি আর না-শিখি এই শিক্ষা হয়েছে যে, মানবচরিত্রের জ্ঞান অর্জন করতে দু-চার বছর কাল মোটেই যথেষ্ট নয়, একটা গোটা জীবন কেটে গেলে তবে বুঝি কতকটা কাজ চালানো গোছের মানবচরিত্রজ্ঞানের কিনারায় এসে পৌছনো যায়। যখন বয়স এবং অভিজ্ঞতা—উভয়ত কাঁচা ছিলাম, চিন্তাধারার দিক দিয়ে মফঃস্বলীয় ছিলাম বলতে গেলে, তখন ধারণা ছিল মতান্তরের ফলে বুঝি মনান্তর হয় না। ওই কাঁচা বিশ্বাস মনে থাকায় চুটিয়ে লোকের সমালোচনা করেছি, মনের কথা মুখে প্রকাশ করার তথাকথিত স্পষ্টভাষিতার আনন্দে অতি নিকটতম বন্ধুকেও অতি কঠিন কথা বলতে ছাড়িনি। ভেবেছি ওটা

তো মতান্তরের ব্যাপার তার জন্য মনান্তর হবে কেন। কিন্তু হায়, বাস্তব জীবনের সত্য কী নির্মম আর কঠিন! অনেক ঠেকে শিখে অনেক ঘা খেয়ে ওই পথ আজ ছেড়েছি। দেখেছি স্পষ্ট কথা বললে নিকটতম বন্ধুকেও হারাতে হয়। সমালোচনা যত ন্যায্যই হোক, কেউ তার নিজের সযত্নলালিত ধারণা-বিশ্বাসের উপর অপরের মতের দৌরাত্ম্য সহ্য করে না, যতক্ষণ না অবশ্য সে নিজে তার ভুল বুঝতে পারে বা অপরের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেউ কাউকে বক্তৃতা দিয়ে শোধরাতে পারে না। সত্য সর্বদাই আপনার ভিতর থেকে উদ্ভাবিত হওয়া আবশ্যক। তবেই কেবল সংশোধনের ভিত্তি পাকা হওয়া সম্ভব।

এই দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায়, সমালোচনা যত ন্যায্য আর সময়োচিতই হোক-না কেন, জোর করে তা অপরের উপর চাপাতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য। মতান্তর তখন মনান্তরে পরিণতি লাভ করতে বাধ্য। মনান্তরের পরিণামে ব্যবধান, বিচ্ছেদ, বিরোধ। শত্রুতাচরণও অকল্পনীয় নয়। এতে অহেতুক শক্তিক্ষয়, অহেতুক অশান্তি; যে-শক্তিক্ষয় আর অশান্তি চেষ্টা করলে নিরোধ করা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এমন ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা হচ্ছে: প্রত্যেকেই যে-যার জ্ঞানবুদ্ধিসম্মত মতামত স্বাধীনভাবে কিন্তু অসূয়ালেশহীন ভাবে প্রচার করুক, সমাজের আকাশে-বাতাসে নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গ অবাধে ভেসে বেড়াক, বিভিন্ন বিরোধী চিন্তাদর্শ নিয়ে শান্তি ও বন্ধুতাপূর্ণ আবহাওয়ায় মতের বিনিময় আর বিচার-প্রচার চলুক। কেউ কাউকে স্বমতে আনবার জন্য জুলুম করবে না, এমনকি সূক্ষ্মভাবেও চাপ সৃষ্টি করবে না। এই সব বিচিত্র ভাবের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে যাঁর যেরূপ অভিরুচি মতামত গ্রহণ করুন, তা দিয়ে স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলুন, কিন্তু দোহাই— মতসংঘাতের সূত্রে হাতাহাতি চুলাচুলি মারামারির মধ্যে যাবেন না। সে বড় কুৎসিত জিনিস দেখতে। সমস্ত আবহাওয়াটাই তাতে বিষিয়ে ওঠে। যা বিচার-প্রচার-অনুশীলনের বস্তু, তা যদি অনুশীলনের স্তরে না থেকে হিংসাশ্রয়ী বাদানুবাদের স্তরে নেমে আসে, তা হলে বৌদ্ধিক চর্চার আনন্দ আর থাকে না, মনের বিষয় তখন রণের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়ে সব কিছু তেতো করে দেয়।

সত্য প্রতিষ্ঠার রীতিই হচ্ছে এই যে, তাকে পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের মধ্যে ফেলে যাচাই করে নিতে হয়। তারপর সিদ্ধান্ত করতে হয়। দুই বিপরীত প্রান্তীয় মতের কোনোটাতেই সত্য নেই, সত্য থাকে প্রায়শ মধ্যপথে— যে মধ্যপথকে যুগ যুগ ধরে জ্ঞানীগুণীরা 'দি গোল্ডেন মীন' বলে অভিহিত করে

গেছেন! বৌদ্ধদের 'মজ্‌ঝিমনিকায়' এই মধ্যপথের সাধনারই নির্দেশ করছে। গ্রীকদের চিন্তাদর্শেও ছিল এই মধ্যপথের সচেতন অনুবর্তন। আজকালই আমরা শুধু বড্ডবেশি প্রান্তীয় মতের চর্চা করছি। প্রান্তীয় মত অর্থাৎ কিনা 'এক্সট্রিম ভিউজ'—এমন গাজুরি ভাবে যাঁর যাঁর নিজস্ব চূড়ান্ত মতকে আঁকড়ে ধরে আছি যে সেই মতের পানটি থেকে চুনটি পর্যন্ত খসতে দিতে আমরা রাজী নই। কেউ খসাতে এলে তাঁর সঙ্গে লাঠালাঠি অনিবার্য। কিন্তু এ-কথা একবার ভুলেও ভেবে দেখি না যে, অপর পক্ষেরও একটা বক্তব্য থাকতে পারে এবং সে-বক্তব্যের মধ্যে কিছু সারবস্তু থাকলেও থাকতে পারে-বা। 'দি আদার মেনস পইণ্ট অব ভিউ'—অপরের দৃষ্টিকোণ—স্বীকার না করতে পারি, তাকে অনুধাবন করতেও যদি আমরা অপারগ হই, তা হলে আর যে-কিছুরই অভিমান আমাদের সাজুক, সত্যসন্ধানের অভিমান অন্তত সাজে না।

এই প্রসঙ্গে সমন্বয়ের কথাটাও ন্যায়সঙ্গতভাবে এসে পড়ে। বিভিন্ন বিরোধী ভাবধারার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রক্রিয়াকে বলে সমন্বয় এবং এই সমন্বয়ের আদর্শকে আমরা সচরাচর খুব মূল্যও দিয়ে থাকি। সমন্বয় যদি গোঁজামিল না হয়, তা যদি সত্যি সত্যি বিভিন্ন পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তাদের সকলের সমবায়ে অথচ তাদের সকলকে ছাড়িয়ে একটি বৃহত্তর মহত্তর অখণ্ড সত্যে পৌছবার চেষ্টা হয়, তবে সেই আদর্শ কেনই বা সম্যকদর্শী বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিদের গ্রহণীয় হবে না? রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়ের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন। সকলেই জানেন কবির সত্যসাধনা ছিল সমন্বয়পন্থী। তিনি প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, জীবন-বৈরাগ্য ও জীবনপ্রীতি প্রভৃতি দুই বিপরীত সারির মূল্যবোধকে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার সংশ্লেষণী শক্তিগুণে জোড়া লাগিয়ে তাদের অতিক্রম করে এক উচ্চতর সত্যে গিয়ে পৌছেছিলেন। তাঁর এই সমন্বয়ী ক্ষমতা ছিল বলেই এই অত্যাশ্চর্য—সংঘটন তাঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে যে-কবি জীবনভর ভারতীয় উপনিষদীয় শ্রেয়োবোধের জয়গান করেছেন, তিনিই কিনা জীবনের সায়াহ্নে এসে, প্রায় সত্তর বছর বয়সের মাথায়, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ শুধু প্রভূত সহিষ্ণুতার ক্ষমতাযুক্ত অতিশয় মহৎ মনের মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

সমন্বয়ের এই যদি ভিতরের কথা হয় এবং তার যদি এতই সদ্‌গুণ থাকে তাহলে রবীন্দ্রনাথের সদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের

বিষয়েও কেন সমন্বয়ের আদর্শ অনুসরণ করব না? দুই বিরুদ্ধ ভাবের বিরোধ নিষ্পত্তিতে কেন সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করব না? যে 'মধ্যপথ'-এর কথা পূর্বে বলেছি, তারই অপর নাম সমন্বয় নয় কি? সমন্বয়, সামঞ্জস্য, স্বর্ণখচিত মধ্যপথ—এগুলি শব্দান্তর মাত্র। এর প্রত্যেকটি কথায় সম-অর্থের ব্যঞ্জনা নিহিত রয়েছে। চূড়ান্ত বিপরীত মত থেকে সরে এসে মধ্যপথে দাঁড়াতে গেলে যে প্রণালী অবলম্বন করতে হয়, সেই প্রণালীরই আরেক নাম সমন্বয়।

আমি নিজে এ-বিষয়ে খুব সচেতন যে, এসব অত্যন্ত গালভরা কথা, মস্ত মস্ত বুলির মতো শোনাচ্ছে। জীবনের নানাবিধ বাস্তব-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে এই জাতীয় বড় বড় কথার সার্থকতা কোথায়? সমন্বয়, মধ্যপথ, চিন্তাচর্চার স্বাধীনতা, সামাজিক সহাবস্থান··জাতীয় তত্ত্বকথা আউড়ে কি ফল, যখন দেখা যায় কাজের সংসারে কাজের নীতি প্রয়োগ করাটাই অনেক বেশি ফলদায়ক? এমন সব কেজো লোকের কথা জানি, যাঁদের যে-কোনো রূপ তত্ত্বকথা শুনলেই মাথায় খুন চেপে যায়। কেউ কেউ তত্ত্বকথার প্রচারককে আক্ষরিক অর্থে তেড়ে মারতেও আসেন। কিন্তু যিনি যা-ই বলুন, তত্ত্ব ভালোই লাগুক আর মন্দই লাগুক, জীবনে তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা আছেই। পৃষ্ঠে তত্ত্বকথার পটভূমি না থাকলে কাজের কথাও তলিয়ে পড়ে। আগে চিন্তা তারপর কাজ। ভাবনা-চিন্তা না করে কাজ করতে গেলে, কাজের নীতি স্থির না করে লোকব্যবহারে অগ্রসর হলে, বিড়ম্বনা কেউ খণ্ডাতে পারে না।

সহনশীলতার অভাব, অপরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারা রূপ অক্ষমতা সমাজজীবনে কত যে অশান্তির সৃষ্টি করে—তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই। আমার কিছু কিছু কংগ্রেসী বন্ধু আছেন যাঁরা কমিউনিস্টদের নাম শুনলেই ক্ষেপে যান। কেউ কমিউনিস্ট মতাবলম্বী এ কথা জানা বা শোনামাত্র যেন তাঁদের গায়ে ছ্যাঁকা লাগে। কমিউনিস্টের সাহচর্যে আসতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি। কোনোরূপ ব্যবহারিক লেনদেনে আসতে চাওয়ার তো কোনো কথাই ওঠে না। এখন, এমনতর মনোভঙ্গিকে আপনি কী বলবেন? এ কি ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে না? এ কি মার্কিনীদের কমিউনিস্ট-ফোবিয়ার সমগোত্র নয়? মনোবিকলনকারীর পরীক্ষণের বিষয় নয় কি এ? আমরা নানারকম অ্যালার্জির কথা শুনে থাকি—কেউ লাল রঙ সহ্য করতে পারেন না, কারও আম খেলে অম্বল হয়, কারও রসগোল্লায় অরুচি, কেউ-বা বিশেষ ধরনের চেহারার অথচ কার্যত অনিষ্টসম্ভাবনাহীন কোনো মানুষের সংস্পর্শে এলে

অসোয়াস্তি বোধ করতে থাকেন, কেউ আর-কিছু সইতে পারেন না—এ-ও কি সেই জাতীয় একটি 'অ্যালার্জি'র নমুনা নয়? আমি তো নিজে কমিউনিস্ট নই, কই আমার তো ও রকম 'অ্যালার্জি' হয় না? তা হলে ওঁদের ওই বহুমূল্য কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট-বিমুখতার কারণ কী? রাজনৈতিক দাদাদের মুখে শোনা কৈশোরে লব্ধ কোনো পক্ষপাতী শিক্ষা কি এই বিরূপতার মূলে আছে? না কি মার্কসীয় তন্ত্র অধ্যয়নের পর এই শাস্ত্রের তথাকথিত ভ্রান্তি মনে গেঁথে গিয়ে মনের এমনতর মজ্জাগত বৈরূপ্যের জন্ম দিয়েছে? না কি কোনো আকস্মিক সংস্কার—যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই—সহসা মনের উপর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করে মনকে আপসহীনভাবে সাম্যবাদী তন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিত করেছে? কে এই ধাঁধার জবাব দেবে?

কখনও কখনও কৌতূহলী হয়ে ওই বন্ধুদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতার হেতু জানবার চেষ্টা করেছি। তাঁদের কাছ থেকে যে-জবাব পেয়েছি, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। অন্তত আমাকে সে-সব যুক্তি মজাতে পারেনি। ওগুলি যেকোনো মতের ও ঢঙ-এর 'ন্যাশানালিস্ট ক্যাম্প'এ চালু ধরতাই বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। ওই সব ছেঁদো কথা সামান্য পরীক্ষার ধোপেও টেকবার নয়।

যেমন, সাম্যবাদীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। বেশ, তর্কের খাতিরে মানলুম সাম্যবাদীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, তারা সার্বিকতার নীতিতে আস্থাশীল। কিন্তু তোমরাই কি গণতন্ত্রে বিশ্বাসবান? স্বাধীনতার পর বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসনের রেকর্ড থেকে তো অন্তত এ কথার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সর্বপ্রকার ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে যেকোনো প্রকারে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে থাকা, ছলে-বলে-কৌশলে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করা, ধনিক-বণিকের স্বার্থে এবং জনস্বার্থের বিপরীতে স্বৈরশাসনের জুলুমবাজী চালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি যদি গণতন্ত্রের নিদর্শন হয়, তবে কংগ্রেসীদের মতো এমন নিখাদ গণতন্ত্রপ্রেমী আর কে আছে?

কাজেই এসব গণতন্ত্র-টনতন্ত্রের কথা অছিলা মাত্র, আসলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মজ্জাগত বৈমুখ্য প্রদর্শনের এ-একটা প্রকরণ। স্থূল প্রকরণ, কিন্তু সকলপ্রকার যুক্তিহীন বিমুখতাই কি স্থূলতামণ্ডিত নয়?

কংগ্রেসীদের আর-একটি যুক্তি—সাম্যবাদীরা হিংসায় বিশ্বাস করে। তাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবই নাকি তাদের হিংসায় প্ররোচিত করে। কংগ্রেসীদের

মতে, একদিকে গণতন্ত্র ও অহিংসা ; অন্যদিকে গণতন্ত্র-বিরোধিতা ও হিংসা। গণতন্ত্রের সঙ্গে নাকি অহিংসার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। হয়তো তা-ই। কিন্তু তা যদি হয় তো সাম্যবাদ-বিরোধীরা নিজেদের জালেই নিজেরা জড়িয়ে পড়বেন। কংগ্রেসীদের বিশ-বাইশ বছরের গণতান্ত্রিক শাসনে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর যত গুলি-গোলা চলেছে, এমন বোধহয় ইংরেজ আমলেও সংঘটিত হয়নি। তা হলে আর এত অহিংসার বড়াই কেন? অহিংসা যদি সার্থক গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়—এ-কথায় সন্দেহ প্রকাশের হেতু দেখা যায় না—সে-ক্ষেত্রে ওই মানদণ্ডের বিচারেই নির্দ্বিধায় বলা যায় কংগ্রেসীরা গণতন্ত্রী নন। তাঁদের হিংসাচারই তাঁদের গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব মানি যখন এঁরা কমিউনিস্টদের 'একস্ট্রা-টেরিটোরিয়াল লয়্যালটি'র অর্থাৎ বৈদেশিক আনুগত্যের ধুয়া তুলে তাঁদের জব্দ করতে চান। এ-ক্ষেত্রেও আমার অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের পাল্টা যুক্তিতে চেপে ধরতে চাই। এই পাল্টা-যুক্তির প্রকরণ অনেকটা গ্রীক সোফিস্টদের ধারার অনুরূপ। এই প্রণালী অবলম্বন করে অনেক পরিস্ফীত বেলুনকেই এক লহমায় চুপসিয়ে দেওয়া যায়। সাম্যবাদীরা না-হয় রুশ দেশ বা চীন দেশের অনুগত, কিন্তু জাতীয়তাবাদের একচেটিয়া কারবারী কংগ্রেস যখন আমেরিকার কাছে দেশকে বিকিয়ে দেবার উপক্রম করে, ঋণের দায়ে তাদের জান-মালের মালিক মার্কিনী কর্তাদের দোরগোড়ায় চুল পর্যন্ত বাঁধা রাখে, তখন সে বিষয়ে এঁরা নিশ্চুপ কেন? এটা বুঝি 'একস্ট্রা-টেরিটোরিয়াল লয়্যালটি' নয়? নাকি সব যুক্তি সবার প্রতি প্রযোজ্য নয়? রামের বেলায় যে-নজির খাটাতে চাইব, শ্যামের বেলায় সে-নজির খাটাতে গেলেই আপত্তি?

এই গেল এক দিকের কথা অন্য পক্ষেও সমান প্রবল না হলেও, অনুরূপ ছাঁচের বিরূপতা যে চোখে না পড়ে এমন নয়। যে সব বন্ধু মার্কসীয় তত্ত্ব স্বীকার করেন না বা তার গভীরে প্রবেশ করেন নি বা ঐ মতবাদ অনুধাবনে যথেষ্ট ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন না, একাধিক বামপন্থী বন্ধুর মধ্যে তাঁদের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে দূরে ঠেলে রাখা তো হয়ই, কখনও কখনও এমনকি তাঁদের সঙ্গে 'অচ্ছুত'-এর মতো আচরণ করা হয়। তাঁরা যেন সৃষ্টিছাড়া জীব, সমাজের একেবারের বাইরের পৈঠায় যেন তাঁদের অধিষ্ঠান—জল-অচল ও অনাচরণীয়।

কিন্তু এ-রকম মনোভাব কেন হবে? এ-জাতীয় অসহিষ্ণুতা নির্মোহ চিন্তাচর্চার মূলেই যে কুঠারাঘাত করে! সকলের গ্রহণক্ষমতা সমান থাকে না, সকলের আগ্রহের মাত্রাও সমান নয়। প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের সম্পর্কে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে চলা উচিত এবং যতোদূর সম্ভব প্রীতি ও শ্রদ্ধা ওই নিরপেক্ষতার মূলে থাকা দরকার। কেউ আমার মনোমতো পথে চলছে না বলেই যে সে ত্যাজ্য হয়ে গেল তা তো নয়। কিংবা তার ভবিষ্যৎ পরিবর্তন-সম্ভাবনাও তার দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায় না। আজ যে আমার বিপক্ষীয় চিন্তার অনুশীলন করছে, সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রসাদে সে হয়তো একদিন আমার অজানিতেই আমার পথানুবর্তী হতে পারে। কিংবা, উন্নততর চিন্তার আলোকে আমি আমার বর্তমান স্থিতি থেকে দূরে সরে যেতে পারি—সে সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং ভাবনা-চিন্তার অনুশীলনের রাজ্যে কিছুই অচল-প্রতিষ্ঠ নয়, কিছুই অনিবার্যরূপে অপরিবর্তনীয় নয়। আকাশে-বাতাসে নানাবিধ চিন্তার ঢেউ ভেসে বেড়াচ্ছে, সমাজমানস আন্দোলিত হচ্ছে বিবিধ প্রকারের মতসঙ্ঘাতের আবর্তে। এই আন্দোলন-আলোড়ন সম্পর্কে কিছুই বলার নেই, যতক্ষণ তা শান্তি ও সহাবস্থানের আবহে অনুষ্ঠিত। নিতান্ত সমাজবিরোধী জনস্বার্থ-পরিপন্থী বিকৃত মানসিকতার পরিপোষক মতামত ছাড়া আর সব রকমের মতামতেরই সহাবস্থানের সুযোগ থাকা চাই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে। সুতরাং অসহিষ্ণুতার কোনো কথা ওঠে না, জুলুম-জবরদস্তির তো নয়ই। চিন্তারাজ্যে জুলুম-জবরদস্তি একেবারেই অচল। তেমনি অচল অপরের গায়ে আগেভাগে অবাঞ্ছনীয়তার লেবেল এঁটে তাকে চিরকালের জন্য দূরে ঠেলে দেওয়ার অভ্যাস। কে কোন চিন্তাদর্শের অনুবর্তী চট্‌ করে তা বলা যায় না। যাকে বিপক্ষ-শিবিরের লোক বলে মনে করা হচ্ছে, সে যে একদিন আমার শিবিরে চলে আসবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। গোড়াতেই কাউকে বিপক্ষীয় বলে চিহ্নিত করলে ফল হয় এই যে, তার আর সংশোধনের আশা থাকে না, তাকে শুরুতেই বিপক্ষের বাহুবন্ধনে সর্বকালের জন্য ঠেলে দেওয়া হয়।

প্রগতি-অভিমানী অনেকেরই দেখি ধর্ম সম্বন্ধে বড়ই অধৈর্য মনোভাব। পূজা-আহ্নিক-উপাসনা, দেবগৃহে প্রণাম নিবেদন, তীর্থ দর্শন, গঙ্গাস্নান ইত্যাদিকে নিতান্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সেকেলে ভাব মনে করে এঁরা ধর্মাচারীদের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকবার চেষ্টা করেন। আধুনিকতা-বিলাসী কেউ

কেউ এমনতর ক্ষেত্রে প্রকাশ্যেই নাক সিঁটকোন। যেন তোমার পথে তুমি চলছ বলেই তোমার পথটা সত্য হয়ে গেল, অপরের পথে সত্যের অঙ্কুরও থাকতে পারে না। ভাবের রাজ্যে ঠিক-বেঠিক নিরূপণ করা এতো সহজ নয়। প্রগতিই বলুন আর আধুনিকতাই বলুন, অনেক দৃষ্টিভঙ্গির এ অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। সুতরাং তার ভিতর পূর্ণ সত্যের দ্যোতনা থাকার কথা নয়, থাকতে পারে না। আস্তিক্য-নাস্তিক্যের প্রশ্ন, ধর্ম-ধর্মশূন্যতার প্রশ্ন এতো হাল্কা ব্যাপার নয় যে শুধুমাত্র আধুনিকতার মাপকাঠিতে ওই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে, তথাকথিত প্রগতির বেড়ের মধ্যে তাকে বাড়ানো যাবে। ধর্মের উপলব্ধির জন্য চাই আরও অনেক গভীরতর, অনেক বেশি অতলসন্ধানী ভাবুকতা। কেউ ঐতিহ্যসম্মতধর্মপথের পথিক বলেই যদি তাকে ওই যুক্তিতে অনভিপ্রেত জ্ঞান করতে হয় এবং তার সঙ্গে অনাচরণীয়ের মতো ব্যবহার করতে হয়, তা হলে ভারতের মতো সনাতন ধর্মবিশ্বাসের দেশে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ মানুষকে এক দমকে অনাত্মীয় করে তুলতে হয়। ওটা বাস্তববুদ্ধির পথ নয়, রাজনৈতিক বিচক্ষণতার তো নয়ই। এ ক্ষেত্রেও জুলুম-জবরদস্তির কোনো অবকাশ নেই, বলাই বাহুল্য।

আসল কথা, চিন্তা বা ভাব বা আইডিয়া একটি প্রবল শক্তি। বাহ্য দৃষ্টির অন্তরালে কোটি কোটি মনের ভিতর তার অমোঘ ক্রিয়া চলছে। সমাজের ভিতর সর্ববিধ লোকহিতপ্রয়াসী চিন্তার অবাধ অনুশীলনের সুযোগ থাকা উচিত—তার মধ্য থেকে অভিরুচি অনুযায়ী গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনের স্বাধীনতাও সুরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাক্যের স্বাধীনতা, মতের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা জাতীয় প্রত্যয়গুলিকে কিতাবী প্রত্যয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের সত্যে রূপান্তরিত করা চাই। দণ্ডশক্তির বা শাস্তির প্রয়োজন সমাজবিরোধী কার্যকলাপের দমনে, জুলুমের আবশ্যক প্রতিক্রিয়ার বিষ-দাঁত ভাঙার কাজে; কিন্তু স্বাধীন চিন্তার আবহ যেন তার দ্বারা উদ্বেজিত, বিঘ্নিত না হয়। আমরা যে যে মতেরই লোক হই না কেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আমাদের মর্যাদা দিতেই হবে। ব্যক্তি সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের বিরুদ্ধাচরণ করলে তার রাশ টেনে ধরবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু যতক্ষণ না তার অনিষ্টকারী ভূমিকা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে তার পথে চলতে দিতেই হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শহরের চার দেয়ালের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করে-বাস-করা প্রতিযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মানুষদের মধ্যেই যত

রাজ্যের অসহিষ্ণুতা তিক্ততা ধৈর্যের অভাব। তাঁদের জীবন অশান্তির দ্বারা নিয়ত-আন্দোলিত। সমবায় ও সহযোগের নীতি থেকে তাঁদের জীবনাচরণ অনেক দূরে, যদিও তত্ত্বত সমবায় ও সহযোগিতার মূল্য সকলেই তাঁরা স্বীকার করেন। এ রকম ঘটবার কারণ কী? কারণ কি এই নয় যে, তাঁদের 'উচ্চ শিক্ষা'র ধাঁচ-ধরনের মধ্যেই তাঁদের আত্মকেন্দ্রিকতার মূল নিহিত আছে? এমন শিক্ষা তাঁরা আবাল্য পান যা অহং-এর বিলোপের বদলে তাঁদের আরও বেশি আত্মসচেতন আর আত্মপ্রাধান্য-প্রতিষ্ঠাকামী করে তোলে। আর এ কথা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার বোধকরি প্রয়োজন নেই যে আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহই সর্বপ্রকার অবিনয় ঔদ্ধত্য অসহিষ্ণুতার জনক। যিনি যত বেশি অহংবাদী, তিনি তত বেশি পরমতসহনে অক্ষম। বুদ্ধিজীবী কথাটার এই মানে হলেই সেটা খাঁটি মানে হয় যে, এমন ব্যক্তি—যিনি নিরপেক্ষ বুদ্ধির চর্চার আদর্শে বিশ্বাসী এবং ওই চর্চাই যাঁর জীবনের প্রধান কৃত্য ও জীবিকার উপায়। কিন্তু তা না হয়ে বুদ্ধিজীবীর মানে যদি এই দাঁড়ায় যে, যিনি কেবলই স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির শানে পালিশ চড়ান আর অপরের বুদ্ধির প্রতি কিছুমাত্র সম্ভ্রম পোষণ করেন না—তিনিই শুধু বুদ্ধিজীবীপদবাচ্য; তবে তো বড়োই মুশকিলের কথা। আত্মপ্রাধান্যের বুদ্ধি বুদ্ধি নয়, সহযোগ আর সহাবস্থানের বুদ্ধিটাই প্রকৃত বুদ্ধি। যে-বুদ্ধির অনুশীলনে ক্রোধ দমিত হয়, অসহিষ্ণুতা আর অবিনয় উগ্রতা হারায়, পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে, তেমন বুদ্ধির চর্চাই আমাদের কর্তব্য নয় কি? আমরা কি চলতি অর্থের বুদ্ধিজীবী হয়েই জীবন কাটিয়ে দেবো?

শহরবাসী শিক্ষাভিমানী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মানুষদের তুলনায় গ্রামবাসীরা নানা বিষয়ে খাটো হতে পারেন, কিন্তু এ কথায় শহরবাসীদের আত্মাভিমান যদি আহত হয়ও—তবু বলতে হবে যে, গ্রামের মানুষদের পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা বেশি, তারা সহযোগ ও সহাবস্থানে শহরের মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অভ্যস্ত। পল্লীবাসী শহরবাসীর তুলনায় শিক্ষাদীক্ষায় সংস্কৃতিতে স্বতঃই অনগ্রসর, কিন্তু তাদের এই অনগ্রসরতা তাদের প্রাণের উত্তাপকে কিন্তু মন্দীভূত করতে পারেনি। বরং সেই অনগ্রসরতাই যেন তাদের প্রাণবত্তার উৎসমূল। শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাস পড়লে মনে হয় বাঙলাদেশের গ্রামের মানুষের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কুচুটে খল মামলাবাজ, অকারণে পরের অনিষ্টতৎপর। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায়, গ্রামের মানুষের মধ্যে যে প্রতিবেশিপরায়ণতা, সহযোগের মনোবৃত্তি ও পরসহিষ্ণুতা আছে—

শহরের বাসিন্দাদের ভিতর তার সিকির সিকিও নেই। শিক্ষা মানুষের মনকে মার্জিত করে বলে জানি, তার রিপুসমূহকে সংযত করতে সাহায্য করে; কিন্তু শহরের মানুষ শিক্ষার বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও অসহযোগের মনোবৃত্তি দেখায়, তাতে তাঁদের শিক্ষার উৎকর্ষ সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ বোধ করা যায় না। বরং গ্রামবাসীরা তাদের অমার্জিত শিক্ষা, অসংস্কৃত রুচি, শিক্ষাদৈন্যের ফলজনিত অসংযত রিপুর তাড়না (যথা ক্রোধ, হিংসা, অসূয়া, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি) সত্ত্বেও কেমন করে যে সকলের সঙ্গে মানিয়ে সকলকে নিয়ে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে যুগ যুগ ধরে গ্রামজীবনে বাস করে আসছে—সেটা একটা পরমাশ্চর্যজনক ব্যাপার। গ্রামে মামলা-মোকদ্দমা হয় আর কয়টা? অশান্তি উপদ্রব কলহবিবাদের ঘটনার সংখ্যাও বোধহয় সংবৎসরের পরিধিতে আঙুলে গোনা যায়। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষের ক্রোধ হিংসা অসূয়া অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি শহরবাসীর তুলনায় প্রবলতর হওয়ারই কথা। কিন্তু বেশ তো তারা দিব্যি সব দিক সামাল দিয়ে কম-বেশি শান্তি আর প্রীতির আবহেই দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। বরং সেই তুলনায় শহরের লোকদেরই অসহিষ্ণুতা বেশি, অসৌজন্য বেশি, একের প্রতি অপরের প্রতিকূল মনোভাব বেশি। অল্পতেই তারা শত্রুতাচরণে প্ররোচিত হয়। শহরবাসীর উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের কোনো কাজেই লাগে না।

এর থেকে যে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে তা হলো এই যে, সহাবস্থান ও সহযোগিতার তত্ত্ব গ্রামবাসীদেরই সমধিক আয়ত্তে, শহরের লোকেরা এই ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।

উপরের যে সমস্ত কথা বলেছি তার থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে, যেহেতু আমি সামাজিক সহাবস্থানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছি, সেই কারণে শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে আমার বিশ্বাস নেই। ঠিক তা নয়। শ্রেণীসংঘাত আমি মানি, শক্তির 'পোলারাইজেশন' তত্ত্বেও আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আছে। বাঙলাদেশের রাজনীতিতে যেমন শিবির ভাগ সুচিহ্নিত হয়ে গেছে, সংস্কৃতি-ক্ষেত্রেও কেন ওই-জাতীয় সুস্পষ্ট শিবির ভাগ হচ্ছে না অন্যত্র এই নিয়ে আক্ষেপও প্রকাশ করেছি। কিন্তু শ্রেণীসংঘাত আর বিবদমান মতামতসমূহের 'পোলারাইজেশন'-এর জরুরি প্রয়োজন মেনে নিয়েও বলব, শ্রেণীদ্বন্দ্ব আর মতসংঘাত যতদূর সম্ভব শান্তিপূর্ণ আবহে জুলুম-জবরদস্তি-হিংসাচার বাদ দিয়ে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও সৌজন্য আমাদের সকল কাজের নিয়ন্ত্রক-প্রেরণা হওয়া চাই। রাজনৈতিক সহাবস্থানকে সামাজিক সহাবস্থানে রূপান্তরিত করতে হলে বোধহয় উপরের নির্দেশিত পথে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

দুরযাত্রা

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

শেষ যাত্রীটি স্টেশনের ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে গেলে সব শূন্য মনে হয়। স্টেশনমাস্টার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর হাতে টিকিট গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসি।

বাইরে ক্ষীয়মান দিনের আলো সব অপরিচিত করে তোলে। ধুলোওড়া-পথে খানিক এগিয়ে পেছন ফিরে তাকালে ডানদিকে, দূরে, লৌহপথ আমায় জায়গাটা চিনতে সাহায্য করে।

কয়েকজন পথচারী বসে ছিল, তারা আমার দিকে সন্দেহ নিক্ষেপ করে কি-না এইরকম ভাবতে ভাবতে খালের পারে এসে দাঁড়ালাম। বিষণ্ণ মাঝি অকস্মাৎ সাদর আহ্বান জানালে মনে পড়ে, তারা আমায় বলেছিল, "বুঝলেন, কিছুদিন আপনার বাইরে থাকা ভালো।"

মাঝি লগি তুলে নিয়ে নৌকোটা একটু ঠেলে দিলে পাছে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি এই আশঙ্কায় নড়েচড়ে স্থির হয়ে মাঝখানে বসলাম। পাড়ের যেখানটায় নৌকোটা ভেড়ানো ছিল, ঘাসগুলো সেখানে চারপাশে ছড়িয়ে অবশ পড়ে আছে। এখন নৌকোর নিচে আরও অনেক বড় ঘাসের স্পর্শ অনুভব করা যাচ্ছে। মাঝি খানিকক্ষণ বৈঠা চালাল, তারপর ধানীক্ষেতের মাঝখান-দিয়ে-চলে-যাওয়া পথের বাঁক ঘোরার জন্যে হাতে লগি তুলে নিল। বলল, "আর কিছুই থাকবো না, সব গেলো।" চেয়ে দেখলাম বামে ভাসা আমন পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

অনেকক্ষণ থেকে সে আমাদের সঙ্গে ছিল। পাখিটা। যদি নৌকোটা থামানো যেত, যদি লগিটা পুঁতে দেয়া যেত, তাহলে ও বোধহয় বসতে পারত। কিন্তু একাকী পাখি, একাকী, সে বসতে চায় না, এইরকম উড়ে যায়।

বিস্তীর্ণ মাঠভরা জল থেকে হাওয়া উঠে এলো। শীতল, জলভরা। তার গন্ধ চারপাশে ছড়ানো। কিছু গন্ধ নৌকোর সঙ্গে ভেসে চলে। ক্রমে আলো ম্লানতর হয়, মাঝির মুখাবয়ব আরও অস্পষ্ট, তার আক্ষেপ "হায়রে, সব গেলো" ক্রমে সমবেদনার অভাবে অস্ফুট হয়ে যায়।

'এইখানে বহুকাল থাকা যায়', আমার এই বাসনা কেবল অন্ধকার সব গ্রাস করে নিচ্ছে। আলোর, কচিৎ কয়েকটি আলোর বিন্দু, দূরে, জলে, নিভে,জলে, নিভে ক্রমে দিগন্ত ছেড়ে চলে যায়। এইখানে, এই জলভরা বাতাসে, গন্ধভরা নৌকোয়, বানেভাসা-আমনের পাশে থাকা গেলে তারা আমায় নিয়ে আর ভাবত না। লম্বা দালান থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি বললেন, "দেখুন, মনে হচ্ছে আপনি কিছুদিন অন্য কোথাও গেলে ভালো হতো।"

সেখান থেকে বেরিয়ে তাদের কাছে গেলাম। আসন্ন সন্ধ্যার আমেজ থেকে ওরা বঞ্চিত হোক আমি চাইনি, তবু বাগানে ওদের পাশে গিয়ে বসেছি। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে তারা আমি কি ভালোবাসি, এখন কি চাই—চা, না শরবৎ ?—প্রভৃতি ব্যাপারে ভয়ানক যত্নবান হলে আমি স্পষ্টতই বুঝতে পারি, ওদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকতে চাইলাম না, কি জানি যদি ওরা চারপাশে পর্দা টেনে সব আড়াল করে দিতে চায়। "আচ্ছা, তবে চলি", এই কথার উত্তরে তারা—"দ্যাখো, কিছুদিন বাইরে থাকলে বোধহয় তোমার ভালো হতো"—এই উপদেশ দেয়।

"আইয়া পড়ছি" বলে মাঝি ছোটো ছোটো বৈঠায় মৃদু শব্দ ঝাঁকুনি তুলে নৌকা পারে ভিড়িয়ে দিলে।

তখন আর কিছু দৃশ্যে নেই। মাঝির হাতে পয়সা তুলে দিয়ে রাস্তায় উঠে এলাম। ঝিঁঝিঁর রব, কিছু জোনাকি, বাতাসে গাছের পাতায় তোলা নিঃশব্দ হাহাকার আমার সঙ্গী হলে এই অন্ধকার গ্রাম্যপথে চারপাশ আলোকিত করে কেউ আসে। আমি তার কাছ থেকে সঠিক সন্ধান নিয়ে অগ্রসর হতে চাইলে, সে স্বেচ্ছায় আমায় বন্ধুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়ে যায়।

বন্ধু ঘরে ছিল না। দিশারী চরম বিব্রত ও ব্যস্ত হয়ে উঠলে আমি তাকে অনুনয় করে চলে যেতে বলি। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঘরের সামনে, একটি ডোবা। বাঁ পাশে ফেলে আসা পথ অনুমানে বুঝে নিই। ডাইনের শূন্যতা অন্ধকারে অস্পষ্ট। ডোবার জলে হঠাৎ ছলকানি, অযুত নিশাচর কীটের নিষ্ঠুর তিরস্কার, সামনের ডোবার পারে স্তূপীকৃত জমাট গাছের ডালে বুঝি বৃক্ষবাসী কেউ হঠাৎ সজাগ হয়। আমি তাহলে এখন কোথায় যাই ?

আলো হাতে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তখন পথের দিক থেকে টর্চের আলো জেলে ঝরা পাতা মাড়িয়ে বন্ধু এসে গেল। আমি নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায়

উঠে পড়ি। "তুই কখন এলি ?" বলে বন্ধু ধীরে আমার কাঁধে হাত রাখল। আলোকধারী দরজা খোলা হলেও একটু দাঁড়িয়ে থাকে।

টেবিলের ওপরে অল্প আলো জোরাল হলে আমাদের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে লজ্জিত হৃদয়বান এবারে তার কাজে চলে যায়।

"ভাগ্যিস অন্যদিনের চাইতে একটু সকালে ফিরে এসেছি, না হলে তোকে অনেক কষ্ট পেতে হতো।" বন্ধু বলল।

লণ্ঠনের হলুদ আলো বিবর্ণ দেয়াল বেয়ে ঝুলতে থাকে। নাতিবৃহৎ ঘর অবিন্যস্ত। চেয়ার দু-তিনখানা ইতস্তত ছড়ানো। বড় টেবিলে, মাঝারি টেবিলে, ছোটো টেবিলে কাগজ-বই ছড়ানো। এক কোণে পাতা খাটের দিকে এগোলাম। হাতের কাছের চেয়ারে ব্যাগটা রেখে বসতে বসতে আস্তে আস্তে বললাম, "কোথায় যাস, মণি ?"

অনেকদিন পরে আমি মণির চোখের দিকে তাকালাম। মণিব বড় ম্লান চোখ আনত হলো, "কোথায় আর যাব, বাজারের দিকে। কয়েকজন ছোটোখাটো অফিসার আছে, সকলেরই তো একই দশা, এই তাস-টাস খেলে খানিক সময় কাটানো।"

আমার মনে পড়ল, মণি তাস খেলতে জানত না। আমরা অলস স্কুল-ছুটির দুপুরে টোয়েন্টি এইট বা ফিস খেলার সময়ে ওকে কোনোদিন পেতাম না। দেখলাম মণির মাথার চুল বড়, দেখলাম মণি আজকাল বড় অপরিচ্ছন্ন।

জুতো ছেড়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বললাম, "তারপর, খবর বল, আমার চিঠি ঠিক মতো পেয়েছিলি ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুই বরং উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নে। রান্না করাই আছে। বেলা থাকতেই ছেলেটা সব সেরে চলে যায়। পাশের গাঁয়েই বাড়ি তো।"

মণি আর-একটা ছোটো আলো জালিয়ে ভেতরের দিকের দরজা খুলে উঠোনে পা দিলে উঠে বসি। হাতের কাছের বই দু-তিনখানা তুলে দেখলাম। তারপর উঠে বড় টেবিলের, মাঝারি টেবিলের, ছোটো টেবিলের বইগুলো আলগা হাতে নাড়তে থাকি। মণিকে আগে কোনোদিন এসব বই পড়তে দেখিনি। নিঃসঙ্গ জীবনে অনেকেই এসব পড়ে জানি।

মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল ও। আমি লক্ষ্য করলাম সামান্য সময়ের ব্যবধানে মণি এখন প্রফুল্ল। "ভালোই আছি, বুঝলি। অনেক কিছু করেছি, কাল সকালে দেখবি।"

খাওয়া শেষ করে তুজনে ঘরে এসে বসলাম। একটু চাপা গরম। বাইরে বাতাস দিতে পারে ভেবে তুজনে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। ততক্ষণে আবছা একরকম আলো কুয়াশার মতো ঝরে যাচ্ছে। চাঁদের ভগ্নাংশটুকু বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিল না। বোধহয় ভেতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যেত।

"তুই হঠাৎ এলি যে।"

তুজনে পাশাপাশি বারান্দার পৈঠায় পা রেখে বসে গেলাম। আমি তার কথায় জবাব না দিয়ে বললাম, "তুই দেখলাম অনেক বই পড়ছিস।"

"বাড়ি থেকে চিঠিপত্র পাস?" মণি অন্য কথা বলে।

"তোর শরীর আগের চাইতে খারাপ হয়েছে, বুঝলি মণি?"

"চাকরিটা আছে তো?"

"তুই কি এখন ব্রিজ খেলতে পারিস মণি?"

তারপর চুপ করে তুজনে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কাছাকাছি কোনোখানে বোধহয় শিউলি ফুটছে। মৃতু ঘ্রাণ পেলাম। ডান দিকের শূন্যতা মনে হলো মাঠ। সেখান থেকে, আরও অনেক দূর থেকে, আরও অনেক দূর থেকে ক্রমে কয়েকটা শেয়াল ডাকল।

মণি বলল, "চল, ঘুমোতে যাই।"

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল মণি অনেক কিছু করেছে, আমাকে দেখাবে। বিছানায় তাকে দেখলাম না। উঠে ভেতরে গেলে দেখি চাকর ছেলেটার সঙ্গে সে কিছু-একটা নিয়ে মহা ব্যস্ত। আমাকে দেখে কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করে, "আয়, দেখবি সব।"

আমি কি দেখব ভেবেছিলাম? রান্নাঘরের পাশে খানিকটা জমি, তাতে বোধহয় কিছু তরকারি ফলানোর চেষ্টা চলছে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে মণি ঘুরে ঘুরে সেসব দেখাতে থাকে। গোটা কয়েক ঢেঁড়শ গাছ, কোনোদিন ফল ধরবে বলে মনে হলো না। পাতাগুলো ক্রমেই কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে আসছে। একটি-তুটিতে ক্বচিৎ ফুল দেখা দিয়েছে। খানিকটা জায়গায় ডাঁটার চাষ করা হয়েছে, স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি পাতা মাথায় নিয়ে কয়েকটি লাল রঙের ডাঁটা তারই স্বীকৃতি দিচ্ছে। একটা পুঁইলতা তিন-চার হাত লম্বা হবে, তু-একটি নাখা গজিয়েছে, মাটির ওপরে পড়ে আছে। মাচা করে দেওয়া হয়নি। করে দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও মনে হলো না।

একটা কাঁকরোলের লতা বাঁশের বেড়া আঁকড়ে ধরে ঝুলছে। দু-তিনটি অতি ছোটো হলুদে-সবুজে মেশানো কাঁকরোল যে-কোনো সময় গাছ থেকে ঝরে যাবে মনে হলো।

মণি খুব উত্তেজিত। সে আমাকে বোঝাবেই কি করে এই ডাঁটা, ঢেঁড়শ, পুঁই আর কাঁকরোল তার অভাব মিটিয়ে দেবে। আমি অনেক চেষ্টা করেও চোখে সপ্রশংস চাউনি ফোটাতে পারি না। মুখ ফিরিয়ে উল্টো দিকে চেয়ে মণি তখন আকাশ দেখছিল, গাছের পাতায় রোদের খেলা দেখছিল, দূরের রেললাইন থেকে ভেসে-আসা চাকার আওয়াজ শুনছিল।

আমি তখন মুখে প্রশংসা ফোটাতে চাই, "বেশ ভালো, আস্তে আস্তে সব হবে মণি।"

মণি আস্তে উল্টোদিকে মুখ ফেরাল, বলল, "মাটিটাই খারাপ, বুঝলি। কতো জল ঢাললাম, কাঁকর বাছলাম, দুবেলা কতো যত্ন নিলাম, কিন্তু ওরা বড় বিশ্বাসঘাতক।"

দুজনে বাজারের দিকে বেরোলাম। কেনার কিছু ছিল না। রান্নার প্রয়োজনীয় সব সেই ছেলেটাই কিনে আনে। আমরা কেবল গ্রাম্য, ছায়াচ্ছন্ন পথে দুজনে মিলে হাঁটতে থাকি। দুপাশে আগাছার ঝোপ রেখে, কখনো টলটলে ডোবার পার দিয়ে, কখনো পড়শীর ঘরের পাশ কাটিয়ে আমরা দুজনে হাঁটলাম। স্পষ্টতই আমরা দুজন বিদেশী। আজন্ম দূরে বাস করে অবশেষে শূন্য পৈতৃক ভিটেতে ফিরে এলে পরিচয় দেবার কিছু থাকে না, সৌহার্দ্য চিরকালের জন্যে দূরে চলে যায়।

আমার পৈতৃক বাসভূমিতে শুনি এখন অপরিচিত মুখ চলাফেরা করে। মণি তো তবুও রুক্ষ জমিতে ফসল ফলানোর চেষ্টা করতে পারে। আমি কোথায় যাই?

আমরা সামনে ধূসর রুক্ষতা নিয়ে পথের পাশে বসেছিলাম। কয়েকটা মুনিয়া সম্ভবত, পি পি শব্দ করে জলভরা মাঠের বুক ছুঁয়ে, কখনও উপরে উঠে দূরে চলে যায়, আবার চলে আসে।

"মণি, আমার নাকি কিছুদিন অন্য কোথাও থাকলে ভালো হতো, আমি কোথায় যাই?"

মণি আমার দিকে চোখ ফেরাল না। জলভরা মাঠ থেকে আবার সেই উদাস হাওয়া উঠে এলো। তার কানের ওপরের চুলগুলো কাঁপাল, মাথার

রুক্ষ চুলগুলো কাঁপাল, আর কিছু কাঁপে না—কেবল গাছের পাতা। আমি লক্ষ্য করলাম তার কানের পাশের চুলে শ্বেতবর্ণ আভাস দেয়। বুঝলাম, তারও অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন থাকলে ভালো হতো। কিন্তু সে কোথায় যাবে?

মণি বাঁশি বাজাত। বাঁশি বাজাতে ভালো লাগত, তাই আমাকেও মণি বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছিল। আমি এখন আর বাঁশি বাজাই না। আমি আর বাজাতে পারি না। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর বাঁশি বাজাস না?"

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তার বিশাল চোখ তুলে ধরে মণি, "বাঁশি আর বাজানো যায় না।"

আমার খুব রাগ হয় তখন। মণি আমাকে বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছিল, আমি তার অনুশীলন করিনি, কিন্তু সে ছাড়বে কেন। মণি আমাকে আরো অনেক কিছু শিখিয়েছিল, সবই আমি এখন ভুলে যেতে চাই; তবুও যদি কোথাও মাথা গোঁজা যায়। কিন্তু সে ছাড়বে কেন? আমাকে পথে তুলে দিয়ে সে এখন নেমে যেতে চাইবে কেন?

জলের রঙ ঘোলা, ছোটো ছোটো ঢেউ নৌকোর নিচে, মৃদু আঘাতে ভেঙে পড়ে। আমাদের বৈকালিক ভ্রমণের কর্ণধার একমনে বৈঠা চালিয়ে যায়। আমরা গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে এসেছি। চারপাশ জলের ওপরে এখন কেবল শূন্যতা। দূরে ভিন্ন গ্রামের সীমানায় কিছু শব্দ পাওয়া যায়। একটা কুকুর একটি মোরগ সেখানে আছে বোঝা গেলো।

ক্রমে ম্লান বৈকাল অতিক্রান্ত হতে চায়। চরাচর দুঃখে ভাসিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা আসে। মাঝি বলল, "এবার ফেরোন লাগে।"

আমরা কেউ জবাব দিলাম না। মণি পাটাতনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি স্থির চোখে জলের ওপরে জলপোকাদের কারুকাজ দেখি। তারপর মণির দিকে ফিরে তাকালাম। সে তখন আকাশে দলছাড়া একাকী পাখিটির দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি তার শরীর স্পর্শ করলাম। কি বলি, কি বলা যায়? মণির চোখে কিসের আবছা পর্দা ভাসে। আমি বললাম, "মণি, আমাদের বোধহয় কিছুদিন অন্য কোথাও যাওয়া দরকার।"

তারপর আমিও তার পাশে শুয়ে দুঃখময় সন্ধ্যায় বিস্তীর্ণ জলরাশিতে বিশাল আকাশে একাকী পাখির দিকে চেয়ে রইলাম।

[পূর্বপাকিস্তানের প্রখ্যাত তরুণ লেখকের এই গল্পটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।—সম্পাদক]

বাসি ফুলের মালী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কয়েক বছর ধরেই ছেলেটিকে দেখছি। আমাদের পাড়ার ফুলওয়ালা। ঠিক আমাদের পাড়ার মধ্যেই যে থাকে তা নয়, থাকে আমাদের বাসস্টপ থেকে আরো ছুটি স্টপ পূবে—দত্তবাগান বস্তিতে।

আমাদের রাস্তা থেকে কতটুকুই বা দূর? তবু মাঝে মাঝে মনে হয়—ও যেন আর-এক রাজ্য, আর-এক জগৎ। এক-এক সময় ভাবি—কাছে যাই। যাওয়া আর হয় না। ওরাই কেউ কেউ আসে। আর আসে ওই ফুলওয়ালা ছেলেটি। আমার লেখার টেবিলের ধারে যে-জানালা, সেই জানালায় এসে ও মৃদু স্বরে বলে, "ফুল নেবেন বাবু?"

আমি ওর দিকে তাকাই। কালো, বেঁটেখাটো, হাফপ্যান্টপরা একটি ছেলে। গায়ে একটি জামাও আছে। নামে মাত্র আবরণ। ছিটের ছেঁড়া ময়লা হাফ শার্ট। নতুন জামাও যে না-পরে তা নয়, কিন্তু আমার যেন মনে পড়ে না ওর সেই নতুন জামা আমি দেখেছি।

"ফুল নেবেন বাবু?"

আমি ওর ফুলগুলির দিকেও তাকিয়ে দেখি। রজনীগন্ধা, পদ্ম, স্থলপদ্ম, জবা, যুঁই আর বেল ফুলের মালা। সবরকম ফুলই ও ফিরি করে। যে-কালে যে-ফুল পাওয়া যায়, সেই কালের ফুল।

কিন্তু আশ্চর্য, সব ফুলই ওর বাসি। আর শুকনো।

"এত বাসি ফুল তুই কোত্থেকে কুড়িয়ে আনিস বলতো?"

ফুলওয়ালা—ওর নাম আমি এখন জানি—মৃদু প্রতিবাদের স্বরে বলে, "না বাবু, বাসি না। নিন না। শস্তায় দিচ্ছি।"

যেদিন আমার মেজাজ ভালো থাকে, ওর কাছ থেকে কিছু ফুল আমি কিনে নিই। বাসি জেনেও নিই। ওর মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন মায়া হয়।

কিন্তু এই নিয়ে মাঝে মাঝে দারুণ দাম্পত্যকলহ লেগে যায়। গৃহের যিনি কর্ত্রী, এই ফুলগুলি তাঁর চক্ষুশূল।

তিনি রাগ করে বলেন, "তোমার ফুলসজ্জার জ্বালায় আর পারিনে। পয়সা দিয়ে এইসব বাজে ফুল কেউ কেনে? মানুষকে দয়া করতে হয়, অন্যভাবে করো। কিন্তু এইসব জঞ্জাল এনে ঘর বোঝাই করা কেন?"

ফুল দেখে তিনি যেসব বাণ ছুঁড়তে থাকেন, সেগুলিকে কিছুতেই আর ফুলবাণ বলার জো থাকে না। আমার অযোগ্যতা, অপরিণামদর্শিতা, কর্ম-বিমুখতার খোঁটা পর্যন্ত শুনতে হয়।

দিন কয়েক ফটিক তার একটি বাঁধা খদ্দের হারায়।

ও এসে দাঁড়ালেই, "ফুল নেবেন বাবু" বলে জানালার কাছে মুখ বাড়ালেই আমি মারমুখো হয়ে উঠি, "যা চলে যা এখান থেকে। যত রাজ্যের বাসি পচা ফুল আমাকে গছিয়ে দেওয়ার মতলব। চলে যা।"

ফটিক একটুকাল অবাক হয়ে থাকে। একজন সদা-সহানুভূতিশীল গ্রাহক হঠাৎ এমন কুপিত হয়ে ওঠে কেন ভেবে পায় না।

ফুলগুলি নিয়ে ও ভয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়, "আচ্ছা বাবু, আমি ভালোফুল নিয়ে আসব। তখন রাখবেন। বিকেলে ভালো ফুল দিয়ে যাব আপনাকে।"

দু-তিনদিন হয়তো ওকে আর দেখতে পাইনে।

কিন্তু চতুর্থ কি পঞ্চম দিনে ও ফের এসে দেখা দেয়। একটু হেসে বলে, "ফুল নেবেন বাবু?"

আমি হেসে বলি, "হতভাগা ছেলে। তোর লজ্জার ল-ও নেই। আবার সেই বাসি ফুলের রাশ কাঁধে করে নিয়ে এসেছিস?"

ও নরম গলায় প্রতিবাদ করতে থাকে, "বাসি না। না বাবু, বাসি না।"

আমি গৃহের গঞ্জনার ভয় সত্ত্বেও ফের ওর কাছ থেকে ফুল কিনি। ফুলগুলি বাসি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার কাছে ফুল বিক্রি করে ওর মুখে যে-হাসিটুকু ফোটে, তা টাটকা।

ফটিক হাসিমুখে বলে, "একটা কথা বলব বাবু?"

আমি বলি, "বল না।"

হয়তো একটা-দুটো টাকা চাইবে। আমি সেই প্রার্থনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু ও অন্য কথা বলে।

"আপনার কাছে যেদিন বউনি হয় বাবু, সেদিন আমার দিন ভালো যায়। আপনার মতো পয় আর কারোরই নেই বাবু।

"দূর। সবাই তো আমাকে অপয়া বলে।"

ফটিক হাসে, "না বাবু, আপনি ভারি পয়মন্ত।"

হাতে সময় থাকলে আর মেজাজ ভালো থাকলে আমি ওর অল্পস্বল্প সুখ-দুঃখের খবর নিই।

ওর বাবা নাকি আগে মাছের ব্যবসা করত। দারুণ লোকসান দিয়ে আর ওমুখো হয়নি। কিন্তু ওর বাবার ভাগ্য ভালো না। যাতে হাত দিয়েছে তাতেই ঠকেছে। মাছ ছেড়ে তরিতরকারি ধরল। তাতেও লোকসান। শেষ পর্যন্ত রোগে ভুগে-ভুগে মারাই গেল। অনেকদিন ভুগেছিল। ফটিক তখন অনেক ছোট। বাবাকে মা প্রায়ই গালাগাল করত, "মরতে পারো না? আমাকে মেরে তবে মরবে।"

কিন্তু তা হলো না। বাবাই আগে মারা গেল। মার তখন কী কান্না!

"তোর মা এখন আছে?"

"আছে।"

"কী করে?"

"পাঁচজনের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে।"

"আর কেউ নেই?"

"না বাবু।"

আমি মাঝে মাঝে ওকে সুপরামর্শ দিতে চেষ্টা করি। বলি, "অন্য কাজ-কর্ম নিলেই পারিস। কত কল-কারখানা আছে। তাতে ঢুকে পড়িসনে কেন? পড় না। এই ফুলবিক্রি করে তোর কীই বা হবে? এতে কি অবস্থা ফিরবে?"

ও বলে, "হ্যাঁ বাবু, তাই করতে হবে।"

কিন্তু পেশা বদলাবার জন্যে ওর তেমন গরজ দেখিনে। ছেলেটার উদ্যম-অধ্যবসায় কম। নইলে এই ফুলের ব্যবসাতেও আরো উন্নতি করতে পারত। শ্যামবাজারের মোড়ে ছোট-বড় আরো কয়েকটি ফুলওয়ালার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তাদের দোকানের অবস্থা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছে। দোকানের সংখ্যাও বাড়ছে দিনের পর দিন।

কিন্তু ফটিকের সেই বাসি ফুলের ব্যবসা আর শেষ হলো না। ওর অবস্থা আর বদলাল না।

অবস্থা বদলাল না কিন্তু চেহারার পরিবর্তন চোখে পড়ল। কিছু বা স্বভাবেরও।

হাফ প্যাণ্ট ছেড়ে ও যে কবে পায়জামা পরতে শুরু করেছে লক্ষ্য করিনি। তবে ঠোঁটের নিচে গোঁফের রেখা যে বেশ পুরু হয়ে উঠেছে,তা চোখে পড়ছিল। হঠাৎ ফের একদিন লক্ষ্য করলাম সেই গোঁফ আবার ছুঁচল হয়ে উঠেছে। চুলের ছাঁট আর টেরির বাহারে আরো-একটু সৌখিনতা। রাস্তার মোড়ের পানের দোকানটার সামনে ওকে মাঝে মাঝে বিড়ি টানতে দেখি। কোনো কোনোদিন সিগারেট। অবশ্য আমার সামনে কখনো খায় না। চোখে পড়লে সরে যায়। বিড়ি কি সিগারেট হাতের আড়াল করে সমবয়সী সখার মতো হেসে কুশল প্রশ্ন করে, "কেমন আছেন বাবু। অফিসের বেলা হলো বুঝি?"

গৃহিণী বলেন, "তোমার ফটিকের গুণ বেড়েছে। ফুল বেচতে গিয়ে অল্প-বয়সী মেয়েদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করে। সুন্দর মুখ দেখলে আর নড়তে চায় না।"

হেসে বলি, "বয়েসধর্ম যাবে কোথায়। আর ব্যবসাটাও তো ইট-কাঠ-লোহার নয়।"

"তুমি ওকে বড্ড আস্কারা দাও। আর জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে ও অত কী গল্প করে বলো তো? ও কি তোমার সমবয়সী না সমশ্রেণীর?"

মনে মনে ভাবি—তা নিশ্চয়ই নয়। তবু কোথায় যেন ওর-আমার মধ্যে একটু সাদৃশ্য আছে। আমারও কারবার ফুল নিয়ে। সেই কথার ফুল সংসারের কোনো দরকারে লাগে না। আমার ফুলও অনেকের কাছে বাসি বলে মনে হয়। এমনকি নিজের কাছেও। তবু মনে নিত্য-নতুন ফুল ফোটাবার সাধের শেষ নেই।

স্ত্রীকে বলি, "ওর ফুলের কোয়ালিটি আগের চেয়ে ভালো হয়েছে দেখেছ?"

"ভালো না ছাই। ভালো ফুল দু-চারটে আনে। সেগুলি ও অন্যের কাছে বিক্রি করে। আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তোমাকে ঠকিয়ে যায়।"

হেসে বলি, "শুধু কি ও-ই ঠকায়?"

এরপর ফটিককে আমি একদিন চার্জ করলাম, "এই, আমাকে খারাপ ফুলগুলি দিয়ে টাটকা ফুলগুলি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে। আমি এগুলি নেব না, ওইগুলি নেব।"

ফটিক বলল, "বিশ্বাস করুন বাবু, আপনাকে যে-ফুলগুলি দিচ্ছি—সেই-গুলিই ভালো। আপনাকে কি খারাপ জিনিস দিতে পারি?"

বললাম, "একেবারে যে না-পারিস তা নয়। ওগুলি কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস?"

আমি অপেক্ষাকৃত টাটকা আর বড় গোলাপগুলির দিকে আঙুল বাড়াই।

ফটিক মুখ নিচু করে হাসে। তারপর বলে, "ও-ফুল কি আপনার ফুলের চেয়ে ভালো বাবু? তা নয়।"

একটু অসঙ্গত প্রশ্ন করি, "ও-ফুল কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস?"

ফটিক বলল, "রাস্তার শেষে ওই যে লাল দোতলা বাড়িটা, ওই বাড়িতে ফুল দিই। ওনারাও আপনার মতো ফুল ভালোবাসেন। রোজ ফুল নেন। সন্ধ্যেবেলায় মালা পরেন। সে মালাও আমি দিয়ে আসি।"

আর-এক রকমের হাসি দেখি ফটিকের মুখে। তৃপ্তির হাসি, গর্বের হাসি।

ওর এই নতুন খদ্দেরটি কে, তা আর মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করিনে। এমনিতেই তো খোঁটা শুনতে হয়—ওকে আমি আস্কারা দিই।

অনুমান করি—ফটিকের কাছ থেকে আরো যিনি ফুল নেন, তিনি অসাধারণ গুণবতী; রূপবতী তার চেয়েও বেশি। তাঁর মুখ ফোটা পদ্মের মতো, গায়ের রঙ চাঁপার বর্ণ। মনে আরো-একটি ক্ষীণ আশা আছে, তিনি হয়তো পাঠিকাশ্রেণীর মধ্যেও পড়েন।

মাস যায়, বছর যায়।

ফটিক আমাকে আগের মতোই ফুল জুগিয়ে যায়। কখনো তাজা, কখনো বাসি। আমিও আগের মতোই কখনো সদয় হই, কখনো রূঢ় ব্যবহার করি। মেজাজ কি সব দিন সমান থাকে? দৃশ্য-অদৃশ্য স্থূল-সূক্ষ্ম কত কারণে মেজাজের পারা ওঠা-নামা করে—তার কি ঠিক আছে!

ফটিকের সাজসজ্জা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। মুখের ভাবও প্রসন্ন। হয়তো ওর বিজনেস আগের চেয়ে ভালোই চলছে। শুধু কি তাই? না কি ওর এই উৎসাহের মূলে আরো কিছু আছে, আরো কেউ আছে? আমি মনে মনে কল্পনা করি।

সেদিন বিকেলবেলায় লিখতে বসেছি। তাগিদের লেখা। বাইরের তাগিদ যত বেশি, ভিতরের তাগিদ তত কম। দুই তাগিদের মিল ঘটাতে না পারলে কি কলম নড়ে? আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু দিনান্তের জন্যে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

পাড়ার দু-তিনটি বাড়িতে বিয়ে। ছোট রাস্তায় জনসমাগম বেড়েছে। দূরের শানাইতে মূলতানের সুর।

হঠাৎ দেখি কাঁধে একরাশ রজনীগন্ধা নিয়ে আমাদের ফটিক বড় রাস্তার দিকে হনহন করে এগিয়ে চলেছে।

দেখতে পেয়ে ওকে আমি ডাকলাম, "এই ফটিক, শোন শোন। কী ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছিস।"

ফটিক এসে জানালার ধারে দাঁড়াল। আমি বললাম, "বিয়ের মরশুমে খুব ফুল বিক্রি করছিস বুঝি?"

ফটিক একটু রূঢ় ভাবে বলল, "না বাবু, বিক্রি হলো না। লাল বাড়ির ওনারা নেবেন বলেছিলেন। নিলেন না।

আমি বললাম, "সে কি রে?"

ফটিক বলল, "হ্যাঁ বাবু। ও-বাড়ির মেয়ের বিয়ে। কথা ছিল আমিই ফুল দেবো। রোজই তো দিই। আজ যত দোষ হলো। ওনারা আর-এক জায়গা থেকে ফুল নিয়ে এসেছেন। বললেন—তোর ফুল বাসি, তোর ফুল নেব না। দেখুন বাবু। আমার ফুলগুলি দেখুন। নগদ টাকা দিয়ে পাইকারের কাছ থেকে কিনে আনলাম।"

আমি নীরবে সহানুভূতি জানালাম।

ফটিক বলতে লাগল, "আমি জানি। ওরা আমাকে দেখতে পারে না। বাপও দেখতে পারে না, ছেলেও দেখতে পারে না। কেন পারে না তাও জানি। কিন্তু আমি আরো যা যা জানি বাবু, তা যদি সবাইকে বলে দিই—তা হলে কি আর ও-বাড়ির মেয়ের বিয়ে হবে?

কাঁধে ফুলের রাশ থাকলে কি হবে, ফটিকের দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন ফুলকি বেরোচ্ছে।

আমি বললাম, "ছি ছি ছি। ওসব কথা বলতে নেই।"

আমার এই অনুশাসন ওর কাছে গ্রাহ্য মনে হলো কিনা জানিনে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও তেমনি হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। পিছন থেকে দেখে মনে হলো সরল সতেজ ডাঁটাওয়ালা একরাশ রজনীগন্ধা তো নয়, ফটিক যেন ভারী এক লোহার গদা ঘাড়ে নিয়ে চলেছে।

ও আরো খানিকটা দূরে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ আমার মনে হলো, আমিও তো এক ডজন ফুল ওর কাছ থেকে নিতে পারতাম।

কিন্তু ওর কি আজ ঐ ফুল বিক্রি করবার মতো মন-মেজাজ আছে?

বক্সা বন্দীশালায় রবীন্দ্রজন্মোৎসব

প্রমথ ভৌমিক

১৩৩৮ সালের কথা। আর আজ ১৩৭৬ সাল। এর মধ্যে ৩৮ বৎসর চলে গেছে। সব কথা মনে নেই। ১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজন্মদিনে ভুটান সীমান্তে বক্সা দুর্গে আবদ্ধ রাজবন্দীরাও কবির জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। তাঁদের অভিনন্দনের উত্তরে কবির একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতাটির প্রতি হঠাৎ আবার নজর পড়ায়—এই স্মৃতিরোমন্থন।

১৩৩৮ সাল—অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩১ সালে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবীদের ধরে এনে বক্সা দুর্গে আবদ্ধ করা হয়েছে। তখন চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ হয়ে গেছে। তারপরই সারা বাঙলাদেশে জাল ফেলে ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ বহু বিপ্লবীকে ধরে ফেলেছে। প্রথমে জেলার জেলগুলিতে তাদের আটক করা হয়। অনেকে বন্দী হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে এবং হিজলির বন্দীশিবিরে। বিপ্লবী নেতাদের জেলে পুরেও ইংরেজের স্বস্তি ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই গোয়েন্দা বিভাগ বুঝতে পারল, জেলে আটক বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে বাইরের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। তাই লোকালয় থেকে অনেক দূরে কোনো বিচ্ছিন্ন স্থানে ওঁদের বন্দী রাখার চেষ্টা চলতে লাগল। এঁরা ছিলেন বিনা-বিচারের আটক বন্দী—চলতি ভাষায় যাদের বলা হতো রাজবন্দী বা ডেটিনিউ। তাই এঁদের আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা গেল না। অবশেষে বন্দীদের মধ্যে যাঁরা নেতৃস্থানীয়, বা যাঁরা গোয়েন্দাকর্তাদের বিচারে বিশেষ বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হতেন, তাঁদের এনে জড়ো করা হলো ভুটান সীমান্তে অবস্থিত এই বক্সা দুর্গে। স্থানটি সত্যিই অতি দুর্গম। এখানে যেতে গেলে নামতে হতো জলপাইগুড়ির বক্সা-দুয়ার স্টেশনে। দুর্গটি একটি পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ছিল। আর চতুর্দিক ছিল ঘন অরণ্যে বেষ্টিত। ৪।৬ মাইল অরণ্যপথ বেয়ে চড়াই-উৎরাই ভেঙে এখানে পৌছুতে হতো। রাত্রে ঘরে শুয়ে জঙ্গলের হায়েনার ডাক শোনা যেত, মাঝে মাঝে বাঘের ডাকও, আর শোনা যেত ঝরনার অবিরাম ঝরঝর শব্দ।

বন্দীশালার একদিকে উঁচু প্রাচীর। আর প্রায় তিনদিকে দুশো-আড়াইশো

ফিট থাম। তাও আবার কাঁটাতারের সুউচ্চ বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে উচ্চ মঞ্চে সেন্টি বক্সে বন্দুকধারী প্রহরী। তবে, প্রাকৃতিক পরিবেশটা মনোরম সন্দেহ নেই। দিনের বেলায় এখানে আনাগোনা করত বিচিত্র বর্ণের নানারকমের পাখি। তার মধ্যে টিয়াই বেশি। এই খাঁচার মধ্যে কলরব করতে করতে ঘুরে বেড়াত বিপ্লবী বন্দীরা—যাদের কবি ঠিকই বলেছেন—"পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা।"

এবার বক্সা দুর্গের বন্দীদের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। সকলেই জানেন বাঙলাদেশের বিপ্লবীরা কোনোদিনই একটা ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবীদলের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেননি। ওঁদের মধ্যে ছিল দুটো প্রধান দল—'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর'। আর এই দুই দলে কলহ ও রেষারেষির অন্ত ছিল না। বন্দীশালায় এসেও এঁরা একত্রে থাকতে পারলেন না। এই দুই দলের মাঝখানে এ-সময়ে আবার দেখা দিয়েছে একটা তৃতীয় দল। তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে 'রিভোল্ট গ্রুপ' অর্থাৎ 'বিদ্রোহী দল'। 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' থেকে বেরিয়ে এসে উভয়দলের অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক বিপ্লবীরা একটা আলাদা দল গড়েছিলেন। এঁরা পুরাতন নেতাদের ধীর-নীতি বা বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকার পথ মানতে অস্বীকার করেন। এঁরা চাইতেন এখুনি কিছু বিপ্লবীকর্মের অনুষ্ঠান করতে। এঁদেরই একদল ধরা পড়ে যান মেছুয়াবাজারে বোমা বানাতে গিয়ে এবং শুরু হয় মেছুয়াবাজার মামলা। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণকারী মাস্টারদা সূর্য সেনের দলের সঙ্গে এঁদের সংযোগ ছিল।

বন্দীশালায় যখন দল ভাগাভাগি করে পৃথক রান্নার ব্যবস্থা করা হলো, তখন এই বিদ্রোহীগোষ্ঠী 'অনুশীলন' বা 'যুগান্তর' কোনো শিবিরেই যোগ দিতে অস্বীকার করলেন। তাঁদের হলো একটা তৃতীয় শিবির। এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন কয়েকজন কমিউনিস্ট বন্দী। এঁরাও বিপ্লবীদের সঙ্গে ধৃত হয়েছিলেন। বন্দীরা তাই মোটামুটি তিন শিবিরে বিভক্ত হলেন—'অনুশীলন', 'যুগান্তর' ও তৃতীয় শিবির। বন্দীশালার চলতি কথায় বলা হতো অনুশীলন কিচেন, যুগান্তর কিচেন ও থার্ড কিচেন।

বিপ্লবীদের মধ্যে তখনো দলাদলির বিরাম ছিল না, এখনো নেই। কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এখন যে-দলাদলি, দেখা যাচ্ছে, তা দেখে সেই পুরনো 'অনুশীলন'-'যুগান্তর'-এর ঝগড়ার কথাই মনে

ড়ে যায়। সন্দেহ হয়—এই দলাদলি হয়তো বিপ্লবী আন্দোলনের একটা
অভিশাপ বিশেষ।

কিন্তু একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। যতই দলাদলি থাক, বিপ্লবী নেতা
ও কর্মীদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা খুবই ছিল। একত্র বসে বিভিন্ন
লের নেতারা তাস-দাবা খেলতেন, হাসি-ঠাট্টা করতেন, আনন্দ করতেন।
দেখে বোঝাই যেত না এঁরা বিভিন্ন দলের নায়ক, বাইরে দল নিয়ে এঁরাই
ষ্ঠ ছেঁড়াছেড়ি করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়—উচ্চ আদর্শবাদ ও বৈপ্লবিক
ত্ত্বের জ্ঞান সত্ত্বেও, আজকের বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে সামাজিক মিলনের অভাব
দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক তিক্ততারও অন্ত নেই।

এই পরিবেশের মধ্যে ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ এসে গেল। বিপ্লবী
ন্দীরা স্থির করলেন তাঁরা একত্রে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করবেন। যতই
লাদলি থাক, এ-রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা জাতীয় উৎসবে কেউই এঁরা
একত্র হতে দ্বিধা করতেন না। আর-একটা ব্যাপারেও সবাই একসঙ্গে
াড়াতেন। দাঁড়াতেন সরকারের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ উপস্থিত হলে।

সেবার রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মোৎসব। সারা দেশে সাড়া পড়ে গেছে।
পযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে রবীন্দ্রজন্মোৎসব পালন করতে হবে। বক্সা বন্দীশালায়ও
সই ঢেউ এসে পৌছল। 'বক্সা লিটারারি এসোসিয়েশন' রবীন্দ্রজন্মোৎসব
ালনের তোড়জোড় করতে আরম্ভ করলেন। এই লিটারারি এসোসিয়েশন
ল সকল দলের এক মিলিত সংস্থা। এখানে মাঝে মাঝে গবেষণা-
বন্ধ ইত্যাদি পাঠের উদ্যোগ করা হতো। সকলেই তাতে সোৎসাহে যোগ
তেন। দুর্গের মধ্যে একটা টিনের গুদাম ঘরের মতো ছিল। সেই গুদামে
ানালা কেটে তাকে একটা হলের রূপ দেওয়া হয়েছিল। সেই ছিল বন্দীদের
াধারণ মিলনস্থান। ওখানে একশো থেকে দেড়শো জন বসতে পারত।
ক হলো ঐ হলেই উৎসবের আয়োজন করা হবে। বন্দীদের মধ্যে একজন
 চিত্রশিল্পী ছিলেন। নাম শ্রীসুধীর বসু। রবীন্দ্রনাথের একটা
তিকৃতি আঁকার ভার তাঁকে দেওয়া হলো। অভিনন্দনপত্র
নার ভার পড়ল অমলেন্দু দাশগুপ্তের উপর। এখানে বোধহয়
মলেন্দুবাবুর একটু পরিচয় দেওয়া বাহুল্য হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের
া বিখ্যাত বিপ্লবী বাঘা যতীনের নেতৃত্বে বালেশ্বরের বুড়ীবালাম নদীর
রে যে পঞ্চ বীর বিপ্লবী বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন,

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। অমলেন্দু ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অমলেন্দু 'বিদ্রোহী গোষ্ঠী'র অন্যতম নেতা শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যদিও অমলেন্দু মূলত একজন সাহিত্যিক ছিলেন—তবুও পারিবারিক ঐতিহ্য বহন করে তিনি বিদ্রোহী দলে যোগ না দিয়ে পারেননি। তিনি কত উঁচুদরের লেখক ছিলেন, তার পরিচয় রেখে গেছেন 'ডেটিনিউ' ও 'বকসা ক্যাম্প' নামে দুটি বইয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে অমলেন্দুবাবু এখন আর জীবিত নেই।

২৫শে বৈশাখ এসে গেল। এক অনাড়ম্বর কিন্তু গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ উৎসবের মধ্যে দিনটি অতিবাহিত হলো। তরুণ বন্দীরা উৎসাহ করে সেদিন ফুল ও পত্রপল্লব দিয়ে সেই টিনের গুদামটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে ছিলেন। বন্দী-শালার মধ্যে উপকরণের খুব অভাব ছিল, কিন্তু নিষ্ঠার কোনো অভাব ছিল না। সকালে সুসজ্জিত হল-ঘরে রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে উৎসবের উদ্বোধন করা হলো। এমন নিষ্ঠাপূর্ণ রবীন্দ্রজন্মোৎসব বাইরে কোথাও দেখা যায়নি!

বিকেলে অমলেন্দুবাবু তাঁর লিখিত অভিনন্দন পাঠ করলেন। সে-অভিনন্দনপত্র অতি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী হয়েছিল। তার ভাষা আজ আর মনে নেই। কিন্তু খুব যে ভালো লেগেছিল—তা মনে আছে।

বন্দীশালার অধ্যক্ষের সাহায্যে কবির কাছে সে-অভিনন্দন পাঠানোও হয়েছিল। আমরা ভাবতেও পারিনি সেবারের সারা দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসব ও শত শত অভিনন্দনের মধ্যে সামান্য কয়েকজন বিপ্লবী বন্দী-প্রেরিত অভিনন্দনবাণী কবির মনে কোনো রেখাপাত করবে।

কবি তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেখান থেকে তিনি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে একটা কবিতা লিখে পাঠান। বিপ্লবীদের অভিনন্দনে কবি যে সত্যিই খুব অভিভূত হয়েছিলেন তা কবিতাটি পড়লেই বোঝা যায়। এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ১৩৩৮ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ দার্জিলিং থেকে কবি লিখেছিলেন:

"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর উর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।…

'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।"

কবিতাটি পড়ে বন্দী বিপ্লবীরা সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কবির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শতগুণে বেড়ে গেল। বিপ্লবীরা কবির প্রতি বরাবরই একটা আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাঁর কাব্য ললিতে কঠোরে মিশ্রিত। তার মধ্যে এই কঠোরের দিকটাই তাঁদের আকর্ষণ করত বেশি। এক কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছিলেন—"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী, সে কি সহজ গান"—বিপ্লবীদের হৃদয়তন্ত্রী সাড়া দিত সেই বজ্রের বাঁশির সুরেই। বিপ্লবীদের মনে হতো, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা যেন তাঁদের আহ্বান করেই লিখিত। "তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র, এনেছে আহ্বান, রুদ্রের ভৈরব গান"—রুদ্র-সাধক বিপ্লবীরা মনে করতেন তাঁদের পথও তপ্ত রৌদ্রের পথ—রুদ্রের ভৈরব-গানে ঝঙ্কৃত সে-পথ। "পথে পথে অপেক্ষিছে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা, শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ, নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ, সেই তোর রুদ্রের প্রসাদ।" বিপ্লবীদের ছাড়া আর কাদের উদ্দেশ্য করে কবির এই কবিতা? কবি লিখলেন

"চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।"

বিপ্লবীরা ভাবতেন—তাঁদের ছাড়া আর কাকে লক্ষ্য করে কবির এই কবিতা হতে পারে। তাই বিপ্লবীদের মধ্যে রবীন্দ্রকাব্য ছিল বহুপঠিত। রবীন্দ্রকাব্য তাঁদের বেপরোয়া বেহিসেবী বিপ্লবীজীবনে অপূর্ব প্রেরণা যোগাত।

অথচ রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিপ্লবী তরুণেরা—যাদের কাছে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য—তাদের প্রতি কবির কিন্তু তথাপি একটা সস্নেহ অনুরাগ ছিল। তাই দেখি যখন হিজলি বন্দীশালায় বৃটিশ পুলিশের গুলি চলল—তখন কবি তাঁর নিভৃত আবাস ছেড়ে নেমে এলেন মনুমেণ্ট ময়দানে—সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে। এমন মহান কবির জন্মোৎসব বন্দীশালায় হবেই তো!

আমৃত্যু চৈতন্যে

বিষ্ণু দে

চতুর্দিকে পোড়ো জমি, বিলাসী পশ্চিমা নয়, বিরিক্ত, আদিম।
বিদেশী-দেশীর তিন শতাব্দীর, ভোজে-লেহ্যে-পেয়ে বিস্তৃত শিকার,
ফাঁকা ফাঁপা মানুষদের সঞ্চয়াতিরিক্ত মৃত্যু ভূতনৃত্যে বাজায় ডিণ্ডিম
দেখি শুধু, যত চলি চতুর্দিকে রেখে গেছে বঞ্চনার দুরন্ত বিকার।

বহু যুগ ঘুরে থামি। এখানে বাস্তবই স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নে যে কবিত্বে একাত্ম
বহুদিন রাত্রি, নাকি অনেক শতাব্দী চলি বিরাট স্বপ্নের দেশে প্রাচীন
শপথে,
বহুলোক, যদিওবা মনে হয় একা একা, বহু রাজপথ বহু কংক্রিটের বর্ত্ম
হেঁটে, হেঁটে রক্তাক্ত মাটির পথে, বালিপথে, ভাঙা, ধসা, কাঁটাপথে।

ক্ষুধায় কাতর, শ্বাসরুদ্ধ, তৃষ্ণায় জর্জর, পথ বুঝি শেষ হল জঙ্ঘ তেপান্তরে
অরণ্যের ভুক্ত-অবশেষে। বহুলোক, মেয়ে ও পুরুষ, বহু শিশু খায়, যেন
দেয় হব্যে,
ভূরিভোজ পাথরে নুড়িতে, মরা আণব ধুলায়, আর কুড়ি হাত ভ'রে ভ'রে
পরিবেশনে মেতেছে একাই দানবমৃত্যু, দেখি এক দণ্ড কেবা পর কেবা
আত্ম।
বসে পড়ি ফনীমনসার ঝোপে, শূন্যপাতে, দুই হাত ভ'রে আমৃত্যু চৈতন্যে।

মাটিকে যে ভালোবাসে

মণীন্দ্র রায়

মাটিকে যে ভালোবাসে
সে কি আর ধুলোতে গড়ায়?
দুপায়ে দাঁড়িয়ে সে তো ঢেলা ভাঙে,
লাঙলের টানে ফালা ফালা
কেবলি ওল্টায় বোবা চাঙড়, দুহাতে
কোদালে কুপিয়ে তোলে
চাপবাঁধা স্থিতিস্থাপকতা।
সেই তো গেরস্তি তার, যে ঘর বানায়—
নিপুণা ঘরনী এই পৃথিবীর জোয়ান মরদ।

অথচ জীবনে আজো
রঙচটা স্বপ্ন, প্রতিষ্ঠান।
অথচ হৃদয়ে আজো
স্থিতস্বার্থ সঞ্চয় আর আশা।
একেকটা যুগের পরে, একেকটা সময়
প্রবলতা প্রেম হয়, ভালোবাসা ধারাল দারুণ,
তা জেনেও অন্তহীন পুনরাবর্তনে
মগজে জড়তা আজো, কামনার তাপে
দপ করে জলে না আগুন।

পূর্বাদেশ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রক্তের ফোঁটাগুলি
একটু একটু ক'রে
জমতে জমতে
এখন একটা প্রকাণ্ড মহাদেশ।

২

আমি উত্তরে, দক্ষিণে
পূবে, পশ্চিমে
যেদিকে তাকাই
দেখি হাজার হাজার
লাল পতাকার মতো
রক্তমাখা মানুষের মুখ
ঊর্ধ্বে আন্দোলিত হচ্ছে।

৩

যেখানেই মানুষের লড়াই
সেখানেই জহ্লাদের খড়্গ,
যেখানেই দেয়ালের লেখা
আগুনের মতো গরম
সেখানেই পথহাঁটার রাস্তাগুলি
মানুষের রক্তে পিচ্ছিল।

৪

জহ্লাদেরা জানে না
তারা চোখ রাঙিয়ে
আমাদের প্রতিজ্ঞাগুলিকেই
ঘুম থেকে জাগিয়ে দিচ্ছে।

চোখের ওপর

রাম বসু

চোখের ওপর সব ঘটে গেল
কুমিরের দাঁতে গাঁথা বাছুরের মতো
একবার তলায়
একবার ওপরে
চোখের সামনে সব গুঁড়ো গুঁড়ো হলো
তার ধুলোবালি শরীরে পড়েনি
আর্তনাদ কানে আসেনি একবারও।

দিগন্তে কয়েকটা পোড়া গাছ, মৃত পাখি, হাওয়া
দিগন্তে বেলে পাহাড়ের মাথায় একাকী বিষণ্ণ সিংহ;

এসব ঘটবেই আমরা যেন ধরে নিয়েছিলাম
আমরা জেনে ফেলেছি একমাত্র বোকারাই চমকায়
স্মৃতিকে আমরা ছেঁড়া চটির মতো ফেলে দিয়েছি
অনুতাপের ওপর পায়ের চাপ রেখে রেখে
আমরা আসি যাই যাই আসি।

কেন আসি কেন যাই বারবার ঘুরে ঘুরে আসি যাই কেন?

ভাবনা!
পৃথিবীর সব ভাবনাই কি ইতিমধ্যে ভাবা হয়ে যায়নি?
কি আছে ভাবার?
কয়েক কোটি বেকার
অনাহারী শিশু
স্বপ্নহীন নারী
এবং আত্মহনন—
কেন বাঁচা কেন?

কেন ?
শুধু এই প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে মানবিক দর্পের বল্লম ছুঁড়ে
মারো
বেলে পাহাড়ের ওপর ওই ব্যথিত সিংহ এখুনি কেশর ফুলিয়ে
ডেকে উঠবে।

বিদেশ-বিভুঁই

স্বদেশ সেন

এক টুকরো জমি পেলে কিছু সব্জি ফলাতে পারতেম
কিছু পদিনার চারা, সূর্যমুখী লঙ্কা দু-চারটে, লাল পালং-এর শাক
আর যা যখন হয়, যে ঋতুতে যে কন্দ সফল
জল-সার-চাঁচাড়িতে যা সাবেকি সুন্দর হতো না ?

এদেশে সমস্ত জমি বিক্রি হয়ে গেছে আগেভাগে
বাঁজা বউদের মেদমজ্জার মতন দাম বাড়ছে কেবলই
তবু ডাঁয়ে বাঁয়ে দেখো কি উদাস, ভরে আছে কন্টিকারী, মাদারের গাছে
চকমকির মতো জ্বলছে এলো-ঘাস রোদের ম্যাজিকে।

শুতে বসতে এত ক্ষুধা, দেখে দেখে পুড়ে যাচ্ছে চোখ
সকল চাষীরা সব মরে গেছে ? এরা কারা আখ্যুটে ঘেয়েজ্বা
নেঙটি পরে ফুরনের কাজ সারে ? এরাও কি বন্দেমাতরম
বলেছিল একদিন ?

মাহুতের মতো দুলছে খরার ঝিলমিল মুখ খুলট বাতাসে
গভানের নিচে আল, জল নেই, বাঁশের ফোয়ারা ফাটছে কাল-রোষে
রাখনী মেয়ের মতো ঘোমটার আড়ালে যাচ্ছে সময় অনেকদূর দিয়ে
বুকের ধুনিতে পুড়ছে সবুজ জ্বালানী।

এখানে ওখানে আছে অন্নসত্র, অসংখ্য হাভাতে
জমি নেই, সব জমি বিক্রি হয়ে গেছে এক রাতে।

সকালবেলা তাজা গোলাপ

শান্তিকুমার ঘোষ

সকালবেলা তাজা গোলাপ রাশি
বাগানে কেন হাজারো চোখ খোলা
বাতাস মেঘ অবাধ কেটে অমন ঊর্ধ্বে পাখি
কমিয়ে ফেলে উচ্চতা তার তুহিন সময় ছুঁয়ে
কাঁপতে থাকে সিন্ধু পাহাড় চক্রবলয় রেখা
নীড়ের পথে অশ্রুত গান নব নবীন সৌরজগৎ ছেপে
মমতা ঢালে অমর পাখি তমোবিনাশ শুভ্র শিখার শিখা
বাগান জুড়ে পরাগ শুধু রাঙা গোলাপ রাশি

প্রতিদানে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

প্রতিদানে
শেষ কানাকড়িটিও
খোয়াতে চাই
শেষতম রক্তবিন্দুটিও

তোমাদের বুকের রক্তে
অনেক গলা ভিজিয়েছি
চিবিয়ে খেয়েছি শক্ত সমর্থ হাড়গুলো
ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে
পাঁচিল তুলে দিয়েছিলাম
সূর্যকে আড়াল ক'রে
পৃথিবীর অগণন নদনদীর উৎস
তোমাদেরই চোখের জল
ঢেউগুলো
দমকে দমকে কান্না
ভুলে গিয়েছিলাম
[আদি পাপে জ্বলে যাচ্ছে শরীর]
ভুলে গিয়েছিলাম
মেঝেয় বিছানো বহুমূল্য কার্পেট
তোমাদেরই জমাটবদ্ধ রক্তকণিকা
তোমাদেরই চাপ চাপ বাসিরক্ত
আমার বাগানে
গোলাপ হয়ে ফোটে
ভুলে গিয়েছিলাম

তোমরাতো
বুকের রক্তে
সাজিয়ে দিলে গোলাপবাগিচা
পাঁজরের হাড়ে অতিসূক্ষ্ম কারুকাজ
অপরূপ শিল্পকীর্তি
মহার্ঘতা বাড়িয়ে তুলল
আমারই প্রাসাদশিলানের
তিলে তিলে বরণ ক'রে নিলে
অবাঞ্ছিত মৃত্যু
আমার খেয়ালখুশির মূল্য দিতে
ভুলে গিয়েছিলাম

মনে পড়ছে
তাই আদি পাপে জ্বলে যাচ্ছে শরীর
[পাপ আমাকে পাগল ক'রে দেবে !]
তাই প্রতিদানে
শেষ কাণাকড়িটিও খোয়াতে চাই
শেষতম রক্তবিন্দুটিও

প্রকৃতির আত্মনিবেদন

সুতপা ভট্টাচার্য

তপ্ত পথে　গলে না পা,　জমে না বুক হিমে
ঐ যে　তিনি চলেছেন　তিনি চলেছেন
অশরীরা　আড়াল খোঁজে　মায়েরা খায় মার
ঐ যে　তিনি চলেছেন　তিনি চলেছেন

তোমাকে জল দেবো তৃষ্ণার জল　কবে সে কবে
ঘুচবে অন্ত্যজ অভিমান　কবে সে কবে
এ-আবরণ ক্ষয় হবে　কবে সে কবে ?

সপ্তসাগর	পেরিয়ে গেলেন	পাহাড়ও নয় বাধা
ঐ যে	তিনি চলেছেন	তিনি চলেছেন
খেত-খামারে	শুকনো মাঠে	লোহার শেডের তলায়
ঐ যে	তিনি চলেছেন	তিনি চলেছেন

তোমাকে জল দেবো তৃষ্ণার জল কবে সে কবে
ঘুচবে অন্ত্যজ অভিমান কবে সে কবে
এ-আবরণ ক্ষয় হবে কবে সে কবে।

শুকতারা

[মে-দিবসকে নিবেদিত]

রণজিৎ মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের আকাশ ঐ জেলেছে শুকতারা জল জল
দেয়াল ঘেঁষে চড়ুই বানায় খড়কুটোতে ঘর
ধুলো উড়ছে ধোঁয়া ঘুরছে ছুটির ভেঁপু বাজে
জোয়ান সকাল বসে রয়েছে প্রতীক্ষা-চঞ্চল।

দরজা খোলো ঘণ্টা বাজে রুটির সানাই হাঁকে
হিমোগ্লোবিন বলতে কি চাও বেচব শুধু ফাউ
দরজা খোলো ঘণ্টা বাজে ডাকছে মাটি-মা
সঙ্গী, এবার মিলছি সবাই শুকতারাটির ডাকে

রথযাত্রায় বসেছেন যুগ লক্ষ পথের পাকে
পথ আঁকছি পথ হাঁটছি লক্ষ পায়ের ছাপে
দরজা খোলো ঘণ্টা বাজে ডাকছে নিদাঘ মন
সঙ্গী, এবার মিলছি সবাই শুকতারাটির ডাকে

রাত পেরোতে রাত ছাড়াতে দূর পথে সরাই
টাইফুনেতে উচ্চ রবে হাঁকছেন ক্যাপ্টেন
দেয়াল ঘেঁষে চড়ুই বানায় খড়কুটোতে ঘর
দরজা খোলো, ঘণ্টা বাজে, রাত-শেষ-সানাই
চিরদিনের সুর বেঁধেছি যে-দিবসের স্বর।

রাজাদিন

আবুবকর সিদ্দিক

সেই একটা দিন
রাজাদিন
ঘনিয়ে আসছে ভাই।
শানিয়ে রাখো
যার যা আছে ঘরে।
তাগদ দিয়ে জোয়ান করো
বাচ্চাগুলোকে।
লেখাগুলো ফিবি করতে
থাকো মুখে মুখে—
পুঁথিপত্র
জ্বলে যেতে পারে।
রাস্তাগুলো ঢালাই করো
শ্রমে রক্তে ঘামে—
প্রকাণ্ড সেই ময়াল মিছিল
হঠবে লুটবে
উঠবে ছুটবে।
হুঁশিয়ার ভাই—
তেড়ে আসছে
মোকাবিলার দিন।

[পাকিস্তানের প্রখ্যাত তরুণ কবির এই কবিতাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।
...পাদক]

পরভয়েজ শাহেদির কবিতা

১. গজল

আজ আমি সহযাত্রী, কমরেড কালের,
এই সব বছর-মাস দিলে আমায় আভিজাত্য।
হাজার মূর্তি ভেঙে, অনেক বিভাজন আবার
লাগল জোড়া।
আর এই, এভাবেই তুললাম গড়ে
আমার জীবনের প্রতিরূপ সত্য।

সরিয়ে দিয়েছি আমার একাকীত্ব
ভাগ নিয়েছি দুঃখের সকলের।
উপচে-পড়া চুলের গোছাগুলিকে সরিয়ে
সাজিয়েছি আবার।
প্রকৃতি সাথে কাকে এমন জড়াল জীবনের বন্ধ।

২. খেলনা

খেলেছি চাঁদ আকাশ তারাদের নিয়ে,
খেলায় গড়েছি সৌন্দর্যউপমা,
খেলেছি কল্পনার হাত ধ'রে, দেখেছি যা দেখবার অনেক
পলকাটা প্রেমের মুখ নিয়ে
করেছি খেলা।
হৃদয় আমার ভেজা, পড়েছে পানি জলে।

খেলেছি মুখোমুখি বেপরোয়া চাহনির
বেঁধেছি প্রতিটি তারে সুর সত্যের সেতারের
খেয়ালের জাফরি কেটে
খেলেছি প্রকৃতির লুকনো রহস্য নিয়ে খেলা।

বাগিচার ওড়না সরিয়ে
প্রত্যেক শরৎ আর বসন্তের সঙ্গে খেলেছি॥

অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন

৩. কে বাজাল ভবিষ্যৎ

না-ছোঁয়া প্রতিমা কত নাড়া দেয় পাষাণের বুক,
আফোটা মুকুল কত বিহঙ্গের বন্দনা দোলায়,
কত না অদেখা রূপ এখনো আবৃত অবরোধে
অছন্দিত রাগিণী সে আবেষ্টিত হৃদয়ের তারে।
দীপ্তিহীন শিখা কত উদ্ভাসিত গোধূলির শেষে
কে বাজাল ভবিষ্যৎ মুহূর্তগুঞ্জনে মুখরিত॥

৪. গজল

অন্ধকারায় লেগেছে উষার ছোঁয়া
পায়ের শিকলে নব দিগন্ত ছোঁয়
মুক্তির সাধ ভেঙেছে শিকল পায়ে
নামে কুন্তল ছায়া।
কামনা! ডেকোনা মানুষ ধ্বংসলীলায়
জীবন এবার সংগঠনের পথে।
যে নৈঃশব্দ্যে রুদ্ধ দুয়ারে কথা
বাঁধা পড়ে ছিল, এলো সে অধর প্রান্তে।
ঢাকা দুটি চোখে যা ছিল স্বপ্নাবেশ
বাস্তবে পেল রূপান্তর সে স্বপ্ন।
স্বপ্নের মতো মুছল রাতের রঙ
চোখে এসে লাগে অরুণোদয়ের আভা,
দীপ্ত আগুনে জ্বলে যৌবনবুক
বার্ধক্যেও শিখার লেগেছে ছোঁয়া।
শেষ করো মসনদ হর্ম্যের স্বর
সময় এখন বেজে ওঠে ঝঙ্কারে
মরা মাটি শোনে সবুজের জয়গান
মেহনত আনে জাগীর-এর অবলোপ।
পথ হারিওনা, এখন 'পরভয়েজ'
এখনই জীবনে এসেছে সার্থকতা॥

অনুবাদ: বীণাপ্রীতিশ নন্দী

কবি পরভয়েজ শাহেদি

কবি ও মানুষ পরভয়েজ শাহেদির সান্নিধ্য পাবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে—এবং কলকাতার সংস্কৃতিজগতে তাঁদের সংখ্যা বড় কম নয়—তাঁরা জানেন কি অসামান্য তিনি ছিলেন।
উজ্জ্বল ও হৃদয়বান, আলাপচারী ও আত্মমগ্ন, কবি ও সংগ্রামের শরিক পরভয়েজ সাহেব ছিলেন আধুনিক উর্দু কাব্য-আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। আর বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁকে

জানতেন একেবারে নিজেদের ঘরের মানুষ বলে। পরভয়েজ সাহেব কখনও বাঙলায় কবিতা লেখেননি। কিন্তু মনে হয়, অনায়াসেই তিনি তা পারতেন। মাতৃভাষা উর্দু'র পর হিন্দী, ইংরেজি ও বাঙলা ভাষাতে তিনি ছিলেন সমান বাকপটু ও পারদর্শী। পরভয়েজ সাহেব শুধু কবিতাই লেখেননি, কবিতার নতুন মূল্য-বোধের জন্য তিনি প্রগতিশীল গণআন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। বক্সা শিবিরে বন্দীজীবনে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখের সঙ্গে দীর্ঘবছর কাটিয়েছেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সে-দিনগুলি সম্পর্কে অবিস্মরণীয় এক স্মৃতিচিত্র লিখে রেখেছেন। কবি পরভয়েজ ছিলেন 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'র একজন মধ্যমণি।

তিনি ছিলেন কলকাতারই বাসিন্দা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। শেষ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করেন কলকাতাতেই। এই মে মাসে হলো তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী।

'জীবনের নৃত্য' তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত প্রথম উর্দু-কাব্যগ্রন্থ। মৃত্যুর পর এ-বছর প্রকাশিত হয়েছে কবির দ্বিতীয় কাব্যসংগ্রহ 'জীবনের ত্রিভুজ'। কবির বন্ধু, সহযোগী ও সাহিত্যিকরা তাঁর আরও কবিতা, চিঠিপত্র প্রকাশের আয়োজন করছেন। সম্প্রতি 'ডায়লগ'-এর পঞ্চম সংখ্যায় তাঁর কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ-সঙ্কলন বেরিয়েছে। অনুবাদ করেছেন ডাঃ এ. এম. ও. গণি।

বাঙলাতেও নানা সময়ে তাঁর বিভিন্ন কবিতা অনূদিত হয়েছে। এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেই তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট বাঙালি কবিরা। পরভয়েজ সাহেব 'পরিচয়'-এর সুহৃদ ছিলেন। এই সংখ্যাতেও তাঁর কয়েকটি রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হলো। নতুন অনুবাদ এবং আগের অনুবাদগুলি সংগ্রহ করে বাঙলায় কবি পরভয়েজ শাহেদির কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া উচিত। জীবিত থাকলে এরকম উদ্যোগকে পরভয়েজ সাহেব হাসিমুখে স্বীকার করে নিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সে-প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভব করা যাচ্ছে।

সিদ্ধেশ্বর সেন

কয়েক ঘণ্টার কষ্ট

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আচমকা "বাবা!" শুনে সেদিন চমকে গিয়েছিল। ভুল অবশ্য ভাঙে সঙ্গে সঙ্গে। গলার আওয়াজ ডাকার ধরন হুবহু এক হলেও মানুষটা আসলে বাপ নয়।

মরা বাপের স্বর্গ থেকে নেমে এসে ছেলের কাছে ভিক্ষে চাওয়া সম্ভব নয়।

তবু দিয়ে বসে জলজ্যান্ত একটা সিকি।

বাপ না হলেও বাপের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছে! মরা বাপের কথা!

তাছাড়া বিপদেআপদে পড়ে কোনো ভদ্রলোক গাড়িভাড়া বাবদ দুচার আনা চাইলে দিত না? দেয়না মানুষ?

স্নানধুতি করিয়ে ফর্সা জামাকাপড় পরিয়ে দিলে তো এ-ও বেমালুম ভদ্রলোক। দেহটা ভাঙাচোরা হলেও যা গড়ন চোখমুখের!

সিকি-দেওয়াটা কার-কার নজরে পড়ল ঠাওর করতে গিয়ে সহযাত্রীদের, নির্বিকার দেখে মানুষের হৃদয়হীনতায় সেদিন চটেও যায়।

যদিও খানিক পরেই চটা-টা চালান করতে হয় নিজের ওপর।

"ভিক্ষে! ভিক্ষে দিয়ে বেগার প্রবলেমের সলিউশন!"

"জাত ভিখিরি নয়—"

"ভিখিরি ইজ ভিখিরি। দানধ্যান করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়নারে। যদ্দিন না এই সমাজব্যবস্থা—"

লোকেশের লেকচারে প্রথমে যায় ঘাবড়ে। তারপর সিকির শোকে হু হু করে ওঠে প্রাণ। টিফিন খারিজ করে শোধ তোলে আহাম্মুকির।

একটি আধলাও কখনো-আর খসায়নি। লোকটা বাসে ওঠা মাত্র মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বেশি "বাবা-বাবা!" করলে খিঁচিয়ে উঠেছে।

"ভগবান তোমায় দেবে বাবা!"

ভগবান! ভগবানই যদি দেনেওলা, কী দরকার তার ভায়া-মিডিয়ার? ডিরেক্ট দিলেই পারে।

"ভগবান তোমায় ধনেপুত্রে—"

বাপও হরদম ভগবানের গুণ গাইত। সেই গুণধরের নাম করতে করতে চোখ ওল্টায়।

গুণধরটি কিন্তু ভক্তের জন্যে লোমও একগাছা খসায়নি। বরং ভক্তের ব্যাটাকে নাজেহাল করে ছেড়েছে।

কণ্ডাকটারকে নালিশ করে বাসে ওঠা বন্ধ করে দেয়। তখন ঘুরত বাসের চারপাশে। ধমক খেয়েও হাত বাড়াত।

কে জানে ধমক খাওয়ার লোভেই হাত বাড়াত কিনা! ভিক্ষে-চাওয়াটা ধমক আদায়ের অজুহাত কিনা কে জানে!

দেহের খোলনলচে দুই-ই ক্রমে পাল্টে যায়। চালচলনও। স্নানধুতি করিয়ে ফর্সা জামাকাপড় পরিয়ে ভদ্রলোক বানানোর কথা আর ভাবাও যেত না।

খাবারের দোকানের এঁটো পাতা চাটে ভদ্রলোক!

"খিদের জ্বালা বড় জ্বালারে।"

যুক্তি লোকেশের জবর। তাই বলে একদিন যাকে বাবা বলে ভুল করেছিল, ডাস্টবিনে সে খাবার হাতড়াবে? তাই নিয়ে আর-পাঁচটা উড়ে-মেড়ো ভিখিরির সাথে হাতাহাতি করবে?

নিজেকে অকথ্য বেইজ্জত মনে হয়। লোকটাকে বেইমান।

পাছে মুখোমুখি পড়ে গেলে "বাবা!" বলে কঁকিয়ে ওঠামাত্র ডান হাতটা চটাং করে ওর গালে গিয়ে পড়ে, তাই আরামে বসে যাওয়ার জন্যে স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ওঠা বাতিল করে সাঁত্রাগাছির মোড়ে বাস ধরা শুরু করে।

কিন্তু ঝুলে যাওয়া ভারি রিস্কি। দালালপুকুরের বাঁকের ঘটনাটা চোখের সামনে দেখার পর পাদানিতে নিজেকে ঝুলন্ত ভাবলেই বুক হিম হয়ে আসে।

সুতরাং আবার স্ট্যাণ্ড। লোকটাকে এড়িয়ে টুক করে বাসে ঢুকে পড়া। মাঝামাঝি বসা। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত এদিক-ওদিক না-তাকানো।

এই ভাবেই চলছিল। কিন্তু স্ট্যাণ্ডে পৌছনোর আগেই আজ বাটার দোকানের কাছে মুখোমুখি পড়ে গেল: নর্দমার ধারে কাৎ হয়ে।

প্রচণ্ড চমক খায়। প্রথম দিনের "বাবা!" শোনার চেয়েও প্রচণ্ড চমক।

মরে গেল? শেষ অব্দি না খেতে পেয়ে মরে গেল?

খাদ্যই যখন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, খাদ্যের অভাবে তখন মানুষের মরে-যাওয়ায় অবাক হওয়া স্রেফ ন্যাকামি। কিন্তু দিনের পর দিন নাখেতে পেয়ে মরা, খিদের জ্বালা সইতে সইতে মরা, তিলে তিলে মরা—

"রাস্তায় বলে চোখে পড়ল, কিন্তু এমন ব্যাপার হাজার হাজার ফ্যামিলিতে—"

লোকেশের লেকচারে মাথাটা সায় দিলেও মন বুঝ মানে না।

গলার আওয়াজ ডাকার ধরন হুবহু এক হলেও মানুষটা আসলে বাপ নয়। ছেলে বেঁচে থাকতে বাপ ভিক্ষেয় বেরোত না। না খেতে পেয়ে নর্দমার ধারে মরে পড়ে থাকত না।

তেমন বুঝলে ছেলেই বাপের আগে গলায় দড়ি দিয়ে কেটে পড়ত।

তবু কেন কেবলি বাপকে মনে পড়ে ?

যে অসুখে বাপ মরে গেল ঠিকমতো খেতে পেলে সেই অসুখটাই হয় না বলে? হলেও ভালোভাবে ট্রিটমেণ্ট করালে ওষুধপথ্য খাওয়ালে ভালো হয়ে যায় বলে ?

ভালোমতো ট্রিটমেণ্ট না করানোর, ওষুধপথ্য না জোগানোর, জোরালো কারণ সেদিন ছিল: আফিসের যা হালচাল! তিনকাল-গিয়ে-এককালে ঠেকা বাপের চেয়ে বউ-ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ভাবাই এখন বেশি জরুরি। এখান থেকে ছাঁটাই হলে আরেকটা চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকার রসদ মজুত করা বেশি জরুরি।

ছাঁটাই না হওয়ার জন্যে বাপকে তবে মনে পড়ছে ? বাপের অকাল-মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হচ্ছে ? গিলটি কমপ্লেকস ? ছাঁটাই হলে মনে অপরাধবোধের গাদ জমত না ?

কিন্তু এই বয়েসে ছাঁটাই হওয়ার চেয়ে হার্টফেল করা ঢের আরামের। ডায়েড ইন অ্যাকটিভ সার্ভিস। ড্যাঙডেঙিয়ে স্বর্গে চলে যাওয়া।

বউছেলেমেয়েগুলি অবশ্য মুশকিলে পড়বে। কিন্তু চোখে তো আর দেখতে হবে না।

মরে গেলে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি মিলিয়ে হাজার সাতেক, বউ আর মেয়ে দুটোর গয়না বেচে হাজার দেড়েক—সাকুল্যে সাড়ে আট। মাসে তিন শো করে হলে সাড়ে আট হাজারে—

তখন অবশ্য একজনের খরচ কমে যাবে। কত কমবে ? কমসে-কম পঞ্চাশ ? তাহলে মাসে আড়াই শো করে হলে—

আড়াই শোরও কম করা যায়। বস্তিতে উঠে গেলে, লেখাপড়ার পাট তুলে দিলে, জামাকাপড় কেনা বাতিল করলে, খাওয়াটা একবেলায় দাঁড় করালে—

কিন্তু যত খরচই কমাও, কুঁজোর জল শেষ একদিন হবেই। তখন ?

ভিক্ষে ?

ভিক্ষে!

বউকে দেখে সেদিনও হয়তো কারো মনে হবে স্নানধুতি করিয়ে ফর্সা শাড়িব্লাউজ পরালে দিব্যি ভদ্রমহিলা বানানো যায়। রঙচঙে ফ্রকপ্যাণ্টে ছেলে-মেয়েগুলোকে ভদ্রস্থ করে তোলা যায়।

সবাই ভিক্ষে দেবে? কেউ কেউ দেবে নিশ্চয়। কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তো বেগার প্রবলেমের সলিউশান হয় না। দানধ্যান করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। যদ্দিন না এই সমাজব্যবস্থা—

সমাজব্যবস্থা বদলের দেরি দেখে বেঁচে থাকার আশায় বউটা বেশ্যা হয়ে যাবে? ছেলেমেয়েগুলো স্ট্রীট আর্চিন? নাকি দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে, খিদের জ্বালা সইতে সইতে তিলে তিলে মরে গিয়ে ওরাও একদিন কোনো নর্দমার ধারে—

বেয়ারা টোস্টের প্লেট সামনে রাখা মাত্র তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু সামলাতে পারে না। হড়হড় করে টেবিল ভাসিয়ে বমি করে ফেলে।

লোকেশ বলে, "বদহজম। খুব পোলাও-মাংস সাঁটাচ্ছিস বুঝি?"

ধরা-পড়া চোরের হাসি হাসে।

"ফাঁকায় ফাঁকায় চলে যা। বলব চাটুজ্জেকে?"

হাসিটা বজায় রেখেই মাথা দোলায়।

"তুই কিন্তু লেজিটিমেটলি ছুটি পেতে পারিস। রিয়েলি অসুস্থ—সকলের সামনেই—"

লোকেশকে আমল না দিয়ে চটপট ফাইলপত্র টেনে নেয়।

দু-কিস্তি ছাঁটাই হয়ে গেছে, আবার নাকি পোয়াতী—এমন সময় অসুখ! রিয়েলি অসুস্থ—সকলের সামনেই—এই নিয়ে হইচই করে হারামজাদা কি ফাঁসাতে চায়? সর্দির ধাত বলে রজনী সরকারকে জোর করে রিটায়ার করাল, আর পক্সের জন্যে দু-হপ্তা ছুটি খেয়েছে এক মাসও হয়নি, তার ওপর আজ অফিসে বমি করে বারোটায় বাড়ি চলে গেলে রক্ষে আছে!

নিজের মৃত্যুর পর বউছেলেমেয়ের না খেতে পেয়ে মরার কল্পনাতেই যদি ডালভাত বেরিয়ে আসে, বেকার হয়ে গুষ্টিসমেত নিজের না খেতে পেয়ে মরার কল্পনায় তো তাহলে রক্তবমি করাই যুক্তিযুক্ত।

ঘাড় গুঁজে কাজ করে।

কাজের গুঁতোয় মনটা টিট হয়ে যায়। যথারীতি শ্রান্তক্লান্ত হয়ে অফিস থেকে বেরোয়। ধর্মতলা থেকে উঠে ডালহৌসি বলে বাসে পাঁচ পয়সা ফাঁকিও দেয় যথারীতি। লেডিজ সিটের দিকে ঘনঘন তাকানোটাও বাদ দেয় না।

কিন্তু রামতলায় বাস থেকে নামা মাত্র আঁতকে ওঠে: এখনো পড়ে আছে? নর্দমার ধারে তেমনি কাৎ হয়ে? সারা রাত পড়ে থাকবে নাকি? কুকুরে যদি ছিঁড়ে খায়!

আস্ত একটা মানুষকে ছিঁড়ে খেতে কুকুররা ভরসা পাবে না? কিন্তু সেই চাল-পাচারে বুড়ির মাংস তো খেয়েছিল?

দুইয়ে অবশ্য ফারাক আছে। পুলিশের হাত এড়াতে চালের পুঁটলিসমেত বুড়ি চলে যায় ট্রেনের তলায়। ট্রেনের চাকাগুলি অগত্যা হাড়মাস দুরমুস করে বুড়িকে বানিয়ে ফেলে মাংসের পিণ্ড। রোদের আগুন দিনভর মাংস-চালের বিরিয়ানি পাকায়।

রেল লাইনে ডেডবডি সরাবে কে? কার এলাকায় রেল লাইন?

প্রশ্নের ফয়সালা হতে হতে রাত কাবার। এদিকে শকুনকুকুরশেয়ালের লানচ-ডিনারে ডেডবডিও প্রায় কাবার।

দল বেঁধে অকুস্থলে গিয়ে দেখে এসেছে। রেল, পুলিশ, সরকার, কংগ্রেস, কনট্রোলকে গালাগালির কোরাসে গলাও মিলিয়েছে।

কিন্তু এখানে তো মালিকানা নিয়ে সমস্যা নেই। তবু কেন সারা দিনেও সরানো হলো না?

হারামজাদারা! দপ করে মাথায় খুন চড়ে যায়। মিউনিসিপ্যালিটির লোক-গুলোকে ধরে ধরে চাবকানো দরকার। চেয়ারম্যান থেকে ধাঙড় অব্দি। সব শালা শুয়ারকি বাচ্চা।

স্ট্রাইকের সময় পাঁচজনের সাথে পাড়ার নর্দমা সাফ করেছে। আহা, ভদ্র-লোকেরা দুদিন পাঁক ঘাঁটলে ধাঙড়দের খাওয়াপরার খানিক যদি হিল্লে হয়—ঘাঁটবে না পাঁক?

পাঁচজনের কথায় স্ট্রাইক ফাণ্ডে একটা টাকা চাঁদাও দিয়েছে। সেই মদতের এই রিটার্ন? দাবি মেটানো সত্ত্বেও কাজে ফাঁকি?

ওয়ার্কাররা ডিমাণ্ডের বেলায় সেয়ানা কিন্তু ডিউটির বেলায় অষ্টরম্ভা—কথাটা কালীদার ষোল আনা খাঁটি। চাটুজ্জেকে তেল দিয়ে আর চুকলি কেটে নিজে

চিরটাকাল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালেও কথাগুলো বলে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

ধাঙড়দের জন্যে দরদে দিশে হারিয়ে যদি দুম করে টাকাটা সেদিন না দিত? সেই টাকায় এই লোকটাকে চারদিন চারটে সিকি দিতে পারত। চার আনার করে মুড়ি খেয়ে আরও চারটে দিন তাহলে বাঁচত লোকটা।

অতএব লোকটার চারদিন আগে মৃত্যুর—অকালমৃত্যুর—জন্যে ধাঙড়দের দায়ী করলে অন্যায় হবে?

অকালমৃত্যু ঘটানো কি প্রকারান্তরে খুন নয়? অতএব যদি বলা যায় ধাঙড়রাই এই লোকটাকে—

"কী—যাবেন না?"

"অ্যাঁ! হ্যাঁ—চলো!" শঙ্করের ডাকে থতমত খেয়ে হাঁটা শুরু করে।

"আচ্ছা, ডেডবডিটা সারা দিনেও—"

"হাসপাতালে ফোন করা হয়েছিল।"

"কেন ধাঙড়রা—"

"ধাঙড়?"

শঙ্করের অবাক হওয়ার বহরে ভড়কে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

"অ্যাকসিডেণ্টে মৃত্যু—ধাঙড়রা কী করবে।"

"অ্যাকসিডেণ্টে?"

"জানেন না? শেষ রাতে লরির ধাক্কায়—মাথাটা খেয়াল করেননি? সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। ছেলেরা একপাশে সরিয়ে রাখে। তারপর কতবার যে হাসপাতালে ফোন করা হলো—"

"লরির ধাক্কায় মারা গেছে?"

"আপনি কী ভেবেছিলেন?"

"আমি—মানে—আমি আর কী ভাবব!"

হাঁফ ছাড়ে। না খেতে পেয়ে মরেনি তা হলে? যাক!

পঞ্চাশটি মানবশিশু, একজন দেবদূত

অমলেন্দু চক্রবর্তী

সারিবাঁধা কতগুলি অপরিচিত মুখের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিনাশ একসময় তার ক্লান্তি আর অধৈর্যে ভিতরে ভিতরে সর্বস্বান্ত হয়ে উঠল। ঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটার এক-কদমেই যেখানে সময় হাঁটে না, সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা সাদা দেয়ালে মুখ রেখে কতগুলি আধমরা মানুষের নড়াচড়া দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হিসেব গোনা! একুনে পঞ্চাশজন মানবসন্তানের জন্য নির্দিষ্ট এই ঘর, অর্থাৎ পঁচিশটি হাইবেঞ্চ আর পঁচিশটি লো-বেঞ্চ এবং তার নিজের জন্য একটি টেবিল, একটি ভাঙা চেয়ার। প্রাণপণ জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধরত অর্ধশত মানবসন্তানের মধ্যবর্তী প্যাসেজটুকুতে নিঃশব্দে পায়চারি করতে করতে অবিনাশ একটি একটি করে প্রতিটি মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগল। অন্তত মানুষের মুখ দেখে সময় কাটুক কিছুটা। অথচ কোনো এক জোড়া মুখই ঠিক একরকম নয়। স্বাস্থ্যে বা উচ্চতায়, গায়ের রঙে অথবা পোশাকে, চশমা থাকায় বা না-থাকায়, মনোযোগে বা অমনোযোগে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। ওই ব্যোপদেব-টাইপ ছেলেটি—যার মাথায় গাঁদা ফুলের কয়েকটি ছেঁড়া পাপড়ি এখনও বিদ্যমান এবং ললাটে দই-এর ফোঁটা শুকিয়ে শক্ত—মুঠো করে কলম বাগিয়ে লিখছে। দু-পা এগিয়ে অবিনাশ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আতঙ্কিত ছেলেটি চোখ তুলে তাকাতেই অবিনাশ ওর রক্তশূন্য হলদে চোখে সাদা ফ্যাকাসে ঠোঁটে ক্রীতদাসের আকুতি দেখল যেন বেঁচে থাকার অপরাধে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষের কাছেই কৈফিয়ত দিতে প্রস্তুত। শস্তা কাপড়ের শার্টটার গলা পর্যন্ত বোতাম-আঁটা। তবু চাগিয়ে ওঠা কণ্ঠাদুটো ঢাকতে পারেনি। অবিনাশ বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ইংরেজিতে দরিদ্রদের দুঃখ-সংক্রান্ত কিছু আদর্শবাদী কথা লিখছে, হাতের লেখাও সুন্দর, কয়েকটা বানান ভুল আর ব্যাকরণের ভুল ক্ষমা-ঘেন্না করে দেখলে মোটামুটি চলনসই। কিন্তু অবিনাশ বিস্মিত হয়, এই লিকলিকে শরীর নিয়ে ছেলেটি যে বেশিদিন বাঁচবে না পৃথিবীতে, আশ্চর্য, দুঃসংবাদ হলেও এ-সত্যটা এতদিনেও ওকে বুঝিয়ে দেয়নি কেউ!

"স্যর—"

অবিনাশ ফিরে তাকাল। পিছনের দিকে কুড়ি-বাইশ অথবা ততোধিক বয়সের

এক উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান যুবক। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু একটা বলতে চায়। অবিনাশ আস্তে আস্তে এগোল। লাল আর কালো ডোরা-কাটা টি শার্ট, ডীপ-নেভি-ব্লু সরু প্যাণ্ট, ডান হাতে দামী ঘড়ি, বাঁ হাতে স্টিলের রিং, শক্ত পেশল বাইসেপ আর চওড়া বুকের ছাতি দেখে নিজের গোলমেলে লিভারটার ভাবনায় অবিনাশ ভিতরে ভিতরে একটু মোচড় খেল।

"আপনি বেহালা থাকেন স্যর!"

"না।"

"মাঝে মাঝে যান স্যর? আপনাকে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

"হবে—" অবিনাশ যথাসাধ্য রাশভারি হতে চেষ্টা করল—"ও-সব কথা এখানে কেন? ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছ, ডোণ্ট ডিসটার্ব আদার্স।"

প্রায় জন্তুর মতো হাইবেঞ্চটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে, থমথমে ঘরটায় প্রচণ্ড শব্দ তুলে, এক ঝটকায় মস্ত লাফ দিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে এলো। আচমকা কিছুই বুঝতে না পেরে, পিছনের দেয়ালের দিকে একবার তাকিয়েই অবিনাশ শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল—"ও কি, তুমি, তুমি বেরিয়ে আসছ কেন? ওখানে বসো, সিটে বসেই বলো—"

ছেলেটি আমলই দিল না, বুক চিতিয়ে কাছে এলো। প্রশ্নপত্রের একটি লাইন সামনে ধরল—"য়্যাণ্ড টোল্ড দেম লঙ স্টোরিজ অব ঘোসটস, উইচেস য়্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানস" তারপর কানের কাছে মুখ এনে গোপন-ব্যবসার দালালের ভঙ্গিতে ফিশফিশিয়ে বলল—"এই ঘোসট, উইচ মানে কী স্যর! ইণ্ডিয়ান মানে তো স্যর আমরা, ওরা তবে কোন দেশের লোক?"

স্টাফ-রুমে অথবা বন্ধুদের আড্ডায় মজা ছড়াবার মতো একটা ঘটনা ঘটছে, তথাপি অবিনাশ, এমন কি মনে মনেও, হাসতে পারছে না। চকিতে দু-দিক থেকে আরও কিছু ছেলে চোঙা প্যাণ্ট ডোঙা জুতোয় পাক খেয়ে প্রায় শাম্মী কাপুরী মেজাজে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। চোখ-মুখের সঙ্গে মেলে না, তবু সকলের মুখেই একটি প্রসন্ন বিনীত হাসি, হাসতে হাসতে টপাটপ পেন্নাম।

"টিকটিকি ইংরিজি কী স্যর?"

"কাইণ্ড-হার্টেড কাকে বলে স্যর?"

"উপরি উপরি দু-সন অজন্মা, ইংরেজি কী হবে স্যর?"

"পাঁচটা ফ্রেজ বলে দেবেন স্যর?"

"এসের টাইটেল কী হবে স্যর?"

"স্যর—"

"স্যর—"

"স্যর—"

অবিনাশের মুহূর্তে মনে হলো, এলোমেলো কতগুলি থাপ্পড় মারে চারদিকে। সামনের মুখগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয় সে যেন কোনো বেপাড়ার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে বেকায়দা অবস্থায়।

"কি, কি বলছ তোমরা—" অবিনাশ ধমকে ওঠে—"গো, গো ব্যাক টু ইয়োর সিটস।"

ওরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়। কানের কাছে মুখ আনে—"এক ঘণ্টা বাদে বাইরে থেকে মাল আনলে অনেক খরচ স্যর। একটা প্রেসি দশটাকা।"

অন্যজন টুপ করে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়—"একটু আধটু বলে দিন স্যর।"

"তিনটে বছর গেছে, এবার গেলে ইজ্জৎ ঢিলে।"

"স্যর—"

দুটো ছেলে ওর পা জড়িয়ে আছে, অবিনাশ স্পষ্ট অনুভব করে। যেন দুটো ঠাণ্ডা সাপ ছুঁয়ে আছে শরীর, পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরায় শিরায় ঝিম ধরে আসছে। অবিনাশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে গেলে দশ টাকা, ভিতরে থাকলে মাস্টারমশাইকে গোটাকয়েক পেন্নাম। ডানে-বাঁয়ে অনুরোধটা আস্তে আস্তে দাবি হয়ে উঠছে, হাসি-হাসি গলার স্বর কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। হাসি শুকোলেই ওই মুখগুলি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তখন সোজাসুজি মোকাবিলায় উত্তাপ বাড়বে। এবং তখন—অসম্ভব—অবিনাশ আর ভাবতে পারে না। শাসন তিরস্কার আদেশ অথবা নির্দেশ···মনে হয় শব্দগুলি তাদের সব অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে অসহায় আর নিরস্ত্র মনে হয়। বলে দেবো? পারি, ঈশ্বরের মতো সর্বজ্ঞ আমি এখানে! শুধু আত্মরক্ষার নামে—অবিনাশ ঘেমে উঠেছে, তেষ্টায় গলা শুকোচ্ছে। দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সদর স্ট্রীটে দিন-দুপুরে ব্যাঙ্ক লুট, সেই কালো আমবেসেডর, নিউ আলিপুরে, আপনজন, আপনজন, অশোককুমার নাইট, ল্ ল্ ল্—লী, ছ ড় ড় ড়—ড়া, মুঝে কাহে তুম জংলি কাহে, সাদার্ন এভিন্যুতে মধ্যরাত্রি, লিবিয়ার জঙ্গলে চাঁদের জ্যোৎস্না···পটকা, ক্র্যাকার, সোডার বোতল···দ্রৌপদী···দ্রৌপদী···লেকের জলে লজ্জা···মেড ইজি, সিওর সাকসেস, ডোণ্ট গো ওয়াইল্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পুলিশের লাঠিচার্জ··· স্টুডেণ্টস আর নট নিও ব্রাহ্মিন্স···যখন কল-গার্ল ছিলাম···শারদীয় সংখ্যার

বিশেষ আকর্ষণ…পরীক্ষা পাশের গ্যারাণ্টি টিউটোরিয়াল হোম, কলেজে লক-আউট…সিনেট নির্বাচনে অধ্যাপকের জোচ্চুরি…ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ…বি-টি পরীক্ষায় অসদুপায়, পরীক্ষার্থী দণ্ডিত…রিপোর্টেড এগেনস্ট…দিল পুকারে আরে আরে আরে…বিবিধ ভারতী…সায়রা বানু গড়িয়াহাটায় পাইকপাড়ায়…আনা ফ্রেঞ্চ হেয়ার রিমুভার, উন্মুক্ত নাভিমূলে অজন্তা কিন্নরী, স্লিভলেস, মাংসের দোকানে বেচারি পাঁঠার ঝোলানো মসৃণ শব, আহা কী মনোরম…এল-এস-ডি, এল-এস-ডি, স্বর্গের চাবি…ছাত্র অসন্তোষ…বিলো স্ট্যাণ্ডার্ড কোশ্চেন…লালবাজার কণ্ট্রোলরুম, ভি-সি স্পিকিং…এক্জাম্ স্টার্টস…সিলেবাস থ্রি-ফোর্থ ইনকমপ্লিট…পরীক্ষা পিছোও…লাঠিচার্জ, অ্যারেস্ট…বাঙালি গর্জে ওঠো…বিজয় সেনা,…বিজয় সেনা…মাভৈ, মাভৈ…রি-এক্জামিনেশান অ্যাওয়ার্ড কুড়ি নম্বর, অনার্সে গ্রেস মার্ক…রেলগাড়িতে পরীক্ষার খাতা লোপাট…চানাচুরের ঠোঙায় বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশান…রাধাকৃষ্ণন-মুদালিয়র-কোটারি…নঈ তালিম, নঈ তালিম…অবিনাশ ব্যতিব্যস্ত, কান ঝালাপালা। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁপাতে থাকে। আলো নেই, বাতাস নেই। পুরনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে পচা গন্ধ, অন্ধকার, এতগুলি মানুষের হৃদপিণ্ড চালু রাখার জন্য মাত্র দুটো সিলিং ফ্যান। অসম্ভব। এবং, মনে হলো, তিরস্কার অথবা ভালোবাসার সব অধিকারগুলি কে বা কারা কখন ইতিপূর্বেই কেড়ে নিয়েছে। এবং সে এখন বড়ে অসহায়!

"একটু-আধটু বলে-কয়ে দিতে হবে স্যর। নইলে পারব না।"

"প্রশ্ন কঠিন।"

"কমন পাইনি।"

"আউট অব সিলেবাস।"

"স্যর বলুন, নইলে গোলমাল হবে।"

"স্যর…"

পায়ের পাতায় আরও কিছু ঠাণ্ডা হাতের শীতলতা, একটা হিম-স্রোত সর্বাঙ্গে উঠে আসছে। ঝিম মেরে অবিনাশ নিজেকে তৈরি করে, সাহস জোগায়, তারপর অকস্মাৎ, একেবারেই অকস্মাৎ, গলা ছিঁড়ে চীৎকার করে ওঠে—"বলব না, বলব না, গো, গো ব্যাক টু ইয়োর সিটস—" বলেই ভিড় মাড়িয়ে একেবারে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়—"কী ভেবেছ তোমরা, ডু ইউ এক্সপেক্ট মি টু বিকাম ইমমরাল, ডু ইউ…"

সমস্ত ঘরটা থরথর করে কেঁপে উঠেই আবার স্থির হয়ে আসে। ছেলেগুলি থমকে দাঁড়ায়, হাসি শুকোয়, শক্ত হয়, চোখে চোখে ইস্পাতের ফলা। যারা মনোযোগে লিখছিল, তারা কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, দরজায় পাশের ঘরের সহকর্মীরা এসে দাঁড়ান। কপালের ঘাম মোছে অবিনাশ, জামার বোতাম খুলে ঘাড়ে-গর্দানে-বুকে হাত ঢুকিয়ে রুমাল ঘসে। এবং ছেলেগুলি একে একে নিজেদের আসনে ফিরে যেতে যেতে অবিনাশের দিকে তাকায়। অবিনাশ লক্ষ্য করে, ওদের জামার নিচে প্যাণ্টের ভাঁজে লুকনো আছে কী সব, উঁচু হয়ে আছে হিপ-পকেটগুলি।

"ওহে বাছাধন, লক্ষ্মীচাঁদ, দেখি তো কী সব মাল-পত্তর এনেছ—"

যাত্রার ভীমের মতো একেবারে ঘরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইংরেজির পরেশবাবু—"দেখি, বের করো—"

"গায়ে হাত দেবেন না স্যর, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি—"

"হুঁ—টুকলি করে ফাঁক করে দিচ্ছে সব, আবার তেজ ফলানো হচ্ছে—"

"সবাই নকল করে স্যর, কেউ সতী নয়—" ও-দিক থেকে একটি ছেলে উঠে দাঁড়ায়।

"কী নয় ?"

"সতী নয়।"

"শুনছেন, শুনছেন কতা !" পরেশবাবু অবিনাশের দিকে তাকালেন। ভেঙচি কেটে খিঁচিয়ে উঠলেন—"খুব সতীত্ব শিখেছিস ! এই এরা লিখছে না, এই এরা··· এই···এরা···এরা···"

পরেশবাবু ভালো ছেলে খুঁজলেন শূন্যে আঙুল ঝুলিয়ে।

"ওরা মুখস্থ করেছে।"

"তোমাকে কেউ মাথার দিব্বি দিয়েছিল মুখস্থ না-করতে !"

"আমাদের মুখস্থ হয় না।"

"তাই নকল করবে ?"

"করব।"

"অ্যা—" আচমকা হকচকিয়ে গেলেন পরেশ চাটুজ্জে। বারকয়েক ঢোঁক গিললেন, উত্তেজনায় হাতা গোটালেন, পাঞ্জাবির বোতাম তুলে বুকের ভিতর ফুঁ দিলেন গরমে এবং শাঁ করে ছুটে গিয়ে ছেলেটির হাত চেপে ধরলেন—"দেখি, দেখি হে চাঁদ, বের করো—"

বের হলো। আস্ত একটা বই। অবিনাশ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, পরেশবাবু বইটির

পাতা ওল্টাচ্ছেন, তিরিক্ষি মেজাজে প্রসন্নতা নামছে, মৃদু হাসছেন, সত্যি হাসছেন পরেশবাবু। ছেলেটিকে পিঠ চাপড়ে বসিয়ে দিয়ে এগিয়ে এলেন, খুশি খুশি ভাব।

একেবারে কাছে এসে আবার জ্বলে উঠলেন—"দেখেছেন, দেখেছেন মশাই, বইটা কী দেদার চলছে, একেবারে হট-কেক। কিন্তু হারামি পাবলিশার্স, শালা বাঙ্কোং, কিছুতেই হাত ওল্টায় না। টাকা চাইলেই শালারা—"

অবিনাশ বইটা হাতে তুলে নেয়—'শিওর সাকসেস, বাই অ্যান একস-পেরিয়েনসড প্রফেসর।'

ঘরটা শান্ত হয়ে এলে আবার সেই আশ্চর্য নীরবতা। দু-পাশের মরা-মানুষ অথবা সজীব মানুষগুলির মাঝখান দিয়ে পায়চারি করতে করতে, এ-দিকে ও-দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে-পড়া কতগুলি কালো-মাথার প্রদর্শনী দেখে দেখে একসময় ধৈর্যের আর সহ্যের শেষসীমায় পৌঁছে দেয়ালে পিঠ রেখে থমকে দাঁড়াল অবিনাশ। বড়ো বেশি বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে নিতাইবাবুকে, বায়োলজির মাস্টারমশাই, বয়সে তরুণ। সহযোগী হিসেবে এই ঘরের চৌকিদারিতে তার থাকার কথা ছিল। "স্ট্রং ডায়েরিয়া—" সকালেই ছোট ভাইকে দিয়ে চিরকুট পাঠিয়েছেন—"সাতদিনের মেডিকেল লীভ প্রার্থনীয়।" অবিনাশ স্থির-নিবদ্ধ একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। "আরে মশাই, কলকাতার রাস্তায় লরি, দজ্জাল শাশুড়ি, পাওনাদার আর পরীক্ষার ছাত্র—এ-চারটের বাইরে ভয় করার মতো মারাত্মক কিছু নেই।" পরীক্ষা শুরু হবার দিন কয়েক আগে স্টাফ-রুমেই বলেছিলেন নিতাইবাবু। চতুর মাছরাঙার মতো অপলক তাকিয়ে থাকে অবিনাশ, মাছটা খেলছে, খেলছে জলের ঢেউ-এ। ডান হাতে কলম এগোচ্ছে খাতার উপর, রুমাল মুঠোয় নিয়ে প্রশ্নপত্রটা বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরা। খাতা আর প্রশ্নপত্রের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মতম ব্যবধানে সরু সুতোর মতো একটা কালো হরফের সরলরেখা। প্রতি মিনিটে একবার করে এক-সুতো তলায় নামছে খাতাটা, নতুন বাক্য উঁকি দিচ্ছে, দ্রুত খাতায় উঠে আসছে। অদ্ভুত মজা লাগল, মনে মনে কৌতুকের লোভ। "ট্রিট দেম ক্রুটালি, দে ডিজার্ভ ইট—" যাবার সময় বলে গেছেন পরেশবাবু—"অল বাসটার্ডস।" অবিনাশ পা টিপে টিপে এগিয়ে এলো, খুব কাছাকাছি, অন্য ছেলেরা সচকিত হয়ে উঠছে—"এভরি বাসটার্ড মাস্ট হ্যাভ এ লুম্পেন ফাদার অ্যাজ হিজ কজ, টেস্ট-পেপার-মেডইজিতে এবার কতো টাকা পেলেন পরেশবাবু? মানিকতলার সি-আই-টি রোডে আপনার নতুন বাড়িটা···আপনার কোচিং-এর ছেলেরা···" অবিনাশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। সত্যি বাহাদুর, কত নিপুণ কারুকলা, কী দুঃসাহস!

দুঃসাহস! খটকা লাগল, দুঃসাহস প্রয়োজন হয় যেখানে ভয়। ওরা বোধহয় আর ভয়ই করে না কাউকে। "কিছু ভয় করবেন না মশাই, হ্যাভ কারেজ ইয়ংম্যান—স্কুলের বাইরে মেন-গেটে একগাড়ি পুলিশ, গোটাতিনেক রাইফেলও আছে। ও-সি নিজেও খুব অ্যালার্ট, দু-বার টেলিফোন করেছেন শুনলাম। একটু ট্যাঁ-ফুঁ করেছে তো কড়াভাবে দাবড়ে দেবেন।" হাতের আঙুলগুলিতে উত্তেজনা বাড়ছে, শুধু যথাযথ মুহূর্তটুকুর অপেক্ষা, মাছরাঙা যেমন ঠিক সুযোগটুকুর জন্য ঘুরপাক খায়, তারপর ছোঁ। পুলিশ দিয়ে চারদিক ঘিরে না-রাখলে আমরা ওদের সামনে দাঁড়াতে পারি না, না পরেশবাবু! রাইফেল উঁচিয়ে থাকলে আমাদের সাহস বাড়ে; এরপর পকেটের গন্ধ শুঁকতে পুলিশের কুকুর আসবে। আমরা শিকল ধরব। তবু, তবু সন্তানের মুখের মধ্যে নিজের মুখের আদল মেলাতে সাধ যায়। ভর্ৎসনার অধিকার হারিয়েছি, কিন্তু ভালো-বাসার? হাতের আঙুলগুলিতে এবার আস্তে আস্তে হিংস্রতা পূর্ণ হয়ে ওঠে, হয়তো যথার্থ সময়, স্নায়ুতে উত্তাপ। অতর্কিতে হাতের থাবাটা খপ করে খাতাটা আঁকড়ে ধরে।

ছেলেটি চমকে ওঠে—"কী স্যর!"

"কী করছ তুমি?" অবিনাশ ক্ষেপে ওঠে।

"দয়া করুন, পায়ে পড়ি, দয়া করুন স্যর—" ছেলেটি জোড়হাতে হাত কচলায়। পায়ের দিকে হাত বাড়াবার জন্য সামনে ঝুঁকে বলে—"আর একটু স্যর, নইলে মরে যাব।"

"পেন্নাম ঘুষ দিয়ে বেঁচে যেতে চাও? একে বাঁচা বলে?" অবিনাশ দু-পা পিছিয়ে আসে। খাতার তলা থেকে হাতে-লেখা একটা কাগজ বেরিয়ে এসেছে। জুটো ট্রানস্লেশন। চোখে চোখ রেখে তাকায়—"কোথায় পেলে এসব? বাইরের সাপ্লাই?"

ছেলেটি চুপ করে থাকে। অবিনাশ খাতা মেলায়। প্রায় সবটাই তুলে নিয়েছে। রীতিমতো চৌকোশ ইংরিজি, পাকা হাতের কাজ—"আমি তোমাকে নতুন খাতা দেবো। এটা বাতিল।"

"স্যর—"

"নইলে আর-এ করব।"

"স্যর—"

"ওকে মাপ করে দিন স্যর, এবারের মতো—"

অবিনাশ চমকে ওঠে—চারদিক থেকে গোটা পনের ছেলে বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ায়। না, এখনও বিদ্রোহ নয়, অনুরোধ। এবার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলি অথবা মাথা গুঁজে লিখছে যারা—কেমন যেন মনে হলো সকলেই ওর অস্তিত্বকে তুড়ি মেরে সিঁদ কেটে যাচ্ছে গোপনে। চুরি-চুরি খেলা। চৌরঙ্গিতে একটা সৎমানুষ খুঁজতে দিন-দুপুরে হ্যারিকেন জেলে হাঁটতে হয়। ওই ছেলেটা! যে আর দুটো কি তিনটে বছরও বাঁচবে না পৃথিবীতে, অজীর্ণ-রোগ অথচ অক্লান্ত লিখছে। ও-ও কী! শেষ বিশ্বাসটুকু বাজি রাখতে ইচ্ছে করছে। অবিনাশ চারদিকে আবার দ্রুত চোখ বুলোয়, একে একে প্রতিটি মুখ—স্নায়ুতে অস্থিরতা বাড়ে, কৈশোর কোথায় বাঙলাদেশে, ব্রনে অক্ষত কচি কিশোর মুখ! নিষ্পাপ চোখ! মরীয়া হয়ে ওঠে অবিনাশ, প্রাণের আকুতি নিয়ে খোঁজে। বেঁচে থাকার জন্য সামান্য একটু বিশ্বাস খুঁজে নিতে চায়। বিনাযুদ্ধেই খাতাটা ফিরিয়ে দেয়, পকেটে চিরকুট বহনের অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়। সবাই শান্ত হয়, আর দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ রেখে সম্মোহিতের মতো এগিয়ে যায় অবিনাশ, শিকারী বিড়ালের মতো। একে একে হাইবেঞ্চগুলি পেরিয়ে যায়, গভীর ঔৎসুক্যে ছেলেরা তাকিয়ে থাকে। উদভ্রান্ত অবিনাশ এগোয়। এ-কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা! হাঁটু পর্যন্ত পা-ডুবিয়েও হাঁটতে চাইছি আজও। আজও গর্ভোৎপাদন করি, জরায়ুতে আজও আতুরে খোকা খুকুরা অন্ধকার খামচায়। অথচ পচা-কাঁঠালের ভুতির উপর মাছি ঘুরছে ভনভন, হাতড়ে হাতড়ে অন্তত একটি কোয়া খুঁজে দেখতে ইচ্ছে হয়। বিশ্বাসের ছবি। হাইবেঞ্চে ঝুঁকে পড়া কালো মাথার সারি, নীল জামা, সাদা শার্ট, চিকনের পাঞ্জাবি, টেরিলিন, লাল টাওয়েল গেঞ্জি, শস্তা মার্কিনের ছিট, অপরিচিত মুখগুলি, নির্বোধ নিরীহ পাতক! অবিনাশ বিশ্বাস খোঁজে, এগিয়ে যায়। একেবারে কোণের দিকে ছেলেটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়—রোল সাউথ সি নম্বর (সায়েন্স) ৮২৫, পনের-ষোল-সতের হবে বয়স, ক্ষুদে ক্ষুদে জাফরি-কাটা টেরিলিনের শার্ট, টেরিকটের প্যান্ট, হাতে দামী ঘড়ি, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। অবিনাশ সস্নেহে পিঠে হাত রাখে, ছেলেটি চোখ তোলে, কেমন অপু অপু ভাব, কচি মসৃণ গালে হাসিতে টোল, নাকের তলায় নতুন গোঁফের রেখা। অবিনাশ হাসে, আদর বুলোয়। "লেখো লেখো, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।" অথচ বলতে পারে না, ভয় নেই তোমার, আছি, আমি আছি, বুক পেতে বাঁচাব তোমাকে। এবং সারা ঘরে তখন গুঞ্জন হল্লা হয়ে উঠছে, পাহারাদার অবিনাশ

মিথ্যে হয়ে গেছে, লুঠেরাদের বেপরোয়া লুঠ চলছে। বাইরের অন্যসব ঘর থেকে মাস্টারমশাইদের হুঙ্কার-গর্জন শোনা যাচ্ছে—"ডোণ্ট টক" "নো টক—।" অবিনাশ কোনো চেষ্টাও করল না। চারদিকের লুঠতরাজের হট্টগোলে স্থবির হয়ে গিয়ে শুধু নিজের শেষ বিশ্বাসটকু, যেন নিজের সন্তানকে, আগলে রাখতে চাইছে। সন্তান! এই দীর্ঘ সময় একা দাঁড়িয়ে থেকে এবং পায়চারি করে করে ক্লান্ত অবসন্ন অবিনাশ এবার নিজের চেয়ারটার দিকে ফিরে যায়, সিলিং-এ ঝোলানো দিনের বেলায় লালচে ইলেকট্রিকের আলোয় ওর দীর্ঘ ছায়া ছেলেদের মাথার উপরে পাক খায়। অবিনাশ হাত-ঘড়ির দিকে তাকায়—এখনও চল্লিশ মিনিট। সময় যত ফুরোয়, উন্মাদনা বাড়ে। হল্লা-চেঁচামেচি, সামনে-পিছনে খাতা দেখা-দেখি, ফিশফিশ অথবা সরব কথা বলা···অবিনাশ জানে, প্রায় প্রতিটি ছেলেই এখানে আড়ালে কাগজ বই-এর পৃষ্ঠা লুকিয়ে লিখছে; আজ যেটুকু সংযম, কাল তাও থাকবে না। প্রকাশ্যে সামনে বই ফেলে লিখবে। এবং কাল-পরশু অথবা অচিরেই একদিন অবিনাশ পিতা হবে। ঘরের মেঝেতে উবু হয়ে বুড়ি-মা কাঁথা বুনছেন, আর দুপুরের একা-ঘরে চোখ বুজে দাঁতে ঠোঁট চেপে যন্ত্রণাকে সামলে নিচ্ছে গীতা। নাভিমূলে পদ্ম ফুটছে। মেঝেতে ছড়ানো ছেঁড়া-কাপড়ের ভাঁজে মায়ের কাঁপা-হাতে সূঁচ নাচছে, লাল-পাড়-তোলা সুতোয় পদ্ম ফুটছে। গোপাল আসবে, গোপাল নাচবে পদ্মের শয্যায়, ঘুঙুর নাচবে মা-যশোদার পায়ে। অবিনাশ অস্থির হয়ে ওঠে, চারদিকে লণ্ডভণ্ড প্রহসনের খেলা, তাকিয়ে থাকে—সাউথ সি (সায়েন্স) আটশ পঁচিশ, হীরের টুকরো ছেলে। চীৎকার বাড়ছে পৃথিবীতে, আরও বাড়বে দিন দিন, বাড়তে বাড়তে হয়তো একদিন শান্তি আর বিশ্রাম ভুলে যাবে মানুষ। অবিনাশ একটা কাগজ টেনে নেয়, কলম খোলে, হট্টগোলের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে আঁকি-বুঁকি খেলে। কি মনে হয়, হিসেব কষে—উনিশ শ উনসত্তরের সঙ্গে সতের যোগ—উনিশ শ ছিয়াশি। চার-সংখ্যার অঙ্কটা আবিষ্কার করে আঁতকে ওঠে—ছিয়াশি! অনেক দূর! এখন তেত্রিশ, সতের যোগ দিলে? পঞ্চাশ। শরীরে জরা নেমেছে, চুলে পাক ধরেছে, পুরনো হয়ে হারিয়ে যাচ্ছি। অবিনাশ শিউরে ওঠে, ফণীবাবুকে মনে পড়ে, স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক, কোচিং-এর ছেলেদের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন আউট করে দিয়ে শো-কজ-এর পর চার্জ-শিট-এর খাঁড়ার তলায় কাঁপছেন। অবিনাশ শিরদাঁড়া তুলে সোজাসুজি চেয়ে থাকে, যেন দর্পণে নিজের মুখ, নিজের মুখের আদল খোঁজে। তোলপাড় হচ্ছে সারা ঘরে, শুধু টিপ-সই-এর অপমান থেকে মুক্তি পেতে মরীয়া হয়ে উঠেছে শেষ আধ-ঘণ্টায়।

চীৎকার করছে, কাগজের টুকরো বই-এর পাতা হাতে হাতে চালান হচ্ছে, ঘাড় ফিরিয়ে এ-ওকে বলছে, এর খাতা ওর হাতে—অবিনাশ দেখছে, সহ্য করছে। অরণ্যের বিভীষিকায় ধ্রুবকে দেখছে, বিশ্বাসের ছবি। উনিশ শ ছিয়াশি, এই ঘর এবং সেই ধ্রুব, সাউথ সি (সায়েন্স) আট শ পঁচিশ, দুপাশে মানুষের মুখগুলি হায়না হয়ে গেছে, সুঁচোল মুখের ডগায় লকলকে জিব, চোখগুলি হিংসায় আগুন, নখে নখে ইস্পাতের ফলাগুলি আলোয় জ্বলছে, বাতাসে টাকা উড়ছে, ঘরে ঘরে ছাপানো নোটগুলি সব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শিরোপা পেয়েছে। স্নায়ুতে যন্ত্রণা বাড়ছে, জীবনের ভার নেমেছে শরীরে, আরও সতের বছরের ক্লান্তি আর অবসাদ। প্রৌঢ় পঞ্চাশের শিথিল দেহভার নিয়ে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় কে ? কেউ চেনে না, পরিচয়হীন। এভরি বাসটাড´ মাস্ট হ্যাভ এ লুম্পেন ফাদার, এ ডিবচ মাদার অ্যান্ড হিজ কজ। ভিতর থেকে একটি মর্মান্তিক তীব্র চীৎকার কণ্ঠনালীতে এসে আটকে যায়, মার-খাওয়া কুকুরের মতো একটা বিকট অর্তনাদ—না, না, আমি কখনও নোট মুখস্ত করে পরীক্ষা পাশ করিনি, বিশ্বাস করো। কেউ বিশ্বাস করে না, হায়নার নখগুলি রক্তের নেশায় জ্বলজ্বল করে—না, না, বিশ্বাস করো, দারিদ্র্যে ট্যুশানি করেছি, কোচিং খুলে ছেলেদের প্রশ্ন বলে দিইনি, প্রিয় ছাত্রদের বেশি নম্বর দিইনি খাতায়। হাঁ-করা হায়নার দাঁতগুলি বীভৎস হয়ে ওঠে। আত্মরক্ষায় অধীর প্রৌঢ়ের আকুল মিনতি--বিশ্বাস করো, পাঠ্য-পুস্তক লিখেছি কখনও, কিন্তু নোট আর মেড-ইজির বেনামী বাণিজ্য কোনোদিন করিনি। হায়নাদের জিবগুলিতে লোভের লালা ঝরে। চোখগুলি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্বাস করো, ঘুমের চোখে খাতা দেখে সর্বনাশ করিনি কারও। চারদিক থেকে হায়নারা লাফিয়ে ওঠে, একসঙ্গে আক্রমণ করে। আমি ভালো-বাসি আমার সন্তানকে, বিশ্বাস করো, ছাত্রদের ভালোবাসি, বিশ্বাস করো··· ক্রুদ্ধ নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত শরীর, বিষাক্ত দাঁতের দংশনে জ্বালা। প্রাণপণ শক্তিতে পালাতে চায়, ছুটে যায়, এই অরণ্যের হিংস্রতায় দু-হাতে আগলে রাখতে চায় ধ্রুবকে, প্রহ্লাদকে। সাদা খাতা। শিউরে ওঠে। পিঠে হাত বুলিয়ে কাগজের টুকরো এগিয়ে দেয়, আস্তে আস্তে ফণীবাবু হয়ে ওঠে, কানে কানে বলে "—লেখ বাবা লেখ, ট্রানস্লেশানটা টুকে নে চটপট, ও-পিঠে প্রেসিটা আছে—কিন্তু ভয় নেই। আমি আছি···আমি আছি···"

সতর্কীকরণের ঘণ্টা বাজে। শেষ পনের মিনিট। সচকিত অবিনাশ হাঁপায়, রুমালে নাক-মুখ-ঘাড়-গর্দানের ঘাম মোছে। হট্টগোলে প্রহ্লাদকে খোঁজে,

সন্তানকে। চমকে ওঠে—হাইবেঞ্চে হাতের ভাঁজে মাথা রেখে ছেলেটি কাঁদছে। অবিনাশ উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায়। একেবারে কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ায়।

"কী হলো, কাঁদছ কেন, লেখো।" ছেলেটির ডাগর চোখ লাল, মায়ের দেওয়া দই-এর টিপ মুছে গেছে কখন, চোখের জলে খাতা ভিজছে—"পারছি না স্যর, এক হাজার ফ্রেজ মুখস্থ করেছি স্যর, একটাও কমন পাইনি।"

এক হাজার ফ্রেজ মুখস্থ! অবিনাশ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খায়—"কিন্তু এ-তো সব সহজ, অনেকগুলি কমন।"

"সব ভুলে গেছি স্যর…" কান্নায় ভিজছে গলা, করুণ হয়ে ওঠে—"তিনটে বলে দিন স্যর।"

অবিনাশ শক্ত হয়ে ওঠে। সোজা হয়ে দাঁড়ায়—"ওদের মতো তুমি চুরি করতে শেখোনি? কাগজ আনোনি সঙ্গে?" ছেলেটি চোখ তুলে তাকায়। ভক্ত প্রহ্লাদের চোখে মানুষের ভাষা-না-বোঝার বিস্ময়। অবিনাশ ভালোবাসার আদর বুলোতে হাত রাখে পিঠে। ঝুঁকে পড়ে। এবার যুদ্ধ নিজের সঙ্গে।

"গোটা তিনেক বলে দিন স্যর"—কাতর অনুনয়।

দুপাশে ছেলেরা সব প্রকাশ্যে বই-এর পাতা খুলে ধরেছে। হিংস্র এই অরণ্যে একটি নিষ্পাপ শিশুর শান্ত-করুণ দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে অবিনাশ আরও ঝুঁকে পড়ল, কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো—"লেখো, নিপ ইন দা বাড…।" ছেলেটি কলম বাগিয়ে উদ্যত হলো, অবিনাশ ভাবল—আওয়ার ব্রাইট হোপস অ্যাণ্ড ফিউচার্স আর বিইং নিপড ইন দা বাড অ্যাট ইয়োর স্যুইট হ্যাণ্ডস, পেরেন্টস—এবং বাক্যটিকে নিজের শিল্পকর্ম বলে মনে হলো তার। জীবনে একবার, অন্তত এই একটিবার, কতগুলি শব্দ দিয়ে নিখুঁতভাবে জীবনের উপলব্ধির রূপ-নির্মাণ। যেন প্রতিটি শব্দের আঁচড়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠছে গর্ভবতী গীতা আর মায়ের ডান হাতের স্যুঁচ বাঁ হাতের আঙুলে গেঁথে গিয়ে রক্ত ঝরাচ্ছে, লাল রক্ত, যে-পদ্ম লাল হবে। একেবারে আচমকা, প্রায় নাটকীয়ভাবেই জোর করে খাতাটা টেনে নিল অবিনাশ। পাঁচ মিনিট বাকি, এ-খাতা টেনে নেবার অধিকার তার আছে। ছেলেটি চীৎকার করে কাঁদল, পায়ের উপর আছড়ে পড়ল এবং অবিনাশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রায় সাদা-খাতাটার পাতা ওল্টাল, শুধু প্রথম পৃষ্ঠায় কিছু অক্ষম প্রয়াস, তিনঘণ্টা ধরে শুধু একটানা নিভৃত-কান্না আর ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস।

অবিনাশ এগিয়ে যায়, একটি অবোধ শিশুর কান্নাকে ডিঙিয়ে আরেক শিশুর কান্নার দিকে।

পুস্তক-পরিচয়

স্মৃতি বিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশী। যুগান্তর চক্রবর্তী। লেখাপড়া : ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। তিন টাকা

বই মধুর মন। লোকনাথ ভট্টাচার্য। অব্যয় : ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা-৯। তিন টাকা

দুটি বইয়েরই প্রকাশ নিঃসন্দেহে এ-বছরের কাব্যজগতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

যুগান্তর চক্রবর্তীর এই বইটিকে এক হিসেবে তাঁর প্রথম গ্রন্থ বলা যায়। বহু পূর্বে তাঁর যে-ছোট চটি বইটি বেরিয়েছিল, সে-সম্পর্কে তিনি নিজেও যেমন বর্তমানে কিছুই উল্লেখ করেননি, তেমনি যাঁদের মনে আছে—তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বিষয় প্রকরণ অভিজ্ঞতায় তাঁর কি বিপুল রূপান্তর ঘটে গেছে, যেন এক নতুন কবির জন্ম হয়েছে। কারো কারো মতে সে-পরিবর্তন সবটাই তৃপ্তিজনক কিনা সন্দেহ। আমার অবশ্য যুগান্তরবাবুর এই পরিবর্তনের সব কটি ধাপ জানা নেই—মাঝখানে তিনি খুব কম লিখছিলেন, প্রায় লিখছিলেনই না, এখনো কচিৎ লেখেন। তাই আলোচ্য গ্রন্থে যে ২২টি কবিতা মাত্র আছে, তা লিখতে তাঁর সময় লেগেছে পনেরো বছর—১৯৫৩ থেকে ১৯৬৭। তার মধ্যেও, ১৯৫৩ থেকে ১৯৬৬-র মধ্যে মাত্র ১২টি এবং ১৯৬৭-তে ১০টি। হয়তো এ-সময়ের মধ্যে লেখা কিছু কবিতাকে তিনি গ্রহণ করেন নি, কিন্তু সংখ্যায় সেগুলো নিশ্চয় তেমন বেশি হবে না। যুগান্তরবাবুর রচনার এই অতি-স্বল্পতার কারণ কি? প্রত্যেকটি কবিতাই এত পূর্ণগর্ভ যে বেশি লেখার দরকার হয় না? নাকি তাঁর বিষয়ের অভাব? অভিজ্ঞতার দৈন্য? কোনো কবিকে কম লেখার জন্য অভিযোগ করা অন্যায় এবং অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু যুগান্তরবাবুর মতো কবির রচনার অতিক্ষীণতা লক্ষণ-যোগ্য, কারণ তা হয়তো তাঁর কবিস্বভাব বা কাব্যক্ষমতার কোনো ইঙ্গিতও বহন করে।

যুগান্তরবাবুর কাব্যরচনার এই বিক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও তাঁর কবিতার কালানুক্রমিক অনুধাবন খুবই আকর্ষণীয়। ১৯৫৩-তে লেখা কবিতা দুটিতে যেন আমরা আগের যুগের তরুণ যুগান্তর চক্রবর্তীর স্বাদ পাই। সেই সুস্থ ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও দৃষ্টির সহজ ও অকপট বহিঃপ্রকাশ।

"এ-আনন্দে সব বুঝি ভেসে যায়, ভেসে যেতে পারে।
প্রতিটি দিনের দৈন্য ধুয়ে ধুয়ে ধারায় ধারায়
সংগীত, সংগীত শুধু—প্রভাতফেরীর পরপারে
তমসা-আকুল মুখ অবগুণ্ঠনের মুক্তি চায়।" [প্রভাতফেরী]

"তুমি যখন স্বপ্ন দেখে কথা কইলে
একটা আশ্চর্য মুক্তির আন্দোলনে বিজয়িনী
তোমার অপরূপ রূপের মুখোমুখি
লজ্জা, ক্ষোভ আর দৈন্যের প্রহারে ভগ্নস্তূপ আমি
চিৎকার করে উঠলাম
যদি এই অন্ধ আকাশের বন্ধ দরজা
এক ঝাপটায় খুলে যায়···।" [তুমি স্বপ্ন দেখে কথা কইলে]

সারল্যের ঐশ্বর্যে আমরা মুগ্ধ হই। আমরা আশা করেছিলাম, এই তারুণ্যমণ্ডিত শক্তিশালী কল্পনারই বিবর্তন ঘটবে স্বকীয় পথের টানা-পোড়েনের লজিকে। কিন্তু দু-বছর বাদ দিয়েই ১৯৫৬ সালের লেখা কবিতায় তিনি যেন সেই আশাকে নস্যাৎ করে স্মৃতিচারণার সহজ আত্মসমর্পণে, বিষাদে, আত্মকণ্ডূয়নে রত হলেন। তাঁর অভিজ্ঞতাটা যে অকপট, তা মানা যায় প্রকরণের অস্থিরতার নৈপুণ্য লক্ষ্য করলে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অনভিপ্রেত দুর্বলতাও বোধহয় ধরা পড়ে যায় সর্বগ্রাসী অসহায়তার এই সাবেকি পথে। ছেলেবেলার ছড়া ধারাপাত তেঁতুলতলার নিশ্চিন্ত জগৎ থেকে কবি যে শব্দগন্ধস্পর্শের তীব্র অনুভূতি পেয়েছিলেন, তা তাঁকে গ্রহণ-বর্জনের সক্রিয়তায়, আবেগমননের দ্বান্দ্বিকবিন্যাসে বৃহত্তর বৃত্তে নিয়ে গেল না, তিনি লড়াইয়ে ইতি দিয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। 'স্মৃতিচিত্র' সেই পরাজয়েরই আত্মজীবনী—কিন্তু তার বর্ণনাতেও যন্ত্রণাবোধ ততটা নেই, তাই তা প্রতীকী হয়ে উঠতে পারে না, সহানুভূতিরই যেন অযোগ্য তা। বরং সেই পরাজয়কেই তিনি তত্ত্বরূপ দিতে চান, সাফাই গাইতে চান আত্মপ্রত্যয়ের নবীয়া ভঙ্গিতে। তাই যুগান্তর চক্রবর্তীর 'নগ্নতা' (স্মৃতিচিত্র, গান, উৎসর্গ) কোনো উত্তরণ নয়, শুদ্ধি-অর্জনও নয়—এ যেন নিঃসহায় দৈন্য, পরাজিত ভবিতব্য। ফলে স্বভাবতই তিনি বাস্তবের দ্বন্দ্বমুখর বৈচিত্র্য থেকে সরে আসেন ব্যক্তিসর্বস্ব আবেগের বা ধারণার চর্চায় ও প্রতিমানির্মাণে, কখনো অতীন্দ্রিয় রহস্যের কানাগলিতে। ঠিক এরকম পরিণতি তাঁর সমকালের

আরো কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে। যুগান্তর চক্রবর্তী অবশ্য তাঁদের মতো ঈশ্বর বা বেনামী ঈশ্বর এড়িয়ে গেছেন স্বভাবতই এবং 'স্মৃতিচিত্র'-র ৪নং অংশে তিনি যেন জটিল সমন্বয়ের সম্ভাবনার আভাসও দেন চকিতে

"যদি ঘুরে ঘুরে ধ্বনিত নামের
অনুষঙ্গে বেজে ওঠে অকস্মাৎ তোমার সত্তার
আবহ সংগীত। তাই কাছে যাই, উচ্চারণ বিনা
তোমার স্বরূপ আর শরীরের
বিরোধিতা থেকে শুধু তোমাকে জাগাই।" [স্মৃতিচিত্র ৪]

কিন্তু তার বহু আগেই তো তিনি সহজ সমাধানের পথে দাসখত লিখে দিয়ে বসে আছেন, তাই এরকম অসাধারণ দৃষ্টিও কাজে লাগে না—আর সমগ্র কাঠামোর ঝোঁকেই এই ছক সঞ্চারিত হওয়ায় তিনি ৫ নং অংশে "কারা যেন ছায়া ফেলে বারবার, কারা আসে যায় জানি না" এই রহস্যের কিনারে গিয়ে নিশ্চিন্ত হন। তারপর পর পর কয়েকটি কবিতায় তিনি নিজেকে আঘাত করছেন, আত্মসংহত হয়ে সচেতনতার সন্ধান করছেন দেখে আশা হয়—এবার হয়তো খোলস মুক্তি ঘটবে। কিন্তু তার বদলে তিনি নিজের চারপাশে কঠিন আবরণ তুলে প্রসন্ন হতে চাইলেন। এটা যে আসলে অভিমান, নিজের দুর্বল কাব্যবোধ ও বন্ধনের গ্লানির জন্য অভিমান, তা টের পাওয়া যায় এ-সময়ের প্রকরণগত নানা বৈশিষ্ট্যে। যেমন জীবনানন্দ দাশের অনুকরণে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার কিংবা পুনরুক্তি কিংবা বিশিষ্ট বাগরীতি ("তোমার শরীরে তত দুঃখ নাই") ইত্যাদি। হঠাৎ মনে হতে পারে এগুলো ছেলেমানুষী। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় এই অননুকরণীয় ভঙ্গি তো এসেছিল তাঁর তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বোধের বাঁকা পরিণতিতে। যুগান্তর-বাবুও যে পরাজয় ও অভিমানের মুহূর্তে এই সবের প্রতি টান অনুভব করবেন, তাও তো স্বাভাবিক। এ-সময়ে তিনি আত্মজিজ্ঞাসা একেবারে বাদ দিয়েছেন—একথা বললে হয়তো অবিচার করা হবে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে উঠেছে নৈরাশ্য ও বৈরাগ্যের দর্শন, নানা চেহারায়। তিনি নিজের এই মানসিক অবস্থাকে অসাধারণ শিল্পচাতুর্যে তুলে ধরেছেন 'অর্জুন বিষাদ' বা 'শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুন' কবিতায়। কিন্তু সেখানেও আত্মক্ষয়ীভাবে বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তিসর্বস্ব উপলব্ধির উপর অহেতুক নির্ভরশীলতা এবং ফলে বদ্ধ নিশ্চিন্ততার চতুর্দশপদী কুঠুরির নিপুণ স্থাপত্য।

১৯৬৭ সালের কবিতাগুলো এই প্রস্তুতিরই অবাধ ও সাহসী পরিণতি। তিনি তুলনায় অনেক কবিতা লিখলেন—জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির'-এর ধাঁধাঁর প্রভাব পড়ল তাঁর আত্মঘাতী শব্দক্রীড়ার দায়িত্বহীনতায়। তাঁর কবিতা আরো নিটোল হলো—তিনি কবিতার মধ্যেই যেন আরো মজে রইলেন বাইরে তাকাবার শেষ দায়টুকুও বিসর্জন দিয়ে, ফলে প্রাইভেট ইমেজের পোয়াবারো আনাগোনা চলল তাঁর কবিতার একদা-ভক্ত পাঠকদের সম্পূর্ণ বিমূঢ় করে।

"আমার নিজস্ব রাজনীতি আজ গোপন সন্ত্রাস" [পৃথিবীর গরীবেরা]
"সারারাত জেগে থাকিবার ঘোর বিরুদ্ধতা থেকে শুধু সমূহ লেখার
নষ্ট হাত হতেছে আলাদা…" [সারারাত চৈত্রবাতাসের শব্দ]
"আমি অভিজ্ঞতা থেকে একা বাতাসের বুকে অঘোরে ঘুমাব…" [দায়ভাগ]

এরকম ছিন্ন লাইন থেকে মানে বের করতে চাইলে কবিতার প্রতি অবিচার হবে, কিন্তু এরই মধ্যে তবু পরিবর্জনের অহংকার ও আত্মসর্বস্বতার অভিযান হয়তো অস্পষ্ট থাকেনি।

অথচ যুগান্তর চক্রবর্তীর কবিতার এই তন্নিষ্ঠ দিক সম্পর্কে আমার যতই আপত্তি জমতে থাকে, ততই কিন্তু আমি তাঁর ছোট্ট নিষ্পাপ লিরিকের ভক্ত হয়ে উঠি—শব্দের ক্ষমতায়, কল্পনার পরিচ্ছন্নতায়। তাঁর আত্মমুখিনতার অভিজ্ঞতা যেন কাজে লেগে যায় এইসব প্রেমের কবিতাগুলোর শব্দব্যবহারে। 'আমার নিজস্ব কোনো বাক্স নাই', 'বোঝা পড়া', 'গান' কিংবা শেষ কবিতা 'উৎসর্গ': এগুলোকে বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা বলেই মনে হয়, তাঁর অস্বস্তিকর 'দর্শন' বাদ দিয়েই এগুলো উপভোগ্যভাবে পড়া যায়।

যুগান্তরবাবু সম্পর্কে এই সমালোচনা বা স্বীকৃতি হয়তো তাঁর অনুকূল হলো না। কিন্তু এ-লেখা নিতান্তই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, যদি আমরা তাঁর ব্যর্থতা বা সাফল্যকে আরো পাঁচজন কবির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। অসতর্ক পাঠকও যুগান্তরবাবুর স্বতন্ত্র অবস্থান উপলব্ধি করতে পারেন। এবং ব্যাপারটা কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিকও বটে। চল্লিশের যুগে আবেগ-উত্তেজনার পথে যখন কাব্যরূপেও শৈথিল্য এলো, তখন সমবয়স্ক কবিদের বিমূঢ় করে কিংবা সমালোচনা কুড়িয়ে যে দু-একজন কবি ভিন্ন চালে চললেন, যুগান্তরবাবু তাঁদের একজন। সরল সমীকরণের সমাধান নয়, দ্বন্দ্বের অপর মুখকেও তাঁরা না-দেখে পারেননি বলেই হয়তো তাঁদের পদক্ষেপ ছিল কিছুটা শ্লথ,

অনিশ্চিত, অতি-সতর্ক এবং আত্মসচেতন। হয়তো এই চেহারা আরো স্পষ্ট ছিল সিদ্ধেশ্বর সেন বা শঙ্খ ঘোষের কবিতায়। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন ছিল এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের। কিন্তু যুগান্তরবাবু এই সঙ্কটের আবর্তেই আবদ্ধ রইলেন। এইখানেই তিনি পিছিয়ে পড়লেন।

যুগান্তর চক্রবর্তীর স্বল্পপ্রসূ ও ক্ষীণতনু কবিতার পাশে লোকনাথ ভট্টাচার্যের অজস্রতা আমাদের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অজস্রতা শুধু কবিতার সংখ্যায় বা কবিতার দৈর্ঘ্যে নয়, কল্পনার বৈচিত্র্য ও চিত্রকল্পের সমারোহেও আমরা সচকিত হই।

একদা লোকনাথ ভট্টাচার্যের কবিতা সম্পর্কে আমাদের প্রধান আপত্তি ছিল বিদেশী অন্বয়রীতির ও মেজাজের প্রাদুর্ভাব, তা তিনি প্রায় সবটাই কাটিয়ে উঠেছেন দেখে প্রসন্ন হতে হয়। এখন আর তিনি বিদেশীর মতো বাঙলা লেখেন না। তাঁর চিন্তা ও কল্পনাতেও দেশের মাটির ধুলো ও রঙ লেগেছে।

লোকনাথবাবুর যে দিকটি আমাদের খুশি করে, তা হচ্ছে তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসন্নতা। নানা বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন। বিষয়ের এই ব্যাপকতা তাঁর কল্পনাশক্তিরই প্রমাণ। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই তিনি তাঁর রুচিস্নিগ্ধ দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেন। অথচ জটিলতাকে এড়ান, তা-ও নয়। সব কিছুর মধ্যে যা সুস্থ যা শুভ—যেন তারই প্রকাশ দেখাতে তিনি উন্মুখ। হয়তো সময় সময় মনে হয়, তাঁর এই বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য সামান্য কিংবা যে-ঐক্য সহজেই প্রত্যক্ষ, তা খানিকটা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তাঁর কাব্যপাঠান্তে আমরা ইন্দ্রিয়ের যে-অতিরেকবর্জিত চর্চার প্রমাণ পাই, তা আমাদের জীবনবোধকেই জোরাল করে। অর্থাৎ জীবনজিজ্ঞাসার কোনো জীবনমরণ টান কিংবা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর কবিতায় না থাকলেও, উপরি-ভাগে কিংবা আনাচে-কানাচে তাঁর তর্কাতীত কাব্যবোধকে চারিয়ে দেন। এবং সে-কাব্যবোধ ঝুঁকিও যেমন নেয় না, তেমনি পদস্খলনও ঘটতে দেয় না। এভাবেই তিনি তুচ্ছতার হাত থেকে বেঁচে যান।

লোকনাথবাবু গদ্যে কবিতা লেখেন। অরুণ মিত্রের তুলনায় তাঁর এই গদ্য মন্থর, বাক্যগঠনে বা বাগরীতি প্রয়োগের অভিনবত্বে খানিকটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসুক—কিন্তু তাঁরই মতো চিত্রকল্পের সমারোহে ও ঐশ্বর্যে তিনি পাঠককে প্রায় বিপর্যস্ত করে ফেলেন। তবে লোকনাথবাবুর চিত্রকল্পে আকস্মিকতা

বা নতুনত্ব বোধহয় বেশি। সময় সময় সন্দেহ হয়, যে-বিদেশী প্রভাবের অনুপস্থিতি আমাদের কিছু আগে সৃষ্ট করেছিল, তা-ই উঁকি মারে ঐ নতুনত্বের পেছনে। বাক্যগঠনের অভিনবত্বে পরীক্ষামূলক ব্যবহারের সাহস এবং বিদেশী-গন্ধবহ কষ্টকল্পনা, এই দুয়ের সীমারেখা মাঝে মাঝে ঘুচে যায়। কখনো কখনো আঁকাড়া অনুবাদের লোভও তাঁকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন করে।

এই প্রভাব বা অনুসরণের ভালো দিকও নিশ্চয় আছে এবং সেদিক থেকে বাঙলা কাব্যভাষার সম্ভাবনাকে তিনি বাড়িয়েই দিচ্ছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এ-ব্যাপারে আপত্তির মাত্রা ক্রমশই কমে যাচ্ছে। গদ্যকবিতায় এই চিত্রকল্পের বাহুল্য যদি তাঁকে কিছুটা সাহিত্যপনায় নিয়ে যায়, কিছুটা রুচিবাগীশের পথে, কিছুটা কৃত্রিমতায়, এমনকি হঠাৎ অনার্য শব্দের সুপরিকল্পিত ব্যবহার সত্ত্বেও, কিংবা সেজন্যই; তাহলেও আমরা তাঁর পূর্বের কাব্যপ্রয়াসের সঙ্গে প্রতিতুলনায় সহজেই ধৈর্য ধরতে পারি!

এবং এখানে সবচেয়ে বড় কথা এটাই যে—অজস্র কবিতায় বাঙলাদেশের, তার জটিলতা ও বৈচিত্র্যের, তার প্রকৃতির ও সংগ্রামের, তার নিঃসঙ্গ মুহূর্ত ও শোভাযাত্রার কলরবের আশ্চর্য সহৃদয় চিত্র তিনি এঁকেছেন দ্রষ্টার অন্তহীন আগ্রহে, যে-আগ্রহ শুচিবায়ুগ্রস্ততার সমস্ত প্রাক্তন চিহ্নকে মুছে ফেলে ক্রমশই হয়ে উঠছে গ্রহণক্ষম, স্বচ্ছ, মুক্ত!

স্বভাবতই কাব্যের বিষয় ও আবেগও তখন সব গণ্ডিরেখা ছাড়িয়ে জীবনের প্রতিটি উপাদানে বিচরণ করে এবং বস্তুর দিকেই সংগ্রামী ও আশাবাদী জীবনের ছবি তাতে বেশি করে ধরা পড়ে:

"শুনলাম, কলকাতায় নাকি চার শো মেয়ের দল শোভাযাত্রা ক'রে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে আমেরিকান আপিসে: অমর ভিয়েৎনাম। ভিড়ের মধ্যে আমি সেই নেত্রীর মুখটি খুঁজি, হাতে একগুচ্ছ ফুল, তাঁর খোঁপায় পরাবার।" [সেই নেত্রীর মুখ] "সে ঘুমোচ্ছে, নীরব নির্জীব নিরহংকার নিজ্ঞান, তার আমি দোষ দিই না। তবু তাকে জাগতে হবে, কারণ ফুলকে যে ফুটতে হবে। নইলে আমরা কি সারারাত শুধু জপের মালায় যে-ভোর এল না তার নাম গাঁথব?" [তার নিদ্রার মৃত্যু]

বলাই বাহুল্য—এগুলো স্লোগান নয়, কিন্তু এর মধ্যেই জীবন-সম্পর্কে সৎ ও শুদ্ধ আবেগ প্রকাশের শর্ত রয়েছে, যাতে আমাদের সংগ্রামী জীবনের অস্তিত্বও ধরা পড়ে, প্রেরণা পায়। আমাদের সব অনুভূতি প্রেরণা আকাঙ্ক্ষা

তো আলাদা আলাদা নয়, সব মিলেমিশে অখণ্ড অভিজ্ঞতা।

"আমার প্রস্তাব: আমার এই ঘরের মূঢ় কোণটাকে বকবকিয়ে হঠাৎ পাগল ক'রে তোলো। আনো অনেক শিশুর হাসি, বিচিত্র খেলনা, অনেক উজ্জ্বল আলো, আনো আনন্দ।" [আমার প্রস্তাব]

"আমি তোমাকে ছুঁতে চাই হাওয়ায়, আমি তোমাকে ছুঁতে চাই আলোয় অন্ধকারে, ছুঁতে চাই আমার বেদনায়।" [চুম্বক]

"এই পোড়া মাটিতে যে ফুল ফোটাই আমার বেদনায়, সে আগুনের ফুল—টেক্কা দেয় কোটি যোজন দূরের তারার সঙ্গে।" [সে আমায় দিয়েছে]

"আমি দেখলাম ছড়িয়ে গেল কথা, যে-কথা আমার মনে, কানে, ঘরের আনাচে-কানাচে, যে-কথা ঐ আকাশে, ঐ উড়ে যায়, যে-কথা ধরার, যে কথা ধরা, তবু ধরার বাইরে।" [বসন্ত]

"এই জীবনের তাপ, তার বেদনার আকাশ, সন্ধ্যা আর ধুলো, আমি চাই, আমি যে কী ভীষণ চাই, হোক তোমারও। সেই ঘামের একটি বিন্দুতে আমি চাই, আমি যে কী ভীষণ চাই, হোক তোমারও আজো-ভাঁজ-না-পড়া কপাল সিক্ত।" [খড় ও রক্তকরবী]

"ছুঁলো কি ছুঁলো না তার হাত, জাগল পদ্ম।" [অনাগত সন্ধির ভোর]

"এই আমাদের খেলার প্রাঙ্গণ, এই মাটি, আকাশ, সন্ধ্যা, এই চিন্তার মুহূর্ত। সবই নিমিত্ত খেলার, তোমার-আমার।" [বুড়ি]

"এ যদি কাব্য হয় হোক, এ যদি ব্যর্থ হয় হোক, এ হোক বা না হোক যা হবার বা না হওয়ার। বললাম মরীয়া হ'য়ে আরো একবার, যা বলার ছিল এই আমি-এক-মানুষের, আমি-এক-চিন্তার, একটি অস্তিত্বের। আমি-এক-পাতার, এক সূর্যাস্ত মেঘের।" [আমি-এক-চিন্তার]

"এদিকে অক্ষর হ'ল নদী—আমার ধ্যানের সন্তান, আমাকে উল্টে ফেলে দিয়ে, আমাকে অস্বীকার ক'রে, ঐ চ'লে গেল সে, ঐ চ'লে যায়, আর নয় আমার ধরার, ছোঁওয়ার নাগালে।" [অক্ষর হ'ল নদী]

তাঁর অজস্র অথচ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল কবিতা থেকে এই সামান্য নির্বাচন নেহাতই আংশিক—কিন্তু তবু লোকনাথবাবুর স্বাতন্ত্র্যের অনেকগুলো দিককেই পরিমাপ করা যাবে এখানে। তাঁর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ঘন চিত্ররচনা, তাঁর চিত্রকল্পে গতির আবেগ, তাঁর স্বাধীন কল্পনার জগতের মায়া, তাঁর জটিল অস্তিত্বের বোধ, তাঁর অতন্দ্র আশাবাদ ও শুভবুদ্ধি, তাঁর সরলীকরণবিমুখ

সমগ্রতার ধ্যান, সব কিছুরই।

হয়তো এরই মধ্যে উদ্দেশ্যহীন অস্পষ্ট কথার স্তূপে মাঝে মাঝেই আমাদের হোঁচট খেতে হয়। কথার নেশায় পেয়ে বসে তাঁকে, তখন এক প্রতিমা থেকে আরেক প্রতিমায় গতায়াত স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হয়। হয়তো এ-কারণেই 'একদিন শ্রদ্ধায়' বা 'যদুনন্দন চক্রবর্তী' বা 'কবির মৃত্যুতে নারী'-জাতীয় কিছু কবিতা একটু ক্লান্তিকর ঠেকে।

অভিযোগ আরও কিছু করা যায়। অনুবাদের গন্ধ ক্রমক্ষীয়মাণ হলেও হঠাৎ হঠাৎ "নয় তোমার বাঁধানো ছবিকে, যা টাঙানোই আছে" কিংবা "নিমিত্ত তারকা, মুহূর্ত নিমিত্ত, ব্যথার, যারও নাম নেই"—জাতীয় বাক্যে তা যেন আবার মাথা তোলে। কখনো ফরাসী ও মার্কিনী কায়দায় শিরোনাম রচনা করে কিংবা আকস্মিক বিষয়বস্তু আমদানি করে তিনি বেশ প্রাসঙ্গিক বৈদগ্ধ্য সৃষ্টি করেন 'কবি না হলে পড়ো না', 'রঙ-বেরঙের জামা', 'গোয়ালার বিল নয়' বা 'এক কিস্তি'—জাতীয় কবিতায়। কিন্তু এরকম বহিরঙ্গ চাতুর্যে আমাদের একটুও খটকা বাঁধে না।

বিদেশী কবিতার পাঠ (ও অনুবাদ) নিশ্চয়ই লোকনাথবাবুর উপকারেই এসেছে। বাঙলা গদ্যের অন্বয়রীতিতে সত্যিই তিনি কিছু স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারবেন কিনা পরে বোঝা যাবে। আপাতত সে-বিষয়ে তিনি কিছু সচেতন দেখেই আমরা খুশী। এখানে তিনি স্যাঁ-জন পেস্‌-এর অবলম্বনে একটি কবিতা লিখেছেন (ইতিবৃত্ত: এক), সে-সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধও আমরা পড়েছি, হয়তো পেস্‌-এর পৌরুষমণ্ডিত বহুচারী গদ্যের জটিল স্বাধীন কিন্তু অতি-নিরূপিত সিনট্যাক্স-এর অনুসরণে গদ্য লেখার চেষ্টাও তিনি করেছেন:

"জানি কথা সব নয়, সব নয় গান, রেখা, রঙ—তার পৌঁছয় না মন্দিরের প্রথম সোপান!" [তিন গদ্যের শেষে]

"বলার, না-বলার মুহূর্ত আজ, যে-মুহূর্ত চিরকালের ও যা কালকেও আসবে। আমাদের খেলাঘর।" [অভিমানী সূর্যাস্তকে]

সেই সঙ্গে বাঙালির রক্তে লিরিকের যে রূপ বাস্তব, 'লিপিকা'তে যার আদল পেয়েছি, তাও আছে। তাঁর কবিতায় যেন এ-দুয়েরই সমন্বয়!

অরুণ সেন

রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক। অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। সংগীত পরিষদ, কলকাতা-৫০ পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় চারখণ্ড ব্যাপ্ত ক'রে বারংবার উল্লেখ করেছেন: "রবীন্দ্রনাথ কবি···মূলত কবি"। সূত্রটি আমি মেনে নিতে পারিনি। আজও আমি মনে করি: রবীন্দ্রনাথ কবির চেয়েও অনেক বড়, তিনি শিল্পী, আর্টিস্ট, যাঁর কাজ সৃষ্টি করা, আন্তর ভাবের আবেশে রূপ ও রস সৃষ্টি। তবেই তাঁর প্রতিভার স্বরূপ-নির্ধারণ সম্ভব। নতুবা, তাঁর আঁকা নতুন রীতির ছবির ব্যাখ্যা কি? যিনি কোনোদিন নাচ দেখেননি, স্বদেশী নৃত্যের ভূগোলে তিনি এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করলেন কিভাবে? একমাত্র উত্তর: অসাধারণ শিল্পী-ব্যক্তিত্বের জন্যে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূলেও এই শিল্পী তথা তাঁর অনির্বচনীয় শিল্পবোধ। লোকসঙ্গীতের অনুরাগী, পাশ্চাত্যসঙ্গীতের ছাত্র, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রসবোদ্ধা—এসবই বহিরঙ্গ তথ্য। গান তাঁর স্বগতোক্তি। রেনেশাঁস-আর্টিস্ট যেভাবে গল্পে-নাটকে-ছবিতে-কবিতায় নিজেকে প্রচার করেন, যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি আত্মপ্রকাশ করেন সঙ্গীতেও, যেমন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সঙ্গীতকে তিনি করেছেন ব্যক্তিগত আর্ট এবং আধুনিক শিল্প। তাই তাঁর সাহিত্যভাবনা, ধর্মচিন্তা এবং সঙ্গীতচিন্তায় একই তত্ত্ব বারেবারে নবনব রূপে প্রতিফলিত হয়েছে, কারণ তারা একই কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্ছুরিত। এই দৃষ্টিতে না দেখলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মমূলে প্রবেশ অসম্ভব প্রস্তাব। এবং তারই ফলে, ইতিউতি নানা বিভ্রান্তিকর উক্তি ও সিদ্ধান্ত পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্রসংগীতের নানাদিক' গ্রন্থে এই অনন্য গীতিকার ও তাঁর রচনাবলীকে এই শিল্পী-ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দেখা হয়েছে। যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত-আলোচক। ফলে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নতুন বক্তব্য অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

প্রথমেই ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর তিনটি পত্রের অংশবিশেষ সম্পর্কে শৈলজারঞ্জন মজুমদার বিস্তৃত বিচার করেছেন। এই চিঠি তিনটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষা প্রসঙ্গে কি কি বিষয়ে অবহিত থাকা প্রয়োজন—তা বলা আছে। আর মন্তব্য করা হয়েছে "মাত্রাকালের একটা ইউনিট থাকা উচিত।" ইন্দিরা-দেবীর বক্তব্য সম্পর্কে শৈলজারঞ্জনের বিচার স্বভাবতই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ

করে। বাজার-প্রচলিত 'জনপ্রিয়' রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি স্পষ্ট।

'রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরসঙ্গতি ও সুরবৈচিত্র্য' প্রবন্ধে সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য নতুন বক্তব্য রেখেছেন, বলেছেন: কথা ও সুরের মিলনের চেয়েও বড় কথা, তাঁর গানে "কথার সামান্যীকরণ থেকে সুরের অসামান্যতায় উত্তরণ"। এ-বিষয়ে মতভেদের অবকাশ থাকলেও, লেখক সিদ্ধান্তটিকে দৃষ্টান্তসহকারে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—তা বিস্ময়কর। তাঁর এই 'ক্লোজড ক্রিটিসিজম' সঙ্গীত-আলোচনার আদর্শ হয়ে থাকবে।

প্রফুল্লকুমার দাসের 'রবীন্দ্রসংগীত-লিপি' একটি তথ্যবহুল পরিশ্রমী রচনা, যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের পক্ষে সীমাহীন সহায়ক।

গান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-প্রবন্ধ-পত্রাবলী সঙ্কলিত হয়েছে 'সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থে। তারই অন্তর্গত তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। আর-একটু গভীরে গিয়ে যদি তিনি তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের মননশীল শিল্প-হৃদয়টিকে ধরবার চেষ্টা করতেন, তাহলে অনেক ভালো হত।

এদিক থেকে রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন সুধীর চক্রবর্তী। কান্তকবি, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি গীতিকারের সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি রবীন্দ্রনাথের শিল্প-ব্যক্তিত্বের মৌলস্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন এবং বোঝাতে পেরেছেন: কোন গুণে রবীন্দ্রসঙ্গীত আধুনিক ভারতের ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে।

প্রতিটি আলোচনাই নতুনতর চিন্তার খোরাক। শুধু দুটো বিষয়ে অভাব বোধ করেছি। এক, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ঐতিহাসিক পটভূমিকা; দুই, শিল্প বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন। এবং বুঝতে পারিনি কেন এই মূল্যবান গ্রন্থে পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের সুর-সংযোজিত বেদ ও উপনিষদের মন্ত্র' প্রবন্ধটি গৃহীত হলো! লেখক মন্ত্রগুলির বিবৃতি ও অনুবাদ দিয়েছেন মাত্র, কোনো আলোচনা করেননি—না ভাবের দিক থেকে, না সুরের দিক থেকে। রবীন্দ্রনাথ কেন এই মন্ত্রগুলি নির্বাচন করেছিলেন, তাঁর দেওয়া সুর ও মূল বৈদিক সুরের সারূপ্য-বৈরূপ্য কোথায়—সেসবের কোনো পর্যালোচনা নেই। তবে কেন এই তালিকা-প্রয়াস?

গুরুদাস ভট্টাচার্য

মার্কসবাদ : বিজ্ঞান ও বিপ্লববাদের মিলন

গত ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'পীস, ফ্রীডম অ্যাণ্ড সোশ্যালিজম' পত্রিকায় মরিস কর্নফোর্থ-এর 'দি ওপন ফিলসফি অ্যাণ্ড দি ওপন সোসাইটি' (প্রকাশক : লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, মূল্য—৩০ শিলিং) সম্পর্কে আই. সোলনে একটি চমৎকার আলোচনা লিখেছেন।

নিও-পজিটিভিস্ট দার্শনিক এবং মার্কসবাদের একনিষ্ঠ সমালোচক কার্ল পপার তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে যে-বক্তব্য বলেছেন, কর্নফোর্থ তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত এই গ্রন্থে তারই বিস্তৃত, যুক্তিপূর্ণ এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। পপার মার্কসবাদের একজন সূক্ষ্ম ও চতুর বিরোধী। 'অধিবিদ্যা', অবৈজ্ঞানিক মতবাদ' এবং 'নির্বিচারবাদ'-এর বিরোধী অবস্থান থেকে তিনি দ্বন্দ্ববাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন।

মার্কসবাদের সমালোচক হিসেবে পপার-এর খ্যাতির কারণ হলো তাঁর আক্রমণের বাহ্যিক পণ্ডিতসুলভ বিষয়মুখিনতা, তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর "প্রকৃত" বিজ্ঞান সমর্থনের দাবি এবং নিজের বক্তব্য প্রমাণের জন্য যুক্তিবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার। বলাই বাহুল্য যে, কমিউনিস্ট-বিরোধীরা পপারের লেখাকে নিজেদের কাজে লাগাবে। সুতরাং পপারের মার্কসবাদ-বিরোধী বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ-বিষয়ে মরিস কর্নফোর্থের অবদান মূল্যবান।

কার্ল পপার তাঁর তিনটি পুস্তক 'দি ওপন সোসাইটি অ্যাণ্ড ইটস এনিমিস', 'দি পভারটি অফ হিস্টরিসিজম' এবং 'কনজেকচারস অ্যাণ্ড রেফিউটেশনস'-এ মার্কসবাদের যে-সমালোচনা করেছেন, কর্নফোর্থ তাঁর পুস্তকে তারই প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। কর্নফোর্থ দেখিয়েছেন, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে পপারের আক্রমণ চারটি ধারা অনুসরণ করছে। প্রথমত, মার্কসবাদ তাঁর মতে "অবৈজ্ঞানিক", কেবলমাত্র "শক্তিশালী নির্বিচারবাদ"। দ্বিতীয়ত, তিনি মার্কসবাদের তথাকথিত "ইতিহাসবাদ"-কেও "খণ্ডন" করেছেন। কারণ পপারের মতে "ইতিহাসবাদ" ঘটনাবলীর পূর্ব-নির্ধারিত বিশ্বাসে পৌছায়। তৃতীয়ত, পপার সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের

বিকল্প হিসেবে নিজের "সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং" তত্ত্ব খাড়া করেছেন। পপারের ব্যাখ্যা হিসেবে, সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে সামাজিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের গঠন বোঝায়। চতুর্থত, পপার "মুক্ত সমাজ-এর" ধারণাকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদী সমাজের দর্শন বিস্তারিতভাবে খুলে ধরেছেন। মরিস কর্নফোর্থের পুস্তক এই চারটি ধারারই পরীক্ষা।

পুস্তকের প্রথম অংশ 'টুওয়ার্ডস অ্যান ওপন ফিলসফি'-তে কর্নফোর্থ দেখিয়েছেন পপারের প্রচেষ্টা হলো বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদকে আক্রমণ করে মার্কসবাদ যে "অবৈজ্ঞানিক"—তা প্রমাণ করা। পপার লিখেছেন: "দ্বন্দ্ববাদকে ধন্যবাদ··· পুনরায় আক্রমণ এড়ানোর জন্য দ্বন্দ্ববাদী পদ্ধতি ব্যবহার করে মার্কসবাদ নিজেকে নির্বিচারবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে যা যথেষ্ট নমনীয়। আমি যাকে বলেছি "শক্তিশালী নির্বিচারবাদ", এ তাই হয়েছে।"

কর্নফোর্থ ধাপে ধাপে এই ধারণাকে নির্মূল করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মার্কসবাদের প্রকৃতিই পূর্বকল্পিত ধারণা ও ছকের বিরোধী। বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নীতির বিরোধী এমন কোনো জ্ঞানাত্মক পদ্ধতি মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ ব্যবহার করে না। মার্কসবাদ যেসব সত্য আবিষ্কার করেছে, তা হলো জটিল জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ফল, যে-জ্ঞানপ্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটনার অনুসন্ধান ও প্রকল্পের বাস্তব পরীক্ষা অন্তর্গত। বস্তুতপক্ষে, বস্তুবাদী ব্যবহার সকল জ্ঞানের একমাত্র যথার্থ মানদণ্ড।

মার্কসবাদ কখনও বাস্তবকে বিচারহীনভাবে গ্রহণ করে না বা অসার বিমূর্তন পছন্দ করে না। তাছাড়া, ঘটনাকে পূর্বকল্পিত ছকে ফেলবার কোনো চেষ্টাও মার্কসবাদ করে না। অন্য কোনো বৈজ্ঞানিক মতবাদের মতো মার্কসবাদও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর ধারণাকে ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করে। "কেবলমাত্র প্রয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সতত প্রয়োগের দ্বারাই সেই ধরনের ব্যবহারিক বোধ এবং উদ্দেশ্য লাভ করা যেতে পারে যা মার্কস ও মার্কসবাদীরা শ্রমজীবীশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজন বলে মনে করেন।" (পৃষ্ঠা ১৭-১৮, দি ওপন ফিলসফি অ্যাণ্ড দি ওপন সোসাইটি)

মার্কসবাদ তত্ত্বকে ব্যবহার থেকে পৃথক করে না এবং এই ধারণা বাতিল করে যে বস্তুর সারধর্ম চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠা করা যায়—যার ফলে আমাদের পরবর্তী জ্ঞান বিশুদ্ধ চিন্তার ধারণাগত বিকাশের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হবে। ফলে মার্কসবাদ কোনো মতবাদ বা ধারণার নিরপেক্ষ সর্বজনীন সত্যতার

দাবি স্বীকার করে না। তা করার অর্থই হলো জ্ঞানকে গোঁড়ামিতে পর্যবসিত করা। মার্কসবাদী মতে, জ্ঞান নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ সত্যের মৌল বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ববাদী ঐক্য প্রদর্শন করে। ব্যবহারেব দ্বারা সমর্থিত ধারণাই হলো মার্কসবাদের মূল নিরপেক্ষ সত্য এবং ব্যবহারের দ্বারাই মার্কসবাদ সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়।

কর্নফোর্থ লিখিত পুস্তক মার্কবাদেয় মূল বিষয়ের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নয়। দ্বন্দ্ববাদের বিরুদ্ধে পপারের যুক্তির অসারতাও তিনি দেখিয়েছেন, যদিও পপারের কোনো যুক্তিই মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে না। পপারের যুক্তিগুলি হলো : [১] মার্কস ও এঙ্গেলস সত্তার বাস্তব বিশ্লেষণকারী হেগেলীয় ত্রয়ীর বিকল্প উপস্থিত করেছেন (বহু বছর আগে মিখাইলোভস্কি এই যুক্তি উপস্থিত করেন কিন্তু লেনিন সেই সময়ে যুক্তিটি খণ্ডন করেন)। [২] দ্বন্দ্ববাদ চিন্তার ক্ষেত্রে বিরোধের নিয়মের (ল অফ কনট্রাডিকশন) বিরোধী। [৩] যৌক্তিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতে যে-অগ্রগতি হয়েছে, তা অবহেলা করা হয়েছে।

কর্নফোর্থ মানবজ্ঞানের দ্বান্দ্বিক প্রকৃতি, বৈজ্ঞানিক মতবাদের গঠনে দ্বন্দ্ববাদের ভূমিকা, মূল দ্বন্দ্ববাদী সূত্রগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বন্দ্ববাদ অবাস্তব, কারণ তা যুক্তিবিজ্ঞান-বিরোধী—পপারের এই যুক্তির দোষও তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। বস্তুতপক্ষে, দ্বন্দ্ববাদ অধিবিদ্যার বিরোধী, যুক্তিবিজ্ঞানের বিরোধী নয়। আকারগত যুক্তিবিজ্ঞানের সূত্রগুলি নির্ভুল এবং প্রয়োজনীয়, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণের জন্য দ্বন্দ্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

পুস্তকের প্রথম অংশের সারসংক্ষেপ করতে গিয়ে কর্নফোর্থ লিখেছেন : "দর্শনের মূল্য এই নয় যে দর্শন "সত্তার প্রকৃতি" সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য দেয় এবং এর সব কিছুই নূতন সূত্রাকারে উপস্থিত করে, বরং দর্শন হবে অবিরত বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের দ্বারা কি করে চিন্তা করতে হবে তার নীতি বের করে নিজেদের জানানো এবং নিজেদের জানিয়ে আমাদের মানবিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিচারশীল সিদ্ধান্তে পৌছনো এবং ঐ উদ্দেশ্য কিভাবে সফল হতে পারে তার উপায় খুঁজে বের করা। দর্শন এই কাজ করে এবং এই কাজ করতে গিয়ে ভাববাদী ভ্রান্তি ও আধিবিদ্যক বিমূর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করে। এটাই হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের মূল্য।" (পৃষ্ঠা ১২১-১২২, দি ওপন ফিলসফি অ্যাণ্ড দি ওপন সোসাইটি)

পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ 'প্রেমিসেস ফর পলিটিক্স'-এ কর্নফোর্থ 'ইতিহাসবাদ' মার্কসবাদের অপরিহার্য অঙ্গ—এই অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পপার বলেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সামাজিক অনুসন্ধানের বদলে যে গোঁড়ামি উপস্থিত করে, তা হলো—সমাজ অবশ্যই পূর্বনির্ধারিত দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির মাধ্যমে আদিম সাম্যবাদী অবস্থা থেকে শ্রেণীসমাজের মধ্য দিয়ে শেষে সাম্যবাদী সমাজে পৌছবে। এবং এর থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয় যে ইতিহাসবাদীরা, সর্বোপরি মার্কস নিজে, দেখেন সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর উদ্দেশ্য হলো দূরগামী ঐতিহাসিক ভবিষ্যতবাণীর পথ প্রশস্ত করা।

এখানেও অত্যন্ত সুসঙ্গতভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে কর্নফোর্থ পপারের বক্তব্য নাকচ করেছেন। মানুষ নিজেই তার ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তা তাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ। তাদের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বাস্তব শর্তের দ্বারা নির্ধারিত হয় যাতে উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মার্কসবাদী বস্তুবাদী ইতিহাসের ধারণার মূল্য এই যে "প্রথমত এই ধারণা পরিস্থিতির নিখুঁত মূল্যায়নে সহায়তা করে, এবং সেই সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটায়। দ্বিতীয়ত, কি করে সামাজিক ঘটনা ঘটে তার ঐতিহাসিক অধ্যয়নের দ্বারা আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি—যাতে বোঝা যায় কোন ধরনের জিনিস তার সঙ্গে মিল রেখে করা যাবে অথবা যাবে না। (পৃষ্ঠা ১৩৭, ঐ)

কর্নফোর্থ জোর দিয়ে বলেছেন যে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ধারণাকে অনমনীয় নিয়মের স্বয়ংক্রিয় ফল বলে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হবে না। "প্রায়ই বলা হয় যে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা-মতে সব কিছুই 'নিয়মানুসারে' ঘটে। এর যদি এই অর্থ হয় যে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা সবসময়ই কি করে মানবসমাজ বিকশিত হয় তার ব্যাখ্যামূলক সামান্যীকরণ করে, তাহলে ভালোই ; ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ঠিক তাই করে। কিন্তু যদি বলা হয় মানুষের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এমন কতকগুলি 'নিয়ম' আছে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিচিতি দেওয়া হলে পরবর্তী সমস্ত ঘটনা সেই নিয়মের দ্বারা নিখুঁতভাবে নির্ধারিত হবে, তবে ফাঁকা কথা বলা হয়। (পৃষ্ঠা ১৩৭, ঐ)

মার্কস দেখিয়েছেন যে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যেসব বিরোধ ও সমস্যা ওঠে, জনগণ কিভাবে তার নিষ্পত্তি করে এবং সমাজবিকাশের বিষয়গত নিয়মের উপর নির্ভর করে কিভাবে তারা ভবিষ্যতবাণী করে। কিন্তু এইসব ভবিষ্যতবাণী কাল্পনিক নয়—ভবিষ্যতবাণী করার সময় মার্কসবাদীরা বাস্তব পরিচিতির বাস্তব বিশ্লেষণ থেকে যাত্রা শুরু করে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কোনো কল্পস্বর্গ নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র শ্রমজীবীশ্রেণীর আন্দোলনকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। একমাত্র সংগঠন যা আন্দোলনকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে পারে—তা হলো রাজনৈতিক দল। এই দল গণ-আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষমতা দখল ও সমাজতন্ত্র গঠন করে।

পপার মনে করেন মার্কসবাদের ব্যবহারিক শ্রেণীনীতিগুলি কাল্পনিক, কারণ তাদের উদ্দেশ্য অস্তিত্ববিহীন "বাধামুক্ত পুঁজিবাদ"কে ধ্বংস করা, কিন্তু পুঁজিবাদের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

প্রমাণ হিসেবে পপার তাঁর 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' তত্ত্ব উদ্ধৃত করেছেন। এই তত্ত্বের তিনি যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা হলো: "বিমূর্ত দ্রব্য লাভের বদলে বাস্তব অমঙ্গল দূর করার জন্য কাজ করো। রাজনৈতিক উপায়ের দ্বারা সুখলাভকে লক্ষ্য হিসেবে রেখো না। বরং বাস্তব দুঃখকষ্ট দূর করাকে লক্ষ্য হিসেবে রাখো...কিন্তু এর সব কিছুই প্রত্যক্ষ উপায়ের দ্বারা করো।" "ব্যবহারিক সংস্কারের" এই নীতিকেই কার্ল পপার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বাস্তব বিকল্প বলে মনে করেন।

কর্নফোর্থ এর যে-জবাব দিয়েছেন, তা হলো: "আমরা 'বিমূর্ত দ্রব্য' লাভের জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধতা করি না, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধতা করি 'প্রত্যক্ষ উপায়ের দ্বারা দারিদ্র্য দূর করতে সংগ্রাম করার জন্য'। অপর পক্ষে ডঃ পপার 'সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' এই অপনামে যাকে অভিহিত করেছেন, তাতে 'বাস্তব দুঃখকষ্ট' ততদূর পর্যন্তই দূরীভূত হবে—যতদূর পর্যন্ত তা পুঁজিবাদী শোষণ বজায় রাখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।" (পৃষ্ঠা ২২৫, ঐ)

এই বিষয়ে পপারের সঙ্গে বিতর্ক করতে গিয়ে কর্নফোর্থ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মার্কসবাদী মত তুলে ধরেছেন এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মৌলিক সমস্যা পরীক্ষা করেছেন।

পুস্তকের তৃতীয় অংশ 'টুওয়ার্ডস অ্যান ওপন সোসাইটি'তে সাম্য ও স্বাধীনতার মার্কসবাদী ধারণা সম্পর্কে পপারের মত এবং তাঁর "মুক্ত" ও "বদ্ধ" সমাজ সম্পর্কে ধারণা আলোচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া সাম্যবাদে উত্তরণের কয়েকটি সমস্যা নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা সম্পর্কে কর্নফোর্থ লিখেছেন: "শেষ পর্যন্ত যা স্বাধীনতার সীমাকে নির্ধারণ করে, তা হলো সম্পত্তির মালিকানা এবং এই নির্ধারণ অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রক্ষা বা পরিবর্তনের জন্য শ্রেণী-

সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে। (পৃষ্ঠা ৩০১, ঐ) সমাজতন্ত্র হলো মুক্ত সমাজের বাস্তব যাত্রারম্ভ।

কর্নফোর্থের সমালোচনার অনেকখানিই পপারের মার্কসবাদবিরোধী বিস্তৃত সমালোচনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' সমাজের তত্ত্বের বিরুদ্ধে। ঘটনার দিক থেকে এই তত্ত্বকে সমাজবিকাশের মার্কসবাদী তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে।

পপারের মতে 'বদ্ধ' সমাজ হলো সেই সমাজ যেখানে নাগরিকদের জীবন কম বা বেশি মাত্রায় রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, যার ফলে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের বদলে ব্যক্তির পুরোপুরি দায়িত্বহীনতার পথ পরিষ্কার হয়। তুলনায়, পপারের 'মুক্ত' সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার পূর্ণ বিকাশের সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত। এখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং এইসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সর্বাপেক্ষা বেশি স্বাধীনতার আয়োজন করা। এই সমাজে নির্ধারক নীতি হলো ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। পাশ্চাত্য এই আদর্শের খুব কাছাকাছি এসেছে। কর্নফোর্থ লিখেছেন, বাস্তবিক পক্ষে পপারের "মুক্ত সমাজ পুঁজিবাদের অন্য নাম মাত্র।" (পৃষ্ঠা ৩৩২, ঐ)

কর্নফোর্থ বলেন, পপারের ধারণার দোষ হলো তিনি শ্রেণীসংগ্রামকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, অথচ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি ও গতি বোঝার জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয়। পুঁজিবাদী সমাজ 'মুক্ত' (যদি শব্দটি একান্তই প্রযোজ্য হয়), কারণ এখানে জনগণ তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেতন-ভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং 'মুক্ত সমাজ', যা বর্তমানকালে বাস্তবে অস্তিত্বশীল, যে সমস্যার অবতারণা করে—তা হলো "সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের অগ্রগমন"।

সবশেষে কর্নফোর্থ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে পপারের আক্রমণের হিসেব-নিকেশ করেছেন এইভাবে: "যা তিনি (পপার) করেছেন, তা হলো কমিউনিস্ট-বিরোধী যুক্তিগুলি সুসংবদ্ধ ও বিস্তৃতভাবে প্রচার।" কিন্তু মরিস কর্ন-ফোর্থের পুস্তক কেবলমাত্র মার্কসবাদের বিরুদ্ধে শেষতম আক্রমণের জবাবই নয়। এর মূল্য এইখানেও যে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনাও এতে আছে।

অরবিন্দ বসু

শুকতারার সন্ধানে

একটি খবরের জন্যে আমরা এতদিন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ১৯৬৯ সালের পাঁচই ও দশই জানুয়ারি ভেনাস-পাঁচ ও ভেনাস-ছয় নামে দুটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে শুক্রগ্রহের দিকে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে-চার মাস ধরে ৩৫ কোটি কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এ-বছর মে মাসের মাঝামাঝি ওদের শুক্রের জমিতে নামবার কথা ছিল। সেই বিরাট অভিযানপর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ওরা গত ১৭ই ও ১৮ই মে তারিখে শুক্রের জমিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে।

সৌরজগতের রহস্যময়ী গ্রহ শুক্র সুদীর্ঘকাল জুড়ে তার ঘন গ্যাসীয় মেঘের আড়ালে নিজের সব রহস্যকে গোপন করে রেখেছিল। জ্যোতির্বিদরা আলোক-দূরবীন-যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টা করেও শুক্রের জমির ওপরতলাকে দেখে উঠতে পারেননি। ফলে শুক্রের জমির গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধেও সঠিক কোনো ধারণা বহুদিন ছিল না। শুক্রের দিন ও রাতের পরিমাণ পর্যন্ত জানা ছিল না। ঘন গ্যাসীয় মেঘের আবরণের জন্যে আপন অক্ষের ওপর শুক্রের বেগ নির্ণয় করাও ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় দু-বছর আগে সর্বপ্রথম শুক্রের রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হয়। তাঁরা ভেনাস-চার নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহা-জাগতিক স্টেশনকে শুক্রের দিকে পাঠান। ওর যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৭ সালের ১২ই জুন। সুদীর্ঘ চার মাস ধরে ৩৫ কোটি কিলোমিটার পথ পাড়ি জমিয়ে ১৮ই অক্টোবর যন্ত্রটি শুক্রের জমিতে গিয়ে নিরাপদে অবতরণ করে। শুক্র সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় খবর বিজ্ঞানের ঐ দূতটির কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম।

ইতিপূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে আরো তিনটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশনকে শুক্রের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রথম দুটি যথাক্রমে শুক্রের এক লক্ষ ও ২৪০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তৃতীয়টি অভিযান শুরু করার সাড়ে-তিন মাস পরে গ্রহটির জমির ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে।

অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত বার পাঁচেক শুক্রের জমিতে স্বয়ংক্রিয় স্টেশনকে নামাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। ভেনাস-চার যাত্রা শুরু করার দুদিন পর তাঁরা মেরিনার-পাঁচ নামে একটি স্টেশনকে শুক্রের দিকে পাঠান, সেটি ভেনাস-চারের শুক্রে অবতরণের পরের দিন শুক্রকে চার হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে মহাকাশের পথে ভেসে পড়ে।

চাঁদের দেশে মানুষের নামার দিনটি এগিয়ে এলো। অ্যাপোলো-আট মহাকাশযানে তিনজন অ্যামেরিকান মহাকাশযাত্রী গত বছর ডিসেম্বর মাসে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসেছেন। এ বছর ১৮ই মে অ্যাপোলো-দশ মহাকাশযানে আরো তিনজন মহাকাশযাত্রী চাঁদের জমিতে নামার যন্ত্রটিকে পরীক্ষার জন্যে চাঁদের দিকে অভিযান শুরু করেন। গত ২৩শে মে সেই পরীক্ষাকাজকে সম্পূর্ণ করে ২৬শে মে তারিখে তাঁরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। আগামী জুলাই মাসের মাঝামাঝি চাঁদের জমিতে মানুষের নামবার দিন ধার্য করা রয়েছে। চাঁদে এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে দুটি গ্রহ মঙ্গল ও শুক্র সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আগ্রহও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরাও এ-দুটি গ্রহ, বিশেষ করে শুক্র সম্বন্ধে, আরো অনেক কিছু জানতে চান।

গ্রহ শুক্র

সূর্য ও চাঁদকে বাদ দিয়ে শুক্র হলো আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। তার কারণ শুক্রকে ঘিরে যে-ঘন মেঘের আবরণটি রয়েছে—তা সূর্যের আলোর শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগ অংশকে প্রতিফলিত করে থাকে।

সূর্য থেকে শুক্রের গড়পড়তা দূরত্ব হলো ১০ কোটি ৮৩ লক্ষ কিলোমিটার। শুক্রের ব্যাস ১২,০০০ কি. মি,—পৃথিবীর ব্যাসের কাছাকাছি। শুক্রের ভর (ম্যাস) হলো পৃথিবীর ভরের ৪।৫ ভাগ। শুক্রের অভিকর্ষ বল (গ্র্যাভিটি) আবার পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের শতকরা ৮৮ ভাগ। অর্থাৎ, পৃথিবীতে কারও ওজন ১০০ কে. জি. হলে শুক্রে সে-ওজন দাঁড়াবে ৮৮ কে. জি.। পৃথিবীর মতো

নানা বিষয়ে মিল থাকার জন্ম শুক্রকে পৃথিবীর যমজ বোন নাম দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী থেকে শুক্রের নিকটতম দূরত্ব হলো ৪ কোটি কি. মি.।

শুক্র সম্বন্ধে এই কয়েকটি তথ্য আমরা এতকাল সঠিকভাবে জানতাম। অন্য সব ধারণাই ছিল অনুমানের উপর নির্ভরশীল।

শুক্রের জমির গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিচিত্র সব ধারণা বিজ্ঞানীমহলে গড়ে উঠেছিল। কেউ কেউ অনুমান করতেন, শুক্রের সবটাই জলময়। যদি তাই হতো, তাহলে শুক্রের আকাশে অত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমে থাকার কথা নয়। সমুদ্রের জল তার অনেকটাই শুষে নিত। সে-অবস্থায় শুক্র হয়ে দাঁড়াত সোডা ওয়াটারের বিরাট এক ডিপো।

আর-একদল বিজ্ঞানী বলে বসলেন, শুক্র হচ্ছে একটি রুক্ষ মরুময় ভূমি। সূর্যের আলো শুক্রের কার্বন-ডাই-অক্সাইডরূপী ঘন মেঘের মধ্য দিয়ে এসে তার জমিকে তাতিয়ে তুলছে। সেই জমি তখন ছড়াচ্ছে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত আলো। ঐ আলো শুক্রের গ্যাসীয় মেঘের ঘেরাটোপের মধ্যে বন্দী হয়ে আলোর তাপ জমা হতে-হতে খোদ শুক্রের জমিটাই অসম্ভব রকম গরম হয়ে উঠেছে। আর সেই তপ্ত জমির ওপর দিয়ে প্রচণ্ড জোরাল ঝোড়ো হাওয়া দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছে।

আবার কেউ ভাবতেন, শুক্র একটি গরম তেলের সমুদ্র। তাপের ঠেলায় তেল বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে এসে ঐ মেঘের আবরণটাকে তৈরি করেছে।

নতুন খবর

প্রায় দেড় বছর আগে শুক্রগামী স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান ভেনাস-চা-এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির কলকাঠির নড়াচড়ার ফলে যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেছে, তাদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা শুক্র সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর লাভ করেছেন। আমরা সেই খবরগুলোর খানিকটা পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

শুক্রের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় খবরটা হলো এই, তা সম্পূর্ণভাবেই

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ হলো শতকরা ১·৬ ভাগ এবং সেখানে নাইট্রোজেনের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি। শুক্রের জমির ওপর বায়ুমণ্ডলের চাপ এক বিপুল অঙ্কে গিয়ে পৌঁছয়—পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর বায়ুর চাপের তুলনায় যা ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রায় ২০ গুণ চাপযুক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নাকি এক আশ্চর্য সুপার-রিফ্র্যাকশন বা অতি-প্রতিসরণের ক্ষমতা লাভ করে বসে আছে। ফলে, শুক্রের ওপর তার জমির বক্রতার তুলনায় আলোর রেখার বক্রতা হবে অনেক বেশি। অর্থাৎ, শুক্রের কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে দিগন্তের ওপারে অনেক দূরের ছবি অতি-প্রতিসরণের জন্যে সহজেই দেখা যাবে—অবশ্য সে-ছবি অনেকটা অস্পষ্ট দেখাতে পারে। বিজ্ঞানীরা একটি আশ্চর্য কথা বলছেন—যদি শুক্রের জমির ১২ কিলোমিটার ওপরে উঠে কেউ সামনের দিকে তাকান, তাহলে তিনি তাঁর মাথার পেছন দিকটাই হয়তো দেখতে পাবেন। অর্থাৎ, মাথার পেছন দিকের ছবি নিয়ে আলোর রেখাগুলো যাত্রা শুরু করে, অতি-প্রতিসরণের প্রভাবে সমগ্র গ্রহটাকে বৃত্তাকারে ঘুরে, আবার সামনের দিকে এসে হাজির হচ্ছে। পৃথিবীতে এজাতীয় একটি ঘটনা আমরা চিন্তাই করতে পারি না।

শুক্রের জমির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহিট পর্য্যন্ত পৌঁছতে দেখা গেছে। শুক্র থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, গ্রহটির উপরিভাগ কঠিন শিলা দিয়ে তৈরি এবং তার চেহারাটা শুকনো তপ্ত মরুভূমির মতো।

পৃথিবীর ২৩৪ দিনে শুক্রের একটি বছর হয়। অর্থাৎ শুক্রে একটি বছরের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় ছোট। কিন্তু শুক্রের একটি বড় রহস্যের সমাধান করা সম্ভব হয়নি—সে হলো ওর দিন ও রাতের সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করা। একমাত্র প্লুটো ছাড়া সৌরজগতের অন্যসব গ্রহেরই আপন অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের বেগ আমাদের জানা আছে—যে-তথ্যটি একটি গ্রহের দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। কিন্তু শুক্রের ঘন গ্যাসীয় মেঘের আবরণটি এই অতি-প্রয়োজনীয় সংবাদ থেকে বরাবরই আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে।

ভেনাস-চার শুক্রে পৃথিবীর মতো কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বা বিকীরণ

বলয়ের (রেডিয়েশন বেল্ট) সন্ধান পায়নি। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চুম্বক রশ্মির বেড়াজাল মহাজাগতিক রশ্মি ও সৌরকণিকা স্রোতের মারাত্মক প্রভাব থেকে পৃথিবীর প্রাণীজগতকে রক্ষা করে চলেছে।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে যেহেতু অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প নেই এবং চৌম্বকক্ষেত্র-কোনো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও নেই, তাই সেখানে পৃথিবীর মতো জটিল প্রাণীজগতের অস্তিত্ব একেবারেই সম্ভব নয়। অতি নিম্নশ্রেণীর কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব সেখানে সম্ভব হলেও হতে পারে। বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল, তখনকার পরিবেশের সঙ্গে শুক্রের বর্তমান পরিস্থিতির হয়তো খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শুক্রে প্রাণীজগতের বিবর্তনের সমগ্র ঘটনাটা আজও বাস্তবে রূপায়িত হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে বলা যায়।

আমরা মহাকাশযান ভেনাস-পাঁচ ও ভেনাস-ছয়-এর সংগৃহীত তথ্য থেকে রহস্যময়ী গ্রহ শুক্র সম্বন্ধে আরো কিছু নতুন খবর পাবার প্রত্যাশায় রয়েছি।

শঙ্কর চক্রবর্তী

ক্যালকাটা পেন্টার্স

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ক্যালকাটা পেন্টার্স গোষ্ঠী তাঁদের যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই বেশ পরিচিত এবং এখনও প্রতিশ্রুতি বহন করেন। অথচ বর্তমান প্রদর্শনীতে পরিণতিমুখিনতার অভিজ্ঞান অনুপস্থিত। ৪৭টি কাজের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নিম্নমানানুগ, গতানুগতির ছায়াচ্ছন্ন এবং মৌলিকতাবর্জিত। কেউই মাধ্যম, আঙ্গিক অথবা বিষয়নির্মাণে সমভাবে পারদর্শী নন। কেন কেউই এঁরা শিল্পসম্পর্কেও ভাবিত নন। ফলত ভণ্ডামি, চোখ ধাঁধানো প্রবঞ্চনা ইত্যাকার অসৎ পন্থার অরাজকতা অব্যাহত। এইসব বিশিষ্ট গুণাবলী এঁদের বেশিরভাগ শিল্পীর মধ্যেই পরিদৃষ্ট। একথা অবশ্য সত্য নয় যে, এঁদের কাজ সমগ্রভাবেই ব্যর্থ বা এঁদের একটি কাজও ডিলেট্যান্টকে তুষ্ট করতে পারে না। কিন্তু বেশিরভাগ কাজেই চরম ব্যর্থতা দেখা যায়। মোট নজন শিল্পীর মধ্যে অমিতাভ সেনগুপ্ত, অনীতা রায়চৌধুরী, তপন ঘোষ ও গোপাল সান্যালের কাজ চোখে পড়ে। কারুকার্য ও টোনাল স্কিমের জন্য অমিতাভ সেনগুপ্তের সাতটি ইনট্যাগলিওর ভূমি সার্থক। বহু বর্ণের প্রিন্ট বা ব্যাক্সটার প্রিন্ট-এ ইনি তর্কাতীতভাবে দক্ষ। একদিকে যেমন 'ডেকরেটিভ' করে প্রিন্টগুলিকে নষ্ট করেননি, অন্যদিকে তেমনি আকৃতিগঠনের সুস্পষ্ট পরিকল্পনায় সামগ্রিক আবেদন আনতে পেরেছেন। ৪৪ সংখ্যক ইনট্যাগলিওটি উল্লেখ্য। বেগুনি রঙের অবতলে ফিগারেটিভ মোটিফ-এ সম্পন্ন প্রিন্টটি আকৃষ্ট করে। সোমনাথ হোড়ের এচিং-এর কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে এই মনে হয় যে, সোমনাথ হোড়ের অতি-প্রতিচীয়ানা এই শিল্পী কেন বর্জন করেন না। অনিতা রায়চৌধুরী কোমল রঙ লেপন করে ইমপ্রেশনিস্ট রীতির অনুসরণ করেন। 'পেন্টিং (২)' [কিছুটা ইমপ্রেশনিস্ট, কিছুটা ফোভিস্ট] উল্লেখ্য। গোপাল সান্যালের 'সঙ্গীতজ্ঞের মৃত্যু' ও 'পেন্টিং নং ১' রিয়্যালিস্টিক কাজ। তিনি দ্বিতীয়োক্ত তেল-রঙের কাজটিতে আড়াআড়িভাবে দুটি ঘোড়াকে টেম্পারার আশ্রয়ে বোর্ডে বেশ নিপুণভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। পুরুরেখার ব্যবহারে যত্নবান হলে তাঁর সাফল্য

অধিকতর পূর্ণতা পেত। তপন ঘোষ একাধিক বর্ণ 'ওভারল্যাপ' করিয়ে 'ক্যালাইডোসকোপিক এফেক্ট' আনতে পেরেছেন। ইনি মূলত পোস্ট-ইম-প্রেশনিস্ট, যদিও বার্বিজন শিল্পধারার প্রভাবে তাঁর নিপুণতা ব্যাহত হয়েছে। ইনি ইমপ্যাসটো (পুরু রঙে ক্যানভাসে ত্রিমাত্রিকতা সৃষ্টি) ও টেম্পেরার রীতিতে কাজ করেন। আর একজন শিল্পীরও কাজ ভালো লাগে না। রবীন মণ্ডলের সার্থকতার পথে অন্তরায় অহেতুক ক্যালিগ্রাফিক ও ডেকরেটিভ হওয়ার দিকে ঝোঁক! তাঁর 'কম্পোজিশন' অবশ্য একটি উত্তীর্ণ জলরঙের কাজ। প্রকাশ কর্মকার, মহিম রুদ্র, নিখিলেশ দাস প্রভৃতির কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের। এঁদের কাছ থেকে ভালো কাজের আশা নিয়েই গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি হতাশ হয়ে।

পদ্মা নাথ—এর বাটিক প্রদর্শনী

ঠিক একই সময়ে আফা গ্যালারিতে পদ্মা নাথ-এর বাটিক চিত্রকলা প্রদর্শিত হলো। এতো ভালো বাটিকের কাজ ইদানীং বেশি দেখিনি, দেখা যায় না। ঠিক মনে হয় পেন্টিং। সুচারু বর্ণলেপন তাঁর অনতিবৃহৎ বাটিকের মধ্যে সুপরিকল্পিত-ভাবে প্রাধান্য পায়। অন্তত ছটি কাজের সার্থকতা প্রশ্নাতীত। পোস্ট-ইম-প্রেশনিজম তাঁর রীতি। 'রমণী ও বিহঙ্গ' (জ্যামিতিক গঠননৈপুণ্য), 'গৃহমালা' (জলরঙের মতো) ও 'স্টীল লাইফ' (যদিও প্রতীচ্যঘেঁষা) তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত। সব থেকে ভালো লাগে 'দৈনন্দিন কাজ'। হলুদ ও হালকা মভ-এর ব্যবহারে দুই রমণীর বস্ত্রপ্রক্ষালনকে তিনি নিপুণভাবে বিধৃত করেছেন। মনে পড়ে যায় গগ্যাঁর তাহিতি চিত্রমালা—ঠিক তেমনই টোনাল ও ফিগারেটিভ প্রবণতা। এঁর কাজ একাধিকবার দেখার ইচ্ছে রইল।

চারুনেত্র

'তের নদীর পারে'

মুক্তি পাবার আগে পর্যন্ত 'তের নদীর পারে' ছবিটির মূল প্রতিপাদ্য প্রশ্নের সঙ্গে ছবিটির নিজস্ব ভাগ্য ''আয়রনি অফ ফেট'-এর মতো জড়িয়ে গিয়েছিল। শিল্পবোধ বাণিজ্যবোধের কাছে মাথা নত করবে কিনা, যথার্থ শিল্পী সহজ মনোরঞ্জনী উপকরণে শিল্পকে সুলভ পণ্যে পরিণত হতে দেবে কি না—ছবির এই জিজ্ঞাসা শিল্পী হিসেবে পরিচালক বারীন সাহারও নিজের কাছে নিজের জিজ্ঞাসা ছিল। তিনি অবিকৃত শিল্পকেই বেছে নিয়েছিলেন। ফলে জন্মমুহূর্তেই পণ্যব্যবসায়ী প্রদর্শকরা ছবিটির ললাটে মৃত্যুপরোয়ানা লটকে দিয়ে গেলেন। তাই প্রযোজক-পরিচালককে ছবিটি শেষ হবার পরও দীর্ঘ আট বছর অটুট ধৈর্য ও তিতিক্ষা নিয়ে শবরীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হলো। শেষপর্যন্ত চলচ্চিত্র-সংরক্ষণ-সমিতির আন্দোলনের জয়লব্ধ ফল হিসেবে এ-ছবি যদি এমন আকস্মিক মুক্তির সুযোগ না পেত, তাহলে আর-কিছুদিন দেখে বাণিজ্যের কাছে শিল্প মাথা নত করবে কিনা—এই প্রশ্ন শরীরে বহন করে, ছবিটিকে নিশ্চিত একদিন অন্তর্জলি যাত্রা করতে হতো।

অবশ্য একথাও ঠিক, এই প্রতিবন্ধকতা ছবিটি সম্পর্কে উৎসাহী দর্শকদের ঔৎসুক্যই বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া পরিচালক-আযোজিত কিছু সৌজন্য-প্রদর্শনীর সুযোগে ছবিটি প্রসঙ্গে দীর্ঘকালীন আলাপ-আলোচনা ছবিটিকে অংশত কিংবদন্তীতে পরিণত করেছিল। এবং ছবিটিকে ঘিরে শেষপর্যন্ত একটা ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা জন্মেছিল, তাহলে কি এদেশে কেউ আর্ট-ফিল্ম করার কোনো সুযোগই পাবেন না?

'তের নদীর পারে'র নিছক মুক্তি এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর বহন করছে না। কিন্তু ছবিটি শেষপর্যন্ত মুক্তি পাওয়ায় দর্শকরা এ-দেশের 'চলচ্চিত্র নির্মাতা'র ভিড়ে এমন একজন চিত্র পরিচালকের সন্ধান পেলেন, 'চলচ্চিত্রস্রষ্টা' হিসেবে যিনি নিঃসন্দেহে সম্ভাবনাময়; এবং এমন একটি চিত্রের—যা প্রচলিত চিন্তাশ্রিত গতানুগতিক ধারার আর-দশটা ছবি থেকে চেহারা-চরিত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। এবং স্বতন্ত্র।

এ-ছবির স্বাতন্ত্র্য বিষয়গত নয়। শিল্পঘটিত যে-প্রশ্ন এ-ছবিতে উত্থাপিত, তা ইতিপূর্বেও কোনো না কোনো আকারে যে এ-দেশী চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত না হয়েছে তা নয়। অথবা এও নয় যে, ছবিটি পুরোপুরি বহিঃদৃশ্যে তোলা। কারণ, অকৃত্রিম পরিবেশে বাস্তব জীবনের চিত্রায়ন বা ডাইরেক্ট ফিল্মিংকে চিত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুণ বলে বিশ্বাসের কোনো হেতু নেই। এক অর্থে চলচ্চিত্রের জন্মই মুক্ত প্রকৃতির কোলে, কৃত্রিম স্টুডিওর সূতিকাগারে নয়। এ-ছবির স্বাতন্ত্র্য পরিচালকের উপকরণ-প্রয়োগের বিশিষ্ট প্রভঙ্গি এবং জীবনদর্শনের প্রতিন্যাসে।

'তের নদীর পারে' গল্পাশ্রিত চলচ্চিত্র নয়। কাহিনী এখানে গৌণ। যেটুকু আছে, তাও যেন গল্পাংশ অনুসরণের সাহায্যার্থে দর্শকের হাতে সূত্র হিসেবে পরিবেশিত। আধুনিক পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের যে-ধারা চলচ্চিত্রকে নিছক গল্প বলার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণে বিশ্বাসী নয়, বিষয়ের চেয়েও বিশেষ একটি ভঙ্গি আবিষ্কারে উৎসুক, এবং সর্বোপরি, প্রচলিত বিষয় ও প্রকরণপ্রথা ভেঙে চিত্র-ভাষার সতর্ক ও তন্নিষ্ঠ প্রয়োগে নতুন কোনো চিত্রাঙ্গিক গঠনে প্রয়াসী—বারীন সাহা সেই ধারার অনুসারী।

তাই, নির্মল ঘোষের যে-কাহিনী অবলম্বনে 'তের নদীর পারে', তাতে নিটোল গল্পের সম্ভাবনা থাকলেও পরিচালক তাঁর ছবিতে পরম্পরাগত মোটা দাগের গল্প এড়িয়ে গেছেন। নাটকের যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও, অতিনাটকীয়তা তো নয়ই, নাটকীয়তারও সাহায্য তিনি নেননি। পক্ষান্তরে এ-ছবিতে অমসৃণ বাস্তব জীবন-ভগ্নাংশের ইঙ্গিতময় কিছু খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে শিল্প-প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা ও জীবন-প্রসঙ্গে তার অনুভব তুলে ধরতে চেয়েছেন।

তাই এ-ছবিতে শিল্পের উদ্দেশ্যঘটিত আপাত-প্রত্যক্ষ প্রশ্নটিই সব নয়, আরো গভীরে, জীবন-প্রসঙ্গে আর-এক অন্তর্মুখ বিমূর্ত প্রশ্নও এ-ছবির অন্তরাত্মা। সে-প্রশ্ন জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার চিরন্তন প্রশ্ন। প্রেয় ও শ্রেয়র জটিল জিজ্ঞাসা।

ছবিটিতে যে-মূল চরিত্রটিকে অবলম্বন করে এই জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত, সে একজন অতি সাধারণ ভ্রাম্যমাণ সার্কাস খেলোয়াড় 'ওস্তাদ'। এই ওস্তাদের চরিত্র-চিত্রণে পরিচালক বারীন সাহা অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘদিন পর এ-দেশী চলচ্চিত্রে শিল্পীর সূক্ষ্ম অনুভূতি, জিজ্ঞাসা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও

অন্তর্জালায় ক্ষতবিক্ষত এমন বিশ্বস্ত একটি শিল্পী-চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

প্রথম দর্শনেই অনুমান করা যায় ওস্তাদ সত্তার গভীরে কোথায় যেন একটা শৈল্পিক ক্ষোভ, অভিমান বা জ্বালা বহন করছে। অথবা এক গভীর অতৃপ্তি। সন্দেহ হয়, আরাধ্যকে পূর্ণ করায়ত্ত করতে না পারার অতৃপ্তি।

ছবির প্রথম পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বী সার্কাস দলের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য ম্যানেজারের নর্তকী আনার প্রস্তাবের মুখে ওস্তাদ নির্মম, কঠোর। কিন্তু পরে সহকর্মীদের কষ্টের কথা ভেবে, শেষপর্যন্ত সে সম্মতি দেয়। শিল্পী হিসেবে অনমনীয় হলেও এ-সম্মতি তার মানবতার পরিচয়। সার্কাসে নর্তকীর আবির্ভাব ওস্তাদের পরাজয় বহন করে আনে। কিন্তু ওস্তাদের আচরণে নর্তকীর প্রতি কোনো ঈর্ষা বা বিরূপতা প্রকাশ পায় না। পরিবেশের সমস্ত বিরুদ্ধতা সংঘাতকে তার নিজের ভেতর গুটিয়ে এনেছে। সংঘাত তার নিজের সঙ্গে নিজের। সেই অন্তর্লীন সংঘাতে ওস্তাদের শিল্পীসত্তা সাময়িকভাবে পরাভব বোধ করে। আত্মঘাতী গ্লানিতে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এক দুঃসাহসী খেলায় মাতে সে। এবং একটা দুর্ঘটনায় পতিত হয়। নর্তকী এ-সময় তাকে শুধু সুস্থই করে তোলে না, ভালো-বাসার ছোঁয়ায় ওস্তাদের ভেতর নতুন করে জীবনবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। শিল্পীর কাছে শিল্প-সৌন্দর্য-জীবন সমার্থসূচক। এই নতুন জীবনকে ওস্তাদ তাই সানন্দে বরণ করে নেয়। কিন্তু বাদ সাধে ম্যানেজার। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ওস্তাদকে সে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। অবশ্য পরাজিত হয়। সার্কাস ছেড়ে চলে যায় ম্যানেজার। এ-কথা টের পেয়ে দৌড়ে আসে ওস্তাদ। শিল্পী হলেও বৃত্তিগত বন্ধনে নিজেদের সে একই সুখদুঃখের অন্তরঙ্গ শরিক বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু অভিমানাহত ম্যানেজারকে ফেরাতে পারে না। এ-বিচ্ছেদকে ওস্তাদ জীবনের নিষ্করুণ নিয়ম হিসেবে মেনে নিয়ে সার্কাসে ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে নর্তকীও তার কাছে বিদায় নিতে এসেছে। সার্কাস ছেড়ে সেও চলে যাচ্ছে। বোঝা যায় ওস্তাদের সাধনায় প্রতিবন্ধক হতে চায় না বলেই সে ওস্তাদকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে। জীবনের এক অমোঘ ভবিতব্যের মতোই এ-বিচ্ছেদকেও ওস্তাদ মেনে নেয়। এক স্থিতধী মগ্ন শিল্পীর মতো সে আবার সার্কাসে ফিরে আসে, তার নিজস্ব শিল্পাশ্রয়ে, যেখানে প্রেমের চেয়েও

বড় তার শিল্প। অথবা হয়তো প্রেম তখন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে বৃহত্তর শিল্প-প্রেমে, জীবনপ্রেমে রূপান্তরিত।

এরই পাশাপাশি বৈষয়িকবোধে চতুর ম্যানেজার ও সাধারণ একজন নর্তকীর—প্রেমের এক দুর্লভ মুহূর্তে যে আত্মত্যাগে অসাধারণ—চরিত্রও পরিচালক আশ্চর্য নিপুণতায় উপস্থিত করেছেন।

মাঝে মাঝে চরিত্রকটিকে যেন প্রতীক বলেও মনে হয়। ওস্তাদের শিল্প-জীবনের শ্রেয় তার শিল্পসাধনা। নর্তকীর ভেতর সে তার প্রেয়কেও খুঁজে পেল। কিন্তু প্রতিবন্ধক হলো ম্যানেজারের বৈষয়িকবোধ আর স্থূল ঈর্ষা। এই সংঘাতে জীবনের সামনে যখন প্রশ্ন, শ্রেয় না প্রেয়?—তখন শ্রেয়কেই, তার শিল্পকেই, শিল্পী বরণ করে নিল।

চরিত্র-চিত্রণে পরিচালক বারীন সাহা একজন নির্মোহ নিরাসক্ত জীবনদ্রষ্টা। জীবন-প্রসঙ্গে কোনো কাল্পনিক বা অরোপিত মসৃণতায় তিনি বিশ্বাসী নন। দর্শকের অভ্যস্ত প্রত্যাশাকে তিনি তাই বারে বারে নিষ্ঠুর হাতে ভেঙেছেন। প্রেমের ত্রিভুজকে শীর্ষবিন্দুতে এনে ভেঙে চুরমার করে দর্শককে আহত বা বিক্ষুব্ধ করতেও ভয় পাননি।

জীবনদর্শনে নির্মোহ নিরাসক্ত হলেও বারীনবাবু নিরীক্ষামূলক নতুন ধারার বহু পরিচালকের মতো জীবন-প্রসঙ্গে আদৌ বীতস্পৃহ বা হৃতস্বপ্ন নন! আক্রমণাত্মকও নন। বরং তিনি ঘনিষ্ঠ জীবনদরদী। জীবনবিশ্বাসে বলিষ্ঠ, সদর্থক।

চিত্রভাষা ও বিন্যাসরীতিতেও পরিচালক প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোকচিত্রের কাজ এ-ছবিটিতে অসামান্য। ক্যামেরার প্রতিটি দৃষ্টিকোণ এবং কম্পোজিশন সুচিন্তিত। মাঝে মাঝে কিছু খণ্ডচিত্রকল্প চিত্র-কলাসুলভ সুষমামণ্ডিত। এ-প্রসঙ্গে প্রথম দৃশ্যে লং-শটে বিস্তীর্ণ নদীর ধূসর পট-ভূমিতে একটি আলোক-বিন্দু-নৌকোর যাত্রা, বিশাল পদ্মপাতার মতো মাঠ জুড়ে শুয়ে থাকা সার্কাসের তাঁবু, মুক্ত আকাশের নিচে দিগন্ত-বিস্তারী নদীর জল ছুঁয়ে উচ্ছ্বসিত নর্তকীর ছুটোছুটি, আর তার পায়ের শব্দে সচকিত রূপালি মাছের ঝাঁকের দৌড়ে পালানোর দৃশ্যটি দীর্ঘদিন স্মরণে রাখার মতো। নর্তকীর প্রথম আগমন, ওস্তাদ ও ম্যানেজারের মারামারি, ত্রিফলা-খেলার দৃশ্য-পরিকল্পনা ও মণ্টাজ নির্মাণের পারদর্শিতায় পরিচালকের নিপুণ চিত্রভাষা প্রয়োগের স্বাক্ষর প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যবোধ যে পরিচালকের করায়ত্ত এবং বিশেষ কারণে

এ-ছবিতে স্বেচ্ছা-বিবর্জিত, এই ছোট্ট মন্টাজকটি তারও এক নিদর্শন।

এ-ছবির অভিনয় গতানুগতিক প্রথানুসারী নয়। পরিচালক অভিনয়কে সংযোগসূত্র হিসেবে দর্শকের কাছে তুলে ধরতে চাননি। সংযোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন চিত্রভাষাকে। তাই এই ছবিতে ব্যক্তিগত অভিনয়ের সুযোগ ছিল সীমিত। তবু সেই সীমিত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন ওস্তাদ, ম্যানেজার ও নর্তকীর ভূমিকায় জ্ঞানেশ মুখার্জি, নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল ও প্রিয়ম হাজারিকা।

পরিচালক এ-ছবির বহু ক্ষেত্রে সহ-স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণে দর্শকের কল্পনা-শক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ-ছবির সর্বাঙ্গে তাই অনুক্ত আবেগ ও অকথিত বক্তব্যের অংশ ছড়িয়ে আছে। নিঃসন্দেহে তাতে পরিচালকের স্বতন্ত্র শিল্পবোধ ও সংযমের পরিচয় পাই। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে একটি কথা থেকে যায়। অব্যক্ত অধ্যায় ও ইশারার কোনো কোনো অংশ ছবিতে বোধহয় আর-একটু আভাসিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। যার অভাবে দেখা যায় একই ঘটনার বিশ্লেষণে শুধু দর্শক নয়, সমালোচকরাও কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন। তাতে হয়তো ঘটনার শেষ পরিণতি অনুধাবনে অসুবিধে ঘটে না, কিন্তু চরিত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিচারবিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

•

'তের নদীর পারে' তুলনামূলকভাবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হওয়ায় একই সঙ্গে প্রদর্শিত হলো বারীন সাহার আর-একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'শনিবার'।

'শনিবার' সাধারণ মধ্যবিত্ত কেরাণী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-গ্লানির একটি ঘনিষ্ঠ আলেখ্য। চরিত্র বিচারে ছবিটি একাঙ্কিকার পর্যায়ভুক্ত। উপস্থাপনাও মঞ্চানুগত। এই ছবির নির্মাণকার্যে পরিচালকের সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা অনুমান করা যায়। কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার ভেতরেও প্রয়োগশিল্পী হিসেবে পরিচালক কিছু সবল চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির কাহিনীকার বাদল সরকারই ছবির নায়ক দিব্যেন্দুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন! এ-ছবিতে তাঁর অভিনয় সাধারণ পর্যায়ের। অন্যান্য চরিত্রে পুতুল সরকার, দেবী গুপ্তা ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মিহির সেন

'অনামিকা'র 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ'

বাঙলা নাট্যরসিকদের কাছে হিন্দী থিয়েটারের প্রায় কোনো আকর্ষণই ছিল না বলা চলে। তার কারণ দ্বিবিধ। হিন্দী থিয়েটার দেখার সুযোগ ছিল কম। ক্বচিৎ কোনো হিন্দী থিয়েটার শহরের মঞ্চে প্রদর্শিত হলেও শিল্পরসের বিচারে তা বাঙলা থিয়েটার-দর্শককে আকৃষ্ট করতে পারেনি। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। পৃথ্বী-থিয়েটার বা ওই ধরনের কোনো বিশিষ্ট দলের শহরের মঞ্চে আবির্ভাব কলকাতার দর্শককে এককালে সচকিত করেছে; কিন্তু তা কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আর-একটি কারণ, বাঙালি দর্শকের হিন্দী সম্পর্কে ঈষৎ উন্নাসিকতা। সেটা শুধু থিয়েটারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অস্বীকার করে লাভ নেই যে বাঙালি মানসিকতায় হিন্দী গল্প, কবিতা, উপন্যাস সম্পর্কেও একটা অশ্রদ্ধার ভাব কিছুটা স্থান দখল করে ছিল। ইদানিং অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। হিন্দী থিয়েটারকেও 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' আয়োজিত নাট্যোৎসবে বিশিষ্ট স্থান দখল করতে দেখা যায়!

বেশ কয়েকবছর ধরে নিয়মিত হিন্দী নাটকের সুপ্রযোজনা 'অনামিকা' নাট্য-সংস্থাকে খ্যাতিমান করেছে। মূলত হিন্দীভাষীদর্শকের জন্য নাটক প্রযোজিত হলেও 'অনামিকা'র নাম বর্তমানে বাঙালি থিয়েটার-দর্শকের কাছেও অল্পবিস্তর পরিচিত। এঁদের 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' দেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, এঁরা বাঙলা থিয়েটারে প্রথম শ্রেণীর যে কোনো দলের সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্য; আধুনিক থিয়েটার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, প্রয়োজনীয় নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এঁদের যোগ্যস্থানে আসীন করেছে।

'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' শ্রীবাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর ভাষান্তরিত রূপ। কিন্তু রসের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ভাষা যে মূল বাধা হতে পারে না, হিন্দী 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বাদলবাবুর 'এবং ইন্দ্রজিৎ' সুপরিচিত নাটক্। নাটকের বক্তব্য সকলের মনঃপূত না হলেও একথা বলতেই হবে, নতুন আঙ্গিকে লেখা 'এবং ইন্দ্রজিৎ' একটি সার্থক নাটক। নাটকে গল্প নেই, কিন্তু কাহিনী আছে।

সে-কাহিনী অমল-বিমল-কমল-এর—নাট্যকারের মতে আধুনিক মানুষের—জীবনকাহিনী। জন্ম—কলেজ—চাকরি—বিবাহ—মৃত্যু— এই চক্রে সে-কাহিনী আবর্তিত। ব্যতিক্রম ইন্দ্রজিৎ। এই আবর্তের বাইরে গিয়ে সে জীবনকে সার্থক করতে চায়। কিন্তু পৃথিবী ঘুরেও সে জীবনের কোনো মানে খুঁজে পায় না। তাহলে এই কীটের মতো নগণ্য জীবনের হাত থেকে মৃত্যুই কি মুক্তির পথ? না, তাও না। সামনে পথ আছে—সুতরাং পথ চলা। পথের শেষ জানা নেই। তীর্থ নেই, শুধু তীর্থযাত্রা!

এখানেই নাটকের শেষ। প্রশ্ন জাগে, যে-ইন্দ্রজিৎ নতুন জীবন সন্ধান করেছিল, সেও কি তাহলে অমল-বিমল-কমল-এর দলে সামিল হচ্ছে? চরৈবেতি। কিন্তু পথ তো একটাই দেখা গেল, অমল-বিমল-কমল-এর পথ—চক্রাকারে আবর্তিত কাহিনী। সেই পথেই কি ইন্দ্রজিৎ-এর নিয়তি? তাই যদি হবে, তাহলে ইন্দ্রজিৎকে ব্যতিক্রম হিসেবে উপস্থিত করার সার্থকতা কোথায়? নতুন কী পথ আবিষ্কার করল সে?

এ-প্রশ্নের জবাব নাটকে নেই। তাই 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' কোনো নতুন বোধ জাগাতে সক্ষম হয় না।

তবু 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ'-এর একটি বিশেষ অবদান আছে। তা হলো, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করা। দুটি দৃশ্যে, মঞ্চসজ্জায় কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে, কয়েকটি মাত্র চরিত্রের মাধ্যমে, যে-ভঙ্গিতে এক বিরাট কাহিনী দর্শকের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসার্হ। প্রচলিত থিয়েটারের গল্পভিত্তি, সেইমতো দৃশ্যভাগ, চরিত্রের বিন্যাস এবং সবশেষে ক্লাইমাক্স অর্থাৎ গল্পের পরিসমাপ্তি-এর কোনো নিয়মই 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ'-এ মানা হয়নি। মানতে গেলে 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ'-এর কাহিনী বলা যেত না। সেই বিবেচনায়, এ-নাটক সার্থক। সার্থক এর পরিকল্পনা। মঞ্চের যে-সীমাবদ্ধতা নাট্যরচনা ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রায়শই বাধা হিসেবে দেখা দিচ্ছে, 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' হয়তো সেই বাধা অতিক্রমণে নাট্যকর্মীদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

দলগত অভিনয়ে 'অনামিকা' নাট্যগোষ্ঠী যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষভাবে নজরে পড়ে শ্রীমতী চেতনা তেওয়ারীর দ্বৈত-ভূমিকায় দ্বৈত-রূপে অবতরণ। মাসী ও মানসী—দুজনের ভিন্নরূপ। কিন্তু অঙ্গসজ্জা ও পোষাকে

কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েও তিনি যেভাবে চরিত্র দুটি দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন, তা রীতিমতো চমকপ্রদ। নাটকের প্রয়োজনে দলগত মূকাভিনয়ের এমন সার্থক প্রয়োগ দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

খালেদ চৌধুরীর দৃশ্যপরিকল্পনা অর্থবহ। আলোকসম্পাত, আবহসঙ্গীতের যথার্থ প্রয়োগ এবং থিয়েটারের আনুষঙ্গিক আর-সবকিছুর মিলে 'অনামিকা'র 'এবম্ ইন্দ্রজিৎ' কলকাতার থিয়েটার জগতে একটি বিশিষ্ট প্রযোজনা।

আশা করব, 'অনামিকা' ভবিষ্যতে সত্যিকারের হিন্দী থিয়েটার উপহার দেবেন, যে-থিয়েটারের মাধ্যমে আমরা হিন্দীভাষী মানুষগুলিকে মাটির কাছে দেখতে পাব।

উমানাথ ভট্টাচার্য

এবারের রবীন্দ্রদিবসে

রবীন্দ্রনাথের বাঙলাদেশে—এ-বছর, উনিশশো উনষাটে—দেখছি সেই 'অপরাজিত মানুষ'। কাঁটা আর নরেল স্তবক একই সময়ে তার মাথায় মুকুট। এ-বছর ৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ছে গণতন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মন্ত্রগুরু বলে। মনে পড়ছে "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" সেই লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনায় গত বাইশ বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কৃমিকীট, সেই বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যায় মাৎস্যন্যায়ের অর্থনীতি একচেটিয়া মূলধনতন্ত্রের জন্ম দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানির গণতন্ত্রঘাতী হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের চাপ সেই পঙ্কশয্যা ঘুলিয়ে তুলেছে, আক্রমণের দাপে আবর্জনার ধুলো ছড়িয়ে পড়ছে এই দেশে ও রাজ্যে। দুর্বোধ্যতাবাদ, পরভাষা-অসহিষ্ণুতা, প্রাদেশিকতা, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি অন্ধকারের শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলে ভারতে নয়া-উপনিবেশিকতার জাল ছড়াচ্ছে তারা। "মন্দির দ্বারে পূজা ব্যবসায়ী" বর্ণাশ্রমের তুরী ভেরী বাজিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করছে হরিজনদের। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির ভাড়াটিয়া ও সেবাব্রতী এদেশী একচেটিয়া সাহিত্য সংবাদ বেনিয়ারা বিদেশী মূলধন আর তার দেশী সহযোগীদের শোষণ-শাসন অব্যাহত রাখতে ভাবাদর্শের ভূমিতেও "মানবপীড়নের মহামারী"র বীজ অলক্ষ্যে উপ্ত করছে। আর যখন ভারতের মানবাত্মার উপরে আক্রমণ চরম হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই তামস-হর যুক্তফ্রন্ট। আর তখনই "পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন···আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে" ভারতের পূর্ব দিগন্তে এই "শ্যাম বঙ্গদেশে।" যেখান থেকে "অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।" আর "প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।" দেখছি, একটানা চল্লিশ বছর ধরে

কলকাতা পৌরশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে-সর্বনাশের বিষবৃক্ষ শিকড় চালিয়ে ছিল; তার গোড়ায় যুক্তফ্রন্টের কুড়োল পড়তেই কেমন তা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দেখছি, সর্বভারতীয় ঐক্যের বীজমন্ত্র "পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মরাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ"কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথের বাঙলাদেশ ভি. কে. কৃষ্ণমেননকে লোকসভায় নির্বাচিত করে পাঠাল। অন্যদিকে অন্ধকারের শক্তিগুলি গুপ্তগহ্বর থেকে বেরিয়ে এলো। প্রাদেশিকতার বিষ ছড়াল। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে মার খেয়ে আবার গুপ্তগুহায় ফিরে গেল। নতুন চক্রান্তের বিষের থালি ঢেলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা অন্য কোনো সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

আর মনে পড়ছে ভিয়েতনামের কথা। সাম্রাজ্যবাদের কোমর ভেঙে দিয়েছে ভিয়েতনাম। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া সংগ্রামে আজ বর্শা-ফলক এই ভিয়েতনাম। এই মে মাসেই ভিয়েতনামের জনগণমনঅধিনায়ক হো চি মিন আশি বছরে পা দিলেন। তিনি রূপ দিয়েছেন সেই মন্ত্রের: "মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।"

এ-বছর রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দিবস পালিত হয়েছে। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে এই আটই মে বলদর্পী হিটলারের নাৎসি রণদুর্মদ পাশবশাসন সোভিয়েত লালফৌজের আঘাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। আর জার্মানির ইতিহাসে প্রথম শান্তিবাদী রাষ্ট্র জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জন্ম নেয়। কিন্তু জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী বিষবৃক্ষের সমূল উৎপাটন এখনো হয়নি। সেই বিষবৃক্ষের বীজ রয়ে গেছে মূলধনতন্ত্রের মধ্যেই। পশ্চিম জার্মানিতে প্রতিহিংসাকামী নয়া-ফ্যাসিবাদী সাপ আবার ফণা তুলতে চাইছে। আবার সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত ব্যাপ্ত করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। য়ুরোপীয় শান্তি বিঘ্নিত হতে চলেছে। আর পশ্চিম জার্মানির পেছনে শক্তি জোগাতে রয়েছে এ-যুগের বীভৎসতম দানবীয় শক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এই মাত্র দু-বছর আগে গ্রীসদেশে মার্কিনী সি. আই. এ. গুপ্তচর চক্র কম্পুটারের হিসাবের সহায়তা নিয়ে আঁটঘাঁট বেঁধে প্রতিষ্ঠা ঘটাল ফ্যাসিবাদী 'কালো কর্নেল' নামা সামরিক 'জুন্টা'। একদিন স্পেনে ফ্যাসিবাদী হিটলার-মুসোলিনি শিখণ্ডী ফ্রাঙ্কোকে সামনে রেখে য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'ড্রেস রিহার্সাল' করে নিয়েছিল। আর স্পেনের প্রজাতন্ত্র

গভর্নমেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে। আজও দেখছি তেমনি এক অশুভ ইঙ্গিত। গ্রীসের ফ্যাসিবাদীদের শিখণ্ডী করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর পশ্চিম জার্মানি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তাবনায় ছিল চেকোস্লোভাকিয়া গ্রাম। এবারও তার প্রস্তুতি হয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিবাদবিরোধী অজেয় ফৌজের সময়মতো হস্তক্ষেপে গর্তের জীবগুলি গর্তে ফিরে গেছে। কিন্তু গ্রীসে তারা সমাজতন্ত্রের দুর্গ আক্রমণের জন্য ফ্যাসিবাদের বুরুজে কামান বসাচ্ছে। য়ুরোপে এখন সমরায়োজনের ঘনঘটা। বন-ওয়াশিংটনের 'বোঁচা গোঁফের হুমকি' তথাকথিত গণতন্ত্রীরা শুনছে আর লোভে ঠোঁট চাটছে। প্রৌঢ় প্রতাপের যত রাষ্ট্রপতি আছে, তারা আজও মন্ত্রিসভাতলে আদেশ-নির্দেশ নিষ্পিষ্ট করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভারতেও গণতান্ত্রিক জার্মান প্রজাতন্ত্র স্বীকৃত রাষ্ট্র নয়, স্বীকৃত পশ্চিম জার্মানির আক্রমণলিপসু রাষ্ট্রটি। বর্ণভিত্তিক আক্রমণে দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেসিয়ার কালোমানুষ আজ ফ্যাসিবাদের শিকার। রক্তশোষণ চলেছে ফ্যাসিস্ত পর্তুগালের আক্রমণে মোজাম্বিকে অ্যাঙ্গোলায়।

এবার ৮ই মে র রবীন্দ্রদিবস পালনের অন্য তাৎপর্য রয়েছে। দেশে-বিদেশে জীবনের শত্রু অন্ধকারের শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করার শপথ নেবার দিন এবার পঁচিশে বৈশাখ। গোটা মে মাস জুড়েই যেন জনগণের বিজয়-কাহিনীর একটির পর একটি পাতা খুলে যাচ্ছে। স্বদেশে আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে সবাইকে মেলাতে চাই "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে", চূর্ণ করতে চাই পশ্চিমী অপসংস্কৃতি। আর সারা দুনিয়া জুড়ে এবার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিপুল ফ্রন্ট গড়ে তোলার ডাক এসেছে।

ভ্রাতৃঘাতী সঙ্কীর্ণতা যে-অন্ধতার স্রষ্টা, তা ফ্যাসিবাদের পদধ্বনিকেই দ্রুত করে তোলে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে আমরা সেই ফ্রন্ট চাই যা সমস্তপ্রকার গণতান্ত্রিক মানুষের মিলন ও সংগ্রামের মঞ্চ। ভারতে সেই ফ্রন্টই অপশক্তির প্রয়াসকে পরাস্ত করতে পারে। জার্মানির নাৎসি অভ্যুত্থানের দিনগুলিকে আমরা যেন ইতিহাসের অভিজ্ঞতার আলোয় বিচার করে দেখি। অযথা ভ্রাতৃবিদ্বেষী সংঘর্ষ সেখানে ফ্যাসিবাদের পথ ত্বরান্বিত করেছিল। ভারতে এ-অভিজ্ঞতার শিক্ষা যেন আমরা না ভুলি। রবীন্দ্রনাথ যুক্তফ্রন্ট-শাসিত রিপাবলিকের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কেননা, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেণীর গণতান্ত্রিক মানুষের সংগ্রামী ঐক্যই হলো সেই যুক্তফ্রণ্টের মিলনমঞ্চ। ঘরে বাইরে

প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এখনও সেই সংগ্রাম। এবারের রবীন্দ্রজন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরব।

রবীন্দ্রনাথ এই বাঙলাদেশেও 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ'র প্রথম সভাপতি ছিলেন। তাঁর সেই ভূমিকাকে নতুন করে মনে করব। মিলনমঞ্চ চাই অন্ধকারের শক্তিগুলির প্রতিরোধে। লেখক-শিল্পীদেরও যুক্তফ্রন্ট। ঘরে বাইরে যুক্তফ্রন্ট।

তরুণ সান্যাল

লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সূচনা প্রসঙ্গে

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ লেনিন-জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

লেনিন বর্তমান শতাব্দীর মাপ। তাঁর সঙ্গে মেপেই আজ কি-ব্যক্তিকে কি-সমাজসমষ্টিকে পরিচয় দিতে হয়। পুঁজিবাদী সমাজকেও মানদণ্ডে উঠে জাহির করতে হয় যে, লেনিনের সমাজের চেয়ে সে খাটো নয়। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বর্তমান কালের মর্মবস্তু। প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে লেনিন প্রাচীনের বিরুদ্ধে নবীনের আন্দোলনকে সুনিশ্চিত করেন।

লেনিন সমাজ গড়ার আগে সমাজের মুখ্য উপাদান মানুষকে গড়েছেন। বলশেভিক গড়া এবং বলশেভিক পার্টিকে গড়া ছিল সবচেয়ে কঠিন কাজ। সমাজের স্বার্থে লেশমাত্র ব্যক্তিস্বার্থহীন একদল মানুষ সৃষ্টির জন্য বিশ্বকে চূড়ান্ত ভাববাদের আশ্রয় নিতে হয়। অথচ লেনিন চূড়ান্ত বস্তুবাদী দ্রষ্টা। বস্তুবাদী ভাবদর্শনে স্বপ্নচারী কর্মীদলের সৃষ্টিতে লেনিন 'ভগবান'-এর মতোই মহান হয়ে উঠেছেন।

লেনিনের জীবনই তাঁর শিক্ষা। তিনি বিজ্ঞানী। ফলে সত্য বৈ কল্পনা তাঁর ভাব-ভাষা-ভঙ্গিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ত্রিভুবন জয় করে মানুষ যে বস্তু-ও-ভাব-শক্তি অর্জন করবে, তার কল্পনা এবং পরিকল্পনাতেই লেনিন লেনিন। ১৯১৯ সালে চারপাশে গৃহযুদ্ধ ও ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে লেনিন বলেছিলেন, "আগামীকাল যদি আমরা একলক্ষ প্রথম শ্রেণীর ট্রাক্টার, এগুলির জন্য জ্বালানি ও চালক জোগাড় করতে পারি—আপনারা ভালো করেই জানেন এটা একেবারেই একটা উদ্ভট কল্পনা—তাহলে মধ্যচাষী বলবেন: 'আমি কমিউনিস্টের পক্ষে আছি'।"

বর্তমানের বুকে পা রেখে অনাগতকে সৃষ্টির পুরুষাকার-সাধনার নাম লেনিনবাদ। সেজন্যই লেনিনবাদ যেমন অজেয়, তেমনই সর্বদা চিরনূতন।

লেনিনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূজার নামে মানুষ নিজেই নিজেকে পূজা করে। মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে অর্ঘ না করে লেনিনকে শ্রদ্ধা জানাবার দ্বিতীয় কোনো উপাচার নেই। লেনিন যে-মানবমুক্তির সাধনা করেছেন, তাতে প্রত্যেকটি মানুষেরই মুক্তি।

বিপ্লবের নেতা লেনিন। বিপ্লবের মুখ্য বিষয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানেই দমনযন্ত্র। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। রাষ্ট্র বিপ্লবের এই মহৎ চিন্তা লেনিন প্রথম মর্ত্যে বপন করেছেন। মহাভারতের কল্পনাকে বিশ্বজনীন করেছেন। লেনিন যখন রুশীয়, তখন তিনি সমানভাবে ভারতীয়।

ভারতেও সমাজবাদ হবে। সেদিন দূরেও নয়। ভারতে সমাজবাদের চারা রোপণ করেছিলেন স্বয়ং লেনিন। ভারতের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বয়ং লেনিনই এদেশকে সাম্যবাদে দীক্ষিত করেছিলেন।

লেনিন-জন্মশতবর্ষে অন্ধের কাছেও পরিষ্কার যে, লেনিন ছাড়া ভারতের কোনো গতি নেই। লেনিন জন্মশতবর্ষে আমরা বাঙালিরা আরও গর্বের সঙ্গে বলি—এ-রাজ্যে লেনিনের নামে শপথকারীরাই সরকার গঠন করেছেন। লেনিনের শিক্ষা নিলেই লেনিনবাদীদের জয়যাত্রা অব্যাহত হবে। লেনিন-জন্মশতবর্ষে লেনিনবাদের সেই শিক্ষার প্রসারই আমাদের জীবনের ব্রত হবে।

জ্যোতি দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর জয়ন্তী উৎসব

গত ২৮এ মার্চ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ ভবনে বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার অন্যতম পীঠস্থান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর ৭৫তম বর্ষ

জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন হয়। চারদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন বাঙলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী।

২৮এ মার্চ অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সভাপতির ভাষণে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার পরিষদ প্রতিষ্ঠার আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথি কবি নরেন দেব সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলেন, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চা হলেই এদেশে বিজ্ঞানের প্রসার সম্ভব। তিনি বাঙলা সাহিত্যে আরও বেশি করে চলতি ভাষা প্রয়োগের আহ্বান জানান এবং সাহিত্য পরিষদকে এই ব্যাপারে যথাযোগ্য ভূমিকা নেবার জন্য অনুরোধ করেন।

টেরাকোটা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ভাস্কর-শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। তিনি বলেন, কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর মনোভাবও দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। বাঙলার শিল্পীদের উপযুক্ত মর্যাদাদানের জন্য তিনি উপস্থিত সকলের কাছে আবেদন জানান।

২৯এ মার্চ শনিবার 'বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা' আলোচনা-সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীপরিমলবিকাশ সেন। অধ্যাপক রাম-গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, সুহৃদচন্দ্র সিংহ প্রমুখ আলোচনা করেন।

পরিভাষা-সৃষ্টির কাজে আমাদের অগ্রগতির বিবরণ পেশ করে অধ্যাপক বলেন, বাঙলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার অগ্রগতি হলেও পরিভাষা-সৃষ্টির কাজে এখনও নানা সমস্যা বর্তমান। ইলেকট্রিক, পজিটিভ, নেগেটিভ, প্লাগ, ফিউজ, সকেট, সুইচ, অ্যানোড, ক্যাথোড, অ্যাটম প্রভৃতি বাঙালির বহু পরিচিত শব্দগুলিকে তিনি অবিকৃতভাবে বাঙলা ভাষায় স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী।

বাঙালি গবেষকরা তাঁদের মৌলিক গবেষণাপত্র বাঙলা না ইংরেজী কোন ভাষাতে রচনা করবেন অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ইংরেজী ভাষাকেই এক্ষেত্রে আমাদের বাহন করতে হবে, কারণ এই ভাষাই বর্তমান পৃথিবীতে অধিক সংখ্যক লোকের নিকট

গ্রাহ্য। বিজ্ঞান-প্রচারে মাতৃভাষার ব্যবহারে তিনি বিজ্ঞান-সেবক ও বিজ্ঞান-অনুরাগী সকলকেই আরো বেশি যত্নবান হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

শ্রীসুহৃদচন্দ্র সিংহ তাঁর বক্তৃতায় মনোবিজ্ঞানের জটিল কথাগুলিকে সহজ-বোধ্য ভাষায় প্রচার করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি শ্রীপরিমলবিকাশ সেন তাঁর ভাষণে বলেন, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব, এই কাজে আকস্মিক সাফল্য লাভ আশা করা যায় না। এই কাজের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিবেশ বিশেষ জরুরি।

৩০এ মার্চ 'বাঙলার কথাসাহিত্য' সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, বর্তমানের অধিকাংশ সাহিত্যিকই বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতাবাদে আক্রান্ত। যুগযন্ত্রণা ও জীবনের অতলান্ত গভীরের সত্যতা নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে অনেকেই অপারগ। এজন্যেই তাঁদের সাহিত্য রসোত্তীর্ণ-কালোত্তীর্ণ হতে পারবে না। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তীকালে রচিত পাশ্চাত্যের সাহিত্যও এই রোগে আক্রান্ত। নিছক ব্যবসায়িক চাহিদা মেটাতেই সেখানকার অধিকাংশ সাহিত্যিক সচেষ্ট। স্বাধীনতা-পরবর্তী-কালে যে-গভীর নিরাশা-হতাশা থেকে আমাদের দেশে শূন্যতাব সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরাকরণে বর্তমানের সাহিত্যিকরা অক্ষম, উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বেরও সবিশেষ অভাব। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় পরিশেষে প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বলেন, সাহিত্যিকদেরই বিশেষভাবে যত্নশীল হয়ে এই সব-কিছুর উপযুক্ত কারণ খুঁজে বার করতে হবে যাতে বর্তমান নৈরাশ্য থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সাহিত্য পরিষদকে তিনি এ-ব্যাপারে উপযুক্ত ভূমিকা নেবার জন্য আহ্বান জানান।

বাঙলা কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি ফ্যাশনধর্মী আর্টের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বিভিন্ন দেশের কবিতার সঙ্গে বাঙলা কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করেন।

এই দিনের আলোচনার উদ্বোধন করেন ডক্টর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে বর্তমান কালের লেখকদের যোগাযোগকে নিবিড় করার আবেদন জানান। সভাপতি শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এক বিস্তৃত আলোচনা করেন। শ্রীপ্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতিও এই দিনের আলোচনায় অংশ নেন।

৩১এ মার্চ সোমবার 'বাঙলা প্রবন্ধ সাহিত্য' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রাবন্ধিকদের প্রবন্ধে যে-মননের পারিপাট্য ও সৃজনধর্মের স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যেত, বর্তমানের প্রবন্ধ-সাহিত্যে তা বিরলদৃষ্ট।

'বাঙলার লোকশিল্প' সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীপ্রভাস সেন বাঙলার গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির দ্রুত অবলুপ্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি লোকশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি বাঙলার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র 'বাঙলার সঙ্গীত' সম্পর্কে দীর্ঘ ও মরমী আলোচনা করেন।

চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রতিদিনই সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল আগ্রহের সঙ্গে বক্তাদের বক্তব্য শোনেন।

মহৎ আদর্শ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো মনস্বী এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল প্রাণবন্ত ধারাটির সঙ্গে পরিষদের সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এলো। কখনো মনে হলো সেটি বুঝি একেবারেই লোপ পেয়েছে। অবশেষে এই প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল মুষ্টিমেয় গবেষক বা সাহিত্য পরিষদ কি তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বা আছে এমন কিছু ব্যক্তির এক চক্রবিশেষ।

অথচ বাঙলাদেশের সারস্বত সাধনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। 'ভারতকোষ'-এর সাম্প্রতিক প্রকাশ যত বিলম্বিতই হোক, কোনো কোনো সুধীজনমহলে তার সম্পাদনা সম্পর্কে যত অভিযোগই উঠুক—নিঃসন্দেহে এই কোষগ্রন্থাবলী আমাদের এক সম্পদ।

কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের প্রত্যাশা আরও অনেক বেশি। বাঙলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরও জীবন্ত হওয়ার প্রয়োজন আমরা নিয়ত অনুভব করি। বিশেষত এখনকার তরুণ সংস্কৃতি-সাধকদের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পর্ক অবিলম্বে স্থাপিত হওয়া

প্রয়োজন। নইলে এই প্রতিষ্ঠান কালক্রমে এক ধরনের যাদুঘরে পরিণত হবে। আর তা হবে গোটা বাঙলাদেশের দুর্ভাগ্য।

আশা করি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৭৫তম জন্মজয়ন্তী বৎসরে আমাদের সশ্রদ্ধ বেদনার্ত ও আন্তরিক এই সমালোচনা এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে আত্মজিজ্ঞাসু করবে ও পরিণামে পরিষদকে নতুনভাবে বাঁচবার প্রেরণা যোগাবে।

কমল সমাজদার

বিশ্বশান্তি সংসদের কুড়ি বৎসর ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যশান্তি সম্মেলন

১৯৪৮ সালে পোলাণ্ডের রকলো শহরে সমগ্র পৃথিবীর ৭৫জন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী মিলে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে এক আবেদন জানালেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পল এলুয়ার, লুই আরার্গ, বার্নাল আর জোলিও কুরীর মতো সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তপাত ও বীভৎস হত্যাকাণ্ড তাঁরা সহজে ভুলতে পারেননি। ফ্যাসিবাদের নগ্ন বর্বরতার কথাও তাঁদের স্মরণে ছিল। তাছাড়া, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও তার জের তখনও মেটেনি। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে চলছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। ঠাণ্ডা লড়াইকে ক্রমশ জোরদার করা হচ্ছে। আণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ বিধ্বংসী ফলাফল মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইসমস্ত মানবপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তিত করে তুলেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই রকলো শহর থেকে তাঁরা পৃথিবীর মানুষের কাছে আকুল ও আন্তরিক আবেদন জানালেন: পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের মানুষ অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হোন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে একই সঙ্গে প্যারিস ও প্রাগ শহরে প্রথম বিশ্বশান্তি সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো।

স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী শিবির এই মহাসম্মেলনকে ভালো চোখে দেখেনি। সম্মেলনের সাফল্য তাদের রীতিমতো চিন্তিত করে তুলেছিল। কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতেই নয়, জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলিতে

এবং এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতেও শান্তি সম্মেলনের পক্ষে বিপুল জনমত তৈরি হয়েছিল। এমনকি খোদ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকেও বিভিন্ন প্রগতিশীল গণসংগঠন এতে প্রতিনিধি পাঠানোর জন্ম প্রস্তুত হচ্ছিলেন; তাঁদের কেউ কেউ গোপনে সম্মেলনে পৌঁছতে পেরেছিলেন, আর অনেকেই দেশবিদেশে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন।

১৯৪৯-এর জুলাই-এর প্রথম সম্মেলনের পর থেকেই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তার গতি কখনও তীব্র কখনও মন্দীভূত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের চোখরাঙানি শান্তি আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারেনি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিবিরে মতপার্থক্যের ফলে অনেকক্ষেত্রেই হয়তো কমবেশি পরিমাণে ক্ষতি এড়ানো যায়নি। তথাপি বিশ্বশান্তি আন্দোলনের কুড়ি বছরের ইতিহাস নিঃসন্দেহে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির জয়যাত্রার ইতিহাস। আর-একটি বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা পরিণতি, পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বীভৎস পরিণাম, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম যুদ্ধ বাধানোর চক্রান্ত এবং সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে নয়া-উপনিবেশবাদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বশান্তি আন্দোলনই প্রথম পৃথিবীর মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করে দেয়। অতি সম্প্রতিকালেও বিশ্বশান্তি সংসদ ভিয়েতনামে আমেরিকার বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে শুধু তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর বিরুদ্ধে সংগঠিত গণমতও গড়ে তুলেছে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখবার জন্ম শান্তি সংসদ আরব জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং আফ্রিকায় পোর্তুগীজ উপনিবেশসমূহ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনও যে পৃথিবীর মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিশ্বশান্তি সংসদ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে—এসমস্ত ঘটনা তারই প্রমাণ।

এবছরের জুন মাসে বার্লিন শহরে বিশ্বশান্তি সংসদের বিংশতিবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে গত এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লীতে 'শান্তির জন্ম জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। দেশবিদেশের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্ত ও নয়া-উপনিবেশবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা এবং আফ্রিকা-এশিয়ার দেশগুলির মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

ভারতবর্ষের শান্তি-আন্দোলনের পক্ষে এই সম্মেলন আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বশান্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনের বহু পরীক্ষিত কর্মী রমেশচন্দ্রকে এখানেই লেনিন শান্তি পুরস্কার দেওয়া হলো। বিশ্বশান্তি আন্দোলনের ইতিহাসে ভারতবর্ষের গৌরবময় ভূমিকার এই বোধহয় শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২৩ থেকে ২৫ মে কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শান্তি-সম্মেলন হয়ে গেল। ২৩ মে সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টায় কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। পশ্চিমবঙ্গ শান্তিসংসদ-এর সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন। বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল ভারত শান্তিসংসদ-এর সভাপতি শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন এম. পি., দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস-এর সভাপতি ঈসপ পাহার প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ২৫ মে সন্ধ্যাবেলায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের প্রকাশ্য অধিবেশনে সম্মেলনের সমাপ্তি হলো। প্রকাশ্য অধিবেশনে সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, শ্রী কে. ডি. মালব্য ও শ্রীভূপেশ গুপ্ত ভাষণ দেন। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি ঈসপ পাহারও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। ভিয়েতনাম, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পোর্তুগীজ উপনিবেশগুলির সমস্যা ছাড়াও এই সম্মেলন থেকে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের নয়া-উপনিবেশবাদী চক্রান্তের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্যও এই সম্মেলন গভীরভাবে চিন্তা করে।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দিবস

আজ থেকে ঠিক চব্বিশ বছর আগে সোভিয়েত লালফৌজের নেতৃত্বে বিশ্বের জনগণ ফ্যাসিবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হানে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে সোভিয়েত লালফৌজ হিটলারী ফ্যাসিবাদকে নির্মূল করে যেদিন বার্লিনে প্রবেশ করল, সেদিন থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা।

বিশ্বের মানুষ প্রায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ নাৎসিদের বিরুদ্ধে মানবজাতির চূড়ান্ত বিজয়।

ফ্যাসিবাদের এই ধ্বংসস্তূপের উপরে কুড়ি বছর আগে গড়ে উঠল এক নতুন জার্মান রাষ্ট্র। সে-রাষ্ট্রের নাম জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র। শান্তি ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই এর অন্যতম লক্ষ্য। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান যেন এক পরম ঐতিহাসিক সত্যকেই তুলে ধরেছে

হিটলার আজ মৃত। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট ফ্যাসিবাদের প্রেতাত্মা এখনও অনেক জায়গাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানিতে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে। পুরনো নাৎসিদের সেখানে আবার উঁচু পদে বসানোর চেষ্টা হচ্ছে। নয়া-নাৎসিরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক জার্মানির অস্তিত্ব বিপন্ন করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। চব্বিশ বছর আগে যে-দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির প্রথম জয়ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল, সেই দেশের মাটিতে নয়া-নাৎসিবাদের জন্ম সত্যিই রীতিমতো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

শুধু পশ্চিম জার্মানিতেই নয়। হিটলারের ফ্যাসিবাদের যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামের জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরতম আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা—এই সমস্ত জায়গার মানুষদেরও নয়া ফ্যাসিবাদের জঘন্য আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একটা ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার থাকা দরকার। বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদ বিভিন্ন নামে ও আকৃতিতে দেখা গেলেও তার স্বরূপ সর্বত্র প্রায় একই রকম। এর বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে আজ প্রত্যেকটি মানুষের রুখে দাঁড়ানো দরকার। চব্বিশ বছর আগে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র মানবজাতি যে-মহান জয়লাভ করেছিল, তার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান পৃথিবীতে যেখানেই মানুষ নয়া-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছে—তার প্রতি সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি জানানো আমাদের একান্ত কর্তব্য।

এই উদ্দেশ্যেই গত ১৫ই মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গণসংগঠন ও শিল্পী-সাহিত্যিকের আহ্বানে এক সভা হয়েছিল। এই সভায়

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবজাতির মহান বিজয়কে স্মরণ করা হয় এবং নয়া-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের যে-সংগ্রাম—তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। এই সভায় উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ও মৎস্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায়। সভার শেষে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

গ্রহণ করতে হবে সময়ের চ্যালেঞ্জ

'অশোককুমার নাইট'-এর তাণ্ডবের পর উত্তমকুমারের রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযান—চমকপ্রদ সব ঘটনা ঘটছে আমাদের এই আজব শহর, কলকাতায়! তবু এই নিয়ে লঘু পরিহাসে মাততে বা প্রবীণদের মতো "দেশটা সত্যিই গোল্লায় গেল"-র শস্তা ধুয়োয় গলা মেলাতেও মন সরে না। কারণ ব্যাপারটা বাস্তবিকই গুরুতর। এতো গুরুতর যে, এ-প্রসঙ্গে হাল্কা রসিকতা বা অভ্যস্ত হা-হুতাশের আর অবকাশ নেই। বরঞ্চ হালে চারদিকেই যে হাল্কা মনোভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে—ঠিক তার বিরুদ্ধেই এই বক্তব্য পেশ করছি বাংলাদেশের বামপন্থী অভিমানের দরবারে।

যে-সংস্থার নাম 'Young's Corner', তারা তো 'Ashoke Kumar Nite'-এর আয়োজন করতেই পারে। কিন্তু তাতে যখন বেলা দুপুর থেকে কলকাতার প্রতিটি পাড়া ও অনতিদূরের মফঃস্বল শহরগুলি পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই তরুণ-তরুণীরাই চলচ্চিত্র তারকার টানে উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসতে থাকেন—যাঁদের অনেকেই হয়তো রাজনীতির দিক থেকে বামপন্থার সমর্থক—তখন ব্যাপারটায় খটকা লাগে না কি? সে-অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেসব অনাচার বা গুণ্ডামি ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলি এখন তদন্ত কমিশনের বিচার্য—তাই এখানে সে-বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু অমন নামের সংস্থার অমন এক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বামপন্থী মহলের কর্তাব্যক্তিদের নাম আদৌ জড়িত থাকে কেন? তেমনি, উত্তমকুমারকে দেখলে পাড়ার

রকবাজেরা "গুরু, গুরু" করে ওঠে—সেটা বুঝি। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিংস-এর কর্মচারীরাও যখন ঐ তারকা দর্শনের উন্মত্ততায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ বন্ধ করে বসেন, তখন ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় না কি? কারণ কে না জানে যে ড্যালহাউসি স্কোয়ার অঞ্চলে তাঁরাই হলেন বামপন্থার সুবিদিত পৃষ্ঠপোষক? আর এটা যে ক্ষণিকের একটা স্খলনমাত্র নয়, তাও বোঝা যায় তাঁদের অধিকাংশই কি বই পড়েন, কি নাটক অভিনয় করেন, কি সিনেমা দেখেন বা কি গান শোনেন, তার একটু খবর নিলেই।

একটা ব্যাপার ঘটে চলেছে আমাদের চোখের সামনে। গত কয়েক বছরে আমাদের রাজনীতির সুর যেমন বামপন্থার পর্দায় উত্তরোত্তর চড়তে থেকেছে, তেমনি ঐ সময়ে অন্যদিকে এক ধরনের হাল্কা, অর্থহীন হুল্লোড়বাজি চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের পেয়ে বসেছে। আর, এই দুই প্রক্রিয়া যুগপৎ চলার ফলে এক কিম্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে—মানুষ, বিশেষ করে তরুণেরা, আনন্দ করবেন না, গোমড়া মুখে সর্বদাই তত্ত্বকথা আলোচনা ও দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধন করবেন। কিন্তু আনন্দ মানে কি এই অর্থহীন হুল্লোড়বাজি? এ-ধরনের চ্যাংড়ামি, ছ্যাবলামির লক্ষণ সমাজে বরাবরই কিছুটা দেখা যেত। কিন্তু সেসব চলত আনাচে কানাচে, আড়ালে আবডালে, এখনকার মতো বুক ফুলিয়ে সমাজের গোটা আঙিনা জুড়ে নয়। এবং শুধু এইসব দুর্লক্ষণের ব্যাপকতাই নয়, সেইসঙ্গে আরো আশঙ্কার কথা এই যে—আজ বামপন্থার প্রভাবাধীন এলাকাও এর সংক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। অবশ্য এমন নয় যে বামপন্থী প্রভাবের পরিধি এখন একাকার হয়ে গেছে এই হুল্লোড়বাজির পরিধির মতো। নিশ্চয়ই তা হয়নি। কিন্তু দুই বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করায় যে এখন দুই বৃত্তেরই অন্তর্ভুক্ত একটা এলাকার উদ্ভব হয়েছে—যার বাসিন্দাদের এক হাতে বিপ্লবের ঝাণ্ডা, অন্য হাতে ঢাউস সিনেমা অথবা 'জনপ্রিয়' পত্রিকা—সে-কথা আর অস্বীকার করা চলে কি?

অথচ আমরা জানি যে বামপন্থা শুধু সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক কিছু কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-আদায়ই নয়, একটি সমগ্র way of life বা জীবন-যাত্রা-প্রকরণ; আর তার পিছনে যে মতাদর্শ—তাও কতগুলি সর্বদোষহর মন্ত্র নয়, যার অবিরাম উচ্চারণেই সমস্ত মুস্কিলের আসান ঘটে। মানব-সভ্যতা-বিকাশের গতিপথে উদ্ভূত বহু মূল্যবান মানবিক মূল্যবোধে সে-মতাদর্শ সুসমৃদ্ধ।

তবে এ-ধরনের বিপত্তি ঘটেছে কি করে, আর কি করেই বা একে প্রতিহত করা যাবে ?

ঘটছে, আমরা ঘটতে দিচ্ছি বলেই। এ-কথা ঠিক যে অসমাপ্ত জাতীয় বিপ্লবজাত ব্যাপক হতাশা ও বিভ্রান্তি থেকেই এ-সবের জন্ম। এও ঠিক যে, দেশীবিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীর দল এতে অবিশ্রাম সর্ববিধ ইন্ধন যোগাচ্ছে। দুর্ভাগ্য এই যে, পরিস্থিতির এই সঠিক বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত টানছি যে জাতীয় বিপ্লব সমাধা করার আগে এইসব গৌণ সমস্যার কোনো সমাধানই সম্ভব নয় এবং এ-প্রসঙ্গে তাই তার আগে আমাদের কিছু করণীয়ও নেই। আর, একবার এই সহজসাধনের পথ ধরলে এমন কথাও ক্রমে মনে করা বিচিত্র নয় যে—এধরনের অর্থহীন হুল্লোড়বাজি বা নৈরাজ্যবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়তো এমনকি বিপ্লবের সহায়কও কিছুটা হতে পারে। এর থেকেই আসে এ-ক্ষেত্রে প্রশ্রয়, অন্তত ঔদাসীন্য ও নিশ্চেষ্টতার প্রবণতা।

এমন চিন্তা যে মারাত্মক তা বলাই বাহুল্য। কারণ, বাস্তব অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে যত পরিপক্কই হোক না কেন, তার সঙ্গে তাল রেখে বিপ্লবী চিন্তা যদি না অগ্রসর হতে পারে, বরং নানারকমের হাল্কা হুল্লোড়বাজির সঙ্গে আপোষ করেই চলে—তাহলে শেষ পর্যন্ত বিপ্লব নয়, প্রশস্ত হবে প্রতিবিপ্লবেরই পথ।

সুতরাং এই ব্যাপারে বামপন্থী মহলের প্রশ্রয় তো বটে, এমন কি নিশ্চেষ্টতারও ফল আখেরে সাংঘাতিক দাঁড়াতে পারে।

তবে কি আইনের বা পুলিশের সাহায্যে এসব প্রতিহত করতে হবে ? আমরা জানি চিন্তাভাবনা বা সাহিত্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপার নেহাতই চরমে না উঠলে আদালত বা পুলিশের হস্তক্ষেপ বিশেষ করে অবাঞ্ছনীয়। তাই পুলিশ দিয়ে 'মুক্তমেলা' বন্ধ করা বা সাহিত্যে অশ্লীলতা কতটা ঢুকল-না-ঢুকল তা পরখ করার জন্য লেখককে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সবসময় ঠিক নয় বলে মনে হয়। কিন্তু তার মানে নিশ্চয়ই এও নয় যে, ঐ হুল্লোড়বাজিকে সর্বত্র অবাধে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া যেতে পারে।

সুতরাং প্রয়োজন সমস্ত প্রশ্রয়ের মনোভাব ও নিশ্চেষ্টতা কাটিয়ে বামপন্থার তরফ থেকে অবিলম্বে এই ধরনের চিন্তা ও তৎপরতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও তার বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পাল্টা অভিযান পরিচালনা। সে-অভিযান নিশ্চয়ই শুধু

নেতিবাচক হবে না, বরঞ্চ মূলতই হবে সদর্থক। অর্থাৎ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এটা চাই না বলাই শুধু নয়, হাতে কলমে দেখানো দরকার কি আমরা চাই। আর শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে যা চাই, তাকে যুক্তি দিয়ে তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই যথেষ্ট নয়। সেখানে সৃষ্টিকে উত্তীর্ণ হতে হবে রসের বিচারেও। সেখানে তাই প্রভূত বৈচিত্র্য ও পরীক্ষার স্থান নিশ্চয়ই থাকবে—ছক ও বাঁধা বুলি সেখানে অচল।

ফরমাসটা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের। কিন্তু উপায় নেই। কারণ এর বিকল্প হচ্ছে বর্তমানে চালু সহজসাধনের মারাত্মক পথ। তবে এক্ষেত্রে কি ধরনের যুক্তফ্রন্ট সম্ভব, সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকেই তার দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আর সে-দৃষ্টান্ত দূরেরও নয়। বাঙলাদেশ যখন অখণ্ড ছিল, তখন একদা এ-রাজ্যের বামপন্থীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন মার্কসবাদী ভাবনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত পশ্চিমের সাহিত্যলোক থেকে। প্রেরণা পেয়েছিলেন গর্কি, মায়াকোভস্কি, শোলোকভ, রলাঁ, আরাগঁ, এলুয়ার, কর্নফোর্ড, কডওয়েল, ফকস, স্টায়েনবেক, হেমিংওয়ে, ফাস্ট, নেরুদা, নিকলাস গীলেন, নাজিম হিকমত-এর কাছ থেকে। তার পাশাপাশি তাঁরা তাকিয়েছিলেন আমাদের উনিশ শতকের ঐতিহ্যের সদর্থক দিকগুলির বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের দিকে। আর কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল লোককলা-লোকসাহিত্যের গুপ্তধন সন্ধানেরও।

পদ্মার ওপারে আজ হয়তো আমাদের চাইতেও জটিল ও প্রতিকূল অবস্থায় যে-বামপন্থা ক্রমেই সংহত হচ্ছে—তার পতাকাতেও দেখি আন্তর্জাতিক মহারথীদের পাশাপাশি তাঁরা সগৌরবে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের নাম, প্রাণ দিয়েছেন অকাতরে বাঙলা ভাষার মান রাখতে। আর বাঙলা একাডেমি মারফৎ সেখানে লোকসাহিত্যের ঐশ্চর্যসন্ধানের জন্য যে-কাজ চলছে, তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত রয়েছে সেখানকার বামপন্থা।

পদ্মার এপারে আমাদের তারুণ্য কি এ-থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করবেন না ?

চিন্মোহন সেহানবীশ

রাজ্য ক্ষেতমজুর সম্মেলন

"এই যে ঝিঙে পটলের তরকারি খাচ্ছেন, এই ঝিঙে আর পটল সম্মেলনে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন ক্ষেতমজুর ভাইয়েরা !"

"কোথা থেকে ?"

"চূর্ণি এবং গঙ্গার মাঝখানে যে চর পড়েছে, আড়াইশ ক্ষেতমজুর এবং গরীব চাষী সেটা দখল করেছেন। এখনও তাঁদের দখলিস্বত্বের আন্দোলন চলছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা তরকারির চাষ শুরু করে দিয়েছেন।"

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষেতমজুর সম্মেলনের মণ্ডপের পাশে একটুখানি খাওয়ার জায়গা, আহার্যও সামান্য। কিন্তু আমার কাছে তার মূল্য বেড়ে গিয়েছিল উপরোক্ত কথোপকথনের পরে। কটা কথার মধ্যেই ক্ষেতমজুর আন্দোলনের জীবন্ত চরিত্র পরিস্ফুট। পশ্চিম বাঙলার নতুন পরিস্থিতিতে এক নতুন আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে। এ তার সূচনা।

এই আন্দোলন সেই শ্রেণীর মানুষের, যাঁরা কাজ করেন সব চেয়ে বেশি, খেতে পান সব চেয়ে কম। মুখবুজে যত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন, তত কম মজুরি পান। যত বেশি করে কাজ খোঁজেন, তত বেশি সময় বেকার বসে থাকেন। যাঁরা জমিতে হাত না দিলে সোনার ফসল ফলে না, তাঁদের হাতে এক বিন্দু জমি নেই। যাঁদের সব চেয়ে বেশি শিক্ষার আলো প্রয়োজন, তাঁদের মধ্যে অশিক্ষার অন্ধকার তত বেশি প্রগাঢ়। যাঁদের মধ্যে দারিদ্র্যজনিত রোগের প্রকোপ সমধিক, তাঁরা পান সব চেয়ে কম চিকিৎসার সুযোগ। প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দুর্ভোগের তাঁরা এক নম্বরের শিকার। আবার এইসব কারণেই তাঁরাই পল্লী-অঞ্চলে বিপ্লবের সেরা শক্তি। তাঁরা গরীব এবং মাঝারি কৃষকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জোতদারদের জমি দখল এবং কৃষির উন্নতি সাধনের আন্দোলনে অংশ গ্রহণেও অতীব আগ্রহী। তাঁরা নড়ে উঠলে গোটা পল্লী-সমাজ নড়ে উঠবে। আর শহরের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের আন্দোলন যুক্ত হলে ?

গত ২রা থেকে ৪ঠা মে সমাজের সব থেকে নিচুতলার মানুষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল নদীয়া জেলার চাকদহের ঘেঁটুগাছি অঞ্চলের গোটরা গ্রামে। পথের উপর তাঁরা দুজন শহীদের নামে দুটি গেট তৈরি করেছিলেন—আনন্দ হাইত তোরণ এবং নূরুল ইসলাম তোরণ। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং,

মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ ছাড়া আর সব কটা জেলা থেকেই ক্ষেতমজুর প্রতিনিধি এসেছিলেন। মোট ১৮৫ জন। দর্শকের সংখ্যা ১০০ জন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবক যাঁরা নিষ্ঠা এবং নিপুণতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যাও ১০০ জন।

গত মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাস দেড়েক আগে হাওড়ার আন্দুলে ক্ষেতমজুরদের প্রথম সম্মেলন হয়। সেদিক দিয়ে এটা দ্বিতীয় সম্মেলন। প্রথম সম্মেলন হয়েছিল পাঞ্জাবে সারা ভারত ক্ষেতমজুর সম্মেলনের ঠিক প্রাক্কালে। তখনো ক্ষেতমজুর সংগঠন গড়া সম্পর্কে হয়তো বা কিছু কিছু কর্মীর মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। প্রথম সম্মেলনকে তাই প্রস্তুতিপর্ব বলা যায়। দ্বিতীয় সম্মেলন ক্ষেতমজুরদের সুচিন্তিত গঠনতন্ত্র, সাংগঠনিক কাঠামো এবং দাবি-সনদের পূর্ণতর রূপ দিতে পেরেছে।

ক্ষেতমজুর প্রতিনিধিদের খোলাখুলি আলোচনায় সর্ববিধ সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র ক্ষোভের অভিব্যক্তি দেখেছি। এ থেকে তাঁদের যে কটা দাবি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে : মজুরি বৃদ্ধি, সারা বছর কাজ, জমি এবং বাস্তুভিটা পাওয়ার অধিকার, শস্তায় খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ। বেকারীর যন্ত্রণালাঘবের জন্য বেকারভাতা এবং রিলিফের দাবিও উঠেছে। মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য ঋণমুক্তির আইন পাশের দাবি করা হয়েছে। দাবি উঠেছে স্বল্পসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চাই এবং সর্বপ্রকার কর থেকে ক্ষেতমজুরদের রেহাই দিতে হবে। বলা বাহুল্য, ভারতে বিশেষ অবস্থায় সমাজজীবন থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং সকলের জন্য সমান সামাজিক অধিকার অর্জন ক্ষেতমজুর আন্দোলনের একটা জরুরি দাবি বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বাঙলাদেশে অন্যান্য যেসব ক্ষেতমজুর এবং কৃষক সংগঠন আছে, তাদের প্রত্যেকের কাছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করার আবেদন জানানো হয়েছে। আর জমি দখল এবং কৃষির উন্নতিকল্পে কৃষক সমাজের ব্যাপকতম অংশের আন্দোলনে সামিল হওয়ার এবং তাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। জোতদার, মহাজন এবং ধনী কৃষকেরা যাতে অন্যান্য কৃষক এবং গণতান্ত্রিক মানুষ থেকে ক্ষেতমজুরদের বিচ্ছিন্ন করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

ক্ষেতমজুররা বৃহত্তর সমস্যার কথাও আলোচনা করেছেন। তাঁরা ব্যাঙ্ক

জাতীয়করণের দাবি তুলেছেন। তাঁদের গঠনতন্ত্রে বিপ্লবী লক্ষ্যের কথা সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়েছে : সাম্রাজ্যবাদ এবং একচেটিয়াবাদের শোষণ থেকে মুক্তি এবং জনগণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। উপনিবেশবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশের বর্ণবিদ্বেষের অবসান, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

নতুন সংগঠনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষেতমজুর সমিতি।' এর সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে শ্রীঅজিত বসু, শ্রীভূজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅনন্ত মাঝি। ৪১ জন সদস্যের একটি কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছে।

যুক্তফ্রণ্টের বিজয়োত্তর পশ্চিম বাঙলায় ক্ষেতমজুর সমিতির এই অভ্যুদয় নিশ্চয়ই পশ্চিম বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন শক্তি-সংযোজন।

গোলাম কুদ্দুস

অতীতের কথা

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিনগুলিতে ছোট-বড় বহু স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। তার কোনো কোনোটা আমাদের স্মৃতিতে এখনও জাগ্রত আছে। অধিকাংশই আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়ে গেছি। "জনসাধারণের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী" এরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু যে জনগণ ইতিহাসের রচয়িতা—তাঁদের স্মৃতি থেকে ঘটনাগুলি একেবারে মুছে যায়নি। হাট-বাজার গ্রাম-বন্দরের সাধারণ মানুষ তাঁদের অন্তরের মণিকোঠায় এখনও অনেক টুকরো ইতিহাসকে সযত্নে রক্ষা করছেন। তাঁরা অবসর সময়ে পরস্পরের মধ্যে এই সকল ঘটনার কথা আলোচনাও করে থাকেন।

১৯৩০ সালে বাঙলাদেশে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের সেই বৈপ্লবিক দিনগুলিতে গণজাগরণের ঢেউ ভারতের দিক-দিগন্ত উদ্বেলিত করেছিল। অগণিত মানুষ সে-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জ্বলন্ত বাসনায় তারা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিল, স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়েছিল অত্যাচার, বৃটিশ সরকারের সকল নির্যাতন।

ঐ ঐতিহাসিক বছরটিতে ভারতের বিভিন্ন অংশে বহু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছিল যা আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে বহুলাংশে জোরদার করেছে। স্বাধীনতা লাভের দু-দশক পরে আজ একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও ইতিহাসে তার স্থান আছে।

ভারতের এক সুদূর কোণে (বর্তমানে পূর্বপাকিস্থানের অন্তর্গত) ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমা। ১৯৩০ সালে কিশোরগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে এক ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। স্থানীয় লোকমুখে এই বিদ্রোহ 'মহাজন-বিরোধী' আন্দোলন বলে পরিচিত। আন্দোলন স্বল্পকাল-স্থায়ী এবং একটা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু এটা ছিল হাজার হাজার কৃষকের এক বিরাট উত্থান। বাঙলার গৌরব, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম পুরোধা আনন্দমোহন বসুর জন্মস্থান কিশোরগঞ্জের মানুষ ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকেই সর্বদা স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্রভাগে স্থান নিয়েছে।

১৯৩০-এর মহাজন-বিরোধী আন্দোলন কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এক নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। কিশোরগঞ্জের কৃষক হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জমিদার-জোতদার-মহাজনদের মান্ধাতা-আমলের সামন্ত-মহাজনী বা কুসীদজীবী প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সঠিক নেতৃত্ব ও যোগ্য সংগঠনের অভাবে এবং অপরদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের ফলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের স্থান দখল করে নেয় এবং আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িকতার পথে বিপথগামী করে দেয়। অবশেষে আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে মহৎ আদর্শের দ্বারা কৃষকশ্রেণী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নতুন পথে আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন—তা আজও সেখানকার কৃষকশ্রেণীর হৃদয়ের কোণে বাসা বেঁধে আছে।

প্রায় এক দশক পরে সারা ভারত কৃষক সভার নেতৃত্বে এই কৃষকগণ নিজেদের পুনঃসংগঠিত করেছিলেন। ১৯৩৯ সালে বাঙলার অবিসংবাদিত কৃষক নেতা, কিশোরগঞ্জের কৃষকগণের একান্ত আপনজন, প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা নগেন সরকার ও তাঁর সহকর্মীগণ বন্দীশিবির থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁদের মধ্যে ফিরে এলেন। সংগ্রামী কৃষকগণ পূর্ণ উদ্যমে কৃষক সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন। তাঁদের উদ্যোগে কিশোরগঞ্জে অচিরে এক বিশাল কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

হাজং কৃষক আন্দোলনের বীর নায়ক কমরেড মণি সিং তখন রূপকথার চরিত্রে পরিণত। তাঁর নেতৃত্বে সামরিক কায়দায় সুগঠিত দুই-শ হাজং কৃষকের এক জাঠা ময়মনসিংহ জেলার সুদূর উত্তর সীমান্তের গারোপাহাড় অঞ্চল থেকে প্রায় ষাট মাইল পথ রুটমার্চ করে কিশোরগঞ্জ আসে এবং সম্মেলনে যোগ দেয়। হাজং কৃষকগণ কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে ১৯৩৬ সাল থেকে এক কুখ্যাত সামন্ত প্রথা ('টঙ্ক')-র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিলেন। কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন আরো আগের ঘটনা। এই আন্দোলনই হাজং কৃষকদের সামনে এক নতুন আদর্শ ও সংগ্রামের এক বিশেষ চেহারা তুলে ধরে। সম্মেলনে তাই বীর হাজং কৃষকরা কিশোরগঞ্জের সংগ্রামী কৃষকশ্রেণীকে অভিনন্দন ও সৌভ্রাত্র জানিয়ে পূর্বসূরীদের কাছে ঋণ স্বীকার করলেন।

দীর্ঘ পনের বছর, হয়তো আরো বেশি দিন ধরে, এই বীর হাজং কৃষকশ্রেণী তাঁদের দুর্ধর্ষ শ্রেণীশক্তি সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই, এমনকি সশস্ত্র সংগ্রাম পর্যন্ত, পরিচালনা করেছিলেন। হাজং কৃষকদের মোকাবেলা করতে সামন্তশ্রেণীকে সর্বতোভাবে শক্তি জুগিয়েছিল শাসকশ্রেণীর সশস্ত্র পুলিশ ও সামরিক বাহিনী। এই অসম শক্তির সংগ্রামে হাজং কৃষকশ্রেণী তাঁদের বহু শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা পিছু হটতে বাধ্য হলেন পিছু হটলেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও নতি স্বীকার করলেন না। হাজার হাজার হাজং কৃষক সপরিবারে তুরা পাহাড় এবং আসামের অন্য একটি পাহাড় ও বনাঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। এর ফলে তাঁরা নিজেদের মধ্যেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আশ্রয় ও সম্বলহীন অবস্থায় অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও তাঁরা আজ অবধি সংগ্রামের পথ ত্যাগ করেননি। আসামের দূর-দূরান্তরের পাহাড়-অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া তাঁদের বিচ্ছিন্ন পরিবার ও সংগ্রামী শক্তিগুলিকে তাঁরা পুনঃসংগঠিত করছেন। তাঁদের বুকে এখনও প্রতিহিংসার জ্বলন্ত বহ্নি। হাজং কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকাহিনী ইতিহাসের আর-একটি অধ্যায়। সে-সম্পর্কে বারান্তরে কিছু লিখব।

ধরণী গোস্বামী

শ্রীমণি সিংহ ও শ্রীনগেন সরকার সম্প্রতি পূর্বপাকিস্তান জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দেশ বিভাগের পর থেকে উভয়ে দীর্ঘদিন গোপন জীবন যাপন করতে ও জেলে আটক থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর, কলকাতায় সম্প্রতি হাজং সংগ্রামী সহায়ক সমিতি গঠিত হয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকার অফিসেই তার অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। সম্পাদক

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন স্মরণে

ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। গ্রীষ্মের খরস্রোতে যখন রাজধানী নয়াদিল্লীর বুক রৌদ্রদীপ্ত, আমাদের জাতীয় জীবন যখন অসমবিকাশের বঙ্কিম পথপরিক্রমাজাত সঙ্কট আর সংঘর্ষের উত্তপ্ত আবেগে দ্বন্দ্বমুখর, ঠিক তখনি অকস্মাৎ মৃত্যুর কালো ছায়া গ্রাস করল নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতিভবন, ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমাদের ধর্ম-নিরপেক্ষতার শ্রেষ্ঠতম প্রতীক, জাতির কল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ডঃ জাকির হোসেনকে।

কবে, কোন শতাব্দীতে, এক পাঠান পরিবার এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে এসে নিজেদের সকল সত্তা বিলীন করে দিয়ে ভারতীয় মানবসমাজের বৈচিত্র্যময় ঐক্যের ঐতিহ্যকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের কাছে সে-কথা হয়তো আজও অজ্ঞাত। কিন্তু সেই পাঠান পরিবারের বংশধর ডঃ জাকির হোসেন যে মনে-প্রাণে ছিলেন খাঁটি ভারতীয়, ভারতবর্ষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তার অন্যতম ধারক ও বাহক, এ কথা তিনি তাঁর বাহাত্তর বৎসরের কর্মময় জীবনে বারংবার প্রমাণ করেছেন।

আলিগড়ের ছাত্র জাকির হোসেন ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে যেদিন সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার কলুষ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় 'জমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' গঠন করলেন, সেদিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী এক আদর্শ শিক্ষক। তাই ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে বৃত হয়ে তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন: উচ্চপদে আমাকে বরণ করা সম্পূর্ণভাবে না হলেও প্রধানত দীর্ঘকাল আমার দেশের মানুষের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকারই ফল।

এমনিভাবে যে-মানুষ শিক্ষকের আদর্শ উচ্চে তুলে ধরে রাষ্ট্রপতির পদকে মহিমান্বিত করতে অগ্রসর হন, রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থেকেও যিনি সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ঔদার্য আর ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যে দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, যাঁর কবিমন আর দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় উর্দু কবি গালিব ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটো সমভাবেই উপস্থিত, যিনি ছিলেন

প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ আর ফলবন্ত বৃক্ষের মতোই বিনম্রাবনত, ভারতের সেই বরেণ্য রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনকে হারিয়ে সত্যিই আমরা শোকাহত।

আমরা জানি, ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে জাতীয় জীবনে যে-স্থান শূন্য হলো, তা পূর্ণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু এই মহান জাতীয়তাবাদী দেশ-প্রেমিক ব্যক্তিজীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন—কোনো দুষ্টচক্রের হাতে আমরা তা ম্লান হতে দেবো না: সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর গণতান্ত্রিক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার উপসৌধটি রক্ষা করার পবিত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা তাঁর স্মৃতি অম্লান রাখব। এই প্রত্যয় থেকেই শোকমগ্ন জনগণের সঙ্গে যমুনার তীরে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকার গভীরে অন্তিম শয়ানে শায়িত ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

দুটি মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ

না, এ-দুটি মৃত্যু-সংবাদের জন্য আমি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। শুধু আমি কেন, উত্তর বাঙলার কোচবিহার জেলার চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকের বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রগামী যোদ্ধা, কবি-সাহিত্যিক প্রবোধচন্দ্র পালের কোনো বন্ধুই তাঁর এই অকাল-বিনষ্টির কথা কল্পনাও করতে পারেন না। তেমনি, হুগলি জেলার গণ্ডগ্রাম থেকে আসা আশ্চর্য কবিমনের অধিকারী কৈশোরোত্তীর্ণ শেখ আব্দুল জব্বারও যে এত অকালে প্রায়-নিঃশব্দে হাসপাতালের বারোয়ারী শয্যায় এমনি করে ঝরে যাবে, তাঁর কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুই এ-কথা ভাবতেও পারেননি।

কবি-সাহিত্যিক প্রবোধচন্দ্র পাল কিংবা শেখ আব্দুল জব্বার—এঁদের দুজনের কেউ-ই হয়তো তথাকথিত খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন না। এঁদের মৃত্যু-সংবাদ কোনো দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভেও সম্ভবত প্রকাশিত হয়নি। অন্তত আমার নজরে পড়েনি। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে এবং মে মাসের মাঝামাঝি লোকপরম্পরায় যখন জানলাম প্রবোধ পাল আত্মহত্যা করেছেন আর আব্দুল জব্বার প্রায় বিনা চিকিৎসায় মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করেছেন, তখন মন সত্যিই হাহাকার করে উঠেছে। আমার কেন জানি না বারংবার মনে হয়েছে, এই দু-দুটি প্রাণের অকাল-বিনষ্টি আমরা হয়তো রোধ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা পারিনি, পারার জন্য কোনো চেষ্টাও করিনি। হয়তো এই মুহূর্তে এই পারা না-পারার প্রশ্নটাই অবান্তর। কারণ, প্রগতি-সংস্কৃতি-শিবিরে যে-সংগ্রামী ঐক্য থাকলে পারস্পরিক যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে, গড়ে ওঠে শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভালোবাসায় জড়ানো দরদী মনোভাব, আমি জানি, তার থেকে আমরা এখনও সহস্র হস্ত দূরে।

অথচ আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম, সাহিত্যিক প্রবোধচন্দ্র প্রাণপণে বাঁচতে চেয়েছিলেন, জব্বারও চেয়েছিলেন তাঁর কবিমনকে বাঁচাবার জন্য সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন ও আশ্রয়।

প্রবোধচন্দ্র পাল সেই চল্লিশের দশকের শেষ দিক থেকে কোচবিহার জেলার ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃস্থানীয় সংগঠকের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেও উত্তরবঙ্গে যেমন সংস্কৃতির আলো জ্বালতে চেয়েছিলেন, তেমনি প্রগতি-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সঙ্গেও স্থাপন করেছিলেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শুদ্ধসত্ত্ব বসু সম্পাদিত 'একক' পত্রিকা, অনিল সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য' এবং পরবর্তীকালে ননী ভৌমিক সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকাসহ কলকাতার আরও অনেক পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তাঁর সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক-জীবনের অনেক স্বাক্ষর। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে এই প্রবোধ পালই ছিলেন কোচবিহারের কোনো এক কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট-সমর্থিত ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী। যতদূর জানি, বিধানসভার এই নির্বাচনে তিনি অল্প ভোটের ব্যবধানেই পরাজিত হন।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'দেয়ালা'-র সমালোচনার সূত্রে 'পরিচয়' পত্রিকা অফিসেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। তারপর দেখেছি, সাহিত্যিকরূপে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার আশায় তিনি সক্রিয় রাজনীতির মায়া কাটিয়ে এই মায়াবিনী কলকাতায় ছুটে এসেছেন সপরিবারে। ১৯৬০ সাল থেকে খুব সম্ভব ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত প্রবোধচন্দ্র এখানে টিকে থাকার জন্য প্রাণপণে লড়াই করেছেন। যৎসামান্য বেতনের বিনিময়ে 'স্বতন্ত্র' নামে একটি বাঙলা-সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা করে, নানা গ্লানি-গঞ্জনা সহ্য করেও তিনি স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়িতে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। তখনও তাঁর মনে দুর্মর আশা ছিল।

দেখেছি, তাঁর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনের পটভূমিকায় রচিত তিন-চারখানা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি কী নিষ্ঠার সঙ্গেই না তিনি বারংবার সংশোধন করেছেন! আমার এইটুকুই শুধু সান্ত্বনা যে, এক সহৃদয় প্রকাশকের সহযোগিতায় তাঁর 'শঙ্খ-হৃদয়' নামক একখানি উপন্যাস আমি শেষ পর্যন্ত প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম।

কিন্তু হায়, ব্যর্থ ও ভগ্নমনোরথ প্রবোধচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হলো সুদূর উত্তরবঙ্গের সেই চিরপরিচিত পরিবেশে। কলকাতা, প্রগতি-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা, তাঁকে পারল না আশ্রয় দিতে। তাঁর সারল্য এবং আদর্শবোধও একচেটিয়া মালিকানায় পরিপুষ্ট বৃহৎ ব্যবসার জন্য পরিচালিত এই কলকাতার অপসংস্কৃতির আড্ডাখানায় তাঁকে মিশতে দিল না। তাই হয়তো দুঃখ-বেদনা আর হতাশায় ক্লান্ত প্রবোধচন্দ্রকে উত্তরচল্লিশেই আত্মঘাতী হতে হলো। একদা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সাহিত্যিক-বন্ধুর অকাল-বিনষ্টির জন্য আমাদের বিবেক কি একটুও বিচলিত হবে না?

তরুণ কবি, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদার আব্দুল জব্বারের অকাল মৃত্যুও আমাকে ঐ একই প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। দরিদ্র চাষী পরিবারের সন্তান বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে অফুরন্ত বিশ্বাস নিয়ে পঞ্চাশের শেষ দশকে কলকাতায় এসেছিল। আশা ছিল, তাঁর কবিমনের স্বপ্ন সার্থক হবে এই কলকাতায়। তাঁকে দেখেছি 'স্বাধীনতা'-র কিশোর বিভাগে, 'পরিচয়' পত্রিকার অফিসে, 'চতুষ্কোণ' আর 'নন্দন'-এর দপ্তরে যাতায়াত করতে। তাঁর গ্রাম্য সহজ সারল্যের সঙ্গে মিশেছিল কবি-প্রতিভার আশ্চর্য এক দীপ্তি। নিজের কবিত্ব শক্তির জোরেই ষাট দশকের শুরু থেকেই আমৃত্যু এই তরুণ কবি প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিজের স্থান করে নিয়েছিল। কলকাতার নানা বিক্ষোভ মিছিলে আমি এই কবিকে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে আন্দোলিত করতেও দেখেছি।

আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ, তখন শুনেছি তাঁর দারিদ্র্য-পীড়িত জীবনের করুণ কাহিনী। কখনো কোনো প্রেসে প্রুফ দেখে, কখনো কোনো পত্রিকায় সাংবাদিকতা করে, কখনো বা এক ব্যবসায়ী বন্ধুর হিসেবের খাতা লিখে দু বেলা শুধু দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে তাঁকে প্রাণান্ত হতে হয়েছে। অথচ কী আশ্চর্য, নিজের দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে অন্য সাহিত্যিক বন্ধু কিংবা রাজনৈতিক জীবনের সহযাত্রীর যে-কোনো বিপদে-আপদে জব্বার

অসঙ্কোচে প্রসারিত করেছে তার ভালোবাসার বলিষ্ঠ হাত। শুনেছি, দাঙ্গায় নিজের জীবন বিপন্ন করেও জব্বার সেদিন অন্য এক সাহিত্যিক-বন্ধুর জীবন রক্ষা করেছে।

কিন্তু জব্বার যে অপুষ্টি আর অভাবের তাড়নায় ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল, এ-কথা তাঁর অনেক বন্ধুই জানতেন। কেউ কেউ সাময়িকভাবে তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাও আমি জানি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রাম-বাঙলার কবি-কিশোর যৌবনের পৈঠায় পা ছুঁয়ে দাঁড়াবার আগেই চিরকালের মতো পিছলে পড়ল। আমরা কেউ তাঁকে দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো এতটুকু জায়গা করে দিতে পারলাম না। আবার সেই প্রশ্ন ঘুরেফিরে মনে আসছে: আমরা কি চেষ্টা করলে সত্যিই পারতাম না জব্বারের অকালমৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে?

জানিনে কবে এ-প্রশ্নের উত্তর মিলবে। আজ শুধু স্পষ্ট অনুভব করছি, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত না হলেও প্রবোধ পালের আত্মহত্যা এবং শেখ আব্দুল জব্বারের অকালমৃত্যুর জন্য আমরা বোধহয় অংশত দায়ী; দায়ী আমাদের অসংগঠিত নগরকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব বিচ্ছিন্ন চেতনা। এই দুই কবি-বন্ধুর অকাল-বিনষ্টি ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক চেতনার দিকে আমাদের মনকে কি আজও উদ্বুদ্ধ করবে না?

ধনঞ্জয় দাশ

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে আবার এক ইন্দ্রপাত ঘটল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে গভীর শোকের সঙ্গে আমরা পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ও বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের বিয়োগের কথা স্মরণ করেছিলুম। আবার এলো রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ। বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম প্রধান প্রবক্তা রমেশবাবুর মৃত্যুতে যে-ক্ষতি হলো, তা বোধহয় অপূরণীয়।

আগেকার কালের বিখ্যাত ধ্রুপদী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রমেশচন্দ্রের সঙ্গীতশিক্ষা আগাগোড়াই পিতার কাছে। যে-বাঙলায় এককালে

ধ্রুপদ-ধামারের চল ছিল খুব বেশি, সেই বাঙলার ঐতিহ্যে ও শিক্ষাতে তিনি মানুষ। পিতার কাছে প্রথম জীবনে তিনি সেতারেও বিশেষ শিক্ষালাভ করেন।

সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিচারে রমেশবাবুর অবদান স্বীকৃত। তাছাড়া রামমোহন রায়ের আদি ব্রাহ্মসমাজের খাঁটি ধ্রুপদাঙ্গে স্তব ও স্তোত্র এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম পর্বের ধ্রুপদাঙ্গের বাঙলা গানে তাঁর সমধিক স্ফূর্তি ও ব্যুৎপত্তি ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তিনি যখন তান ও বাঁটের প্রচলন করেন, তখন কোনো কোনো মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল।

তাঁর একক কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার সুযোগ লেখকের হয়নি, তাঁদের ঘরের অন্যতম বিখ্যাত ছাত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরের কণ্ঠে কয়েকবার তান-বাঁট যুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তানগুলি সুললিত, অবলীলাক্রমে বয়ে চলছে এবং তার প্রধান কারণ, এগুলি হচ্ছে সাধারণ সাদা-মাটা সাপট তান বা কয়েকটি পর্দা পরপর সাজানো—আরোহণে-অবরোহণে। অর্থাৎ, উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল কণ্ঠসঙ্গীতে হলক, মুস্কিলাং চক্রধার, বা আড়ি-কুয়াড়ীর কাজ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রসঙ্গীতে চলবে না এবং রমেশবাবু সে-চেষ্টা কোনোদিন করেনওনি। কিন্তু ছোটো ছোটো টুকরা সোজা আরোহী বা অবরোহী তানে অনেক সময় গানের (নিশ্চয়ই যে-গানগুলি রাগনির্ভর) সৌন্দর্য খুলে যায় বলেই আমাদের ধারণা। এটি অবশ্য একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে রমেশবাবু সঙ্গীত-নাটক একাদেমির ডীন নিযুক্ত হয়ে সঙ্গীতশিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁর পুণ্য স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

দিলীপ বসু

সূচিপত্র

প্রবন্ধ :

গল্প :

কবিতা :

নাটক :

পুস্তক-পরিচয় :

চিত্রপ্রসঙ্গ :

নাট্যপ্রসঙ্গ :

বিবিধ প্রসঙ্গ :

বিয়োগপঞ্জী :

পাঠকগোষ্ঠী :

উপদেশকমণ্ডলী

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৩৮। সংখ্যা ১১
জ্যৈষ্ঠ। ১৩৭৬

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য

কাজী নজরুল ইসলাম

বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্যের দিকে একটু ভাল করে দেখলে সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তার দুটি রূপ। এক রূপে সে শেলীর Skylark-এর মত, মিল্টনের Bird of Paradise-এর মত এই ধূলিমলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গের সন্ধান করে, তার চরণ কখনো ধরার মাটি স্পর্শ করে না, কেবলি ঊর্ধ্বে উঠে স্বপন-লোকের গান শোনায়। এইখানে সে স্বপন-বিহারী।

আর এক রূপে সে এই মাটির পৃথিবীকে অপার মমতায় আঁকড়ে ধরে থাকে —অন্ধকার নিশীথে, ভয়ের রাতে বিহ্বল শিশু যেমন করে তার মাকে জড়িয়ে থাকে—তরু-লতা যেমন করে সহস্র শিকড় দিয়ে ধরণী-মাতাকে ধরে থাকে— তেমনি ক'রে। এইখানে সে মাটির দুলাল।

ধূলি-মলিন পৃথিবীর এই কর্দমাক্ত শিশু যে সুন্দরকে অস্বীকার করে, স্বর্গকে চায় না—তা নয়। তবে সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গ-লোকে যেতে চায় না। সে বলে: স্বর্গ যদি থাকেই তবে তাকে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধূলার ধরাতেই নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপণা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব। এর এ ঔদ্ধত্যে সুরলোকের দেবতারা হাসেন। বলেন অসুরের অহঙ্কার, কুৎসিতের মাতলামী! এরাও চোখ পাকিয়ে বলে: আভিজাত্যের আস্ফালন, লোভীর নীচতা!

গত মহাযুদ্ধের পরের যুদ্ধের আরম্ভ এইখান থেকেই।

ঊর্ধ্বলোকের দেবতারা ভ্রূকুটি হেনে বললেন: দৈত্যের এ ঔদ্ধত্য কোন কালেই টেকেনি।

নীচের দৈত্য-শিশু ঘুষি পাকিয়ে বলে: কেন যে টেকেনি, তার কৈফিয়তই তা চাই, দেবতা! আমরা তো আজ তারই একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই।

দুই দিকেই বড় বড় রথী মহারথী। একদিকে নোগুচি, ইয়েট্স্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি dreamers স্বপ্নচারী; আর-দিকে গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ড শ, বেনাভাঁতে প্রভৃতি।

আজকে বিশ্ব-সাহিত্যে এই দুটো রূপই বড় হয়ে উঠেছে।

এর অন্য রূপও যে নেই, তা নয়। এই দুই extreme-এর মাঝে যে, সে এই মাটির মায়ের কোলে শুয়ে স্বর্গের কাহিনী শোনে। রূপকথার বন্দিনী রাজকুমারীর দুঃখে সে অশ্রু বিসর্জন করে, পক্ষীরাজে চড়ে' তাকে মুক্তি দেবার ব্যাকুলতায় সে পাগল হয়ে ওঠে। সে তার মাটির মাকে ভালবাসে, তাই বলে' স্বর্গের বিরুদ্ধে অভিযানও করে না। এই শিশু মনে করে—স্বর্গ এই পৃথিবীর সতীন নয়, সে তার মাসিমা। তবে সে তার মায়ের মত দুঃখিনী নয়, সে রাজরাণী, বিপুল ঐশ্বর্যশালিনী। সে জানে, তারই আত্মীয় স্বর্গের দেবতাদের কোন দুঃখ নেই, তারা সর্বপ্রকারে সুখী—কিন্তু তাই বলে তার ওপর তার আক্রোশও নেই। সে তার বেদনার গানখানি একলা ঘরে বসে বসে গায়—তার দুঃখিনী মাকে শোনায়। তার আর ভাইদের মত, তার অশ্রুজলে কর্দমাক্ত হয় যে মাটি—সে মাটিকে তাল পাকিয়ে উদ্ধত রোষে স্বর্গের দিকে ছোঁড়ে না।

এঁদের দলে—লিওনিঁদ আঁদ্রিভ্, ন্যুট হামসুন, ওয়াদিশ্‌ল রেমঁদ প্রভৃতি।

বার্ণার্ড শ', আনাতোল ফ্রাঁস, বেনাভাঁতের মত হলাহল এঁরাও পান করেছেন, এঁরাও নীলকণ্ঠ, তবে সে হলাহল পান ক'রে এঁরা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, সে হলাহল উদ্গার করেন নি।

যাঁরা ধ্বংসব্রতী—তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন,—এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভোলিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল্ নলচে দু'ই বদলে একেবারে নতুন ক'রে সৃষ্টি করব। আমাদের সাধনা দিয়ে নতুন সৃষ্টি নতুন স্রষ্টা সৃজন করব!

স্বপ্নচারীদের Keats বলেন :

> A thing of beauty is a joy for ever :
> (ENDYMION).
>
> Beauty is truth, truth beauty.

প্রত্যুত্তরে মাটীর মানুষ Whitman বলেন,—

> Not Physiognomy alone—
> Of Physiology from top to toe I sing,
> The modern man I sing.

গত Great War-এর ঢেউ আরব-সাগরের তীর অতিক্রম করেনি, কিন্তু এবারকার এই idea-জগতের Great War বিশ্বের সকল দেশের সবখানে শুরু হয়ে গেছে।

দশ মুণ্ড দিয়ে খেয়ে, বিশ হাত দিয়ে লুণ্ঠন করেও যার প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি হ'ল না, সেই capitalist রাবণ ও তার বুর্জোয়া রক্ষসেনারা এদেরে বলে হনুমান। এই লোভী-রাবণ বলে, ধরণীর কন্যা সীতা ধরণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভোগ্যা, ধরার মেয়ে প্রজারপাইন যমরাজা প্লুটোরই হবে সেবিকা। সীতার উদ্ধারে যায় যে তথাকথিত হনুমান, রক্ষ-সেনা দেয় তার ল্যাজে আগুন লাগিয়ে। তথাকথিত হনুমানও বলে, ল্যাজে যদি আগুন লাগালি, আমার হাত মুখ যদি পোড়েই—তবে তোর স্বর্ণলঙ্কাও পোড়াব। ব'লেই দেয় লম্ফ।

আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে, এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে—এ আপনারা যে-কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধহয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দুর্বীনের দরকার হবে না।

রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতাকে উদ্ধার করায় পুণ্যবান মুখপোড়া হনুমান অমর হয়ে গেছে। সে আজ পূজাও পাচ্ছে ভারতের ঘরে ঘরে। আজকের লাঞ্ছনার আগুনে যে দুঃসাহসীদের মুখ পুড়ছে তারাও ভবিষ্যতে অমর হবে না, পূজো পাবে না—এ কথা কে বলবে?

এইবার কিন্তু আপনাদের সকলেরই আমার সাথে লঙ্কা ডিঙ্গাতে হবে। অবশ্য, বড় বড় পেট যাঁদের, তাঁদের বলছিনে, হয়ত তাতে ক'রে তাঁদের মাথা হেঁটই হবে।···

এই সাগর ডিঙাবার পরই আমাদের চোখে সর্বপ্রথম পড়ে—14th December—১৮২৫ খৃষ্টাব্দের 14th December. এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি: Merezhkovsky-র বেদনা-চীৎকার—"14th December!" এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি বর্বর রুশ-সম্রাট নিকোলাসের দণ্ডাজ্ঞায় সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত শতাধিক প্রতীভাদীপ্ত কবির ও সাহিত্যিকের মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস! এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুশকিনের ফাঁসির রজ্জুতে (?) লট্‌কানো মৃত্যু-পাণ্ডুর মূর্তি!

এই দিনই নির্যাতনের কংস-কারায় জন্ম নেয় অনাগত বিপ্লবী-শিশু। বীণাবাদিনী সরস্বতী এইদিন বীণা ফেলে খড়্গ হাতে চামুণ্ড-রূপ

করে। এর পরেই পাতাল ফুঁড়ে আসতে লাগল দলে দলে অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল। কেতকীবিতানের শাখায় শাখায় তুলে উঠল বিষধর ভুজঙ্গের ফণা।

এই নির্বাসনের সাইবিরিয়ায় জন্ম নিল দস্তয়ভস্কির Crime and Punishment। রাস্কলনিকভ্ যেন দস্তয়ভস্কিরই দুঃখের উন্মাদ মূর্তি, সোনিয়া যেন ধর্ষিতা রাশিয়ারই প্রতিমূর্তি। যেদিন রাস্কলনিকভ্ এই বহু পরিচর্যা-রতা সোনিয়ার পায়ের তলায় পড়ে' বল্‌লো,—"I bow down not to thee but to suffering humanity in you!" সেদিন সমস্ত ধরণী বিস্ময়ে ব্যথায় শিউরে উঠ্‌ল। নিখিল মানবের মনে উৎপীড়িতের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেনিয়ে উঠলো। টলষ্টয়ের God এবং Religion কোথায় ভেসে গেল এই বেদনার মহাপ্লাবনে! সে মহাপ্লাবনের নূহের তরণীর মত ভাসতে লাগল সৃষ্টি—প্লাবন-শেষে নতুন দিনের প্রতীক্ষায়।

তারপর এল এই মহাপ্লাবনের ওপর তুফানের মত—ভয়াবহ সাইক্লোনের মত বেগে ম্যাক্সিম গোর্কি। শেকভের নাট্যমঞ্চ ভেঙ্গে পড়ল, সে বিস্ময়ে বেরিয়ে এসে এই ঝড়ের বন্ধুকে অভিবাদন করলে। বেদনার ঋষি দস্তয়ভস্কি বললে: তোমার সৃষ্টির জন্যই আমার এ তপস্যা। চালাও পরশু, হানো ত্রিশূল! বৃদ্ধ ঋষি টলষ্টয় কেঁপে উঠলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে বলে উঠলেন: That man has only one God and that is Satan! কিন্তু এই তথাকথিত শয়তান অমর হয়ে গেল, ঋষির অভিশাপ তাকে স্পর্শও করতে পারল না।

গোর্কি বললেন: "দুঃখ-বেদনার জয়গান গেয়েই আমরা নিরস্ত হব না—আমরা এর প্রতিশোধ নেব। রক্তে নাইয়ে অশুচি পৃথিবীকে শুচি করব।"

লক্ষ কণ্ঠে "গুরুজির জয়" শব্দে আবার বাসুকীর ফণা দোল খেয়ে উঠ্‌ল।

দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস্ যে মারণ-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে! জার গেল—জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ধ্বংসক্লান্ত পরশুরামের মত গোর্কি আজ ক্লান্ত শ্রান্ত—হয়ত বা নব-রামের আবির্ভাবে বিতাড়িতও। কিন্তু তাঁর প্রভাব আজও রাশিয়ার আকাশে বাতাসে।

কার্ল মার্কসের ইকনমিক্‌সের অঙ্ক এই যাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে! পাথরের স্তূপ সুন্দর তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলেছে!

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কিনা, তা আজও বলা দুষ্কর !

রাশিয়ার পরেই আসে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া। আইডিয়ার জগতে বিপ্লবের অগ্রদূত বলে দাবী রাশিয়া যেমন করে—তেমনি নরওয়েও করে। ফ্রান্স-জার্মানীও এ অধিকারের সবটুকুই পেতে দাবী করে।

আজকের নরওয়ের ন্যুট্ হ্যামসুন—যোহান বোয়ার—শুধু নরওয়ের ওঁরাই বা কেন বলি, আজকের বিশ্বের জীবিত ছোট-বড় সব Realistic লেখকই বুঝি বা ইবসেনের মানস-পুত্র।

হ্যামসুন বোয়ারের প্রত্যেকেই অর্ধেক Dreamer, অর্ধেক ঔপন্যাসিক। যোহান বোয়ারের Great Hunger-এর Swan যেন ভারতেরই উপনিষদের আনন্দ। তাঁর The Prisoner Who Sang-এর নায়ক যেন পাপ-পুণ্যে অবিশ্বাসী নির্বিকার উপনিষদের সচ্চিদানন্দ। হ্যামসুনের Growth of the Soil-এর, Pan-এর ছত্রে ছত্রে যেন বেদের ঋষিদের মত স্তবের আকৃতি। যে করুণ-সুন্দর দুঃখের, যে পীড়িত মানবাত্মার বেদনা এঁদের লেখায় সিন্ধু-তীরের উইলো তরুর মত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—তার তুলনা জগতে কোন কালে কোন সাহিত্যেই নেই।

এই দুঃসহ বেদনা আমরা লাঘব করি লেগারলফের রূপকথা পড়ে,—মাতৃহারা শিশু যেমন ক'রে তার দিদিমার কোলে শুয়ে রূপকথার আড়ালে নিজের দুঃখকে লুকাতে চায়, তেমনি।

রাশিয়া দিয়েছে revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা, স্ক্যানডিনেভিয়া দিয়েছে অরুন্তুদ বেদনার অসহায় দীর্ঘশ্বাস। রাশিয়া দিয়েছে হাতে রক্ত তরবারি, নরওয়ে দিয়েছে দু'চোখে চোখ ভরা জল। রাশিয়া বলে এ বেদনাকে পরুষ শক্তিতে অতিক্রম করব,—ভুজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধ কারা! নরওয়ে বলেঃ প্রার্থনা কর! ঊর্ধ্বে আঁখি তোল! সেথায় সুন্দর দেবতা চির-জাগ্রত—তিনি কখনো তাঁর এ অপমান সহ্য করবেন না!

এই প্রার্থনার সব স্নিগ্ধ প্রশান্তিটুকু উবে যায়—হঠাৎ কোন অবিশ্বাসীর নির্মম অট্টহাস্যে। সে যেন কেবলি বিদ্রূপ করে! চোখের জলকে তারা মুখের বিদ্রূপ-হাসিতে পরিণত করেছে। মেঘের জল শিলাবৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে! পিছন ফিরে দেখি চার্বাকের মত, জাবালির মত, দুর্বাসার মত, দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি-কুটিল বার্ণাড শ'—আনাতোল ফ্রাঁস—জেসিঁতো বেনাভাঁতে।

তাঁদের পেছন থেকে উঁকি দেয় ফ্রয়েড! শ' বলেন: Love টাভ কিছু নয়—ও হচ্ছে মা হবার instinct মাত্র, ওর মূলে Sex. আনাতোল ফ্রাঁস বলেন: কি হে ছোকরারা! খুব তো লিখছ আজকাল! বলি, ব্যালজ্যাক জোলা পড়েছ?

বেনাভাঁতেও হাসেন, কিন্তু এ বেচারা ওঁদের মধ্যেই একটু ভীরু। লুকাতে গিয়ে কেঁদে ফেলে' Leonardo-র মুখ দিয়ে বলে—"বন্ধু! যে জীবন মরে ভূত হয়ে গেল তাকে ভুলতে হলে ভালো ক'রে কবরের মাটি চাপা দিতে হয়! মানুষের যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে ততক্ষণ সে কাঁদে, কিন্তু সব আশা যখন ফুরিয়ে যায়, সে যদি প্রাণ খুলে হেসে আকাশ ফাটিয়ে না দিতে পারে—তবে তার মরাই মঙ্গল!"

তাঁর মতে হয়তো আমাদের তাজমহল—শাজাহানের মোমতাজকে ভাল ক'রে কবর দিয়ে, ভাল ক'রে ভুলবারই চেষ্টা!

বেনাভাঁতে হাসে, সে নির্মম, কিন্তু সে বার্ণার্ডশ'র মত অবিশ্বাসী নয়।

এরি মাঝে আবার শান্ত লোক চুপ ক'রে কৃষাণ-জীবনের সহজ সুখ-দুঃখের কথা বলে যাচ্ছে—তাদের একজন ওয়াদিশ্‌ল্‌ রেমণ্ট—পোলিশ আর একজন গ্র্যাৎসিয়া দেলেদ্দা—ইতালীয়ান।

কিন্তু গল্প শোনা হয় না—হঠাৎ চমকে উঠে শুনি, আবার যুদ্ধ-বাজনা বাজছে—এ যুদ্ধ-বাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের। দেখি, তালে তালে পা ফেলে ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ত সেনা। তাদের অগ্রে ইতালির দ্যুআনন্‌ৎসিও, কিপলিং প্রভৃতি। পতাকা ধরে মুসোলিনী এবং তাঁর কৃষ্ণ-সেনা।

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাঁশীর ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ স্বপন-চারী নোগুচির গভীর অতলতার বাণী—The sound of the bell, that leaves the bell itself! তারপরেই সে বলে: "আমি গান শোনার জন্য তোমার গান শুনি না, ওগো বন্ধু, তোমার গান সমাপ্তির যে বিরাট স্তব্ধতা আনে, তারি অতলতায় ডুব দেওয়ার জন্যই আমার এ গান শোনা!" শুনতে শুনতে চোখের পাতা জুড়িয়ে আসে! ধূলার পৃথিবীতে সুন্দর স্তব-গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায়। স্বপ্নে শুনি—পারস্যের বুলবুলের গান, আরবের উষ্ট্র-চালকের বাঁশী, তুরস্কের নেকাব-পরা মেয়ের মোমের মত দেহ!

তখনো চারপাশে কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির হোলিখেলা চলে। আমি স্বপনের ঘোরেই বলে উঠি—Thou wast not born for death, immortal Bird!

প্রাতিকা

১৩৩৯।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাজচিন্তা

অমর দত্ত

বাঙলা নবজাগরণ আন্দোলনের প্রথম পথিক রামমোহন রায়ের অনুগামীদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যতম। উত্তর কলকাতায় চিৎপুর অঞ্চলে শেরবোর্ন সাহেবের কোচিং-জাতীয় বিদ্যালয়ে তাঁর ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই শিক্ষার পরিধিকে তিনি সম্প্রসারিত করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের অন্যসব মনীষীদের মতো দ্বারকানাথও ইংরেজির মাধ্যমে য়ুরোপের মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

য়ুরোপের রেনেসাঁস মানববাদ প্রতিষ্ঠার যুগ। এই মানববাদই রেনেসাঁসের সামান্য লক্ষণ। সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মান্দোলন, নারীর নবমূল্যায়ন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞান-নির্ভর শিল্পবিপ্লব, বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান, নব্যশিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি রেনেসাঁসের বৈশেষিক লক্ষণ। য়ুরোপের রেনেসাঁসের উত্তরসাধক ইংলণ্ড। সেই ইংলণ্ডের বণিকশক্তির সঙ্গে উনিশ শতকের বাঙালির প্রথম পরিচয় (অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিক সম্প্রদায়কে রেনেসাঁসের সার্থক উত্তরসাধক বলা যায় না)—আর তারই পথ বেয়ে ইংরেজের তথা য়ুরোপের চিন্তাসমুদ্রে শিক্ষিত বাঙালির অবগাহন। এই চিন্তাসমুদ্রে অবগাহন করেই দ্বারকানাথের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তাঁর সমস্ত কর্ম ও চিন্তার মধ্যে রেনেসাঁসের মানববাদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কার্যকরী পারিপার্শ্বিকের কথা মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে, নতুবা উনিশ শতকে যেসব মনীষী য়ুরোপের চিন্তাসমুদ্রে অবগাহন করেছেন, তাঁদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকমের হত।

অর্থনীতি-রাজনীতি সমাজ-নিরপেক্ষ কোনো ঘটনা নয়। সুতরাং অর্থনীতি-রাজনীতি সম্বন্ধে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুললে সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের উপর তার প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। দ্বারকানাথের পরিচয় সমাজ সংস্কারে নয়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে। কিন্তু যিনি এ দেশের

অর্থনৈতিক বিন্যাসকে য়ুরোপের আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক বিন্যাসের অনুরূপ করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি সামাজিক সংস্কারের বা আন্দোলনের সম্বন্ধে উদাস থাকবেন কেমন করে? এইজন্য রামমোহনের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনে দ্বারকানাথ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক দ্বারকানাথ নারীকে ভোগ্যবস্তুর স্তর থেকে উন্নীত করে মানবিক মর্যাদায় ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন। ইংলণ্ডে সতীদাহের বিরুদ্ধে আবেদন প্রেরণে ও এ-দেশে ঐ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা রামমোহনের মতো উজ্জ্বল নয়।

এদেশের মানুষের রাজনৈতিক চেতনার বৃদ্ধিকে দ্বারকানাথ তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ফলে এ দেশের মানুষের রাজনীতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দূরীভূত হবে। তিনি বলেছিলেন, "Let the Hindu college go on, as it has gone on, for three or four years more, and you will have a meeting like this attended by four times the number of Natives "[১]

দ্বারকানাথ সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর ধরে তিনি এই স্বাধীনতার স্বীকৃতির জন্যে সচেষ্ট ছিলেন—কেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে সুন্দর করতে হলে এই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্যর চার্লস মেটকাফের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলে তিনি লিখেছিলেন, "it strengthens their own hands and ears and eyes, in ruling this vast region, and it is also a guarantee to the people that their ruler mean to govern with justice, since they are not afraid to let their subjects judge of their acts."[২]

রেনেসাঁসের যুগে ও তার পরবর্তীকালে য়ুরোপের বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটে। প্রতিটি অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর একটি বিশেষ সমাজ-চিন্তা থাকে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে একটি তত্ত্বগত বক্তব্যের উপস্থাপনা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া অর্থনৈতিক গোষ্ঠী নিজেদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলে—যে জনমত শাসক শ্রেণীকে

বণিক সম্প্রদায়ের অনুকূল শক্তিতে পরিণত করে। এই উভয় কারণে রেনেসাঁস ও তার পরবর্তীকালে বণিক সম্প্রদায় সংবাদপত্রের মালিকানার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে। দ্বারকানাথও বাঙলা রেনেসাঁসের যুগে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন এবং Bengal Hurkura ও অন্যান্য পত্রাদির মালিক হন। য়ুরোপের বণিক সম্প্রদায়ের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি দ্বারকানাথের কার্যকলাপে সুস্পষ্ট।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, অথচ ইংরেজ শাসনে ভারতীয়দের রাজনৈতিক অবনতিতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ইংলণ্ডে কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের সভায় তিনি বলেছিলেন, "I have worked in my humble sphere under a firm conviction that the happiness of India is best secured by her connection with your own great and glorious country,"[৩]—অথচ এই দ্বারকানাথই একদিন বলেছিলেন, "they have taken all which the Natives possessed; their lives, liberty, property and all were held at the mercy of Government।"[৪] এখানেই দ্বারকানাথের সীমাবদ্ধতা। ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক অধিকারের বিনষ্টির ক্ষতিপূরণ সামাজিক অধিকারের বিস্তৃতিতে হতে পারে বলে দ্বারকানাথ মনে করতেন—কিন্তু দ্বারকানাথ যদি একটু গভীরভাবে ভাবতেন তবে অনুভব করতেন যে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ছাড়া পূর্ণ সামাজিক অধিকার সম্ভব নয়।

দ্বারকানাথ জীবন ও সম্পত্তি ভোগকে সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক অধিকার বলে মনে করতেন। Committee of Police Reform-এ সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য থেকে সেই কথা মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, দারোগা থেকে পিয়ন পর্যন্ত এ দেশের সমস্ত পুলিশ দুর্নীতিগ্রস্ত। ধনী-নির্ধন সকলকেই এদের তুষ্ট না করে উপায় নেই। জমিদার ও নীলকরদের বিরোধের সময় পুলিশ বিভাগ প্রভূত অর্থ বেআইনীভাবে উপার্জন করে। কোনো জায়গায় ডাকাতি হলে পুলিশ সেই স্থানের নিরীহ রায়তদের গ্রেপ্তার করে এবং তাদের উপর অত্যাচার চালায়। রায়তরা অর্থদান করলে অথবা করতে সক্ষম হলে এই ধরনের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়। এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে দ্বারকনাথ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের কথা বলেছেন। "To remedy the state of things complained of, Deputy Magistrates

should be appointed, either Native, East Indian or European ; and if selected from the two latter denominations, they should be conversant with the Native language, so as not to be dependent on the interpretations of the other people, but understand directly the Ryots, and when they receive any petition in the vernacular language that they may read it themselves....The appointment of these new officers should either be made by the Government or the Court of Sudder Dewany Adawlut. They should be stationed in the interior, and their powers in criminal cases should correspond with those of Moonsiffs, and they should be allowed to exercise jurisdiction over the Thanadars. The present Darogahs should be abolished, and the Thanas remodelled on the plan of those in Calcutta."[৫] দ্বারকানাথের সাক্ষ্যদান ও পরামর্শকে সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিসট্রেটদের পদসমূহ সৃষ্ট হয় এবং শিক্ষিত দেশীয়রা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদসমূহ অধিকার করে।

দ্বারকানাথ গণতান্ত্রিক অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। য়ুরোপে রেনেসাঁস-যুগে ব্যক্তির মানবিক অস্তিত্বের দার্শনিক অস্তিত্বকে স্বীকার করায় কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তির মানবিক মর্যাদাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে, ব্যক্তিকে মানবিক মর্যাদা দিতে গিয়ে গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে—এবং ধনতন্ত্রেরও। সমসাময়িক যুগে একটা উল্টো স্রোত রয়েছে—সমাজে ব্যক্তির বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যেই গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই উভয়ের সম্মিলিত স্রোতই রেনেসাঁস-যুগের অর্থনীতি-রাজনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে য়ুরোপের এইসব চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জমিদারী ব্যবস্থায় রায়তদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সীমাবদ্ধ ছিল—তাদের মানবিক মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। নীলকর সাহেবেরা এ দেশে নীল চাষ আরম্ভ করলে দ্বারকানাথ তাদের কৃষিশিল্পের অগ্রদূত বলে ভেবেছিলেন এবং নিজেও নীলচাষের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দ্বারকানাথের যুগে নীলচাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ রায়তদের চেয়ে ভালো ছিল—অবশ্য তাদের

মানবিক মর্যাদা কতখানি স্বীকৃত হত তা বলা শক্ত। কেন না দ্বারকানাথের যুগেই শ্যামচাঁদ আইনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারা যায়। (দ্বারকানাথ মনীষী হলেও তিনি মানুষ, এবং মানবিক দুর্বলতা দ্বারা কোনো না কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো নীলচাষের সঙ্গে জড়িত হয়ে অধিকতর মুনাফা অর্জন করায় তিনি নীলচাষ সম্বন্ধে অধিকতর আকর্ষণ দেখিয়েছিলেন।)

শিল্পবিপ্লবই যে য়ুরোপের শ্রীবৃদ্ধির কারণ একথা দ্বারকানাথ বুঝেছিলেন। দ্বারকানাথ আরো অনুভব করেছিলেন যে আধুনিক ব্যাঙ্কই মূলধন সরবরাহ করে য়ুরোপের শিল্পগুলিকে সুসংগঠিত করেছে। একদিকে নীলকর সাহেবদের কৃষিশিল্পের অগ্রদূত বলে মনে করে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, অন্যদিকে এদেশে য়ুরোপের অনুরূপ ব্যাঙ্ক গড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। শেষোক্ত চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী হয়ে ওঠেন। কিন্তু য়ুরোপীয় বণিকদের প্রতিকূলতায় তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রথম জীবনে এজেণ্ট হিসেবে জীবন আরম্ভ করলেও স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি দ্বারকানাথের আগ্রহ ছিল। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'নিমকের এজেণ্ট-এর পদ পরিত্যাগ করেন এবং কার এণ্ড টেগোর কোম্পানির স্বত্বাধিকারী হন। রেনেসাঁসের একটি বৈশেষিক লক্ষণ হলো বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান। উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে এদেশেও যে এক ধরনের আধুনিক বণিক-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়েছে দ্বারকানাথকে তার প্রথম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাই ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে দ্বারকানাথের বিশেষ একটা ভূমিকা আছে। দ্বারকানাথই এদেশে প্রথম য়ুরোপের Laissez-Faire তত্ত্বকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে টাউন হলের এক সভায় রামমোহন colonisation-এর প্রস্তাব করেন। এদেশ থেকে ইংলণ্ডে মূলধন রপ্তানি বন্ধ করার জন্যে তিনি ঐ প্রস্তাব করেন। য়ুরোপীয়রা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করলে বিদেশে মূলধন রপ্তানি বন্ধ হবে। এবং সেই মূলধন থেকে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। তিনি মনে করতেন য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের চিত্তবৃত্তিরও প্রভূত উন্নতি হবে। তিনি বলেছিলেন, "I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in

literary, social and political affairs." । ৬ তাছাড়া য়ুরোপীয়েরা এদেশে বসবাস করলে য়ুরোপের আধুনিক শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবাসীর অধিকতর পরিচয় ঘটবে এবং কালক্রমে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মতো এদেশেও শিল্পবিপ্লব ঘটবে। য়ুরোপীয়দের এদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের ফলে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবার লুপ্ত হবে ও প্রতিযোগিতার ফলে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটবে ; ভারতীয়রাও সেই সুযোগে আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পাবে। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনের কলোনাইজেশন প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন।

রামমোহন-দ্বারকানাথের কলোনাইজেশন প্রস্তাবের অবশ্যই সীমাবদ্ধতা ছিল। য়ুরোপীয়রা আমেরিকায় বসতি স্থাপন করলে আমেরিকার নবজন্ম হয়—রামমোহন-দ্বারকানাথ সম্ভবত ভারতবর্ষের সেইরূপ এক নবজন্মের কথা ভেবেছিলেন! এদেশে ও বিলেতে অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কলোনাইজেশনের প্রস্তাব নিয়ে এদেশের সনাতনপন্থীরা খুব হৈ-চৈ করেছিলেন। 'চন্দ্রিকা'য় এই সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল, "On receiving this intelligence, all, the great and the little, the rich and the poor, the Jumendar and the Izardar are overwhelmed in perplexity ; for if colonization be introduced into this country, the natives will be subject to many disadvantages. Our general impression is that if the English come into this country as Jumendars and Agriculturists there is a great reason to fear, that the natives will lose caste, that the means of subsistence will be destroyed, and that continual disputes will arise with the English, relative to lands."

"From the acquisition of the country by the English to this present time, the natives have lived in tranquility. There is no doubt that while the English govern the country, equity will prevail. But if they begin to share our lands and our property, much distress will follow. How shall we describe the anxiety which these measures have created." ৭

বিলেতের পত্র-পত্রিকাতেও colonisation-এর সম্বন্ধে আলোচনা হয়

এবং colonisation-এর ফলে ভারতবর্ষের পরিণতি আমেরিকার মতো হতে পারে একথা ভেবে সেই সব পত্র-পত্রিকায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে John Bull-এ প্রকাশিত Edinburg Review-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয় :

The following brief summary of the usual objections to the free settlement of Europeans. [৮]

(1) The Hindus are a peculiar and timid race: and if Europeans were permitted to hold lands, they would soon dispossess the native inhabitants.

(2) If Europeans were permitted to settle, their offences against native usages and institutions would disgust the inhabitants of the country, who would rebel and expel us from India.

(3) If Europeans were to settle in India they would soon colonise the country, and Great Britain would lose her Indian possessions, in the exact same manner in which she lost her American colonies.

(4) If we civilize the Hindus, or, in other words, if we govern them well, they will become enlightened, rebel against us, expel us from the country, and establish a Native government.

অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রামমোহন-দ্বারকানাথের colonisation-এর প্রস্তাবটা অলীক বলে অবজ্ঞা করা চলে না। আধুনিক য়ুরোপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারতবর্ষের বিপ্লবাত্মক পরিণতির সম্ভাবনাকেও উপেক্ষা করা চলে না।

দ্বারকানাথের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো যে তিনি চিন্তা ও কর্মে পরবর্তী যুগের মানুষ হয়েও পূর্ববর্তীযুগে জন্মেছিলেন। কলোনিয়াল দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মানসিক কাঠামো ছিল য়ুরোপের স্বাধীন দেশের নাগরিকের মতো। ইংলণ্ড তথা য়ুরোপের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে

পরিচয়ের ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে রাজনীতিতে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়, এবং বাণিজ্যে মানুষকে পণ্য করার বিরুদ্ধে—বিজয়ী ইংরেজরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু বিজিত ও বিজয়ীর সমানাধিকার যে সম্ভব নয় একথা তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চাননি এবং মাঝে মাঝে মোহভঙ্গ হলেও তাঁকে সাময়িক বলে মনে করেছেন। বণিক ইংরেজ নিজেদের স্বার্থেই দেশীয়দের পরিচালিত ব্যাঙ্ককে সুদৃষ্টিতে দেখবে না একথা তিনি অনেক মূল্য দিয়ে বুঝেছিলেন। কাঁচামাল ও মূলধনের দেশ ভারতবর্ষের শিল্পায়ন বণিক ইংরেজের স্বার্থের পরিপন্থী একথাও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। নীলকর সাহেবেরা কৃষি-শিল্পের অগ্রদূত হতে পারে না—কেননা যে কোনো ধরনের শিল্পবিপ্লবের জন্যে যে গভীর বিজ্ঞানানুশীলন প্রয়োজন তা এদেশে অনুপস্থিত ছিল; আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, তা বণিক ইংরেজের কাম্যও ছিল না। দ্বারকানাথের সময় নীলকরদের লগ্নীর ফলে রায়তদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হলেও পরিণতিতে যে দুর্দশার সম্ভাবনা রয়েছে একথা দ্বারকানাথ ভাবেননি। যে নীলকরেরা রায়তদের মানবিক মর্যাদা দিতে জানত না, তারা যে পরবর্তী-কালে রায়তদের নিছক উৎপাদনের উপকরণ বলে মনে করবে—দ্বারকানাথ সেই সম্বন্ধে সচেতন হলে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতেন।

রামমোহনের অনুগামী হিসেবে দ্বারকানাথ এদেশে য়ুরোপের best settlers-দের উপনিবেশ স্থাপন কামনা করেছিলেন। কিন্তু একমাত্র ভবঘুরে ছাড়া যে অন্য কেউ এদেশে বসতি স্থাপন করতে পারে না একথা তিনি ভেবে দেখেননি। এই ভবঘুরেরা য়ুরোপের রেনেসাঁস-এর মূল্যবোধের বাহক হতে পারে না—এবং এদের সঙ্গে পরিচয়ে ভারতবাসীর মানসিক উৎকর্ষ সম্ভব ছিল না। আমেরিকায় প্রধানত য়ুরোপের ভবঘুরেরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ফলে এই ভবঘুরেরা সেদেশে এক বিশেষ ধরনের কালচার বা সংস্কৃতি গড়ে তোলে ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারতবর্ষে অনুরূপ ঘটনা সম্ভব ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির monopoly এই সব settlers-রা ধ্বংস করলে তা এদেশের মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর হত না—ভারতবর্ষ তাদের সকলের কাছে মুনাফা অর্জনের বাজার। ফলে যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে তারা তৎপর হয়ে উঠত। এই ধরনের তৎপরতায় ভারতবর্ষের জনগণ অধিকতর শোষিত হত—যেমন ঘটেছিল চীনদেশে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির monopoly বা একাধিপত্য

থাকায় কোম্পানি যেমন শোষণ করেছে ঠিক তেমনি দীর্ঘদিন শোষণ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ভারতবাসীকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। কলোনাইজেশন প্রস্তাব কার্যকরী হলে শোষণের পরিমাণ বেড়ে যেত অথচ ভারতবাসী কিছু সুযোগ সুবিধাও লাভ করত না।

দ্বারকানাথের সীমাবদ্ধতা ও স্ব-বিরোধের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ অন্যায়—কেননা এই সীমাবদ্ধতা ও স্ব-বিরোধের উৎস যতখানি তাঁর মানসিক কাঠামো তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর যুগ। উনিশ শতকে আমরা য়ুরোপের মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কিন্তু সেই মূল্যবোধের বস্তুভূমির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেনি, তাই সমস্ত যুগ ধরে আমরা সীমাবদ্ধতা ও স্ব-বিরোধে ভুগেছি। তবু বলা যায় যুগ ও কালের পরিবেশে দ্বারকানাথ নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল।

(১) Bholanath Chandra—Life of Digambar Mitra
(২) Kissorichand Mitra—Memoirs of Dwarakanath Tagore
(৩) Friend of India—March 16, 1843
(৪) Kissorichand Mitra—Memoirs of Dwarakanath Tagore
(৫) Friend of India—March 16, 1843
(৬) Asiatic Journal—June, 1830
(৭) John Bull—Jan 3, 1830
(৮) John Bull—June 5, 1829

অপরাধ জগতের ভাষা : ধ্বনিতত্ত্ব

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

অপরাধ-জগতের ভাষায় আংশিক কৃত্রিমতা রয়েছে। একে মিশ্র ভাষাও বলা যায়। যদিও অন্যান্য ভাষার মতো এখানেও বিবর্তন দেখি।

উচ্চারণের সময়ে প্রায় অস্বাভাবিক লম্বা টান লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো শাখাভাষা (dialect) এবং প্রশাখা-ভাষা (sub-dialect)-তে এই ভঙ্গিটি লক্ষণীয়। অপরাধ-জগতের লঘুভাষাকে একটি প্রশাখা-ভাষা বলব।

বাঙলাদেশের বাঙালি অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণদের লঘুভাষার বাক্য রীতি বাঙলা ঢঙ-এর। যদিও হিন্দির প্রাধান্য অনস্বীকার্য। এ জগতে বাঙালি এবং হিন্দিভাষীদের মধ্যে ভাষাগত পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রাধান্য কাজ করছে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে লঘুভাষীদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। উচ্চারণ পার্থক্য কোথাও কোথাও শ্রেণীগত। সাধারণত দেখা গেছে, যারা কারেন্সি নোট খুচরা মুদ্রা জাল করে অর্থাৎ জালিয়াৎ প্রতারক ইত্যাদি— তাদের উচ্চারণ এবং পকেটমার চোর গব্বাবাজ (burglar) ডাকাত প্রভৃতির উচ্চারণ একেবারে স্বতন্ত্র। জালিয়াতিতে যারা মেতে থাকে তাদের অনেকেই লেখাপড়া জানা মানুষ। জালিয়াতি প্রভৃতিতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, কারিগরী বিদ্যারও সময়ে সময়ে দরকার হয়। অপরাধীদের মধ্যে যারা আলোচ্য শ্রেণীভুক্ত তাদের অধিকাংশের অশিক্ষিত হলে চলে না। গবেষণা কালে অন্তত এমন কজন লোকের সন্ধান পাই যাদের মধ্যে একজন এম. এ, বি. এল এবং অপরজন রসায়ন শাস্ত্রের অনার্স পাশ! দুজনই বাঙালি এবং নোটজালে পারদর্শী।

পকেটমার, গব্বাবাজ, ডাকাত, কোটনা (pimp) জাতীয় অপরাধীরা সমাজের একেবারে নিচের তলার বাসিন্দা। এদের শিক্ষাদীক্ষার কোনো বালাই নেই। তবে 'আধুনিক' ডাকাতদের অনেকে ডাকাতিতে নতুন নতুন 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং মনে হয়, অধীত বিদ্যা ছাড়া এ

সমস্ত আয়ত্ত করা সহজ নয়। জালিয়াৎ বা ঠগদের কৌশল চমকপ্রদ; নিত্য পরিবর্তনশীল—নানান মুখোশ আর নানান ঢঙ-এ আত্মগোপন করে এরা নিজেদের কাজ হাসিল করে। এদের বাহ্যিক ব্যবহার এতই সাংস্কৃতিক যে মানুষকে সহজে ধোঁকা দিতে পারে।

সাধারণ জগতের মতো অপরাধজগতেও শ্রেণীবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভিন্ন মনের, রুচির এবং শিক্ষার মানুষ নিয়ে অপরাধজগতের সৃষ্টি। বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, মানুষগুলির হাতের সৃজনীশক্তির ছাপ সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

সভ্যজগতের সঙ্গে যেসব অপরাধের যোগ রয়েছে, সেখানে অপরাধীদের সভ্য আচরণ এবং সর্বসম্মত ভাষা ব্যবহার করতে হয়। জাল-জুয়াচুরির কাজ করতে গেলে সভ্য সাজতে হয়, সর্বদা সভ্যসমাজের সংস্পর্শে থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন উচ্চারণ হয় বৈচিত্র্যহীন অর্থাৎ তাতে অপরাধজগতের স্পর্শ থাকেনা বললেই চলে। 'শিক্ষিত' অপরাধীদের উচ্চারণ সমাজের সাধারণ মানুষদের মতো হয়ে থাকে।

যেসব বাঙালি যুবক গব্বাবাজি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই-কে পেশা করে নিয়েছে, তাদের অনেকেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত পরিবারের ছেলেরা যখন অপরাধজগতে নাম লেখায়, তখন তাদের চারিত্রিক অবনতির সঙ্গে মুখের ভাষারও অবনতি ঘটে। শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি ধীরে ধীরে পালটাতে থাকে। কালে বোঝা কঠিন হয়, একদা এরাও সভ্য জগতের মানুষ ছিল কি-না।

পতিতাদের ভাষাও লঘুভাষার অন্তর্গত। পতিতাদের বিশেষ ধরনের ভাষা আছে যা সকল অবস্থায় (সচ্ছল এবং দুস্থ) সকলে বলে থাকে। তবে সেখানেও ধ্বনিগত এবং অন্যান্য বৈষম্য বর্তমান। পতিতাদের বাচনভঙ্গি কতক পরিমাণে সামাজিক আর্থনীতিক মানের ওপর নির্ভরশীল। একজন পতিতার বাচনভঙ্গি প্রকাশ করে তাদের সমাজের কোন স্তরে সে অবস্থান করছে। সামাজিক মানের ওঠা-নামার ওপর ভাষার পরিবর্তন নির্ভর করে। ধ্বনিবৈষম্য নির্ভর করে—জন্মস্থানের ভাষা, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি বহু কিছুর ওপর। এই শ্রেণীর মহিলাদের আচার-ব্যবহার এমনকি বাচনভঙ্গি অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের পুরুষ অতিথি-অভ্যাগতদের শ্রেণীসংস্কৃতির ওপর। কিন্তু অন্যান্য অপরাধীশ্রেণীগুলির ভাষায় অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখিনি। বাচনভঙ্গি এবং

শব্দচয়নরীতি অপরাধজগতের বাসিন্দাদের নানা শ্রেণীতে ভাগ করতে সাহায্য করেছে।

অপরাধপ্রবণদের মধ্যে আর-একটি শ্রেণী সম্পর্কে দু-চার কথা বলার প্রয়োজন আছে। এরা হচ্ছে হিজড়া। হিজড়াদের ভাষা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণায় প্রভূত খোরাক জোগাতে পারবে। বিকৃত উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের সঙ্গে শারীরিক এবং মানসিক বিকৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের যোগ কতটা—তা কে জানে! ভাষাবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় এ-কাজ সম্ভব।

কণ্ঠনালীতে রণন, পৃষ্ঠন-এর মাত্রাভেদ নানা পরিবর্তন ঘটায়—ক্রমিক, সাময়িক ও স্থায়ী। নারী-পুরুষ ও শিশুর কণ্ঠস্বরে যে-পার্থক্য দেখি, তা আংশিকভাবে কণ্ঠনালীর প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে। সঙ্গীতশিল্পে কণ্ঠনালীর গঠনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে—স্বরোচ্চতা, কম্পন ইত্যাদির প্রাধান্য কে না স্বীকার করবে!

হিজড়াদের কণ্ঠস্বরের বিকৃতির জন্য সম্ভবত তাদের যৌনবিকৃতি দায়ী। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য হিজড়াদের পরিচিতি বলা যায়। যৌনবিকৃতি এদের জীবনে এনে দিয়েছে 'যৌন-অনুপস্থিতি', তাদের প্রাত্যহিক জীবন এই বিকৃতি দ্বারা পরিচালিত। এদের চলন-বলন ইঙ্গিত-ইশারা সব কিছু সাধারণ মানুষ (নারী ও পুরুষ) থেকে স্বতন্ত্র। হিজড়াদের ভাষা নিয়ে গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

হিজড়াদের কথাবার্তায় ধৃষ্ট. মূর্ধা এবং উষ্মধ্বনি 'হ'-এর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কথায় কথায় অনুপ্রাস অলংকার। হিজড়াদের ভাষার কিছু উদাহরণ এখানে দিচ্ছি: তুমসি পতো হুমসি হামসির ঘরে ঠিকছে: তুমি পালাও লোকটি আমার ঘরে আসছে। হুমসি হামসিকে খুমুচিস করল: লোকটি আমাকে চুমু খেলো। নোসের কাছে ঝলকা আছে ঝেড়ো: লোকটার কাছে টাকা আছে কেড়ে নিও। আড়িয়াল বিলাবিলি: ঝগড়া। কুটনি: কথাবার্তা। টৌনছা: গালাগাল। ছুবড়ি: স্ত্রীলোক।

অপরাধজগতের ভাষার উক্তিগুলি বেশি সংখ্যায় একাক্ষর, দুই-অক্ষর এবং তিন-অক্ষর বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

পশ্চিম বাঙলার মিশ্র লঘুভাষায় [illegible] অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং

অ্যা। 'অ্যা' উক্তির শেষে মেলে না, 'অ' অন্তে অত্যন্ত অল্প পাওয়া যায়, যেমন, চ (চ+অ): চোট।

শ-এর ব্যবহার উচ্চারণে নেই বললে চলে। ঢ-কে উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় না।

একই উক্তির উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, আক, আঁক: চশমা। কাটি, কাঁটি: ধরা পড়া। অন্ধা, আন্ধা: চোরেদের সর্দার। এন্টি, এ্যান্টি: চোলাই মদ। অ্যা, অনুনাসিক এবং মহাপ্রাণহীণ ধ্বনি পশ্চিম বাঙলার বাঙালিদের উচ্চারণবৈশিষ্ট্য। পশ্চিম বাঙলার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এদেশের অপরাধীদের উচ্চারণেও থেকে গেছে। পূর্ববঙ্গবাসী এবং অবাঙালি-দের সংস্পর্শে তা একেবারে লোপ পায়নি।

আমার সংগৃহীত তথ্যে সর্বসাকুল্যে ১৫১টি যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে।

অপরাধজগতের মানুষেরা উচ্চারণ করে বিচিত্র ঢঙ-এ। এদের উচ্চারণে অসংস্কৃত জগতের ছাপ স্পষ্ট। কথাবার্তায় স্বরের টান-টোন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ওঠানামা করে—যে ভঙ্গি-আমরা সাধারণ চলিত ভাষায় কদাচ লক্ষ্য করি।

মিশ্রণ এবং কৃত্রিমতা সত্ত্বেও লঘুভাষা এক ধরনের ভাষা। সুতরাং ধ্বনি-তত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং এ-ভাষার রীতি বুঝতে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজনও আছে। পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের লঘুভাষার সঙ্গে এ-রাজ্যের নানান উপভাষার যোগ। তাছাড়া হিন্দু-স্থানীর প্রভাবও প্রচুর। আঞ্চলিক ভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা এবং অভিধান-প্রস্তুতপর্ব শেষ হলে লঘুভাষার গবেষণা আরো সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে। পশ্চিম বাঙলার লঘুভাষায় বহু শব্দ এসেছে আঞ্চলিক ও অনাঞ্চলিক (non-local) ভাষা থেকে। এতগুলি ভাষার সাহায্যে লঘুভাষার সৃষ্টি। গবেষণার মাধ্যমে অন্ধকার জগতটির শুধুই কি ভাষা, ভাষাকে কেন্দ্র করে মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সংস্কৃতির ঝকঝকে ছবিখানিও আমাদের হাতে এসে যাবে।

লঘুশব্দ গঠন সম্পর্কে Vendryes বলেছেন "...mutilation are merely extensions of regular phonetic changes." [Language by I. Vendryes, Routledge & Kegan Paul Ltd. (1952) P. 254] লঘুভাষায় পরিবর্তন সাধারণ ভাষার মতোই হয়ে থাকে।

লঘুভাষার বাঙলা, হিন্দি বা মিশ্রণ শব্দগুলির ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করছি।

স্বরধ্বনি লোপ :

(ক) **আদিস্বর :** যখন দ্বিতীয় অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে

খাড়া : জানলা ভাঙার যন্ত্র < আখাড়া, আখড়া।

গুন : বিপদ < আগুন।

(খ) **মধ্যস্বর :** যখন প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে

গুরমা : দলের সর্দার < গুরুমা।

চাপনি : চাপ, আত্মগোপনের সাজসজ্জা < চাপুনি, চাপানো।

তরালি : যুবতীর আকর্ষণীয় ঠোঁট < তরোয়ালি।

(গ) **অন্তস্বর :** আরটআন : আধুলি < আনা।

ওতোল : সেখানে < ওতলা (-তল্লাট)।

ওখরান্ : মালগাড়ি থেকে চুরি করতে যে সাহায্য করে < ওপড়ানো, ওগরানো।

ইচ্ছাকৃত স্বরধ্বনি পরিবর্তন :

ইন্ধার : অন্ধকার রাত < ওড়িয়া অন্ধার : অন্ধকার। অ্যাটুলি : তোধামুদে < এটুলি। ডলি : মৃত < ডুলি। ঝোম : ঘুম। জেগেল হওয়া : জাগা। জসম : হাতঘড়ি < যশম। করমু : পকেটমার < কর্মী। গর্ম্ : মাতাল < গর্মী। কাটি : ছুরি। চড়্ : ফাঁসীকাঠ < চড়া।

শব্দের আদি, মধ্য এবং অন্তে স্বরধ্বনি সংযোগ :

আরেলা : গোলমাল, দাঙ্গাহাঙ্গামা < হিন্দী : রেলা। আড়িয়া : কোনো মেয়েকে লক্ষ্য করে বাঁকা চাহনি < আড়। আন্না মেলানা : চুরিতে বার হওয়া। অগ্‌লি বগ্‌লি : ঘুরে বেড়ানো < হি. অগল-বগল।

আ > অ হচ্ছে ব্যঞ্জন সংযোগে :

কটনি : কাঠের বাক্স < কাঠ। কত্তি : দরজা ভাঙার যন্ত্র < কাতুরি। ছপ্নি : পাছা < ছাপ < পাছ।

স্বরসঙ্গতি :

বিরি : হাতঘড়ি। গিল্লি : ফাউনটেন পেন < গিলা < গেলা।

স্বরধ্বনির দ্বিস্বর ধ্বনিতে রূপান্তর :

(ক) স্বর > দ্বিস্বর :

আড়িয়া : কোনো মেয়েকে দেখা < আড়ি।

(খ) ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের ফলে :

গাঁই, গাঁইয়া : কোমর, গেঁজে। ঘাউ : ব্লেড < ঘাত, ঘা।

(গ) **দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী 'হ'-এর লোপে**

গউনা, গওনা : গলার মধ্যে থলি যেখানে চোরাই টাকাকড়ি গয়না লুকিয়ে রাখা যায় < গহন। দয়লা : দশ < দহলা।

(ঘ) **দুই শব্দের সঙ্কোচনে :**

টেনিয়া : পতিতালয়ের রাতের চাকরলোকজন < টেনে আনা।

দ্বিস্বর-ধ্বনির পরিবর্তন :

আখেয়া : চোখ, দৃষ্টি < হি· আঁখিয়া। অওজর : বড়ো ছুরি < আরবি অউজর। থাই : দড়ি < থেই।

স্বরধ্বনি লোপের মতো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপও দ্রষ্টব্য এবং কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধ্বনি লোপ উল্লেখ করা যেতে পারে :

(ক) **আদি ব্যঞ্জন :**

আলি : কালি। আদা : সাদা, সুন্দর। মাবরাউমাকে : নিদ্রারত দরোয়ান < 'উমাকে' হয়তো 'ঘুমাতে' থেকে এসেছে।

(খ) **মধ্য ব্যঞ্জন :**

দয়েলা < দহলা। থুড়ি : বৃদ্ধমহিলা < থুবড়ি।

(গ) **অন্ত্য ব্যঞ্জন :**

উপ্পু : শুয়ে পড়া < উপুড়। চ : ঠকানো < চোট। দা : স্তনবৃন্তের চতুর্দিকের কালো অংশ < দাগ।

ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তন : শব্দের আদি ব্যঞ্জন পরিবর্তন অন্ত অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। যেমন, ওগলানে : দোষ স্বীকার করা < ওগরানো। কক : থুথু < কফ। কোনা : সোনা। কোরা : চোর (= চোরা)। খাম : মেয়েদের উরু (= থাম)। গালা : বালা। ঘোঁট : চুরির সামগ্রী গিলে ফেলা < ঢোঁক। চাম্মু : তামা (= তাম্মু)। ছুট : ডাকাতি < লুঠ। ছেচকি : রেজকি। জিরে : হীরে। নাপি : মেয়েদের নাভি।

ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্তকরণ : কচ্চা : গাঁজা < কচ : গাছের কাঁচা

শেকড়। খাব্বিশ: বুড়ি<খবিস। খুল্লা: উলঙ্গ<খুলা। গিল্লি: গেলা। চিল্লর: রেজকি, শিশু<চিলর: এক প্রকারের পোকা, মুদ্রা। টক্কর: মাথা<টিকর: টাকরা। তর্রা: জামা কাপড়<তাড়া। থাব্বা: একমুঠো টাকাকড়ি যা গোনা হয়নি।

যুক্তব্যঞ্জনের সরলীকরণ: কদ্‌কা পানি: কোকাকোলা ও বোতল<হি. কদ্দু। গহক: পতিতাদের দালাল<গ্রহক। পতিদার: ধনী<পত্তিদার।

মহাপ্রাণহীনতা (deaspiration)-র প্রভাব খুব বেশি: কাটা: কাজ, সাজা<খাটা (=জেলখাটা)। করকা: অভাব<খরচা। গরানচি: কোলাপসিবল ফটক<গরাঞ্চি। টোকর: জুতো<ঠোকর। টোঁডা: মেয়েদের পেট<ভোজপুরী ঢোঁড়হি: পেট। তাবড়ি: চড়<থাবড়া।

ঘোষীভবন (voicing): এর প্রভাব অতি বিরল

থাগ: সিঁড়ি<থাক, সিঁড়ির ধাপ।

বিপর্যয় (metathesis):

আরচা: সিঁধ-কাটা (=চারা), করচা: চাকর। কোদান: দোকান। ছাপাই: প্যান্টের পাস পকেট<পাছা। নাথা: থানা মুচে। নেওয়া: ছিনতাই<ছিনে—ছিনিয়ে। মালবি: চোর<বামাল>বেমাল>মালবে> মালবি। মাগলাস: খনিজ ধাতু<গামলা>গামলাস>মাগলাস। মাজা: শার্ট<জামা। লোঠা: পুলিশ<ঠোলা: অপরাধীদের ভাষায় পুলিশ।

সমীভবন (assimilation): র/ড়-এর সংস্পর্শে।

চড্ডা, চোড্ডা: চোর (=চোর+টা)। চড়া: চ্যাবলা, হয়তো চড়বড় এর সঙ্গে যোগ থাকতে পারে। নেত্তা: তিন (তিনে নেত্র)।

সকারীভবন (assibilation):

কামাস: কাছে (=কাছ)।

মিশ্রণ (contamination) এবং **জোড় কলম** (portmantean word):

উমরা: ঘর-বাড়ি (=উপর কামরা)। খড়পা: চটিজুতো (=খড়ম পা)। গুপটি: সিঁড়ির নিচের ঘর<গুপ্তি এবং ঘাপটি। ঘপা: ঘর বা আড্ডাখানা<ঘর এবং গোপা (=গোপন)। চুয়ালা: মদ<চোয়ানো এবং পেয়ালা। ঠুঙকা, ঠুনকা: পতিতালয়ের ছুটকো খদ্দের<ঠুনকো এবং খাউকো। দউনি: কোকাকোলা<দওয়াই+পানি।

স্বরভক্তি (anaptyxis): আলগ : 'বিদেশী' অপরাধী অর্থাৎ নতুন আমদানী < আলগা।

মূর্ধন্যীভবন (cerebralization) : উণ্ডা : সুন্দরী < আরবী উন্দ (হ্)। টোর : গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেওয়া < হি. তোরনা। টাণ্ডি : মারধোর < তণ্ডি। টানাটল : কোলাপসেবল গেট < টেনে তোল। ডল : কাপড়ের ভাঁজ < দল। ডুরি : দারোয়ান < দ্বারী।

মূর্ধন্যীহরণ (loss of cerebralization) : গোথনি : বোন < গোষ্ঠী। দোলি : খুন < ডুলি। নেতি : নর্তকী < নটী।

নাসিক্যীভবন (nasalization) : আঁটকাবাজ : কয়লাচোর < আটকা-আঁসকি : চোখ < অক্ষি। কাঁটি : তালা খোলার চাবি < চাবিকাঠি। ঘাঁট : তাঁতের ফাঁস (গলায় পরিয়ে টেনে মেরে ফেলা হয়) < ঘাত।

নাসিক্যীহরণ (loss of nasalization) : আখ : চশমা, টর্চ, আলো < আঁখ। কাচ্চি : রূপো < কাঁচা। কোচর : লুকানো < কোঁচর। গাটিয়া : গেঁজে < গাঁঠিয়া। খোচ. যে বলপূর্বক হরণ করে, যে অপরাধীকে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকাকড়ি আদায় করে < খোঁচা। ছাটা : জন্মনিয়ন্ত্রণ (হয়তো 'ছাঁটার' সঙ্গে যোগ থাকলেও থাকতে পারে)।

দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপে পূর্ববর্তী ধ্বনির দীর্ঘিকরণ :

আকর : জুয়া < অক্ষর। মাকরা : ঠাট্টা < মস্করা।

শব্দের উল্টিভবন : চাপ : পেছন < পাছ। ছাম : মাছ, যুবতী। নেপ : কলম < পেন। খুম : মুখ।

শব্দের একাংশ বর্জন : ছোট ছোট শব্দের এ-রাজ্যে চলন খুব বেশি। বড় শব্দ এরা পছন্দ করে না। যেমন, আড়া : সিঁড়ি < আড়কাঠা। কুনজি : গাড়ির চাবি < আলা কুঞ্জি। গাদা : বন্দুক < গাদা বন্দুক। চাকাল্লাস : হইহুল্লোড় < চাকবেঁধে উল্লাস। ছড়া : গলার হার < হারছড়া। জদু : যাদুঘর। জালি : জালনোট। ঝাপ্পা : পোষাক, ঝাপ্পা বলতে সন্ন্যাসীর পোষাক বোঝায় যারা ছেলেমেয়ে চুরি করে < ঝাপ্পা-ঝোপ্পা। টাপু : বাবুটাবু। টুসি : টি. সি. (ticket collector)। ডি : জুয়াচোর, বেশ্যাপাড়ার দালাল < ডালাল। নোস : লোক < মানোস (= মানুষ)। তির : কলকাতায় হুগলী নদীর ধার < নদীর তীর। নিচের : নিচের পকেট। লকর : ছুরি < লোহালক্কর। মারি : আলমারি।

অক্ষর যোগ (Syllabic addition) :

আরটআন : আটা আনা<আট+আন্। কিসিরে : কি। ছিটোরি : ছবি। কিসে : কি। কোমাথায় : কোথায়। বিটুরি : বুড়ি।

অনেক সময়ে অপরাধ-জগতে সৃষ্ট শব্দ থেকে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। যেমন, আক : জুয়া<আকর, জুয়া। কুলসি : চুরি করতে বার হওয়া<কুলকি, চোর। কোট : সাকরেত<কোদ : চোর। কেয়ারি : তিন<তেয়ারি : তিন। খিল লোচর, খোমোচর : পুলিশ<খোচর : পুলিশ। গাঁক : পতিতার খরিদ্দার<গহক : সমার্থক। জুগু : '?' মতো অাঁকশি, যার সাহায্যে চোরেরা পাঁচিল টপকায়। অাঁকশিতে একটি দড়ি বাঁধে এবং দড়ি ধরে উঠে যায়<জিজ্ঞাসা : সমার্থক। ঝাপ : মেয়েদের পাছা<ছাপা>পাছা। টিটা : মদ<কিটা : ঐ। টেক দেয়া : সাহায্য করা<ঠেক : ঐ।

গ্রেপ্তার

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

বহুবাঞ্ছিত দিনটি কিন্তু অতি বিশ্রীভাবে শুরু হলো।

খুব ভোরেই অনিন্দ্যর ঘুম ভেঙেছিল। তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। খোলা জানলা পথে বাইরের ধূসর আবছা চরাচর চোখে পড়ল। এখনও রাস্তায় পদাতিক মানুষের মিছিল শুরু হয়নি। শুধু কর্পোরেশনের লোক সাফাই-কাজ আরম্ভ করেছে। লম্বা হোস পাইপে করে তোড়ে জল ঢেলে রাস্তা ধুয়ে দিচ্ছে। গাড়িবারান্দার তলায় ফুটপাথে ঘুমন্ত ভবঘুরে স্ত্রী-পুরুষ-শিশুরা সেই জলের ছাঁটে বিপর্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে ঘুমঘুম চোখে আপন আপন পোঁটলাপুঁটলি কাপড়চোপড় সামলাচ্ছে। আকাশ দ্রুত ফর্সা হয়ে আসছে। কেরিয়ারে টাটকা উষ্ণ খবরের কাগজের বাণ্ডিল চাপিয়ে দিনের প্রথম কাগজওলারা ঘণ্টা বাজিয়ে বেগে সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল।

এখনই ওঠার কিছু দরকার নেই। বাড়ির অন্যান্যরাও কেউ এখনও ওঠেনি। অনিন্দ্য কান পেতে বাড়ির মধ্যে কিছু সাড়া পেতে চাইল। কিন্তু না। বাড়ি এখনও ঘুমন্তপুরী। এখনও খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। অনিন্দ্য পাশ ফিরে শুল। চোখ বুজল। কিন্তু চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। আজকের দিনটার কথা ভেবে সে ভিতরে ভিতরে এত উত্তেজিত ব্যস্ত হয়ে উঠছে যে তার মস্তিস্কের স্নায়ুকেন্দ্র বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। রাত্রেও ভালো ঘুম হয়নি। থেকে থেকে ঘনীভূত তন্দ্রা ছিঁড়ে গেছে। চমকে জেগে উঠেছে। যতটুকু ঘুমিয়েছে তার মধ্যেই সব এলোমেলো অর্থহীন অসংলগ্ন স্বপ্নদৃশ্য তাকে কখনও ভীত কখনও শঙ্কিত করে তুলেছে।

অবশেষে অসংখ্য পাংশু পাণ্ডুর একঘেয়ে দিনের অন্তহীন মিছিলের শেষে উজ্জ্বল সুন্দর একটা দিন এল। বি. এ ফাইন্যাল পরীক্ষার পর থেকে বাড়িতে ঠায় বসা। রেজাল্ট আউট হলো পাসের সংবাদ নিয়ে। অনার্স ছিল না। সুতরাং এম. এ পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। চেনাজানা বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণ, যাঁরা বি. এ পাস করতে পারলেই হাতে চাঁদ ধরে দেবার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন, এখন শুধু নানাবিধ শুকনো উপদেশ দিতে লাগলেন। লাইব্রেরি-য়ানশিপটা পড়ে ফেলো। একটা কোনো ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ শেখোনা—তিব্বতী শিখতে পারো—ওর বেশ ডিম্যাণ্ড আছে। অথবা, বি. টি. ট্রেনিংটা নিয়ে নাও—কমপ্লিট করতে পারলে নির্ঘাত একটা মাস্টারি পেয়ে যাবে—আজকাল মাস্টারদের পে-স্কেল দেখেছ—ফার্স্ট ক্লাস। এইরকম সব নানা ধরনের সারগর্ভ পরামর্শ!

অচিরেই মোহভঙ্গ হলো। এবং অনায়াসলভ্য অসংখ্য উপদেশ-পরামর্শের তোয়াক্কা না করে অনিন্দ্য নিজেই নিজের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হলো। খবরের কাগজের 'সিচুয়েশন ভ্যাকাণ্ট' কলম দেখে দেখে বক্স নাম্বারে আবেদনের শরবর্ষণ করতে লাগল। ফল অবশ্যই ক্রমান্বয় নিষ্ফলতা। ক্বচিৎ কোনো আবেদন ইণ্টারভিউ পর্যন্ত মুকুলিত হলো বটে, কিন্তু চরম সাফল্যের ফুল আর ফুটল না। দিনগুলো বিবর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। কর্মহীনতার নিদারুণ অবসাদে এক-একটা দিন যেন সীসের মতো ভারী, অনড়। সেই সঙ্গে বাধ্যতামূলক অলসতার জন্য অপরাধবোধ। প্রৌঢ়, আশু-অবসরণীয় পিতাকে সাহায্য করতে না পারার ব্যর্থতাবোধে সর্বদা হীনমন্যতা। বাড়ির প্রত্যেকের কাছ থেকে চোরের মতো নিজেকে লুকিয়ে রাখা।

শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হলো। ব্যাপারটা খানিক রহস্যময়। কবে যে আবেদনটি পাঠিয়েছিল, অনিন্দ্য মনে করতে পারে না। তার ডাইরিতেও কিছু নোট করা নেই। অথচ একটি প্রখ্যাত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ইণ্টারভিউর ডাক এলো। ইণ্টারভিউ অন্তে সে নির্বাচিতও হলো। ব্যাপারটা খানিকটা অলৌকিক ধরনের। যাই হোক, অনিন্দ্য ভেবে নিল—সে আবেদন করেছিল নিশ্চয়, কিন্তু অসংখ্য আবেদনের ভিড়ে এই বিশেষ আবেদনটির কথা তার মনে থাকেনি।

দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার এই অন্তিম সাফল্যে সকলেই খুব খুশী হয়ে উঠল। মা হৈমন্তী কালিঘাটে পুজো মানলেন। বাপ অচিন্ত্য খুশির উচ্ছ্বাসে একটা হাতঘড়ি পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনিন্দ্য আকুল আগ্রহে কাজে যোগ দেবার দিনটির প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আজ অনিন্দ্যর প্রথম চাকরিতে যোগ দেবার দিন।

অনিন্দ্য অল্প তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সকালবেলার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় বিলি কাটছিল। সহসা বাড়ির সামনেই ভারী কোনো গাড়ির

ব্রেক কষার যান্ত্রিক আর্তনাদে পলকা তন্দ্রা ভেঙে গেল। কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কায় অনিন্দ্য লাফিয়ে উঠে জানালায় গেল। উঁকি দিয়ে দেখল বাড়ির দরজার সামনেই একটা বড় ঢাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উপর থেকে গাড়িটাকে পুলিশ ভ্যান বলে মনে হলো।

পলকপাতেই সন্দেহের নিরসন হলো, গাড়ি থেকে টকাটক লাফিয়ে গুটিকয়েক কনেস্টবল নামল। নামল একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, পোষাক দেখে মনে হয় ইনসপেক্টর। তারা অনিন্দ্যকে বিস্মিত হওয়ার সুযোগ না দিয়েই সদর দরজাতে সজোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল। ধাক্কার প্রচণ্ড আঘাতে মনে হলো এখনই ভেতর থেকে খিল ভেঙে যাবে।

অনিন্দ্য দ্রুত পায়ে একতলায় নেমে এলো। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে কয়েকজন কনেস্টবল ভিতরে ঢুকে পড়ল। অনিন্দ্যর জিজ্ঞাসুদৃষ্টির উত্তরে ইনসপেক্টর প্রশ্ন করল—"এটা আট নম্বর বাড়ি?"

অনিন্দ্য বলল—"হ্যাঁ।"

ইনসপেক্টর সাহেব পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে দেখে বলল—"বনওয়ারীলাল মিশ্র এ বাড়িতে থাকে?"

বনওয়ারীলাল বাড়ির ভাড়াটে। বউ-ছেলে নিয়ে একতলার একখানা ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে। কোনো একটা কারখানায় টাইমকীপারের চাকরি করত। সম্প্রতি কিছুদিন যাবত কারখানা লক-আউট থাকায় বনওয়ারীর কিছু বিপন্ন অবস্থা। সময়মতো ভাড়া দিতে পারছে না। সকালবেলায় বেরিয়ে যায় দু-পয়সা উপার্জনের ধান্ধায়, ফেরে অনেক রাত্রে।

ইনসপেক্টরের প্রশ্নের জবাবে অনিন্দ্য বলল -"হ্যাঁ। থাকে।"

—"তার নামে ওয়ারেন্ট আছে। ঘর সার্চ করব। ঘরটা দেখিয়ে দিন।"

অনিন্দ্য অবাক হয়ে গিয়েছিল। বনওয়ারীর মতো শান্ত নিরীহ ভালো-মানুষ প্রকৃতির লোক হঠাৎ কি-এমন করে বসল, যাতে তাকে ধরতে সাত-সকালে সাজগোজ করে একগাড়ি পুলিশ এসে হাজির হলো? অনিন্দ্য ভেবে পাচ্ছিল না।

অনিন্দ্য বলল—"আসুন।"

ইনসপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে অনিন্দ্য বনওয়ারীর ঘরের সামনে গিয়ে দেখল ঘরের দরজা খোলা। উঁকি মেরে অনিন্দ্য দেখল বাচ্চা ছেলেটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বনওয়ারীর বউ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। অনিন্দ্য বলল—

"ভাবীজী, বনওয়ারীবাবু ঘরে আছেন?"

আতঙ্কিত চোখ তুলে বনওয়ারীর বউ অনিন্দ্যকে, অনিন্দ্যর পিছনে ইনসপেক্টরকে দেখল। তারপর পাশাপাশি মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলল—"নেহি।"

ইনসপেক্টর ধমকে উঠল—"নেহি কেয়া! এতনা সবেরসে কাঁহা চলা গিয়া!—"

ভয়ে আতঙ্কে বনওয়ারীর দেহাতী তরুণী বধূর চোখে প্রায় জল এসে গেল। ওকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই অনিন্দ্য বলল—"বনওয়ারীবাবু রোজই খুব সকালে বেরিয়ে যায়।"

এবারে অনিন্দ্যর ধমক খাওয়ার পালা। ইনসপেক্টর গর্জন করে উঠল—"রাখুন মশাই আপনার ওকালতি। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ, বেরিয়ে গেলেই হলো। নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে খাটের তলায় গা ঢাকা দিয়েছে।"

ইনসপেক্টর হাতের ছোট হাণ্টারের ইঙ্গিতে সঙ্গী পুলিশবাহিনীকে ঘরে ঢুকতে হুকুম করল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশগুলো একদল ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল ও পলকপাতে তাণ্ডবলীলা শুরু করে দিল। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে বনওয়ারীর বউ রুদ্ধ চীৎকার করে উঠল ও তাড়িতা হরিণীর মতো ছুটে ঘরের বাইরে চলে এলো।

অনিন্দ্য বলল—"ভাবীজী, আপনি ওপরে মার কাছে চলে যান···"

ইনসপেক্টর বাধা দিয়ে গর্জন করে উঠল—"দাঁড়ান। ওকে কোথাও পাঠাবেন না এখন। ওর বডি সার্চ করা দরকার হতে পারে।"

বনওয়ারীর বউ বুকের মধ্যে ছেলেকে চেপে ধরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ভীত শঙ্কিত বড় বড় চোখের অপলক চাহনিতে ঘরের মধ্যে মহাপ্রলয় দেখতে লাগল। স্বভাবত লাজুক তার মাথা থেকে ঘোমটা অর্ধেক খসে গেছে। কপালের বাসি মেটে সিঁদুর কপালময় লেপটে আছে। কবরীবন্ধনচ্যুত রুক্ষ চুল উড়ছে। ওদিকে ঘরের মধ্যে পুলিশরা তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে। এটা টানছে, ওটা ভাঙছে। আলনায় রাখা কাপড়চোপড় ছড়িয়ে গেছে চারদিকে, বালিস তোষক ফেটে গিয়ে ঘরময় তুলো উড়ছে।

বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে গেছে। সকলেই বাসি মুখ নিয়ে নিচে নেমে এসেছে। অচিন্ত্যর কৌতূহলের উত্তরে ইনসপেক্টর শুধু গম্ভীর মুখে বলেছে—"আপনি একজন মারাত্মক সমাজবিরোধীকে জায়গা দিয়েছেন।" বাড়ির

সামনে এত সকালেও কৌতূহলী দর্শক-জনতার ভীড়।

ইতিমধ্যে রাস্তার দিক থেকে দুজন কনেস্টবল বনওয়ারীকে ধরে নিয়ে এসে হাজির হলো।

বনওয়ারীকে দেখে ইনসপেক্টরের মুখে বিজয়গৌরবের হাসি ফুটল। তার হাসিতে এ দর্পটুকু অপ্রকাশ রইল না যে বহু মারাত্মক আসামী জেলঘুঘুর সঙ্গে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। চুনোপুঁটি বনওয়ারী তো তুচ্ছ। পুলিশের সাড়া পেয়েই বনওয়ারী বাড়ির পিছন দিককার নিচু দেয়াল টপকে পালিয়েছিল। কিন্তু ধুরন্ধর পুলিশ ইনসপেক্টর সে সম্ভাবনা পূর্বাহ্নেই আন্দাজ করে দুজন কনেস্টবলকে দেয়ালের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিল। ফলে প্রারম্ভিক কিছু দৌড়ঝাঁপের পর বনওয়ারী হাতেনাতে গ্রেপ্তার।

ধৃত বনওয়ারীকে দেখেই তার বউ একটা আর্ত চীৎকার করে উঠে পরক্ষণেই মুখে হাত চাপা দিয়ে চীৎকারের শব্দ দমন করল। তারপর বিস্ফারিত চোখে বনওয়ারীকে দেখতে লাগল। লজ্জায় সঙ্কোচে লম্বা বনওয়ারীর উদ্ধত মাথা নিচু হয়ে গেছে। সে ভাবলেশহীন মুখে অধঃমুখী দৃষ্টিপাতে পায়ের কাছের মেঝে দেখছে। ইনসপেক্টর একজোড়া হাতকড়া নিয়ে মারাত্মক আসামী বনওয়ারীর বাঁহাতের কবজিতে খটাস করে পরিয়ে দিল। একটা হাতকড়া রইল ইনসপেক্টরের হাতে। নিষ্কলঙ্ক লোহায় তৈরি ঝকঝকে উজ্জ্বল হাতকড়াটা বনওয়ারীর কবজিতে অলঙ্কার বলে ভুল হচ্ছিল।

ব্যাপারটার আকস্মিকতা ও রহস্যময়তা সবাইকেই পীড়িত করছিল। বনওয়ারী দীর্ঘদিন এ-বাড়িতে এ পাড়ায় আছে। প্রথমে একা থাকত, পরে দেশ থেকে বিয়ে করে বউ নিয়ে এসেছে। বাচ্চাও হয়েছে। কোনোদিনই তাকে খুব মারাত্মক অপরাধীশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়নি। ইদানীং তার কারখানা লক-আউট থাকার দরুন জীবিকানির্বাহের দায়ে সে নানা প্রকার পথে বিচরণ করত এবং সে পথের সবগুলোই আইনের মানা ও সীমানা টায়টোয় মেনে চলে—একথা জোর করে বলা যায় না। কিন্তু তাই বলে বনওয়ারী যে রাতারাতি হিংস্র দুষ্ট ভয়ঙ্কর প্রকৃতির অপরাধী হয়ে উঠেছে—এমনটাও বিশ্বাস করা শক্ত।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে গেল। বনওয়ারীর ঘরে আগাপাস্তালা নিপুণ তল্লাশী চালিয়ে অবশেষে পুলিশরা একটি ছোট ঘিয়ের টিন উদ্ধার করল। টিনটা দেখেই ইনসপেক্টরের দুচোখ উল্লাসে ঝিকিয়ে উঠল।

খুশির হাসিতে তার দুপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল শিকার-সফল বাঘের দাঁতের মতো। আঙটা ধরে টিনটা অচিন্ত্যর নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে ইনসপেক্টার বলল—"এর মধ্যে কি আছে জানেন?"

দোদুল্যমান টিনটাকে চোখ দিয়ে আগুপিছু অনুসরণ করতে করতে অচিন্ত্য বললেন—"কি আছে? ঘি?"

—"টিনটা ঘিয়ের। তবে ভেতরে যা আছে তা ঘি নয়।"

—"তবে কি?"

শব্দটার স্বাদ গ্রহণ করতে করতে ইনসপেক্টার নিটোলভাবে উচ্চারণ করল—"আফিম।"

অচিন্ত্য থতিয়ে গেলেন—"আফিম! মানে চোরাই আফিম—"

ইনসপেক্টার চোখ মটকে বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ। চোরাই আফিম। নেপাল থেকে চোরাপথে আমদানী করা। বিরাট গ্যাং রয়েছে এর পেছনে। এরা হচ্ছে লোকাল এজেন্ট। এখন বুঝতে পারছেন, কি চিজকে জায়গা দিয়েছেন—"

বনওয়ারীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। বনওয়ারীর বউ প্রথমে জোরে পরে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল। হৈমন্তী তাকে ধরে উপরে নিয়ে গেলেন। সান্ত্বনা দিলেন—"কেঁদনা বউ। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মেজাজটা আরম্ভেই খিঁচড়ে গেল। বিশেষ দিনটি এইরকম একটা অঘটনের মধ্যে শুরু হওয়াতে অচিন্ত্য মনে মনে অখুশী হয়ে উঠল। ঘটনাটা দিনের প্রচলিত স্বচ্ছন্দ গতিতেও যেন একটা ছন্দপাত ঘটিয়ে দিল। পুলিশ চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ কৌতূহলী জনতা বাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। যারা দেরিতে এসে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তারা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে চাইল। পরে তারাই আবার বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। ফলে ক্রমেই ব্যাপারটা বিকৃত ও পল্লবিত হয়ে উঠল।

এদিকে অনিন্দ্যর স্নান করতে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। প্রথম দিনের চাকরি, একটু সময় হাতে নিয়ে বেরুলেই ভালো। অথচ এখনও রান্না হয়ে ওঠেনি। বাজারও আসেনি। সব কেমন যেন এলোমেলো ছন্নছাড়া হয়ে

গেছে। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয়ে বাড়ির প্রতিটি লোকের মানসিকতা যেন কেন্দ্রাতিগ হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে আবার অবনী এসে হাজির হলো। অবনীর একটি বিবাহ-যোগ্য মেয়ে আছে। সেই মেয়েটিকে সে অনিন্দ্যর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। অনেকদিন ধরেই ঘোরাঘুরি করছে। প্রথমে অচিন্ত্য পরে হৈমন্তীকে ধরেছে। দুজনেই ছেলের বেকারত্বের অজুহাতে প্রস্তাবটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু অবনী হচ্ছে সেই জাতের লোক যাদের অপছন্দ হলেও এড়ানো যায় না। অপরের সহজাত ভদ্রতাও চক্ষুলজ্জার সুযোগে তারা তাদের আচরণের স্থূলতা আর গায়েপড়া ভাব নিয়ে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং অবনীর উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। সে হেসে হেসে বলেছে—"বিলক্ষণ। আমি তো এখনই বিয়ে করতে বলছি না। তবে আশীর্বাদটা হয়ে থাক। তারপর চাকরি পেলে শুভকাজ হবে—"

বিরক্তি চেপে কৃত্রিম ভদ্রতার সঙ্গে অচিন্ত্য জবাব দিয়েছেন—"ঠিক আছে, ঠিক আছে। হবে খন—"

আজ কিন্তু অচিন্ত্য বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না। অবনীকে দেখে একটু রুক্ষস্বরেই বললেন—"অবনীবাবু, এখন তো আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় হবে না—"

অবনী দর্শনীয়ভাবে জিভ কাটল। বলল—"না না বেয়াইমশাই। আমি ঐ বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে আসিনি। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি বাড়ির সামনে জটলা। জিজ্ঞেস করতে কেউ বললে নোট ছাপানর কল ধরা পড়েছে, কেউ বললে ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে। তা ভাবলাম ব্যাপারটা কি জেনেই যাই। তাছাড়া, বাবাজীও তো আজ চাকরিতে জয়েন করবে। এই সঙ্গে পাকা খবরটাও নিয়ে যাই—"

—"ও, আচ্ছা, বসুন।" অচিন্ত্য সংক্ষেপে বনওয়ারী-বৃত্তান্ত বলল। তারপর সকৌতূহলে প্রশ্ন করল "তা অনিন্দ্য যে আজ চাকরিতে জয়েন করবে, এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?"

বিনীত মধুর রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে অবনী বলল—"হেঃ হেঃ বেয়াইমশাই, আঁচল চাপা দিয়ে কি আর আগুন লুকিয়ে রাখা যায়। সুগন্ধ আর সুসংবাদ বাতাসের আগে ছোটে। আচ্ছা, উঠি বেয়াইমশাই। যাওয়ার আগে বেয়ান-ঠাকরুনের সঙ্গে একটু আলাপ করে যাই—"

সময় নেই বলে অনিন্দ্য তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছিল। হৈমন্তী তদারক করছিলেন। অবনী একেবারে সেখানে এসে হাজির—"এই যে বেয়ান-ঠাকরুন। ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন? আপনার আর কি! ছেলে দাঁড়িয়ে গেল!"

স্মিত মুখে হৈমন্তী বললেন—"আসুন আসুন। খবর পেয়ে গেছেন দেখছি।"

—"তা আর পাব না। বলে ঐ খবরটার জন্য চাতক পক্ষীর মতো অপেক্ষা করছি।"

অবনীর উপস্থিতিতে অনিন্দ্য অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। মাথা নিচু করে সে দ্রুত খাওয়া শেষ করতে চাইল। কিন্তু অবনীর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না—"এই যে বাবাজী। তুমি তো জেমসবেরীতে জয়েন করছ?"

অনিন্দ্য একটু বিস্মিত হলো। অবনী এত খবর পেল কোথা থেকে? মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে।

অবনী বলল—"ভালো ভালো। দেখলে তো কত কোম্পানি ঘুরে। সেই, তোমার ছাত্র-পলিটিক্সের হ্যাপা আর পুলিশ-রিপোর্ট। কোথাও কিছু বিঁধতে পারলে? এরা এসব পরোয়া করে না। খুব বড় কোম্পানি। মন দিয়ে কাজ করলে অনেক দূর উঠতে পারবে।"

অনিন্দ্যর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে আঁচিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে দ্রুতহাতে প্যান্টশার্ট পরল। অবনীর কথায় শুধু বিস্ময় নয়, কী এক ধরনের ভয়েও তার গা ছমছম করে উঠল। তারপর আবার এঘরে এলো মাকে প্রণাম করতে। অবনীকেও একটা প্রণাম করতে হলো। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল অবনী—"বেঁচে থাকো বাবা। বেঁচে থাকো। আরও উন্নতি হোক—"

অনিন্দ্য বেরিয়ে যেতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কথাটা না বলে পারল না—"মা, বাবাকে মনে করিয়ে দিও।" বিস্মিতভাবে হৈমন্তী বললেন—"কিরে?"

—"ঐ যে"—একটু ইতস্তত, করল অনিন্দ্য—"ঘড়ি"—

—"ও—" হৈমন্তী হাসলেন—"তা, তুই তো প্রণাম করতে যাবি। তুই-ই বলিস না।"

—"না। তুমিই বোলো—"

হৈমন্তীর দুর্গানাম উচ্চারণ শুনতে শুনতে অনিন্দ্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চাকরিতে প্রথম দিনটা যেন কোনো নতুন জায়গায় বেড়াতে আসা। কৌতূহলী সহকর্মীরা এসে ঘিরে ধরে। মৃদু মিষ্ট ভাষণে পরিচয় নেয়, দেয়। সাহায্য-সহযোগিতার অকৃপণ আশ্বাসে সকলেই মুখর হয়ে ওঠে। নানা জনের নানা প্রশ্নে মন্তব্যে নিজেকে বিশেষ একজন বলে মনে হয়।

অনিন্দ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ডিপার্টমেণ্টের সকলেই একে একে ওর সঙ্গে আলাপ করে গেল। সুদেব নামেও ওর সমবয়স্ক যুবকটি হেসে বলল—"দাদা, মরতে এই ভাগাড়ে এলেন কেন ?"

অনিন্দ্যও হেসে বলল—"আর কোনো ভাগাড়ে ঠাঁই মিলল না বলে।"

প্রৌঢ় রাখালবাবু একথা-সেকথার ঝোপঝাড় পিটনোর পর নাকের চশমা নামিয়ে কণ্ঠস্বর নিম্নগ্রামে এনে প্রশ্ন করল—"কে আছে ?"

অনিন্দ্য নির্বোধের মতো বলল—"মা, বাবা—"

—"আরে, সে থাকা নয়।" রাখালবাবু প্রশ্রয়পূর্ণ হাসি হেসে বলল—"আহা বলুন না, টপ ম্যানেজমেণ্টের কার থ্রু দিয়ে এলেন।"

—"কারো থ্রু দিয়ে নয়তো—"

রাখালবাবু অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে অনিন্দ্যকে দেখল—"কেউ না-থাকলে জেমসবেরিতে কারো চাকরি হয়েছে বলে শুনিনি তো !"

অনিন্দ্য অবাক হয়ে রাখালবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

টিফিনের পরেই কিন্তু রাখালবাবুর সন্দেহের যাথার্থ্য নিরূপিত হয়ে গেল। একজন বেয়ারা এসে অনিন্দ্যকে একটা চিরকুট দিল। পার্সনেল ম্যানেজার ডেকে পাঠিয়েছে।

লাহিড়ি অনিন্দ্যকে পরম সমাদরে বসাল। গোটা কয়েক ফরম সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল—"এগুলো ফিল-আপ করে দিন।"

অনিন্দ্য মনোযোগ সহকারে ফর্মের খালি ঘরগুলো ভর্তি করছিল। হঠাৎ লাহিড়ি কথা বলে উঠল—"আপনি অবনী ঘোষালকে চেনেন ?"

চমকে অনিন্দ্য লাহিড়িকে দেখল। অবনীর সঙ্গে তার পরিচয় লাহিড়ি জানল কি করে ? ভীত দ্বিধাগ্রস্ত অনিন্দ্য বলল—"চিনি।"

—"কি হয় আপনার ?"

—"হন না কেউ"…ইতস্তত করে অনিন্দ্য বলল—"এই মানে, শুভানুধ্যায়ী—"

লাহিড়ির ঠোঁটের হাসিতে কৌতুক আর রহস্য মিলেমিশে ছিল। সেই

হাসিতে অনিন্দ্যের কথা থেমে গেল। তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে সে ফর্ম ভর্তি করতে লাগল। একটু পরেই আবার লাহিড়ির কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"অবনী ঘোষাল আপনার ভাবী শ্বশুর। তাই না?"

অনিন্দ্য প্রথমে বিস্মিত পরে লজ্জিত হলো। লজ্জায় সে আর চোখ তুলে লাহিড়ির দিকে তাকাতে পারছিল না। কিন্তু ক্রমেই বিস্ময় লজ্জাকে ছাপিয়ে গেল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না লাহিড়ি এত কথা জানল কি করে। লাহিড়ির আচরণেও রহস্য আর উৎকণ্ঠাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা।

অবশেষে লাহিড়ি একটু একটু করে ভাঙল—"আমি হলাম অবনী ঘোষালের ভায়রা। মানে ওর স্ত্রী আমার স্ত্রীর বোন। তোমাকে তুমি বলছি বলে মনে কিছু করো না। হাজার হোক, তুমি যদি অবনীদার মেয়েকে বিয়ে করো, তা হলে তুমি তো আমারও জামাই হবে। আর বিয়ে করবেই বা না কেন? নিরুপমা মেয়ে হিসেবে খুবই ভালো। আর অবনীদার মতো শ্বশুর পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। ওর কত জানাশোনা, কত কানেকশনস। ওর মতো শ্বশুর সহায় থাকলে জীবনে আর ভাবতে হবে না। এই এখানেই কি তোমার চাকরি হত যদি না অবনীদা আগে থেকে এসে আমাকে —মানে তোমার স্টুডেন্ট লাইফটা তো—"

অনিন্দ্য চুপচাপ লাহিড়ির কথা শুনে যাচ্ছিল। চাকরি করতে এসে প্রথম দিনে আর যাই হোক অফিসারের কাছ থেকে এ-ধরনের কথা প্রত্যাশিত নয়। ভেতরে ভেতরে তার এখনকার খোলসে লুকিয়ে থাকা পুরনো অনিন্দ্য কখন যেন একটু কৌতুক অনুভব করতেও শুরু করেছিল। সহসা লাহিড়ির শেষ কথাটা শুনে চমকে উঠল। অনেক প্রশ্ন ও রহস্যের কিনারা হয়ে গেল। রাখালবাবুর সন্দেহও যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হলো। অনিন্দ্যর ভেতরটা যেন ঘুলিয়ে উঠেছে। ভাবী শ্বশুরের কৃপায় ও মুরুব্বিয়ানার জোরে চাকরি পেতে হবে—এ-কথা কোনোদিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

লাহিড়ি বলে যাচ্ছিল—"আচ্ছা ইয়ংম্যান। এখন যাও তুমি। মন দিয়ে কাজ করো। ডোণ্ট ওরি। এ সন-ইন-ল অফ এ টপ বস ইজ নেভার কেপ্ট লো ইন জেমসবেরি।"

লাহিড়ির ঘর থেকে অনিন্দ্য বেরিয়ে এলো। নিজের চেম্বারে ফিরে এসে সে চুপ করে বসে রইল। তার একটুও ভালো লাগছিল না। চাকরিতে যোগ দেওয়ার সেই আনন্দ-উত্তেজনা যেন নিমেষে মরে গেছে। কাজটা তার

খুবই দরকার ছিল। কিন্তু তাই বলে এভাবে! অবনীর মতো ব্যক্তির, তার ভবিষ্যৎ শ্বশুর মহাশয়ের, অযাচিত দাক্ষিণ্যে চাকরি পেয়ে অনিন্দ্যর অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তার পৌরুষ অপমানিত লাঞ্ছিত বোধ করছে। অনিন্দ্যর মনে হচ্ছিল ষড়যন্ত্রের নিখুঁত মিহি একখানা জাল যেন তাকে ঘিরে বোনা হচ্ছে। ক্রমেই সেই জালখানা দ্রুত সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জীবনে সে আর তার বাইরে আসতে পারবে না। তার নিজের পছন্দমতো জীবন, তার প্রেম-ভালোবাসা-ভালোলাগা, সব কিছু থাকবে সেই জালের ওপারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ভয়ে আর ভালোবাসায় উদ্বেল অনিন্দ্য তার অন্তরের গভীর থেকে এই মুহূর্তে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার একটা প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করল।

কিন্তু তার আর উপায় নেই। চোখের সামনে বাবার আনন্দিত মুখ, যার হাসিখুশিতে উজ্জ্বল চোখ ভেসে উঠল। অচিন্ত্য বৃদ্ধ হয়েছেন। এই সেপ্‌টেম্বরেই অবসর নেবেন। উপযুক্ত ছেলে বাড়িতে বেকার বসে থাকায় তিনি মর্মে মর্মে চিন্তিত ও পীড়িত ছিলেন। অনিন্দ্যের চাকরি পাওয়া তাঁর তিক্ত অন্ধকার জীবনে এক ঝলক আলোর নিশানা। তাছাড়া এক অর্থহীন অহংবোধ বা নিছক ব্যক্তিগত সুখ আর আনন্দকে অক্ষুণ্ন রাখার তাগিদেও অনিন্দ্যের পক্ষে চাকরি ছেড়ে দেওয়া আর সম্ভব নয়। মুহূর্তের বীরত্বের পর আবার তো সেই ভয়াবহ বেকারজীবন। তার জন্য অনন্তকাল ধরে কেউ অপেক্ষা করে থাকবে—এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়!

অনিন্দ্যকে চুপচাপ আর চিন্তিত দেখে পাশের টেবিলের ব্রজলাল বলল—"কি দাদা। কি ভাবছেন? বস্‌ ডেকে কি জ্ঞান দিলে?"

অনিন্দ্য ক্লিষ্ট হাসি হেসে বলল—"না, জ্ঞান দেয়নি। শুধু বললে মন দিয়ে কাজ করলে এখানে অনেক স্কোপ আছে।"

ব্রজলালের হাসিতে তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল—"হ্যাঁঃ! স্কোপ আছে। আরে দাদা, এরা কাজ চায় না, বুঝলেন। শো চায়। কাজ করুন আর না করুন, টেবিলে গোটা কয়েক ফাইল ছড়িয়ে খুব ব্যস্ত ভাব দেখান। ব্যাস। তা হলেই হবে। আর, আগে আগে আসবেন, দেরি করে যাবেন—"

ব্রজলালের কথায় অচিন্ত্যর প্রতিশ্রুত ঘড়ির কথা অনিন্দ্যর মনে পড়ল।

অফিস থেকে বাড়ি এসে অনিন্দ্য শুনল বনওয়ারীকে থানা থেকে ছাড়তে রাজি হয়নি। হাজতেই রেখে দিয়েছে। অচিন্ত্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

থানার ও. সি. "আরে মশাই, আপনি কেন এইসব সমাজবিরোধী আসামীদের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছেন। আপনার কি!" ইত্যাদি সদুপদেশ দিয়ে তাঁকে বিদায় করে দিয়েছে। বনওয়ারীর বউ বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদেই চলেছে। সেই বিলাপধ্বনিতে সারা বাড়িতে একটা শোকের থমথমে আবহাওয়া সঞ্চারিত হয়েছে।

হৈমন্তী বললেন—"কেমন চাকরি করলি? মুখটা অমন শুকনো কেন?"

অনিন্দ্য কিছু বলতে যাবে, অবনী ঘোষাল এসে হাজির। অবনী এমনি-ভাবেই আসে। বলা নেই কওয়া নেই, "এই যে বেয়ান ঠাকরুন" বলে একেবারে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে। যেন কতকালের আত্মীয়।

অনিন্দ্যকে দেখেই অবনী খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল—"এই যে বাবাজীবন। আপিস থেকে এলে! কেমন লাগল নতুন আপিস?"

অনিন্দ্য মৃদু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল—"ভালোই।"

—"হেঃ হেঃ। ভালো লাগলেই ভালো। ভালো লাগলেই ভালো।" বলতে বলতে অবনী সর্বক্ষণের সঙ্গী চামড়ার ব্যাগটা হাটকাতে লাগল। তারপর একটা সুদৃশ্য প্ল্যাস্টিকের কেস বার করে বলল—"এঁটা আমি তোমার জন্যে নিয়ে এলাম। সত্যি কথাইতো। ঘড়ি ছাড়া কি আপিস করা যায়—।" অবনী কেস খুলে একটা সুন্দর সুদৃশ্য হাতঘড়ি বার করল।

হৈমন্তী অস্ফুটে বললেন—"একি?"

অবনী তৈলাক্ত মসৃণ হাসি হেসে বলল—"হেঃ হেঃ বেয়ান ঠাকরুণ। সকালবেলা শুনলাম বাবাজীর একটা ঘড়ি দরকার। ভাবলাম, তা আমিও তো কিনে দিতে পারি একটা। মনে করুন না কেন বাবাজীকে আজই আমি আশীর্বাদ করছি। অবশ্যই আন-অফিসিয়াল আশীর্বাদ। হাঃ হাঃ হাঃ—" আপন রসিকতায় অবনী হেসে আকুল হলো।

—"এসো বাবাজীবন। এসো—" বলতে বলতে অবনী নিজেই অনিন্দ্যর কাছে এগিয়ে এলো। তারপর তার অবশ অসাড় হাতখানা তুলে নিয়ে কবজিতে ঘড়িটা বেঁধে দিতে লাগল—"জানো বাবাজী, ট্রামে-বাসে চলাফেরা করবে ভেবে চামড়ার ব্যাণ্ড না নিয়ে স্টিলের ব্যাণ্ডই নিলাম। কেমন পোক্ত জিনিস দেখেছ! চোর-গুণ্ডার বাপের সাধ্যি নেই যে কেটে নেয় বা ছিনতাই করে—।" পটাস করে শব্দ করে উজ্জ্বল ঝকঝকে ইস্পাতের ব্যাণ্ডটা কবজিতে শক্ত হয়ে আটকে গেল।

অবনী অনিন্দ্যর হাতখানা একটু উপরে তুলে ও দূরে ঠেলে ধরে হাত এবং হাতঘড়ির সম্মিলিত রূপ দেখতে লাগল। ক্রমে তার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল—"বাঃ! সুন্দর মানিয়েছে। কি বলো বাবাজীবন! ও বেয়ান ঠাকরুণ। বলুন না ছেলেকে ঘড়ি পরে কেমন দেখাচ্ছে!"

হৈমন্তী খানিক বিব্রত কিছু খুশী ভাবে বললেন---"ভালো। বেশ ভালোই তো—"

অনিন্দ্যর চোখ ঘড়িতে ছিল না। নিজের হাতেও নয়। তার দুই চোখের অনিমেষ দৃষ্টি শিকলের মতো উজ্জ্বল, দৃঢ়, বলিষ্ঠ ব্যাণ্ডটার উপর স্থির-নিবদ্ধ ছিল। তার বুকের ভেতরটা যেন এক অজানা ভয়ে অনির্দিষ্ট শঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল, সে ধরা পড়ে গেছে। আর কিছুই করণীয় নেই। একটা প্রগাঢ় অসহায়তা, অবলম্বনহীনতা তাকে তলহীন গহ্বরের মতো ব্যাদিত মুখে গ্রাস করে নিচ্ছে। সহসা কি জানি কেন অনিন্দ্যর সকালবেলাকার বনওয়ারীর হাতের হাতকড়ার কথা মনে পড়ল।

প্রথা মতে অনিন্দ্যর উচিত ছিল অবনী ঘোষালকে প্রণাম করা। সেই সঙ্গে হৈমন্তীকেও কিন্তু অনিন্দ্য সেসব কিছুই করল না। অবনীর হাত থেকে নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলল। যেতে যেতে বারান্দায় সে বনওয়ারীর বউয়ের গুনগুন কান্না শুনে হঠাৎ চমকে উঠল।

কেননা, তার সহসা মনে হলো ঐ কান্নার আওয়াজটা নিজের বুক থেকেই উঠছে। তার হৃদপিণ্ডের মধ্যে বসে ললিতা গুনগুন করে কাঁদছে।

অথচ অনিন্দ্য ভেবে রেখেছিল—প্রথম দিনের চাকরির অভিজ্ঞতা শুনিয়ে ললিতাকে প্রচুর হাসাবার পর আজই সন্ধ্যায় একেবারে হঠাৎ নিতান্ত খাপ-ছাড়াভাবে একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে ললিতার আনন্দ তার হতাশ আর বিষণ্ণ চোখের কোণে কীভাবে একটা মুক্তো হয়ে ফুটে উঠছে!

বাঙলাদেশ

বিতোষ আচার্য

জীবনের স্থিতচর্যা মৃত নক্ষত্রের মতো খসে খসে
বিশ্রান্ত নদীতে ডুবেছে,
কি আশ্চর্য অন্ধকার ঝোড়োচুলে এ যুগের কুশীলব ঘাড়ে বয়ে
রাতভোর নদীগর্ভ তোলপাড় করে

এই তো সেদিনও—
শ্রান্ত নদীপ্রান্তশায়ী বয়স্ক দেহাতে অন্বেষণে ত্যক্ত হলে
প্রৌঢ় পথ অল্প কেসে ঘনিষ্ঠ আলাপে
ধূসর লণ্ঠন জ্বেলে ডেকে নিয়ে যেত :
কঠিন চোয়ালে স্থির তন্ময় মানুষ
নিস্তব্ধ নদীর বাঁকে বঁড়শি বাইত অবেলায়,
নদীগর্ভে পুষ্ট জাং-এ ঠাণ্ডা পলি মেখে
সশব্দে কলসী ভরে জল ছলকে মায়াবী রমণী
ঘরে যেত

তারপর অন্ধকার বাঙলাদেশে বহু সূর্য পরিচর্যা দিয়ে গেছে :

যুগজীর্ণ কুটিরের রাতজাগা জানলায় জানলায়
অব্যক্ত প্রাণের মর্ম দগ্ধগাঢ় মমতার মোমে সুস্থির শিখায় কেঁপেছিল,
জোড়া ভ্রূর ধনুকে ধনুকে জেগেছিল অগ্নিবর্ণ শরের উদ্ভাস,
দুর্মর মানুষগুলো ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ফেটে পড়ে
আচমকা ঋজুস্কন্ধ, ক্রুদ্ধ, দুর্বিনীত

তবু অন্ধকার লেগে আছে :
মৃত নক্ষত্রের উল্কা, বিকলাঙ্গ কুশীলব—সব বুকে করে
ধ্যানমগ্ন শীর্ণ নদী ;
আর বাঁওড় বাতাস সারারাত
সারারাত কী অভিনিবেশে অসংখ্য তরঙ্গ তুলে
যেতে চাইছে সমুদ্রের দিকে।

আমার কী করণীয়

সত্যব্রত ঘোষ

এক.

আয়ুধে সজ্জিত, মূঢ়
ভয়ঙ্কর সাবলীল প্রত্যক্ষ ক্রীড়ায়,
স্বজনবিরোধী অবিমৃষ্যকারিতার
চলন্ত যানের নিচে বিশেষত যুবকজনের
পিষ্ট হৃৎপিণ্ড, কিংবা অঙ্গগুলি চূর্ণ হতে দেখে

আমার কী করণীয়, ভেবে স্থির করার আগেই
চিকিৎসালয়ের দিকে
তৎক্ষণাৎ কিছু লোক তবু
অন্তর্হিত হয়।

দুই.

নিয়ত আমার
সর্বাঙ্গে কোলাহলের ব্যথা,
অবিরাম
মস্তিষ্কে প্রলয়, নাকি রক্তের ক্ষরণ—
সংগ্রামের কী যে অর্থ,
সংঘাতের সংজ্ঞা, বুঝি নিরূপিত হবে না এখন ?

তিন.

পরিধি ব্যাপক হলে
মুস্কিল-আসান বড় দুরূহ ব্যাপার !
পরিধি ব্যাপক হলে
মহত্ত্বের ভীষণ সন্তাপ !
একান্ত নিজস্বধ্যানে
নানাবিধ জটিলতা গ্রন্থিমুক্ত হতে গিয়ে শেষে

আলখাল্লা খুলতে বড মায়া লাগে, দোস্ত,
আলখাল্লা খুললে দীন শরীরের স্বপ্ন ভেঙে যায়।

চার.

আয়ুধে সজ্জিত এক ভয়ঙ্কর সাবলীল প্রত্যক্ষ ক্রীড়ায়
আহত বিবেক, আমি,
আমার কী করণীয়—স্থির করা এখনো গেল না।

দুই বাঙলা

মিহির সেন

মুখের সামনে আগুন জ্বলে,
বুকের লোমও সে উত্তাপে
সলতে পোড়ে ; অনেক সয়ে
মাথায় বাঁচার আগুন চাপে :
—বর্শা হাতে পূব-বাঙলা !
একই আগুন, কী যন্ত্রণা !
যন্ত্রণাকে খুঁজতে নেমে
আত্মরতির অন্ধকারে
পথ হারিয়ে গোলকধামে
আমরা, অবাক, চুপ-বাঙলা

অলক্তে রাতুল জল, গ্রীবাভঙ্গিমার ঊর্মিমালা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অর্ধমানবীর প্রায় জেগে ওঠে পাথর-প্রতিমা।

কাছ ঘেঁষে তরী ধায়—বাতাসে বাদাম অসম্ভব ফুলে ওঠে,
ভামিনী-ভুরুর ছাঁদে বাঁকা স্রোত,
গাঢ় মরিচার রং দুই তটে,
নিশীথে, ভোরের স্বপ্নে মধ্যসমুদ্রের থেকে ঘন ঘন ডাক আসে,
পূরন্ত গর্ভিনী যেন ত্রিভুজের প্রাচীন প্রথায়
জানু খুলে ছেড়ে দেয় শোণিতের অবাধ জাহ্নবী।
সরু গিরিখাত বেয়ে উপত্যকা ভাসানো সুনীল
এভাবে উদার ঢল,
ছোটো আরও ছোটো হয় বিধৌত স্থলের
তমাল-হিন্তাল-রাজি-নীলা,
গলা খুলে 'নির্বাসন' হেঁকে ওঠে ব্যথিত জাহাজ,
লক্ষ্যহীন উন্মাদ তরণী।

মেঘ অন্ধ দিশাহারা
কুটিল কুলটা আলো চলে গেলে দ্বিগুণ আঁধারে
এ ভাবে দাপট খোলে কণ্ঠে পাখ্সাট-ছুট্তান
কপাট-খিলান নাই মোহ-আবরণ
শির-ছেঁড়া হাত দিয়ে গলে যায়
এত যত্নে গড়ে তোলা শরীরের বিলাসী নির্যাস
ধ্বনি প্রতিধ্বনি ধ্বনি
কারামুক্ত কয়েদীর উল্লাসে অধীর—
বহু দূরে পড়ে থাকে
মগ্ন বালুকায় ছিন্ন পাদুকা, প্রেমের অস্থি, সেনানী-শিবির।

যাও, তারে বোলো গিয়ে—না, কিছু বলার নাই
কথা কথা কথা
শুকায়ে গিয়েছে কণ্ঠ
তাই মেঘে মেদুর অম্বর
করুণায় ভেঙে পড়ে
খুলে যায় হাজার দুয়ারী
একাকার দিগন্ত দ্রাঘিমা
গরমে ভাসান দেয় থেকে থেকে ফিরোজা আগুন
তরঙ্গের শাণিত শিখরে।

এই গাঢ় মেঘমন্দ্র স্বরে
শোনা যায় তার গান ফিরে ফিরে গানের ওপারে,
নাকি সেই-ই পারাপার, প্রতিকার, নিষিদ্ধ-সাহস?
যেদিকে তাকাও, তার সিক্ত চরণের
অলক্তে রাতুল জল, গ্রীবা-ভঙ্গিমার ঊর্মিমালা,
ভোর হলে ভয়ঙ্কর বেজে ওঠে লাল দমকল,
অমোঘ তর্পণ-লগ্নে করপুটে দক্ষিণমুখিনী
তুলে ধরে আকাশের রক্তিম গোলক
খরধারে সদ্যছিন্ন, ছটফটে, গরম কলিজা।

একেক দিন

তুলসী মুখোপাধ্যায়

একেক দিন সিন্ধু-সারস বুকে করা অবশ্য জরুরি
নইলে পায়ের তলার মাটি বুনো মোষের মতন বেঁকে বসে
চোরকাঁটা ছেঁকে ধরে বিকেলের বেড়ানো বাতাস
যখন তখন চোরাবালু খপ করে জামা টেনে ধরে।

একেক দিন হাতের তালুর মধ্যে চাঁদ পাওয়া ভালো
নইলে বিষুবের জ্বালামুখ খুলে চাট হয়
উঠোনে ডালিম ফুল দরকচা মেরে ঝরে যায়
বিরুদ্ধবাদী উকুনের বাসা ফুসফুসে কিলবিল করে।

একেক দিন আতস কাঁচে মুখ দেখা ভীষণ দরকার
নইলে দেয়ালে উই-এর ছাপ পুরু হতে থাকে
প্রাতরাশ বমন-বমন ভাবে ধোঁয়া হয়ে যায়
সামিয়ানা ভেঙে পড়ে মাথার উপরে।

একেক দিন দুহাত উপরে না উঠলে
মাধ্যাকর্ষণের টান মোটে বোঝাই যায় না।

অন্ধকার

মনীষীমোহন রায়

ভাঙলে অনেক সিঁড়ি, বসালে হাজার দাঁড়ি
তবু থাকে অন্ধকার হাজার দুয়ার ··

বাহিরে ভিতরে তার শব্দময় ধূলিময় ঝড়
মনে মনে শব্দহীন কলরোল তার
তবু যাত্রা···শুধু যাত্রাময়
উত্তর হারানো প্রশ্ন চক্রাকারে ফেরে···
যতই পেরোই সেতু, বসাই হাজার দাঁড়ি
সিঁড়ি ভাঙি
অমেয় যোজন জুড়ে জন্মান্ধ-যন্ত্রণা-ঘোর
শব্দময় শব্দহীন কলরোল তার।

দণ্ড দাও

সুকোমল রায়চৌধুরী

বসত বাড়িটা থেকে সুদীর্ঘ আহ্বান
"দণ্ড দাও"
রৌদ্রময় চূড়া থেকে বিক্ষত আজান
এক মুঠ্ স্তব···ভিক্ষা
এক বুক গান···ভিক্ষা
আকাশে উধাও।
বারান্দার বুক চিরে দুপুর রোদ্দুর
থামগুলি ভেঙে দিয়ে রাস্তা বরাবর
বুকে বুকে বুকের তল্লাস
বারান্দার বুক চিরে—
দেয়ালে প্রতিফলিত কিসের আভাস?
বসত বাড়িটা থেকে রাস্তা বরাবর
দণ্ডভিক্ষা প্রাচীন ভিক্ষুর।

বসত বাড়িটা থেকে আকাশ অবধি
একটি প্রার্থনা—"দণ্ড দাও"
বুক থেকে কলজে অবধি
সব বাধা ছিঁড়ে ফেলে নৈঃসঙ্গ্য মেশাও
দণ্ড দাও, দণ্ড দাও।

চলো সাগরে

বিজন ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় তরঙ্গ

[রাত্রি। শহর-উপান্তে জঙ্গলের পটভূমিতে ডাকবাংলো প্যাটার্ন একখানি ঘর। পিছনের জানালা খোলা। কাটা জানালা। ভেতরে দুটো সেজ লণ্ঠন জলছে। একটি আলোতে কালিন্দী ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে। অন্য আলোতে কমরেড প্রভাত মজুমদার ছোট্ট একখানি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে কাগজের ওপর লিখে চলেছেন। শান্ত সমৃদ্ধ পরিবেশ।

হঠাৎ কাটা জানালার পিছনে ঝোপঝাপ নড়ে ওঠে। কয়েকজন আদিবাসী জানালা জুড়ে দাঁড়ায়। গাছের ওপর তাদের লম্বা ছায়াগুলো কাঁপে। দূরাগত মাদলের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। ওরা এগিয়ে আসে। সসম্মানে ডাক দেয়।]

মাইকেল : কমরেড—কমরেড—! ···(এগিয়ে যায় কমরেড প্রভাত মজুমদার)

শুনলম, তুই নাকি মোদের ডাকা করাইছিস? তাই মোরা তোর কাছে আসলম। মুংরা সাঁওতাল বুল্ল, তুই নাকি জমি বিলি দিছিস ভুঁইচাষীদিগে, বীজধান দিছিস, চাই কি চাষী যদি সজ্জন হয়, সমিতির সামিল হঁয়ে খুনের বদল খুন দিয়ে ঝাণ্ডার ইজ্জত কায়েম রাখে, তো মুংরা সাঁওতাল বুল্ল—এক বছরের কড়ারে কর্জাধান শুধিবার মুচলেখায় তুই মোদের বলদ লাঙল ভি দিবার পারিস। তাই মোরা তোর ঠাঁই শপথ নিতে আসলম। তা কুথায় পাট, কুথায় থান? কি ছুঁয়ে বা কিরা কাটব, শপথ লিব—তুই মোদের বুলিস কেনে কমরেড।

প্রভাতদা : তোমার নাম কি?

মাইকেল : আমার নাম আইজ্ঞা কমরেড মাইকেল বিল্‌হন। নিবাস পোড়াবাড়ি। আসেক কেনে? ইয়ার নাম নরসিং রাজবংশী! নিবাস জঙ্গলবাড়ি। চা-বাগানে কাম করত। গত

চা-বাগিচা শ্রমিক আন্দোলনের সময় সাহেবের প্রতিবাদী হইয়ে হটাবাহার হইয়েঁছে। পরথম ছিল ভূমিহীন চাষী, দুই বচ্ছর অন্তে হয় বর্গাদার, ই বছর জোতদার উয়াক উঠবন্দী করাইছে। জমি কেড়ে লিয়ে এক তাঁবেদার দিয়া ক্ষেতি করাইছে—মাগ-ছেল্যা লিয়ে উ এখন তাই উয়ারই এক জ্ঞাতিকাকার ঠাঁই এসেছে। তাগড়াবদন চওড়া দিল—কথা কামে ফারাক নাই—সমিতির কামে প্রাণ দিবে তাই সংগে আনলম। —শুধু চায় একটু জমিন। আর ইয়ার নাম আইজ্ঞা কমরেড সোমরা, সাঁওতাল—মদেশীয়—কহেক না।

সোমরা : বসতি ছিল মোর বাংলা-বিহার বর্ডার সীমানা। এখন যেইখানে ইঞ্জিন বনাইছে, চিত্তরঞ্জন কারখানা। সিখানে আমরা সকল ছিলম। সাতপুরুষের বসবাস মোদের। একদিন দেখলম মোদের ঘর ভাঙতে এসেছে। —লোহার ইঞ্জিন—নাম শুনলম বুলডগবাজার। —সি এক লোহার দৈত্যের সামিল—দাঁতপাতে মাটি কেট্যে ঘরবাড়ি গাছগড়ান সব মোদের ধূলা করি দিল। সাতপুরুষের ভিটা মাটি জমিন—জমিনই তো মা, মাগী। অনেক সর্দার দখল ছাড়ল নাই। —বুল্ল, বার কর তীর ধনুক—আখরী লড়হাইটো ইখানেই। —তা রাতে যুদ্ধ, দিনে বিরাম। সাতদিন অন্তে অনেক পলাইয়ে গেল দামোদর পার। যারা মাটি কামড়ে পইড়ে থাকল, তাদিগে দাঁতপাটিতে চিবাই খাইল বুলডগবাজার। অনেক মারলম, অনেক মরলম! তারপর বাপদাদামায়ের স্মরণে তিন-তিনটা মাটির পিদ্দিম জ্বালাই এক রাত পাড়ি দিলম এক চা-বাগিচার ঠিকাদারের সাথ। তা সিখানেও যুদ্ধ, ইখানেও যুদ্ধ। আমার কপালে সুখটো নাই। ইউনিয়ন করলম, মোর্চা বনাইলম, তো আমাক দেগে দিল হটাবাহার। ছাড়লম বাগিচা, ধরলম জমিন, তো ফিরভি সেই উঠবন্দী—দুনিয়ার হটাবাহার। মনটো খুব দুখাইল। দুনিয়ার আমি ঠিকই বটে, কিন্তুক আমার কোন দুনিয়া নাই। ভাবতে ভাবতে মনটাক সমঝাইলম—ই একটা মস্ত ঠকবাজী। আমার দুনিয়াটাক

আমাকই বনাইতে হবে। ভাবলম, যেইখানে আমি, সেই মোর দুনিয়া। মাগীটাক বল্লম কথাটো—উ হাসতে লাগল। বুঝ, কথাটো হকের বটে, কিন্তুক ই কথাটো তোর কোন মানবে? তখন ঠিক করলম, জংগলের আমি জংগলেই যাব। তো এই যখন মনে ঠিক দিলম, তখন শুনলম তুরা শহর ছেড়ে জংগলে আসছিস আমার দুনিয়াটাক কায়েম করতে। তখন মাগীটাক একটা চুমা দিলম। পরাণবন্ধু মাইকেলের সাথ চলি আসলম তুদের ঠাঁই। —কি ভাবছিস?

প্রভাতদা : তোরা কজন আছিস?

মাইকেল : ইখানে বেশি নাই, জনা দশ-বারো। ধাওড়ায় যাবি তো দেখবি পংগপাল—হাজার হাজার। যাবি তুই?

প্রভাতদা : যাব। কালিন্দী—আমি একটু ঘুরে আসছি।

কালিন্দী : এসো।

সোমরা : বউটা একা থাকবে?

প্রভাতদা : তো তোর বউটাকে রেখে যা সঙ্গী হিসাবে।

সোমরা : থাকিস কেনে? (কালিন্দী এগিয়ে গিয়ে ডাকে)

কালিন্দী : এসোনা—কি নাম তোমার?

কালিয়া : কালিয়া।

কালিন্দী : আমার নাম কালিন্দী।

মাইকেল : কালীয়দমনটা কমরেড ইবারে তবে হবেই বটে। চক্রটা আনিস চক্রধারী।

কালিন্দী : শুনলে?

প্রভাতদা : শুনলাম। ওরা ব্যাখ্যাটা ভালোই করে, ঠিক করে—আমরা ভদ্রলোক মার্কসবাদীরাই তার অপব্যাখ্যা করি। কেননা প্রত্যেকেরই জড় আছে, জট আছে। ও তো বলে দিল আমিই শ্রীকৃষ্ণ। খুব মুস্কিল কালিন্দী…কালীয়দমন…যাই হোক—যাচ্ছি।

কালিন্দী : এসো! (প্রভাতদা ও অন্যান্য সাঁওতালরা বেরিয়ে যায়। ঘরে থাকে কালিয়া ও কালিন্দী)

কালিন্দী : তোমাদের দুজনের সংসার?

কালিয়া : একটা বেটা নিয়ে মোরা তিনজনা ।

কালিন্দী : কত বড় ছেলে ?

কালিয়া : গ্যাদা না—এত্ত বড় ।

কালিন্দী : নাম কি ছেলের ?

কালিয়া : জংলী। সকাল থিকা সাঁজতক খালি জংগল ঘুরবে—খরগোস ধরবে, শিয়াল মারবে, পাখি পালবে। তাই নাম রাখলম জংলী।

কালিন্দী : সুন্দর নাম। একদিন ছেলেকে নিয়ে এসোনা ?

কালিয়া : আনব। —তোর ছেল্যামেয়া কয়জনা ?

কালিন্দী : আমার ? আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই।

কালিয়া : (চুকচুক শব্দ করে) ইয়ার একটা ওষুধ আছে দিদি। গুণ করালে পারতিস।

কালিন্দী : তোর দাদা বলেন—না।

কালিয়া : তুই কিছু বুলিস না ?

কালিন্দী : কি বলব ?

কালিয়া : জনম না দিলে জনম হয় না—একটা মেয়ে মা হয় না।

কালিন্দী : থাক কালিয়া। —তুই কিন্তু ছেলেকে একদিন আনবি।

কালিয়া : সে তো আনব। কিন্তুক বেটা পুত নাই, ছেলের কদর তুই কি বুঝবি ? আমার সমাজে তোর মত মেয়ার ইজ্জত নাই। বাঁজা মেয়া আর অফলা জমিন—দুই সমান।

কালিন্দী : আগে জমিনটা সুফলা হোক, তারপর মেয়েটাও আর বাঁজা থাকবে না কালিয়া—আমিও তখন মা হব। ধানটা না মিললে মানটা রাখবে কে ছেলের ?

কালিয়া : ইটা তুই ঠিক বুলছিস। লিখাপড়া জানিস, তুদের অনেক বুদ্ধি আছে, অনেক দেমাক। আমাদের ঐ বুদ্ধিটো নাই। ঘর ঘর মোদের ছেল্যা আছে, মেয়া আছে, কিন্তুক দানাটো নাই। আর দানা নাই তো ছেল্যামেয়ারও কোন ইজ্জত নাই। ভুখা মরে।

[হঠাৎ নেপথ্যে গণ্ডগোল ওঠে। কালিন্দী ও কালিয়া সন্ত্রস্ত পদক্ষেপে কাটা জানালার দিকে এগিয়ে যায়।

মঞ্চ অন্ধকার।

ড্রাম বিটিং।

ব্যাকগ্রাউণ্ডে তীর-ধনুকধারী আদিবাসীদের ছায়া-মিছিল। একটা আদিবাসী সঙ্গীতের উন্মত্ততা। এই সঙ্গীত মিলিয়ে গেলে রুট মার্চের শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। এবং এই শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়।

মঞ্চ আলোকিত হয়।

দেখা যায় পোড়াবাড়ির একখানি মানচিত্রের কাছে দাঁড়িয়ে একজন সৈনিক পুরুষ ছড়ি দিয়ে দেখিয়ে পোড়াবাড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও আদিবাসীদের অবস্থান সম্পর্কে ভৌগোলিক বর্ণনা দিচ্ছেন।

"Mark, these are troubled spots : Porabari, Junglebari and Harinbari. সারি ইলাকা সন্ত্রাসবাদীয়োঁ কি কব্জেমে হ্যায়। উনলোগ শান্তিবাদী সাধারণ জনতা ঔর জোতদার কি উপর সন্ত্রাসরাজ চালু কিয়া হ্যায়। ইন লুটেরা লোগ জমিন রূপেয়া ঔর গাই-গৌ—সব লুট রহে হ্যায়।

আব যব তুমলোক ই ইলাকামে যাওগে, বহুৎ হোসিয়ারিসে ঔর একাট্রে হো কর যাওগে। কেঁও কি, সারি জঙ্গলমে ইয়ে দুষমনো ছিপে রহতে হ্যায়। আচানক ইয়ে দুষমনো তুমহারি উপর চঢ়াও হো সকতে হ্যায়। ইস বারেমে তুম জরুর হাতিয়ার লে কর তৈয়ার হো যাও, ঔর গোলি চালাও মারনেকে লিয়ে। ঔর ই`হাসে যব তুম ঔরভি উত্তরকে তরফ বাঢ়োগে, তো টেরাইকে জঙ্গল পাওগে—যাঁহা সন্ত্রাসবাদী লোগ মিলিটারিকে ডরসে ভাগকর ছুপে হ্যঁায়।"

সামরিক অফিসারের কমেণ্টারি শেষ হতেই বাতাস ও আদিবাসীদের ইয়েলিং ফেটে পড়ে এবং ক্রমে সেই শব্দ মিটিং-এর এলোমেলো গণ্ডগোলে পর্যবসিত হয়। মঞ্চ এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। আলো ফুটতেই দেখা যায় মিটিং চলছে রাজনৈতিক কর্মীদের।

মিটিং। সভাপতি—প্রভাতদা। অন্যান্য বিপ্লবীগণ সমুপস্থিত]

বিপ্লবী ৩(ক) : আদিবাসী ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদের জমির লড়াই আজ জনগণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে প্রাগ্রসর হয়ে একটা বৈপ্লবিক গুণগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় জনসাধারণের সংগ্রামকে দাবিয়ে রেখে রাজনৈতিক আন্দোলনের গলা টিপে মারলে শুধু জনসাধারণের উপরেই নয়—বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপরও আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

বিপ্লবী ৩নং : শোধনবাদীদের চোখ দিয়ে পোড়াবাড়ির ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের জমির লড়াইকে বিচার করে আমাদের রাজনৈতিক হঠকারী সাব্যস্ত করলে পার্টি নেতৃত্বের উপর—যাঁরা অনিবার্যভাবে জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মারছেন, তাঁদের প্রতিও—আর আমাদের আস্থা রেখে চলা সম্ভব হবে না।···আপনি কিছু বলবেন ?

বিপ্লবী ২নং : বলছিলাম—ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদের জমির লড়াই জমির পরিপ্রেক্ষিতেই সীমাবদ্ধ রাখলে কি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে? আমার প্রশ্নটা এইখানে। আপনারা বলছেন—জমির লড়াই রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রাগ্রসর হয়ে গুণগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে একটা বৈপ্লবিক অবস্থা তৈরি করেছে। কমরেড, কিছু মনে করবেন না। এই বৈপ্লবিক চেতনা—যেটা লাগাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে থেকে অনেক আয়াসে বহুদিন ধরে আয়ত্ত করতে হয়—পোড়াবাড়ি, জঙ্গলবাড়ির এই সহজ সরল আদিবাসীরা সেই চৈতন্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছে, একথা আমি অন্তত স্বীকার করি না। এতে করে আমার মনে হয়—দেশের বড় বড় জোতদার ও ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদের এই ন্যায্য জমির লড়াইকে বানচাল করবার সুযোগ পাবে। তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী অতিবৈপ্লবিক কার্যকলাপের নজির দেখিয়ে জমির লড়াইয়ে চাষীর ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করবে।

বিপ্লবী ৩নং : This is Revisionism. আমলাতন্ত্রের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে এই আপোষ করার মনোবৃত্তি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের কথায়

সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা এই সংশোধনবাদী মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করি।

বিপ্লবী ২নং : কমরেডস! আমি আবার বলছি—এটা সংশোধনবাদী আপোষকামীর কথা নয়। নয়া-সাম্রাজ্যবাদী কুশাসনে জর্জর আমার দেশ মনোপলি ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে সোভিয়েট নীতির হুবহু অনুকারী নীতি অনুসরণ করে পরিত্রাণ পাবে না জানি। তবে স্থান-কাল-অবস্থা অস্বীকার করে অতিবিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নির্দেশে দেশের জনসাধারণের মহা অকল্যাণ করা হবে। তাই আপনাদের কাছে আজ আমার এই বক্তব্য যে, জমির লড়াইকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন। জমির লড়াইকে রাজনৈতিক লড়ায়ের পর্যায়ে নিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দেশের জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুন। সে-দায়িত্ব আমরা গত ত্রিশ বছরের মধ্যে কেউ কোনোদিন পালন করিনি। ধনুর্বাণের ব্যবহার জানলেই গাণ্ডীবী হয় না। যে গাণ্ডীবী, সেই হবে অর্জুন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিনের মতে তবেই তার বিপ্লবে অধিকার বর্তাবে।—লাল সেলাম।

বিপ্লবী ৩ (গ) : তুমি বিপ্লবের অবমাননা করছ।

বিপ্লবী ৩ (ঘ) : জঙ্গলবাড়ি, পোড়াবাড়ি তোমার বাড়ি আমার বাড়ি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

(মিটিং-এর শেষটায় গণ্ডগোল, চেঁচামেচি। দূরাগত আর্ত চীৎকার। মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। ঘরের ভেতরে ধোঁয়া। বাইরে রুটমার্চের আওয়াজ)

কালিন্দী : বারুদের গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না।

প্রভাতদা : যোগাযোগের সবগুলো পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জঙ্গলের কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। চোরাপথ ধরে জোতদারের লোকেরা সশস্ত্র শান্ত্রীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ওদিকের খবর এদিকে আসছে না, এদিকের খবর ওদিকে যাচ্ছে না।

কালিন্দী : কি করবে?

প্রভাতদা : ভাবছি।

(রুটমার্চের শব্দ মিলিয়ে যায়। কালিয়া ছেলে কোলে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করে)

কালিন্দী : কালিয়া—কি হয়েছে কালিয়া ?

কালিয়া : মনটায় বড় তরাস লেগেছে আমার। তাই ছেল্যা নিয়ে পলাই আসলম। মরদরা সব জংগল পলাইছে—ঘরের আঙিনায় সৈন্যরা সব তাঁবু গেড়েছে—চাঁদমারি করছে টিলাটায়। দিন-রাইত বন্দুক ফুটাইছে, কুচকাওয়াজ করতে লেগেছে। হাঁকড় আর হুঙ্কারে বনের পশুপাখি সব পলাইছে—আমি আর থাকি কোন সাহসে ? তাই চলি আসলম তুদের ঠাঁই। এই চিঠি।

প্রভাতদা : (চিঠি পড়ে) যা আশঙ্কা করেছিলাম।

কালিন্দী : কি ?

প্রভাতদা : আসলে সংগঠন, সংগঠন যদি জোরদার না হয় তো এই ধরনের জরুরি কোনো অবস্থায় কোনো কিছুই করা যায় না।

কালিন্দী : ঘটনাটা ঘটলও কিন্তু আকস্মিকভাবে। সাতদিন আগেও কি ভাবতে পারা গেছে ?

প্রভাতদা : ভাবতে পারা যায়নি ঠিকই—কিন্তু নেতৃত্বের পক্ষে এই অজুহাত অমার্জনীয়। হাজার হাজার লোকের জীবন নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করতে পারো না। (পড়ে) "তরাই অঞ্চল থেকে সুদূর নাগাল্যাণ্ড, আসাম সীমান্ত পর্যন্ত ভূমিহীন চাষীর এই আন্দোলন আজ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়ায়ের দিকে ঐতিহাসিক নিয়মেই দুর্বারগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন এলাকার সংগ্রামী জনতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আঞ্চলিক ভাবে লড়ায়ের tactics and strategy সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট do's and don'ts সমন্বিত সকাল-বিকেল দুই প্রস্থ বুলেটিন—as yet we have no transmitter system—এখনই চালু করা প্রয়োজন। এ-বিষয়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আমাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারবেন। এ-সম্পর্কে আপনার ও সংশ্লিষ্ট অন্য কমরেডদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হবে জেনে বিষয়টি ত্বরান্বিত করুন" ইত্যাদি ইত্যাদি—

সব মানলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু আসল লড়াইটা যেখানে চলেছে, সেখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে tactics and strategy আমি কি বাতলাব ? বুলেটিন বেরুবে কাকে ভিত্তি করে ! সুদূর তরাই অঞ্চল থেকে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত · তবে কি···

কালিন্দী : কি ভাবছ ?

প্রভাতদা : না কালিন্দী, চুপ করে এখানে বসে থাকা আর হাত কামড়ানোর কোনো মানে হয় না। আমি বরং চোরাবাট ধরে ওদের সঙ্গে একটা contact করবার চেষ্টা করি।

কালিন্দী : বুঝলাম। কিন্তু বুলেটিন তো আর জঙ্গল থেকে বার করা যাবে না। আর তুমি এখানে না থাকলে···

প্রভাতদা : হ্যাঁ, কিন্তু কিসের ভিত্তিতেই বা আমি এখানে থেকে—

কালিন্দী : তার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত খবরাখবর, যা কিছু ঘটছে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে—তার সব কিছুই এই হেড কোয়ার্টারে সরবরাহ করতে হবে। বিভ্রান্ত না হয়ে এখন emergency বুঝে কাজ করতে হবে। চিঠিতে এক জায়গায় আছে—"ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই আমাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারবেন।" আমার মনে হয় গোটা অবস্থাটা বিবেচনা করে কমরেড এখানে ঠিকই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রভাতদা : হ্যাঁ, কিন্তু তেমন মেয়েই বা আমরা পাচ্ছি কেমন করে, কাকে পাচ্ছি, কজন পাচ্ছি ?

কালিন্দী : পেতেই হবে। অন্তত একজনও যদি থাকে তো সে-ই যাবে।

প্রভাতদা : কে যাবে ?

কালিন্দী : আমি যাব। আমি গিয়ে কালিয়ার মতো আর দশজন বিশ্বস্ত মেয়েকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃত তথ্য তাদের দিয়েই এখানে রোজ সরবরাহ করতে পারব···

প্রভাতদা : তা তুমি পারবে। তোমার ওপর আমার সে বিশ্বাস আছে। কিন্তু দেখতে তো তুমি ওদের একজনের মতোও নও। হাজারটা মেয়ের মাঝখান থেকে পুলিশ অনায়াসে তোমাকে স্বতন্ত্র একজন হিসেবে ঠিকই চিনে নেবে। ওদের মাঝখানে

থেকে তুমি তো কাজই করতে পারবে না।

কালিন্দী : ওটা খুব বড় কথা নয়, প্রয়োজনে আত্মগোপন করবার ইচ্ছা থাকলে···

প্রভাতদা : এখানে আত্মগোপন অর্থে যে আত্মবিলোপ। ঐ চুল, ঐ মুখ, ঐ নাক—কি করে তুমি তোমাকে ঢেকে রাখবে?

কালিন্দী : বেশ তো, আমার দ্বারা সম্ভব না হলে আর কেউ—মোট কথা ও কাজটা আমাকেই ছেড়ে দাও।

প্রভাতদা : বেশ, তাই দিলাম। কিন্তু দেখো···

কালিন্দী : এ-লড়াইয়ে মেয়েদের দায়িত্ব সমান প্রভাত!

প্রভাতদা : একশবার, কিন্তু এই স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করাটাই হচ্ছে আসল কথা। সেটা মনে রেখো।

কালিন্দী : আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি।

প্রভাতদা : বেশ। কে যাবে না-যাবে ব্যবস্থা করো। হ্যাঁ, তবে সবার আগে আমার ক-টা কথা আছে।

কালিন্দী : সে তুমি যে যাবে তাকেই বলো। তোমার সঙ্গে দেখা না করে সে নিশ্চয়ই যাবে না।

প্রভাতদা : বেশ, কথা রইল। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। রাত্তির হলে কিছু ভেব না।

কালিন্দী : এসো। (প্রভাতদা বেরিয়ে যান) কালিয়া—আমাকে কি খুব সুন্দর দেখতে?

কালিয়া : সে আমি কেনে কথাটো সকল বুলবে দিদি।

(কালিন্দী দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে আয়নায় নিজের মুখ দেখে। একটু সময় পর সে যখন মুখ ঘোরায়—দেখা যায় কালিন্দী আদিবাসীদের মেকআপে। সে যেন কালিয়াদের গোত্রেরই একজন। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। মঞ্চ আলোকিত হয় প্রভাতদা টেবিলে রাখা টেবিল-ল্যাম্পের সুইচ অন করলে। দরজায় টুকটুক করে আওয়াজ হয়। মৃদু ডাক শোনা যায় "কমরেড, কমরেড"। প্রভাতদা গিয়ে দরজা খুলে দেন)

প্রভাতদা : কে?

সোমরা : আমি সোমরা সাঁওতাল। মাইকেল বিলহন আমাক পাঠাইছে। ই চিঠি।

প্রভাতদা : ভেতরে এসো।…আর কি কাগজপত্র আছে সঙ্গে ?
(সোমরা আরও কাগজপত্র এবং চিঠি বার করে। কমরেড পড়েন ও পাইচারি করতে থাকেন। লিখে কয়েকটা চিঠির উত্তর দেন)

প্রভাতদা : আচ্ছা সোমরা, তুমি পোড়া ও জঙ্গলবাড়ির কটা ধাওড়ায় কি কি দেখলে ? জঙ্গলে যারা আছে, তাদের সঙ্গে ধাওড়ার কুলি-কামিনদের সম্পর্ক কি রকম ?

সোমরা : আইজ্ঞা কমরেড, পোড়া আর জঙ্গলবাড়ি এলাকায় সে অনেক আছে। আমি পাঁচ-ছয়টা ধাওড়ার কথা জানি। বিলহন আমাক পাঠাইছিল কামে। তা দেখলম জংগলের লোক-গুলানের সাথ ধাওড়ার লোকগুলার সমঝোতা আছে। ধাওড়ার মেয়া কামিনগুলা জংগলের মরদগুলাকে খোয়াইছে। জংগলের মেয়াগুলা—যারা জোতদারের দাপটে ক্ষেতিজমি ছেড়ে চলে আসছে, তারা—বালবাচ্ছা কচি গ্যাদা নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে বটে ধাওড়ার মেয়াগুলানের কাছে। তবে ধাওড়াগুলা এখন আইস্তে আইস্তে বাগিচার টহলদার রাতপহরার নজরবন্দী হইযে আসছে। জোতদার, মহাজন আর পুলিসের সমঝোতায় সব চা-বাগিচা মালিকেরও একটা জোট বেঁধে উঠেছে। আর কুচকাওয়াজ চলছে—দিনে কি রাইতে টহলদার, শান্ত্রী, পুলিসের কমী নাই।

প্রভাতদা : হুঁ, আর কোনো চিঠিপত্র নেই ?

সোমরা : আইজ্ঞা কমরেড, না। বিলহন বুল্ল, তোর কাজ এখন যোগান দেওয়া। চিঠি দিবি, চিঠি আনবি। ইটা নাকি একটা ভারী দায়িত্বের কাজ।

প্রভাতদা : দায়িত্বেরই তো। সাংঘাতিক দায়িত্বের। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে আমাদের অনেক গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাবে। তোরও নিস্তার থাকবে না।

সোমরা : ধরুক দেখি কেনে ? আমি আছি একটা জংগলের শিয়াল, হঁ।

হতে পার তুমি ব্যাঘ্রের সমান, কিন্তুক শিয়ালটাক ধরবে কমরেড এমন ব্যাঘ্র আজও জন্মে নাই।

প্রভাতদা : ঠিক আছে। কাল যাবার সময় আমি তোমায় কিছু দরকারী কাগজ ও হ্যাণ্ডবিল সঙ্গে দিয়ে দেবো। নিয়ে যাবে। যাও, এখন বিশ্রাম করোগে, আমায় কাজে বসতে হবে। এই যে কালিয়া, দিদিমণিকে সমরুর খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতে বলো। এতটা পথ পায়দালে এসেছে। এসো সমরু।

সোমরা : আইজ্ঞা কমরেড।

(সোমরা বেরিয়ে যায়। প্রভাতদা কাজে মন দেয়। কাগজ-পত্র দেখে। একটু পরে উঠে পড়ে)

প্রভাতদা : গুয়েভারার বইটা আবার কোথায় গেল ? কিন্তু চে-কে নিয়ে এখনই এতোটা মাতামাতি করবার কি আছে! Objective condition-এ কতটা কি suit করবে··· ! নাঃ। মনোরঞ্জনটা মাঝে মাঝে এতো ক্ষেপে ওঠে···

(আবার প্রভাতদা লিখতে আরম্ভ করে। লিখে নিজেই পড়ে। চুপ করে বসে থাকে। তারপর আলো নিভিয়ে দেয়। মঞ্চ অন্ধকার। দিনের আলোয় আলোকিত হয়। কালিন্দী, কালিয়া, সমরুকে দেখা যায়। সমরু চলে যাবে, তাই ব্যাগে দরকারী কাগজপত্র ভরে নিচ্ছে)

সোমরা : ই একটা বেইমানের কাজ। কমরেডকে তুই কোন সাহসে মিথ্যাটা বুলবি ?

কালিয়া : দিদি আমাক যা বুলবার কইছে আমি তোক শুধা তাই বুল্লম। ইখানে সত্যমিথ্যা তোর-আমার বিচার করিবার নাই। তুই কোন কথা বুলবি নাই বোকাটার মত।

সোমরা : সেই কথা দিদি ?

কালিন্দী : হ্যাঁ। (প্রভাতদার প্রবেশ)

প্রভাতদা : তাহলে সমরু, তুমি আর দেরি করো না। রওনা হয়ে যাও। আর কালিয়া, সমরুর সঙ্গে যে মেয়েটি যাবে—কাল আমার কালিন্দীর সঙ্গে কথা হয়েছিল—(কালিন্দী ঘুরে দাঁড়ায়, কমরেড চোখ নামিয়ে নেয়) ও, এ-ই যাবে ?

কালিয়া ঃ　হঁ গো দাদা।

প্রভাতদা ঃ　কালিন্দীর কাছে কাজের ধারা সব বুঝে নিয়েছ তো ?

(কালিন্দী মাথা নাড়ে)

কালিয়া ঃ　দিদি ওয়াক সব সমঝাইছে, সব কথা বুলে দিয়েছে, সমরুর সংগে যাবে ও—

প্রভাতদা ঃ　ঠিক আছে। (সমরু প্রণাম করে) আবার প্রণাম কেন? (কালিন্দী প্রণাম করে) থাক থাক। এসো। (এগিয়ে যায় ওরা। কালিয়াকে) একবারটি দিদিকে ডাকিস তো কালিয়া।

(কালিয়া বেরিয়ে যায়। কমরেড কাগজ পড়ে। দাগ দেয়। সিগারেট ধরায়। পদচারণা করে। আবার অন্য কাগজটা টেনে নিয়ে পড়ে। কালিয়া চায়ের বাটি হাতে ঢোকে। চা দেয়)

প্রভাতদা　কালিয়া, তোকে যে একবার দিদিমণিকে ডাকতে বললাম! কি? (কালিয়া চলে যায়। প্রভাতদা চায়ে চুমুক দেয়। কালিয়া বিছানার নিচে থেকে চিঠি এনে হাতে দেয়)

প্রভাতদা　তার মানে? কালিন্দী চলে গেছে? (কালিয়া মাথা নামায়। প্রভাতদা চিঠি পড়ে) "আমি যখন তোমার সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার কথায় সায় দিলাম—তখন আমার বিশ্বাস, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। Bravado-র কথা নয়। কাজটাই বড়। কাজটাই আগে। এ-সঙ্কট-সময়ে তোমাকে অন্তত কিছুটা সাহায্য করতে পারলেই আমার মনে হয় আমি তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য হব। যে-অভিমান নিয়ে আমি তোমাকে সাময়িকভাবে ছেড়ে গেলাম, কামনা করো, আমি যেন তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারি। ভালোবাসা জেনো। ইতি তোমারই কালিন্দী।" আমার সামনেই দাঁড়িয়েছিল, কালিন্দী অনুমতি নিয়ে চলে গেল! আমি তাকে সত্যিই চিনতে পারলাম না! আশ্চর্য! কালিয়া···

কালিয়া　তুই যদি আমাক বুলিস তো দিদি বুলেছে উ আবার ফিরে আসবে। করবে নাই জংগলে কাম।

প্রভাতদা : না, আমি তা জানি। কিন্তু আশ্চর্য ছাখ কালিয়া—আমি তোর দিদি, মানে কালিন্দীকে, চিনতেই পারলাম না। কিন্তু অত সুন্দর করে সাজল কি করে? আদিবাসী কি রাজবংশী মেয়েদের মতো?… আশ্চর্য! কালিয়া, জানলি—আমরা ঠিক জিতব, জিতবই। কেউ আমাদের রুখতে পারবে না।

(নেপথ্যে আদিবাসী-উল্লাসধ্বনি। মেশিনগানের আওয়াজ। ঝড়-এর আওয়াজ। বন্দুকের গুলির আওয়াজ। মঞ্চ ধোঁয়ায় ধূসর। ছাপাখানার আওয়াজ। তার মাঝে দেখা যায় কর্মীরা কাঁধে করে তাড়াতাড়া পোস্টার নিয়ে যাচ্ছে। এক সময় ধ্বনির কল্লোল থেমে যায়। শুধু অশান্ত সঙ্গীতের সুর Crescendo-য় গিয়ে পৌঁছয়। তারপর সঙ্গীতের সুর বিষণ্ণ। মাইকেল বিলহন, সোমরা ও অন্যান্য কুলি-কামিনরা কালিন্দীর মৃতদেহ ক্রুশে করে নিয়ে এসে পিছনের কাট-আউটে তুলে ধরে। প্রভাতদার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত শিরাউপশিরা যেন ছিন্নভিন্ন)

প্রভাতদা : কিন্তু, ও এখানে কেন? She is supposed to be in the jungle—না, না। এ হয় না কালিন্দী, তুমি সামনে থাকতে আমি সেদিনও চিনতে পারিনি, আজও চিনতে পারছি না! তুমি জঙ্গলে যাও। লড়াইয়ের এখনও অনেক বাকি। কালিন্দী-কালিন্দী…

মঞ্চ অন্ধকার

(ক্রমশ)

নাট্যকার দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র দাস

অনেক অলিগলি ঘুরে শেষ পর্যন্ত নটরাজের মন্দিরে তিনি নিয়ে এলেন পূজার অঞ্জলি। বহুদিন সাংবাদিকের কাজ করেছেন। রাজনীতি ও সমর বিদ্যা নিয়ে সারগর্ভ বহু বই লিখেছেন। "যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র", "রণ ও রাষ্ট্র", "বর্তমান জাপান", "মহাযুদ্ধে সোভিয়েট", "বিশ্বসংগ্রামের গতি" ও "মুক্তি সংগ্রামে জনসেনা" এক কালে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসও তিনি লিখেছেন—"মাটি ও মানুষ"। অনুবাদ করেছেন আলেক্সি তলস্তয়ের "অরডিয়েল" এর প্রথম ভাগ। কিন্তু নাটকে যখনই হাত দেন, তাঁর সমস্ত হৃদয়তন্ত্রী যেন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেন নতুন করে আবিষ্কার করেন নিজেকে। আবিষ্কার করেন তিনি একজন নাট্যকার এবং নাটকই তাঁর আত্মপ্রকাশের মুখ্য মাধ্যম।

ফুল ফুটলেই মানুষের চোখে পড়ে, কিন্তু বীজ থেকে ফোটার পর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ অধ্যায়। বলা যেতে পারে প্রস্তুতি পর্ব। শিল্পীর সাধনা চলে তখন লোক চক্ষুর অন্তরালে, একান্ত সঙ্গোপনে। দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাট্য রচনার হাতেখড়ি বহু দিন আগেই। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে "জাহ্নবী"ই তাঁর প্রথম নাটক। তারপরে লেখেন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক "পরশমণি"। ভীল বিদ্রোহ ও ধর্ষিতা নারীর কাহিনী নিয়ে পর পর দুখানি নাটকও লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্তের দপ্তর" এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু গল্পের নাট্যরূপও তিনি দিয়েছেন। বহু প্রহসন ও নাটকে অভিনয় করেছেন। পরিচালনা করেছেনও প্রচুর। হতে পারে এ তাঁর শিক্ষানবিশীর কাল; নবযুগের বাণী যিনি নিয়ে আসতে চান, সৃষ্টির বেদনা যে তাঁকে চঞ্চল করবে, এত খুবই স্বাভাবিক। তাই তাঁর মনে এই প্রশ্নই হয়ত বারে বারে জেগেছে, "কি লিখব, এবং কেমন করে তা লিখব?" নাটকে বিষয়বস্তুই শুধু নতুন হবে না। আঙ্গিকও হবে নতুন।

এলিয়ট লিখেছেন, কবির দৃষ্টি সাধারণত হয় অন্তর্মুখী। বাইরের অতি সাধারণ উপকরণে কবির অন্তর্দীপ জ্বলে ওঠে, কথাশিল্পী ও নাট্যকারের দৃষ্টি

হয় বহির্মুখী। বাইরের জীবন, জগৎ ও ইতিহাসের বিচিত্র ধারা থেকে তাঁরা উপাদান সংগ্রহ করেন। নাট্যকারের বর্তমানকে জানার তাগিদ যেমন আছে, অতীত সম্বন্ধে তাঁর সম্যক জ্ঞানেরও তেমনি প্রয়োজন। সে হিসাবে দিগিন্দ্রচন্দ্র ভাগ্যবান। সাংবাদিকতার কাজ এ সুযোগ তাঁকে দিয়েছে। মুক্তি আন্দোলনে যেমন তিনি জড়িত ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনেও তেমনি ছিল তাঁর সক্রিয় ভূমিকা। ফলে নদীমাতৃক বাঙলা দেশের চেহারা যেমন দুচোখ ভরে দেখেছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষ, চাষাভুষা, কলকারখানায় মেহনতী মানুষও তাঁর নজর এড়ায়নি। এই অভিজ্ঞতা তাঁর নাট্যজীবনে হয়েছে ফলপ্রসূ। কারণ সার্থক শিল্পের জন্ম দৃষ্টি ও সৃষ্টির শুভযোগে; তাই গ্রাম ও কলকারখানার পটভূমিকায় সৃষ্ট চরিত্রগুলো হয়েছে বাস্তব ও জীবন্ত; তাদের মুখের ভাষা হয়েছে সরস, বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত।

সমালোচকেরা যাই বলুন না কেন, চল্লিশোত্তর বাঙলার নাট্য-সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ছায়াছবির আক্রমণে ও ব্যবসায়ী থিয়েটারের প্রাণহীন গতানুগতিকতায় দর্শকেরা যখন ক্লান্ত, তখনই হঠাৎ বদ্ধ স্রোতে এলো জোয়ার। সেই দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ তাড়িত বাঙলা দেশে, গণনাট্য আন্দোলন—মঞ্চ যে জীবনের প্রতিচ্ছবি, সেই অভিব্যক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করল। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' বাঙলা নাট্য আন্দোলনের সেই সন্ধিকালের দিকচিহ্ন। এলো নতুন জীবন, নতুন স্বাদ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নয়া জীবনদর্শন। আর পরীক্ষা নিরীক্ষার ত অন্ত নেই। ব্যবসায়ী থিয়েটারের বাইরে গণনাট্য ও কয়েকটি প্রগতিশীল সম্প্রদায় নতুন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করলেন। বলা বাহুল্য, সে সময়কার বহু নাটকের সাহিত্য মূল্য হয়ত বিশেষ নেই। প্রকাশের চেয়ে প্রচারই ছিল মুখ্য। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সে দিনের বিপ্লবী ধারার পলি এসে গণমানস উর্বর হয়েছে; বাঙলা নাটকের পরিমণ্ডল হয়েছে বিস্তৃত। এই আন্দোলনের পুরোধাদের মধ্যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর নাট্যজীবন থেকে উদ্ধৃত করে বলি, "নবযুগের বাণী নাটকে আনতে হলে নাট্যশালার চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে পথে নাবতে হবে।···নতুন দল গড়তে হবে, আন্দোলন করতে হবে। সেদিন ভারতীয় গণনাট্যের জন্ম হয়নি। তবু যেন মানস-নেত্রে দেখতে পাচ্ছিলাম একটা আন্দোলন।" পরিবর্তন সত্যি এসেছে। ভাবে, ভাষায় ও বিষয়বস্তুতে, বহু সাধকের বিচিত্র সাধনায় বাঙলা নাটকের হয়েছে পুনর্জন্ম।

এই পটভূমিকা স্মরণে রেখে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকগুলো আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়। রচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে, "অন্তরাল" এই পর্বের প্রথম নাটক যেখানে তিনি প্রথম একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হন। "অন্তরাল" সমাজ জীবনের অন্তরালের কাহিনী। কানীন সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মহাভারতের যুগ থেকে এ সমস্যা চলে আসছে, এখনও আমাদের সামাজিক মনোভাবে কুমারী জীবনে মা হবার অধিকার অস্বীকৃত। A child born outside the legal wedlock—সমাজ তাকে স্বীকার করে নেবেনা। রলঁ্যার "Soul Enchanted"-এর নায়িকার আনেৎ-এর সঙ্গে অন্তরালের নায়িকা ঝরণার সাদৃশ্য অনেকখানি। "To dare to assume pains and responsibilities of motherhood without first having accepted the stamp of official marriage is something for which a woman of their class is never pardoned." আনেৎ মাতৃত্বের অধিকার চায়। চায় সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা। ঝরণার দাবিও যেন তাই। যদিও নাট্যকার জোর করে কোন সমাধান চাপাননি, তবু একথা বুঝতে কষ্ট হয়না তাঁর আবেদন যুক্তিনিষ্ঠ মনের কাছে।

যাদের নালিশ কেউ শোনেনা, বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন তাদেরই মুখপাত্র হয়ে। তারপর এলো অন্য লেখকের দল। কল্লোল, কালি-কলম ও পরিচয় গোষ্ঠী। সাহিত্যে নতুন আবহাওয়া বইতে শুরু করলো। বহুমুখী হলো তাঁদের অভিযান—মনের গহন তল থেকে শুরু করে মিল-কলিয়ারী পর্যন্ত। এক ধরনের সংস্কার ও মনের জড়তা থেকে তাঁরা আমাদের মুক্ত করলেন। কারো কারো লেখায় নির্যাতিত নিপীড়িতদের জন্য যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ পেল। কিন্তু শুধু দরদ আর চোখের জলে সমস্যার নিরসন হয়না। তাই আরএকদল লেখকের আবির্ভাব হলো, যাঁরা আধিব্যাধির ছবি শুধু আঁকলেন না, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখলেন। দুর্গতির কারণ যেমন তাঁরা দেখলেন, নিদানও তার বাতলালেন। তাঁরা রোমান্টিক ভাবালুতা ছেড়ে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাঁদের লেখায় হাজির হলো নতুন মানুষ। কৃষক, শ্রমিক, শোষিত জনসাধারণ। এঁরা মুখ্যত মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের ভাবধারায় প্রভাবিত। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলেন তাঁরা। আর্টের নতুন ব্যাখ্যা তাঁরা গ্রহণ

করলেন : "Art of the people is determined by their psychology, that this psychology is outcome of their condition and that this is determined in the last analysis by the state of their production."—(Plekhanov). এই পরিবেশে দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্য-রচনা শুরু। আর, চল্লিশের পরবর্তী যুগে এ দেশে ত সমস্যার অবধি নেই। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, শরণার্থী সমস্যা, আরো কত কি। তাতে সমাজ-মানসের রূপান্তর ঘটছে। লেখক বা শিল্পীর দায়িত্ব এইখানে যথেষ্ট। তাঁদের মন সূক্ষ্ম বীণাযন্ত্র। ক্ষীণ শব্দও তাতে কম্পন তোলে। ব্যক্তিচেতনা তাই যুগচেতনা হয়ে ওঠে। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে সমাজের এই রূপরেখাই স্পষ্ট। নতুন ভাবধারার রঞ্জনরশ্মি ফেলে দেশ ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে তিনি দেখলেন। বিচার বিশ্লেষণ করে, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথও তিনি বাতলালেন।

মুক্তি-আন্দোলন নিয়েই শুরু করা যাক। "এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?" একদিন আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা-আন্দোলনের উদ্দাম স্রোত এসেছিল। তা শুধু নগর ও শহরকে প্লাবিত করেনি, সুদূর পল্লী অঞ্চলেও তার ঢেউ পৌঁছেছিল। "তরঙ্গ" বিদেশী শাসক ও তাদের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের কাহিনী। এ-নাটকে বিধৃত হয়েছে পূর্ব-বঙ্গের ছোট একটি গ্রামের সাধারণ মানুষের নব চেতনা ও সংগ্রামের ইতিহাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যেতে পারে, "নাট্যকার এই বিপ্লবী শক্তির সমস্ত উত্তাপ ও উত্তেজনা তাঁর নাটকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একটা বিশাল তরঙ্গাভিঘাতের চাঞ্চল্য ও গতিবেগ নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে উহার পাত্র-পাত্রীদের সংলাপের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।" নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়, শোষিত কৃষক ও পল্লীবাসীর ত্যাগ ও দুর্জয় সঙ্কল্পের চিত্র এখানে পরিস্ফুট। 'তরঙ্গ' -রচনার সময় ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় বিশেষ করে চৌরিচোরা ও আগষ্ট আন্দোলন লেখককে প্রভাবিত করেছিল মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। উভয়ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল অহিংস, কিন্তু তার পরিণতি হলো হিংসাত্মক। 'তরঙ্গ' আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন ও বিচিত্র ভাবধারার একখানা নিখুঁত দলিল।

পরাধীনতার অভিশাপ থেকে আমরা মুক্তি পেলাম। দেশ স্বাধীন হলো। বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এলো দেশকে খণ্ডিত করে। তার ফলে পূর্ববঙ্গের

হিন্দুদের মনে দেখা দিল অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বোধের অভাব। পুরুষানুক্রমে যে ভিটেমাটির সঙ্গে ছিল নাড়ির টান, যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল হিন্দু-মুসলমান, তার মূলে টান পড়ল। তার ওপর ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শনে বিশ্বাসী লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব তাদের ভীতি বিহ্বল করল। বাস্তুত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল। লেখক প্রশ্ন করেছেন, যুগ যুগ ধরে যে মাটির মায়ায় মানুষ মজেছিল, যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছিল অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন, তা কি এত সহজে ছিন্ন হয়ে গেল? উত্তরও তিনি দিয়েছেন তাঁর নাটকে। "লীগ সরকার ভীত হয়ে বাস্তুভিটে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, কিন্তু আমীন মুন্সী ও কফিলদ্দিদের তিনি মেরে ফেলতে পারেননি। আমীন মুন্সী ও কফিলদ্দির দলই আজ পূর্ববঙ্গের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সমুন্নত শির নিয়ে বিরাজিত। মহেন্দ্র মাস্টার ও আমীন মুন্সীর মিলন অক্ষয়, অমর।" 'বাস্তুভিটা'র নায়ক মহেন্দ্র মাস্টার মাটি ও মানুষের প্রেম-প্রীতির কাছে বাঁধা পড়লেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে তিনি জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেলেন।

দিগিন্দ্রবাবু সমাজ সচেতন লেখক। তাই শোষিত, নির্যাতিত-মানুষের জন্য তাঁর দরদ অফুরন্ত। সে দরদ শুধু দুফোঁটা চোখের জল ফেলে ক্ষান্ত নয়, তা প্রতিষ্ঠা করতে চায় শ্রেণী-শোষণমুক্ত সমাজ, তুলে ধরতে চায় মানুষের সামনে নতুন প্রত্যয় ও বিশ্বাসের আলো। তাই শিল্পী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব প্রচুর। সে দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যেন উপলব্ধি করলেন: "He must fight to change the world, to rescue Civilisatoin and he must fight aganist the anarchy of Capitalism in human spirit."—(Ralph Fox). মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা, মানবাত্মার শাশ্বত মহিমা প্রতিষ্ঠা করাই যেন তাঁর স্বপ্ন। তাই যুদ্ধকালীন বঞ্চনা নীতির ফলে মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্যে জ্বেলে দিয়েছেন মনুষ্যত্বের "দীপশিখা"। তিনি দেখিয়েছেন, স্বাধীনতাকামী জাতির জীবনে পরবশতা অবসান করবার জন্য উত্তাল, উদ্দাম তরঙ্গ-প্রবাহ, দিয়েছেন বাস্তুত্যাগীদের জন্য প্রেম-প্রীতির অভয়মন্ত্র। এই জীবন-দর্শন সামনে রেখেই শ্রেণীসংগ্রামের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি পরপর দুটি নাটকে।

তাঁর "মোকাবিলা" নাটক মালিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষের কাহিনী। যুদ্ধের সময় কিছু কিছু লোক প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছেন। বলাবাহুল্য, এই অর্থ সৎ উপায়ে অর্জিত নয়। বেশীর ভাগই কালো টাকা—যার জন্য ন্যায়, নীতি, বিবেক সবই বিসর্জন দিতে হয়েছে। কলকারখানার মালিক হয়েছেন তাঁরা।

কালীনাথ এই সমাজেরই প্রতিনিধি। শ্রমিককে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শোষকরূপেই তার আত্মপ্রকাশ। তার এই সম্পদ বৃদ্ধির কাজে শ্রমিকদের অবদান আছে একথা তিনি আজ ভুলে যেতে বসেছেন। স্বীকার করতে চাননা মজুরি ছাড়া শ্রমিকদের আর কিছু প্রাপ্য আছে। "এই সুন্দর পৃথিবীর জলবায়ু, ফুলফল, তরুলতা, যদি তোমারই আশীর্বাদ, তবে তাতে সবার অধিকার সমান নেই কেন?···কেন তোমার সৃষ্টিতে এত বিভেদ, এত বঞ্চনা, এত অবিচার···" এই 'কেন'-র জবাব মেহনতী মানুষেরা চায়। এই অসাম্য দূর করবার জন্য তারা আজ কৃতসঙ্কল্প। তার মোকাবিলা তারা করবে।

শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্র প্রকাশ দেখি "মশাল" নাটকে। আপসে স্বাধীনতা আমরা পেলাম, কিন্তু তার বিষময় ফল থেকে আমরা নিষ্কৃতি পেলাম না। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় আমরা লিপ্ত হলাম। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হলো। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কারুরই অব্যাহতি নেই। রক্তের বন্যায় ভেসে গেল সারা দেশ। কিন্তু আশ্চর্য এই, যা একান্ত ঘৃণ্য, মানবতা বিরোধী, সেই রক্তক্ষয়ী হানাহানিকে দুষ্টচক্র কিভাবে শ্রমিক বিরোধী কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে, তারি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ রয়েছে এই নাটকে। এমন কয়েকটি নরনারীর চিত্র এইখানে তিনি এঁকেছেন, যারা সুস্থ বিবেকের তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে এই কুটিল চক্রকে ব্যর্থ করেছে। ব্যর্থ করেছে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার উর্ধে ওঠে। এই নাটকে ললিতা চরিত্রটি নাট্যকারের এক অপূর্ব সৃষ্টি। ললিতা মুসলমান গুণ্ডার হাতে নিজের সন্তান হারিয়েও তার সেই ব্যগ্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে সেই বিধর্মীরই একটি শিশুকে বাঁচাবার জন্য। অন্ধ উন্মত্ততার হাত থেকে শিশুটিকে বাঁচাতে সে পারেননি। তার বেদনার্ত হৃদয় থেকে শতধারে অশ্রু ঝরে পড়েছে। এ কান্না মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন কান্না। নাটকটি পড়তে পড়তে মনে হয় নিরন্ধ্র অন্ধকারে পথের নিশানা নির্দেশ করছে যেন "মশাল"।

জীবন গতিশীল। যে শিল্পী চলমান জীবনের ছন্দ ধরতে পারেন না, তিনি নিজেরই পুনরাবৃত্তি করেন। তাই চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখককে সৃষ্টির অফুরন্ত ভাণ্ডার জীবন-মহাকাব্যের পাতাই খুলে ধরতে হয়। এতকাল শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সমস্যা-জর্জর মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবিই ফুটে উঠেছে। সমস্যামূলক নাটক উপন্যাসের বিপদ এই যে, অনেক সময় সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টির আয়ুও নিঃশেষ হয়ে যায়। তবু বহু সমস্যামূলক

সাহিত্যে ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, তার কারণ শুধু সমসাময়িক কাল নয়, নিত্যকালই লেখকের লক্ষ্য ছিল। দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকগুলো সম্বন্ধে এ প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। তার উত্তরের সময় বোধহয় এখনো আসেনি। যেহেতু যুগের যে সব জ্বলন্ত প্রশ্ন তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে, সেগুলো এখনো আমাদের জাতীয় সমস্যা। এখনো এদেশে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, বাস্তুহারা, ও শ্রমিক মালিকদের দ্বন্দ্ব রয়েছে। যে দূরত্ব নিয়ে সে বিচার সম্ভব, সময়ের সেই ব্যবধানটুকু আসেনি।

আনন্দের কথা, এরপর তিনি নতুন পাতা খুললেন। লেখার মোড় ঘুরে গেল। জীবনশিল্পী চিরকাল অনাগরিক। তিনি চিরন্তন পথের অভিযাত্রী। তাই নিত্য নতুন পথের খবরই তিনি দেবেন। জীবন পাগলা-ঝোরা, উদ্দাম গতিতে ছুটে চলে—ধর্মের বাঁধন বা কোন ইজমের অক্টোপাশে তা বাঁধা পড়বার নয়। জীবন চলবে আপন স্বভাবে নিজস্ব গতিতে। 'জীবনস্রোতে' এই সত্যটি তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন "মানুষ জীবনকে উপলব্ধি করতে চায়, নির্দেশ মেনে চলতে সে নারাজ। মেনে চলার আদেশ যেখানে, সেখানেই না মানার ঝোঁক। তত্ত্ব বোঝা হয়ে চাপলেই তা ঝেড়ে ফেলে কাঁধটাকে হালকা করার প্রবৃত্তি স্বভাবজ। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিজালে সেই প্রবৃত্তিকে বন্দী করা যায়না, হৃদয় তাতে সায় দেয়না। বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয় বৃত্তির যেখানে বিরোধ সেখানেই যত গণ্ডগোল।...শাস্ত্রীরা শাস্ত্রবাক্য আওড়ান—রসিকজনেরা বলেন রসের কথা। জীবন রসাশ্রয়ী—রস আছে বলেই তার বৃদ্ধি।...জীবনকে সংকুচিত করবার জন্যে যেখানেই তত্ত্বের প্রাচীর সেখানেই তার প্রতিবাদ। যুগে যুগেই এ নিয়ে দ্বন্দ্ব। শাস্ত্র পড়ে থাকে পেছনে। জীবন চলে এগিয়ে। জীবন গতিশীল বলেই দাবী রাখে নতুন জীবন দর্শনের।"

এর পরও তিনি এগিয়ে চলেছেন। চলমান জীবনস্রোত নিরীক্ষণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। ডুব দিয়েছেন জীবন-সমুদ্রের গভীর তলদেশে। তারই ফলশ্রুতি হলো পূর্ণাঙ্গ নাটক "কেউ দায়ী নয়।" "জীবনের পথে ঘটনা দুর্ঘটনা দুই-ই আছে। আমি চলতে চেয়েছিলাম। দুর্ঘটনায় পড়ে আমার পা দুটো ভেঙে গেল।" সুধা তাই চলতে পারেনি। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে সুধা। কলকাতায় এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। মা ও ভাইকে বাঁচাবার জন্ম। এইখানে হলো সে লোভ আর লাভের শিকার। সুধার কাম্য জীবনের মৃত্যু

হলো, কিন্তু তার আত্মা মরেনি। তার আত্মার আর্তনাদ ফুটে উঠছে নাটকের প্রতিছত্রে। জীবনের সহস্র আবিলতার মধ্যে একটি মর্মন্তুদ জিজ্ঞাসা যেন বারে বারে দেখা দিচ্ছে, "এই জীবন নিয়ে আমি কি করবো?" রূপাপা-জীবিনী নারীর সমস্যা নিয়ে বার্নার্ড শ লিখেছেন "Mrs Warren's Profession" এবং জার্মান ঔপন্যাসিক জুড়ারম্যান রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "Song of Songs. বার্ণার্ড শ ও জুড়ারম্যানের নায়িকারা অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। সুধার জীবনের ট্রাজেডি এই যে, সে অবস্থাকে মেনে নিতে পারছে না। সে না পারছে বাঁচতে, না পারছে মরতে। জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত তার অন্তর। দিগিনবাবুর অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিতে যেন দেখতে পাই, চরিত্রেরা এসেছে সমস্যাকে রূপ দিতে; কিন্তু সুধা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই, জীবনের মর্মমূল থেকে তার বেদনা স্বতোৎসারিত। অতি সুনিপুণ শিল্পীর স্বাক্ষর পাই এই নাটকখানিতে।

পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়া গর্কির "মাদার" ও রবীন্দ্রনাথের "ল্যাবরেটারি"র নাট্যরূপও তিনি দিয়েছেন। এ ছাড়া আছে তাঁর একাঙ্ক। সংখ্যায় যেমন বহু, সৃষ্টি হিসাবেও সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। বহু রসের কারবারী তিনি। ধরণও বিচিত্র। আঙ্গিক ও রূপরীতির বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন। হাস্যরস, ব্যঙ্গ, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক মনোলোগ, রূপক প্রভৃতি বিচিত্র ধারা। শুধু গঠন পরিপাট্যে নয়, গভীরতার বিচারে "পাণ্ডুলিপি" "পাকা দেখা," "দাম্পত্য কলহে চৈব" "কেউ দায়ী নয়" (একাঙ্ক), "অভিনেত্রীর নবজন্ম" এবং আরও কিছু কিছু একাঙ্ক বাঙলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসাবে গণ্য হবে। আশার কথা, তিনি এখনো সৃষ্টি করে চলেছেন। এ ছাড়াও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার মারফৎ নিত্য নতুন চিন্তার খোরাক আমাদের জুগিয়েছেন তিনি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক আলোচনার পর একটি প্রশ্ন স্বভাবত দেখা দেয়, কোন্ জীবন সত্যে তিনি বিশ্বাসী? যতদূর জানা যায়, তাঁর বাল্যজীবন কেটেছে অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্যে, জীবনেও তিনি অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়েছেন, তাঁর পক্ষে পেসিমিস্ট লেখক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হননি। "কেন হননি?" এর উত্তর খুঁজবার জন্য বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। কবিকে তাঁর জীবন চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না সব সময়, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন সৃষ্ট চরিত্রই স্বয়ম্ভু নয়। তারা বিশেষ

অবস্থার সৃষ্টি। সমাজ ও মানুষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একটাকে বাদ দিয়ে আর একটির কল্পনা করা যায় না এবং "you cannot create a faithfully drawn psychological entity on the stage until you understand his social relaton and their power to make him what he is and to prevent his form what he is not" আর্থার মিলারের মত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ও বিশ্বাস করেন, পরিবেশই মানুষের জীবনের পটভূমি এবং এই পরিবেশকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের কোন চরিত্রকে যথাযথ রূপ দেওয়া যায় না, দিলেও তার মূল্য থাকে না ভারসাম্য নষ্ট হয়। জীবনে দুঃখ আছে, ব্যথা আছে, অসাম্য আছে, অবিচার-আছে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি ও সাহসও মানুষের আছে। কারণ মানুষ অবস্থার দাস নয়, মানুষ নিজেরই ভাগ্যবিধাতা। মানুষের প্রতি এই বিশ্বাস তাঁকে জীবনের তিক্ততা ও ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করেছে। 'সঙ্কটের সম্মুখীন হতে বুর্জোয়া মানবতাবাদ যেখানে লক্ষ্যহীন ও দ্বিধাগ্রস্ত', তাঁর হয়ত বিশ্বাস সর্বহারা মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয় সেখানে মানুষের মুক্তির পথ দেখাবে।

পুস্তক-পরিচয়

লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎস সন্ধানে। ডঃ শ্রীকৃষ্ণ রতনজংকার। সংগীত পরিষদ, কলকাতা-৫০। দু-টাকা ॥

শিল্পের ইতিহাসে মানুষের প্রথম আবিষ্কার: খোদাই ছবি, দ্বিতীয় আবিষ্কার: মূর্তি। তৃতীয় পর্যায়ে অনেকগুলি শিল্পের আবির্ভাব ঘটে জীবন-ঘনিষ্ঠ এক বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান থেকে, যার নাম 'কৃত্য' বা 'রিচুয়াল'। চাষ, যুদ্ধ, শিকার—নানা কারণে এই কৃত্যগুলির অনুষ্ঠান হত, যার সূত্র ছিল 'অনুকরণ' এবং যেখানে একসঙ্গে প্রযুক্ত হত বিভিন্ন শিল্পমাধ্যম: নাচ-অভিনয়-কথা-বাজনা-আলপনা এবং গান বা 'কৌমগতি'। ক্রমে বাস্তব কার্যকারণে সমাজ উন্নত ও দ্বিধাবিভক্ত হলো কৌমগতি বিবর্তিত হলো স্থানীয় লোকগীতিতে, এবং সমৃদ্ধ হলো মার্গসঙ্গীতে। অর্থাৎ মার্গসঙ্গীতের উৎস লোকসঙ্গীত, পরে উভয়ের স্বতন্ত্র বিবর্তন। প্রক্রিয়াটি একাধিকবার ঘটেছে। পাশ্চাত্য দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা নিরলস প্রচেষ্টায় নানাভাবে এই রহস্যের সন্ধান করে চলেছেন।

ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে অনেকে চর্চা করেছেন—লোক এবং মার্গ, উভয় ক্ষেত্রেই। কিন্তু, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তেমনি, তাঁরা শাস্ত্রনির্ভর আলোচনা করেছেন, গণ্ডী পেরিয়ে তার উৎস-সন্ধানে লোকায়ত সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের দ্বারস্থ হননি। আর্যত্বের একটা মায়াময়ী অহমিকা তাঁদের সত্য দৃষ্টিকে আবৃত করেছে।

ডঃ কৃষ্ণনারায়ণ রতনজংকারের 'লৌকিক ও রাগসংগীতের উৎস সন্ধানে' গ্রন্থটি নিতান্ত হ্রস্বকায় (মাত্র ৩৫ পৃষ্ঠা)। তবু এই ছোট্ট রচনাটিতে ভারতীয় সঙ্গীত-চর্চার সবচেয়ে বড় অভাবটি দূর করার প্রয়াস রয়েছে। বস্তুত, এটি একটি বক্তৃতা—রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি সিংহল শাখার আমন্ত্রণক্রমে রচিত ও পঠিত। তথাকথিত আর্যত্বের গোঁড়ামি বর্জিত, মুক্তমনে তথ্যের বিশ্লেষণ।

পাশাপাশি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে ডঃ রতনজংকার দেখিয়েছেন: কেমন করে লোকসঙ্গীত থেকে রাগসঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছে এবং রাগসঙ্গীত কিভাবে বৈদিক একস্বর থেকে বিবর্তিত হতে হতে ক্রমশ জটিল রূপ ও চরিত্র লাভ

করেছে। এবং একবার নয়, একাধিকবার। এবং শুধু ভারতে নয়, তাবৎ সভ্য দেশেই। স্বল্প পরিসরে, স্বচ্ছ ভাষায় ও ঋজু ভঙ্গিতে প্রতিপাদ্য বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে গবেষণাধর্মী অথচ সহজবোধ্য রীতিতে। মূল ভাষণটি অবশ্য ইংরেজি, বাঙলায় অনুবাদ করেছেন সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণা বসু।

রাগসঙ্গীতের উৎস লোকসঙ্গীত—তারই পর্যালোচনা আলোচ্য গ্রন্থে। কিন্তু লোকসঙ্গীতের উৎস যে নৃত্যে, ডঃ রতনজংকার তার সন্ধান করেননি। পাশ্চাত্য সাদৃশ্যেরও বিস্তৃত আলোচনা করেননি। তবু, যে কথাগুলি তিনি বলেছেন, বর্তমান আবহাওয়ায় তার মূল্য অসীম। এমন একটি শোভন ও অপরিহার্য প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 'সঙ্গীত পরিষদ' ধন্যবাদার্হ—শুধু সঙ্গীতবিদ নয়, সংস্কৃতি-সন্ধানীদের কাছেও।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

আগুনের বাসিন্দা। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। তিন টাকা॥
বিস্ফোরণে জ্বলন্ত নগরে। প্রভাত চৌধুরী। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। দু-টাকা॥
দর্পিত প্রহরে। শিবেন চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। দু-টাকা।

'আগুনের বাসিন্দা'র পাতা ওলটাতে গিয়েই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা আমায় সামলাতে হয়েছে। উৎসর্গপত্রে স্মলপাইকা বোল্‌ডে একটি নির্দেশ জ্বলজ্বল করছে: "মশয়ান আনিত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আত্মাই আমার একমাত্র পাঠক।" মানে কি? মশান হয়তো—অনেক ভেবেচিন্তে এইরকম একটা অর্থ করেছি—এই পৃথিবীটাই, যেখানে মানুষের মৃত্যু নিয়তিনির্দিষ্ট। কিন্তু এ-আর নতুন কথা কী। আর অন্যকোনো মানে থাকলে—থাকলে কেন, নিশ্চয়ই আছে, 'আত্মা' শব্দটিই তো সাংঘাতিক, একাই একশ মানের জন্মদাতা—সবিনয়ে স্বীকার করছি, বুঝিনি। যাইহোক, স্থূল সূক্ষ্ম যেকোনো অর্থেই হোক, শেষ পর্যন্ত মেনেই নিলুম আমিও জনৈক 'মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আত্মা', অন্তত পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নতুন কবিতার বইটি পড়বার যোগ্যতা অর্জনের খাতিরে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় গোড়া থেকেই। তাঁর প্রথম বই 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরিয়েছে আট বছর হলো। আজ যখন তাঁর হাল আমলের কবিতাগুলি একসঙ্গে পড়বার সুযোগ পেয়েছি, তখন তার

সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে না হয় "ফাঁসীর আসামীই"—কবি যা চেয়েছেন—হলুম!

কিন্তু উৎসর্গপত্র নিয়ে কথা না বাড়িয়ে কবিতার প্রসঙ্গেই আসা যাক। প্রথমেই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, পবিত্র মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখতে জানেন তাঁর সমসাময়িক অনেকের চেয়ে অনেকগুণ বেশি যোগ্যতায়। একটি জিনিস—যা চলতি দশকের বাঙালি কবিদের প্রায় সকলেই জেনে অথবা না জেনে পরোয়া করেন না, অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমি যাকে কবিতার অন্যতম শর্ত বলে মনে করি, অর্থাৎ ছন্দ—তাতে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধির হাতেনাতে প্রমাণ 'আগুনের বাসিন্দা'। এর অন্তর্ভুক্ত 'অসীমার প্রতি সনেটগুচ্ছ,' 'প্রেম পুনর্বার,' 'প্রকীর্ণ কবিতাবলী' এবং 'বিষাদাশ্রিত কবিতা'—এই চারটি পর্যায়ের কবিতাগুলি প্রথমেই আমাকে আকৃষ্ট করেছে সুশৃঙ্খল সংযত পদরচনার ক্লাসিকাল বিন্যাসে। প্রাথমিক আকর্ষণের দাম আমার কাছে অনেক। পরে অবশ্য বহুক্ষেত্রেই ঠকতে হয়, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মানে চলতি কথায় যাকে বলে দর্শনধারী, তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাছাড়া পবিত্র মুখোপাধ্যায় আমাকে ঠকিয়েও দেননি। বরং "তোমার জন্মদিন জন্মদিন আমারও ঈশ্বরী" জাতীয় সহজ মরমী লিরিক্যাল কবিতায় আমি বারবার আপ্লুত হতে চেয়েছি; এবং কবিকে ধন্যবাদ, এই মেজাজের কবিতা তিনি আমাদের অকৃপণভাবে তাঁর নবতম কাব্যগ্রন্থে উপহার দিয়েছেন।

প্রায় সব কবিতাই তাঁর বিষাদভিত্তিক ("বড় বিষণ্ণতা ঢাকে অস্তিত্বের অমিত উত্তাপ", "এ কার বেদনা হতে জন্ম নিল আরক্ত গোলাপ?"), সেদিক থেকে কিছু কবিতাকে আলাদা করে 'বিষাদাশ্রিত কবিতা' নামে চিহ্নিত করার কোনো দরকার ছিল কি? এর মধ্যে কবির নিশ্চয়ই কোনো ইনডিভিজুয়ালিটি—এর প্রতিশব্দ কি হবে, প্রাতিস্বিকতা—নেই, উনি তা দাবিও করবেন না হয়তো। দেশ-বিদেশের অধিকাংশ কবিই তো দুঃখের মহিমায় নান্দনিক অর্থে বিভোর এবং সোচ্চার। আসলে তাঁর কবিতাগুলো অত্যন্ত দরদ দিয়ে লেখা, রক্তের ছিটে যেন প্রতিটি শব্দে লেগে আছে। পাঠক হিসেবে এই আন্তরিকতার চেয়ে বড় কিছু কীইবা আশা করতে পারি। সেইজন্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কী অমিয় চক্রবর্তীর ক-ফোঁটা পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় মিশেছে, তা মাঝে-মধ্যে মনের ভেতর প্রশ্নাকারে এলেও আদৌ আমল দিইনি।

অতঃপর 'আগুনের বাসিন্দা' পর্যায়ের কথা। বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, এর কবিতাগুলো তেমন উৎরোয়নি। কবির মৃত্যুচিন্তা প্রায়ই যাত্রার বিবেকের মতো কবিতার মধ্যে নাক গলিয়ে লেখাকে জখম করেছে। না, এপিকের কোরাস নয়, কেন না পবিত্র মুখোপাধ্যায় তো এপিক লেখেননি, দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন; এবং দীর্ঘ কবিতা প্রায়শই যে-দোষে আক্রান্ত হয়ে থাকে, সেই বিবৃতিধর্মিতা এই লেখাগুলোকেও নষ্ট করে দিয়েছে। "জল দাও, হে প্রিয় ঈশ্বরের পুত্র/জানি, অসহায় তুমিও, হোরেবের পাথরে যতই আঘাত করো/প্রস্রবনের দেখা মিলবে না/চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাতের তৃষ্ণাই সত্য/ঈশ্বরও আজ মানুষের প্রাণ নিয়ে নিলাম ডাকছেন,/প্রভু, আমাদের মার্জনা করো"—কতখানি কবিতা হয়েছে স্বয়ং কবিই বলুন। এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে বাইবেলের প্রচুর অ্যালিউসন ব্যবহৃত হয়েছে। ফলত, কবি এখানে বেশ গম্ভীর একটি আবহ তৈরি করতে পেরেছেন, এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাঁর সহায়ক হয়েছে চিত্রকল্প রচনার, শব্দব্যবহারের এবং ছন্দোজ্ঞানের ত্রিমুখী দক্ষতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না। দার্শনিকতা এবং কবিত্ব মিশে যায়নি, সুতরাং বিচ্ছিন্ন কিছু লাইন চমৎকার লাগলেও, গোড়ার কথাগুলোই আমি আবার বলতে চাইছি।

কবিতার নামকরণ সম্বন্ধে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের সঙ্গে আমি কিছুতেই একমত হতে পারছি না। নাম দেওয়া না-দেওয়া নেহাতই কবির ব্যক্তিগত খেয়াল, কবিতার উৎকর্ষ-অপকর্ষের এতে কিছুই যায় আসে না। তবে নাম দিলে লেখাটিকে বেশ পূর্ণাঙ্গ মনে হয়। এটা একটা সংস্কারও বলা যায়; আর সব সংস্কারই যে খারাপ, তাতো নয়। দ্বিতীয়ত, নামকরণ আর যাই হোক, গোয়েন্দা কাহিনীর অপরাধীর নাম আগেভাগে জানিয়ে দেয়ার মতো নয়, সুতরাং "পাঠকের অম্বিষ্ট মনের সততার প্রতি এটা অশ্রদ্ধারই নামান্তর" ভাবা ভুল। যেকোনো দীক্ষিত পাঠকই শিরোনাম দেখেই কবিতার জাত-বিচার করেন না। তৃতীয়ত, কবি নিজেও তো "কয়েকটি ব্যতিক্রম" মেনে নিয়ে নাম দিয়েছেন। কেন? সেগুলোতে "পাঠকের অম্বিষ্ট মনে"র প্রতি হঠাৎ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য কি? বোঝা মুশকিল।

বইটির প্রকাশনকলা নিঃসন্দেহে সাধুবাদের যোগ্য।

প্রভাত চৌধুরী বেশিদিন কবিতার জগতে না এলেও দুটি কাব্যগ্রন্থ বার করতে পেরেছেন, শেষেরটি হচ্ছে 'বিস্ফোরণে জ্বলন্ত নগরে।' 'শুধু প্রেমিকার

জন্ত' বইখানি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি, সুতরাং প্রভাতের রচনার গুণগত পরিবর্তনের খতিয়ান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। না হলেও, সমালোচ্য বইটিতে তাঁর 'অতি সাম্প্রতিক লেখা'র সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত কিছু পুরনো লেখাও দেওয়া আছে, যেমন পবিত্র মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন। কিন্তু পড়ে দেখলাম, লেখার ধরনধারণ প্রায়ই এক।

কবি খুব তেজী গলায় ঈশ্বর—মতান্তরে বিবেকের কাছে—প্রার্থনা করছেন, "রক্তের ভিতরে সেই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ" থেকে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। হয়তো এরই মধ্যে তিনি পরিত্রাণ খুঁজে পাবেন, কিসের থেকে ঠিক বলতে পারব না। মনে হয় পরিপার্শ্ব এবং ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক অসঙ্গতি থেকে, বৈষম্য থেকে, ম্যাল্ অ্যাডজাস্টমেণ্ট থেকে। ভালোই তো। আমরাও এইটা চেয়েছি, চাই। কিন্তু চাওয়া এক জিনিস, তাকে শিল্প করে তোলা আর-এক ব্যাপার। প্রভাত চৌধুরী তা কতটা পেরেছেন, সেটাই দেখতে হবে।

প্রায়ই কবিতার মধ্যে তিনি "বিস্ফোরণ", "কার্টুজের মতন প্রার্থনা ফাটিয়ে রক্তের ভিতর ভূমিকম্প", "অগ্ন্যুৎপাত"—ধরনের শব্দ বা ইডিয়ম ব্যবহার করেছেন ; উদ্দেশ্য কবিতাকে পাঠকের মধ্যে তীব্র করে অনুপ্রবেশ করানো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা লক্ষ্যভেদী নিঃসন্দেহে, যেমন "প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সূর্যের চোয়াল খসে পড়ে / শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসা উত্তাপ পায়ের চেটোয় / জমা ক'রে কে তুমি আঘাত কর আমার শরীরে। ···সূর্যকণা গায়ে মেখে আমি অগ্নিপিণ্ড / তোমার দেহের উত্তাপে আমার পাঁজর বজ্র হয়ে গ্যাছে ···।" এক্ষেত্রে কবিতা হয়ে উঠেছে পুরোপুরি আবেগধর্মী, সেন্টিমেণ্টাল। আবেগে আমরা নরম হয়ে যাই, প্রভাত চৌধুরীর মতন এই ধরনের লেখায়, গরমও হই ; কিন্তু পরে, ফলশ্রুতিটা দাঁড়ায় কী ? সেন্টিমেণ্টালিটি আর কবিতা কি এক জিনিস ? ওইসব শব্দ বা ইডিয়মগুলো বারবার ব্যবহার করলেই কি সত্যিই বিস্ফোরণ ঘটবে, মানে, কবিতায় ? মনে হয়, না। এ-একটা আজব আর্টফরম—যেখানে প্রভাত চৌধুরীদের প্রার্থিত বিস্ফোরণ ঘটে যায় চুপিচুপি ; ইঙ্গিতে, প্রতীকে, বর্ণচোরা শব্দহীনতায়—সোজা কথায়, আলঙ্কারিকরা যেমন বলতেন, ব্যঙ্গার্থে। আর তা হলে সবচেয়ে বেশি যা জরুরি, তা হচ্ছে সংযম, পরিমিতিবোধ, কলমের স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত না করার দায়িত্ব। ইচ্ছে করলেই প্রভাত চৌধুরী থামতে পারতেন। তাঁর 'অন্তিম

কবিতাবলী'র তের নম্বর কবিতা, কিম্বা 'একই বিন্দুতে আমি স্থির অথর্ব' শীর্ষক কবিতার কোনো কোনো জায়গা—বিশেষত, এই জায়গাটা : "সুন্দরের ভিতর কত বিনম্র মগ্নতা / প্রবাহিত শিরা উপশিরা থেকে বেদগান ভেসে আসে / সমস্ত গোলাপ যদি মৃত হয় আমিও সোচ্চার / জ্ঞানপাপী হয়ে আর বাঁচব না এই পৃথিবীতে"—বেশ ভালো লেখা। তাঁর অনেক লেখাতেই কবিত্ব প্রচুর ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ; কিন্তু তা প্রায়ই বক্তব্যের চড়াস্বরের গন্তঘেঁষা উচ্চারণে মাঠে মারা গেছে। আর একটা কথা, ছন্দ জিনিসটা কি কবির কাছে একেবারেই চক্ষুশূল ? প্রথম দিকে এ-নিয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম ; পয়ারের ঢঙে কোনো কোনো লাইন সাজানো দেখে ভেবেছিলুম : ছন্দ আছে। কিন্তু না, আমার জানা অক্ষরবৃত্তের কোনো বিন্যাসই—যেমন ৮+৬, ৮+১০, ৬+৪ ইত্যাদি—সেখানে দেখতে পাইনি। শেষে ছন্দে ভুল ধরা ছেড়ে দিয়েই কবিতাগুলি পড়তে বাধ্য হলুম। গদ্য কবিতা বা ফ্রি ভার্স বলেও তো একটা ভঙ্গি চালু আছে। সুতরাং এ-নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।

শিবেন চট্টোপাধ্যায়ের 'দর্পিত প্রহরে' বেরিয়েছে চার বছর আগে। এতদিন পর তাঁর বইয়ের সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছু মন্তব্য করা কতখানি উচিত হবে, ভাবছি। নিশ্চয়ই অন্তর্বর্তী এই সময়ে শিবেনবাবু আরও লিখেছেন—তাঁর কবিতা বাঙলাদেশের লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে প্রায় নিয়মিতই পড়তে পাই—এবং স্বাভাবিক কারণেই এই লেখাগুলি 'দর্পিত প্রহরে'র কবিতাবলীর চেয়ে পরিণত মনে হতে পারে। বস্তুত শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটিতে প্রায় সবখানেই একটি কোমল সংবেদনশীল কবিমনের প্রাথমিক আত্মপ্রকাশের পরিচয় সুস্পষ্ট ; এবং 'প্রাথমিক' বিশেষণটি ব্যবহার করতে সাহস পেয়েছি তাঁর এই ধরনের পংক্তিগুলি পড়েই : "এখনো জাগিয়া আছে মত্ত নীল নক্ষত্রের কঠিন ধূসর চোখ স্থিরতর হয়ে / বিবর্ণ ঘাসের বুকে এখনো জাগিয়া আছে ম্লানতর হয়ে / কবেকার কোন এক রূপসীর নয়নের জল।" জীবনানন্দের প্রভাব এখানে স্পষ্ট। আর, প্রথম প্রথম মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে অগ্রজ কবির প্রভাব এড়ানো খুবই শক্ত ; শিবেনবাবুও তা পারেননি। এ নিয়ে এতদিন পর তাঁকে কিছু বলা মোটেই ঠিক হবে না। বরং চার বছর আগে, এত বড় একটা প্রভাব সত্ত্বেও যিনি 'ইছামতী' কী 'প্রান্তরের অন্ধকারে'র মতো চমৎকার কবিতা লিখতে পেরেছিলেন, তিনি

নিরঙ্কুশ প্রশংসারই পাত্র। সবচেয়ে বড়ো কথা, 'দর্পিত প্রহর' বইটি যে-কোনো কবিতা পাঠককেই শিবেনবাবুর ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ—বলা বাহুল্য, কবিতার ভবিষ্যৎ—সম্বন্ধে একটি অনুকূল আস্থা এনে দিতে পারে।

শিবশম্ভু পাল

সময়। আশিস গোষ। এই দশক॥
শীতেব বাতেব কান্না। মুবাবী মুখোপাধ্যায। হ্বফ প্রকাশনী॥

আশা করি আমাদের এ-সময়ে ষাটের দশকও যখন উপান্তবর্তী, তখন বাঙলাদেশের নতুনতর গল্প-ভাবনা সম্পর্কিত ভূমিকা অনেকাংশে অবান্তর। স্বাধীনতা-উত্তর কালে, বিশেষত পঞ্চাশের দশক থেকেই, বাঙলা গল্পের ধারা রূপান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে প্রাগ্রসর। বিষয়ে, তারও অধিক প্রকাশ রীতিতে, রূপবদলের যে পালা চলেছে, তার সঙ্গে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত।

পরিচিত আমাদের এ-সময়ের সঙ্গেও। যে-সময়ে আমরা বসবাস করছি, নানা কারণে তার স্বরূপটা বড় জটিল। বাসিন্দারা ততোধিক জট-সম্পন্ন। চলার পথ বক্র, অনেকাংশে অচেনা; চিন্তার জগতও কম ধোঁয়াটে অস্বচ্ছ নয়। আধুনিক জীবনযাত্রা, তাই স্বভাবত একটা গোলকধাঁধা। এ-যুগের মানুষেরা, বিশেষত নগর-প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এই সময়ের হাতের অসহায় ক্রীড়নক, উদ্দেশ্যবিহীন, চেনা-অচেনার মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলত, তার গতি-বিধি কখনও কখনও যে অস্পষ্ট রহস্যময় হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য কি! ওরা যেখানে পৌছুতে চায়, তার ঠিকানাটা প্রায়শ জানা থাকে না। অথবা গন্তব্য স্থলে আদৌ পৌছুতে চায় কি না, সে সম্বন্ধেও নিদারুণ সন্দেহ আছে। বলা বাহুল্য এই জীবন-ভাবনা সাম্প্রতিক নগর-জীবনের নৈরাশ্য সম্ভূত।

পক্ষান্তরে, এ-সময়ের আরও একটা দিক আছে। বাঙলাদেশের, বা বৃহত্তর বাঙলার মফস্বল জীবন-কেন্দ্রিত সেই সময়-ভাবনা বহুলাংশে এর বিপরীত। কলকাতা বা নাগরিকতার ব্যাধিগ্রস্ত মানসিকতা যে সে স্তরে অনুপস্থিত তা নয়. বরং ইদানীংকার ট্রেন বাস পাকা সড়ক, বি. ডি. ও বা

রেডিওর পথ ধরে সুদূর পল্লী অঞ্চলেও তার প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত; হতাশার বীজ সেখানেও নানাভাবেই অঙ্কুরিত হচ্ছে, তবুও বলা যায় সেখানকার জীবন-যাত্রায় সংগ্রাম আছে। সংগ্রাম যথার্থ অর্থে, চাল ডাল নুনের, সংগ্রাম স্বাস্থ্যের আর স্থায়িত্বের, সংগ্রাম শিক্ষার, শোষণহীনতার আর প্রগতির। অথবা বলা চলে, অধুনা নগর-জীবনের প্রবাহে সৃষ্ট মিশ্র এবং জটিল ধাঁধাঁর মধ্যেও জীবনের পক্ষে তারা নিয়ত যুদ্ধ করে চলেছে।

উপরোক্ত দুই কোটির জীবন-ভাবনার ফসল যথাক্রমে আশিস ঘোষের 'সময়' এবং মুরারী মুখোপাধ্যায়ের 'শীতের রাতের কান্না'। একই সঙ্গে তরুণতর এই দুই গল্পকারের গল্পগ্রন্থে যুগপৎ দুই জগতের মানুষকে, তাদের শরীর ও মন সহ, যথেষ্ট সজীব ও সত্যরূপে দেখতে পাওয়া গেল। সুখের বিষয় অশিস ঘোষ এবং মুরারী মুখোপাধ্যায় দুজনেই নিজস্ব অভিজ্ঞতায় সীমিত এবং শ্রদ্ধাশীল।

আশিস ঘোষের গল্পের আবেদন স্বভাবত বুদ্ধিতে, মনে। তাঁর গল্পের মানুষগুলি—(লেখক হয়তো বলতে চান এ-সময়ের যে-কেউ, তাঁর অনেক গল্পের মানুষ নামহীন), বুদ্ধিমান, শাণিত-রসিক, এবং জীবন সম্পর্কে কথঞ্চিৎ নিরাসক্ত, বেশ কিছুটা অতীন্দ্রিয়, কিছুটা নৈরাশ্যবাদী। 'সময়', 'অচেনা', 'স্বপ্ন', 'স্বাদ', 'আহ্বানে'—প্রভৃতি প্রায় সব গল্পে তাঁর এই চিন্তা ধরা পড়েছে। কলকাতা সম্পর্কে তাঁর নায়ক ভাবে, "উঃ, কী বীভৎস সেই জীবন! এক একটা অর্থহীন দিন যেন মনে হয়, আয়ু থেকে খসে খসে পড়ছে। ক্রমশ বয়স বেড়ে যায়। পরিচিত মুখ, পরিচিত ব্যবহার, মাঝে মাঝে খুব এক ঘেয়ে মনে হয়। জীবনের কি কোন গতি নেই, কোন উত্থান পতন নেই? হিরন্ময় ভেবে দেখেছে, আর এই ভেবে ক্লান্ত হয়েছে যে,—আসলে আমরা খুব অসহায়।" নিজেকে এভাবে অসহায় ভাবলে দিক নির্ণয়েও অক্ষম হবে। কোথায় যে সে যাবে ('সময়', 'যদি', 'অলক্ষ্যে'), কেনই বা সে যায় ('স্বপ্ন', 'আহ্বানে') সে জানে না। কোথাও হয়তো সামান্য ইঙ্গিত আছে, স্বপ্নের, ব্রিজের চড়াই ভাঙার সংগ্রামে। আবার নিষ্প্রাণ পাথর হওয়ার সাধনায়, রোগগ্রস্ত যুবকের পাশে পিতার অবস্থিতি, ভস্মীভূত, রাজপ্রাসাদ, সাইকেল প্রতিযোগিতার অনবরত চেষ্টা করে যাওয়ার মধ্যে।

এই ইঙ্গিত ও জটিলতার মাধ্যমে কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা আছে। কিন্তু এ-গল্পে সে-বক্তব্য একটি লিরিক কবিতার ধূসর ইঙ্গিতের মতো দুরাশ্রয়ী, কখনও

বা নিতান্তই অস্পষ্ট। বস্তুত, আশিস ঘোষের গল্পগুলি পরিবেশমুখ্য, মুহূর্তভাবনাই এখানকার গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য। এবং আশিস ঘোষ আঙ্গিক হিসাবেও তাই খুব সংক্ষিপ্ত পরিসর, কবিকে এবং রহস্যময় পরিবেশ, তির্যক ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষণ গ্রহণ করেছেন। সব মিলে কিছু চিত্র পাই, কিন্তু গল্প? কোনো কোনো সাম্প্রতিক গল্প বিষয় ভাব ও প্রকাশরীতিতে অনেকাংশে কবিতার কাছাকাছি, আর্ট-ফরম হিসাবে উভয়ের দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা কারো কারো রচনাতে দেখা যায়, যাচ্ছে ; তবুও বলব, কখনও কখনও দূরত্বটা বাড়িয়ে দিলে যে গল্প হিসাবে তার স্ব-রূপ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার প্রমাণও আশিস ঘোষেরই দুএকটি গল্পে আছে। বস্তুত 'অচেনা', 'অসুখ' বা 'সাইকেল'-এর মতো গল্প আছে বলেই, ''সময়ের গল্পগুলি সম্বন্ধে পাঠক আগ্রহবোধ করেন।''

মুরারী মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে পক্ষান্তরে চমক কম, ধারও কম—কি ভাষাপ্রয়োগে, কি প্রকাশরীতিতে। অনেকটা সহজ সরল করে বাঙলার দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের কথা বলা হয়েছে। কি বক্তব্যে, কি জীবনজিজ্ঞাসায় মুরারী মুখোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এ-গল্পের আবেদন বুদ্ধিতে নয়, হৃদয়ের অনুভবে। মুরারী মুখোপাধ্যায়ের মানুষগুলি দুঃস্থ, পরিশ্রমী এবং সংগ্রামী। 'অন্নড়াইভর'-এর অন্নদা সর্দার, 'সোনার হরিণ'-এর অমিয়, 'শীতের রাতের কান্না'র রহমান, দেলজান, 'প্রতিবিম্ব'-র নিরামত প্রভৃতি সকলেই মেহনতি মানুষের প্রতিচ্ছবি। 'পাঁচটার ভোঁ বেজে গেছে। সারারাত মেসিনের সঙ্গে লড়াই করা মানুষগুলো, কাক বাচ্চার মত চ্যাঁ চ্যাঁ করে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে। ওদের মধ্যে অমিয় নিজেকে আবিষ্কার করে। সারাটা যৌবনের শক্তি সামর্থ, বিবেক বুদ্ধি, অনুভূতি বেদনা মায় ঋতুর ফসল পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে, ঋণ জর্জর ঘুণ ধরা এক জীবনকে ফুটো নৌকোর মত কোনক্রমে বার্ধক্যের দরজায় হাজির করা।' নড়া দাঁতের মত প্রতি মুহূর্তে যা অসহ্য ব্যথা সৃষ্টি করবে। শুয়োরের বাচ্চার মত এক পাল ছেলে মেয়ে। অভাব-দারিদ্র্য, রোগ শোক, লোভ-মোহ, ঈর্ষা হতাশা, রাজব্যাধি রাজরোষ সব মিলে এক জঘন্য তিক্ততা। এর এক ধারাবাহিক প্রবাহ চলেছে যেন। যার মধ্যে শুধু অমিয় নয়, পৃথিবীর আর সবাই মিশে যাবে। যারা জীবনে মিষ্টি ছবি এঁকেছিল একদিন।" এই অনুভব মুরারী মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে। 'সিন্ধু'র বিধবা দুটি নাবালককে নিয়ে কারখানার আনাচ-কানাচ থেকে পোড়া কয়লা কুড়িয়ে জীবিকার সংস্থান করে। জীবন ধারণের এ-এক

নিষ্ঠুর প্রহসন। স্ত্রীর তাড়নায় এবং ম্যানেজারের দাপটে একটি লাগাতর ধর্মঘটকে বানচাল করে দেওয়ার পর অমিয়র অন্তর্জ্বালা বা সদানন্দ অনুভূতি প্রবণ অয়ডাইভরের অসুস্থ ছেলেকে কেন্দ্র করে জীবনদর্শনের রূপান্তর—এমনি আরও সব জীবন্ত বাস্তব ছবি। কিন্তু প্রথম গল্প 'পরিত্যক্ত দুর্গ' কলকাতা-বাসী কোনো অধ্যাপকের চাষীর ঘরে আশ্রয়লাভ এবং চাষী মেয়ের সঙ্গে রাত্রি-যাপনের পতিত কাহিনী এ গ্রন্থে না থাকলে কি ক্ষতি হত? অবশ্য বিদায়ের সময়কার রাক্ষসীর সেই মূর্তি, "আর কোনো দিন এসো না তুমি"—মনে রাখার মতো। প্রকাশভঙ্গিতে এবং গল্পকথনে আরও সচেতন হলে মুরারী মুখো-পাধ্যায়ের হাতে মফস্বল বাঙলার সাধারণ মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠবে, এ-আশা করা যায়।

শচীন বিশ্বাস

রুমানিয়ার লোকশিল্প

কিছুদিন আগে আফা গ্যালারিতে রুমানিয়ার লোকশিল্পের এক আকর্ষণীয় প্রদর্শনী হয়ে গেল। লোকশিল্পের নাম শুনলেই ভ্রূকুঞ্চনে আজো আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতির সোল এজেন্টরা অভ্যস্ত, তাদের বোধহয় মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছিল ঐ প্রদর্শনী দেখে, অবশ্য যাঁরা যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের কথাই বলছি। রুমানিয়ার লোকশিল্প ইয়োরোপে চিরদিনই সমাদৃত, এর যেমন নিখুঁত রীতি ও আঙ্গিক, তেমনই বৈচিত্র্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করাই এই শিল্পের লক্ষ্য: যেমন পরিধেয় দ্রব্য, অলঙ্কার, ইত্যাদি। পরিচিতি-পত্রে লেখা রয়েছে: "Rumanian Folk art did not appear divorced from historic reality , it was always an expression of the people's struggles and sufferings, of their love of work and life. Their songs of longing and ballads, the way they built and decorated their homes are only some of the forms of expressing reality।" দেখতে দেখতে এই কথাগুলির প্রত্যক্ষতা অনুভব করছিলাম। সিরামিকস, কাঠের কাজ, পশমের কাজ, সুতোর কাজ প্রভৃতিতে এই স্বাক্ষর স্পষ্ট। তাদের যেমন আনুপাতিক ভারসাম্যে, তেমন ফর্মের সঙ্গতিতে, রঙের ব্যবহারে ও নক্সায় অবিশ্বাস্য দক্ষতা। বেছে বেছে বলা খুবই শক্ত, কাদের কাজ কেমন, মোটামুটি ভাবে তিনঅঞ্চলের নাম সব থেকে বেশি উল্লেযোগ্য—ওল্‌টেনিয়া, ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়া ও মল্‌ডাভিয়া। সিরামিকসে ও কাঠের কাজে মল্‌ডাভিয়ার কাজ সব থেকে ভালো লেগেছে, তার মধ্যে 'জানালার চৌকাঠ' ও 'রেকাবি' উল্লেখ্য; কার্পেট ও পশমের কাজে ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়ার 'রমণীর পোষাক' ও 'কার্পেট' ভালো লাগে। ওল্‌টেনিয়াকে সব দিকেই দক্ষ মনে হলো—যেমন গরম কাপড়, তেমন কার্পেট, তেমন সিরামিকস; একটি 'ভিটেল ওয়াল কার্পেট' সকলেরই চোখে পড়েছে।

প্রদর্শনী থেকে রুমানিয়ার পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনার জন্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশুনস ও রুমানিয়ার দূতাবাসের কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

গ্রুপ স্কেচ প্রদর্শনী

অতি সম্প্রতি আকা গ্যালারিতে কয়েকজন শিল্পী এক যৌথ স্কেচের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ রোহাতগী, অমিতাভ ব্যানার্জি, শ্যামল বসু, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, বেণু লাহিড়ী, বারিদ গোস্বামী ও শঙ্কর ঘোষ। স্কেচ প্রদর্শনীর আকর্ষণ অন্যত্র। স্টাণ্টবাজির সুযোগ এখানে বড় কম, এখানে চিত্রাঙ্কনের 'অ্যাসিড টেস্ট' হয়ে যায়। অর্থাৎ ড্রয়িং-এর কেরামতি ধরা পড়ে। বলতে দ্বিধা নেই, এঁদের অধিকাংশ কাজেই ঐ দুর্বলতা দেখিনি। অমিতাভ ব্যানার্জি ও বারিদ গোস্বামীর কাজ সব থেকে উত্তীর্ণ মনে হয়েছে। প্রথমোক্ত শিল্পী এক ধরনের 'ইণ্টার-টোনাল ক্রসিং' (এক রঙের ওপর অন্য রঙ লেপন করে একটা প্রক্রিয়ার সৃষ্টি) করিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন। তার মধ্যে 'সঙ্গীতজ্ঞ' অত্যন্ত সার্থক ছবি। বারিদ গোস্বামী মূলত অ্যাকশ্যন পেণ্টার (অর্থাৎ বিষয়ের কথা আগে না ভেবে ইচ্ছেমতো রঙ লেপন করে যে ফর্ম বেরিয়ে আসে, সেটাকে আকৃতি দেওয়া), জাতে এক্সপ্রেসনিস্ট। এঁর ছবির আর-একটা গুণ টোনাল এফেক্ট। টেম্পার ও ওয়াশ পদ্ধতিও অবলম্বন করে থাকেন। 'মোরগ', 'রমণীর প্রতিকৃতি' (জলরঙ), 'গ্রামের চাঁদ' ও 'বাউল' (পেন এণ্ড ইংক-এর নিপুণ স্কেচ) উল্লেখ-যোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী প্রধানত দুটি কি একটি রঙ বেছে রেখাবর্জিত স্কেচ করেছেন, তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য হলেও 'কালোসাদা' ব্যতীত আর একটি কাজও তেমন উচ্চমানের হয়নি। শঙ্কর ঘোষ ও শ্যামল বসুর কাজ গতানুগতির প্রভাব মুক্ত নয়। সন্তোষ রোহাতগীর 'গ্রুপ' (জলরঙ) ও বেণু লাহিড়ীর 'চা-বিরতি' মুখোমুখী দুজনের ছায়াপাতের জন্য আকর্ষণীয়। এঁদের প্রত্যেকেই যদি বিষয়ের দিকে আরো সঙ্গতিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন, তাহলে নিজেদের প্রতি সুবিচার করবেন।

ঐতিহ্যময় গ্রাফিকস

একই গ্যালারিতে এই দশকের কয়েকজন যুগন্ধর চিত্রকরের যৌথ গ্রাফিকস এর প্রদর্শনী হয়ে গেল। এক হিসেবে ঐ প্রদর্শনীর তাৎপর্য অপরিসীম, এঁদের

মধ্যে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চুনীলাল দত্তগুপ্ত, সমর দাশগুপ্ত, হরেন দাস প্রভৃতি। আজকের তরুণ শিল্পীরা নকল-নবিশীতে সময় ও ক্ষমতা অপচয় করেন। অনুকরণ (অথবা হনুকরণ—apism) এখন খ্যাতির সোপান, যদিও তার ভাঙন শুরু হয় অবিলম্বে। অথচ এঁরা যদি তাঁদের পূর্বসূরীদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হতেন, তাহলে নিজেদের প্রতি সুবিচার তো করতেনই, উপরন্তু আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা অধিকতরভাবে সমৃদ্ধ হতে পারত।

এই পূর্বসূরীরা যে কি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ছিলেন, তার পরিচয় মেলে প্রতিটি রেখানির্মাণে, অধিকাংশ কাজই ছিল ক্রোমোলিথোগ্রাফ জাতের (অর্থাৎ রঙিন লিথো)। নন্দলাল বসুর 'পার্থসারথী' ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বভারতীয় প্যানেলের স্মৃতিবহ, খয়েরী ও লালের মিশ্রণে টোন ছবিটিকে ডিরেক্ট করে তুলেছে। চুনীলাল দত্তগুপ্তের 'মা ও ছেলে' মাতিস-এর বর্ণব্যবহারের কথা স্মরিয়ে দেয়, অথচ মোটিফে এঁর মৌলিকতা বিস্ময়কর ও প্রাচীনগুণসম্পন্ন। সমর দত্তগুপ্তের কাঙড়া রীতিতে 'উৎসব' সূক্ষ্মতায় একক। রথীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ক্ষেত্র কারুকার্যে নিপুণ 'পুষ্পগুচ্ছ' একথা প্রমাণিত করে যে, কবিপুত্রের প্রতিভার ঘাটতি ছিল না। প্রদর্শনীতে সবথেকে বিশিষ্টতা নিয়ে উপস্থিত রমেন্দ্রনাথের কাজগুলি, তিনটি কাজই অসামান্য, 'ভুবনেশ্বরের মন্দির'-এর ডিটেল ও টোন, 'ভাগলপুরের পথে'র সজীব ছায়াচ্ছন্ন গৃহমুখিনতা এবং ইমপ্রেশনিজম ধর্মী 'ভুবনডাঙ্গা' অবিস্মরণীয়; শেষোক্ত প্রিন্টটি লালমাটির স্মৃতিতে আর্দ্র। হরেন দাসের কাঠ খোদাইগুলি ঐ প্রদর্শনীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, 'মেলার পথে' গরুর গাড়িতে আরোহী দুই রমণী ও একজন পুরুষের অবস্থানকে কেন্দ্র করে চিত্রিত।

ঐ প্রদর্শনীটি যাঁরা দেখতে পেলেন না, তাঁদের জীবনে এমন অমূল্য সুযোগ হয়তো আর আসবে না; যাঁরা দেখেছেন, মুগ্ধ হবার এমন আস্বাদ তাঁদের কাছে সম্পদ হয়ে থাকবে।

চারুনেত্র

পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থার নবতম নাটক

কল্মাষপাদ

১০ জুন '৬৯ সন্ধ্যায় মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চে পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থা তাঁদের নবতম নাটক 'কল্মাষপাদ'-এর তৃতীয় অভিনয় মঞ্চস্থ করেছেন। কিছুটা আকস্মিকভাবে এবং কিছুটা অনিচ্ছুক মন নিয়ে এই নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুটা-অনিচ্ছার হেতু পষ্টাপষ্টি বলতে বাধা নেই: এঁদের দু-তিনটি বিজ্ঞাননাট্য আগে দেখে আমার খুব একটা উৎসাহ জাগেনি, যদিও সেগুলিরও বিষয়বস্তু ছিল অভিনব, প্রচেষ্টা ছিল দুঃসাহসিক, উদ্দেশ্য ছিল মানবিক—কিন্তু কোথায় যেন কিছুর অভাব ছিল যার ফলে সেগুলিকে সার্থক নাটক হিসেবে আমি অন্তত গ্রহণ করতে পারিনি। শ্রদ্ধেয় নাট্যকার ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নতুন নাটক 'কল্মাষপাদ'-এ 'অমিল, মেকিমিল ও গোঁজামিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' করেছেন এমনি বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেখে মনে হয়েছিল বর্তমান দেশ-কালের কিছু মানসিক বিকারের গূঢ় মনস্তত্ত্বাশ্রয়ী রূপায়ণ এমন কিছু লোককে দিয়ে অভিনয় করানো হবে যাঁরা পণ্ডিত, সৎ, প্রগতিশীল কিন্তু নাট্যাভিনয় যাঁদের শখের বিষয় মাত্র—এমন শখ যা নিয়মিত চর্চা করা হয় না, যার সঙ্গে জীবন-মরণ জড়িয়ে নেই, যা দু-দণ্ডের খেয়ালখুশি মাত্র। সুতরাং বলাই বাহুল্য, নাটকের যবনিকা উঠবার আগে নাট্যকার যখন থেকে সাম্প্রতিক নাট্য-আন্দোলনের জটিল সমস্যাবলী সম্পর্কে ভাষণ শুরু করলেন তখন থেকেই কল্মাষপাদ নাটক শুরু হয়ে গেছে ভেবেছিলাম।

কিন্তু আমার ভুল ভাঙল সত্যি যখন যবনিকা উঠল। দৃশ্যের শুরুতেই চমকে গেলাম। এবং সেই যে চেয়ারের পিঠ থেকে আমার পিঠের সংযোগ বিচ্ছিন্ন (অ্যালিয়েনেটেড)। হলো, নাটকের শেষ মুহূর্ত যবনিকা পতনের সময় পর্যন্ত (সম্ভবত সোয়া দু ঘণ্টা) তা আর পুনঃসংস্থাপিত হয়নি। বিপুল বিস্ময়ে, আবেগে, আনন্দে, কৌতুকে, শ্রদ্ধায় সময়টা এমন দ্রুত কেটে গেল যে, নাটকের শেষে আমার কেবলই মনে হতে লাগল এই নাটক না-হয় ছাপার অক্ষরে চিরকাল থাকবে কিন্তু এমন অভিনয় যদি আর না হয়? যদি আর কেউ না দেখে? যে নিষ্ঠা ও শক্তিতে ছাপার অক্ষরগুলিকে, জীবনের

কতকগুলি সত্য কথাকে নাট্যরূপায়িত করা হলো সেই নিষ্ঠা আর শক্তি যদি ভবিষ্যতে ফের একত্র না হয়? নাটকের শেষে এক অভিনেতা আমাকে জিগ্‌গেস করেছিলেন, কেমন লাগল? তখন আমার অভিভূত অবস্থা, শুধু বলেছিলাম, এ নাটক শুধু কলকাতায় নয়, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার যোগ্য, সারা পৃথিবী জানুক বাঙলা নাটক কত উঁচুতে উঠে এসেছে।

কল্মাষপাদ নাটকের বিষয়বস্তু দ্বিবিধ। বৈষম্য, উৎপীড়ন ও শোষণভিত্তিক সমাজের মুখোশ খুলে শ্রেণীশত্রুদের কয়েকটিকে চিনিয়ে দেওয়া এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলাদেশের নাট্য-আন্দোলনে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ, অস্তাবাদ, অর্থহীনতাবাদ, অতিপ্রাকৃতবাদ, নিয়তিবাদ, অধিবাস্তববাদ, স্বভাববাদ এবং এমনকি অতিবিপ্লবী হঠকারিতা আসর জঁাকিয়েছে সেগুলির খোলসের তলায় কোন্ মানসিকতা বিদ্যমান, কেন এবং কিভাবে এই সব ঝোঁক লালিত হচ্ছে, কোথা থেকে এরা মদত পায় তা নাটকীয় সংলাপে, টুকরো-টুকরো গুটিকতক দৃশ্যের উপস্থাপনে, মঞ্চোপরি প্রদর্শন ও নেপথ্য ঘোষণায়, ড্রেসিং- পেইন্টিং-এর ধার না ধেরে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে-যার নিজের-নিজের পোশাকে মঞ্চে হাজির হয়ে মাঝে-মাঝে মুখোশ পরে এবং খুলে ফেলে, দাঁড়ি-গোঁফ প্রভৃতি অন্যান্য ছদ্মবেশ দর্শক-সমক্ষেই টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে রিয়ালিটিকে আড়াল করবার দ্বারা ইলিউশন সৃষ্টি করে নয়, রিয়ালিটিকে প্রকটতর করবার দ্বারা নূতনতর ইলিউশন সৃষ্টি করে, পূর্বাপর কাহিনীবিহীনভাবে মুক্তাঙ্গনের মঞ্চে আলোকসম্পাতের ভেলকি ছাড়াই সহজ-সরল সেটে নাট্য-আবেদনে মূর্ত, প্রাণবন্ত, সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে।

নাটকের প্রস্তাবনা অংশে প্রথমেই প্রবেশ করেন শীর্ণকায় বর্মচর্ম শোভিত শ্রীকুইক্‌সট্ চোখমুখ পাকিয়ে, তাঁর কাঁধের ঝোলায় নাটকের পাণ্ডুলিপি—হাতবোমার মধ্যে পোরা। বীরদর্পে স্টেজের ওপর তাঁর মার্চিং-কায়দা রীতিমতো দেখবার বিষয়। তারপর কাঁধের ঝোলা থেকে শিঙাটি বের করতেই তাঁর সহকারী সাংকোপাঞ্জা প্রবেশ করেন কাঁধে ড্রাম নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে। সহকারীর এই ল্যাংচানো এবং পরে তাঁর কণ্ঠে নিরুত্তাপ যান্ত্রিকতায় বুঝতে পারা যায় তিনি তাঁর আগুনে নেতার গাধাবোট এবং প্রতিধ্বনির যন্ত্র মাত্র। নেতা এবং সহকারীর এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে নাটকীয়তার শুরু। নেতা হাঁক পাড়েন; 'ফেস্টুন!' সহকারী প্রতিধ্বনি করেন: 'ফেস্টুন রেডি!' সঙ্গে সঙ্গে ফেস্টুনধারীর প্রবেশ, ফেস্টুনে লাল

রঙে লেখা : 'যুদ্ধ ঘোষণা !' কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—নেতা জানিয়ে দিলেন, সহকারী তোতাপাখির মতো তা আওড়ালেন। ফেস্টুনধারী জানতে চাইল : 'শত্রু বুঝব কিসে? দাও আমাদের দিশে।' নেতা তখন সহকারীর প্রতিধ্বনি সহ একে-একে ছটি শত্রুর নিশানা দিলেন : 'অস্পষ্টবাদী আর অতিস্পষ্টবাদীরা আমাদের এক নম্বর শত্রু; অবাস্তববাদী আর অতিবাস্তববাদীরা আমাদের দু নম্বর শত্রু; মানুষ পশু অজ আর ডাইনোসর আমাদের তিন নম্বর শত্রু; উদারপন্থী আর কট্টরপন্থী, প্রতিবিপ্লবী আর অতিবিপ্লবী দুজনেই আমাদের চার নম্বর শত্রু, নৈরাজ্যবাদী আর নৈরাত্মবাদী, অস্তিবাদী আর নাস্তিবাদী আমাদের সুপার শত্রু : পাঁচ নম্বর; যান্ত্রিক জড়বাদী আর অতীন্দ্রিয়বাদী আমাদের ম্যাগনাম শত্রু : ছ নম্বর।' বক্তব্য উপস্থাপনের এই উদ্ভট রীতি সত্ত্বেও সংলাপের ভাষা এবং তা ডেলিভারির গুণে বক্তব্যের মর্ম অনুধাবনে অসুবিধা হয় না; বরং এর দ্বারা নীরস বক্তব্য নাটকীয় সরসতা লাভ করছে। বোমা চার্জ করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা তো হল, নাটকের কামান শত্রুর দিকে তাগ করার জন্য নেতা বায়নোকুলার বের করে সহকারীকে দিলেন শত্রুর অবস্থান হদিস করতে। শত্রু বেরিয়ে এলেন মঞ্চের পেছন থেকে : তিনি হলেন পাতালপুরীর কুবের ট্রাস্টের এজেন্ট তথা অন্তরীক্ষ নাট্য-কনট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান মিস মুখার্জী (ওরফে মেছো মুখার্জী), সঙ্গে তাঁর দুই বোনঝি, তাদের একজন আবার তাঁর সহকারী তথা উকিলও বটে। মেছো মুখার্জীর হাতে হুইল, সহকারী রেবার হাতে টোপ, বাচ্চা মেয়ে টুকটুকের হাতে মাছ রাখবার জলপাত্র। ততক্ষণে মঞ্চের একটা অংশ গভীর জলাশয়ে পরিণত, মৎস্য (অর্থাৎ নাটুকে দল) শিকারের জন্য বঁড়শিতে টোপ গেঁথে চেয়ারম্যান জলে সুতো ছাড়লেন। চারের মশলার বিবরণ শুনে মৎস্য চরিত্র বোঝা গেল, টোপটিও ছিল লোভনীয় : মহাকাশযানে অন্তরীক্ষ ভ্রমণের রিটার্ন টিকিট! এই টোপ যারা গিলেছে ও গিলতে অগ্রসর তাদের চিনে নেবার জন্য কুইক্‌সট্ আর সাংকো কিন্তু সদাই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অনুবীক্ষণে ব্যস্ত। তাঁরা সবকটি মৎস্যের চেহারা আর চরিত্র বুঝে নিয়ে গানারকে হেঁকে হেঁকে জানিয়ে দিলেন কে কত ডিগ্রি কত সেকেণ্ডে অবস্থান করছে যাতে যথাসময়ে তাদের আক্রমণ করা যায়। কিন্তু আক্রমণের জন্য আমরা কি প্রস্তুত, এই প্রশ্ন উঠল প্রস্তাবনার শেষ মুহূর্তে। কম্পিতকণ্ঠে নেতা শুধোলেন সহকারীকে : আমরা কি রেডি? ভয়ার্ত সহকারী ফেস্টুনধারীকে :

আমরা কি রেডি? ফেস্টুনধারী পরিত্রাহী চিৎকার করল: জনসাধারণ, আমরা কি রেডি? নেপথ্যে জনসাধারণের কলরব ধ্বনিত হল: সেনাপতি, আমরা কি রেডি? দিশেহারা সেনাপতি আবার সহকারীকে জিগ্গেস করলেন: আমরা কি রেডি? সাংকো তখন গানারকেই জিগ্যেস করে বলল: আমরা কি রেডি? গানার হাঁকল: অর্ডার স্যার। কুইক্সট ভয়ার্ত চিৎকার করলেন: স্যাল-ভো! এরপর ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। প্রস্তাবনা শেষ।

অতঃপর মানুষের মুক্তি হবে যে কল্কিযুগে তার সার্থক নাট্যকারের কাছে পাঠানো কুইক্সটের নাটকের স্ক্রিপ্টের 'প্রথম দশাব বৃত্ত' অভিনীত হল: আমরা দেখলাম মুখোস-পরা রাজা কল্মাষপাদকে, শৃগালের মুখোসে এক রাজভক্ত প্রজাকে এবং হুতোমপ্যাঁচার মুখোসে আরেকটি প্রজাকে কিন্তু সে রাজবিদ্বেষী, বিদ্রোহী।

এটি শেষ হবার পর নাটকের আসল নাটক, আসল পাত্র-পাত্রীর দেখা মিলল, দেখা মিলল নকলদেরও তাদের আসল চেহারায়, আসল ভূমিকায়।

সেই আসলের বিস্তৃত পরিচয় এখানে নাই-বা দিলাম। নাট্যপিপাসু মানুষ নিজের চোখে-দেখে সে পরিচয় সাধিত করবেন, এ বিশ্বাস আমি রাখছি। বিষয়বস্তু ছেড়ে এবার অভিনয় সম্পর্কে দুটি-একটি কথা বলতে চাই।

ব্যক্তিবিশেষের অভিনয়ের ঊর্ধ্বে দলগত অভিনয়ের যে সংহতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সর্বাঙ্গীন সার্থকতার কথা প্রায়ই বলা হয় তা এই নাটকে সম্যকরূপে ফুটেছে, এইজন্য এই নাটকের পরিচালক নির্মল ঘোষকে অশেষ ধন্যবাদ। ব্যক্তিগত অভিনয়ের ক্ষেত্রে সৌকর্য ও প্রাণময়তায় সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন ফোরম্যান ওরফে টেক্-এর ভূমিকায় উশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়! কিছুকাল ধরে এদেশের নাটমঞ্চে আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জাবিষয়ক টেকনিকাল জারিজুরির প্রতিযোগিতামূলক ভেলকিতে আমাদের ট্যারা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কল্মাষপাদ নাটকে সে-ব্যবস্থা নেই বটে কিন্তু আছে ঐ ট্যারা-বানানো টেকনিকাল শক্তির প্রতীক টেক্। কৃত্রিম আলোর উৎস কতকগুলো যন্ত্রপাতির বিকল্প এই জ্যান্ত চরিত্রটি আমাদের অভিভূত করে যান্ত্রিক কারচুপিতে নয়, অভিনয়ের কলানৈপুণ্যে। এঁর অভিনয় দেখতে দেখতে এবং পরেও আমার এই কথা বারে-বারে মনে হয়েছে যে সমগ্র নাটকে তিনি এমন একটি প্রাণময় গতিবেগ সঞ্চার করেছেন যার ফলে সমস্ত দলটাই যেন উজ্জীবিত, প্রদীপ্ত, সংকল্পসমুত্থিত হয়ে উঠেছে। এঁর সঙ্গে প্রায় সমানে-সমানে পাল্লা দিয়েছেন নাট্যকারের

ভূমিকায় সুব্রত নন্দী। অসাধারণ দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বে নাটকের কঠিনতম ভূমিকাটিকে তিনি সহজ, সাবলীল, স্বাভাবিক করে তুলেছেন।

কুইক্‌সট্ ও মঙ্গলগ্রহীর ভূমিকায় শরৎ রায়, সাংকো ও পুং ডায়নোসরের ভূমিকায় তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৃগালের মুখোসে রাজভক্ত প্রজার ভূমিকায় সুনীল বিশ্বাস নিজ নিজ ভূমিকা একাগ্রতাগুণে অর্থপূর্ণ এবং দর্শনীয় করে তুলতে পেরেছেন। আর অন্তরীক্ষ নাট্য-কনট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান মেছো মুখার্জীর ভূমিকায় সবিতা মুখোপাধ্যায় তো তাঁর ধমক-ধামক, নাকসিঁটকানো এবং মাঝে মাঝে 'বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি' বলেই একেবারে মাত করে দিয়েছেন। কিন্তু হুতোমপ্যাঁচার মুখোসে বিদ্রোহী প্রজার ভূমিকায় ধূর্জটি দত্ত একেবারেই বেমানান, ভাবলেশহীনভাবে তিনি মুখস্থ পার্ট আউড়ে গেছেন মাত্র এবং সংলাপ যত অর্থবহই হোক না কেন, বলতে না জানলে তা যে কত নীরস, বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে শ্রীদত্ত তা ভালোই প্রমাণ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয় মোটামুটি মানিয়ে গেছে। আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাত এইজন্যই প্রশংসনীয় যে তা আত্মজাহিরের চেষ্টা করেনি।

সর্বশেষে—যদিও বলা উচিত ছিল সর্বাগ্রে—বলতে হবে এই নাটকের সংলাপের ঐশ্বর্যের কথা। ব্যঞ্জনা ও কার্যকারিতায়, বাহুল্যবর্জিত সুষ্ঠুতা ও ছন্দোময় বাক্যরচনায়, স্বচ্ছন্দগতি ও অভিনব ভাবের দ্যোতনায় এবং সর্বোপরি পরিহাসে, কৌতুকে, হাস্যরসে পরিপূর্ণ ভাষার এমনি চাল, এই নাটকের প্রথম থেকে শেষ সংলাপ পর্যন্ত, যেমনটি গড়ে উঠেছে তার দ্বারা এই নাটক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরকালীন সম্পদরূপে স্বীকৃতির যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী বা তাসের দেশ ভাষার যে যাদু ঐশ্বর্য দেখিয়েছে, বহুকাল পরে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই কল্মাষপাদ নাটকে আমরা নতুন চেহারার সম্পূর্ণ অভিনব শব্দ সম্ভারে আবার তা পেলাম। তাই এই নাটক শুধু মঞ্চে অভিনয়ের জন্যই নয়, নাট্যসাহিত্য রূপে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে একান্তে পাঠযোগ্যও বটে।

শেষ কথা দর্শকমণ্ডলী সম্বন্ধে। মুক্তাঙ্গনের আসর সেদিন মোটামুটি ভর্তিই ছিল এবং আমার মনে হয়েছিল, বিদগ্ধ ব্যক্তি বলে জানি এবং যাঁদের দেখলে বিদগ্ধ বলে মনে হয় এমনি দর্শকের সংখ্যা সেদিন যত ছিল তার চতুর্গুণ ছিল এমন সব লোক যাঁরা বিশেষভাবে দগ্ধ তো ননই, পাণ্ডিত্য ও মতান্ধতা দ্বারা যাঁরা আদৌ দগ্ধ নন। আমি লক্ষ্য করেছিলাম এমন যে দর্শকমণ্ডলী,

তাদের কাছে এই নাটক সেদিন সমাদৃত হয়েছে ; কারণ কাউকে উসখুস করতে পাশের লোকের সঙ্গে ফিসফিস কানাকানি করতে, হাই তুলতে বা নাটক শেষ হবার পর নিষ্কৃতি পাওয়া গেল—এমন ভাব প্রকাশ করতে দেখিনি। বরং নাটকের মধ্যে মধ্যে দর্শকের উচ্চহাসি এবং নাটকের শেষে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একটা সামগ্রিক উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের আগ্রহ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তাই মনে হয় এ নাটক দেশের ব্যাপক দর্শকমণ্ডলীর কাছে পৌছলে জন-সংযোগের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যমের কাজ এর দ্বারা ভালোই সংসাধিত হবে। আমরা কি এমন একটি সর্বার্থসাধক নাটকের বহুল প্রচারে যার যতটা সাধ্য উদ্যোগী হব না ?

সত্যপ্রিয় ঘোষ

'নক্ষত্র'র 'বৃষ্টি বৃষ্টি'

পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী, যাঁরা নিজেদের নাট্য-আন্দোলনের শরিক বলে মনে করেন এবং যাঁরা সমাজ-সচেতনতার দাবি করেন, তাঁদের নাট্যকর্মের পর্যা-লোচনা করলে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে সমষ্টির প্রাধান্য মানতে গিয়ে ব্যক্তিমানসের অস্বীকৃতি ; অপরদিকে ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করতে গিয়ে সমাজ-বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের সন্ধান। একদিকে নাট্যমঞ্চকে ভুল করে ভাবা হয় রাজনৈতিক প্রচারের মঞ্চ হিসেবে ; অপরদিকে, সম্ভবত এরই প্রতিক্রিয়ায়, ব্যক্তিমানুষকে উপস্থিত করা হয় দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ অনাদিকালের একটি মানুষ হিসেবে। ফলে দর্শক বিভ্রান্ত। কারণ, শিল্প মাত্রই প্রচার, তবে সব প্রচারই শিল্প নয়—একথা তাঁরা মানেন ; তাই যখন নাট্যমঞ্চে প্রচারটাই একমাত্র সত্য হয়ে দেখা দেয়, তাঁরা অন্যদিকে মুখ ফেরান। কিন্তু যেদিকে তাকান সেখানে যখন দেখেন মঞ্চে এমন সব কাহিনী—তথা সমস্যা হাজির করা হচ্ছে, যে-সমস্যা এ-দেশের তো নয়ই, হয়তো কোনো দেশেরই নয় ; এমন সব মানুষ মঞ্চে অবতরণ করছে, যাদের অস্তিত্ব এদেশে কেন, হয়তো কোনো দেশেই নেই—তখন বিভ্রান্ত না-হয়ে তাদের উপায় থাকে না। নাটক যদি সমাজের দর্পণ হয়, সামাজিক সত্যকে উদ্ঘাটিত করাই যদি নাটকের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মানতেই হবে রাজনৈতিক প্রচার অথবা ব্যক্তিমানসের প্রকাশ, কোনোটাতেই সমাজ-সত্যের প্রতিফলন যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হচ্ছে না।

এবং দুই সীমান্ত সরতে সরতে এমন জায়গায় গিয়ে হাজির হচ্ছে যে, সাধারণ বুদ্ধি আর তার নাগাল পাচ্ছে না। ভুলের মাশুলও দিতে হচ্ছে দু-পক্ষকেই। পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বক্তব্যকে মঞ্চে উপস্থিত করার জন্য একপক্ষ সদাব্যস্ত; অপরপক্ষ ভাববাদের কোলঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, ব্যক্তি-মানসের প্রতিষ্ঠা হলো। ফলে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দু-পক্ষই যে ক্রমশ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন, এটা বোধহয় কেউই বুঝতে পারছেন না। কিছুদিন আগেও এমন একটা সময় ছিল যখন অপেশাদার নাট্যকর্ম পেশাদার মঞ্চকে রীতিমতো ভাবিত করেছে, কেমন করে অপেশাদার নাটকের দর্শককুলকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। কিন্তু এখন অবস্থা খানিকটা অন্যরকম। দর্শকের অভাব বর্তমানে অনেক অপেশাদার গোষ্ঠীকেই ক্ষুব্ধ করে তোলে; ওদিকে পেশাদার মঞ্চে রমরমে ভাব। কেন এমন হলো? এর সদুত্তর খুঁজে বের করা দরকার।

'নক্ষত্র'র 'বৃষ্টি বৃষ্টি' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এত কথা বলতে হলো, কারণ 'নক্ষত্র'র নাটক-নির্বাচন আমাকে খুশী করতে পারেনি।

অল্প কথায় নাটকের কাহিনীটি নিম্নরূপ।

একটি পরিবার—বাপ, দুই ছেলে, এক মেয়ে। একজন রিটায়ার্ড প্রতিবেশী। আরও কয়েকটি চরিত্র—দুধউলী, মেয়েটি ভালোবাসত—এমন একজন যুবক। এবং সবশেষে একজন যাদুকর।

গ্রীষ্মের খরতাপে এরা ব্যতিব্যস্ত; বৃষ্টি না-হলে প্রাণে বাঁচা দায়। খবর এলো, যুবক ছুটিতে এখানে আসছে। শুনে মেয়ে অসন্তুষ্ট। যে-ভালোবাসা মিটে গেছে, তাকে কি আবার নতুন করে জাগিয়ে তুলতে আসছে সে? সম্ভব নয়, কারণ একদিন যেমন সে মেয়েটিকে অবহেলায় ত্যাগ করে গিয়েছিল, মেয়েটির মনেও তেমনই আজ আর তার প্রতি এতটুকু ভালোবাসা অবশিষ্ট নেই।

দুই ভাইয়ের দুই ব্যক্তিত্ব, প্রায়শই বিরোধ বাধে। বাপের সঙ্গে মিল নেই বড় ছেলের। বিরোধের কয়েকটি ক্ষেত্র প্রস্তুত। এমন সময় উপস্থিত হয় যাদুকর। সে নাকি মন্ত্রবলে বৃষ্টি এনে দিতে পারে। অনেক মতান্তর, এবং অবশেষে অনেক বিরোধের মীমাংসা। যাদুকরের ঘোষণা—তুমি বৃষ্টি চাইলেই বৃষ্টি হবে। তোমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক মিটে গেছে বলছ; যদি মনে করো—মেটেনি, তাহলেই তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে। বিরোধ কল্পনা

করছ বলেই বিরোধ, অন্যথায় নয়। তুমি বৃষ্টি চাইছ, তাই বৃষ্টি হবে।

যাদুকর বিদায় নেয়, বিরোধ মেটে এবং আকাশ ঝেঁপে সত্যি সত্যি বৃষ্টিও আসে।

তাহলে কি 'মন আগে না বস্তু আগে'—এ-প্রশ্নের আজও মীমাংসা হয়নি? মন এবং বস্তুর সম্পর্ক যে দ্বান্দ্বিক—একথা কি তর্কাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়নি? তাহলে এমন কাহিনীর অবতারণা কেন? আমি ইচ্ছা করলেই একজনকে ভালোবাসতে পারি, ইচ্ছা করলেই আমি সুখী হতে পারি, সবই নির্ভর করছে আমার চাওয়া না-চাওয়ার উপর—এত সহজ মীমাংসায় কাদের লাভ? নিশ্চয়ই ভাতের উপর নুন জোটে না, তাই চার আনা পয়সা মাইনে বাড়ানোর জন্য যাদের তাজা প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়—তাদের নয়? কিংবা স্বাধীনতা-শান্তি-প্রগতি ও মুক্তজীবনের অধিকার অর্জনের জন্য প্রতিমুহূর্তে যারা জীবন দান করে চলেছে—তাদের নয়?

একটু তলিয়ে ভাবতে অনুরোধ করি। একদিকের Extreme চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার প্রয়োজনে আর-এক Extreme-এ পৌঁছে যাওয়া নিশ্চয়ই কোনো কাজের কথা নয়। 'নক্ষত্র' নাটক করতে পারেন, নাটক তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান, নিয়মিত নাটক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে আজ তাঁরা প্রথম শ্রেণীর নাট্য-দলের মর্যাদা অর্জন করেছেন; তাই তাঁদের কাছে অনেক আশা। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো বাঙলার নাট্যকর্ম ক্রমাগত ডাইনে-বাঁয়ে দোল খাচ্ছে। ডান-বাঁ—কোনোটাই ঠিক নয়। অন্য কিছু করার আছে কিনা, ভাবলে সকলেই উপকৃত হব।

প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'নক্ষত্র'র যোগ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। 'বৃষ্টি বৃষ্টি'-তেও তাঁরা সে-যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। মঞ্চ-স্থাপনা, আলোক-সম্পাত, শব্দ ও সঙ্গীতের ব্যবহার, সর্বোপরি দলগত অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে। তবে সকলের অভিনয় নাটকের দাবি মিটিয়েছে, মনে করতে পারছিনা। একদিকে Stylised অভিনয়, অন্যদিকে Realistic অভিনয় (দুই-ই উচ্চস্তরের হওয়া সত্ত্বেও) নাটকের মূল সুর যেন মাঝে মাঝে ব্যাহত করেছে।

শেষ কথা, আধুনিক নাট্যকর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। 'নক্ষত্র'ও এই কর্মে লিপ্ত। আশা করি, তাঁদের উত্তীর্ণ হওয়ার দিন খুব দূরে নয়।

উমানাথ ভট্টাচার্য

সত্তর বছরে নজরুল

এ-বছর ১১ই জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের সত্তর বছর পূর্ণ হলো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে তাঁর জন্ম দিবস পালনও করা হয়েছে। এতে আমরা খুশি হয়েছি। শুনে আনন্দিত হয়েছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কবির সমগ্র রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করবেন। এজন্য সত্বাধিকার আইনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। রবীন্দ্র-শতবর্ষে প্রকাশিতব্য বলে ঘোষিত রবীন্দ্র-রচনাবলী যেমন ক-বছর ধরে আমাদের হাতে এলো, তারিখ দেওয়া রইল ১৯৬১ সালের—আশা করব তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি আঠারো মাসে বছরের দেশে নজরুলের সমগ্র সাহিত্যসম্ভার দেশবাসীর হাতে পৌঁছবে।

এ কথা ঠিক, এ বছর অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি বিভিন্ন শহর-গ্রামে সংস্থা-সংগঠনে নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। বিশেষভাবে যুব-সমাজের উদ্যোগ এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, এ-বছর নজরুলের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে যে নজরুল-উৎসব বাঙলাদেশে হতে পারত, তার একাংশও লক্ষ্য করা যায়নি। এ বিষয়ে বাঙলাদেশের সাহিত্য-ব্যবসায়ী পত্র-পত্রিকাগুলির রচনার দিকে একটু চোখ ফেরালেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এগারোই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দৈনিক পত্রিকাগুলি নমো নমো করে দু-লাইন নজরুলের কবিতা ও অসুস্থ কবির একটি আলোক-চিত্র প্রকাশ করে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। আমরা অবাক হয়েছি দেখে যে, নজরুলের সত্তর বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য পত্রিকার কর্ণধারেরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রীদের সুভাষিতবলী এবং অকিঞ্চিতকর রচনা রুটিন ওয়ার্কের মত ছেপে দায় মুক্ত হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট-পূর্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর উদ্যোগে গৃহীত নজরুলের জীবনের উপরে অতি নিম্নস্তরের একটি তথ্যচিত্র মোবাইল ভ্যান তথা চলচ্চিত্র গৃহ মারফতে এবারও দেখানো হয়েছে। ছবিটিতে অতি অশ্রাব্য কণ্ঠে কবির কিছু কিছু কবিতার কোন কোন অংশের আবৃত্তিও শোনানো হয়েছে। আর ঐ তথ্যচিত্রের সারাৎসার—নজরুলের কাব্যজীবনের শেষদিকের সঙ্গীতগুলিই নাকি তাঁর প্রতিভার যথোপযুক্ত নিদর্শক! প্রমাণ স্বরূপ ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তাঁর লেখা গানও শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রচনা পরিচিতিতে কালৌচিত্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। যে গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য নজরুলকে প্রচুর গান লিখে দিতে

হয়েছে মুনাফার পাহাড় উঠেছে বিদেশী মালিকের ঘরে, তাঁরাও নজরুলের ঋণ শোধ করেছেন অন্তভাবে। নজরুলের মঞ্জুলভাষায় প্রেম-ভাবনার উপরে গীত কয়েকটি গান 'বেস্ট লাভড্ সঙস অব নজরুল' নামে বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু যে গান গেয়ে একদা দেশ-প্রেমিকেরা মৃত্যুঞ্জয় হতে চেয়েছিলেন, ঐ 'বেস্ট লাভড্ সঙস্'-এর মধ্যে তার একটিও নেই। অর্থাৎ নজরুল ছিলেন একদা বিদ্রোহী, অতঃপর ঠাণ্ডা সুস্থির মানুষ। 'অগ্নিবীণা,' 'বিষের বাঁশি' 'সাম্যবাদী' 'সর্বহারা'-র কবি নজরুলকে ভুলে যেতে হবে। ভোলা দরকার। নইলে প্রতিক্রিয়ার স্বস্তি নেই। স্বস্তি নেই মূলধনতন্ত্রের ভাবাদর্শ প্রচারক সংবাদপত্র এবং সেগুলির নির্মন ও নির্মনন সেবাদাসদের।

নজরুলকে অস্বীকার করা যায় না বলে, তাঁর জন্মজয়ন্তী স্মরণ করতে হয় বাজারী পত্রিকাগুলিকেও। কিন্তু ঐ পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকতা বা রচনা-রীতিতে ধূমকেতু-গণবাণী-লাঙল-নবযুগের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নজরুলের ঐতিহ্যের ছিঁটেফোঁটাও কি আছে ?

বেশ কিছুদিন নজরুলের কাব্য, স্বাধীনতার পরবর্তী শিক্ষিত বাঙালি জনমানসের কাছে যেন অচ্ছুৎ হয়ে পড়ে ছিল। আমাদের দেশের 'প্রেস্টিজ' পুস্তকব্যবসায়ী থেকে বিজ্ঞাপন ভারাক্রান্ত দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির পরিচালকদের কাছে কিছু 'আধুনিক' কবির কাব্য প্রকাশ ও প্রচার অনেক বেশি আদরের সামগ্রী ছিল। বাঙলাদেশের আধুনিক সমালোচকদের চোখে নজরুল ইসলাম প্রায় 'পদ্যলেখক'-এর পর্যায়ে নেমে গেছেন। আমাদের যেন মনেও হতো না যে কারো কারো কাছে নজরুলের অস্তিত্বই—তাঁদের নিজেদের কবিতার পক্ষে ঢাক-ঢোল পেটানোর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ। তা-ছাড়া পশ্চিমী, বিশেষভাবে মার্কিনী ধাঁচের কবি-চরিত্র গড়েতোলার জন্য আগ্রহী পত্রপত্রিকা, সাহিত্য-ব্যবসায়ী এবং তাদের পদতললেহনকারীদের প্রয়োজন ছিল 'কমিটেড' কবির বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিকূলতা নির্মাণ। এঁরা ডলারের প্রতি অবশ্যই কমিটেড ছিলেন নিজেরাই, কিন্তু বামপন্থী রাজনীতি বা কমিউনিজম অথবা সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত কণ্ঠস্বরের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। আর, বাঙলা দেশেরও দুর্ভাগ্য, যে-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে বামপন্থার প্রতি জনগণকে আকর্ষণ করতে চাইছিলেন—ভাবাদর্শের জগতে লড়াইয়ের জন্য তাঁরাও খুব একটা যেন মনস্ক ছিলেন না। ছিলেন না বলেই তেমন প্রগতিশীল সংস্কৃতির হাতিয়ার হয়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত কোনও সর্বসাধারণের সাংস্কৃতিক মুখপত্র আজও গড়ে উঠল না। টাকার থলির কাছে বাঙলা সাহিত্যের মাথা বন্দী রাখার চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াইও তীব্র, তিক্ত, সংযুক্ত ঐক্যবদ্ধ হলো না। বরং রাজনীতিক স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকেও

খণ্ড খণ্ড করে দিলো। সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থসমন্বিত উদ্দেশ্যপ্রবণতা কতদূর যেতে পারে তার একটি নিকৃষ্টতম উদাহরণ সাম্প্রতিক কোন এক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য। ঐ বামপন্থী নেতা, বাঙলাদেশের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের জনৈক শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার চরিত্রহননের জন্য ধান ভানতে শিবের গীত-এর মত অন্য এক প্রসঙ্গে ঐ সাংস্কৃতিক নেতার নাম উল্লেখ করে. নির্জলা মিথ্যার প্রচারে তাঁর প্রতি যথেষ্ট কাদা ছুঁড়েছেন। তবু এ পরিপ্রেক্ষিতেও তো বাঙলাদেশে বামপন্থী যুক্তফ্রণ্ট সরকার গড়ে উঠেছে। এই যুক্তফ্রণ্টের জমি তৈরি করেছে বাস্তব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন অপশাসন এবং জনগণের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা। দল ভাঙাভাঙির রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের চিৎকৃত কুৎসা —বরং সে ঐক্য বহুক্ষেত্রে বিঘ্নিতই করে।

সুযোগসন্ধানীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও, আমাদের মনে নজরুলের স্থায়ী আসন রয়ে গেছে। বর্তমান রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতই তাঁকে বিশেষভাবে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এ-পরিবেশে, কোটিপতিদের এসটাব্লিশমেণ্ট, 'বিদ্রোহী' নজরুল নয়, অন্য এক নজরুলকে আমাদের কাছে পরিচিত করিয়ে ভাবের ঘরেও চুরির ব্যবস্থাটি অটুট রাখতে চাইবে! আমাদের এজন্য যথেষ্ট সচেতনতা দরকার। নজরুল যে শ্রমজীবী মানুষের সাথী, অত্যাচারের শত্রু, সংগ্রামের সৈনিক—এ কথাই ভুলিয়ে দিতে চাইবে তারা। ভারতেব বর্তমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতি নজরুলের কাব্যের রসাস্বাদনের অনুকূল, কিন্তু তা ভুলিয়ে দিতে 'সাবভারসন' তো প্রতিবিপ্লবের পক্ষ থেকে আসবেই।

নজরুলের জীবনের মধ্যেই শ্রমজীবী মানুষের কাব্যঅভিব্যক্তির ইঙ্গিত আছে। ১৩০৬ (১৮৯৯) সালে তিনি বর্ধমান জেলার খনি অঞ্চল রাণীগঞ্জের কাছে চুরুলিয়ায় জন্মেছিলেন। মানুষের শ্রম কি-ভাবে দেশী-বিদেশী খনিমালিকের সম্পদ গড়ে তোলে—নজরুলের এ-সব প্রত্যক্ষ দেখা। জীবনের স্পষ্ট অভিজ্ঞতায় চুরুলিয়ার রুক্ষ জমিতে ফসল ফলানো চাষীকেও তিনি জেনেছিলেন। বারো বছর বয়সের মধ্যে মক্তবে পড়ানো, রুটির দোকানে শ্রমিকের কাজ করা এবং লেটোর দলের গান বাঁধা—সব কিছু মিলে দারিদ্র্য, শ্রমজীবী জীবনের অভিজ্ঞতা, লোকসংস্কৃতির গৌরবময় ধারার সঙ্গে সংযোগ, নজরুলকে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গী করে তুলেছিল। আর, মুক্তির নেশায় পাগল, রোমাণ্টিক, বিদ্রোহী নজরুলের ৪৯নং বাঙালি পল্টনে যোগদানও ঐ পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করতে হবে। করাচীর সেনানিবাসে তাঁর কাছে মহাসোভিয়েতে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সাধনার সংগ্রামী অভিব্যক্তির সংবাদ পৌছেছিল। ১৯১৮ সালে করাচীর ছাউনিতে বসে লেখা 'ব্যথার দান' গল্পটিতে 'বিশ বছরের যুবক নজরুল ইসলাম

যে রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিকতা বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়' (মুজফ্‌ফর আহমেদ)। আর সোভিয়েত লালফৌজ-এর সম্পর্কে ঐ কাহিনীতে নজরুলের নায়ক বলছে "এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না। তাই এ দলে এসেছি।" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগে নজরুল ইসলামের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতই বদলে গেল। জন্ম নিল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। লেনিন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের বললেন, মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে পদানত ঔপনিবেশিক দুনিয়ার মানুষের মুক্তি সংগ্রাম একই সূত্রে গ্রথিত। ডাক এলো উপনিবেশগুলির অন্যান্য দেশপ্রেমিক শ্রেণীগুলির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আরও বেশি সাহসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে শ্রমিকদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তার সংগ্রাম একই বৃন্তে ধারণ করতে হবে। নজরুলের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কবিতা, 'শাত-ইল-আরব' পরাধীন জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী ঐক্যকেই স্বাগত জানায়:

ইরাক-বাহিনী। এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ বাহিনী
তোমারও দুঃখে জননী আমার! বলিয়া ফেলিবে তপ্তনীর রক্তক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু-ফোঁটা ভঙ্গবীর!

আর শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে নজরুলের ডাক আসে:

লাল-পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীর সাচ্চা
মরি জালিমের দাঙ্গায়!
মোরা অসি বুকে বরি হাসিমুখে মরি 'জয় স্বাধীনতা' গাই
ওরে—আয়।

কেবল কবিতায় নয়, নজরুলের সাংবাদিকতায় একই স্বাক্ষর মেলে: "আমাদের পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে। বল আমরা পেছাব না।" (নিশান বরদার ধূমকেতু ১৯শ সংখ্যা,)।

এ কথা অবশ্য ঠিক নজরুল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন করার সুযোগ পান নি। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীতো তাঁর সৃষ্টিতে যুগের সারাৎসারের কোন না কোন অংশ বিম্বিত করেনই! শিল্পীর অভিজ্ঞতা ও চৈতন্য এ কাজে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে। নজরুলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাছাড়া মুজফ্‌ফর আহমেদ প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সাহচর্যে নজরুলের অনেক

তাত্ত্বিক উপকার হয়েছিল। ব্যক্তিজীবনের প্রেমের বেদনাও তিনি জাতীয় বেদনায় উন্নীত করেছিলেন ('তুমি এই আগুনের পরশমণি না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না, আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না…')। নজরুলের কাছে স্বাধীনতার অর্থ অনেক ব্যাপক, অখণ্ড। "স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটুলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে।" নজরুল শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাই জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় গণতন্ত্রের কবি হয়ে উঠেছেন। তাই জাতীয় সংহতির প্রশ্ন তাঁর কাছে অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত হয়ে এসেছে। ধর্মান্ধতা, দুর্বোধ্যতাবাদ, বর্ণাশ্রমগত সঙ্কীর্ণতা, পুরুষ নারীর অসম মর্যাদা—সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে প্রতিবাদের বিষয় হয়ে উঠেছে। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' এখনও আমাদের কাছে প্রেরণার সামগ্রী। কিংবা :

> আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান,
> মুসলিম তার নয়ন মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ—
> এক সে আকাশ মায়ের কোলে
> যেন রবি শশী দোলে
> এক রক্ত বুকের তলে
> এক সে নাড়ির টান।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সত্যাগ্রহ, চরকা, সশস্ত্র সংঘাত—সব কিছুই তাঁর কাছে পথ হিসাবে এসেছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

নজরুলও কি পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন? দারিদ্র্যের চাপে? গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের মায়ায়? নাকি জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা বিষয়ে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের দোলায়মান চিত্ত, আন্দোলনে আগ্রহী জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য মুক্তি পিপাসু কবিকে হতাশ করেছিল? এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দরকার। নইলে, ত্রিশের যুগে নজরুলের কবিতায় কেন ক্রমশ মরমিয়াবাদের ছায়া পড়ল? কেন দুর্বোধ্যতাবাদের ছাপ পড়লো তাঁর চরিত্রে—তা না হলে এ সব কিছুর সূত্র পাওয়া যাবে না।

নজরুলের অগ্নিপথ যাত্রায় যথোপযুক্ত উত্তরসূরী দেখা যায় কি? এ প্রশ্নও আমাদের মনে জাগে। নজরুলের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কবিদের

অনেকের মধ্যে এসে পড়েছিল য়ুরোপের ধ্বংসোন্মুখ ও সাম্রাজ্যবাদী মূলধনতন্ত্রের মধ্যে দিশাহারা ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবাদী কাব্যবক্তব্য ও কাব্যাদর্শ। সমাজ থেকে ব্যক্তির তথাকথিত বিচ্ছিন্নতা উত্তীর্ণ হবার জন্ত সমাজকেই সঙ্গী করে সমসমাজে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রামী আধুনিকতা অনেকের কাছেই অন্বিষ্ট হয়ে এল না। বাঙলা কবিতা এখনও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ববাদী চাপ থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। এ প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। তবুও বলা যায়, একমাত্র কমিউনিস্ট ও তাদের সহযাত্রী কবিদের মধ্যেই নজরুলের সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

আমরা জেনে সুখী হয়েছি যে, প্রথম যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীসভা সেচমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে নজরুলকে যে বাসস্থানের জন্য এক টুকরো জমি দিতে চেয়েছিলেন, কংগ্রেস-পি. ডি. এফ কোয়ালিশন ও পরে রাষ্ট্রপতি শাসনের টালবাহানার শেষে তা নজরুলকে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমরা নজরুলের সংগ্রামী কাব্য ও সঙ্গীতে উদ্বোধিত হতে চাই। চাই নজরুলের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন। এ-প্রসঙ্গে নজরুলের সাহিত্য-ভাবনার নানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইঙ্গিতগুলির পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। আমাদের দেশে নজরুল চর্চা আরও বাড়ুক। আমরা তো জানি এখনও দু-বাঙলার মৈত্রীর লক্ষ্যে নজরুলের কবিতাই শ্রেষ্ঠ সেতুবন্ধ। দীর্ঘজীবী হোক নজরুলের কবিতা এবং নজরুলের সংগ্রামী ঐতিহ্য।

তরুণ সান্যাল

পণ্ডিত বিধুভূষণ বসু

প্রবীণ সাহিত্যিক ও দেশভক্ত পণ্ডিত বিধুভূষণ বসু ৯৫তম বর্ষে পদার্পণ করেছেন গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ। এই উপলক্ষে তাঁর বাসগৃহে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তরুণ ও প্রবীণ অনেক সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ডঃ সুকুমার সেন, শ্রীরাধারমন মিত্র, কবি শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, ডঃ মহাদেব সাহা এবং মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে।

পণ্ডিত বিধুভূষণ বসুর নাম আজকালকার তরুণদের অধিকাংশই জানেন না। দীর্ঘকাল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তিনি চোখে দেখেন না, কানেও শোনেন কম। কিন্তু এই দীর্ঘকাল যে তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন—সেইটাই একটা অনন্তসাধারণ ঘটনা। বাঙলাদেশের

সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর মতো এত দীর্ঘ জীবন বোধহয় আর কেউ লাভ করেন নি।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার এক দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারে ১২৮২ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্ম। বাল্যাবধি এক প্রবল দেশভক্তি তাঁকে কর্ম থেকে কর্মান্তরে তাড়না করে বেড়িয়েছে। স্বদেশী যুগে তিনি বাগেরহাট মহকুমা শহরে 'পল্লীচিত্র মেশিন প্রেস' নামে একটা ছাপাখানা স্থাপন করে 'পল্লীচিত্র' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। সেই সুদূর অতীতে যাকে গ্রাম বললেও অত্যুক্তি হবে না, এমন একটা মহকুমা শহর থেকে পত্রিকা প্রকাশ যে কি অসীম সাহসের পরিচয় তা আজকের আমরা হয়তো বুঝতে পারব না। সেই পত্রিকায় তাঁর 'শিকার' নামে একটা গল্পের জন্য তিনি ১৯০০ সালে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আজকাল সেই গল্পটি যদি কেউ পড়েন, অবাক হয়ে যাবেন যে তার জন্য কারও রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাদণ্ড হতে পারে—তাও আবার ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। এ ঘটনা ঘটেছিল তৎকালীন সরকারের তাঁর প্রতি নিদারুণ আক্রোশ ছিল বলেই।

দেশভক্ত বিধুভূষণ বুয়র যুদ্ধের সময় কিছুদিন 'দৈনিক সঞ্জীবনী'র সম্পাদনা করেন। সেই সময়ে তাঁর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের 'কর্মযোগী' ও ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় লিখতেন। 'সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী'তেও তিনি অনেকদিন কাজ করেন।

দেশভক্তিই ছিল বিধুভূষণের সমস্ত সাহিত্যকর্মের মূল প্রেরণা। সে যুগে দেশভক্তি ছিল একটা অপরাধ। দেশভক্তি মানেই ইংরেজ সরকারের বিরোধিতা। এই অপরাধের শাস্তিও তাঁকে কম পেতে হয়নি। তাঁর লেখা 'সতীলক্ষ্মী' নামক উপন্যাস এবং 'রক্তযজ্ঞ' ও 'মীরকাশিম' নামক নাটক এবং 'বঙ্গবাসীর সোনার স্বপন' নামক গানের বই সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এক কালে তাঁর লেখা গান, "ফুলার কি দেখাও ভয়", "বেত মেরে কি মা ভুলাবি, আমরা কি মার সেই ছেলে"—লোকের মুখে মুখে ফিরত।

দেশভক্তি প্রচারকে বিধুভূষণ জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। নিজে একটা স্বদেশী যাত্রার দল গড়ে নিজের লেখা নাটক অভিনয় করেও এককালে তিনি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেকালের প্রসিদ্ধ স্বদেশী যাত্রাভিনেতা চারণ মুকুন্দ দাসের অভিনীত অনেক নাটক বিধুভূষণই লিখে দিয়েছিলেন। নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি মিলে তিনি প্রায় অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর একখানি উপন্যাস হিন্দী ও গুজরাতী ভাষাতেও অনুবাদ হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় নারীত্বের মহিমা এবং স্বদেশানুরাগ—এই-গুলিই ছিল তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য। তিনি নিজেও যেমন সরল

অনাড়ম্বর দরিদ্র জীবন যাপন করে গেছেন, তাঁর গল্প ও উপন্যাসেও সেই তেজোদৃপ্ত দারিদ্র্যের মহিমা প্রচার করেছেন। সেকালে তাঁর কোনো কোনো বইয়ের আট-নটি করে সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। এতেই তাঁর জনপ্রিয়তা প্রমাণ হয়।

পণ্ডিত বিধুভূষণ বসু যে এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন এইটাই একটা অসাধারণ ঘটনা। তিনি যে শুধু দেশভক্তি প্রচার করেছেন তাই নয়—রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলেও গেছেন। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ড হয়।

এই দেশভক্ত বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিককে আমাদের উপযুক্ত সম্মান দেখান উচিত। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর জন্মদিনের সভায় প্রস্তাব করেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'ডক্টরেট' উপাধি প্রদান করা। আমরা এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমরা আশা করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখবেন এবং তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন।

প্রমথ ভৌমিক

জর্জি ডিমিট্রভ স্মরণে

১৯৩৫ সাল। জার্মানীতে হিটলারী নাৎসীরা আর ইতালীতে মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্টরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন। কমিউনিস্ট, সোসাল ডেমোক্রাট ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের অনৈক্যের সুযোগে দেশ বিদেশে ফ্যাসিজমের কালোছায়া নেমে আসছে। ফ্যাসিজমের চরিত্র নিয়ে তখনও বাদবিসংবাদ চলছে—ফ্যাসিজমের বিপদ সম্বন্ধে তখনও গণতান্ত্রিক মহলে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। তখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে বুলগেরিয়ান কমিউনিস্ট, জর্জি ডিমিট্রভ তাঁর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে যে গুরুত্বপূর্ণ দলিল উপস্থাপিত করেছিলেন—ফ্যাসিজম, সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি ও সমাজতন্ত্রের সৈনিকদের তা আজও অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি তাঁর ঐতিহাসিক দলিলে ফ্যাসিবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে ফ্যাসিবাদ হচ্ছে মৃতপ্রায় পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি : "Fascism is the power of finance capital itself. It is the organisation of terrorist vengeance against the working class and the revolutionary section of the peasantry and intelligentia." (p-3)

· ফ্যাসিবাদ যে-কোন ধরণের মুখোস পড়ুক না কেন, যে ভাবেই নিজেকে উপস্থাপিত করুক না কেন, যে কোন ভাবেই তারা ক্ষমতায় আসীন হোক না কেন—ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন :

> "Fascism is a most ferocious attack by capital on the toiling masses ;
> Fascism is unbridled chauvinism and annexationist war
> Fascism is rabid reaction and counter-revolution ;
> Fascism is the most vicious enemy of the working class and of all the toilers". (P-7)

ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাকে প্রতিহত করার কর্মকৌশলও বর্ণনা করেন তাঁর দলিলে। ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতান্ত্রিক দল—মেহনতি মানুষের সংযুক্ত মোর্চার গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানান ডিমিট্রভ। তিনি তাঁর রিপোর্টে দেখান কিভাবে মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট শুধু ফ্যাসিবাদের আক্রমণ থেকে গণতন্ত্র ও শ্রমিকদের বহুদিনের কষ্টার্জিত কল্যাণগুলিকেই রক্ষা করবে তাই নয়, ফ্যাসিবাদের মূল উৎপাটন, শান্তি রক্ষা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়াভিযানে হাতিয়ার হবে।

তিনি তাঁর দলিলে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গঠনের কর্ম কৌশলের বর্ণনা করে ফ্রণ্ট গঠনের পথে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও বামপন্থী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজ যুগ সন্ধিক্ষণ। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিরা তৎপর। জনসংঘ, আর. এস. এসের মত ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি সংগঠিত হচ্ছে। মার্কিন, পশ্চিম জার্মান, বৃটেন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ভারতবর্ষের প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিদেশী স্তম্ভ। কংগ্রেস ভাঙছে এবং ভাঙবে। এমনই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাঙলা ও কেরালার যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কার্যকলাপের উপর সারা পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভারত কোন পথে যাবে. দক্ষিণে বা বামে—এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ডিমিট্রভের যুক্তফ্রণ্ট গঠনের কালজয়ী শিক্ষা এই অবস্থায় ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিকে যুক্তফ্রণ্ট গঠন করে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলার পথে, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা যোগাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই সুখের বিষয় কলকাতার "কালচার পারলিশার্স" ডিমিট্রভের মূল দলিলটি সুলভ মূল্যে প্রকাশ করে গণতান্ত্রিক দল ও মতের জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন।

পঞ্চানন সাহা

সঙ্গীত সংসদ

সমকালীন সমাজের সঙ্গে সঙ্গীতের প্রকৃত যোগাযোগ সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং তার সাংস্কৃতিক গুরুত্বে বিশ্বাসী একটি সংঘ গঠিত হয়েছে 'সঙ্গীত সংসদ' নামে। এঁদেরই ডাকে গত ১৫ই জুন রবিবার, ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানী-মৈত্রী-সমিতির ঘরে, শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস 'পল্লীসঙ্গীতের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করলেন, তিনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সঙ্গীত-সহযোগে উদাহরণ দিয়ে।

প্রথমে শিক্ষিত সহরের মানুষদের মধ্যে পল্লীসঙ্গীতের আগ্রহ বিষয়ে আশ্বস্ত বললেন শ্রীবিশ্বাস তাঁর আলোচনায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, লোকগীতির যা আলোচনা হয়েছে তা মূলত সাহিত্যরসের দিক থেকেই এর সাংস্কৃতিক দিক থেকে নয়। অথচ তা না হলে পল্লীসঙ্গীতের আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।

তাঁর মতে, আঞ্চলিকতাই হচ্ছে লোকসঙ্গীতের প্রাণ। ক্লাসিকে যা ঘরানা, পল্লীগীতিতে তাকে বলা যায় 'বাইরা না' বা আঞ্চলিকতার চিন্ময় চেতনা। আপামর জনগণের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে রয়েছে সুর। ক্লাসিক সঙ্গীতকাররা তার থেকেই গ্রহণ করেছেন রাগরাগিনী। সুরের বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে বলা যায়, বিভিন্ন অঞ্চলে গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন ঠাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। অনেক সময় তাদের মেলোডির ধাঁচ বদলায় কিন্তু ঠাট থেকে বেরিয়ে আসে না। ভাটিয়ালীর গানের বিষয়ে তাঁর মত, এই গানগুলি বহিরঙ্গ জীবনের কাজকর্ম এবং আনন্দ-নিরাশা থেকে জন্ম নেয়। আবার এই ভাটিয়ালীতে যখন ছন্দ আসে তখন তা 'সারি'র রূপ পায়। বহিরঙ্গ জীবন-চেতনার জন্যে ভাটিয়ালী বা সারিতে প্রকৃত গ্রামীন ছবিই থাকে, কোন কোন সময় বেসুরো হয় কিন্তু স্বরগমের সচেতনতা, তাঁর মতে, লোকসঙ্গীতের বিপরীত ধর্ম। কথা প্রসঙ্গে তিনি দেখালেন, কিভাবে ভাটিয়ালীতে সুরের স্পর্শ লেগেছে পরবর্তীকালে। যেমন 'ভূপালী ঘেঁসা' 'আমি কেমনে জানিব গো' এবং 'ভীমপলশ্রী' ঘেঁসা 'ওগো কালারে কই' গান দুটি গাইয়ে শোনালেন, সারি গানের মধ্যে থাকে সমকালীন সমাজের ঘটনা তার সম্পর্কে সুখ দুঃখ, করুণা বা বিদ্রূপ।

এরপর শ্রীবিশ্বাস উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, গোয়ালপাড়া জেলার হাতীধরার গান, আসামের অন্যান্য উপজাতিদের নিজস্ব গানগুলির বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে আলোচনা করলেন। গোয়ালপাড়া জেলার গানগুলি কুচবিহারের আঞ্চলিকতাকেই গ্রহণ করেছে। আসাম উপজাতিদের গানগুলি হচ্ছে হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা এবং ওপর থেকে চাপানো ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ। এদের গানগুলি রক্তের মধ্যেকারই ব্যাপার। সে কারণে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একসঙ্গে নেচে উঠতে বাধ্য। আবার উত্তর আসামের গানগুলিতে ছোটখাট সাংসারিক ঘটনা, যেমন স্ত্রী স্বামীকে চা বাগানের চাকরি নিতে বারণ করছেন (চা-বাগিচার চা-চাকরি/তেজপুরিয়া ঢং) অথবা একসময় যে আফিং আসামের সর্বনাশ করেছিল সে বিষয়ে গান—কোন আফিংখোরকে কেউ যেন বিয়ে না করে (ও সেনাই মনয়া···) ইত্যাদি। লোকসঙ্গীতে দেশাত্মবোধ এসেছে অনেক পরে। শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস বলছিলেন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কৃতিত্ব এর জন্যে রয়েছে অনেকখানি।

যে আঞ্চলিকতা পল্লীসঙ্গীতের চরিত্রকে বহন করে সেই আঞ্চলিকতা বর্তমানে ইচ্ছাকৃতভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে। সুর পালটিয়ে তো বটেই, এমন কি কথাও বদলানো হচ্ছে জনরুচির দোহাই দিয়ে। অথচ এই গানগুলিই বিদেশে বাঙলা লোকগীতি বলে চালানো হচ্ছে। গানে এই সব নাগর 'বাণী' গুলি চোলাই করে যুক্তি দেখানো হয় যে গ্রামীন পটভূমি পালটাচ্ছে, সেখানে আধুনিক উপকরণ ঢুকেছে। ফলে গ্রাম তার স্বভাবধর্ম বদলায়, সে কারণে তার আঞ্চলিক লোকগীতিও বদলায়। কিন্তু শ্রীবিশ্বাস বললেন, ভাবসম্পদের পরিবর্তনেও সুর সেই পরিমাণে পালটায় না। যেমন চীন বা রাশিয়ায় সামাজিক পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও লোকসঙ্গীত তার নিজস্ব রূপেই বন্যার মত এগিয়ে চলেছে। আর তাছাড়া, আঞ্চলিক 'কথা' পালটে 'কলকাতাইয়া' করায় ব্যবসায়িক ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে? শিক্ষিতজনের এ বিষয়ে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন আছে। তিনি এ প্রসঙ্গে দুঃখ করলেন। সংগ্রাম করে তাঁরাই পল্লীসঙ্গীতকে আপন মর্যাদায় নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু পুনরায় 'স্বার্থবাজ'দের হাতে পড়ে তা যথারীতি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে।

মোট ত্রিশটি গান তিনি ও তাঁর সম্প্রদায় গেয়ে শুনিয়ে ছিলেন। সবশেষে গাওয়া হয়েছিল শ্রীবিশ্বাসের নিজেরই লেখা প্রিয় গানটি 'আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগা···'।

জিষ্ণু চৌধরী

কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা

তি দেশেই যুগে যুগে এক একজন এমন প্রতিভাধর সংস্কৃতি সাধকের আবির্ভাব ঘটে; যাঁদের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক একটা জাতির ভাবমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতির ভাবমণ্ডলে এ যুগের তেমনি এক ধ্রুবতারা ছিলেন জ্যোতি প্রসাদ—আর, তার পর সেই ধ্রুবতারার জ্যোতিকে যিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিকদিগন্ত আলোকিত করেছিলেন তাঁরই নাম বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। সেদিন ২০শে জুন দুরারোগ্য কর্কট রোগ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছে, কিন্তু রাভার আভা চির অম্লান। যে জনতার সমুদ্রে ডুব দিয়ে রাভা সুন্দরকে দেখতে পেয়েছিলেন, সেই সুন্দরের মধ্যেই তিনি চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

ঢাকা শহরে ১৯০৯ সালে তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন একজন সামরিক অফিসার। সাত বৎসর বয়সে পিতৃহারা হয়ে তিনি ফিরে এলেন তেজপুরে। রাভা ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। তিনি প্রথমে কলিকাতার সেণ্ট পল'স্, ও রিপন কলেজে পড়তেন, পরে কোচবিহারে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে পড়তে সুরু করেন।

১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে যখন ডাক পড়ল, রাভা তখন সক্রিয়-ভাবে যোগ দিলেন সেই আন্দোলনে। কোচবিহারে সে-সময় চলেছিল দেশীয় রাজার শাসন। হাকিন্সন নামে একজন ব্রিটিশ সাহেব আর এন. আর. খাস্তগীর দেওয়ানের সর্বময় কর্তৃত্ব। তখন বিরাজমান কোচবিহারের সর্বত্র রাজ প্রাসাদের সিংহ দরজায় হঠাৎ পোস্টার দেখা গেল :

রাজ্যে আছে দুইটি পাঁঠা
একটি কালো একটি সাদা,
রাজ্যের যদি মঙ্গল চাও
দুইটি পাঁঠাই বলি দাও।……

পোস্টার লেখা ছাড়াও রাভা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহই ঘোষণা করলেন। কোচবিহার ছেড়ে চলে যেতে হল তাঁকে। এখানেই রাভার ছাত্র জীবন শেষ হয়ে গেল আর সুরু হল এক নূতন জীবনের পর্ব। রাভা ছিলেন জীবন-শিল্পী। কালের বুকে প্রায়-বিলীন হয়ে যাওয়া আসামের

দুষ্প্রাপ্য সাংস্কৃতিক উপাদানের খোঁজে তিনি ঘুরে বেড়ালেন গ্রাম-সত্রের দিকে দিকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সাংস্কৃতিক ক্ষুধা তাঁকে প্রাণ চঞ্চল করে রেখেছিল।

রাভা একাধারে ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, সুরকার, নাট্যকার, চিত্র-শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, বাদ্যযন্ত্র বাদক আর তারই সঙ্গে ছিলেন মানবসমাজের মুক্তি আর কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ একজন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক কর্মী। রাভা একাই ছিলেন একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে কলকাতায় রুশ ব্যালে নর্তকী আনা পাভলোভার নৃত্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই সোভিয়েত শিল্পীর কাছ থেকে নৃত্য শিক্ষার আগ্রহ প্রকাশ করায় রাভাকে অবশ্য পাভলোভা সেদিন উত্তরে বলেছিলেন: ভারতীয় শিল্পীকে নৃত্য শেখানোর ধৃষ্টতা তার নেই। ভারতের মঠ-মন্দির, প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে নৃত্যের উপাদান।...এর পরে তিনি আসামের নামঘর, সত্র, মন্দির থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য সাংস্কৃতিক সম্পদ উদ্ধার করে জনসমক্ষে তুলে ধরেন।

১৯৪০ সালে রাভা কাশীতে নৃত্য প্রদর্শন করে শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী উপাধি লাভ করেন। নির্ভেজাল অসমীয়া সুর দিয়ে গাওয়া তাঁর কয়েকটি গানের রেকর্ড সঙ্গীত জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রাভা কলকাতায় থাকার সময়ে চিত্রবিদ্যা শিখেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুর সিং আর হেমেন্দ্র মজুমদারের কাছ থেকে। তাঁর কল্পনা থেকে আঁকা শ্রীশঙ্কর দেবের চিত্রখানি এক মূল্যবান চিত্র সম্পদ। রাভা একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদও ছিলেন। তিনি ছিলেন সেণ্ট পলস কলেজের ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন, কারমাইকেল কলেজের হকি টিমের অধিনায়ক। কলকাতায় একবার ভলিবল খেলে তিনি চ্যাম্পিয়ানও হয়েছিলেন। অবশ্য ছাত্রজীবনের পরে ক্রমশঃ এই ক্রীড়াজগত থেকে তিনি বিদায় নিতে থাকেন। একবার শান্তি নিকেতনে ফুটবল খেলার পর কবিগুরুর "একদা তুমি প্রিয়ে" গান গেয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তারপর রাভার কণ্ঠে ইংরাজি, হিন্দী, উড়িয়া, নেপালী, ভূটীয়া, মণিপুরী, বড়ো, রাভা, মিরি, মিকির, গারো, নাগা, খাসী, আবর প্রভৃতি ষোলটি ভাষায় গান শোনার পর সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

চলচ্চিত্র এবং রঙ্গমঞ্চ জগতের সঙ্গেও রাভার ছিল ঘনিষ্ট যোগসূত্র। অসমীয়া চলচ্চিত্রে তাঁকে উপদেষ্টা, সহ-পরিচালক, নৃত্য-পরিচালক এবং অভিনেতারূপে দেখতে পাওয়া গেছে। রাভা ছিলেন গণ-শিল্পী। সাম্প্রতিক কালে আসামে যে ভ্রাম্যমান থিয়েটার চালু হয়েছে, তার প্রেরণাদাতা, উপদেষ্টা ও অভিনেতারূপে রাভাকে পেয়ে সেই সংস্থাগুলো অনেক সাফল্য অর্জন করেছে, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আসামের প্রগতিশীল লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ (আসাম গণনাট্য সংঘের সভাপতি), শান্তি আন্দোলন এবং কৃষক ও মজদুর আন্দোলনে রাভার অবদান অনস্বীকার্য। সত্যি কথা বলতে কি, আসামের যেকোন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক, অনুষ্ঠানের সঙ্গে রাভা সর্বদাই ছিলেন ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, আসামের কলা-গুরু রূপে রাভা সর্বজনস্বীকৃত।

দেশের মুক্তি আন্দোলন এবং শোষণবিহীন সমাজ গঠনের আন্দোলনে তিনি বহুবার অজ্ঞাতবাস ও কারাবরণ করেন। যৌবনদীপ্ত রাভাকে নিয়ে তাঁর জীবনকালেই তাঁর সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে অনেক কবিতা, কাহিনী। লোকপ্রিয় শিল্পী রাভা যেন রূপকথার নায়ক, কোনো রোমান্টিক কাহিনীর বীর এবং সমাজ জীবনে প্রাণস্রোতের এক দুর্বার প্রবাহ। সরল স্বভাবের রাভা যেন যৌবনের প্রতীক। সর্বদাই তাঁর মুখে যেমন হাসি লেগে থাকত তেমন ছিল তাঁর পৌরুষ ভরা সুগভীর কণ্ঠস্বর। জনতাকে ছেড়ে তিনি একটি মুহূর্তও আলাদা থাকতে পারতেন না।

সেকালের ব্রিটিশ সরকারের পদস্থ কর্মচারীর সন্তান, বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক, শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃতিবান রাভা পরাধীন যুগে কোনো চাকরির মোহ রাখেন নি। সব কিছু আত্মসুখ ত্যাগ করে বেছে নিয়েছিলেন সংগ্রামের পথ। পুলিশ অফিসারের পদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সব কিছু পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা লাভের পরেও রাভা রয়ে গেলেন জনতার সংগ্রামের মধ্যে। সাম্যবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আর. সি. পি. আই. সংগঠনে যোগ দিলেন। সুদীর্ঘ কাল অজ্ঞাতবাসকালে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের তিব্বত, নেপাল, বার্মা সীমান্ত সহ প্রায় ১০ হাজার মাইল পথ পরিক্রমা করেছেন। অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছেন। স্বাধীন ভারতের সরকার তখন তাঁকে ধরে দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তার পর ১৯৪৮-১৯৫২ সালে আবার কারাবরণ। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনীতি ও হঠকারিতার মধ্যদিয়ে ভারতে সমাজতন্ত্র গড়া যাবে না। তাই তিনি যোগ দিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পার্টিরই রক্ত পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরে তিনি জনতার মধ্যে কাজ করে গেছেন। গত নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি পার্টির গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

সংস্কৃতি আর রাজনীতি আজকের যুগে যে বিচ্ছিন্ন নয়, সেটা তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়েছিল। তার বিখ্যাত বই "সোণপাছি"র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন কিভাবে জনতার সাহচর্য তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছিল। সেই মুখবন্ধে তিনি বলেছেন : "আমার অজ্ঞাতবাসের সময় জীবনে এক বিরাট পর্ব সৃষ্টি হয়। বিরাট শক্তি অর্জন করি। সেই শক্তি জনতার সমূহ শক্তি, যে শক্তি স্বয়ং

বিধাতাকেও নড়িয়ে দিতে পারে।…অজ্ঞাতবাসে আমার শিল্পী জীবনে এক অজ্ঞাত অধ্যায় যোগ হয়। এ অভিজ্ঞতা না হলে আমার শিল্পী জীবন অপূর্ণ থেকে যেত। জনতা অফুরন্ত কলাশিল্পের ভাণ্ডার। সেই জনতার স্নেহের অন্তর-সমুদ্রে ডুব দিয়ে আমি শিল্প সরস্বতীকে লাভ করেছি।" ফেরারি জীবন ও কারাজীবনে লেখা কতগুলো নিষ্পেষিত জীবনের কাহিনীর সমষ্টিই হল এই 'সোণপাছি' ছোট গল্প সঙ্কলনটি। তাঁর অনেক লেখা অসমাপ্ত এবং এখনও অপ্রকাশিত। তাঁর "মিসিং কারেং" উপন্যাস, কয়েকশ গীত "মুক্তির দেউল", নৃত্যনাট্য, আসামের বিভিন্ন উপজাতির কৃষ্টির ইতিহাস প্রভৃতি অসমীয়া সাহিত্যে মূল্যবান অবদান।

জীবনের স্থাবর সম্পত্তি বলে তাঁর কিছুই নেই। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী আর তিনটি সন্তান রেখে গেছেন। জনগণের মধ্যেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর সকল সম্পদ। মেহনতি মানুষের মনে, সংস্কৃতি সেবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের হৃদয়ে তিনি সর্বদা আদর্শ পুরুষরূপে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

হেম শর্মা

বাঙলা সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত ডক্টর আবদুল হাই পূর্ব পাকিস্তানে সম্প্রতি একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। এ-সংবাদে আমরা শোকার্ত, বিহ্বল ও মুহ্যমান। আগামী সংখ্যায় বিয়োগপঞ্জীতে ডক্টর হাই-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। ডক্টর হাই মৃত্যুহীন।

প্রখ্যাত নট শ্রীজহর গাঙ্গুলি মহাশয় সম্প্রতি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাঙলাদেশের মঞ্চ, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

সম্পাদক, পরিচয়

সবিনয় নিবেদন,

মাঘ ও ফাল্গুনের 'পরিচয়' পত্রে বাঙলা ভাষায় বুদ্ধিবাদী সুলেখকদের অন্যতম এস. ওয়াজেদ আলী সম্পর্কে শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্যের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তৎসম্পর্কে চৈত্রের পরিচয়ে শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে দেখলাম। ঐ পত্রে দুইটি বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়েছে: এক—'বসন্ত কুমারী' নাটকের পাঠ এবং দুই—লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম।

বসন্ত কুমারী নাটকটি আমি নিজে পড়িনি সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি নিজে কিন্তু কিছু বলতে পারছি না। তবে লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম প্রসঙ্গে বলতে চাই যে পত্র দৃষ্টে মনে হলো পুরা নামটি সুকুমার বাবুর জানা; তিনিও তো পুরা নামটি উল্লেখ করে ঘাটতি পূরণ করতে পারতেন! আসল কথা আমি ওয়াজেদ আলী সাহেবের পুরা নামটি জানতে বড় উৎসুক অথচ সামান্য দু-একস্থানে (যেমন প্রবোধ ঘোষ প্রণীত "বাঙালি" নামক গ্রন্থে) প্রসঙ্গক্রমে তাঁর নাম উল্লেখ করা হলেও যতদূর দেখেছি পুরা নামটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। আলী সাহেব নিজেও বিভিন্ন গ্রন্থে (যেমন গঠনমূলক আলোচনা গ্রন্থ "ভবিষ্যতের বাঙালী"তে) রচয়িতা হিসাবে নিজের সংক্ষিপ্ত নামই ব্যবহার করেছেন। এমনকি তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যসেবীদের রচনাবলীতেও তাঁকে "এস. ওয়াজেদ আলী" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩৪ সনে প্রকাশিত লোকসঙ্গীত সংগ্রহকার স্বনামধন্য মৌলভী মনসুর উদ্দীনের "ধানের মঞ্জরী" নামক গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

"অতি আধুনিক কালের বাঙলা সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে মিঃ এস্. ওয়াজেদ আলীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মুসলমান বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশী নেই; এবং তিনি যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রাণবন্ত যত্ন নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন তাও আমাদের মধ্যে সুদুর্লভ।

এতদিন আমাদের লেখার মধ্যে বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্য বা মতবাদ ফুটে উঠেনি। সম্প্রতি তা আজকালকার সাহিত্যে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী নূতন চিন্তা ও ভাবনার জয়যাত্রা চলেছে। তার পুলক শিহরণ বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিককেও উতলা করে তুলেছে। জরাজীর্ণ পুরাতনকে নির্বিচারে আর কেউ এখন গ্রহণ করতে রাজী নহেন। পুরাতনকে পরীক্ষা করে তবে আসন দিতে প্রস্তুত।

এই নূতন চিন্তাধারার বাহক হিসাবে মিঃ এস. ওয়াজেদ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনাকে একটি বিশিষ্ট নিজস্ব মূর্তি দিতে চেষ্টা করেছেন। এতদিন সাহিত্য নিয়ে লোকে খেয়াল-খুশী মত যাই ইচ্ছা তাই করতেন; কিন্তু তিনি ঐ উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। সত্যই সাহিত্য যদি একটি বিশিষ্ট পথ কেটে না বেরুল তাহলে তার যে ক্ষতির পরিমাণ তা খুব বেশী। উহা প্রকৃত প্রভাব ও শক্তি পরিচালনা করতে পারে না। মিঃ ওয়াজেদ আলীর লেখা বেশ সুন্দর, রীতি হিসাবে তিনি বীরবল পন্থী; এবং চিন্তায় যুক্তিবাদী মতবাদেরই বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।"

বিভাগপূর্ব বঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের যে কয়েকজন ভাবনা চিন্তার এবং কর্মকাণ্ডে যা কিছু মূল্যবান দিয়েছেন আজও পর্যন্ত বিভাগোত্তর এই বঙ্গে এক-প্রকার অস্বীকৃত। আমাদের বাক্‌সর্বস্ব সোচ্চার প্রেমতরঙ্গ আর যাই করুক এই সত্যকে চাপা দিতে পারছে না। আপনারা এই কলঙ্ক মোচনে অগ্রসর হয়েছেন—এজন্য আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ। বস্তুতঃ ওয়াজেদ আলী সাহেবের চিন্তা-ভাবনা যুগের চেয়ে কত অগ্রগামী তা ভেবে আশ্চর্য হই।

আমার বিনীত নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি—২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৬

রুদ্র আচার্য

এ সংখ্যা 'পরিচয়ে' হরফ প্রকাশনীর আব্দুল আজীজ আল-আমান কর্তৃক প্রকাশিত ও আব্দুল কাদের কর্তৃক সম্পাদিত 'নজরুল সাহিত্য সম্ভার' সঙ্কলন গ্রন্থটি থেকে নজরুল ইসলামের 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রকাশকদের এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদক, পরিচয়।

পরিচয়
বর্ষ ৩৮ । সংখ্যা ১২
আষাঢ় । ১৩৭৬

সূচিপত্র

প্রবন্ধ :

কবিতা :

নাটক :

গল্প :

রিপোর্টাজ :

পুস্তক-পরিচয় :

বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ :

চারুকলাপ্রসঙ্গ :

বিবিধ প্রসঙ্গ :

বিয়োগপঞ্জী :

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার । অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদপট : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত

পরিচয়
বর্ষ ৩৮। সংখ্যা ১২
আষাঢ়। ১৩৭৬

বিষ্ণু দে ও তাঁর রচনাবলী

অরুণ সেন

। দে-র ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে এই গ্রন্থপঞ্জি রচনার প্রচেষ্টা। যিনি ৪৩ বছর ধরে অবিরল কাব্যরচনা করে চলেছেন, আজও যাঁর কাব্যব্যক্তিত্ব সমানই সজীব ও সক্রিয়, আমাদের প্রার্থনা, আগামী আরো বহুদিন নিশ্চয়ই তিনি নিত্যনতুন সৃষ্টিতে আমাদের যিনি চরিতার্থ করবেন—তাঁর রচনাপঞ্জি উপস্থিত করার এটা মোটেই সময় নয়। কিন্তু দুটি কারণে এই কাজে হাত দিতে আমি প্রবৃত্ত হয়েছি: প্রথমত, ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ রচনাপঞ্জি তৈরির প্রয়োজন এবং সময় যখন হবে, তখন এই খশড়া প্রচেষ্টাটি কাজে লাগবে আশা করা যায় (অনেক পরে এ কাজটাই দুরূহ হয়ে উঠবে, যেমন কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে হয়েছে)। দ্বিতীয়ত, বিষ্ণু দে-র কাব্যপাঠে যেহেতু তাঁর ধারাবাহিক সমগ্রতা-বিষয়ে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি বলে আমরা মনে করি, তাই তাঁর সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক বিবরণ, অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত হলেও, সব সময়ই চোখের সামনে থাকা প্রয়োজন।

সব কবির ক্ষেত্রেই কবিতার বিচারে, সামান্য একটি কবিতার বিচারেও, তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনের সত্যকে মনে রাখার দরকার হয়। কারো কারো ক্ষেত্রে এই ঐক্য বা সম্পর্ক হয়তো স্পষ্ট বা প্রয়োজনীয় নয়, বস্তুত এক পদক্ষেপের পর তাঁদের আরেক পদক্ষেপ হয়তো স্বেচ্ছাচারীই। কিংবা আর কারো কবিতায় আত্মসন্তুষ্ট অহম্ এত সর্বগ্রাসী যে তা পূর্বাপরহীন হয়ে মন ভোলাতেও পারে। কিন্তু আবার কোনো কোনো কবির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগটা প্রায় অনিবার্য। কারণ তাঁদের কাব্যব্যক্তিত্ব বা কাব্যবৈশিষ্ট্যের মধ্যেই নিহিত আছে এই সমগ্রতার বা প্রবহমানতার বা সংলগ্নতার ধারণা। বা অন্যভাবে বলা যায়, তাঁদের রচনার পর্যায়ক্রমের মধ্যে স্বভাবতই একটা কাঠামো গড়ে ওঠে। অর্থাৎ কবিতা যাঁদের কাছে 'কবির ইতিহাস তার মনের বিকাশের', তাঁদের কাছে ঐ প্রবহমানতার ব্যাপারটা নিছক একটা পদ্ধতি মাত্রই নয়। বিষ্ণু দে-র কবিতা, তাঁরই অনূদিত এলুয়ারের প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়,

অবিচ্ছিন্ন। কবির ক্রমোন্নতি বা বিকাশকে বা তাঁর ঐক্যকে যাঁরা কবিতারই বিচ্ছিন্ন উপভোগ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জ্ঞানে দেখেন, তাঁদের কাছে বিষ্ণু দে-র কবিতার মূল্য অন্য ধরনের।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে বিষ্ণু দে-ও চমৎকৃত হয়ে বারবার লেখেন তাঁর 'আশ্চর্য সূচনা থেকে…ক্রমিক পরিণতির আশ্চর্য দীর্ঘ পর্বপরম্পরা'-র কথা এবং বলেন, 'সেই উপভোগকে চিনতে গেলে বুঝতে গেলে উপভোগে অবশ্যই সুবিধা হয় সেই কবির সব কবিতা, তাঁর সমসাময়িক কবিতা, সাহিত্য…' ইত্যাদি (রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা)। একথা বিষ্ণু দে সম্পর্কেও ঠিক ততখানি সত্যি। কেননা আরেক সময়ে তিনিও তো আমাদের ইতিহাসের মানসে আধুনিকতার আর্কেটাইপ, মৌলিক প্রতিনিধি। হয়তো আরো নানা কারণেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। তিনি যে আজ লেখেন আমরা তো রাবীন্দ্রিক, তারই পেছনে অনেক স্তরের সত্য, আমাদের ঐতিহ্য ও বর্তমানের সংগঠনের অনেক বাস্তব উদ্যত থাকে। কারণ রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে তিনিই পুনরায় বলেন, নিছক অভিজ্ঞতার লিখনই তো সব নয়, 'এর পিছনে থাকছে কবিমানুষটির সমগ্র সত্তা অথবা সমস্ত রকমের অভিজ্ঞতার গোটা পট তাঁর স্মৃতি ও ভবিষ্যৎভাবনায় প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য, থাকছে তাঁর সমস্ত বিশ্বের পশ্চাদ্-ভূমির, সমস্ত তত্ত্বজগতের জলহাওয়া।'

অথচ এই রবীন্দ্রধ্যান নিশ্চয়ই অগ্রগতির বিরোধী নয়। কারণ প্রথম রচনার সময় থেকেই দেখা গেছে কবিতার প্রকরণে ও বিষয়ে তাঁর মতো দূরত্ব বা স্বাতন্ত্র্য আর কারোরই ছিল না, সমসাময়িক বা ঈষৎ অগ্রবর্তী কবিদের প্রায় কারোরই নয়। এই স্বাতন্ত্র্য এবং রবীন্দ্রসামীপ্য, সারাজীবনব্যাপী, সত্তার কোন গরজে ঘটেছে, তা বুঝতে পারলেই একদিক থেকে বিষ্ণু দে-র কবিতার মর্মে পৌঁছুনো যাবে বলে মনে করি। অজস্রতা এবং নিত্যনতুন আবিষ্কার ও বৈচিত্র্য একদিকে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ঐক্য, বিষ্ণু দে-র ভাষায় 'তত্ত্ব-সংগঠন' —অভিজ্ঞতার নতুন নতুন আলোকে বিভিন্ন উপাদানের সংলগ্নতাকে আরো বেশি করে চেনা : এ তো তাঁরও বৈশিষ্ট্য। এটা অনুধাবন করতে পারলে বিষ্ণু দে-র পাণ্ডিত্য, কোনো কবি বা কবিকুলের প্রভাব, তাঁর কবিতার পুনরুক্তিময় অজস্রতা, কবিতার শুদ্ধতা-বিষয়ে কিংবা কবিতা-অকবিতা বিষয়ে ছুৎমার্গী বিচার : এ সমস্তর প্রতি বিচ্ছিন্ন মনোযোগ নিতান্তই অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক লাগবে।

রচনাপঞ্জি

রচনাপঞ্জি তৈরির একটা বৈজ্ঞানিক রীতি আছে। সে-সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সামান্য। বন্ধুবর বিমান সিংহ আমাকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, যদিও তাঁর পরামর্শ সম্পূর্ণতই আমি অনুসরণ করতে পেরেছি, একথা বলা সত্য হবে না।

আমার এই পঞ্জি রচনার মূল উদ্দেশ্য যেহেতু কবির মানসিকতার ইতিহাসের তথ্যকে ধরিয়ে দেওয়া, তাই কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদিকে আলাদাভাবে বর্ণনা না করে কালানুসারে সমস্ত লব্ধ রচনাকে আমি একত্রিত করেছি।

কয়েকটি বিষয়ে আরো বলা দরকার:

১. হয়তো মুদ্রক বা প্রেসের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল, কিন্তু আপাতত তা অনুল্লিখিত রইল।

২. প্রকাশক যখন একই, তখন পরবর্তী উল্লেখের সময়ে তাঁর ঠিকানা ইত্যাদি দেওয়া হয় নি।

৩. বঙ্গাব্দের উল্লেখ আছে। যেখানে উল্লেখ নেই, সেখানে খ্রীষ্টাব্দ বুঝতে হবে।

রচনাপঞ্জির জন্য যে কটি তথ্য আবশ্যক, তা সব দেওয়া হয়ে ওঠে নি। পরন্তু অনেক সময়, বিশেষত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সাল-তারিখও দেওয়া যায় নি। যেখানে দেওয়া হয়েছে, সেখানেও হয়তো ত্রুটি রয়ে গেল। কোনো পাঠক যদি ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেন, তবে সঙ্কলক কৃতজ্ঞ থাকবেন।

১। উর্বশী ও আর্টেমিস:

১৩৪০ বঙ্গাব্দ (১৯৩৩)।

প্রকাশক: বুদ্ধদেব বসু; গ্রন্থকার-মণ্ডলী; ৪৬/১ রমেশ মিত্র রোড, কলকাতা।

উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়কে'।

বোর্ড ও আংশিক কাপড়ে বাঁধাই, মলাটে বইয়ের নাম বা কোনো চিত্র নেই। দাম লেখা নেই। রচনাকালও অনুল্লিখিত। গ্রন্থের সূচনায় টি. এস্. এলিঅটের The Sacred Wood থেকে উদ্ধৃতি আছে।

২য় সংস্করণ: বৈশাখ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬১)।

প্রকাশক: দিলীপকুমার গুপ্ত; সিগনেট প্রেস; ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা ২০।

বোর্ড বাঁধাই, পূর্ণেন্দু পত্রী-অঙ্কিত প্রচ্ছদ, দাম ২·০০ টাকা। কবিতার রচনাকাল উল্লিখিত হয়েছে (১৯২৮ থেকে ১৯৩৩), তবে কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত নয়। সূচনার উদ্ধৃতিও বর্জিত হয়েছে। কবিতার সংখ্যা ২৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৭০। বর্তমান সংস্করণে পাঠের প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে।১

২। চোরাবালি:

প্রকাশকালের উল্লেখ নেই [১৩৪৪ বঙ্গাব্দ২, ১৯৩৭ বা ১৯৩৮]।

প্রকাশক: কুন্দভূষণ ভাদুড়ী; ভারতী ভবন; ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

উৎসর্গ: 'শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ-কে'।

মুখবন্ধ: 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুখবন্ধসহ' (আখ্যাপত্রের উল্লেখ)। 'চোরাবালি' শিরোনামে রচনাটি প্রথমে 'স্বগত' এবং পরে 'কুলায় ও কাল-পুরুষ' গ্রন্থের অঙ্গীভূত।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ১·৭৫ টাকা, রচনাকালের উল্লেখ নেই। প্রচ্ছদ-শিল্পীর নামও গ্রন্থে উল্লিখিত নেই। প্রচ্ছদটি কবিপত্নী প্রণতি দে-কৃত, লেখক জানিয়েছেন।

২য় সংস্করণ: আষাঢ়, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬০)।

প্রকাশক: দিলীপকুমার গুপ্ত। সিগনেট প্রেস।

বোর্ড বাঁধাই, পূর্ণেন্দু পত্রী-অঙ্কিত প্রচ্ছদ, দাম ২·২৫ টাকা। রচনা-কালের (১৯২৬ থেকে ১৯৩৬) উল্লেখ স্বতন্ত্র কবিতা ধ'রে ধ'রেই আছে, কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত নয়। কবিতার সংখ্যা ২১। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৭৮। এই সংস্করণে পাঠের সামান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

৩। পূর্বলেখ:

প্রকাশকালের উল্লেখ নেই [১৯৪১৩]।

প্রকাশক: প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী; ২১০/৫ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। কবিতা ভবন; ২০৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা।

উৎসর্গ: 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্বয়ামি তে মনসা মন ইহেমান্ গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি।/সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপবান্তু

শগ্মাঃ ॥/ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ ।/ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ ॥'

কাগজের মলাট, যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ, দাম ২·৭৫ টাকা। 'কবিতাগুলির অধিকাংশই ১৯৩৫-৪০ সালে সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে লিখিত' (গ্রন্থের নামপত্রের পরপৃষ্ঠায় লিখিত)। রচনাকাল ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১১০। গ্রন্থটিতে দুটি অংশ আছে; মূল গ্রন্থ এবং 'বিদেশী' (সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে উৎসর্গীকৃত)। কবিতার সংখ্যা ২১+১৯। 'বিদেশী''-অংশে এলিঅটের ৪টি, লরেন্সের ৬টি, পল মোরাঁ ও উইলফ্রেড ওএন্-এর ১টি ক'রে, হাইনে-র ৭টি কবিতার অনুবাদ আছে। পরবর্তীকালে 'এলিঅটের কবিতা' এবং 'হে বিদেশী ফুল'-এ এই অনুবাদগুলি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত অবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং 'একুশ বাইশ' কাব্যসংগ্রহে বর্জিত হয়েছে। আমার কপিতে (শ্রীবিমান সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত) হাইনের একটি কবিতার অনুবাদের মুদ্রিত পাঠ ছাড়াও কবির হস্তলিখিত (এবং অমুদ্রিত) আরেকটি পাঠ আছে। 'হে বিদেশী ফুল'-এর ৩য় পাঠটি আবার সম্পূর্ণ পৃথক।

১. তুমি যেন কোনো ফুল, কোমল শুচি ও সুকুমার
চোখ মেলে দেখি আর হৃদয় বিষাদে ভরে।
মনে মনে সাধ রাখি দুই হাত জোর করে'
তোমার মাথায়, বিধাতাকে বারবার
বলি থাকো চির শুচি কোমল ও সুকুমার।

(পূর্বলেখ-তে মুদ্রিত পাঠ)

২. তুমি ফুল, মৃদু শুচি আর সুকুমার।
চোখ মেলে দেখি, মধুর বিষাদে ভরে
হৃদয় আমার, দুই হাতে জোড় করে'
তোমার মাথায়, বিধাতাকে বারবার
বলি, তুমি থাকো অনন্তকাল ধরে'
যেন ফুল, মৃদু শুচি আর সুকুমার　　(অমুদ্রিত পাঠ)

৩. তুমি যেন এক ফুল
নম্র শুচি ও সুন্দর।
আমি চেয়ে থাকি আর
বিষাদে বিধুর অন্তর :

মনে হয় হাত রাখি
তোমার মাথায় কম্প্র,
বিধাতাকে বলি থাকো
সুন্দর শুচি নম্র ॥ ('হে বিদেশী ফুল'-এর পাঠ)

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এ কবিতাটিকে স্মৃতিতে রেখেই কবির পক্ষে 'একাদশী'-র ('আলেখ্য' গ্রন্থে) মতো একটি মৌলিক ও সার্থক কবিতা রচনা করা সম্ভব হয়েছিল।]

এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ আর বের হয়নি—অনুবাদগুলি বাদে পুরো গ্রন্থটিই অপরিবর্তিত অবস্থায় 'একুশ বাইশ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

৪। ২২শে জুন :

প্রকাশকালের উল্লেখ নেই [১৯৪২৫]।

প্রকাশক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ; ২৪৯ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা।

প্রাপ্তিস্থান : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ; ১৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের করকমলে'।

কাগজের মলাট, শাদামাটা প্রচ্ছদ, দাম .২৫ টাকা। রচনাকালের উল্লেখ নেই। কবিতার সংখ্যা ১৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+১০।

কবিতারম্ভের পূর্বে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি আছে :

"I hate all boets and bainters—George II.

The creation of a new proletarian class culture is the fundamental goal of the Proletcult.—Pletnev. Ha! Ha!—Bunk!—Lenin.

The national problem was thereby transformed from a particular and national state problem, into a general and international problem, into a world problem of emancipating the oppressed peoples in the dependent countries and colonies from the yoke of imperialism—Stalin."

এই বইয়ের লভ্যাংশ ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক সঙ্ঘের প্রাপ্য, এই মর্মে উল্লেখ আছে এবং গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

[সভাপতি : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি : যামিনী রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। অর্থাগারিক : অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। সভ্যবৃন্দ : বুদ্ধদেব বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, স্টেলা সেনগুপ্ত, হিরণকুমার সান্যাল, সজনীকান্ত দাস, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, আবদুল কাদির, বিনয় ঘোষ, মহীউদ্দীন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ। সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে]।

একটি কবিতা ('জনযুদ্ধ') বাদে পুরো গ্রন্থটিই পরবর্তী 'সাত ভাই চম্পা'-র অন্তর্ভূ́ক্ত হয়েছে।

Jamini Roy

Indian Society of Oriental Art-প্রকাশিত অ্যালবামের ভূমিকা। জন আরউইন (John Irwin)-এর সঙ্গে।

"By what standards are we to judge Jamini Roy? A genius experimenting in pure form? An Indian Giotto or Cézanne?

Let us, at the outset, be content with the simple claim that Jamini Roy is the only living painter in a country of four hundred million people who has achieved a pure and vital intensity of creative expression. It will be sufficient if, as an introduction to his work, we can set out the circumstances which made this lonely achievement possible, and in a way that will assist the reader who has no direct knowledge of his work to arrive at an independent valuation."

৫। সাত ভাই চম্পা :

প্রকাশকালের উল্লেখ নেই [১৯৪৫৬]।

প্রকাশক : অমল বসু ; ঈগ্‌ল পাবলিশার্স ; ৩০৯ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা।

উৎসর্গ : 'শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য-কে'।

কাগজের মলাট ; যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ ; দাম ১'০০ টাকা। রচনাকালের উল্লেখ নেই [১৯৪১-১৯৪৪৭]।

পরিশিষ্টে কিছু অনুবাদ-কবিতা (ল্যাংস্টন্ হিউজ, সিমোনফ, রিলকে,

আরাগঁ, লোরকা, পল এলুয়ার, বের্টোলড্ ব্রেখট 'অনুসরণে') আছে—পরবর্তীকালে 'হে বিদেশী ফুল'-এর অন্তর্ভূ ত।

· ২য় সংস্করণ বের হয়নি, অধিকাংশ অনুবাদগুলি বাদে গ্রন্থটি 'এখুশ বাইশ'-এর অন্তর্ভূ ত।

৬। সমুদ্রের মৌন ঃ

ফরাসী লেখক ভের্‌কর্‌ (Vercors)-এর 'Le silence de la Mer' (ইংরেজি অনুবাদ ঃ Put out the light) নামক গল্পটির মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। ১ম সংস্করণ ঃ ১৯৪৬।

প্রকাশক ঃ অমল বসু। ঈগ্‌ল পাবলিশার্স।

কাগজের মলাট, দাম ·৭৫ টাকা, নীরদ মজুমদার-অঙ্কিত প্রচ্ছদ (গ্রন্থে উল্লেখ নেই)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২+৪৬।

'ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য' এই শিরোনামায় লেখকের দীর্ঘ ভূমিকা আছে।

"জর্মান্ নাৎসিরা ও তাদের ফরাসী বন্ধুরা যখন ফ্রান্সের বুকে চেপে, তখন সে দমবন্ধ অত্যাচারে ফ্রান্সের জনসাধারণ হার মানে নি, সমুদ্রের মতো মৌন অসহযোগে মুক্তির প্রস্তুতি নির্মাণ করে গেছে। এবং ফরাসী লেখকেরা, শিল্পীরা, সঙ্গীতকারেরা কিভাবে গেস্টাপোর মারণমন্ত্রের মধ্যেই বই লিখেছেন, ছেপেছেন, হাতে হাতে বিলি করেছেন, ছবির প্রদর্শনী করেছেন, সঙ্গীত রচনা ক'রে গোপনে রেকর্ড করেছেন, সে সব কাহিনী উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর আর স্বদেশপ্রেমের ও মানবমর্যাদার অক্ষয় প্রমাণ।···

কিন্তু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এ প্রতিরোধে সর্বদলের একতা। তাই লেৎর্ ফ্রঁাসেস-পত্রিকায় কাথলিক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্রঁাসোয়া মোরিয়াক্ লেখেন; দুআমেলের সঙ্গে কম্যুনিস্ট আরাগঁ, এলুয়ার, ভেরকর্‌ও নিয়মিত লেখক। গোপন প্রকাশক এদিসিওঁ দ মিনুই-তে তাই আরাগঁ-র সঙ্গে হাত মেলান মারিতঁ্যা, বঁদা, কাসু, ভেরকর্, মোরিয়াক। লেৎর্ ফ্রঁাসেসের প্রস্তাবনায় তাই সম্মিলিত ইস্তাহার বেরোয়—মোরিয়াক্, দুআমেল্, আরাগঁ, এলুয়ার, ভিলদ্রাক, গেএনো, মারতঁ্যা দু গার্, বঁদা সকলেরই নামে। অর্ঘ্য দান করেন গেস্টাপো-নিহত সাঁ্যা-পল-রু এবং ম্যাক্স জাকব্-কে। লেৎর্-ফ্রঁাসেস-এর প্রতিষ্ঠাতা জাক্ দেকুরকেও জর্মানরা হত্যা করে।···

দেকুর একটি পত্রিকা স্থাপনে ক্লান্ত হন নি, লা পঁসে লিব্‌র্‌ বা স্বাধীন চিন্তা নামক পত্রটিও তিনি দুটি বন্ধুর সঙ্গে সুরু করেন। সেই বন্ধুটিও জর্মান-গুলিতে মারা যান। কিন্তু এই কেন্দ্র থেকেই লেখক সমিতি গড়ে ওঠে এবং এদিসিওঁ দ মিনুই-র হয় সূত্রপাত।...এই গ্রন্থমালাতেই ভের্কর্ প্রকাশ করলেন তাঁর প্রথম গল্প সমুদ্রের মৌন। বইটি শেষ হয় ১৯৪১-এর অক্টোবরে এবং ছাপা হয় বিয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে। বিয়াল্লিশের শেষদিকে বইটির সমুদ্র-যাত্রা, তারপরে কায়িএর দু সিলস্‌ বা মৌনায়ন গ্রন্থমালার প্রথম প্রকাশ এই সমুদ্রের মৌন। মোরিস্ ক্রওঁ ভূমিকায় লিখেছেন কি করে জেল এড়িয়ে, পুলিশের তোয়াক্কা না রেখে, সৈন্যদলের মুখে তুড়ি দিয়ে, সীমান্ত প্রহরীকে নাজেহাল করে, এইসব মৌনব্রতের পুঁথি আসত।...

এন্‌গ্রেভার হয়ে উঠলেন প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক, পলাতক দেশসেবিকা স্ত্রীও জানতেন না যে সমুদ্রের মৌন তাঁর স্বামীর রচনা। শুনেছি ভেরকরের আসল নাম নাকি ব্রুলে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় বইও তাঁর বিখ্যাত nom de plume, nom de guerre-কলমী নামে যুদ্ধের নামেই বেরিয়েছে। ভেরকরের সাহিত্য তথা প্রতিরোধের মুক্তি আজকে শান্তিতেও অনাহত রয়েছে—আরাগঁর মতো, এলুয়ারের মতো।"   (ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য)

Introducing Nirode Mazumdar :

'Modern Art Publication, Vol. No. 2 : Calcutta Group presents eight monochrome reproductions of Nirode Mazumdar's paintings'-এর ছোট্ট ভূমিকা।

প্রকাশকাল : উল্লেখ নেই [১৯৪৮]।

প্রকাশক : দি বুক এম্পোরিয়ম। ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা।

"Nirode Mazumdar has only recently left the pretty decoration of his student period in the Indian Society of Oriental Art. And considering that, his three Nudes, the Family and the Destitute Orphan are remarkable essays in the apprehension of surfaces and solid forms, I am sure Nirode Mazumdar will cultivate more of the revolutionary patience in the arts as well as in life. What is exciting is that he and his friends have taken their start in a step forward and that they have this formal interest and a renewed understanding of

concrete life together. It is not for nothing that Picasso is a member of the Communist Party of France."

Bengal Painters Testimony :

[প্রকাশকাল ১৯৪৬৯]

গ্রন্থটি আমি দেখি নি।

৭। রুচি ও প্রগতি :

১২টি প্রবন্ধের সঙ্কলন।

১ম প্রকাশ : উল্লেখ নেই [১৯৪৬১০]।

প্রকাশক : অমল বসু। ঈগ্‌ল পাবলিশার্স।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু-কে'।

বোর্ড বাঁধাই ; দাম ১·৭৫ টাকা ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪+১২২। সূচিপত্র নেই।

গ্রন্থারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে Henry James, Pearse and Crocker এবং Rainer Maria Rilke-এর উক্তি আছে।

'The play of one's mind gave one away, at the last, dread fully in action, in the need for action, where simplicity was all...... Henry James...

We are really only just beginning to regard the relationship of a human individual to another individual dispassionately and objectively, and our attempts to such a relationship have no pattern before them. And yet in the passage of time, there are now several things that are ready to help our shy novitiate.

Rainer Maria Rilke."

সূচিপত্র নেই। প্রবন্ধের তালিকা : ১. বাংলা সাহিত্যে প্রগতি ২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩. টি. এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান ৪. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৫. পরিবর্তমান এই বিশ্বে ৬. সোভিয়েট শিল্প সাহিত্য ৭. জনসাধারণের রুচি, ৮. হালকা কবিতা ৯. গদ্যকবিতা ১০. প্রগতিবাদী কবি ১১. বুদ্ধিবাদী উপন্যাস ১২. রিচার্ডসের কল্পনা। এর মধ্যে ৪টি—৬নং, ৭নং ('এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য'-এ গৃহীত), ১০ নং (মণীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা) ও ১২নং ('এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য'-এ গৃহীত)

ছাড়া বাকি ৮টি প্রবন্ধই পরবর্তী 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৯৫২) গ্রন্থের অন্তর্ভূ্ত হয়েছে।

৮। সন্দ্বীপের চর ঃ

প্রকাশকালের উল্লেখ নেই [১৯৪৬$_{১১}$]।

প্রকাশক ঃ চিন্মোহন সেহানবীশ ; দি বুক ম্যান ; ৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা।

উৎসর্গ ঃ 'শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

কাগজের মলাট ; রথীন মৈত্র-অঙ্কিত প্রচ্ছদ ; দাম ২·০০ টাকা।

রচনাকালের উল্লেখ নেই [১৯৪৪—১৯৪৭$_{১২}$]

২য় সংস্করণ বের হয় নি, ৩টি কবিতা ('সাঁওতাল কবিতা', 'ছত্তিশগড়ী গান' ও 'উরাওঁ গান') বাদে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি 'একুশ বাইশ'-এর অন্তর্ভূ্ত।

৯. Caramel Doll :

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষীরের পুতুল' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ—প্রণতি দেবীর সহযোগে।

১ম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৪৬।

প্রকাশক ঃ ফিরোজ কে মিস্ত্রি ; কুতুব, বম্বাই।

বোর্ড বাঁধাই, প্রচ্ছদপট ও ভেতরের অসংখ্য ছবি শীলা অডেন-অঙ্কিত।

এই বইটি এবং 'সমুদ্রের মৌন' ১৯৪৫ সালে রিখিয়াবাসকালীন সময়ে অনূদিত।

অনুবাদকের মন্তব্য আছে।

"That this world can never be adequately translated, at least by them, the translators realise. For example, the assumption of the world of Bengali folk-tales makes for the whole charm of Caramel Doll, and the purple patch of the book appears towards the end where Abanindranath weaves long magical sentences which give new shapes to the nursery rhymes that are universally known in Bengal, but beyond the scope of any translation."

(Translators' note : P. D. and B. D.)

১০। অম্বিষ্ট ঃ

সেপ্টেম্বর, ১৯৫০।

প্রকাশক : নবযুগ আচার্য ; ২৮৮ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ১৯।

কাগজের মলাট, প্রাণকৃষ্ণ পাল-অঙ্কিত প্রচ্ছদ, দাম ২·৫০ টাকা।

কবিতাসংখ্যা ১৫ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+৭০।

রচনাকাল অনুল্লিখিত (১৯৪৭-১৯৪৯১৩)। কিন্তু 'একুশ বাইশ' গ্রন্থে 'জল দাও' কবিতাটির রচনাকাল দেওয়া আছে : ১৯৪৬।

স্বতন্ত্রভাবে পুনর্মুদ্রিত না হলেও 'একুশ বাইশ' গ্রন্থের (১৯৬৫) অন্তর্ভূত।

১১। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঃ

১৮টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। আশ্বিন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ (১৯৫২)।

প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত ; সিগনেট প্রেস।

উৎসর্গ : 'শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ২·০০ টাকা, সত্যজিৎ রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮+১১৮।

পূর্ববর্তী 'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬)-র ৪টি প্রবন্ধ (৬, ৭, ১০ ও ১২ নং) বাদে বাকি প্রবন্ধ (৮টি) এই গ্রন্থের অন্তর্ভূত। অতিরিক্ত প্রবন্ধ : ১. অবনীন্দ্রনাথ, ২. যামিনী রায়, ৩. বাংলা সাহিত্যের ধারা, ৪. বীরবল থেকে পরশুরাম, ৫. রাজায় রাজায়, ৬. আরার্গ, ৭. পিকাসো, ৮. ক্যালকাটা গ্রুপ, ৯. সোভিয়েত শিল্পপ্রদর্শনী, ১০. লোকসঙ্গীত। এর মধ্যে পূর্বগ্রন্থের 'টি. এস. এলিঅটের মহাপ্রস্থান' প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে 'এলিঅট' শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

১২। নাম রেখেছি কোমল গান্ধার ঃ

আশ্বিন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ (১৯৫৩)।

প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত। সিগনেট প্রেস।

উৎসর্গ : 'জন অরউইন, মার্টিন কর্কম্যান, পার্সি ও এপ্রিল মার্শালকে' (২২শে জুন ১৯৫৩)।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩·০০ টাকা, মোট ৪১টি কবিতা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪+১১৮। সত্যজিৎ রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

রচনাকাল অনুল্লিখিত (১৯৪৬-১৯৫৩১৪)।

২য় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ (১৯৬০)।

৩য় সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৭০ (১৯৬৩)। অপরিবর্তিত।

১৩। এলিঅটের কবিতা :

টি. এস. এলিঅটের ১৮টি কবিতার অনুবাদ।

আষাঢ় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ (১৯৫৩)।

প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত। সিগনেট প্রেস।

উৎসর্গ : 'শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ-কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ২·০০ টাকা। সত্যজিৎ রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

ভূমিকা আছে।

২য় সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৬০)।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ২·০০ টাকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪+৫০। কবিতার সংখ্যা ২২।

"এলিঅটের কবিতার দ্বিতীয় সংস্করণে চারটি কবিতার নতুন যোজনা হল, তার মধ্যে একটির মূল হয়তো সকলের পরিচিত নাও হতে পারে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটি এবারে বাদ দিয়েছি, কারণ সেটি লেখা হয়েছিল শ্রীযুক্ত এলিঅটের ষাট জন্মদিনের উপলক্ষ্যে। সম্প্রতি তাঁর সত্তর জন্মদিন পালিত হ'য়ে গেছে। তাছাড়া সেই ভূমিকাটি লেখকের 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' [এবং 'সাহিত্যের দেশ বিদেশ'] নামক প্রবন্ধপুস্তকে সন্নিবিষ্ট"।

(ভূমিকা)

১৪। হে বিদেশী ফুল :

মোট ৫৮ জন কবির ২৫৩টি অনুবাদ-কবিতার সঙ্কলন।

১ম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (১৯৫৬)।

প্রকাশক : তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় ; বাক্ ; ১০ চৌরঙ্গী, কলকাতা ১৩।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫·০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+১৯০।

যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ। প্রাচীন চৈনিক কবিতা বা ইংরেজি ধাঁধাঁর ছড়া ছাড়াও চৈনিক, ইতালী, ফরাসী, ইংরেজি, স্পেনীয়, রুশ, জর্মান এবং মার্কিন-ইংরেজি কবিতা থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদের সংখ্যা-প্রাচুর্যের দিক থেকে নিম্নলিখিত কবিরা উল্লেখযোগ্য : মাও ৎসে তুং ;

বদলেয়র, মালার্মে, র‍্যাবোঁ, আপলিনেয়র, পল এলুআর, লুই আরাগঁ; শেক্সপীঅর, ব্লেক, টমাস হার্ডি, ইএট্স, ডি. এইচ. লরেন্স, পাউণ্ড; লোরকা, পাবলো নেরুদা; গয়টে, রিলকে; হুইটম্যান, এমিলি ডিকিনসন, ফ্রস্ট, ওঅলেস্ ষ্টিভ্নস।

"যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি মূল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাসে বহন করতে। এবং সেই দুরূহ চেষ্টায় আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও যদি কিছু সাফল্য কোন কোন কবিতায় এসে থাকে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি অনেকের সাহায্য, বিশেষ ক'রে আমার পরলোকগত অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বহুভাষাবিদ্ অকৃপণ স্নেহ ও পরিশ্রম। তাঁর নামে এই অনুবাদগ্রন্থ বহু বিলম্বে হ'লেও গ্রথিত করতে পেরে তাঁর সেই প্রবল উৎসাহের অনুরণন আজও বোধ করছি।" (মুখবন্ধ। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬)

১৫। আলেখ্য:

বৈশাখ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (১৯৫৮)।

প্রকাশক: সুপ্রিয় সরকার; এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি.; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ১২।

উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র ও শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবীশ-কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ২·৫০ টাকা, কবিতার সংখ্যা ৪৭, মোট পৃষ্ঠা ৮+৭৪। কবিতা পর পর টানা-ছাপা।

রচনাকালের উল্লেখ নেই (১৯৫২-১৯৫৮১৫)।

১৬। তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ:

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ (১৯৫৮)।

প্রকাশক: তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়; বাক্। ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৯।

উৎসর্গ: 'শ্রীমান চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান কমলকুমার মজুমদারকে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ২·৭৫ টাকা। যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

মোট কবিতা ৫৫।

রচনাকালের উল্লেখ নেই (১৯৫৫-১৯৬০১৬)।

২য় সংস্করণ বের হয়নি—'একুশ বাইশ' গ্রন্থের অন্তর্ভূ'ত।

The Paintings of Rabindranath Tagore :

প্রথমে 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি-তে প্রকাশিত, পরে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে 'Quarterly Booklet'-রূপে প্রকাশিত।

দাম ১'৫০ টাকা।

পরে এই রচনাটিই ঈষৎ পরিবর্তিত হ'য়ে খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে 'Homage to Rabindranath Tagore'-এ প্রকাশিত হয়। এর বাংলা অনুবাদ প্রথমে 'পরিচয়'এ এবং পরে 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' ও 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থদ্বয়ে 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে স্থান পেয়েছে।

১৭। মাও ৎসে তুং। আঠারোটী কবিতা ঃ

মহাচীনের রাষ্ট্রনায়ক মাও ৎসে তুঙের ১৯টি কবিতার অনুবাদ। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই [১৯৫৮$_{১৭}$]।

প্রকাশক ঃ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; ঈস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানি ; ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা ১৩।

উৎসর্গ ঃ 'শ্রীযুক্ত চেন্ হান্ সেং-কে'।

কাগজের মলাট, 'সাইজ ১০×৬½ ইঞ্চি', দাম ২'০০ টাকা, পৃষ্ঠা ৪+২৮। যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

প্রকৃতপক্ষে আঠারোটি এবং পুনশ্চ আরেকটি, মোট ১৯টি কবিতার অনুবাদ। ভূমিকা আছে।

"কমরেড মাও ৎসে তুং-এর এই কবিতাগুলির অনুবাদ প্রচেষ্টার জন্য অধ্যাপক তান্ য়ুন শান্ মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনিই এই চীন-বাংলার মিলিত চেষ্টার প্রস্তাব করেন। শিঃ কান্ বা কবিতা পত্রিকাটি তিনিই আমাদের ব্যবহার করতে দেন, যদিও পত্রিকাটি দুষ্প্রাপ্য। এবং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন।

আমার কর্ণধার অধ্যাপক তান য়ুন শান মহাশয়ের পুত্রের কাছে আমি একান্তভাবে ঋণী। তিনি প্রথাসিদ্ধ চৈনিক কাব্য পড়তে পারেন এবং তাঁর পড়া, আক্ষরিক ব্যাখ্যার সাহায্যেই এ-কাজ সম্ভব হয়েছিল। তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়াই বাহুল্য।" (মুখবন্ধ। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৫৭)

হো চি মিন ঃ

প্রকাশকালের উল্লেখ নেই।

প্রকাশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ যুব সঙ্ঘ; ১০৭ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৫।

কাগজের মলাট, ৪ পৃষ্ঠা, দাম '১০ টাকা।

কবি-অনুবাদকের হস্তাক্ষরে হো চি মিনের 'অপরাজেয় ভিয়েতনামের-এর প্রতি' কবিতাটির অনুবাদ।

১৮। এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য ঃ

১৪টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রকাশকালের উল্লেখ নেই (১৯৫৮১৮)।

প্রকাশক ঃ অম্বিকাপদ বিশ্বাস; ইস্ট এ্যাণ্ড কোম্পানি; ৫২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৯।

উৎসর্গ ঃ 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৪·০০ টাকা, মোট পৃষ্ঠা ১০+১৭২।

পিকাসোর দুটি ছবি, একটি রঙিন এবং একটি শাদাকালো, ২টি স্কেচ এবং যামিনী রায়ের ৭টি স্কেচ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

"এই প্রবন্ধগুলি ১৯৩৮ থেকে প্রায় বিশ বছর ধ'রে নানা পত্রিকায় বেরিয়েছিল; হয়তো আমাদের বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়ার একটা ধারণা হতে পারে, এই ভেবে সহৃদয় পাঠক সমাজে একত্রে উপস্থিত করা হল। শ্রীমান হরপ্রসাদের কাছে এ বিষয়ে আমি কৃতজ্ঞ।" (লেখকের নিবেদন) প্রবন্ধসূচি ঃ ১. এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য, ২. চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, ৩. লোকশিল্প ও বাবুসমাজ, ৪. যামিনী রায় ও শিল্পবিচার, ৫. মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ, ৬. টমাস স্ট্যার্ন্‌স এলিঅট, ৭. প্রমথ চৌধুরী ও আমরা, ৮. আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড, ৯. সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা, ১০. জনসাধারণের রুচি ১১. রিচার্ডসের কল্পনা ১২. ভারতপথিক ইংরেজ কবি ১৩. ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড, ১৪. ডেভিড হর্বার্ট লরেন্‌স।

এর মধ্যে ৯ এবং ১১নং প্রবন্ধ দুটি পূর্বেই 'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬) গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।

Indian and Modern Art :

উইলিঅম আর্চরের ঐ নামে প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা।

'Visvabharati Quarterly Vol 25, No. 1 : Summer 1959' পত্রিকায় প্রকাশিত।

পরে এই রচনাটির বাংলা অনুবাদ 'ভারত ও আধুনিক শিল্পসৃষ্টি' নামে (অনুবাদক : অরুণ সেন) 'সাহিত্যপত্র, শারদীয় ১৩৭৫'-এ প্রকাশিত হয়।

An English poet discovers India :

'Quest' পত্রিকার ২৩নং সংখ্যায় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৫৯) প্রকাশিত।

The problem of art education in India :

'Quest' পত্রিকার ২৫নং সংখ্যায় (এপ্রিল-জুন ১৯৬০) প্রকাশিত।

পরে এই রচনাটি 'ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষার সমস্যা' নামে (অনুবাদক : অরুণ সেন) 'সাহিত্যপত্র, আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৭৫'-এ প্রকাশিত হয়।

Pradosh Dasgupta : an introduction :

ললিতকলা আকাদেমি-প্রকাশিত 'Contemporary Indian Art Series'-এর পকেট-অ্যালবামে প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য-প্রসঙ্গে লিখিত ভূমিকা।

প্রকাশকাল : ১৯৬১।

এই লেখাটির অনুবাদ 'প্রদোষ দাশগুপ্তের ভাস্কর্য' নামে (অনুবাদক : অরুণ সেন) 'সাহিত্যপত্র, চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫'-এ প্রকাশিত হয়।

১৯। সাহিত্যের দেশ বিদেশ :

১১টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ [১৯৬২]।

প্রকাশক : মনোতোষ সরকার ; কথাকলি; এ ১২ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ১২।

উৎসর্গ : 'শ্রীমান জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমান বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়-কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫·০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+১৫০।

যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ। সূচিপত্র নেই।

১১টি প্রবন্ধের মধ্যে ৬টি প্রবন্ধই 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় উক্ত গ্রন্থ থেকে পুনরায় এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রবন্ধ : ১. মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স, ২. আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক, ৩. সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য, ৪. আধুনিক কাব্য ১ (Empson, Barker, Moore ও Day Lewis-এর কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা), ৫. আধুনিক কাব্য ২ (Auden & Garrett, Roberts, Parsons-এর গ্রন্থের সমালোচনা) ।

২০ । স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত :

বৈশাখ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ (মে ১৯৬৩) ।

প্রকাশক : রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ; সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রা. লি. ; ২২ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা ১ ।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়কে/তাই পরালাম রাখী' ।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫·০০ টাকা, কবিতার সংখ্যা ১০২, মোট পৃষ্ঠা ৮+১৫২ । যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ ।

অধিকাংশ কবিতারই রচনার কাল দেওয়া আছে, তবে কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত নয় ।

রচনাকাল : ১৯৫৫-১৯৬১ ।

২য় সং : ১লা বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল, ১৯৬৮) । দাম ৫·০০ টাকা । অপরিবর্তিত ।

২১ । সেই অন্ধকার চাই :

বৈশাখ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৯৬৬) ।

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায় ; ভারবি ; ২৬ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ১২ ।

উৎসর্গ : 'জন-গণক ও পরিকল্পনাবিদ্ শ্রীমান অশোক মিত্রের করকমলে' ।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩·৫০ টাকা, কবিতার সংখ্যা ৫৩, মোট পৃষ্ঠা ৮+৬৪ । পূর্ণেন্দু পত্রী-অঙ্কিত প্রচ্ছদ । রচনাকাল উল্লিখিত আছে এবং কালানুক্রমিক-ভাবে সজ্জিত (১৯৬১-১৯৬৫) ।

২২ । রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা :

মাঘ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ (১৯৬৬) ।

প্রকাশক: জ্যোৎস্না সিংহরায়; লেখক-সমবায়-সমিতি; ৭৩বি শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে রোড, কলকাতা ২৬।

উৎসর্গ: 'শ্রীমান সত্যজিৎ রায়কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৪·০০ টাকা, মোট পৃষ্ঠা ৮+৯৮।

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা-মালা মুখ্যত এই প্রবন্ধের উৎস। তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের কাছে লেখক কৃতজ্ঞ।...শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর মনোযোগী সৌজন্যে আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছেন, তা আবার এখানে সানন্দে স্মরণ করি।"

(মুখবন্ধ)

লেখাটি এর আগে 'সাহিত্যপত্র, শারদীয় ১৩৭২'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

২৩। মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা:

৮টি প্রবন্ধের সঙ্কলন। ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ (৯ মে ১৯৬৭)।

প্রকাশক: চিন্মোহন সেহানবীশ, মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি.।

উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়কে, শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্যকে, শ্রীযুক্ত অসীম রায়কে'।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৯·০০ টাকা, পৃষ্ঠা ১০+২১৬। সত্যজিৎ রায়-কৃত

"এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি নানারকমের এবং বহু বছরের ছাপ বহন করছে একজন বাংলা লেখকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও আলোচনার চেষ্টায়। সেটুকুই লেখকের আত্ম-সমর্থন।" (লেখকের নিবেদন: ১লা মে ১৯৬৭)

'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য' এবং 'সাহিত্যের দেশ বিদেশ' দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ঐ গ্রন্থদুটির বহু প্রবন্ধই এখানে স্থান পেয়েছে: ১৮টি প্রবন্ধের মধ্যে ১২টি। নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে: ১. মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ২. রবীন্দ্রশতবার্ষিকী, ৩. শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের শিল্পকথা, ৪. বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি, ৫. কোণার্কের মৃত্যু, ৬. শেক্সপিঅর ও বাংলা।

পূর্ববঙ্গের বাংলা:

'সাহিত্যপত্র', পৌষ-ফাল্গুন ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

পূর্ববঙ্গের কবিতা ঃ

'সাহিত্যপত্র'। চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

দুটি রচনাই বিষ্ণু দে-র বেতারপাঠের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ।

"পূর্ববঙ্গে যে উদ্যমে ও নিষ্ঠায় বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলছে, তার খবর আমরা কমই পাই। মাঝ মাঝে হয়তো-বা শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের চেষ্টায় বা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর একাগ্র উৎসাহে কিছু কবিতা বা কিছু গল্প, প্রবন্ধ যখন দেখতে পাই তখন খুশি লাগে। অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর দাক্ষিণ্যে সম্প্রতি কিছু বাংলা ভাষার বিষয়ে মূল্যবান সংগ্রহ ও আলোচনা পেয়ে বেশ অভিভূত বোধ করেছি। আবদুল হাই সাহেবের 'ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' নামক পুরোধা বইটির একটা পরিচয় অমলেন্দুবাবু নিজেই দিয়েছেন কম্পাস-এ। দিন কয়েক আগে তাঁরই কপিটি ধার পেয়ে আমার মতো ভাষা ও ধ্বনির তত্ত্বে অনভিজ্ঞ কিন্তু সাহিত্যের কারণে মজ্জায় মজ্জায় আগ্রহান্বিত লোক খুবই উত্তেজিত। যেমন উত্তেজিত শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ শাহেবের নেতৃত্বে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান-এর প্রথম অংশ দেখে। অমলেন্দুবাবু ঠিকই বলেছেন: পূর্ববঙ্গের ডায়লেক্‌টের শব্দসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন।" (পূর্ববঙ্গের বাংলা)

২৪। সংবাদ মূলত কাব্য ঃ

শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৯৬৯)।

প্রকাশক ঃ আশীষ মজুমদার ; ৯ কাশী ঘোষ লেন, কলকাতা ৬।

উৎসর্গ ঃ 'শ্যামসুর রাহমান, আবুবকর সিদ্দিক/—পূর্ববঙ্গের সহকর্মীদের উপহার'।

বোর্ড বাঁধাই জ্যাকেটসহ, দাম ৪·০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+১০২। মোট কবিতার সংখ্যা ঃ ৮৯।

রচনাকাল উল্লিখিত হয়েছে ১৯৪৭-১৯৬৫। কিন্তু ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত কবিতা মাত্র ৮টি, বাকি কবিতা ১৯৬২-১৯৬৫-এর মধ্যে। 'সংবাদ মূলত কাব্যতে-তে তারিখ-অনুসারে কবিতা ছাপা যে সর্বত্র. হয়নি, সেটা নেহাতই অনবধানতাবশত'। (মুখবন্ধ)

কয়েকটি প্রবন্ধ

Modern Art and the East :

'ইলাসট্রেটেড উইকলি'তে প্রকাশিত।

রচনাটির বাংলা অনুবাদ 'আধুনিক শিল্প ও প্রাচ্য' নামে (অনুবাদক : অরুণ সেন) 'সাহিত্যপত্র', শারদীয় ১৩৭৪-এ প্রকাশিত হয়।

Father and son (a note on Jamini Roy & Amiya) :

'দি স্টেটসম্যান' দৈনিক পত্রিকার সাময়িকীতে প্রকাশিত।

"Amiya, proud as he is to be son of Jamini Roy, would like to be known and judged on his own and by himself and is almost universally known as Patal. And the whole point is that he is the highly talented son of a very great father. Indeed they would form an excellent subject for a fascinating study of Father and son. And this particular study would raise some of the fundamental problems of art and education."

Satyendra Nath Bose : A legend in his life time :

এই পুস্তকাটি ছাপিয়েছেন 'ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিঃ'-এর পক্ষে প্রশান্ত সান্যাল। সঙ্গে সত্য সেন ও সুনীল জানার তোলা ছবি।

এই লেখাটির অনুবাদই পরে 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'য় গৃহীত হয়েছে।

My Calcutta :

প্রেস ক্লাব-প্রকাশিত পুস্তিকার অন্তর্গত রচনা।

"I have always felt that I belong to Calcutta, although I could never claim any Calcutta ancestry like my friend Sudhindranath Datta, whose ancestors came early to Gobindapur or Govindpore, one of the three traditional villages from the ashes of which sprang—or sprawled out the Calcutta our grandfather knew."

The Pioneers of Art in Modern India :

ললিতকলা আকাদেমির 'ললিতকলা কনটেমপোরারি ১' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ।

"Any body familiar with the development of creative art in India for the last half a century will agree that we should be all grateful to the few artists and art enthusiasts in Calcutta, who started the movement which spread all over India and has lately developed into various styles which might have shocked the ancestors themselves."

Drawings and Paintings of Rabindranath Tagore :

'ললিতকলা কনটেম্‌পোরারি ১' পত্রিকায় প্রকাশিত পুস্তক-সমালোচনা।

"Saddened as men of taste and understanding have been by the way the centenary of Rabindranath Tagore was celebrated at various official and semi-official levels, it was a relief when the Lalit Kala Akademi offered us the opportunity to buy this handsome volume of his drawings and paintings.

W. B. Yeats in India : A few centenary thought :

"Tagore thought in that Georgian era, that Yeats, unlike the usual poets writing in English, derived his power because he was a poet of the real world and not merely a literary writer, who is like an Ustad who sings and develops his music, not from his whole being, but from the world of conventional music alone."

সাক্ষাৎকার

Shakespeare with or without tears :

বিষ্ণু দে-র সঙ্গে শেক্সপিঅর-বিষয়ে সাক্ষাৎকার।

'Shakespeare among Indians' (Reprint of a Supplement issued by Oxygen News to mark the Quarter centenary of Shakespeare)-পুস্তিকায় প্রকাশিত।

প্রকাশক : প্রশান্ত সান্যাল।

কাব্য-সংগ্রহ

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ (জুন ১৯৫৫) ।

প্রকাশক : গোপালচন্দ্র রায় ; নাভানা ; ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩ ।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৫·০০ টাকা । যামিনী রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ ।

১৯২৬ থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি রচিত কবিতার সঙ্কলন ।

"আধুনিক বা জীবিত লেখকের কবিতায় পাঠক অনুরক্ত হন নিজগুণেই । তবু পাঠকের উদারতায় ভরসায় কোনো লেখকের পক্ষে নিজের লেখার সংকলনকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা সমীচীন কিনা সেটা ভাববার কথা । কিন্তু এই বই এক গ্রন্থমালার একটি, তাই সেই মালার নামানুসারেই এর নিরুপায় নামকরণ ।

"কোনো লেখকের পক্ষে নিজের রচনাবলীর বিচারে নিরপেক্ষ হওয়া শক্ত, বর্তমানের ভাবনা-চিন্তায় আগের লেখার সার্থকতা নিজের কাছেও বদলায় ; এবং এটা ঘটে নিজের অতীত লেখার বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে মমতা বা সন্তোষ না থাকলেও ।

"তা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ কবিতা কি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নই, বিশেষত নিজের লেখার ব্যাপারে । তবে নাভানা-র শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায়, যাঁর উৎসাহে এ-বই বেরোল, এ-ক্ষেত্রেও আমায় সাহায্য করেছেন ।"

(মুখবন্ধ । ১২.৫.৫৫)

২য় সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ (জুলাই ১৯৬২) ।

এই সংস্করণের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঃ দাম ৫·০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০ + ১৬৫ । কবিতার সংখ্যা ঃ ৮৬ । এই সংস্করণেও পৃথক 'মুখবন্ধ' আছে (১৭.৬.৬২ তারিখে লিখিত) ।

৩য় সংস্করণ ঃ কার্তিক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ (নভেম্বর ১৯৬৮) ।

লক্ষণীয় পরিবর্তন ঃ দাম ৬·০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ + ১৮৪ ।

কবিতার সখ্যা ১০৩ । পৃথক মুখবন্ধ আছে (৮.৮.৬৮ তারিখে লিখিত) । ২য় সংস্করণ পর্যন্ত যে অনুবাদের সঙ্কলনও ছিল, ৩য় সংস্করণে সেই 'অনুবাদের নমুনাগুলি বাদ দেওয়া হল' ।

একুশ বাইশ :

বৈশাখ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ (১৯৬৫)।

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার ; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি.।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৮·০০ টাকা, পৃষ্ঠা ১০+৩০০। মোট কবিতা ১৫৭।

"শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের দীর্ঘ পরিচিত সাহিত্য-সৌহার্দ্যের জন্যই এই পাঁচটি কবিতার বই একত্রে পুনর্প্রকাশিত হল—প্রায় একুশ বছরের লেখা।" (মুখবন্ধ। ১লা মে ১৯৬৫)।

এই পাঁচটি বই হচ্ছে : ১. পূর্বলেখ, ২. সাত ভাই চম্পা, ৩. সন্দ্বীপের চর, ৪. অন্বিষ্ট, ৫. তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ। কাব্যসংগ্রহকালে কিছু কিছু পরিবর্জনও করা হয়েছে—যথা, 'পূর্বলেখ' বা 'সাত ভাই চম্পা'র অনুবাদ কবিতাগুলি এবং 'সন্দ্বীপের চর'-এর 'সাঁওতাল কবিতা', 'ছত্তিশগড়ী গান' ও 'উরাওঁ গান' এখানে নেই। অনুবাদগুলি 'হে বিদেশী ফুল'-এ এবং অন্য কবিতাগুলি 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় স্থান পেয়েছে।

রুশতী পঞ্চাশতী :

নভেম্বর ১৯৬৭।

প্রকাশক : তরুণ সেনগুপ্ত ; মনীষা গ্রন্থালয় প্রা. লি.।

বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩·০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২+৮৪।

কবিতার সংখ্যা ৫০। সুবোধ দাশগুপ্ত-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

"মনীষা যে এই পঞ্চাশটি ভালো-মন্দ কবিতা সোভিএট বিপ্লবের পঞ্চাশৎ-বার্ষিক উৎসবে প্রকাশ করছেন, তার জন্য আনন্দিত বোধ করছি : তাঁদের সঙ্গে আমিও এই মহোৎসবে সাধ্যমতো যোগদানের সুযোগ পেলুম—প্রত্যেকের কাছ থেকে তার যা সাধ্যে কুলোয়"। (মুখবন্ধ)

কবির দীর্ঘ কাব্যসংগ্রহ থেকে সময়োপযোগী কবিতার সঙ্কলন এই গ্রন্থ—প্রয়োজনবোধে কোনো কোনো কবিতা, যেমন 'জল দাও', আংশিকভাবে উদ্ধৃত কিংবা কোনো কোনো কবিতার শিরোনাম পরিবর্তিত, যেমন 'সন্দ্বীপের চর'-এর 'মৌভোগ' এখানে 'লাল নিশান'।

সম্পাদনা

একালের কবিতা

মাঘ ১৩৬৯ (জানুয়ারি ১৯৬৩)।

প্রকাশক : রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্বোধি পাবলিকেশনস্ প্রা. লি.।

বোর্ড বাঁধাই। দাম শোভন সং ৮'০০ টাকা, সুলভ সং ৬'৫০ টা.।

সত্যজিৎ রায়-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

দীর্ঘ ভূমিকা আছে।

---

১ এই পাঠ-পরিবর্তনের বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার যোগ্য।

২ ২য় সংস্করণের বিবৃতি।

৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৭, ১৮ 'সাহিত্যের দেশ বিদেশ'-এ প্রদত্ত তালিকা অনুসারে।

৪, ৭, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ 'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় প্রদত্ত উল্লেখ অনুসারে।

উনসত্তরের পরিপ্রেক্ষিত

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহস্পতিবার, ৩১ অক্টোবর ১৯৬৮

দমদম বিমান বন্দর উৎসবের আঙিনা হয়ে উঠল। হাজার হাজার মানুষ—অধিকাংশই ছাত্র। আর ইতস্তত রক্তপতাকা। এবং সেই মুখগুলি—যেন কি-একটা পেয়েছে, কি-একটা চাইছে!

ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কন্সাল জেনারেল মিস্টার ম্যুয়েন হোয়া এবং ভাইস কন্সাল ডঃ নিয়েন দিল্লী থেকে কলকাতা পৌঁছেচেন। বে-সরকারী সফর বলেই হয়তো রাজপুরুষরা কেউ অভ্যর্থনা জানাতে আসেননি। ভিয়েতনামের প্রতিনিধি বলেই হয়তো এয়ারোড্রোমের ভি-আই-পি লাউঞ্জে যাঁদের প্রায়ই দৌড়োদৌড়ি করতে দেখা যায়, তাঁদের কারোর পাত্তা মেলেনি। কিন্তু কলকাতা শহর সেই মৃত্যুঞ্জয় দেশের প্রতিনিধিদের বীরের সম্বর্ধনা জানাল। বৃহৎ সংবাদপত্রও স্বীকার করল—স্মরণকালের মধ্যে কোনো বিদেশী অতিথির ভাগ্যে এমন অভ্যর্থনা জোটেনি।

ডঃ নিয়েন গত বছর কলকাতায় এসেছিলেন, দিন সাতেক ছিলেন। বাঙলাদেশের মানুষ ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রক্ত দিয়েছিল। নিয়েন সেই প্লাজমা গ্রহণ করতে এসেছিলেন। মার্কিন ঘাতকদের বিরুদ্ধে সে ছিল আমাদের প্রতিবাদ।' সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী জয়ের পক্ষে সে ছিল আমাদের সমর্থন। সে ছিল ভিয়েতনামের জন্য আমাদের গৌরব, ভালোবাসা।

প্রতীক হিসেবে সেই রক্ত গ্রহণ করে নিয়েন বলেছিলেন—"ভারতবর্ষ আর ভিয়েতনামের মধ্যে এতদিন ছিল আত্মিক সম্পর্ক। আজ থেকে আমরা রক্তের বন্ধনে বাঁধা পড়লাম।"

কিন্তু ম্যুয়েন হোয়ার সঙ্গে পরিচয় হলো এইবার, ঐ ৩১ তারিখেই, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদ আয়োজিত এক ঘরোয়া সভায়। পাতলা ছোটোখাটো মানুষটি। শান্ত চোখ। ফিক করে হেসে ফেলেন। আর এত নরম এত সুরেলা গলায় কথা বলেন যে মনে হবে গান শুনছি। মালা গলায় দাঁড়িয়ে

যখন মাতৃভাষায় বক্তৃতা করছিলেন, তখন আমি তো বুঝতেই পারিনি তিনি ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন। পরে নিয়েনের কাছে জানা গেল হ্যুয়েন হোয়া এক মস্ত বীর। তিনি দিয়েন-বিয়েন-ফুর যুদ্ধে লড়েছেন।

পরদিন পয়লা নভেম্বর, হ্যুয়েন হোয়ার সঙ্গে বেলা আড়াইটেয় আমার ইণ্টারভিউ। পথে থমকে দাঁড়িয়ে 'আকাশবাণী'র খবর শুনলাম—জনসন উত্তর ভিয়েতনামে নিঃশর্তভাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে।

জয়, জয় হয়েছে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের। জয়, জয় হয়েছে দুঃখব্রতী মনুষ্যত্বের। ছোট্ট একটা দেশ গগনচুম্বী স্পর্ধা ও প্রায় অলৌকিক শক্তির দম্ভ চূর্ণ করেছে। পরাধীন আর সদ্যস্বাধীন যে-দেশগুলির লড়াই একা ভিয়েতনাম লড়ছিল—জয় হয়েছে তাদেরও।

ইচ্ছে হচ্ছিল রাস্তায় একটা কিছু করি। চেনা মুখের খোঁজে পাশ ফিরে তাকাতেই দেওয়ালের পোস্টার চোখে পড়ল। "উত্তর ভিয়েতনামের কন্সাল ও ভাইস কন্সালকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য ১লা নভেম্বর বিকেল ৫টায় ময়দান চলো।"

ঐতিহাসিক দিন, ঐতিহাসিক সভা। শহর কলকাতাকে ইতিহাস একটি দুর্লভ মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। বুঝলাম পূর্ব-নির্ধারিত ঐ সভাই হবে আমাদের বিজয়-উৎসব।

কিন্তু হ্যুয়েন হোয়া এবং ডক্টর নিয়েন একেবারেই নির্বিকার। যেন জানতেন—এ তো হবেই, তাছাড়া দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! অথচ মুখে সেই হাসি, সেই নরম স্বরে কথা। মাথা হেঁট করে নিয়েন অনর্গল ইংরিজি তর্জমা করে যাচ্ছেন, আর মাতৃভাষায় তাঁর কন্সালকে আমাদের বক্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সরাসরি কথা বলার দরকার না হলে কারো মুখের দিকেই তাকাচ্ছেন না।

ঠিক তিনটের সময় হ্যুয়েন হোয়া উঠে গেলেন। দিল্লীর কন্সালভবন থেকে কিছু জরুরি বার্তা এসেছে। সাক্ষাৎকার আগেই নির্ধারিত ছিল, তাই সেগুলি পড়ে দেখতে পারেননি। অথচ, ভিয়েতনামের জাতীয় জীবনে আজ একটা বিশেষ দিন, অন্তত কূটনৈতিক তৎপরতার দিক থেকে তো বটেই। তবু, আগেই সময় দেওয়া থাকায়, সেই বার্তা পাঠ না-করে সমস্ত উদ্বেগ চেপে রেখে শান্ত মৃদু স্বরে সাধারণ সাংবাদিকের সঙ্গে এতক্ষণ গল্পগাছা করে যাওয়া বড় সামান্য কথা নয়!

ঠিক চারটের সময় দুজনকে 'কালান্তর' আপিশে নিয়ে চললাম। ষ্যুয়েন হোয়ার পরনে সাদা সুতির পুরো হাত জামা। ডঃ নিয়েন পরেছেন হালকা নীল রঙের টেরিলিন বুশ শার্ট। নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে অনুরোধ করায় ষ্যুয়েন হোয়া হাত জোড় করে বলেছিলেন—"আমাদের প্রেসিডেণ্ট তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেন না, আমি তো সামান্য ব্যক্তি। আপনি ভিয়েতনাম সম্পর্কে প্রশ্ন করুন।" অথচ গত বছর এক একান্ত সাক্ষাৎকারের সময় বলব না বলব না করেও আমার প্রশ্নের উত্তরে ডঃ নিয়েন নিজের সম্পর্কে দু-চার কথা বলে ফেলেছিলেন। ষ্যুয়েন হোয়ার মুখে কৃষকের আদল। নিয়েন চেহারায় বুদ্ধিজীবী। তাছাড়া, বয়েসেও তফাৎ আছে!

গাড়িতে পাশে বসে দেখলাম ডঃ নিয়েন তাঁর কন্সালের ট্রাউজার আর কোট হাত দিয়ে ঝেড়ে দিচ্ছেন। যেন ছোটো ভাই তার ভোলানাথ দাদাকে সময়োপযোগী করে নিচ্ছে। কিন্তু তার পরের ঘটনায়ই নিয়েনের কৃষক চেহারাটাও বেরিয়ে পড়ল। গরম লাগছিল। ট্রাউজার দুটো টেনে হাঁটুর কাছে তুললেন। ঘষঘষ করে পা চুলকোলেন। মনে পড়ল—এই যুবকও সেদিন পর্যন্ত ট্রেঞ্চে লড়েছে, সাহিত্যে ডাক্তার হয়েছে, এখন ভারতবর্ষের মতো দেশে আছে ভাইস কন্সাল হয়ে।

'কালান্তর' আপিশে সবাই অপেক্ষা করছিলেন, পত্রিকা ও প্রেসের প্রত্যেকে। সন্ধ্যের সভায় অনেকেই যেতে পারবেন না। কালও পারেননি। তখন তাঁদের খবর লিখতে হয়। শীষের হরফে হাত কালো করে খবর গাঁথতে হয়। সকলে অপেক্ষা করছিলেন। সম্পাদক শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্ত কিছুটা অভিভূত ভঙ্গিতে দুজনকে মালা পরিয়ে দিলেন। আবার সেই গানের সুরে নরম গলায় বক্তৃতা। সেই ঘাড় হেঁট করে বাধ্য ছাত্রের মতো ইংরিজি তর্জমা।

তারপর ডাক্তারদের একটি সভা হয়ে ময়দান। কলকাতার সমস্ত রাস্তা সেদিন ময়দানে এসে মিশেছে। চতুর্দিকে শুধু মানুষ আর রক্তপতাকা। একধারে আলোকচিত্রে ভিয়েতনামের একটি অসাধারণ প্রদর্শনী।

আর মাটিতে কাগজ বিছিয়ে বইয়ের অনেকগুলো দোকান। নতুন করে মনে পড়ল ভিয়েতনামী সাহিত্যের বাঙলা ভাষান্তর হয়নি বললেই চলে। আর কলসীর চা এবং শস্তা অথচ মুখরোচক খাদ্যের পশরা। বেশ একটা মেলা মেলা ভাব। পায়ে পায়ে চেনা মুখ। দু-পা এগোলেই হারিয়ে যাওয়া মানুষ।

ক্লাচে ভর দিয়ে সেই তিনি অনেকদিন বাদে মনুমেণ্টের জমায়েতে এসেছেন। বাচ্চার হাত ধরে অনেকে এসেছেন সপরিবারে। শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-অধ্যাপক-শ্রমিক-কর্মচারি-যুবক-ছাত্র-নেতা-কর্মী-সাংবাদিক - ফোটোগ্রাফার—সকলের মুখ জলছে। ঐতিহাসিক দিন, ঐতিহাসিক মুহূর্ত। জনসন বোমা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। পুতুল সরকার এবার প্যারিস বৈঠকে জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের প্রতিনিধিত্ব মানতেও বাধ্য হবে। চাকরের আবার এত মান! অর্থাৎ ভিয়েতনামের যুদ্ধ শেষ হওয়ার দিকে। আমেরিকার তাহলে সরাসরি থাবা বসাবার মতো নতুন দেশ চাই। তাহলে এ্যাজেণ্ডায় কি এবার ভারতবর্ষ? কুরুক্ষেত্রের সূচনা? তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।

আর পতাকা উড়ছে। হাজার হাজার মানুষের মাথা ছুঁয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো ডায়াসের নিশানটিতে যেন লাল আগুন জালিয়ে দিয়েছে। সেই পতাকার তলায় ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দুই প্রতিনিধিকে দাঁড়াতে দেখে সমুদ্রে জোয়ার এলো।

আর ,সভা শুরু হলো। সভাপতিত্ব করছেন সেই ব্যক্তি—মাত্র কিছুদিন আগেও যিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন; সেই ব্যক্তি—যিনি ছিলেন বাঙলাদেশের বহু দুঃখে পাওয়া প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী; সেই ব্যক্তি—যিনি নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী থেকেও কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভিয়েতনামের পক্ষে দাঁড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার জানাবার সাহস অর্জন করেছেন!

বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি নিখিল ভারত শান্তি সংসদ-এর পক্ষে এই ঐতিহাসিক সমাবেশকে অভিনন্দন জানালেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, ভিয়েতনামের যুদ্ধ ও বিশ্ব-শান্তি-আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্কটি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—জাতীয় ফ্রণ্টই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বিকাশকে নিরাপদ রাখবে, সম্পূর্ণ করবে।

সবশেষে উঠলেন হ্যয়েন হোয়া। সেই পরিবেশ ও অধিকাংশ বক্তার বীররসের বক্তৃতা স্পষ্টতই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দিয়েন-বিয়েন-ফুর বীর যোদ্ধা কিছুটা চড়া গলায়ই তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। তারপর ডকটর নিয়েন সেই বক্তৃতার ইংরিজি অনুবাদ পাঠ করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরেও উত্তেজনার ছোঁয়া। তারপর বক্তৃতা বাঙলা করে দিলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার।

সভার শেষে বেশ কিছু মানুষ ডায়াসের দিকে দৌড়ে এলেন। তাঁরা ভিয়েতনামের বীরদের একটু কাছ থেকে দেখতে চান। কী আকুলতা তাঁদের কণ্ঠে। অনেকগুলি কিশোরও ছিল। কী মিনতি তাদের গলায়, কিছুটা যেন দাবিও। শ্রোতাদেরই একজন বলে উঠলেন—"ওরাই তো ভবিষ্যৎ, ওদের সামনে যেতে দিন।"

ডায়াস ঘেঁষে আমরা যেখানে বসেছিলুম, তার চারদিকেই মানুষের দেওয়াল। যেন কী-এক আবেগের ভূমিকম্পে সে-দেয়াল কাঁপছে। অনেকক্ষণ পরে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারলুম। ততক্ষণে রাত্রির আকাশে সূর্য উঠেছে। খবরের কাগজকে পাকিয়ে মশাল করে হাতে হাতে আগুন জ্বলছে।

আর চীৎকার করে এ-ওকে ডাকছে। চীৎকার করে এ-ওকে সাড়া দিচ্ছে। চীৎকার করে কতগুলি ছেলেমেয়ে বলে উঠল—"এই জীবনের অপর নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।"

অস্ফুটে আমি বললাম—স্বপ্নে জাগরণে অবিরাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম

বুধবার, ২০ নভেম্বর ১৯৬৮

দমদম বিমান বন্দর সকাল থেকেই রণসাজে সেজেছে। ভেতরে মাছি গলবার উপায় নেই। এক-আধজন সাংবাদিক যদি বা প্রবেশ করতে পেরেছেন—পকেট থেকে তাঁদের মুহুর্মুহু প্রেসকার্ড বের করে দেখাতে হচ্ছে। ভি-আই-পি লাউঞ্জে রাজ্যপাল স্বয়ং অপেক্ষা করছেন। আর তাঁকে ঘিরে সময়োপযোগী ব্যক্তিগণ।

বিমান বন্দর থেকে বেরুবার প্রত্যেকটা মুখে পুলিশের কর্ডন। ঢাল, লাঠি, বন্দুক, গ্যাস নিয়ে তৈরি হয়ে আছে। ইঙ্গিত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। এপাশে সার বেঁধে প্রিজন ভ্যান, ট্রাক; মাথায় হেডফোন লাগিয়ে ওয়্যারলেসে কথাবার্তা চলছে। কলকাতার নানা জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে।

আর সেই পুলিশ-কর্ডনগুলির কয়েকহাত দূরে ব্যারিকেড। শক্ত হাতে হাত বাঁধা ব্যারিকেড। কাঁধে কাঁধ লাগানো ব্যারিকেড। তারপর যতদূর চোখ যায় মানুষ। সকাল থেকে জড় হতে হতে এখন প্রায় তরঙ্গের রূপ নিয়েছে। ঘন ঘন স্লোগান উঠছে, আর বক্তৃতা, আর গান। বিমানবন্দর

থেকে বেরুবার সব কটি রাস্তা তারা অবরোধ করেছে। বন্দরে এক-একটি বিমান এসে নামে, আর বজ্রধ্বনিকে দীর্ঘশ্বাসে পরিণত করে তাদের গর্জন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

সঙ্কল্পে দৃঢ়, শৃঙ্খলায় অটুট, মর্যাদাবোধে আত্মস্থ সেই জনসমাবেশকে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করতে হয়। আর ক্রোধের সে কী দিব্য অভিব্যক্তি! মুখে মুখে ফিরছে ভ্যান ত্রয়-এর নাম। যুবক ভ্যান ত্রয়। জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের বীর যোদ্ধা। মাত্র কিছুদিন আগে বিয়ে করেছিল। কিন্তু সমুদ্রপারের নররাক্ষসরা এসে তার বাসরগৃহকে রণক্ষেত্র করে তুলল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী, ভিয়েতনামে মার্কিন সমরনীতির মুখ্য প্রবক্তা রবার্ট ম্যাকনামারা তখন দক্ষিণ ভিয়েতনাম সফর করছে। একটা ব্রীজ শুদ্ধু তাকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে ভ্যান ত্রয় ধরা পড়লেন।

তারপর বিচারের সে-এক প্রহসন! সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার প্যারাগুয়ের গেরিলারা ভ্যান ত্রয়-এর মুক্তির শর্তে একজন মার্কিন যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দিলেন। সমস্ত পৃথিবীর চোখ তখন এই যুবকটির দিকে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পিশাচরা ভ্যান ত্রয়কে ফায়ারিং স্কোয়াড-এর সামনে দাঁড় করালে। বধ্যভূমিতে কয়েকজন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ভ্যান ত্রয় সুযোগটি গ্রহণ করে দস্তুর-মতো প্রেস কনফারেন্স বসিয়ে ঘোষণা করলেন—অপরাধ আমেরিকার, অপরাধী ম্যাকনামারা। ধর্ষিত পিতৃভূমির সম্মান রক্ষা তাঁর কর্তব্য। যুবক মৃত্যুর আগে চোখ বাঁধতে দিলেন না। ভিয়েতনামের দিকে শেষ বারের মতো তাকিয়ে এক ঝাঁক বন্দুকের গুলি বুকে নিয়ে ভিয়েতনামেরই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মুখে মুখে ভ্যান ত্রয়-এর নাম ফিরছে। আর সেই অবিস্মরণীয় স্লোগান—তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। বীর শহীদের অপর নাম—ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম। কে যেন গান গেয়ে উঠল—একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। মুখে মুখে ইতিহাস ফিরছে।

সেই ভিড়ে দুটি তরুণ-তরুণী ছিল—আমি জানি তারা পরস্পরকে ভালো-বাসে। না-জানি আরও কত প্রেমিক-প্রেমিকা ক্লাস ছেড়ে আপিশ ফেলে দমদমে ছুটে গিয়েছিল। যে-কোনো মুহূর্তে গুলি চলতে পারে—এই সম্ভাবনা জেনেও গিয়েছিল। আর, মুখে মুখে ইতিহাস ফিরছিল।

ঠিক তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এ্যামপ্লিফায়ার লাগিয়ে ছাত্র-নেতারা বক্তৃতা করছিলেন। প্রাক্তন যুদ্ধমন্ত্রী কি করে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট

হন—এই ব্যাপারটা বলতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া-ঔপনিবেশিক নীতির সুন্দর ব্যাখ্যা করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিপদ সম্পর্কে তাঁরা শ্রোতাদের হুঁশিয়ার করছিলেন। ফটকে প্রকাণ্ড পোস্টার—উপাচার্যের কাছে ছাত্রদের বিনীত চিঠি, ঘাতকের ভোজসভা যেন তিনি বর্জন করেন। চিঠিতে রবার্ট ম্যাকনামারার অপরাধের বিস্তৃত তালিকা। মাইকের বক্তৃতায়ও উপাচার্যের প্রতি একই প্রার্থনা। শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতি ম্যাকনামারার নামে একটা টাকা মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে লিখেছেন—আগে আমেরিকার ঘেটোগুলি মনুষ্যবাসের উপযোগী করো, তারপর কলকাতার জন্য ভেবো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফুটপাত উপচে মানুষ। তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে সেই বক্তৃতা শুনছে, সেই চিঠি পড়ছে। আর চারদিকে উত্তেজনা। ছাত্ররা কি ঠেকাতে পারবে? আমেরিকার পাপ ও স্পর্ধার প্রতীক এই নররাক্ষস কি সত্যিই রাস্তায় পা ফেলে শহর কলকাতাকে অপমান করবে? নফর রাজ্যপাল ও তার নোকর সরকার কি সত্যিই এই জল্লাদকে এনে রাজভবনে তুলতে পারবে?

আর চারদিকে উত্তেজনা। আজ একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। ভিয়েতনামের ঘাতককে আমরা কলকাতার পথে ফুলবাবুর মতো ঘুরে বেড়াতে দেবো না। আজ যদি যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকত! আমরাই যুক্তফ্রন্ট, আমরাই সরকার। আব কোমর বাঁধো, তৈয়ার হো, হুঁশিয়ার। একবার বিদায় দে মা···। গাহি ইণ্টারন্যাশনাল···।

কথাটা তারপর বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল। হেলিকপ্টারে ম্যাকনামারাকে নিয়ে বীর ধর্মবীরা চোরের মতো রাজভবনের দিকে উড়ে গেছে। এমনকি বিমানবন্দরের লোকেরাও কেউই প্রায় জানতে পারেনি।

তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম—কার মুখ দিয়ে এই স্লোগান প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল? এত সুন্দর এত মহৎ এত অনিবার্য রণধ্বনি স্মরণকালের মধ্যে শোনা যায়নি।

কিন্তু সভায় মিছিলে এ-স্লোগান আমি কোনোদিন উচ্চারণ করিনি। মূল্য না-দিয়ে এত বড় দাবি করার স্পর্ধা আমার হয়নি।

কিন্তু আজ, এই প্রথম, মনে হলো—আমেরিকার পাপ ও স্পর্ধার প্রতীক

রবার্ট ম্যাকনামারাকে শহরে পা ফেলতে না-দিয়ে কলকাতা এই রণধ্বনি উচ্চারণের যোগ্যতা অর্জন করল।

আর, কিছু রক্তের মূল্যও তাকে দিতে হলো। ম্যাকনামারা উড়ে যাবার অনেক অনেক পরে পুলিশ দমদমে হঠাৎ সেই প্রতিরোধী মানুষগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গুরুতর আহত অবস্থায় কেউ হাসপাতালে গেল, কেউ জেলখানায়।

আর কারা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পর পর তিনটে ট্রামে আগুন ধরিয়ে দিলে। সেই আগুনে হকার্স কর্নারের একটা অংশও পুড়ে গেল। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে দৌড়ে এসে ছাত্ররা আগুন নেভাল। বলল—রক্ত বেচে সেই টাকায় তারা হকারদের ক্ষতিপূরণ করবে।

তারপর সন্ধ্যেবেলা সুবোধ মল্লিক স্কোয়্যার থেকে কলকাতার নাগরিকদের বিক্ষোভ মিছিল বেরুল। কলেজ স্ট্রিট অন্ধকার। রাস্তায় দগ্ধ ট্রাম। ইতস্তত পটকা ফাটছে। ট্রাম-বাস বন্ধ। এই অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও হাজার হাজার মানুষ এসে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। সেই এক ধ্বনি—ঘাতক ম্যাকনামারা ফিরে যাও। সেই এক প্রতিজ্ঞা—কলকাতাকে আমরা সাম্রাজ্য-বাদী চক্রান্তের ঘাঁটি হতে দেবো না। সেই এক ঘোষণা—তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম।

মার্কিন তথ্যদপ্তরের সামনে বিক্ষোভের ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরা হাতে মার খেলেন প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত ফটোগ্রাফার। কয়েক মাস আগে গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের অভূতপূর্ব গণজাগরণের ছবি তুলতে তুলতে ঐ পুলিশের লাঠিতেই তিনি আহত হয়েছিলেন। ধর্মবীরার লেঠেল অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রৌঢ় এই শিল্পীকে দু-দুবার পিটিয়ে সেদিনের আন্দোলনের সঙ্গে আজকের বিক্ষোভের মূল ঐক্যসূত্রটিকে একেবারে স্পষ্ট করে দিলে।

শহরের মূর্তি দেখে ম্যাকনামারার সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করা হলো। মধ্যরাতেরও পরে শহর যখন ঘুমিয়েছে, ধর্মবীরকে পাশে বসিয়ে পুলিশ পাহারায় চোরের মতো গোপনে আর অন্ধকারে শহরের পথে ইতস্তত ঘুরে ম্যাকনামারার কলকাতা দর্শনের সাধ মিটল।

বৃহস্পতিবার, ২২ নভেম্বর ১৯৬৮

শহর জ্বলছে। অনেক রুটেই ট্রাম-বাস বন্ধ। লাঠি চলছে, টিয়ার গ্যাস।

ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধ। মনুমেণ্টের তলা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছে। কলেজ স্ট্রিট আজও অন্ধকার।

আর অন্ধকার রাজভবনের চারপাশটা। ঘাতক সেখানে নির্বাচিত অতিথিদের সঙ্গে কফির আসরে বসেছে। আমন্ত্রিত অতিথিরা চোরের মতো লুকিয়ে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছে। আমন্ত্রণকারী নিজেও চোরশ্রেষ্ঠের মতোই সে-বাড়িতে দিন কাটাচ্ছে। কফি-পানের আসর যেন কিছু অপরাধীর গোপন আড্ডায় পরিণত হয়েছে।

ঠিক তখন, সন্ধ্যেবেলা, মহাজাতি সদনে শুরু হলো আলো আর গান আর নাচের উৎসব। দূর দূর থেকে মানুষ এসেছে। বৃদ্ধ-শিশু-নারী-পুরুষ। ট্রাম-বাস ঠিকমতো চলছে না, ট্যাকসি করার পয়সা নেই—প্রায় সকলে হেঁটেই চলে এসেছে। ধর্মবীরের পুলিশ কোথায় কখন কি করে বসবে কেউ জানে না—তবু এসেছে। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে সেখানে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি সম্বর্ধনা জানাবে।

ভিড়, ভিড়, ভিড়। হল উপচে পড়ছে মানুষে। মানুষ—কী আশ্চর্য এই অভিধা!

সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ঘাতক ও শ্রেষ্ঠী রবার্ট ম্যাকনামারা যখন গোপনে পুলিশ পাহারায় কিছু বাছাই করা আমলা পুঁজিপতি আর বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে বাতচিত করছে, তখন নগরের মানুষ দৌড়ে এসেছে মানব সভ্যতার প্রতীক সোভিয়েত-সংস্কৃতিদূতদের কাছে। ওখানে প্রভুর কাছে ভৃত্যের সমাবেশ, এখানে ভাই আর বন্ধুকে ঘিরে মানুষ!

ওই মুখগুলো আমি চিনি। কাল ওরা দমদমের রাজপথ অবরোধ করেছিল। আজ সারাদিন মিছিলে ঘুরেছে, পথসভা করেছে। তারপর রাতে এসেছে মহাজাতি সদনে। সেই যুগলটিও এসেছে।

আর, আলোয় উদ্ভাসিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে রুশদেশের শিল্পী লোকসঙ্গীতের উদাত্ত মধুর সুরে চতুর্দিক প্লাবিত করছে। যেন সেই ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে ওড়না উড়িয়ে নাচের ছন্দে পাদপ্রদীপের সামনে এসে কতগুলি কিরঘিজ মেয়ে হাতছানি দিয়ে দর্শকদের ডাকছে।

ডায়াসের পেছনে রুশ দেশ আর ভারতবর্ষের পতাকা। যেন নাচের মুদ্রায় সেইদিকে আঙুল উঁচিয়ে তারা জীবনের অনিবার্য সত্যটি ঘোষণা করছে।

৭. ১২. ৬৮.

ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঃ সেদিন আর এদিন

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

"আমি মার্কিন দেশে গিয়েছি। হামবুর্গ দেখেছি। লণ্ডনের পথে পথেও ঘুরেছি। ফ্রান্সও বাদ যায়নি। আর ফরাসীরা—চমৎকার মানুষ ওরা। ফ্রান্সে ফরাসীরা আশ্চর্য ভালো। অমায়িক ব্যবহার, উদার মন। ওখানে অনেক ফরাসীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও হয়েছে। কিন্তু ফরাসীরা এখানে, ভিয়েতনামে?"

মুখ লাল হয়ে গেল ন্‌গুয়েন ভা বা-র। চোখদুটো জ্বলে উঠল।

"কুকুর! এখানকার ফরাসীদের আমি ঘেন্না করি, মনেপ্রাণে ঘেন্না করি।"

একজন বিদেশী সাংবাদিক তার ইণ্টারভিউ নিচ্ছিলেন। সে নাবিক। বিশ্বময় ঘুরে বেড়ানোই তার পেশা। সে বুকের ভেতরে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে সারাক্ষণ জলে ভাসে।

সেদিন আর এদিন

ঘৃণার আগুন ভিয়েতনামের প্রতিটি মানুষের বুকে। কোথাও দাউ দাউ করে জ্বলে, কোথাও ধিক ধিক করে। কিন্তু জ্বলে প্রতিটি বুকে। এই আগুনের তাপে শীত আর বর্ষাকে কাবু করে, ক্ষুধা আর মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে ওরা ঘোষণা করতে পারে, আমরা হাজার বছর ধরে লড়ব, কিন্তু স্বাধীন আমরা হবই। ভিয়েতনামের উত্তরাংশে সে-প্রতিজ্ঞা ওরা রেখেছে। সরকারীভাবে ১৯৫৪ সাল থেকে, আসলে ১৯৪৫ সাল থেকেই। সেখানে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত।

সম্প্রতি দক্ষিণেও অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দিন আর রাতের পার্থক্য করে দক্ষিণের প্রায় সর্বত্রই "ভিয়েতকং"-এর শাসন চলছিল অনেকদিন ধরেই। এতোদিনে একটা সুসংহত, দেশব্যাপী কর্তৃত্ব করার মতো সরকার গঠিত হলো। এই প্রথম নয়। এর আগেও একবার সেখানে সত্যিকারের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় পঁচিশ বছর আগে। উত্তরের সঙ্গে তাল রেখে দক্ষিণের মানুষও গড়েছিল স্বাধীন সরকার। কিন্তু

সপ্তাহখানেকের বেশি টিঁকিয়ে রাখা যায়নি। কিন্তু সেদিন আর এদিনে তফাৎ অনেক—পঁচিশ বছরের তফাৎ। একটা ছোট্ট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই তফাৎটুকুর ব্যাপ্তি বুঝতে সাহায্য করবে। সেদিন, ১৯৪৫ সালে, জাপানীদের হাত থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে যে-স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল—তাকে কোনো রাষ্ট্রই ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত স্বীকৃতি জানায়নি। তারপর চীনের বিপ্লব। চীন স্বীকার করে নিল হ্যানয়কে। তারপর একে একে অনেকে। পঁচিশ বছর পরে, উনসত্তর সালের জুনে, দক্ষিণে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হওয়ার খবর এলো। প্রায় একই সঙ্গে এসে পৌঁছল বহু রাষ্ট্রের স্বীকৃতির খবর। তাদের মধ্যে প্রথম হওয়ার সম্মান আলজিরিয়ার। সোভিয়েত, চীন প্রভৃতি দেশ তো আছেই।

সেদিন আর এদিনের মাঝখানে পঁচিশটি বছর। রক্ত, মৃত্যু, ধ্বংস, সংগ্রাম আর ত্যাগের পঁচিশ বছর। তারপর আরেকবার বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা। এই মৃত্যু আর সংগ্রামের বছরগুলিতে ঘৃণা ছিল, কিন্তু উদারতার অভাব ছিল না। শত্রুর নিপীড়ন ছিল, কিন্তু সংগ্রামীদের সঙ্কীর্ণতা ছিল না। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা ছিল, কিন্তু গোঁড়ামি ছিল না।

আশি বছর ধরে যাদের শোষণ জাতটাকে সাদা করে দিয়েছে, প্রতিদিন যাদের কারাগারে অসংখ্য দেশপ্রেমিকের মৃত্যু ঘটছে, প্রতিদিন যারা অগুণতি সন্তানহারা মাতার কান্নায় ভরে দিচ্ছে আকাশ, কতো না বিধবার অশ্রুতে ভাসিয়ে দিচ্ছে ভিয়েতনামের মাটি—সেই ফরাসী উপনিবেশবাদীদের কাছে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়বার প্রস্তাব দিলেন দেশপ্রেমিকরা।

তখন ১৯৪৩ সাল। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক মাঝখানে। জাপানীরা দ্রুত পায়ে দখল নিচ্ছে একটার পর একটা অঞ্চল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গঠনে আর দেরি করা যায় না। কাজেই ফ্যাসিবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের যুক্ত মোর্চা ভিয়েতমিন-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব গেল ফরাসীদের কাছে। জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রতিরোধের প্রস্তাব। সাধারণ এবং বৃহত্তর শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যের প্রস্তাব। কিন্তু ফরাসী কাপুরুষরা মুখ ফিরিয়ে নিল। বলল: "জাপানীদের সঙ্গে লড়বার জন্যে এখন তোমরা অস্ত্র চাও। কিন্তু পরে তো ঐ অস্ত্রই তোমরা ঘুরিয়ে ধরবে আমাদের বিরুদ্ধে। ওটি হচ্ছে না।" বুদ্ধিমান ফরাসীরা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে ভিয়েতমিন সদস্যদের বিরুদ্ধে তাদের পীড়ন দ্বিগুণ করে তুলল।

৯ই মার্চ, ১৯৪৫-এর পর

জাপানীরা কিন্তু এগোচ্ছিল। এগোতে এগোতে এক সময় তারা দখল নিল সমগ্র ভিয়েতনামের। ১৯৪৫ সালের ৯ই মার্চ জাপানীরা ফরাসীদের নিরস্ত্র করে ভিয়েতনামের প্রভু হয়ে বসল। দায়িত্ব বেড়ে গেল ভিয়েতমিনের। লড়াই শুরু হলো জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে—সশস্ত্র সংগ্রাম। ফরাসীদের কিছু কিছু অস্ত্রশালা তাদের হাতে এলো, জাপানীদের ওপর অতর্কিতে হানা দিয়ে দখল করল আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র। গেরিলা লড়াই শুরু হলো। ফরাসীরা তখন সীমান্ত পার হয়ে পালাচ্ছে। কেউ কেউ সহযোগিতা করছে জাপানীদের সঙ্গে। অন্যদিকে লড়াই চলছে। ভিয়েতমিন একটু একটু করে সরিয়ে দিচ্ছে জাপানীদের। তারপর এক সময় চীনের সীমান্ত পার হয়ে আসতে থাকল মার্কিন গোলা-বারুদ। ছোট মাঝারি অস্ত্র। মার্কিনরা উড়োজাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে আরম্ভ করল রাইফেল, টমিগান, মেশিনগান, হালকা কামান আর বিশেষজ্ঞ। ইতিহাসের পরিহাস, যুদ্ধ মিটে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে, আবার ফিরে এলো এই বিশেষজ্ঞরাই। এবারে আর বন্ধুর বেশে নয়, এলো শত্রু হয়ে।

জাপানীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে লড়াই শুরু করল ভিয়েতমিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের সর্বশ্রেণীর মানুষ।

জাপানীরা দেশটাকে দখলই করেছিল, শাসন করতে পারেনি। এমনকি সব গ্রামে একটা করে পুলিশও পাঠিয়ে উঠতে পারেনি, ইতিমধ্যে শুরু হলো অভ্যুত্থান। তাঁবেদার একটা সেনাবাহিনী গঠন করল জাপানীরা। সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবার হিড়িক পড়ে গেল স্থানীয় আর সায়গনে! তাদের হাতে বন্দুক দিয়ে পাঠানো হলো ভিয়েতমিনদের ঘাঁটির দিকে। ভিয়েতমিন বাহিনীর সামনাসামনি হতেই তাঁবেদার বাহিনীর বেশির ভাগ সেনা বন্দুক ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জাপানীদেরই বিরুদ্ধে। জাপানীরা হটতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে। মার্চ থেকে আগস্ট, এর মধ্যেই ভিয়েতমিন টংকিনের পাঁচটি প্রদেশ শত্রু-কবল-মুক্ত করল। ভিয়েতনামে তখন সবচেয়ে জবরদস্ত বাহিনী হলো জাপানীদের টুয়েন্টি ফার্স্ট ডিভিশন। শুরু হলো তার সঙ্গে লড়াই। ওদিকে হাজার হাজার দেশপ্রেমিককে বন্দী করতে থাকল জাপানীরা। এ-ব্যাপারে ফরাসী পুলিশবাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি"দের নামের তালিকা তাদের কাজে লাগল। শহরে-গঞ্জে সর্বত্র দুর্বার

অহিংস গণআন্দোলন আর প্রদেশে প্রদেশে সশস্ত্র সংগ্রাম। কোথাও মুখোমুখি যুদ্ধ, কোথাও গেরিলা কায়দায় লড়াই। জাপানীরা হটতেই থাকল। তারপর হঠাৎ যুদ্ধ থেমে গেল। বড্ড বেশি রকমের হঠাৎ। ভিয়েতমিনরা তখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

হ্যানয়ে মুক্তির পতাকা : ১৯এ আগস্ট, '৪৫

যুদ্ধ শেষ। জাপানীরা পরাজিত। ফরাসীরা পলাতক। এই শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এলো ভিয়েতমিনের নেতৃত্বে সমগ্র ভিয়েতনামের জনগণ। চীন-সীমান্তের কাছে কাওবাঙ-এ অনুষ্ঠিত হলো ভিয়েতমিন মহাসম্মেলন। ঠিক তার আগের সপ্তাহে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করেছে। গঠিত হলো অস্থায়ী সরকার। ১৯ এ আগস্ট হ্যানয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন সরকার। এখানে ওখানে জাপানীদের সঙ্গে, কোথাও তাঁদের তাবেদার বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত ঘটল। কিন্তু সে নিতান্তই তুচ্ছ।

বাও দাই বিশ বছর ধরে ভিয়েতনামের নামসর্বস্ব সম্রাট। জাপানীরাও তাঁকে উৎখাত করেনি। এবারে তিনি নিজেই সিংহাসন ত্যাগ করলেন। অদ্ভুত একটি ঐতিহাসিক ঘোষণাতে বাও দাই বললেন :

"দুঃখের হলেও একথা আমরা স্বীকার না করে পারি না যে, গত বিশ বছরের শাসনে উল্লেখ করা যায় এমনভাবে দেশের সেবা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।··অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। এবার থেকে এক স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হয়ে আমরা সুখী হব।"

নতুন সরকারও তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। তাঁর "বাও দাই" উপাধি বাদ দিয়ে তিনি জনৈক এম. ন্‌গুয়েন ভিন্‌ থুম হয়ে নতুন সরকারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন।

১৯ এ আগস্ট থেকে স্বাধীনতার পতাকা হ্যানয়ের আকাশে উড়তে থাকল। লাল রং-এর কাপড়ের ওপর জ্বলজ্বল করছে হলুদ একটি তারা।

সায়গন মুক্ত। মুক্ত সায়গন

সায়গন। ২৫এ আগস্ট। গণমিছিলের আহ্বান জানালেন ভিয়েতমিন নেতৃত্ব। লক্ষাধিক মানুষ স্বাধীন হয়ে নেমে এলো পথে। উৎসাহ, উদ্দীপনা, সংগ্রামী মেজাজ, অথচ আশ্চর্য সুশৃঙ্খল লক্ষাধিক মানুষের অভিযান। মিছিলের সামনে ফেস্ট নে স্বাধীনতার কথা, নতুন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার

কথা ঘোষিত। কোচিন চীন সরকারের দপ্তরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল দু-লক্ষ পা। উত্তোলিত হলো এক লক্ষ হাত। কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটল না। রাজতন্ত্রের তাঁবেদাররা আগেই উবে গেছে নিঃশব্দে। মিছিল শেষ। বিজয় অর্জিত। পরের দিন, ২৬এ আগস্ট, সায়গনে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন স্বাধীন সরকার। হ্যানয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের অধীনস্থ কর্তৃপক্ষ হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন ভিয়েতমিন পিপলস কমিটি। হ্যানয়ের মতোই এখানেও ছোটখাট দু-একটা সংঘর্ষ ঘটল বিচ্ছিন্নভাবে। প্রধানত জাপানীদের সঙ্গেই। বিশেষ করে তে নিন্ এবং থু দাও মত্-এর কাছে। তারপর সব শান্ত, সুশৃঙ্খল, নিয়মমাফিক, স্বাভাবিক।

গ্রামে গ্রামে শান্তি। শহরে শহরে উৎসব। মানুষে মানুষে মৈত্রী। শত বৎসরের গ্লানি মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করার উৎসাহ ও উল্লাস। জাপানী সৈন্যরা তাদের শিবিরে অপেক্ষমান। মিত্রপক্ষের হাতে তাদের দৈব। অসংখ্য ফরাসী সমগ্র ভিয়েতনামে উদ্বেগে কাল গোনে। অকারণ। একজনও নিরস্ত্র ফরাসী আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায় না। উৎসাহ, উল্লাস, উৎসব। অথচ আশ্চর্য শৃঙ্খলাবোধ। শত বৎসরের সংগ্রামের একটা শিক্ষাই বোধহয়—সহনশীলতা আর উদার শৃঙ্খলাবোধ।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

তারপর এলো বিশ্বের কাছে ভিয়েতনামের বার্তা। সেদিন ৪৫-এর ২রা সেপ্টেম্বর। আমরা স্বাধীন হবই। আমরা মুক্ত হয়েছি। এ বার্তা সমগ্র ভিয়েতনামের—উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ। স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ঘোষণাপত্রটি এই রকম :

গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

"সমান হয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রতিটি মানুষ। প্রতিটি মানুষকে স্রষ্টা দিয়েছেন কতকগুলি অধিকার—যা থেকে আলাদা করা যায় না কোনো মানুষকেই; এর মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা আর সুখ অর্জনের অধিকার।"

এই অমর বাণী উৎসারিত হয়েছিল ১৭৭৬ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে এর মর্মার্থ হলো :

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জন্মমুহূর্ত থেকেই সমান, প্রতিটি মানুষের আছে বাঁচার অধিকার, আছে সুখী হওয়ার অধিকার, স্বাধীন হওয়ার অধিকার।

১৭৯১ সালে, মানুষের ও নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে ফরাসী বিপ্লবের ঘোষণাবলীতেও বলা হয়েছিল: "প্রতিটি মানুষ জন্মেছে স্বাধীন হয়ে, জন্মেছে সমান অধিকার নিয়ে; এবং প্রত্যেকটি মানুষকেই স্বাধীন হয়ে, সমান অধিকার নিয়েই বাঁচতে হবে।"

এ-সত্য অস্বীকার করা যায় না।

অথচ, আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে, স্বাধীনতা সাম্য আর মৈত্রীর সমস্ত মানকে ধুলিসাৎ করে, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা মথিত করেছে আমাদের পিতৃভূমি, নিপীড়িত করেছে আমাদের সহগামী নাগরিকদের। মানবতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শের বিরুদ্ধেই কাজ করে গেছে ওরা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের জনগণকে প্রতিটি গণতান্ত্রিত স্বাধীনতা থেকে ওরা বঞ্চিত করেছে।

অমানুষিক আইন ওরা চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর; আমাদের জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট কবার জন্যে, আমাদের জনগণ যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে, উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ওরা তিনটি পৃথক রাজনৈতিক প্রশাসন গড়ে তুলেছে।

ওরা যত স্কুল গড়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বানিয়েছে কারাগার; নির্মমভাবে হত্যা করেছে আমাদের দেশপ্রেমিকদের; রক্তের বন্যায় ভাসিয়েছে আমাদের প্রতিটি অভ্যুত্থান।

আমাদের জনমতকে ওরা শৃঙ্খলিত করে রেখেছে; আমাদের জনগণের শিক্ষা-সংস্কৃতির মুখে কুসংস্কারের পাথর চাপা দিয়েছে ওরা।

আমাদের জাতিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্যে ওরা আফিং আর মদের নেশায় আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওরা আমাদের অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত শোষণ করেছে; রিক্ত-নিঃস্ব করেছে আমাদের জনগণকে; ধ্বংস করেছে আমাদের ভূমি-সম্পদ।

ওরা লুণ্ঠন করেছে আমাদের ধানের ক্ষেত, আমাদের খনি, আমাদের বনসম্পদ আর যাবতীয় উৎপাদন-সামগ্রী। ব্যাঙ্ক-ব্যবসা আর রপ্তানি-বাণিজ্য একচেটিয়া করে রেখেছে ওদের মুঠোয়।

কত রকমের অন্যায় কর আবিষ্কার করেছে ওরা, আর আমাদের

জনগণকে, বিশেষ করে আমাদের কৃষকদের, ঠেলে দিয়েছে চরম দারিদ্র্যের অন্ধকার তলদেশে।

আমাদের জাতীয় বুর্জোয়াদেব বিকাশকে ব্যাহত করেছে ওরা ; নির্দয়ভাবে শোষণ করেছে আমাদের শ্রমিকদের। ১৯৪০ সালের শরতকালে, জাপানী ফ্যাসিবাদীরা যখন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে নতুন নতুন ঘাঁটি গড়ার উদ্দেশ্যে ইন্দোচীনের ভূখণ্ড পদদলিত করল, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তখন তাদের সামনে নতজানু হয়ে আমাদের দেশকে তুলে দিল তাদের হাতে।

এইভাবে, সেইদিন থেকে, আমাদের জনগণের কাঁধে চেপে বসল—ফরাসী আর জাপানী—দু-দুটো জোয়াল। দুঃখ-কষ্টের সীমা রইল না আমাদের জনগণেব। ফল হলো : গত বছরের শেষ থেকে এ-বছরের শুরু পর্যন্ত, কোয়াং ত্রি প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে উত্তর ভিয়েতনাম পর্যন্ত বিশ লক্ষের ওপর আমাদের সহগামী নাগরিকের অনাহারে মৃত্যু। মার্চ মাসের নয় তারিখে জাপানীরা ফরাসীদেব সেনাবাহিনীকে নিবস্ত্র করে। ফরাসী উপনিবেশবাদীবা হয় পালিয়ে যায়, নয় আত্মসমর্পণ করে। স্পষ্ট হয়ে যায় ওরা যে আমাদের "রক্ষা" করতে অক্ষম শুধু তাই নয়, পাঁচ বছরের মধ্যে দু-দুবার ওরা আমাদের দেশকে বিক্রি করে দিয়েছে জাপানীদের কাছে।

৯ই মার্চের আগে ভিয়েতমিন লীগ বহুবার ফরাসীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে জাপানীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে। এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পরিবর্তে ফরাসী উপনিবেশবাদীরা ভিয়েতমিন সদস্যদের বিরুদ্ধেই তাদের সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ তীব্র করে তুলেছে। পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা ইয়েন বে এবং কাওবাঙ-এর অসংখ্য রাজবন্দীকে নির্মমভাবে খতম করেছে।

এসব সত্ত্বেও, আমাদের সহ-নাগরিকরা সব সময়েই ফরাসীদের প্রতি একটা সহনশীল এবং মানবিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। এমন কি, ১৯৪৫-এর মার্চে জাপানী অভ্যুত্থানের পরেও ভিয়েতমিন লীগ বহু ফরাসীকে সীমান্ত পার হয়ে চলে যেতে সাহায্য করেছে, তাদের অনেককেই জাপানীদের বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করেছে এবং ফরাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪০-এর শরতকাল থেকেই আমাদের দেশ আর ফরাসী উপনিবেশ নেই ; জাপানীদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে।

জাপানীরা মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর জাতীয় সার্বভৌমত্ব

অর্জন করার জন্যে এবং ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সমগ্র জনগণের অভ্যুত্থান ঘটল।

আমরা আমাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি জাপানীদের কাছ থেকে, ফরাসীদের কাছ থেকে নয়, এইটেই সত্য।

ফরাসীরা পালিয়ে গেছে, জাপানীরা হার মেনেছে, সম্রাট বাও দাই তাঁর সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। প্রায় শত বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করেছে আমাদের জনগণ, আমাদের পিতৃভূমির জন্যে তারা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। সেই সঙ্গে আমাদের জনগণ বাতিল করে দিয়েছে সেই রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা হাজার হাজার বছর ধরে প্রভুত্ব করেছে আমাদের ওপর। তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।

এইসব কারণে, আমরা, অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা, সমগ্র ভিয়েতনামী জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করছি :

ফ্রান্সের সঙ্গে ঔপনিবেশিক চরিত্রের সমস্ত সম্পর্ক এই মুহূর্ত থেকে আমরা ছিন্ন করলাম ; ভিয়েতনামের হয়ে ফ্রান্স এ-পর্যন্ত যেসব আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, আমরা তা বাতিল করে দিলাম ; আমাদের পিতৃভূমিতে ফরাসীরা বে-আইনীভাবে অর্জিত যেসব বিশেষ সুবিধা ভোগ করত তা আমরা বিলোপ করলাম।

ফরাসী উপনিবেশবাদীরা এ-দেশ পুনর্দখলের কোনো চেষ্টা যদি করে তবে তার বিরুদ্ধে এক অভিন্ন লক্ষ্যের দীপ্তিতে উদ্দীপ্ত আমাদের সমগ্র জনগণ শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত সংগ্রাম করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মিত্রপক্ষের শরিকরা, যাঁরা তেহরাণ এবং সানফ্রান্সিসকোতে জাতিসমূহের সাম্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতির প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন, তাঁরা যে আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি করবেন না এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

একটা জনগণ, যাঁরা আশি বছরের ওপর সাহসের সঙ্গে ফরাসী প্রভুত্বের বিরোধিতা করেছেন, মিত্রপক্ষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাঁরা বিগত বছরগুলিতে লড়াই করেছেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, এমন একটি জনগণকে স্বাধীন হতেই হবে, মুক্ত হতেই হবে।

এইসব কারণে, আমরা, গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক ভিয়েতনামের অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা, বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করছি যে, ভিয়েতনামের সমগ্র

জনগণ তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সমস্ত কায়িক ও মানসিক শক্তি সংহত করতে, তাদের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সায়গনে জনগণের কমিটি ক্ষমতা হাতে নিয়েই তিনটি কাজ করলেন। স্বাধীন সরকার আর তার নানান বিভাগ গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। নাগরিক জীবনে ফিরিয়ে আনলেন শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ক্ষমতায় এসেই আদেশ দিলেন : কারাগারের দ্বার খুলে দাও। সায়গন, হুয়ে, হ্যানয়-এর কারাগারের অন্ধকার নির্জনতা থেকে বন্দীরা বেরিয়ে এলেন মুক্ত মাতৃভূমির উজ্জ্বল আলোতে। পওলো কন্দর দ্বীপের বন্দীশিবিরে জাহাজ পাঠানো হলো। ফিরিয়ে নিয়ে এসো সেইসব দেশপ্রেমিকদের যাঁরা আজ বিজয়ী অথচ আজও বন্দী। অগাধ আত্মবিশ্বাস আর মিত্রপক্ষের প্রতি অশেষ আস্থা নিয়ে কাজ শুরু করলেন স্বাধীন সরকার। স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রেও বলা হলো : "তাঁরা (মিত্রপক্ষ) যে আমাদের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি করবেন না এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।" তাঁরা নিশ্চিত। কিন্তু পারী-লণ্ডন-ওয়াশিংটন-এ অন্য শক্তি, অন্য চিন্তা, অন্য আকাঙ্ক্ষা নিশ্চিতভাবেই দাবার চাল দিচ্ছিল।

"রঙীন ফুল নয়, বন্দুক দাও হাতে"

পওলো কন্দরের ছোট জাহাজগুলি যখন মূল ভূখণ্ডে এসে পৌছল, তখন তার যাত্রীরা আশায়-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল। কতদিন পরে দেখা হবে প্রিয়জনের সঙ্গে। কত যুগ পরে মুক্ত মানুষের মতো ফিরে যাওয়া যাবে স্বাভাবিক জীবনে। মাতৃভূমি আজ মুক্ত। কিন্তু।

মাটিতে পা দিতে না-দিতেই ভিয়েতমিন কমিটি তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন, রাজধানীতে নয়, দূর দূর গ্রামে, মফঃস্বলের গঞ্জে আর শহরে। এখুনি বেরিয়ে পড়ুন। সংগঠন গড়ুন। বন্দুক আর রাইফেলগুলি তৈরি রাখুন। লড়াই শেষ হয়নি। নতুন করে শুরু হয়েছে।

কারণ, সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন ভিয়েতনামকে সহ্য করতে পারেনি। সায়গনে মুক্ত সরকার টিঁকতে পারেনি এক মাসের বেশি।

পটসডাম চুক্তি অনুসারে মিত্রপক্ষ সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ওপর বৃটিশের আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন। জাপানীদের নিরস্ত্র করা, "আইন-শৃঙ্খলা

পুনঃপ্রতিষ্ঠা” করা, “আইনসম্মত সরকার” দাঁড় করানো ইত্যাদির দায়িত্ব তার। কিন্তু ইন্দোচীনের বিশেষ পরিস্থিতির কারণে সেখানকার দখলদারী ভাগাভাগি করা হলো চীন ও বৃটেনের মধ্যে। সিকসটিন্থ প্যারালাল বরাবর কেটে দু-টুকরো করা হলো দেশটাকে। এর উত্তরে চীনের আর দক্ষিণে বৃটেনের আধিপত্য মেনে নেওয়া হলো। ভিয়েতনামের পূর্বতন প্রভু ফ্রান্সের কথা কেউ ভাবল না। তাদের অবস্থা তখন নিতান্তই কাহিল।

আগস্টের শেষ দিকে বৃটিশপ্রতিনিধিদের প্রথম দলটি সায়গনে পৌছল। ভিয়েতনামীরা সারা শহর সাজিয়ে দিলেন মিত্রপক্ষের পতাকা দিয়ে। ২রা সেপ্টেম্বর আর একটা মহামিছিলের আহ্বান জানানো হলো। মিত্রপক্ষের সমর্থনে আর নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নেমে এলো। তিন ঘণ্টা ধরে পথে পথে মিছিল। তারপর সমাবেশ। নেতাদের বক্তৃতা। তারপর ঘরে ফেরার পালা। মনে আশ্বাস, পরিবেশে পূর্ণ শান্তি। তখন বিকেল পাঁচটা বাজে। সমাবেশের এক পাশ থেকে গুলির শব্দ পাওয়া গেল। ফরাসী উস্কানিদাতারা তাদের কাজ শুরু করে দিল। ফরাসী আর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রটাতে থাকলেন শত শত ইওরোপীয়ানকে গুলি করে মেরেছে ভিয়েতনামীর দল। কিন্তু বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে অনেক চেষ্টা করেও তিনটির বেশি ইউরোপীয়ের মৃতদেহের সন্ধান দেওয়া গেল না।

ঘটনাটি ছোট। কিন্তু এইভাবেই শুরু। তারপর দীর্ঘ ইতিহাস। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, তাঁবেদারী আর সংগ্রামের কাহিনী।

নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতা

মিত্রপক্ষের হয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন, দেশে আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে তাঁরা জারি করলেন সামরিক আইন। সর্বাগ্রে বৃটিশ ফৌজ গিয়ে দখল করে নিল সংবাদপত্রের দপ্তরগুলি। ভিয়েতনামী সরকারের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন তাঁরা। স্বাধীন সরকারের প্রধান দপ্তর ফৌজ পাঠিয়ে দখল করে নিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি থেকে স্বাধীন সরকারের পুলিশকে হটিয়ে দিয়ে বৃটিশ ফৌজ বসানো হলো। জাপানীদের বন্দীশিবির থেকে যে পাঁচ হাজার ফরাসী সৈন্যকে ভিয়েতনামীরা মুক্ত করেছিল, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হলো। নিরস্ত্র করা হলো ভিয়েতমিন মিলিসিয়াকে। স্বাধীন সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের তরুণ সচিব ফাম্ নগো থাক্ বারবার প্রতিবাদপত্র পাঠালেন। অগ্রাহ্য হলো প্রত্যেকটি

প্রতিবাদ। তারপর বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন ভিয়েতনামী সরকার আসলে জাপানীদের সৃষ্টি। অতএব সরাসরি তাদের সঙ্গে কোনো কথা চলতে পারে না। সব কথাই হবে জাপানীদের মাধ্যমে। স্বাধীন সরকারের প্রতি যাবতীয় বার্তা তাঁরা জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের ঠিকানায় পাঠাতে থাকলেন। স্বাধীন সরকার প্রস্তাব করলেন, সত্তর হাজার সশস্ত্র জাপানী সৈন্য রয়েছে, তাদের নিরস্ত্র করা হোক। বৃটিশ দপ্তর থেকে কোনো উত্তর গেল না। বরং জাপানীদের যাবা আদেশ দিলো সমর প্রস্তুতি নিতে। তারপর ১২ সেপ্টেম্বর জাহাজ জাহাজ বৃটিশ সেনা এসে পৌছল ভিয়েতনামে। তাদের বেশিরভাগই ভারতীয়। জাঠ, রাজপুত, শিখ এবং গোর্খা রেজিমেণ্ট।

ফরাসী বাহিনীর নেতা কর্নেল সেদিল-এর নেতৃত্বে ২৩এ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা একটা সামরিক ক্যু ঘটল। বৃটিশরা তাদের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করল। স্বাধীন সরকারের সদর দপ্তর তখন হোটেল দ্য ভিল্-এ। সেখানে চড়াও হলো ফরাসীরা। রক্তের বন্যা বয়ে গেল অতর্কিত আক্রমণে। তছনছ হলো দপ্তর। দখল হলো হোটেলটি। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঢুকে শেষ রাত্রে শুরু হলো গ্রেপ্তার। শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ভিয়েতনামীদের মার্চ করানো হলো পথে পথে। পিছমোড়া করে বেঁধে প্রকাশ্য রাস্তায় চাবুক মারা হলো প্রতিরোধকারীদের। সকালে ঘুম ভাঙতেই বিদেশী সাংবাদিকরা দেখলেন সিঁড়িতে চাপ চাপ রক্ত, বাগানে ছড়ানো মৃতদেহ, পথে পথে ফরাসী বন্দুকের সামনে হাঁটছেন অসংখ্য বন্দী। ফরাসী সংস্কৃতির সাম্রাজ্যবাদী সংস্করণ আবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সায়গনে, বৃটিশের সহায়তায়।

ভিয়েতনামীরা একদিন অপেক্ষা করল। দু-দিন। তারপর শুরু হলো প্রতিরোধ। প্রধান নেতারা প্রায় কেউই গ্রেপ্তার হননি। তাঁরা ডাক দিলেন প্রতিরোধের। ধর্মঘটে অচল হয়ে গেল সায়গন। বন্দুক গর্জন করে উঠল চোলোঁ অঞ্চলে। এবারে সরাসরি বৃটিশ ফৌজ পথে নামল মোকাবিলা করার জন্যে। কিন্তু বিপ্লবীদের অগ্রগতি রোধ করা গেল না। লড়াই করতে করতে তারা শহরে ঢুকে পড়ল। শহরের রাস্তাগুলি মুক্ত করতে করতে তারা এগোতে থাকল। তারা যখন ফরাসীদের সদর দপ্তরের পাশের বাড়িটি দখল করছে, তখন বৃটিশ কমাণ্ডার মেজর জেনারেল ডগলাস গ্রেসি যুদ্ধবিরতি এবং আলোচনার প্রস্তাব পাঠালেন।

আরো একবার মিত্রপক্ষের ওপর ভরসা করে ভিয়েতমিন আলোচনায়

বসলেন। আলোচনা চলল। একদিন, দু-দিন··· ছ-দিন পরে বোঝা গেল আলোচনা নিরর্থক। ভিয়েতনামী নেতারা ফিরে গেলেন তাঁদের লড়াই-এর ঘাঁটিতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। তারা আলোচনার টেবিলে মীমাংসা চাইছিল না। তারা চাইছিল সময়। আলোচনার ছ-দিন যুদ্ধবিরতিরও ছ-দিন। ঠিক ছ-দিনের দিন ফরাসীদের যুদ্ধ জাহাজ "গ্লয়ার" এসে পৌছে গেল সায়গনের বন্দরে।

তারপর শুরু হলো "মিত্রপক্ষের" অভিযান। "আইন-শৃঙ্খলা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে।" বৃটিশ ফৌজের পাশে দাঁড়াল ফরাসীরা, আর তাদের পাশে বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে এলো জাপানীরা। সবাই মিলে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার টুঁটি টিপে ধরল। ভিয়েতনামীরা তখন চোলোঁর বস্তিতে বস্তিতে, সায়গনের গলিতে গলিতে, ভিয়েতনামের গ্রামে গ্রামে বন্দুক আঁকড়ে ধরে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। কেন না, লাল জমির ওপরে হলুদ তারা আঁকা পতাকাটা নামিয়ে ওরা তখন ফরাসী তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছে ভিয়েতনামের আকাশে।

পঁচিশ বছর পর

এইভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়েছে, লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে পঁচিশ বছর ধরে। জয়, পরাজয়, মৃত্যু, অনাহার, কারাগার আর বন্দীশিবিরের পঁচিশ বছর। আসলে, সংগ্রামের পঁচিশ বছর। এর মধ্যে জাপানীরা বিদায় নিয়েছে। বৃটিশরাও চলে গেছে। মাথা নিচু করে তেরঙ্গা পতাকা গুটিয়ে নিয়ে ফরাসীদের দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। এদের ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে পালের গোদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। আজ, পঁচিশ বছর পরে, তাদেরও বিদায় নিতে হচ্ছে। আইক-নিক্সন শাসন কালেই ইয়াংকিরা ভিয়েতনামের "স্বাধীনতা" রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। ইতিহাসের পরিহাস, তাদের দীর্ঘ লাঙ্গুল আজ যখন ক্রমাগত ছোট হয়ে যাচ্ছে, ভিয়েতনাম থেকে তাদের পরাজয় আর পলায়নের খবর আসছে ক্রমাগত, তখনও নিকসনই তাদের কর্তা।

পঁচিশ বছর সংগ্রামের পর ৬৯ সালের ৬ই থেকে ৮ই জুন মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েতনামে এক গণ-প্রতিনিধি-সম্মেলনের পর ঘোষণা করা হয়েছে: আমরা স্বাধীন, বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করলাম। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে।

এই দ্বিতীয়বার। এবারে এ-সরকারের পতন ঘটায় এমন শক্তি পৃথিবীর

কোনো সাম্রাজ্যবাদের নেই। কারণ, প্রথম আর দ্বিতীয় সরকারের মধ্যে পার্থক্য অনেক। পার্থক্য পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার, পঁচিশ বছরের সংগ্রামের।

কিন্তু সায়গন? সায়গন তো এখনো মার্কিন আর তাদের তাঁবেদার কি-থিউ সরকারের ঘাঁটি। সত্যি কথা, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য, সায়গন এখন একটা দ্বীপে পরিণত। সেখানকার কর্তারাও শহরের বাইরে পা দিতে ভরসা পান না। আর মুক্তিসেনারা অনায়াসেই বার্চেটকে নিয়ে গিয়ে হাজির করে সায়গনের উপকণ্ঠে। সেখানে যে তাদেরই রাজত্ব! কতবার মুক্তি-সেনার দল খোদ সায়গনকে কাঁপিয়ে দিয়েছে তাদের আক্রমণে। আত্মরক্ষার ক্ষমতাও আজ আর ওদের নেই, সরকারী কর্তারা, মন্ত্রীরা তাই প্রত্যেকে মনে মনে পরাজিত। তারা বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকা রাখছে, পারী কিংবা রোমে বাড়ি করে রাখছে এক-আধখানা। পরিবারের সদস্যদের আইনী বা বেআইনী ভাবে প্রতিদিন বিদেশে চালান করে দিচ্ছে। মুক্তিসেনার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে থি-র নেতৃত্বে যে তাঁবেদাররা গিয়েছিল পারীতে, তাদের একজন, সায়গনের এক মন্ত্রী, এখন ফরাসী নাগরিকতা নিয়ে জনৈক ধনী ফরাসীব বাড়িতে পাচকের কাজ করছে। পরাজয় সম্পর্কে ওরা কতো নিশ্চিত, কতো অসহায়।

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে সেই ভিয়েতনামী তরুণটির কথা। মাত্র বছর খানেক আগে বুলগেরিয়াতে বিশ্বযুব উৎসবে তার সঙ্গে দেখা। জানতে চেয়েছিলাম পরের উৎসবে তার দেখা পাব কিনা, সে আসবে কিনা। কণ্ঠ-স্বরে অগাধ আস্থা নিয়ে জলপাই-সবুজ সৈনিকের পোষাক পরা বাইশ বছরের ছেলেটি উত্তর দিয়েছিল :

"না, আমরা আসব না। তোমরাই যাবে। কারণ, এর পরের বিশ্বযুব-উৎসব করব আমরা, আমাদের দেশে। সে-উৎসব হবে সায়গনে, মুক্ত সায়গনে।"

সারা ভিয়েতনাম আজ মুক্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে সেই উৎসবের জন্যে। আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি চলছে পারীর আলোচনা টেবিলে, ভিয়েতনামের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, কলকাতা-পিকিং-মস্কো-ওয়াশিংটনের পথে পথে মুক্তিকামী মানুষের সংহতি মিছিলে।

সীমান্তকাল

কুমারেশ ভট্টাচার্য

চারিপাশে গমগম করছে অফিস-চত্বরের ব্যস্ততা। উন্মুখ কর্মঠ আসা-যাওয়া এদিকে ওদিকে। শঙ্কর ডান হাতের কব্জি ঘুরিয়ে সময় দেখল। পা চেপা প্যান্টের (সোডার বোতল গলে যায় অবশ্য) কোমরে গোঁজা টেরিলিন শার্টের খানিকটা অংশ বাঁ পাশে ঢিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। শঙ্কর সে অংশটাকে গুঁজে দিয়ে শার্টের ভাঁজের ওপর এখানে সেখানে টোকা মেরে ভাঁজ ঠিক করে দেয়। আফ্, বাসের ভেতরে যেন ধর্ষণ করে দিয়েছে শরীরটাকে। শ্‌শালা, এভাবে এসেও লেট!

পয়েন্টেড টো জুতোর তলায় মুড়মুড় করে সুরকীর শব্দ হতে থাকে। এক-একটা মোড়, মিছিল আর লাল সিগন্যালে আবদ্ধ যাত্রীদের রাগ উৎকণ্ঠার শব্দগুলো শঙ্করের কানে যেন লেপটে রয়েছে—লাও ঠ্যালা, এত আগে বেরিয়েও বানচোৎ লেট্ ঠেকানো যায় না।···ঘেন্না ধরে গেল শাল্লা। পান চিবনো শব্দগুলো শঙ্করের নিত্যকার শোনা। আর সেই ভদ্রলোকটা—মাকড়া কথার দমকে দমকে নাকের ওপর ঘেমো বগলটা এমন নাড়াচ্ছিল—এ্যাঃ, কী বিট্‌কেল গন্ধরে বাওয়া।

পর পর সিঁড়িগুলো উঠে ডাইনে ঘষা কাঁচে ঘেরা ঘরের সমীপবর্তী হতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরে এলে এটাই নিয়ম। সায়েবের সামনে তার হুকুম নিয়ে সই করতে হয়। বাঁ পাশে একটা টানা হল্ ঘর। সারি সারি সাজানো টেবিল—নিয়মিত গুঞ্জন। কিন্তু আজ অবশ্য আলাদা গুঞ্জন আছে। ঠেলা দরজার সামনে দাঁড়ায় শঙ্কর। কব্জি ঘুরিয়ে আর-একবার দেরিটা মেপে নেয় সে। আজ পাক্কা কুড়ি মিনিট লেট।

পেছনে থামের ওদিক থেকে সহানুভূতির মতো কথা আসে—ইস্ এই মাত্তর, দু-মিনিট আগে খাতায় (হাজরে-খাতা) দাগ টানল সায়েব।

যেন আঠার মিনিট লেট পর্যন্তও সহ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু শেষের দু-মিনিটে ভারতবর্ষ রসাতল হচ্ছিল আর কি!

বলছে কে? অ, পালোধিবাবু। লোকটার কোনোদিন লেট হয় না।

কি ক'রে পারে? সাইকেলে আসে লোকটা। চাকা পাংচারও হয় না নাকি কোনোদিন? অফিস টাইম ধ্যান-জ্ঞান-ইষ্ট। চুলোয় যাকগে। আসতে দেরি হলেও শালার কাজটুকু তো সবই সেরে যেতে হয়!—তবে?

—"ভেতরে আসব স্যার?"

—"ইয়েস্। আলমারির মাথার ওপর খাতা আছে।"

শঙ্কর নিয়ম মতো খাতাখানা অফিসারের টেবিলে রেখে নিজের নামের পাতাটা বের করে কলমের জন্যে চেপা প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাল।

সায়েব সোজা হয়ে বসলেন। রিভলবিং চেয়ারে শব্দ হলো একটা 'ওঁচ্'।

—"অ। এটা ফোর্থ লেট? সতর দিনের মধ্যে চারটে?"

শঙ্কর কলমের খাপটা খুলতে খুলতে থেমে দাঁড়াল। কোমরটা সোজা করে দাঁড়াল সে। যেন মেরুদণ্ডকে একটু শক্ত করার চেষ্টা করল শঙ্কর।

—"নো। চার্জ-শিট হবে আপনার। কেন লেট হয়?"

—"স্যার, আজ ট্রাফিক জ্যাম-এ···।" সত্যি, ধর্মতলার মোড়ে অটোমেশন-বিরোধী একটা মিছিল। তার যেন শেষ নেই। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাফিক—তারপর লাইন বাঁধা ক্রসিং···বাপস।

—"রিগ্রেট। এত বড় একটা বিজি সিটি। ট্রাফিক জ্যাম তো হবেই। আগের বাস-এ আসেন না কেন?"

—"স্যার, আগের বাসটায় এত···।" অর্থাৎ আগের বাসটায় কত চেষ্টা করেও একটু পা রাখতে পারেনি। তা ভিন্ন সে-বাসগুলোও তো আটকে ছিল। কিন্তু বলে কোনো লাভ নেই। জ্ঞানপাপী। তার চেয়েও হয়তো বাড়ির কারও অসুখ-বিসুখ, কিম্বা স্বজনের মৃত্যু—অথবা এই রকমই একটা কোনো ভেজাল কৈফিয়ত দিলে সিচুয়েশন সফট হতো। বাট হোয়াই? এ-রকম একটা সামান্য জিনিসের জন্যেও আমাকে দিয়ে জলিফলি মিথ্যে বলাবে? নাকি মিথ্যাই এক্ষেত্রে নিয়ম। ডিসিপ্লিন?

—"হোয়াই স্ট্যাণ্ডিং? ফোর্থ লেট হ্যাজ নো এক্সকিউজ। কোনো কৈফিয়ত থাকতে পারে না।"

—"স্যার, সংসারের নানা দায়-দায়িত্বের জন্যে···"

—"এ্যাবভ অল এখানকার ডিসিপ্লিন। শৃঙ্খলা।"

শঙ্কর, তুই সেই মিথ্যে কথাই বললি? সংসারের দায়? দায়িত্ব? কোনটা রে? সকালে তুই মায়ের কাছ থেকে মুখ ঢেকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে

ছিলি। এ্যানিমিয়ায় শুকনো হতাশ মুখ মা থান কাপড় পরে উবু হয়ে বসে উনুনে হাওয়া করছিল, আর তুই একবার নিরিখ ক'রে নিয়েই চোঁ—। লজ্জা, লজ্জা পেয়েছিলি তুই কাল রাত্রে। ভবানীর জন্যে ছেলে দেখার কথা বলছিল মা। তুই ভাবছিলি ভবানী মাস্টারি করছে, অনশন ধর্মঘট করছে এবং প্রণবের (বি. কম. পাশ, ভালো রোজগেরে, দেখতেও বেশ এবং লেখেটেখে) সঙ্গে প্রেম করছে, তাই বিয়ে হওয়া বা করার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে ওদের ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ওরা যদি এ-কথা মানতে না চায়, তবে কি অন্যত্র চেষ্টা করা শ্লীলতা হবে? মা তোর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর চায়। সংসারের দায়-দায়িত্ব-স্থিতির কথা। কিন্তু সাড়া না পেয়ে তোর মা বললে—এসব কথার জবাব কেন দিবি? আমাকে পাশের বাড়ির মেয়ের কাছে তোর আঁতের খবর জেনে নিতে হবে! পাশের বাড়ির মেয়ে অর্থাৎ অঞ্জু—তোর ভালোবাসার মেয়ে। অশ্লীল লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রুটি কখানা কোনোমতে গলায় গুঁজে নিয়ে তুই রাত্রে নিজের ঘরে সরে এসেছিলি।

জীবন, আদর্শ, ন্যায়, শিক্ষা—সব যেন বুকের ভেতর জমে আজ তুষিমাল হয়ে গেছে। সকালে মুখ লুকিয়ে চায়ের দোকানে ব'সে ব'সে চিন্তার আগুনে বুকে তুষিমাল পুড়ছিল। কাল বিকেলে অঞ্জু বলছিল—কারা যেন তার চোখ-মুখ-নাক-চুল-গানের গলা দেখে গেল। ওর বাবা নাকি বলেছে—শঙ্কর? হুঁঃ! অর্থাৎ আমার চেপা প্যান্ট, কেরানির চাকরি আর পটপটে কথা—এই নিয়েই নাকি গোটা আমি। কিন্তু বুকে যে-আগুনটা জ্বলে, যে-মানুষটা পোড়ে, সে তবে কে? কার জীবতনু? কোনও পথ নেই, পোড় শালা পোড়। এই ভাবে পুড়তে পুড়তে স্নান-আহারের প্রয়োজনে চোখ উল্টে ছুটে এলাম অফিসে। —শালা!

মা হয়তো এখনও ভাতের থালা সামনে নিয়ে মুখ উঁচু ক'রে উদাস চোখে ব'সে আছে। ভবানী বাড়িতে নেই। কাল শুনলাম মাস্টারদের সঙ্গে কোথায় অনফন-ফনশন ক'রে বসে আছে। আর কিশোর—সে হয় পড়ার টেবিলে মুখ গুঁজে ব'সে, না হয় কোথাও সাজেশান-এর ধান্ধায় ঘুরছে। কেরিয়ারের তপস্যা। আর মা—আহা! ধ্যুর! শঙ্করের ইচ্ছে হচ্ছিল লাথি মেরে ঠেলা দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসে। কিন্তু অতিশান্ত সুস্থির হাতে একটা পাট ফাঁক ক'রে সে বেরিয়ে আসে। আস্তে আস্তে, গোড়ালি চেপে চেপে, বিলম্বিত পায়ে।

কিছুই বলে উঠতে পারা যায় না। আপত্তি বা গ্লানি অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বেস্বাদ নিয়ে জিভের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এই হলাম আমরা—যার উপার্জন-টুকুর ওপর থান পরা মা জীর্ণ পাণ্ডুর চোখে কত সাধের কথা ভাবে। ছাল ওঠা ভাড়াটে ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়ে চেয়ে ভবানী এবং নবকিশোরের ছিন্নের কল্পনা আঁকে। দেওয়ালের গা থেকে ঝুর ঝুর করে বালি খসে পড়ে—স্বপ্নের পোকা দেয়ালের বালি কাটে—মা দেখতে পায় না।

এবং অঞ্জু (আমার প্রেমিকা, মসৃণ তনুলতা পেলব চোখ-মুখ, কপালের দুই পাশে দুটো চুলের স্প্রিং সর্বদা টিলটিল করে, কোমর থেকে নামিয়ে পরা শাড়ি, হাঁটার সময় দুটি স্বাস্থ্যল নিতম্ব এমন একটা গমক সৃষ্টি করে যে চেয়ে থাকলে আমার নিজেরই "ইয়াহু" ব'লে উঠতে ইচ্ছে হয়। ও বলে—কি করব, এটা আমার ন্যাচার‍্যাল ফর্ম। দু-চোখে চঞ্চল মদির প্রাণ, সেকেণ্ড ইয়ার চলছে) সেও এই মাইনেটার ভরসায় ভাবতে পারে—বাবা না চায় না চাইবে, দেখে গেছে তো বয়েই গেছে। আমাদের যা করবার করব। নবকিশোর (আমার ছোট ভাই, ইলেভেনথ ক্লাসে পড়ছে) হয়তো জীবন সম্বন্ধে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার অথবা সুযোগ মতো যা-হয় একটা পথ তৈরির সাধনা করে (অবশ্য আদর্শ-ফাদর্শ নয়, টাকা কামাবার পথ আর কি)। নির্ভর এই ডিসিপ্লিন মেনে চলা মাইনেটা।—শঙ্কর, এই সব মুখগুলো মনে রেখে কার বিরুদ্ধে মেরুদণ্ড সোজা করবি তুই?

—"শোনো শঙ্কর। কাছে এসো। বলছিলুম কি, চটাচটি ক'রে আসনি তো সায়েবের সঙ্গে?"

—"ন্-না!"···সত্যিই, কী চটাচটি করবে? কি নিয়ে করবে? লেট ইজ লেট। অন্তত এই অভিযোগের কোনও ফাঁক নেই।

—"শোনো, কাছে বোসো। বড় বাবুকে দিয়ে সায়েবকে বলব 'খুনি। ও হয়ে যাবে।"

কি নির্জীব দুটো চোখে চেয়ে আছে নিমাইপদবাবু। চোয়ালের সমস্ত মাংস খুঁটে খুঁটে খেয়ে হাড়ের ওপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়ে আছে। অনিয়মের আনুগত্যগুলো রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে বুক নিচু করে বসে আছে। বাতগ্রস্ত গৃহিণী এবং অপগণ্ডদের দায়ে ভালোবাসায় কণ্ঠার হাড় কাঁধের ওপর ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মেরুদণ্ডে হাড়ের ভেতরে কেঁদে কেঁদে একটা মানুষ কবে যেন মরে ফৌত হয়ে গেছে! বিপন্ন দুটি চোখ নিচু ক'রে বসে আছে

যেন অপরাধী জীবন। এ তবু মৃত নয়—অন্তহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।

—"ভায়া কি রাগ করছ?"

—"উঁ? না নিমাইপদবাবু। রাগফাগ আবার কি! গুলি মারুন ওসব চিন্তায়।"

আসলে কথাটা আর-এক রকম। আজ নিমাইপদবাবুর টেবিলের তলায় পালোধি, নতুন বিয়ে করা বি-কে মল্লিক এবং হয়তো আরও কারও কারও র‍্যাশন ব্যাগের থলে চোখে পড়বে। রাত্রে অফিসে থাকার জন্যে রসদ আছে ওতে। এক দিনের ধর্মঘটের প্রস্তাব। চিন্তিত হয়ে পড়েছে এই সব ভঙ্গুর চোখ মুখ হাড় মেরুদণ্ড কিম্বা পেলব চিকন আত্মপ্রীতি! আর সন্দেহ, লজ্জা। প্যারাফিনের মতো হাতে মুখে ছড়িয়ে থাকছে। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বুঝতে চাইছে কোথায় সেই রোজকার সচ্ছল গুঞ্জন—খাদ্যের দর, চিত্রতারকার মৃত্যু, রেশানে ভেজাল, দক্ষিণপন্থী বামপন্থী সব শব্দ। প্রত্যেকের চোখ মুখ যেন নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটা-দুটো শব্দ করে প্রাণকে জাগিয়ে রাখছে ঈশ্বরের করুণা পাবে বলে।

কোথায় গেলে মানুষের সমাজের নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে! কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে!

আমার আয়ুর পেণ্ডুলামের কিছু শব্দ এখন ঝরিয়ে ঝরিয়ে অন্যান্য ঘড়ির শব্দগুলির সঙ্গে অন্য-এক স্থির আলোচনার মতো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছি। প্রণব (ভবানীর লেখক প্রেমিক), তোমার রাখাল ছেলে কি সুরটাকে খুঁজে পেয়েছিল? বাঁশিটাকে হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সুরটা পেয়েছিল কি? আহা, সুরের আশায় বাঁশিতে ফুঁ দেয় সে, আর লোকে জিজ্ঞেস করে—ওরে ও তুই কাঁদিস কেন অমন করে, ও রাখাল ছেলে? সত্যিই, কান্না তো সেই সুর নয়, জীবনের ভুবন দোলানো সুর!

—"এই যে, শুনছেন? হ্যালো, কমরেড শঙ্কর, এদিকে।"

এ আবার কী ঠাট্টারে বাবা। আমি শঙ্কর কমরেড?

—"কি ব্যাপার বিজনবাবু?" (বিজনবাবু অর্থাৎ ইউনিয়নের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি বিজন আচার্য্যি)।

—"একটু ওদিকে চলুন! কথা আছে।"

আমাকে হঠাৎ 'কমরেড' কেন বন্ধু, সহকর্মী, ও-দরদী জাতীয় শব্দে

সমতুল ব্যক্তি বলে ভাবছে নাকি আমাকে? তবেই হয়েছে! শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! আমি তো শালা ছালওঠা লাসকাটা ঘরের ভয়ে পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্তি বয়ে বেড়াই। তর্জনী আঙুলটাকে সূর্যে রেখে আনন্দে পোড়াই।

—"আপনার লেট হয়েছে আজ, সই করতে দেয় নি সায়েব,—না?"

—"হুঁ!"

এর ভেতরে এত খবর পেল কি করে? কারা দেয়? নাঃ গলার ভেতরটা আঠা আঠা লাগছে। বাঃ, দেওয়ালের গায়ের পোস্টারের লেটারিংগুলো তো ভারি সুন্দর। ইউনিয়নের এত সুন্দর লেটারিং-এর পোস্টার কি দেখেছি আগে? আর্টিস্ট দিয়ে লেখানো নাকি? "১৯শে সেপ্‌টেম্বরের আর এক নাম—সংগ্রাম—সংগ্রাম···।"

—"শঙ্করবাবু, সায়েবকে প্রেস করেন নি?"

—"সামান্য। এ্যাকচুয়ালি যখন লেট তখন আর বলবার কি আছে!"

—"কিন্তু এতো সারকমস্টানসিয়াল। একটা এ্যাপিল—"

—"ধ্যু্‌র, আজ আর ওসব রগড়ারগড়ি ভালো লাগছে না। চলুন একটু ক্যান্টিনে যাই—।"

—"আমি জানি আর দশজনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আপনি এটা করতেন। কিন্তু বুঝতে পারছি সব, আজ আপনি ক্লান্ত।"

'সব' বুঝতে পারছি মানে? আমার সব ক্লান্তিকে এরা জানে? আমার লজ্জা, আমার গ্লানি নিস্তব্ধ জানলা দিয়ে উটের গ্রীবার মতো মুখ বাড়িয়ে আছে।

ওর মুখের কালো নিঃশ্বাসে আমি বায়ু খুঁজে পাই না।

—"দেখুন শঙ্করবাবু, আপনার বোন অবস্থান ধর্মঘট ক'রে আছেন···"

—"হ্যাঁ!" (কিরে বাবা, এ খবরও রাখে? আশ্চর্য!)

—"আপনি তো একজন সমর্থক।"

সমর্থক? কই এমন ক'রে তো ভেবে দেখিনি কথাটা। তবে অনেক শিক্ষকদের সঙ্গে ভবানী সহযোগিতায় আছে, এতে আমার মতামত ভেবে দেখার কথা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া ব্যক্তিগত অভাব-অনটন যন্ত্রণাহেতু ভবানী ওখানে বসে আছে—এ তত্ত্ব শুনলেই আমার হাসি পাচ্ছে। প্রণবের ঘরে দিব্য মহিলা সাজার সময় কোথায় যাবে এই সব মাস্টারি-ফাস্টারির

সমস্যা, আদর্শ! এর চেয়ে বেশি কিছু ওর সম্বন্ধে আমি ভেবেছি কি?

—"দেখুন শঙ্করবাবু, মুখ ফুটে স্বীকার না করলেও আমরা বুঝে নিতে পারছি। আচ্ছা, আপনার ছোট ভাই তো—হ্যা, এই যে, এই চেয়ারটায় বসুন। অল্প কিছু খাবার-টাবার নিই—কি বলুন? চান-খাওয়ার সময় পান নি তো?"

—"না, মানে সকালে ঠিক সময় পাইনি আর কি!"

বিজন আচাযি্য কি ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ঝুলিয়ে নিয়ে কাউন্টারে খাবার আনতে চলে গেল? হ্যা, তাইতো মনে হলো! সত্যি, সকালে চাঁদুর চায়ের দোকানে বসে অঞ্জুর কথা মায়ের কথা নিয়ে কি যে সব মনে হচ্ছিল, ব্যাস্, ঘড়ি বলে তখন পারিস তো ছোট্ আমার সঙ্গে। তখন অফিস আসব না চান-খাওয়া করব? তাও তো শালা—চুলোয় যাকগে—কিন্তু ক্যান্টিনে তো তেমন লোকজন দেখছিনে আজ! ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা আনহোলি সাইলেন্স! আসলে ক্যান্টিনে বসে যে সব তর্কফর্ক করি—মিয়ার স্পোর্টস—তাই নিয়েই বিজনবাবু আমার সম্বন্ধে এত বড়ো করে ভাবছে নাকি?

মোটে একঠোঙা খাবার আনছে বিজনবাবু? উনি খাবেন না?

—"আরে? আপনার?"

—"আমার দরকার হবে না। চালান।"

ঠিক আছে বাওয়া! আই এ্যাম ইন নীড। চেপাপ্যান্ট পয়েন্টেড় টো সু পরা ছেলে আমি—অতসব কিরিচমারা কায়দা-ফায়দা ভাল্লাগে না। মা হয়তো এখনও কিছু খায় নি—ছেলে কোথায় গেল—কি করছে--কি খেলো—এ সবই ভাবছে। মাকে আমি চিনি। দুঃখে আর হতাশায় বড়ো রুগ্ন। বড়ো নিঃসঙ্গ!

—"আচ্ছা, ক্যান্টিন এত লোন্‌লি কেন বিজনবাবু?"

—"লোন্‌লি? ও! কালকের সার্কুলার দেখেন নি? টিফিন টাইম ভিন্ন দশ মিনিটের বেশি এখানে বসলেই—আপনার নাম-সেকসান জেনে নেবার লোক আছে এখানে।"

—"ও—! বেশ! বেশ! তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই। তথাপি যে আলো, যে কথা জন্ম নেবার—তারা কি ঠিক-ঠিক কথা বলছে মানুষের মুখে?..."

—"থামলেন কেন শঙ্করবাবু? বলুন না, বেশ বলছিলেন—"

—"ও নাথিং! একটা লাউড থিংকিং! আপনি কি বলছিলেন যেন?"

—"না, মানে, আপনার ছোট ভাই, স্টুডেণ্টস ইউনিয়নের একজন তো সক্রিয় কমিটি মেম্বর সে।"

নাকি? আমি ভাই হয়েও তো এত জানিনে বাওয়া। কিশোর আবার এ সবেও। মেঘে মেঘে অনেক বেলা—এঁ্যা?

—"এবং শঙ্করবাবু, আপনি যে কাল সারারাত বোনের পাশে অবস্থান ধর্মঘটে ছিলেন—চুপ ক'রে থেকে কি আর এ কথা অস্বীকার করতে পারেন? আপনার এই রুখু চেহারাই এখন তার সাক্ষী!"

বলে কি? আমি? বিপ্লববাদী মানুষের মতো ভবানীদের পাশে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়ানো অংশীদার? আমি হেসে ফেলব নাকি? দারুণ শব্দ করে হেসে ফেলব? (ওর পাশে বসে আছে বটে একজন—সে প্রণব—ঝেড়ে দেশোদ্ধারও হচ্ছে, প্রেমের র‍্যালাও চলছে) বাবাকে যজমানের দেওয়া কলা করা খাটে আমিতো শালা কাল সারারাত ভালোবাসার লজ্জায় বালিসে মুখ ঢেকে অক্ষম জন্তুর মতো কুঁকড়ে পড়ে ছিলাম।

কিন্তু বিজন আচায্যির চোখমুখ যেন সবজান্তার মতো ধারালো অভিব্যক্তিতে আমার মুখের ওপর বিদ্ধ হয়ে আছে। রুগ্ন রুক্ষ ঐ শরীরটা এক প্রচণ্ড নিষ্ঠায় অনড় নিশ্চল বিন্দুর মতো স্থির।

—"ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন শঙ্কর বাবু? এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের চোখে আপনার ছবি ঐ রকম ভাবেই পড়ছে সব আর কি। তাই শুধু লেট হওয়াই নয়—আরও অনেক ছল-ছুতো খুঁজবে। আপনার আপিসের কাজকামের আপনার প্রাইভেট লাইফ—মানে যেখানে যার সঙ্গে—ইয়ে, মাপ করবেন, অঞ্জুদেবীর ওপরে আপনার ইনফ্লুয়েন্সটাও হিসেবের ভেতরে রেখে আপনাকে ওয়াচ করা হয়। —তখনও ঠিক ধরা-ছোঁয়ার ভেতরে পাচ্ছে না—এই আর কি।"

উঃ, কী গভীর অন্ধকার একটা জগৎ ছায়ার মতো মিশে আছে আমাদের রৌদ্রালোকিত পৃথিবীর ওপর। আমি এখন সেই নেপথ্য পৃথিবীর ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। নেপথ্য অন্ধকারের কথা শুনছি। কিন্তু লক্ষ্য পাই না, অথচ এরা আমারই সঙ্গে সঙ্গে আছে। মানুষের হৃদয়ের অগোচরে।

এই বিষণ্ণ আনুপূর্বিক ক্লান্তিতে জীবকোষগুলি কেটে কেটে দেয়—আর ক্লান্তের মতো অঞ্জুর ভালোবাসার দিকে তাকাই। এক গণ্ডূষ ছায়াশীতল শ্রদ্ধার স্থান, সেখানেও ওদের কলুষ নজর পড়ে এবং আমরা অরুচিকর এক বিষণ্ণতা নিয়ে একে অপরের সামনে মাথা নিচু করি। ও বলে—ভালোবাসা শব্দটা খুব মহৎ—তুমি ওকে 'প্রেম ফ্রেম' বলে উচ্চারণ করো কেন?…বুঝি, ওর এই সেই চোখ যা দিয়ে ও গোটা মানুষের নামে প্রার্থনা করে।

আমি সব জেনেও নিজের রক্তে ফিরে যাই চুপ করে। মধ্যবিত্ত মদির জগতে আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।

—"শঙ্করবাবু উঠছেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"আজ প্রতিরোধ আন্দোলনে থাকবেন কিন্তু।"

প্রতিরোধ? _ কিসের? ধর্মঘটকে ভাঙবার জন্য রাষ্ট্র কর্তার ফতোয়া, পুলিশের সজ্জা, অফিসে ঢোকার সময় তো দেখলাম দুখানা পুলিশের গাড়ি এসে গেছে।

চারমিনারের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটে গুঁজে নেয় শঙ্কর। দেশলাই কাঠিটা বারুদের ওপর অভ্যেস মতো একটানে ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া নিয়ে দেওয়ালের দিকে রিঙ ছুঁড়ে দেয়। ধোঁয়ার রিঙটা পাখার হাওয়ায় ভেঙে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। শঙ্কর ঘূর্ণায়মান পাখার দিকে তাকাল। তারপর বাঁ হাতটা চেপা প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে মাথা নিচু করে গোড়ালি টিপে টিপে ধীর পায়ে ক্যাণ্টিন থেকে রাস্তায় নামল।

ক্যাণ্টিন থেকে সেকশান বিল্ডিং আর কতটুকু দূর? তবু মনে হল এক গভীর অন্ধকারে চোখ দুটো অনেকক্ষণ বোবা হয়ে ছিল। এখন রাস্তার আলোয় এসে চেয়ে চেয়ে আলো দেখতে লাগল সে। দু-পা এগিয়ে গেল সার বাঁধা পাম গাছের ছায়ায়। কাঁধ দুটো একটু ঢিল করে দাঁড়াল শঙ্কর। চারিপাশে লাল সুরকী। টবের ফুল দিয়ে সাজানো চৌকো একটা মঞ্চ। তার মাঝখানে তর্জনীর মতো উঁচু একটা দণ্ড। এই দণ্ডের ওপর বৎসরে দুবার পতাকা উত্তোলন হয়। তাছাড়া ক্যাণ্টিন থেকে এখানে এই ছায়াতেও কিছু কিছু লোক দাঁড়িয়ে টাঁড়িয়ে থাকে। ভালো লাগার মতো পোয়াটাক মাইলের জগৎকে চেয়ে চেয়ে ছাখে। আর ঠিক তারই কাছে আজ দাঁত-নখ ঢেকে দুখানা পুলিশের গাড়ি বসে আছে।

সিগারেটের টুকরোটা লাল সুরকীর ওপর ফেলে জুতোর ছুঁচোল টো দিয়ে থেঁতলে দিল শঙ্কর। তারপর এগোতে লাগল সিঁড়ি তলার দিকে। বড় দরজার বাঁ পাশে আঁটা পোস্টারটা পড়ল—"১৯শে সেপ্টেম্বরের আর এক নাম—সংগ্রাম—সংগ্রাম। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।"

চমৎকার মাল্‌টিকালার লেটারিং। অক্ষরের শিল্প এবং বর্ণসুষমা যেন তাকে জীবনের প্রতি এক সৌন্দর্য এক ভালোবাসার চিহ্নের মতো মুগ্ধ করে রাখল। শঙ্কর আস্তে আস্তে সেকশানের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে ভাবল—আপাতত আমিও হয়তো নিজেকে এখন জিজ্ঞেস করব—কেন একটি নারীর হৃদয়ে হাত রেখে নিজেকে প্রেমবান মনে করার তৃপ্তিকর শব্দগুলির ভেতরে হঠাৎ বিষ ঝরে পড়ে? কোথা থেকে পড়ে? কোথায় দাঁড়াব?

চারিদিকে টেবিলে টেবিলে কাগজপত্তর ফাইল, ঢাকনি ঢাকা জলের গেলাস কিম্বা গ্লাসের গোড়ায় জমে থাকা এঁটো চায়ের তলানি। কোনো কোনো টেবিলের তলায় পোঁটলা—সাধ্যমতো নজরের আড়ালে রাখার চেষ্টা। এবং এপাশে ওপাশে চুপচাপ মুখ চাওয়া-চাওয়ি—চাপা-কথা। চারিপাশে পাখার হাওয়া শরীর ছুঁয়ে ঘুরে ঘুরে নামে। সঠিক অর্থে শ্রমিক নয় এরা, নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী। কোল কুঁজো প্রাণ। শঙ্কর যেন এদের সামনে করে বসে থাকার মতো কনুই দুটো টেবিলের ওপর রেখে চুপ করে থাকার ভেতরে ডুবে থাকে।···

এ ভিন্ন সময়ের আর কোনো স্বর নেই যেন। কোনও সাক্ষ্য থাকে না চোখেমুখে। কেবল রোদ্দুর আর আলো নিজ নিজ জায়গা পরিবর্তন করে নিয়মের মতো। পৃথিবীকে একটু একটু করে ঘুরে যাওয়া দেখায় ঘড়ির কাঁটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ক্লান্তি জমে—ক্লান্তি—শুধু ক্লান্তি······

ই—ই—ন্ কি—লা—আ—ব্!

শব্দ—! কণ্ঠনালী বিদীর্ণ হয়ে কার একটা কণ্ঠস্বর নিচের তলা থেকে সিঁড়িতে সিঁড়িতে ছড়িয়ে গেল একবার।

জি—ন্—দা— বা—দ্!

অনেকগুলো কণ্ঠস্বরের তেজালো শব্দ ভেঙে পড়ল নিচের তলায়।

একক কণ্ঠস্বরটি আবার উত্তেজিতভাবে বিদীর্ণ হলো নিম্নতল জুড়ে—'ই-ই-ন্ কি-লা-আ-ব!' একটা ছোট্ট হৃৎপিণ্ড যেন তার হৃদয়ের ঘৃণা ছুঁড়ে মারছে কঠিন চার দেওয়ালের ওপর।

নিমাইপদবাবু পালোধি হৃষিকেশদের একে অপর দিকে চাওয়ায় ইতিহাস অর্ধসত্যের মতো হিজিবিজি কিছু যেন মনে করিয়ে দেয়। মুখেচোখে চিন্তার পর্দা নেমে এসেছে। ভয়, দ্বিধা, সাহস—সন্দেহের চোখ, চেয়ে-চেয়ে দেখছে কে কোথায় দাঁড়ায়ে আছি। আহ্, দেওয়ালের ওদিকে অনেক রোদ্দুর। আমাদের অন্তরে ইতিহাসের অন্ধকার!

অনেকেই নড়ছে। কেউ কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে। হাঁটছে। এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিধা। "জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে।"

শব্দটা আরও কিছু কণ্ঠস্বর ধরে বিস্তৃতি বাড়াচ্ছে। বৃত্তটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে দপ্তরখানাকে ঘিরছে। নিচুতলা ছেয়ে ফেলছে—ডাউন ডাউন ব্যুরোক্রেসি, পুলিস ডাকা চলবে না (অফিস চত্বরে পুলিশ ঢুকেছিল আজ), জবর হুকুম মানব না, বাঁচার মতো মজুরি চাই।...সেই শুভ রাষ্ট্র ঢের ঢের দূরে আজও। বহু দিন থেকে শান্তি নেই নীড় নেই পাখীর মতন সব হৃদয়ের তরে।

সম্ভবত এই কথাই আগামীকালের কার্যধারার সঙ্গে মিলিয়ে দাবিগুলি বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে বিজন আচাযি্য এখন সিঁড়ির মুখে উঁচু জায়গাটায় উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই রকমই চেনা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কণ্ঠস্বর কাঁপছে। শব্দের এক-একটি তরঙ্গ কণ্ঠে নিয়ে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে গোড়ালিটা এক-একবার নিশ্চয় উঁচু হয়ে উঠছে। চারিপাশে অনেকের বুক থেকে একটা বোধ কাঁধে হাতে চোখে এবং কণ্ঠনালীতে জমা হয়ে হয়ে রুদ্ধ আবেগে নিজেকে জানান দিতে চাইছে।

যদিও উত্তেজনার শরীরগুলো শেষপর্যন্ত নিরীহের মতই নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়ে চুপ করে নিজের নিজের রক্তে ফিরে যায়। কেননা তার বেশি কিছু করণীয় এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মা-ও থান-পরা মাথাটা হেঁট করে নিত্য সন্ধ্যায় লক্ষ্মী পটের সামনে বসে বসে প্রার্থনা করে পদ্ম পদ্মালয়া...ইত্যাদি ইত্যাদি, আর আশায় আবেগে সিঁদুর ঘষে ঘষে ছবিটাকে ঝাপসা করে ফ্যালে। মায়েদের জগতেও জানা থাকে এ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। যুগ যুগ ধরে এ ভিন্ন উপায় নেই জানা গেছে। এবং এ না করেও উপায় নেই জানা গেছে। কেন না ভদ্রোচিত পথ এই পর্যন্তই জানা থাকে সকলের। কর্তৃপক্ষও একবার শব্দগুলো শুনে নিয়ে নিজের নিজের কাজ করে। কেন না যে যার বৃত্তে হৃদয়কে অন্ধকার চোখে এর বেশি খুঁজে পায় না। আহা, হৃদয় হে, রক্ত বয়ে বয়ে ক্লান্ত হও শুধু!

আমি এখানে এই সব কিসের চিন্তার ভেতরে ভাসছি? আমি?

ই-ইন কি-লা-ব…জিনদাবাদ।

নষ্ট স্বপ্ন, আবর্জনা, কলহ, অজীর্ণ গ্লানি আর বঞ্চনার শব্দ, হৃদয়ের যাবতীয় ধিক্কার এদের কণ্ঠরবে মিশে শব্দের জ্বালা হয়ে উঠছে এখন। কার্নিসের পায়রাগুলো ভয় পেয়ে পত পত করে আশে পাশে উড়ছে।

এখানে টেবিলের কোণে কোলকুঁজো কেউ কেউ আছে। ওদিকে দেওয়ালের কোণে নিমাইপদবাবু, মাঝখান বরাবর সিদ্ধ আলুর মতো মুখ নিয়ে বি. কে. মল্লিক, ঘোড়া প্রেমিক ষড়েশ্বর, উই দরজার মুখে পালোধি, থামের গোড়ে একাউন্ট্যান্ট সুধীর দত্ত—সব যেন উদ্ধার করা ঐতিহাসিক চিহ্নের মত নিঃসঙ্গ হয়ে যাদুঘরে বসে আছে। তার পাশে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে খগেশ্বর চাপরাশী। এ ভিন্ন শূন্য টেবিলগুলো টা-টা করছে চোখের ওপর। আর আমি শঙ্কর ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে সিগারেট খাচ্ছি। সিগারেট পোড়াচ্ছি। নিজের নামে কিছু একটা খুঁজছি। বিরস গান গাহিতেছি।

—"বলি ও ভায়া, একা একা কেন? এখানে এসো—।"

নিমাইপদবাবু টেবিলের কিনার থেকে গলা উঁচু করে আমাকে জুল জুল চোখে ডাকছে। বিবর্ণ গ্লানির তলে ট্যাক ধর্ম সবই মরেছে ওর। কি বলবে কথা? চুপি চুপি কোনও ভীরু পরামর্শ অথবা তাও সাহস না পেলে পি, এফ থেকে টাকা নিয়ে যে চোর কুঠরী (উনি যাকে ঘর গৃহ বলেন) তৈরি করছে —নক্সা ইঁট কাঠ চুণ বালির কড়চা শোনাবে নাকি? ফুঃ!

শঙ্কর যেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। সিগারেটের টুকরোটাকে মেঝেয় ফেলে গোড়ালি দিয়ে রগড়ে গোড়ালির উচ্চতাকে মেঝেয় ঠুকে শব্দ করতে করতে অন্য দিকে দ্রুত পার হতে লাগল। করিডোরের দিকে।

আমি এখন কোন দিকে যাব? কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে? আমি যেন এই কথাই চীৎকার করে বলতে চাই—উপযুক্ত মজুরির অভাবে আমারও ভালোবাসা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীড় নেই পাখীর মতো এক হৃদয়ের তরে।

"অত্যাচারের জবাব চা-ই। পুলিশ ডাকা চলবে না—আ!"

পুলিশ কি তবে অফিসের ভেতর তাড়া করেছে। ওঃ, শব্দগুলো যেন দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে কাঁপছে।…আমি কি ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শব্দ জোগান দেব?

আরে আরে, প্রচণ্ড কলরব·করিডোরের সিঁড়ি দিয়ে রোষের মতো পাক খেয়ে উঠছে যে।

শঙ্কর কোমর পিঠ ঘুরিয়ে সেদিকে তাকায়। একেবারে উঠে আসছে যে আজ। ওদের শক্তি হাতের মুঠো থেকে ভেসে যাচ্ছে নাকি? একপাল অন্ধ মানুষের শক্তি···বাধা নেই সামনে কিছু······বলগাহীন ছুটে আসছে······ব্যর্থ মানুষের গ্লানি, কলরব···একটা কণ্ঠস্বর চাই···বিজনবাবু কোথায় চাপা পড়ে গেল···ওরা যেন নখ দিয়ে নিজেদের মুখ আঁচড়াচ্ছে···আমি কি ওদের হাত ধরব? এঁ্যা—আমি?

—"আঃ, কেরে বাব্বা···পড়ে যেতাম যে।" টাল সামলাতে গিয়ে শঙ্কর ধাক্কা খাওয়া লোকটির শার্ট মুঠো করে চেপে ধরে।

—"আরে! (এযে বড়ো সায়েব, মিস্টার শর্মা!) স্যার আপনি?"

—"গিভ মি ওয়ে, প্লি—ই—জ!"

আহ্, ভয়ে কাঁপছে।...এই মুহূর্তটা নিলাম হচ্ছে যে কোনো দামে।···· আমার আত্মার নির্দেশ চাই। মানবাত্মা কথা কও···

—"শঙ্করবাবু, সায়েবকে ছেড়ে দিন। স্যার, এই যে এদিকে ঘুরানো সিঁড়ি আছে···ছেড়ে দিন শঙ্করবাবু, করছেন কি···ওরা পেলে ছিঁড়ে ফেলবে···

—"মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না। থামুন।"

—"ইয়েস, এ্যাংরি মব···রাশিং হেয়া···"

পেণ্ডুলামটা দুলতে দুলতে গতি পাচ্ছে। সভ্যতার বয়স গণনা হচ্ছে। নিঃশ্বাস বড় কম।···নির্দেশ করো ঈশ্বর, ন্যায়সঙ্গত কিছু···মস্তিষ্ককে একবার সুন্দর চিন্তা দাও।

"অত্যাচা—রী—র শাস্তি চা—ই! শাস্তি চা—ই!···"

ওহ্, টিউব লাইটটা ভেঙে পড়ল ঝন ঝন করে। একটা কালো ঢেউ ভাসছে···ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ড ভেসে আসছে পঙ্কিল স্রোতে। পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে যাবে নাকি—

—"আপনি এখানেই দাঁড়ান স্যার (আহা এমন কোনও কথা—একটা কণ্ঠস্বর—যা দিয়ে এর বুকের কপাট খুলতে পারি···ভাষা···শব্দ···হায় ঈশ্বর) খাড়া হয়েই দাঁড়ান—লীস্‌ন্ দেম···"

—"ডোণ্ট বি সিলি···আমা ছেড়ে দিন মুশা···"

এত ক্ষুদ্র হৃদয় নিয়ে ধরে আছো এত ক্ষমতা? ছিঃ। তথাপি আমি তোমার হৃদয়কেই বলব—

"পালিয়ে যাবেন কোথায় স্যার! এক রোজ তো পাকাড় লেগা জরুর···(অবিরাম যন্ত্রণায় তোবড়ানো মুখগুলি ছাখো। হৃদয় পেলে ওরা সুন্দর হতে পারত। ঠিক এই কথাই···আর সময় নেই···তোমায় বোঝাই কি দিয়ে গো···) ওদের কথাগুলো শুনলে ওরা শান্ত হয়ে যাবে স্যার···(আমার কোনও বিদ্বেষ নেই এখন)—ভালোবেসে ওদের কথা শুনুন একবার স্যার···উইথ লাভ একবার শুনুন···"

চারিপাশে রোষের শব্দ এবার—শর্মা সায়েব কি কিছু বলছে—শব্দের কালো কালো ঢেউ চারিপাশ অন্ধকার করে ঘুরপাক খাচ্ছে। চোখভরা অন্ধকার ভেদ করে শুধু কয়েকটি বোতাম দেখছি—শর্মা সায়েবের বুকের বোতাম···"জীবনকে সকলের তরে ভালো করে পেতে হলে তবে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মত অম্লান অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।"

অন্ধকার চোখের ওপর গোলমাল হয়ে একটা তীব্র শক্তি হুইসেল বাজিয়ে হাতের কব্জিতে চেপে বসছে। তালগোল পাকানো অনেক লোক, শব্দ সরে যাচ্ছে। আমি কিছুই টের পাচ্ছি না এমনই এক অন্ধকারে দুচোখ ডুবে যাচ্ছে। ওহ, এ কিসের থাবা আমার চোখের ওপর পড়ল···উঃ···চোখের পাতায় নাকে গণ্ডে চেপে কেটে কেটে বসছে···এ কী শীতল কঠিন থাবা! টানছে আমাকে!

''কমরেড শং—কর", "জিন্দা বা—দ্!"

"কমরেড শং—কর", "জিন্দা বা—দ্!"

বুঝেছি। সিঁড়ি দিয়ে টানছে আমাকে। শব্দের সমতল থেকে এখন নেমে যাচ্ছি। হ্যাঁ—এখনও শব্দের কিছু কিছু অংশ আওয়াজের মতো শোনা যাচ্ছে...

"কমরেড শং—কর, জিন্দা বা—দ্!"

আমার কব্জিতে কয়েকটা আঙুল, হাতের পাঞ্জা দাঁতের মতো চেপে বসে আছে। আঃ, এবার আলো দেখতে পেলাম! ছোট্ট মঞ্চ—উঁচু দণ্ডটা—পাম গাছের সারি—তারের জালে ঘেরা কালো গাড়িও এসে গেছে তবে? লাঠি রাইফেল পুলিস—দাঁত আর নখে ছিঁড়তে লেগেছে ধর্মঘটের কলজে।

পেছনে বারবার সম্মিলিত আওয়াজ সাহসীর মতো কার্নিস ধরে ঝুঁকে ভালোবাসা জানাতে লাগল—"কমরেড শং—কর, জিন্দা বা—দ্!"...

লাল দেওয়াল থেকে মস্ত রঙিন পোস্টারটা ·ফ্যার·ফ্যার করে শব্দ করে খসে পড়ছে দেখে শঙ্কর একবার শব্দটার দিকে তাকাল। পুলিশের লাঠির ডগা তখনও কাগজটাকে খোঁচাচ্ছে। শঙ্কর আস্তে করে চোখ সরিয়ে নিল, যেন কিছুই চিন্তা করল না। শুধু খানিকটা ফাঁকা বাতাস লম্বা করে টেনে নিল বুকে। সভ্যতার বাতাস।

তারপর সে একবার মাথা নিচু করে যেন পৃথিবীর বয়সের কথা ভাবল। এবং হাঁ-করা অন্ধকারের চোয়ালটাকে দেখে নিয়ে শক্ত করে পা রাখল। শঙ্কর কালো গাড়ির ভেতরে ঢুকল।

গাড়িটা শব্দ করে তেল-পোড়া গন্ধ ছড়াল কয়েকবার। তারপর অফিস চত্বর থেকে কব্জি ঘুরিয়ে বাঁক নিল।

আজ না আসিলে বন্ধু

জসীম উদ্‌দীন

আজ না আসিলে বন্ধু কালকে আসিও
কাল না আসিয়া মোরে আরো ব্যথা দিও।
আরো আঘাত সইবার লাগি
হিয়ায় আছে যাগা
আরো জ্বালায় জ্বলবার লাগি
আমার এ প্রাণ দাগা।
সুখ যদি না দিবার পারলে দুঃখ মোরে দিও॥

তুমি যে সুন্দর বন্ধু সবার চেয়ে ভবে
বুঝিলাম পদ্মের মধ্যে তোমায় দেখলাম যবে।
বুঝিলাম ঐ রাঙ্গা রূপের
জহর গোলা বান
তাহার থনে অভাগীয়ার
নাইকো পরিত্রাণ।
তাই বিবাগিয়া হইলাম বন্ধু দুঃখদিয়ার গাঁও॥

বাজারেতে লক্ষ মানুষ দু-একজনা শুধু
আনতে পারে এই অন্তরে দুঃখ দিবার মধু।
সেই মধু আজ পান করিয়া
জাগি দিঘল রাতি
পথ ভুলে বা যদি বন্ধু হেথায় পা বাড়াও॥

প্রতিধ্বনি

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

পেতে হলে
দিতে হয় নিজেকে নিঃশেষ করে,
স্নেহে, প্রেমে, কাজে।
প্রতিটি মুহূর্ত ধরে জীবনের,
নিজেকে সে দিয়েছে নিঃশেষে।
তারপর একদিন
হঠাৎ সে নেই।
যারা শুধু পেয়েই এসেছে,
অথচ দিতেও রাজি,
শূন্যতার দিকে চেয়ে
আর্তনাদ করে তারা বলে,
"দেবো···কাকে?···কাকে?"
প্রতিধ্বনি পাল্টা প্রশ্ন করে,
"কাকে?"

লেনিন

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

বিশুদ্ধ ইচ্ছার বৃত্তি, মন, উত্তরণ
সব পাই লেনিন, তোমার কথা হঠাৎ যখন
মনে পড়ে। ফিরে আসে উজ্জ্বল প্রত্যয়।
মনে হয় এই বিশ্ব আজো স্বচ্ছ, আজো মৃত্যুঞ্জয়।

এবং এখনো দেখি আমাদের কোনো কোনো দিন
হঠাৎ আশ্চর্যরূপে প্রাণৈশ্বর্যে জীবনের কেতন উড্ডীন
সম্ভ্রমে, সম্মানে—
অচঞ্চল স্থৈর্য স্বপ্নে অম্লান কল্যাণে।
উজ্জীবিত যৌবনের মনের প্লাবনে
মর্মরিত স্নিগ্ধকান্তি তিনি এক। অহল্যার দুঃসহ ক্রন্দনে
সমুদ্র-বিশাল ব্যাপ্ত প্রদীপ্ত প্রজ্ঞায় স্থির রৌদ্রদীপ্ত অক্ষয় আকাশ
মাটি ফুল জল ছায়া ঘাস।
ভালোবাসা। সুশান্ত আশ্বাস।

পৃথিবীর শুভলগ্ন তিনি তাই। মানবিক বিমুগ্ধ উল্লাস।
তাঁর জন্ম পৃথিবীর নবজন্ম। পরিচ্ছন্ন। বিশুদ্ধ তন্ময়।
মনুষ্যত্বে স্বর্ণোজ্জ্বল স্বচ্ছ এক প্রত্যাশার জয়।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ, শঙ্খ, মাঙ্গলিকী
সব নিয়ে প্রত্যাশার শপথের ভাষা কাব্যে লিখি
তাঁকে ভেবে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে।
উত্তুঙ্গ বলিষ্ঠ বিশ্ব অপরূপ আলো হয়ে আসে
তাঁকে ভেবে তাই আজো, ইতিহাস পথ খুঁজে পায়
দ্বেষহীন হিংসাহীন বিমুগ্ধ সত্তায়।

মানুষের প্রেমে তিনি। তিনি দীপ্ত একাত্ম বন্ধনে।
তমসাবিদীর্ণ বিশ্বে সর্ব আলিঙ্গনে
সবিতার ভালোবাসা। আনন্দ উচ্ছ্বাস।
মুক্তি তিনি। তাই আজো তিনি বিশ্বে সূর্যের আকাশ।
পরিপূর্ণ হৃদয়ের সর্বাঙ্গীন বৃত্তির চূড়ায়
তিনি শান্ত পদ্মাসীন। অন্তর্লীন মর্ত্য-মূর্ছনায়।
যাকে নিয়ে দিন আর রাত্রি সব সবুজ। নদীর জ্যোতি। ঘাস-বৃক্ষ-ছায়া
অপ্রমত্ত সমাসীন। যাকে নিয়ে দীর্ঘ মুগ্ধ মায়া
ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে। যাকে পেলে মনে হয়
এ-জীবন অক্ষয় অব্যয়।

মৃত্যু যাকে কাছে পেয়ে মায়ের তৃপ্তির মতো ভালোবাসা হয়
অন্ধকারে, যন্ত্রণায়, প্রণয়ের লজ্জার প্রহরে—
সে হৃদয়, সেই মৃত্যু তাঁরি সে নামের স্পর্শে প্রতি ঘরে ঘরে।

অবশ্য স্বীকার্য দেহ। তবু তার সব কিছু নিয়ে
সৌন্দর্যের তিলোত্তমা বুকে তুলে রতি-মুগ্ধ দেহকে ছাড়িয়ে
চিত্রাঙ্গদা কথা বলে যেখানে নিবিড় শান্ত রমণীয়তায়—
প্রসন্ন সন্ধ্যার রঙে জোনাকির দীর্ঘমন স্থির মত্ততায়
নিসর্গ-মাধুরী খোঁজে, সুরভির আলোছায়া খোঁজে—
দুচোখ প্রিয়ার মতো নম্রতায় বোজে
প্রশান্তিতে, আসঙ্গে, নিভৃতে—
যেখানে রয়েছে গ্রহ-তারা-চাঁদ আত্মোদ্ভব প্রত্যুত্তর দিতে
জাগ্রত প্রহরী হয়ে অবিশ্বাসী মানুষের কাছে—
হিমময় অথবা সন্ধ্যার সব পাখিদের পুঞ্জীভূত গাছে
পুষ্পের আনন্দ নিয়ে, শ্রমিকের কৃষাণের ঘর, অথবা কুঁড়ির মধ্যে গর্ভিনীর
যন্ত্রণার মতো।

লেনিনের কাছে তাই আজো দীপ্ত কতো
আকর্ষণ। মৈত্রী। প্রেম। উচ্ছ্বাস। প্রণয়।
যাতে ক'রে একদিন এ-পৃথিবী আরো বেশি নিবিড় অতল হয়ে উচ্চারিত
অনিন্দিত হয়।

এখন ফাল্গুন

শক্তি হাজরা

এখানে যদিও রাত্রি
তবু এই মুহূর্তেই অন্য পারে
এখন সকাল।
বালি জল মাটি পলি স্তর
ক্রমশ কঠিন,
কোটি কোটি শিল্পকার
রাত্রি ছেনে গ'ড়ে তোলে দিন।

তারও পরে রূপান্তর—
ক্রমশ পাথর শিলা ইস্পাতের দামিনী ঝলক
কোটি বর্ষ বদ্ধদ্বার অন্ধকার কপাটের চূড়ান্ত প্রত্যয়
পলে পলে ক্ষয় হয়।
প্রতিদিন শত শত সূর্য তার মহার্ঘ মমতা দিয়ে
গ'ড়ে তোলে আলোক আলয়।

অতএব
বলি ওহে রাত্রির স্তাবক—
জেগে থেকে অথবা ঘুমিয়ে
যে ভাবেই চোখ বুজে থাকো
অবশ্যই প্রভাত প্রহারে
মায়াবী তন্দ্রার কিছু প্রস্তুতকারক
এপারেও সুরক্ষিত স্বপ্নের প্রাচীরে
ঘুমের বীজাণুগুলি রক্ষা পাবে নাকো।

এই তো সেদিনও ছিল তার
জগদ্দল জড়ের পাহাড়
আড়ষ্ট হিমের দাপে
রিক্ত পাত্র শ্যামল শোভার
প্লাবনের নদী ছিল স্বচ্ছতোয়া
ক্ষীণ স্রোতোহীন,
আজ দেখো উত্তর অয়নে
সূর্য ফোটে অশোক প্রাঙ্গণে
সেদিনের অশ্রুনদী তার
নিপার গঙ্গায় পায় ভল্গার জোয়ার
বজ কঙ্গো আন্দোলায় বসন্ত বাহার
আরক্ত করবী, কালো পলাশ আগুন
এখন ফাগুন।

তৃষ্ণা

রবীন সুর

তুমি চৈত্র নিষ্ঠুরতা ক্রমাগত আমাকে জ্বালাও,
বিশাল খরায় মাইল মাইল দাহ, বনস্পতি পিপাসাকাতর :
প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষায় শিকড়ের বিনিদ্র বিস্তার
ক্রমশঃ ফুরিয়ে যায়, ধুলার উত্তাপে
লুটোপুটি খেতে খেতে শালিখ দম্পতি
বিস্ফারিত চঞ্চুর জিহ্বায় সন্তাপ নেভায়,
তুমি কতটুকু তৃষ্ণাটিকে দাও উপশম।
আমি সারাদিন ঘরে কিংবা ঘরের বাহিরে
পথে পথে পথের অন্তিমে
গ্রামে গঞ্জে, গঞ্জের খেয়ায়
তিরতিরে নদী পারাপারে
দূরাগত সন্ন্যাসীর মতন গাজনে
শীতল হবার গানে উদয়াস্ত সানন্দে মেতেছি।
তুমি নিষ্ঠুরতা কবে কোন সুদূর অতীতে
পিপাসার বীজগুলি পুঁতেছিলে বুকের ভিতরে
তারপর একদিন অনায়াসে চৈত্রের মতন
নীলিমা নিঃশেষ ক'রে
দিগন্ত পেরিয়ে অন্ত দিগন্তের অদৃশ্য সীমায়
নদীকে পাঠিয়ে দাও, অবিরল বৃষ্টির আশ্বাসে
সমুদ্র ফতুর করো রোদ্দুরের প্রচুর উৎকোচে ;
আমি প্রতিদিন চড়কের প্রাণান্ত কৃচ্ছ্রতা :
অভিপ্রেত তৃপ্তি খুঁজে দিগ্বিদিকে পিপাসার শূন্যতায় বাঁচি,
কতদূরে পরিত্রাণ, উথালপাথাল ঝড় অবিরাম বৃষ্টির ভিতর
নতুন নতুন নদী সঞ্জীবিত নীলিমায় তপ্ত বালিয়াড়ি।

না হলে তো কথাই থাকে না

তরুণ সেন

প্রধান সড়ক সব ছেয়ে গেছে প্ল্যাকার্ড পোস্টারে
এখন দুরূহ কর্ম ভীড় থেকে খোঁজা মুখ,
এক লহমায় ঠিক চিনে নেওয়া বাড়ির নম্বর
কিশোরীর মুখ দেখে বোঝা দায় ও তল্লাটে
মাংসের দোকান আছে কি না
মনীষী ও গরিলার হাড় মিলে মিশে গেছে
পুরাতত্ত্ববিদের খাঁচায়
বিদ্যুৎ ঘড়ির কাঁটা আমায় নিশানা করে কিনা এক বিষম বিস্ময়
মর্মর বেদীর পায়ে পা ছড়িয়ে ভবঘুরে
ভুলে গেছে ফলকের প্রাচীন মহিমা।

মৃত্যুদিনে একবার ফুলের একান্ত সমারোহ
এই ভেবে প্রৌঢ় ঝাড়পোছ করে বাতিল লণ্ঠন
বাড়ির নম্বর খুঁজে পীনস্তনা মহিলার সমস্ত সড়কে আনাগোনা
শব্দের ভেতর মন ফেলে ঠায় বসে থাকা মেছুরের মতো
দু-এক যুবার জন্যে কখনো খাটানো হয় আকাশের নীল শামিয়ানা
এক পশলা রক্তস্নান শেষে ফের এ-শহর বেশ পরিপাটি
নিপুণ নারীর মতো—চোখে চোখ রেখে ঠিক বুকের গভীরে মারে টান
ফলতঃ এসব তত্ত্বে প্রাত্যহিক কেরাণীর বেড়ে যায় জটিল উৎসাহ
না হলে তো অর্থহীন দু-একটি দুয়োরে রাখা পাথরে
খোদিত চেনা নাম
না হলে তো কথাই থাকে না।

জলের নিকটে তবু

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দের ভিতরে শব্দ
ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি ওঠে, মন ছুঁয়ে যায়-আসে
অনেক চিকন কথা বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে ভাসে।

এখনো অনেক ঢেউ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে শব্দ ভাঙে
তরঙ্গ বেলায় ফাটে ফেনপুঞ্জ উৎসাহে উল্লাসে
উপলস্মৃতির চূর্ণ দিগদিগন্তে রক্তরাগে রাঙে
শব্দের ভিতরে শব্দ
শব্দের ভিতরে তবু তরঙ্গভঙ্গের ফেনা হাসে।

শব্দে শব্দে বাঘবন্দী খেলা
শব্দের ভিতরে যাদু বিস্ময়ের, শব্দে সম্মোহন
অথচ আশ্চর্য শব্দ বন্দী আছে নিঃশব্দের ভিতরে উন্মন।

জলপ্রপাতের শব্দে এখনও কান পেতে আছি
এখনো বুকের মধ্যে জেগে আছে নৃত্যপর হরিণীর তৃষা
জলের নিকটে তবু মেটেনি এখনো এসে জলের পিপাসা
এখনো ঘুরছি কানামাছি।

অন্ধকারে, পদব্রজে

শুভাশিস্ গোস্বামী

এখনও অনেক পথ চলা বাকি প্রিয়,
এখনই মুখের আদলে আঁধার কেন?
কম্পিউটারে ভবিষ্যতের উত্তর নেই,
আমাদেরই কাঁধে হাত দিয়ে হেসে উঠবে সময়।

এখনও যেথায় বল্মীক নিয়ে ঘোরে যারা,
তাদেরই বাজারে কালোরাত কেনাবেচা,
এখনও তাদের রক্তে সাপের হিম,
বড় ভয়, প্রিয়, বড় ভয় তাই দগ্ধ দুপুর।

তোমাতে আমাতে চলো কেটে যাই অন্ধকার,
রক্তে বাজুক সেতারের দ্রুত ঝালা।
জমাট আঁধার পুড়িয়ে জালব রাঙা আভার,
যে পরে পরুক পার্টি-ডিনারে পচা বুর্জোআ মালা

এমিলি, মামণি

চৌ হুউ

"আমার সঙ্গে এসো, এমিলি,
তাহলে যখন তুমি বড় হবে
তখন পথ চিনে নিতে পারবে।"
"আমরা কোথায় যাচ্ছি, বাবা ?"
"পেটোম্যাক নদীর তীরে।"
"তুমি আমাকে কি দেখাবে, বাবা ?"
"আমি তোমাকে পেন্টাগন দেখাতে চাই, বাছা
আদরের মামণি, তোমার অবাক-হওয়া চোখ,
আদরের মামণি, তোমার ঝলমল-করা চুল।"

ওয়াশিংটন···
আত্মার গোধূলি
বেঁচে ছিলে অথবা আজও বেঁচে আছো।
সত্য, জলে ওঠো. বিঘোষিত হও,
মুখোশ খুলে দাও জমিয়ে-তোলা অপরাধের।
মানবতা আজ ধর্ষিতা!

জনমন, মানুষের ছুনিয়ার ডলার-শয়তান,
কোন ঔদ্ধত্যে তুমি ধার করো যিশুর আঙরাখা
অথবা বুদ্ধের জাফরান জোব্বা ?

ম্যাকনামারা
কোথায় লুকোচ্ছ তুমি ?
তোমার বিরাট পাঁচকোণা বাড়ির
মাটির তলার ঘরে ?
এক-একটি কোণ এক-একটি মহাদেশের জন্যে ?
যে-আগুন জ্বেলেছ তার থেকে লুকোতে চাও তুমি
উটপাখি যেমন বালির মধ্যে মাথা লুকোয়।

এদিকে তাকাও
এই একটি মুহূর্তের জন্য তাকাও আমার দিকে—
শিশুর-হাত-ধরা এ-একটি মানুষ মাত্র নয়।
আমি আজ জ্বলন্ত বর্তমান
আর, আমার এমিলি আমাদের সমস্ত আগামীকাল।
এইখানে দাঁড়িয়ে আমি ডাক পাঠাই
আমেরিকার মহান আত্মাকে—
দিগন্তে পুনরায় প্রজ্বলিত করতে
ন্যায়ের আলোকবর্তিকা।

শয়তানের দল
কার দোহাই দিয়ে তোমরা পাঠাচ্ছ
হোয়াইট হাউস থেকে সোজা ভিয়েতনামে
বড় বড় বোমারু বিমান
নাপাম বোমা আর বিষাক্ত গ্যাস বোঝাই ক'রে
শান্তি এবং একটি দেশের স্বাধীনতাকে খুন করতে
স্কুল ও হাসপাতাল পুড়িয়ে ছাই করতে
ভালোবাসা ছাড়া যারা আর কিছুই জানে না
সেই সব মানুষকে জবাই করতে ?

স্কুলের পথে চলেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে
তোমরা তাদের হত্যা করছ
ঋতুতে ঋতুতে ফুলে ফসলে হাসছে মাঠ
তোমরা তাকে বধ করছ
কবিতা ললিতকলা আর সঙ্গীতের প্রবাহকে
টুটি টিপে মারছ তোমরা।
কোন নামের দোহাই পেড়ে
তোমরা কফিনে ভরে কবরে দিচ্ছ
আমেরিকাব ছেলেদের
দীর্ঘকায় বলবান সব যুবক
যারা প্রকৃতির শক্তি-ভাণ্ডার চুঁড়ে
সুখের সন্ধান দিতে পারত মানুষকে।
কার নামে আমাদের পাঠাচ্ছ জঙ্গলে,
ঢালু শস্যক্ষেত্রে, প্রতিরোধী জলাভূমিতে,
সেই সব গ্রামে ও শহরে যা আজ দুর্গ
যেখানে দিবারাত্রি পৃথিবী প্রকম্পিত
আর আকাশ আন্দোলিত
বীর যেখানে ছোট ছোট ছেলেরাও
যেখানে ভীমরুলের পাল যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত
যেখানে ফুল ও ফল রূপান্তরিত আয়ুধে।

"এমিলি, মামণি,
এখন অন্ধকার ঘনাচ্ছে
আজ রাতে আমি আর বাড়ি নিয়ে যেতে
পারব না তোমাকে

আগুন নিভে যাওয়ার পরে
তোমার মা এসে নিয়ে যাবেন তোমাকে
আমার হয়ে মাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে
চুমু দিতে পারবে তো ?

আর তাঁকে ব'ল—
দুঃখ করো না, বাবা খুশি মনে চলে গেছেন।"

ওয়াশিংটন,
আত্মার গোধূলি
বেঁচে ছিলে অথবা আজও বেঁচে আছ
আমার অন্তর এখন জ্বলছে উজ্জ্বলতম দীপ্তিতে
আমার জ্বলন্ত দেহের রূপান্তর হয়েছে
সত্যের মশালে॥

নরমান মরিসন একজন মহাপ্রাণ আমেরিকান কোয়েকার। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় যুদ্ধ ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। ঘটনাটি ঘটে কেন্দ্রীয় সমর-দপ্তর পেণ্টাগনের সামনে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তানকে। তাদের সবার ছোট কন্যা এমিলি।

বিদেশী মরিসন আজ অজেয় ভিয়েতনামের জাতীয় বীব। তাঁর ছবি ও ফোটোগ্রাফ ঘরে ঘরে, স্কুল-কলেজে, কলে কারখানায়—সর্বত্র সুশোভিত। ভিয়েতনামের রাস্তা তাঁর নামাঙ্কিত। কবিতাটি প্রতিটি ভিয়েতনামবাসীর মুখস্ত, পরমপ্রিয়। সুর আরোপিত হয়েছে কবিতাটিতে। লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরে প্রবল স্পন্দন জাগায় সেই সঙ্গীত। কবিতাটির রচয়িতা ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক।

অনুবাদক—চিত্তরঞ্জন পাল

চলো সাগরে

বিজন ভট্টাচার্য

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সঙ্গে সঙ্গে দ্রুলকি চালে ছোকরার ঢোলক ও মাদারির ডুগডুগি বেজে ওঠে। অন্ধকারেই মাদারির সওয়াল শোনা যায়]

মাদারি : ছোকরা !

ছোকরা : হাঁ।

মাদারি : হাড্ডিকা খেলা দেখায়া ?

ছোকরা : দেখায়া।

মাদারি : ঠিকসে দেখায়া ?

ছোকরা : দেখায়া।

মাদারি : ইমানদারিসে দেখায়া ?

ছোকরা : দেখায়া।

মাদারি : তো সচুঁ ফির খেল খতম ?

ছোকরা : নেহি জী, ঔর ভি এক খেল বাকি হ্যায়।

মাদারি : ইয়ে কোনসা খেল ?

ছোকরা : মজদুরকি সাথ মজদুরকে তগদির কি লড়াইমে মজদুরো কি যো হালত হোতি হ্যায়—উসিকি খেল।

মাদারি : তো ফরিয়াদি ঔর গুনেগারেঁকো সব হাজির করো।

[ঢোলকের বাজনা ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসে। মঞ্চে আলোক-সম্পাত হয়।

দেশী মদের দোকান-সংলগ্ন চত্বরে ভাগ ভাগ গোল হয়ে বসে মদ খাওয়া চলেছে। দূরে কোথাও কাওয়ালী গান হচ্ছে। তার সুর এখানে এসে পড়ছে। মগজে আমেজ এসেছে সবার]

: লে, পি লে। (মদ খায়)

: ইসসে লড়াইকা জমানা আচ্ছা থা চাচা। বোল, ঠিক কি নেহি? শালা দুটো পহার মুখ দেখা যেত। বেধে যায় আর-একটা লড়াই মা কালীর দয়ায়!

: নেহি তো ইয়ে মন্দীকা কুচভি ফয়সালা হোবে না চাচা। মজদুরেঁাকো পাকিটমে এক পয়সা ভি উশুল না হোগা।

: লে বে ডাল···মাল··· (মদ ঢালে)

নাগিনা : দেখতাহি তো! —ইউনিয়নকি বাত মঁ্যায় এয়স্তা শোচা চাচা, ঘর কি মুরগী দাল বরাবর।—লছমী পরিবারকি মাফিক উ সামলোগোকোঁ ভালাই চাহাতা হ্যায় চওবিশ ঘণ্টা, লেকিন এয়স্তা জরুরৎ হো তো কুচভি ফয়দা উশুল কিয়া যায় মজদুরেঁাকো এয়স্তা তাগত উস্কা হ্যায়ই নেহি। ইসলিয়ে কহতা কি চাচা, লড়াইকা জমানা আচ্ছা থা।

ইমরাত : বহৎ বহৎ দেশমে লড়াই হো রহা হ্যায়—ভিয়েতনাম, হংকং, সাইপ্রাস, আরব—সারি দুনিয়ামে লড়াই চলতা হ্যায়। ঔর দেখ লে হামারা দেশমে কুচভি লড়াই চলতা নেহি।

নাগিনা : ঔর লড়াই নেহি তো মুনাফা ভি নেহি—পয়সা বঢ়ানেকে লিয়ে মালিকলোঁগ কুচভি কৌসিস নেহি করেগা। —হঁ, ইয়ে বাত ঠিক কি লড়াই বহৎ বুরা হ্যায়। লেকিন ইয়ে ভি তো ঠিক হ্যায় কি বিনা লড়াইসে মজদুরেঁাকো এক পয়সা ভি উশুল না হোগা। হামলোগোঁকো ভালাইকে লিয়ে দুসরে তরিকা হ্যায়ই নেহি।

ইমরাত : ঠিক বাত।

সতীশ : লে বে ডাল।··· (শূন্য বোতল তুলে ধরে) ···আরে এ নাগিনা, এক বাটলি তু হি পি চুকা শালা! হামলোগোঁকো লিয়ে কুচ ভি না রাখ্যা?

নাগিনা : কেয়া পি চুকা! সরাব কা কুচ কমতি হ্যায় দুনিয়ামে? (ট্যাঁক থেকে এক তাড়া নোট বার করে) ইয়ে লে, দো বাটলি মোলালে—এক হামারা, দুসরি তেরা···

চাচা : এতনা মত পিও নাগিনা।

নাগিনা : আরে ছোড় চাচা —সরাব কে লিয়ে কুচ হিসাব না জোড়ো। আব দেখতা কি সরাবই হামারা দোস্ত হ্যায়। সরাব বিনা হামারা কৈ নেহি হ্যায়।

চাচা : উ তো ঠিক বাত, লেকিন পয়সা ? পয়সা হি তো···

নাগিনা : পয়সা চাচা হারাম হ্যায়।

সতীশ : এটা তুই ঠিক বলেছিস নাগিনা। মেয়েমানুষের চাইতেও বেইমান।

নাগিনা : ঠিক কি নেহি বোল ?

সতীশ : বিলকুল।

নাগিনা : কম কামালাম গয়া লড়াইকে টাইম মে। সব রুপিয়া শালা ডালা জমিনমে—দেশপর।

: অথুন তো শুনেছি ওখানে আকাল পড়ে গেছে—ক্ষেতিউতি সব জল গয়ি। ভুখা মরতে হ্যায় আদমীলোগ।

নাগিনা : তো আর কি বলছি—কমসে কম তিন হাজার রুপিয়া ডালা জমিনমে।—ছোটা ভাইটার নকরি হলো না তো কহল তু ঘরপেই বৈঠ র। জোতদার সে জমিন জমা লে কর আচ্ছাসে ক্ষেতি কর।—রুপিয়া যো লাগেগা সো মেরা। মাই বাপ বহুৎ খুশ হয়ে—আমার দিলটাও খুব শান্তি হলো কি ইয়ে শালা কারখানেকে কামকে কুচ গড়বড় হো তো বালবাচ্চা জরু লে কর দো ওয়াখত খানাকি কুছ পরেশানি না হোগি। আব দেখলে নসিব, তগদির কি মার, ক্ষেতিউতি সব জল গেয়ি খরামে। তালাও যেতনা থা, সব শুখ গয়া। বিনা দানা-পানি সে ভৈঁষা, গাই, বতখ, মুরগা, সব মরনে লাগা—পাখ-পাখেলি ভি আসমানসে পঙ্খ মোড়কে জমিনসে শুকি পাত্তিকে মাফিক গিরতে হুয়ে। ধরতি ঔর আসমানকে বীচসে শ্রিফ আগ—বয়লারকে আগকে মাফিক জল রহা হ্যায়।—মালুম হোতা কি আগলে দিনমে সমুচা সংসার জলকর খাক হো যায়েগা, রাখ বন যায়েগা, মহাশ্মশান।

চাচা : আরে তু ভি ভগবান শালা বেইমান হো মহাজনকে তরহা

তু ভি হামলোগোঁকো জানসে মার রহা হ্যায়।

: আরে চাচা উধর কিঁউ চিল্লাতে হো, ভগবান উধরি নেহি হ্যায়। আব তো শুনা কি কঁহা কৈ কৈ রাজভবনমে উনকা পাত্তা চলেগা।—ইস জমানেমে উয়ে সব কৈলাস ছোড়কর ধরতিকে সমূচা সোনাদানা কব্জা করকে ইঁহাই কাঁহা কোই পাঁচো ঘরানেমে বৈঠ গয়ে।

চাচা : হঁ হঁ, ইয়ে নয়া কিসসা ম্যঁয় ভি শুনাথা। মিসিরজীনে বাতায়া উসরোজ কারখানেমে। লেকিন নাগিনা, তু ঘাবড়াতা কিঁউ? জলতে হুয়ে আগ যাঁহা জলনে দো। তেরা যো কোই হ্যায় দেশপে তো আব ইঁহাই হ্যায়। খা-পিকে হিঁয়া আচ্ছাই হ্যায়!

নাগিনা : আচ্ছা নেহি জী, মুস্কিল বহৎ হ্যায়।—তবভি মানলিয়া কি সব কোই জিন্দা হ্যায়। মগর বাত ইয়ে হ্যায় কি চাচা, সব কোই কো জিন্দা রাখতে হুয়ে হামারি জিন্দগী বরবাদ হোনে লাগি।—না জানে কিস রোজ, কিস তরেসে কিসসে ম্যঁয় খতম হো যাঁউ।—ঔর নেহি তো ইয়ে ভি হো সকতা কি, ইয়ে মেরে দোনো হাত দেখতা না, আপনে গলেমে উঠকর শাঁস দাবাকর আপনাকো জান খতম কর দুঁ।

চাচা : লক আউট ঔর লে অফ কি টাইমমে দেখাকি আদমি লোগোঁকো খানাহি না মিলি। ঔর তেরি গিরস্তি নাগিনা দেখতাকি আচ্ছি তরা চলতি হ্যায়। রোটিকে উপর ঘিউ, ভাজি, লাড্ডু মৌজসে চলতা হ্যায়। কেয়া যাদু জানে তু, তুহি জানে।

যজ্ঞেশ্বর : যাদু নেহি চাচা, মৌতকা সওয়াল। মৌতকে সাথ পাঞ্জা লড় রহা হ্যায় নাগিনা, কমরেড নাগিনা মাহাতো।

নাগিনা : দিল্লাগী ছোড় যজ্ঞেশ্বর। বেকার বাত মত বোল। আলবাৎ কমরেড নাগিনা মাহাতো—সুখনলাল ভিকনলাল জুটমিলকা নাগিনা মাহাতো। গেটমিটিংপর একহিবার শ্লোগান পুকারুঁ কি হাজারো মজদুর ভাইয়োঁ সাথ সাথ আওয়াজ উঠাবেগা—ইনকিলাব···।—দালাল পার্টিকে হাজার রূপেয়া যো

খায়া, উ হাম জরুর ওয়াপাস করেঙ্গে। দালাল মজদুর ইউনিয়ন যেত নাহি শয়তানি করে না কিঁউ—

পণ্ডিত : আবে নাগিনা— ?

(দালাল পার্টির নেতা পণ্ডিত দলবলসহ অদূরেই অপেক্ষা করছিল। পণ্ডিতের হাঁকডাক শুনে সতর্ক হয়ে ওঠে নাগিনা। নাগিনা উঠে দাঁড়াতেই বিপক্ষ দল জোট বেঁধে এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়ায়।)

নাগিনা : কা বে, কেয়া কহনা চাহাতা ?

পণ্ডিত : যো হি তু হামলোগোঁকে সমঝানে চাহাতা।

নাগিনা : কেয়া সমঝানে চাহাতা ?

পণ্ডিত : সরাব কা লাথ শিরপে উঠ গিয়া, মু কা সওয়াল গাঁড় বরাবর—তুঝসে কেয়া বাত করু—যা ঘর যা। পিছে বাত করেগা।

নাগিনা : আবভি বাতা না বে মাদার কা বেটা।

পণ্ডিত : মারেগা এক ঝাপ্পড়, শালা বুদ্ধু কাঁহিকা। জবান ঠিক সে বাতা।

চাচা : আরে ছোড়ো জী হল্লা না মচাও—সারাবীকে সাথ কেয়া ফজুলকি বাত করতা ?

পণ্ডিতের সহচর : যা বে নাগিনা, ঘর চলা যা—তেরে ভালাই কে লিয়ে কহেরাহাহুঁ।

নাগিনা : ভালাই কে লিয়ে কহেরাহাহুঁ…

পণ্ডিতের সহচর : হ্যাঁ, ভালাই কে লিয়ে কহেরাহাহুঁ—ঘর চলা যা। পিছে সওয়াল হোগা।

চাচা : আ যা নাগিনা।

নাগিনা : এ চাচা !

চাচা : যো কুচ বাত পিছে হোগা। আব চল, ঘর চল।

নাগিনা : (চাচাকে) সোচতাকি কাঁহি কুচ গড়বড় কিয়া চাচা ?

চাচা : (নাগিনাকে) আব ছোড় না বে, বাত করতা বেকার। কহা পহেলি ঘর চল।

পণ্ডিত : চল চল।

নাগিনা : ছোড় দো মুঝে, মঁ্যায় বদলা লুংগা।

চাচা : আব ছোড় বদলা কি বাত। ঘর চল।

(চাচা নাগিনাকে টানতে টানতে বার করে নিয়ে যায়। বিপক্ষ দলও অন্ধকারে অন্তর্ধান করে।)

[সকাল বেলা। বস্তির ধারে উটকো চা-এর দোকান। লুঙ্গি পরা শ্রীহীন চা-ওলা চা ছাঁকছে। সামনে বাঁশের চ্যাচাড়ির বেঞ্চিতে বসে নাগিনা ও তার বন্ধু কিষ্টো ও শরৎ চা খাচ্ছে। এমন সময় পণ্ডিত আসে খড়ম খটখটিয়ে। নাগিনা বিব্রত বোধ করে। বন্ধু পালাবার পথ খোঁজে]

কিষ্টো : আমি শালা কেটে পড়ি।

নাগিনা : পণ্ডিত না বে?

কিষ্টো : শালা ইধরই আ রহা হ্যায়।

নাগিনা : আনে দো।

কিষ্টো : এসেই শালা টাকার কথা পাড়বে। আমি শালা খসে পড়ি।

নাগিনা : বোস না বে। টাকার কথা পাড়বে তো কি হয়েছে? আমরা শালা হাঁস না মুরগি বে যে চাইলেই আণ্ডার মত টাকা বিয়োব?

চা-ওলা : শালা একের নম্বর হারামী। পেত্যেকের কাছে দাদন দিয়ে রেখেছে।

শরৎ : উশুল করতে এলেই এবার গাদন।—নেই তো দেবে কোত্থেকে টাকা লোকে? আসছে শালা এইদিকেই।

নাগিনা : আসুক, চেপে বোস।

(চা-ওলা সবাইকে চা দেয়। পণ্ডিত এসে দাঁড়ায়)

চা-ওলা : আরে এই যে পণ্ডিতজী। এসো এসো, বসো। চা দেবো?

পণ্ডিত : নেহি নেহি, ঠিক হ্যায়।

চা-ওলা : সকাল বেলা, চা খাবে না? পেরথমেই তো দেখি বেচাল করছো।—পয়া না থাকে বাকিতেই খাও, তবু চা খাও—সকাল বেলা।

পণ্ডিত : বাকি করে পণ্ডিত কখনো চা খেয়েছে তোর দোকানের?

চা-ওলা : খাও নি, না হয় খেলেই একদিন চা।

পণ্ডিত : না, খাবে না। পণ্ডিত কখুনো বাকি খাবে না।

চা-ওলা : তা তোমার ট্যাঁকের জোর আছে, তুমি বলতে পারো এ-কথা।

পণ্ডিত : হুঁ, এই কথা। খেয়াল করবি।

চা-ওলা : খরিদ্দার না, কিছু না—তোমার পয়া থাকল-গেল, আমার ভারি বয়েই গেল।

পণ্ডিত : আর তোর দোকানের চা তো মুত্তি। পয়সা দিয়ে মুত্তি পিব?

চা-ওলা : আমার মুত না খাও, কোই দেশোয়ালী ভাইয়ের মুত খাও তো। যাও না, ঐ যে পেতলের কলসি ভরত্তি করে রাস্তার ধারে উনুনে চাপিয়ে বসে আছে—চার চার পয়া।

নাগিনা : চায়ে মে বহুৎ সা দুধ ডালা রে রামু, জারা সা লিকর ডাল।

চা-ওলা : (নাগিনাকে) তু কহতা হ্যায় দুধ, কোই কহতা হ্যায় মুত!

নাগিনা : যো যেইসা পিতা পিনে দো ভাই। (চা-ওলা লিকার ঢালে) —জারা সা—ব্যস ব্যস।

পণ্ডিত : পয়সে কা কেয়া খবর নাগিনা?

নাগিনা : বাজার বহুৎ মন্দী হ্যায় পণ্ডিতজী।

পণ্ডিত : উয়ো তো ঠিক বাত, লেকিন তেরে লিয়ে মালুম হোতা বাজার বহুৎ তেজ হ্যায়। শুনা কারখানেকা গেট পর আভি ভি তু ইনকিলাব পুকারতা—লক আউট তোড়নেকে লিয়ে হাজারো মজদুরোঁকি জমায়েতকি কোশিষ কর রহা হ্যায়?

নাগিনা : স্রিফ আওয়াজ হি উঠায়া যায়, ঔর কেয়া করু। রোটি-রোজি কে লিয়ে···

পণ্ডিত : লেকিন উও তো লাল ঝাণ্ডেকা সওয়াল?

নাগিনা : ঔর নেহি তো কেয়া?

পণ্ডিত : ব্যস তো হামারা রুপেয়া ওয়াপস কর দে।

নাগিনা : কিসকা রুপেয়া?

পণ্ডিত : হামারা রুপেয়া।

নাগিনা : য়্যাসা তো কুচ বাত নেহি থী। রুপেয়া যো ভি কুচ দিয়া মালিক ইউনিয়ন। ঔর সো ভি দিয়া থা মজদুরোঁকা ভলাইকে লিয়ে। উস্কে বাদ দেখা কি মু কি বাত একতরেকি, ঔর কাম যো বনতা হ্যায় উও বিলকুল বুরা।—মজদুরোঁকে

পসিনেসে সিরিফ মুনাফা লুঠ রহা হ্যায় মালিক।—সাড়ে চার আট পার্সেণ্ট যো বঢ়া দিয়া মালিক, উও ভি এক ধোঁকা। ডেভালাপমেণ্ট স্কীম ঔর কারখানেকে মাশিনোকি লিয়ে ক্রড়ো রুপেয়া যো ডালা কম্পানি, উও হি উস্কা সবুত। তো আব সোচা কি মালিক ইউনিয়ন কা সমুচা কাম, সমুচা রং ঢং বিলকুল ধোখাবাজী। মজদুরোঁকো জানসে খতম করনাহি তুমহারা দালাল ইউনিয়নকি মতলব। ইস লিয়ে—

পণ্ডিত : ঠিক হ্যায়, তেরা ধরম তেরে পাশ—জেয়াদা বাত করনেমে কুচভি ফয়সালা না হোগা মগর যো রুপেয়া লিয়া হামসে তু উও তো জরুর ওয়াপস কর দে।

নাগিনা : মানতা কি লিয়া থা রুপেয়া। মগর উও রুপেয়া কিসসে লিয়া থা ম্যঁায়—ইয়ে তো সোচ! ইউনিয়নসে লিয়া না?

পণ্ডিত : হামসে লিয়া থা তু।

নাগিনা : তুমসে-উসসে নেহি জী, রুপেয়া মিলা থা মালিক ইউনিয়নসে।

পণ্ডিত : আচ্ছা!

নাগিনা : তো এতনা রোজ কাম কিয়া, মদত দিয়া, উস্কে লিয়ে রুপেয়া যো কুচ লিয়া তো বরাবর হো গিয়া।

পণ্ডিত : ঝুটমুট ঝামেলা মত কর নাগিনা। মদত যো তু দিয়া হামারা ইউনিয়নকে লিয়ে, উও ভি ম্যঁায় আপনা আঁখসে দেখা। ভালা চাহা তো রুপেয়া ওয়াপস কর দে।

নাগিনা : ঔর যো কাম কিয়া, উস্কা উশুল ক্যায়সে হোগা?

পণ্ডিত : কাম কিয়া তো দুষমণ কি কাম—বৈঠে বৈঠে ইউনিয়ন তোড়া। খতম কিয়া মজদুরোঁকা জোট।

নাগিনা : মজদুরোঁকি ভালাই কে লিয়ে তুমহারা দালাল ইউনিয়ন খতম করনাহি আচ্ছা হ্যায়।

পণ্ডিত : ঠিক হ্যায়, তু রুপেয়া ওয়াপস কর।

নাগিনা : কহা তো বরাবর হো গিয়া।

পণ্ডিত : নেহি দেগা রুপেয়া?

নাগিনা : আরে চল বে, হট!

পণ্ডিত : আচ্ছা, তো সমঝ কর লে—দুসরি কোই তরিকাসে হাম উও

রুপেয়া জরুর উশুল কর লেগা।

নাগিনা : আরে যা বে—।

(চাচা ও নাগিনার দলবল নাগিনাকে টেনে নিয়ে চলে যায়)

চাচা : কহতা চল, ঘর চল। চল !

[পণ্ডিত হঠাৎ ট্যাঁক থেকে ছুরি বার করে। ফলাটা পেছন থেকে নাগিনার দলের দিকে তাক করে ধরে শ্বাপদ-সঞ্চারে অনুসরণ করে। এই সময় নেপথ্যের কাওয়ালী গান শ্রুতিগোচর হয়।

অন্য দিন। অন্যক্ষণ। রাত্রি। বস্তির কোথাও বিচ্ছিন্ন একটি সুন্দর কাওয়ালীর আসর জমেছে। লাল আলোয় দেখা যাচ্ছে জবরদস্ত এক কাওয়াল তারস্বরে কাওয়ালী গাইছে, আর তার সহকারী চেলারা তুন এসে পড়তেই দুহাতে করতালি টেনে ধুয়া টানছে। লাল আলোর বৃত্তের মাঝখানে জোড়া জোড়া হাত ঢুকছে, বেরুচ্ছে। আর সব অস্পষ্ট। আবছা আলোয় তবু একটা মানুষের জমায়েত-এর আভাষ পাওয়া যায়। জমাট বেঁধে আছে জনতা, কাওয়ালী গান শুনছে।

এই জনতার মাঝখানে নাগিনাকে একটা আলোর ফলায় দেখা যায়। সে তারিফ করছে মাথা দুলিয়ে আর মাঝে মাঝে হাত তুলে চেঁচিয়ে সমঝদারের অভিব্যক্তি জানাচ্ছে—আরে কেয়া কিয়া—কেয়া বাত কেয়া বাত—ছোরি মারিস রে—

দারুন জমেছে কাওয়ালী। এমন সময় ভিন্ন দিক থেকে পণ্ডিত তার দলবলসহ চুপিসারে এসে ঢোকে এবং একজন অনুচরকে দিয়ে ইঙ্গিতে নাগিনা মাহাতোর ওপর অতর্কিতে বোমা চার্জ করায়। থেমে যায় কাওয়াল। বিশৃঙ্খলার মাঝখানে কাওয়ালের মুখের ওপরকার আলোটা সরে গিয়ে নাগিনার মুখে পড়ে। ছটফট করছে নাগিনা। হঠাৎ মৃত্যু সমাসন্ন জেনে সে দাঁত চেপে জনতার সামনে শেষ জবানবন্দী দেয়]

নাগিনা : ম্যঁয় জান্তা থা কি একরোজ হুনকা বদলা খুন হামকো দেনাই

পড়েগা।···ভাঁইয়োঁ, আফশোষ মত করনা। মজদুর হো কর একরোজ মঁয় ভুল গিয়া থা মজদুর কা ধরম—বেচ দিয়া থা ইনসানিয়াৎ দুষমনকে পাশ। আজ দুষমন উসকা বদলা লিয়া।—মঁয় চলতা হুঁ। লেকিন মেরে লিয়ে কুচভি পিয়ার তেরা দিল মে রহে তো জরুর ইসকা বদলা লেনা। ইন কি···

[কথাটা শেষ করতে পারে না নাগিনা। মারা যায়। লাল আলোটা কাঁপতে কাঁপতে নাগিনার মুখে মিলিয়ে যায়। অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে মাদারির ঢোলক দুলকি চালে বেজে ওঠে]

মাদারি : ছোকরা ?

ছোকরা : হাঁ।

মাদারি : মজদুর নাগিনা মাহাতোকা খেল খতম হুয়া ?

ছোকরা : হুয়া।

মাদারি : কুল মিলাকর কিতনে খেল দিখায়া ?

ছোকরা : চার খেল দিখায়া।

মাদারি : ঔর কৈ খেল বাকি হ্যায় ?

ছোকরা : নেহি, ঔর কোই খেল নেহি হ্যায়।

মাদারি : তো সব কুচ সিমাট লেঙ্গে ?

ছোকরা : হঁ হঁ, সিমাট লো।

(অতঃপর মাদারি ও ছোকরা খেলার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দড়াদড়ি লাঠি-ঢোল-বাক্স-পেঁটরা সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে রওনা হতে যাবে এমন সময় নেপথ্য থেকে আওয়াজ ওঠে :)

১ম ঐকতান : হামলোগোঁকা কেয়া হোগা ?

২য় ঐকতান : হামলোঁগ কেয়া করেঙ্গে ?

৩য় ঐকতান : হামলোগোঁকা ইয়ে দুখ খতম ক্যায়সে হোগি ?

৪র্থ ঐকতান : দরদ কব মিটেগি ?

৫ম ঐকতান : ইয়ে অন্ধেরা রোশন কব হোগা ?

মাদারি : ইয়ে দুখ-দরদ কি ফয়সালা মঁয় কর নেহি পাউঙ্গা। ইসকো হল তুমি লোগোঁকো করনা পড়েগা। ইয়ে অন্ধেরা তুমি

লোগোঁকো তোড়না পড়েগা। এক কাঠটা হো কর আগেকা ভবিষ্য তুমি লোগোঁকো বনানা পড়েগা! ইন কিলাব।

ছোকরা : জিন্দাবাদ।

[জয়ধ্বনি দিতে দিতে মাদারিসহ ছোকরার প্রস্থান।

দুঃখের দরিয়ায় তুফান ওঠে এখন। ফরিয়াদি আর গুণেগার-এর দল নিজেদের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদে প্রমত্ত হয়ে ওঠে। সবার এক কথা—"দরদ কব মিটেগি?"

"ইয়ে অন্ধেরা রোশন কব হোগা?"

উত্তর পাওয়া যায় না।

অন্ধকারে হানাহানি মারামারি শুরু হয়। চীৎকার চেঁচামেচি। সমস্বর আর্তনাদ ফেনিয়ে ওঠে। আর মাঝে মাঝে আর্তকান্না পাক দেয় :

হামলোগোঁনে কেয়া করেঙ্গে?

হামলোগোঁকা কেয়া হোগা?

দরদ কব মিটেগি?

আর্তনাদ আর্তনাদেই শেষ হয়।

হঠাৎ প্রশ্ন ওঠে।

: কদম উঠাও।

: হাঁ, একসাথ কদম উঠাও।

: কদম উঠানা।

মার্ক টাইম-এর পদশব্দ ওঠে। বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। অতর্কিতে এ-ওকে আঘাত করে বসে। শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। চীৎকার, চেঁচামেচি। সমস্বর আর্তনাদ! আবার সেই বুকফাটা আর্তকণ্ঠ :

: দরদ কব মিটেগি?

: ইয়ে অন্ধেরা রোশন কব হোগা?

সমস্বর আর্তকণ্ঠ মিলিয়ে যেতেই আবার কদম ওঠে। দৃঢ় পদধ্বনি শোনা যায়।

বিশৃঙ্খল হতে হতে শৃঙ্খলা রক্ষা পেয়ে যায়। পায়ে পায়ে কদম ওঠে। আর থেকে থেকেই সাধু সাবধান :

: ঠিকসে বাঢ়ো !

: কদম বঢ়ানা !

: উঠাও কদম !

: জোর কদম !

: বাঢ় যা জওয়ান !

: কদম কদম !

ইতিমধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে সুর সংযোজন। কোনো সময় মনে হচ্ছে দূর থেকে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে উপকূলে। কোনো সময় সন সন হাওয়ার চাবুকে শিষ শোনা-যায়। আর শোনা যায় সংযত সংহত ছন্দোবদ্ধ একক পদধ্বনি। মাদারির গণ্ডী ভেঙে লক্ষ সওয়ার ঘোড়ার খুরে ছুটে চলেছে।

দুর্বার কদম। জনতার কদম। ঢেউ-এর মতো পাড় ভাঙছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার লক্ষ লক্ষ ফণায় ছুটে এসে পাড়ে এসে ভেঙে পড়ছে।

ধ্বনি তরঙ্গের একটি শীর্ষ : ইনকিলাব···

ঘোড়ার খুরে হাজার সওয়ার ছুটে চলে।]

সমাপ্ত

গত দোসরা শ্রাবণ মনস্বী কবি শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র বয়েস ষাট বছর পূর্ণ হলো। প্রথম যুগ থেকেই তিনি 'পরিচয়'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই জন্মদিন বারবার ফিরে আসুক, তিনি শতায়ু হোন ; তাঁর বিস্ময়কর সৃজনশীল প্রতিভা আজকের নতুন ও স্বপ্নসম্ভব সময়কে উপযুক্ত দায়িত্বের সঙ্গে অক্ষরের মালায় গাঁথুক—এই আমাদের প্রার্থনা। —সম্পাদক

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ঃ ভারতের রাজনীতিতে নতুন পদক্ষেপ

রণেন নাগ

১৯৪৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটি ঘোষণা করেছিল যে ভারতের মতো অনুন্নত অথচ দ্রুত-উন্নয়নকামী দেশের পক্ষে ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ঐ অভিপ্রায় ও লক্ষ্য ঘোষণার একুশ বছর পরে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৪টি সর্ববৃহৎ ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মানুসারে ব্যাংক-পুঁজি এবং শিল্প-পুঁজি একীভবনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সংঘটিত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা এভাবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির করায়ত্ত হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের বেকারী, ক্রয়ক্ষমতা-হ্রাস ও জীবনে অনিশ্চয়তা বেড়ে যায়। ফলে শিল্পবাণিজ্য এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংকটাপন্ন হয়। ব্যাংক শিল্পের মালিকানার প্রশ্ন এই কারণেই জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানে নীতিনির্দেশক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রনীতি এমন হবে যাতে আর্থিক ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত না হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র সর্বদা সেই লক্ষ্যসাধনে মনোযোগী থাকবে। আমরা জানি, গত একুশ বছর ধরে সংবিধানের এই ঘোষিত লক্ষ্য অবহেলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার মৌখিক সদুদ্দেশ্য দেখালেও কার্যত ব্যাংক শিল্পের মালিকানা এখন ভারতের কুড়িটা একচেটিয়া মালিক-পুঁজিপতি পরিবারেরই করায়ত্ত। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মালিকানায় ব্যাংকগুলি যেভাবে কয়েকটা মাত্র পরিবারের হাতে পুঁজি-মালিকানা কেন্দ্রীভূত করেছে, ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া-জৈন, সিংহানিয়া, খাটাউ-মফাতলাল, থাপার, রামকৃষ্ণ, শেষায়ী প্রভৃতি প্রত্যেকটি একচেটিয়া পুঁজি-মালিক নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকের সাহায্যে সাধারণের সঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পুঁজিকে করায়ত্ত করে নিজেদের শিল্পসাম্রাজ্য প্রসারিত করেছে এবং প্রণালী-বদ্ধভাবে সারা দেশের আর্থিক ক্ষমতা, বিনিয়োগ ও বাজার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছে।

পুঁজিবাদী বিকাশের এই-ই নিয়ম, এটাই ক্রমপর্যায় ও ধারা।

একুশ বছর আগে কংগ্রেস দল যখন দেশের শাসনভার হাতে পেয়ে ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটির শ্রুতিমধুর সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করছিল, ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠী তখনও আজকের মতো তিমিঙ্গিল একচেটিয়া পুঁজির মালিকে পরিণত হয়নি। তখনও তাদের বিনিয়োগ ও পুঁজি-সঞ্চয়ের গতিবেগ এত তীব্র হয়নি। কিন্তু কংগ্রেস দল শাসকদলে পরিণত হয়ে পুঁজিবাদী বিকাশের যে-ভ্রান্তপথ গ্রহণ করল, ভারতের মতো নিম্নস্তরের আর্থিক বিন্যাস-ব্যবস্থায় তার ফলস্বরূপ অপরিহার্যভাবেই আর্থিক ক্ষমতা ক্রমশ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল। কংগ্রেস দলের ঘোষিত নীতি যাই হোক না কেন, ঐ নীতির বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী শক্তির প্রভাবে ঘোষিত সংকল্প নির্বীর্য নিষ্ক্রিয়তায় পর্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। একুশ বছর আগে পরিকল্পনাভিত্তিক জাতীয় অর্থনীতি সংগঠিত করার সময়ে দেশের ব্যাংকগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে আজ হয়তো দেশের আর্থিক উন্নয়ন দ্রুতহারে অগ্রসর হতে পারত এবং সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের এমন বিসদৃশ সামাজিক অবস্থান দেখা যেত না। কারণ, দেশের আর্থিক কাঠামোতে ঋণ ও অর্থ সরবরাহের গোটা ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকলে দেশের প্রয়োজন অনুসারেই অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে সংগতিবণ্টন সম্ভব হত এবং এর ফলে পুঁজিবাদী নিয়মে অসম-বিকাশের বিপজ্জনক অবস্থায় দেশকে পড়তে হত না।

আজ একুশ বছর পরে দেশকে গুরুতর সংকটের কিনারায় এনে ফেলে ১৪টি ব্যাংকের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পদক্ষেপ কতটা ফলপ্রসূ হবে, অথবা এই প্রয়াসআদৌ জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সক্ষম হবে কিনা কিংবা এল,-আই,-সির মতো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিও একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের 'ঝুঁকি বাদ দিয়ে মুনাফা' করার নিশ্চিত সম্ভাবনা এনে দেবে কিনা—তা সতর্কভাবে পরীক্ষা করা নিশ্চয় প্রয়োজন।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনাকালে মূলধনী ব্যয়, সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যয়, সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যয় বিপুলভাবে বেড়েছে। এর ফলে মোট চাহিদা বেড়েছে এবং টাকার অংকে আয় বেড়েছে। বহুবিধ কারণে এই বর্ধিত

আয়ের একটা বিপুল অংশ মুনাফার আকারে শ্রমজীবী জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে এবং জাতীয় আয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারায় মুনাফা ও মজুরির মধ্যে এই বৈষম্য একদিকে অসংগত বিপুল মুনাফা ও বিসদৃশ ভোগ, অন্যদিকে বিপুল দারিদ্র্য ও সংকুচিত ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি করেছে। অধিকাংশ জনগণের নিম্নতম চাহিদা পূরণেরও অক্ষমতা শিল্প-উৎপাদনে ক্ষমতার প্রয়োগকে অসম্ভব করে তুলেছে। অর্থাৎ এককথায় জাতীয় আর্থিক অগ্রগতির সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করেছে।

এই অসম-বিকাশের ফলে পুঁজির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, জনগণের আর্থিক বিকাশ রুদ্ধ হয়েছে এবং জাতীয় আর্থিক বিকাশ রুদ্ধগতি নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদি আজকের যুগ সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ না-হয়ে সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশের যুগ হত, তাহলে হয়তো ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতির গোষ্ঠী এই তীব্র সংকটের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অন্যদেশে বাজার দখল করার উদ্যোগ গ্রহণ করত। মনে রাখতে হবে যে, আজকের যুগে ঐ ধরনে সম্প্রসারণশীলতার পথ গ্রহণ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। একদিকে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অবস্থান, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শিবিরের তীব্র পর্যায়ের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, এই সম্প্রসারণশীলতার পথে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনাকে সুদূরপরাহত করে তুলেছে।

তাই ভারতের শাসকশ্রেণীকে নানাধরনের কৌশল অবলম্বন করে নিজের শ্রেণী অবস্থানকে রক্ষা করার প্রয়াসে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে।

আমলাতান্ত্রিক ধরনে রাষ্ট্রায়ত্ত করা এই কৌশলগুলিরই অন্যতম। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ওপরে নির্ভরশীল আমলাতন্ত্রের হাতে আর্থিক সংগতি বণ্টনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকলে 'ঝুঁকিবিহীন একচেটিয়া মুনাফা' লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয় বলে ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে আর্থিক সংগতির অর্থাৎ লগ্নির সুযোগ সব চাইতে বেশি পাবে বলে মনে করতে পারে। বিশেষ করে যেসব পুঁজিপতি সরাসরি ব্যাংক মালিক নয় অথবা যে শিল্প-পুঁজির মালিকশ্রেণী আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয়-করণের ফলে দ্রুতগতিতে পুঁজি বাড়াতে পেরেছে—তাদের ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে লাভই হয়।

ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রচণ্ড বিরোধী হলো একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজির

সেই অংশ যারা শিল্পোৎপাদন, উৎপাদন-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, প্রচার-অভিযান প্রভৃতি আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদনের উন্নত নিদর্শনগুলিকে উপেক্ষা করে প্রধানত সামন্তশ্রেণী ও বিদেশী পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, পণ্যোৎপাদন-ক্ষমতাকে অলস রেখে, পণ্য ও উপকরণের ফাটকাবাজীকে পুঁজি সঞ্চয়ের বৃহত্তম পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। পুঁজিবাদী কাঠামোর এই অংশ আজ সমগ্র সামাজিক প্রয়োজনের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ জনগণের ব্যাপক অংশের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

মহান লেনিন বলেছেন "...কিন্তু যদি আমরা একচেটিয়া পুঁজির প্রসাবে ব্যাংকগুলিব ভূমিকা পর্যালোচনা না-করি, তাহলে আধুনিক একচেটিয়া পুঁজির আসল ক্ষমতা এবং প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ ও অত্যন্ত নিচু স্তরে থেকে যাবে।" [সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদী বিকাশের সর্বোচ্চ স্তব, রুশ সংস্করণ পৃঃ ২৭, অনুবাদ লেখকের]

তিনি বলেছেন "ব্যাংকের প্রধান ও প্রাথমিক কাজ হচ্চে লেনদেনের কাজে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ। এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তারা অকেজো আর্থিক পুঁজিকে কার্যকরী অর্থাৎ মুনাফা-উৎপাদনকারী পুঁজিতে পরিণত করে। তারা সবরকমের আর্থিক আয়কে সংগ্রহ করে পুঁজির মালিক-শ্রেণীর ব্যবহারে নিয়োগ করে।

"ব্যাংক শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের হাতে ঐ পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর ফলে 'সাধারণ মধ্যস্থের' ভূমিকা ছেড়ে ব্যাংক-গুলি শক্তিশালী একচেটিয়া পুঁজির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাদের হাতে সমস্ত পুঁজির মালিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের আর্থিক পুঁজি, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের বৃহত্তম অংশ এবং বিশেষ কোনো দেশের অথবা কয়েকটি দেশের কাঁচামালের উৎস করায়ত্ত হয়। বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'মধ্যস্থ'র বদলে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাবের ফলে পুঁজিবাদের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধারণের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদন দেখা দেয়। এই কারণেই আমাদের ব্যাংকশিল্পের কেন্দ্রীভবনতা সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই বিশ্লেষণ করতে হবে।" [ঐ পৃঃ ২৮, অনুবাদ লেখকের]

লেনিন পুঁজিবাদী বিকাশের এই পর্যায়কে বিশ্লেষণ করে বলেছেন "আমরা দেখতে পাই যে দেশের সমস্ত এলাকা জুড়ে সমস্ত পুঁজি সমস্ত আয়কে কেন্দ্রীভূত করে, সারাদেশে ছড়ানো হাজার হাজার ছোট ছোট শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করে এই প্রক্রিয়ার বহুবিস্তৃত জাল দ্রুতবেগে বেড়ে চলে

এবং সমগ্রদেশে একটি জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও তারপর একটি বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তোলে।" [ঐ পৃঃ ৩১, অনুবাদ লেখকের]

ব্যাংকগুলির এইভাবে "বিচ্ছিন্ন বহু পুঁজিবাদীকে একত্রবদ্ধ একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিণত" করার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লেনিন বলেছেন "কয়েকটি পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের চলতি হিসাব পরিচালনা করার সময় ব্যাংক যে ভূমিকা নেয়, সেটা হলো বিশেষজ্ঞের ভূমিকা এবং সম্পূর্ণ সহায়ক কাজ! কিন্তু যখন ব্যাংকগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজি-মালিকের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে—তখন তারা সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজের গোটা কাঠামোটিকে, সমস্ত বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের প্রক্রিয়াকে, তাদের কয়েকজনের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে। কারণ এই ব্যাংক মালিকেরা ব্যাংক পরিচালনা করতে গিয়ে চলতি হিসাব তাদের হাতে থাকার দরুণ এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগে প্রথমত বিভিন্ন পুঁজি-মালিকের আর্থিক অবস্থা **সঠিকভাবে বুঝতে পারে,** তারপর তাদের **নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,** ঋণদানের নিয়মগুলির কঠোর অথবা শিথিল করে, ঋণের সুযোগসুবিধা দিয়ে বা তা প্রত্যাহার করে তাদের প্রভাবিত করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত **সম্পুর্ণভাবে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ** করতে সক্ষম হয়, তাদের আয় নির্ধারণ করে দিতে পারে, তাদের পুঁজি কেড়ে নিতে পারে অথবা দ্রুত হারে তাদের পুঁজি বৃদ্ধির ও বিপুল সম্প্রসারণের সুযোগ দিতে পারে।" [ঐ পৃঃ ৩২, অনুবাদ লেখকের, বড় হরফ মূল বইয়ের]

লেনিন আরো পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন, "ব্যাংকের বড় বড় চাঁইয়েরা ভয়ের ভান করে ভাব দেখান যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যেন অচিন্তিত সূত্র থেকে তাঁদের সব ক্ষমতা কেড়ে নেবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই ভয়ের ভান আসলে একই প্রতিষ্ঠানের দুইটি বিভাগের ম্যানেজারদের রেষারেষির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ একদিকে সেভিংস ব্যাংকে সঞ্চিত পুঁজি শেষ বিচারে **এই সমস্ত ব্যাংকের চাঁইয়েরাই** নিয়ন্ত্রণ করেন এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মালিকানা আসলে কোনো শিল্পে পুঁজির মালিকেরা যখন প্রায় দেউলিয়া হতে চলেছে তখন তাদের আয় বৃদ্ধি করার ও তাদের পুঁজিবাদী আয়কে সুনিশ্চিত করার একটি গ্যারান্টি মাত্র।" [ঐ পৃঃ ৩৫-৩৬, অনুবাদ লেখকের]

ব্যাংক, শিল্প ও পুঁজিবাদী সমাজ এবং সরকারের যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে লেনিন বলেছেন "ব্যাংক ও শিল্প-মালিকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ, তাদের উভয়ের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ দিয়ে সংরক্ষিত। সাইদেল বলেছেন, "সম্মানিত ব্যক্তিগণকেও—ভূতপূর্ব সিভিলিয়ানদের মতো যাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সুবিধা (!?) করে দিতে পারেন এমন লোকেদের—প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালকমণ্ডলীতে নিযুক্ত করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ···সাধারণত কোনো বৃহৎ ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীতে পার্লামেন্টের কোনো সদস্য অথবা বার্লিন শহরের কোনো পৌরপিতাকে দেখতে পাওয়া যায়"। [ঐ পৃঃ ৩৯, অনুবাদ লেখকের]

আমাদের দেশে সমস্ত রাষ্ট্রীয়করণের অভিজ্ঞতা থেকে লেনিনের উপরোক্ত উক্তিগুলির যথার্থতা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

যে ১৪টি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে, তাদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে দেশের বৃহত্তম কুড়িটি একচেটিয়াগোষ্ঠী প্রধানত এই বৃহদায়তন ব্যাংকগুলির মালিক অথবা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারী। এই ব্যাংকগুলি আমাদের দেশে যে-পরিমাণ আর্থিক সংগতি নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিমাণ দেশের সমগ্র আর্থিক আমানতের ৮৫ শতাংশ। অথচ এদের নিজেদের লগ্নি জনসাধারণের আমানতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ মাত্র। নিচের সারণীতে এর চিত্র পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাবে।

১৯৬৮ সালের ৩১-এ মার্চ এই ১৪টি ব্যাংক ও স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপ :

সারণী-১ (কোটি টাকার অংকে)

ব্যাংক	মোট আমানত	মোট আগাম দাদন	নিজস্ব ফাণ্ড	নীট মুনাফা
১	২	৩	৪	৫
সেণ্ট্রাল ব্যাংক	৪৩৩·২৭	২৯৬·২০	১১·৮৮	১·১৯
ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	৩৯৪·৯৭	২৫৩·০৫	১০·৪৯	১·৫০
পাঞ্জাব নেশনেল	৩৫৫·৯৬	২০৯·৪০	৬·৮৩	·৭৫
ব্যাংক অব বরোদা	৩১৩·৮০	১৯৬·১৪	৫·৬৬	০·৬৩
ইউঃ কমার্শিয়েল	২৪০·৫৮	১৪৪·০০	৬·৯৭	০·৫৫
কানাড়া ব্যাংক	১৪৬·৪৪	৯৬·৭২	৩·২১	০·১৯
ইউনাইটেড ব্যাংক	১৪৩·৮৯	৯৯·৬১	৪·০৪	০·২৬
দেনা ব্যাংক	১২১·৮৮	৭৪·০৮	২·৯৩	০·৩১

ইউনিয়ন ব্যাংক	১১৫.২২	৬৮.৬৩	২.৫৬	০.২২
এলাহাবাদ ব্যাংক	১১২.৭২	৬৯.৯৩	২.৫৪	০.২০
সিণ্ডিকেট ব্যাংক	১১২.১৯	৭০.৬১	২.৬৬	০.৩১
ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ	৯৩.২২	৫৮.২২	২.১৫	০.১৫
ইণ্ডিয়ান ব্যাংক	৮৪.৫৯	৫৭.১৬	২.০৬	০.১৩
ব্যাংক অব মহারাষ্ট্র	৭৩.০২	৪৯.৭৪	২.০২	০.২৪
১৪টি ব্যাংক মিলে	২৭৪১.৭৬	১৭৪৩.৬৬	৬৩.০২	৬.৬৪
স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	১০৭৮.২৫	৭৫৭.৩৭	×	×

এই চৌদ্দটি ব্যাংকের মালিকেরা কত টাকা লগ্নি করেছে? তাদের লগ্নি-পুঁজির তুলনায় ব্যবসায়ে মোট লগ্নি কি বিপুল তা লক্ষ্য করলে ব্যক্তিগত ব্যাংক মালিকের হাতে সারা দেশের নানা স্তরের মানুষের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করার কি বিরাট সুযোগসুবিধা এই ব্যাংক মালিকেরা ভোগ করত সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে এবং এই সুযোগসুবিধার তুলনায় তাদের ঝুঁকি কত সামান্য তাও বুঝতে কষ্ট হবে না।

সারণী-২

ব্যাংক	আদায়ীকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)
সেণ্ট্রাল ব্যাংক	৪.৭৫
ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া	৪.০৫
পাঞ্জাব নেশনেল	২.০০
ব্যাংক অব বরোদা	২.৫০
ইউনাইটেড কমার্শিয়েল	২.৮০
কানাড়া ব্যাংক	১.৫০
ইউনাইটেড ব্যাংক	২.৬৯
দেনা ব্যাংক	১.২৫
ইউনিয়ন ব্যাংক	১.২৫
এলাহাবাদ ব্যাংক	১.০৫
সিণ্ডিকেট ব্যাংক	১.২৯
ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাংক	১.০০

ইণ্ডিয়ান ব্যাংক		০·৮৯
ব্যাংক অব মহারাষ্ট্র		১·৪৮
১৪টি ব্যাংকের	মোট	২৮·৫০
স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া		৫·০৩

[৩১.১২.৬৮]

অর্থাৎ ১৪টি সর্ববৃহৎ ব্যাংক (যাদের মালিকানা মোট ২০টি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ১৮৮টি ব্যক্তির পরিচালনাধীন) মোট ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লগ্নির ঝুঁকি নিয়ে বছরের নীট মুনাফা করেছে ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বা ২৫ শতাংশের সামান্য কিছু কম। এই নীট মুনাফার অংশটিও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিপুল পারিশ্রমিক (?), গোপন আয়ের উৎস বিসদৃশ খরচের বহর ধরলে নীট মুনাফা আরো অনেক বেশি দাঁড়ায়। অথচ এই সামান্য অর্থ লগ্নি করে এঁরা দেশের মোট আমানতের ৭২ শতাংশ (স্টেট ব্যাংককে ধরলে ৮৫ শতাংশ) নিয়ন্ত্রণ করে। সর্ববৃহৎ পাঁচটি ব্যাংক আবার এই মোট আমানতের সিংহভাগ অধিকার করে আছে।

এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাংকগুলি লেনিনের উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে "সমস্ত পুঁজির মালিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীর আর্থিক পুঁজি, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের বৃহত্তম অংশ এবং বিশেষ কোনো দেশের অথবা কয়েকটি দেশের কাঁচামালের উৎস" করায়ত্ত করেছে। এবং "এই ব্যাংক মালিকেরা ব্যাংক পরিচালনা করতে গিয়ে চলতি হিসাব তাদের হাতে থাকার দরুণ, এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগে, প্রথমত বিভিন্ন পুঁজি-মালিকের **আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে বুঝতে পারে,** তারপর তাদের **নিয়ন্ত্রণ করতে পারে,** ঋণদানের নিয়মগুলিকে কঠোর অথবা শিথিল করে, ঋণের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বা তা প্রত্যাহার করে, তাদের প্রভাবিত করতে পারে এবং শেষ-পর্যন্ত **সম্পূর্ণভাবে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে** সক্ষম হয়, তাদের আয় নির্ধারণ করে দিতে পারে, তাদের পুঁজি কেড়ে নিতে পারে অথবা দ্রুত হারে তাদের পুঁজি বৃদ্ধির ও বিপুল সম্প্রসারণের সুযোগ দিতে পারে।"

১৪টি ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে একচেটিয়া পুঁজির মালিকগোষ্ঠীর মধ্যে যে-কোলাহল উঠেছে—তার কতটা কৃত্রিম এবং কতটা খাঁটি তা উপলব্ধি করতে হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির অন্যতম মালিক শ্রী বি-কে-দত্ত মহাশয়ের (ইউনাইটেড ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর) বিবৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তিনি বলেছেন "ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অর্ডিন্যান্সটি অপ্রত্যাশিত নয় বরং চলতি অবস্থাকে প্রণালীবদ্ধ আকার দেবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র⋯শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানিবৃদ্ধির কাজে এই পদক্ষেপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না-করে বরং অধিকতর সুযোগসুবিধা সৃষ্টি করবে।" [হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ২৬এ জুলাই]

এখানে আবার লেনিনের উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়: "ব্যাংকের বড় বড় চাঁইয়েরা ভয়ের ভান করে এমন ভাব দেখান যে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যেন অচিন্তিত সূত্র থেকে তাদের সব ক্ষমতা কেড়ে নেবে। বলা নিষ্প্রয়োজন এই ভয়ের ভান আসলে একই প্রতিষ্ঠানের দুইটি বিভাগের ম্যানেজারদের রেষারেষির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়"। (এই প্রবন্ধের আগের অংশ দ্রষ্টব্য]

ব্যাংকগুলির চাঁইয়েরা এবং তাদের মুখপাত্র মিনু মাসানি (স্বতন্ত্র দলের নেতা ও এম. পি.) এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী (জনসংঘ সভাপতি ও এম. পি.) প্রভৃতি রব উঠিয়েছেন যে ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা অত্যন্ত অসংগত হয়েছে। দোষ-ত্রুটি সামান্য যা রয়েছে তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পূর্বগৃহীত নীতি প্রয়োগ করেই দূর করা সম্ভব ছিল।

একথা বোঝা দরকার যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানত রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। গত একশ বছর ধরে সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার উপরে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। কিন্তু তার ফলে পুঁজির কেন্দ্রীভবনতা এবং ব্যাংক ও শিল্পের একীভূত সমাজস্বার্থবিরোধী ভূমিকা বন্ধ হয়নি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিকল্প হতে পারে না।

স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলতে বাধ্য হয়েছেন "নতুন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নীতি কার্যকরী হওয়া সত্ত্বেও এবং নির্দেশানুযায়ী ব্যাংকগুলির আগেকার পরিচালকমণ্ডলী পুনর্গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকের পরিচালক-মণ্ডলীতে আগেকার শিল্পপতি চেয়ারম্যান ডিরেক্টর হিসাবে রয়ে গেছেন এবং নতুন চেয়ারম্যান তাঁরই অধীনস্থ পূর্বতন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন বলে এখনও তিনি ব্যাংকের কার্যকলাপের উপরে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন!" [এ. আই. সি. সির সাম্প্রতিক বাঙ্গালোর অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক নোটস]

জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে ব্যাংকের ভূমিকার অপরিসীম গুরুত্ব, কিন্তু তার অসংগত প্রয়োগ মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর স্বয়ং

স্বীকার করেছেন "ভারতীয় ব্যাংকব্যবস্থার একটি সাংগঠনিক উপাদান হচ্ছে আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে লগ্নিপুঁজির তুলনায় এই ক্ষমতা অত্যন্ত বিসদৃশ রকম বেশি। সময় সময় এমন সব ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে যে কোনো কোনো পরিবার অথবা গোষ্ঠী ব্যাংকের পরিচালনায় এমন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী যে তাদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্যে আমাদের হিসাব পরীক্ষা বিভাগকে বড় রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে।"

জাতীয় অর্থনীতি যখন কৃষিউৎপাদন-লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারে উন্মুখ—তখন আর্থিক সংগতিকে অনুৎপাদনশীল ক্রিয়াকলাপে, ফাটকা-বাজীও বাণিজ্যের সন্দেহজনক কার্যে, কালোবাজারী প্রভৃতি অবৈধ অসঙ্গত কার্যকলাপের বিপথে পরিচালনা করার অভিযোগ যাদের বিপক্ষে প্রমাণিত; দেশের কষ্টার্জিত বিদেশী মুদ্রা জাল ইনভয়েসের মাধ্যমে স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যাংকের সহায়তায় যারা বিদেশে পাচার করে অমার্জনীয় অসামাজিক অপরাধ করে—তাদের হাতে নিশ্চয়ই দেশের সমগ্র আর্থিক সংগতিকে তুলে দেওয়া যায় না।

বেসরকারী ব্যাংকগুলি তাদের মোট আগাম দাদনের পরিমাণ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক রিপোর্টে (১৯৬৮ সালের) তার যে-সন্দেহজনক চিত্র ফুটে উঠেছে—তা লক্ষ্য করলেই জাতীয় স্বার্থবিরোধী অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে রত এইসব একচেটিয়া পুঁজিপতি মালিকশ্রেণীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।

রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে ১৯৬৭ সালের ৩১এ মার্চ পর্যন্ত বেসরকারী শিডিউল্ড ব্যাংকগুলি মোট আগাম দাদনের মধ্যে (১) ১৭৪৭.৯৫ কোটি টাকা শিল্পে (২) ৫২৫.৫২ কোটি টাকা বাণিজ্য-ব্যবসায়ে (৩) ৯৬.৬৬ কোটি টাকা লগ্নি বাবদে [শেয়ার ও অন্যান্য লগ্নি বাবদ] (৪) ১১৪.৫০ কোটি ব্যক্তিগত জামীনে (৫) অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে ১৭৪.৯৭ কোটি টাকা এবং (৬) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিউৎপাদনে মাত্র ৫৬.৬৮ কোটি টাকা লগ্নি করেছে। ৬নং খাতে কৃষিউৎপাদনে বলতে দেশী-বিদেশী মালিকানাধীন চা, কফি, রবার, কাজুবাদাম প্রভৃতি বাগিচা-শিল্পকেও ধরা হয়েছে। অর্থাৎ আসল সমস্যা খাদ্য ও কৃষিজাত কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যাংক অতি সামান্য অবশিষ্টটুকুই লগ্নি করেছে। [সূত্র: স্টেটসম্যান, ২৭এ জুলাই ১৯৬৯]

শতকরা হিসাবে তুলনা করলে দেখা যায় যে কৃষি বাবদ বেসরকারী

শিডিউল্ড ব্যাংকগুলির লগ্নি ১৯৫১ সালে মোট লগ্নির ২.২ শতাংশ, ১৯৬১ সালে ০.৭ শতাংশ এবং ১৯৬৫ সালে মাত্র ০.২ শতাংশে নেমে এসেছে; অন্যদিকে শিল্পে লগ্নির পরিমাণ ১৯৫১ সালে ৩৫.৫ শতাংশ থেকে ১৯৬৫ সালে ৬১.৫ শতাংশে উঠে গিয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে বে-সরকারী মালিকানায় ব্যাংকগুলি দেশের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনের বিরুদ্ধে অসঙ্গত মুনাফালাভের পথে পরিচালিত হয়েছে। [রিজার্ভ ব্যাংক রিপোর্ট ১৯৫১, ১৯৬১ ১৯৬৫, ১৯৬৭ ও ১৯৬৮]

সুতরাং ভারতের রুদ্ধগতি কৃষি ও শিল্পকে পুনরায় সচল করে তুলতে হলে আর্থিক সংগতির ও সংগতি নিয়োগের প্রধান উপায় ব্যাংকব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ব্যবস্থা থেকে বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাংকগুলিকে বাদ দেওয়ায় ব্যাংকব্যবস্থার উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে আসেনি। শতকরা হিসাবে বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাংকগুলির মোট আমানত সমগ্র আমানতের মাত্র ১০ শতাংশ হলেও মোট পরিমাণে তা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সারা দেশের মোট ব্যাংক-আমানতের প্রায় সমান। তাই এর গুরুত্ব অবহেলা করা যায় না। অন্যদিকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় অংশ এইসব বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাংকগুলির করায়ত্ত থাকায়, বিদেশী মুদ্রার অবৈধ পাচারের সম্ভাবনা থেকেই যায়। সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে পি. এল. ৪৮০ বাবদ ভারতে জমা মার্কিনী টাকার এক বিপুল অংশ (১৯৬৭ সালে ৩৫ কোটি টাকা) এই সব বিদেশী ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফলে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ও অদৃশ্য (invisible) লেনদেনের বাবদ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অনেকাংশে জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

সদ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির মোট আমানতের সবটাই এখনই যে সরকারের হাতে আসবে তা নয়। কারণ ব্যাংকগুলি ইতিমধ্যেই যে-পরিমাণ অর্থ দাদন দিয়েছে, তা দীর্ঘকালীন মেয়াদে আবদ্ধ। এবং পরীক্ষার ফলে যেসব অবাঞ্ছিত বিনিয়োগের নজির ধরা পড়বে, তা আদায় করতেও সময় লাগবে। সুতরাং পরিকল্পনা বাবদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বরাদ্দ অবিলম্বে বাৎসরিক আমানত বৃদ্ধির হার ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি টাকার বেশি বেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকব্যবস্থার পরিচালনায় কাদের

নিযুক্ত করা হবে। যদি সরকার এবং ব্যাংক ও শিল্পের মালিকদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী আমলাতন্ত্র অথবা তথাকথিত সম্মানিত ব্যক্তিদের পরিচালনায় কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত করার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আমাদের মনে হয় ব্যাংক ও শিল্পকর্মীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদ এবং প্রগতিশীল জনপ্রতিনিধিদের ব্যাংক পরিচালনার কাজে নিযুক্ত করা সমধিক প্রয়োজন। অন্যথায় শিল্প ও ব্যাংক মালিকদের প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালনার কাজ চালাতে গেলে ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সামাজিক সদুদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

তাছাড়া ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে যে-অতিরিক্ত সংগতি পাওয়া যাবে, পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে তার সুসম বণ্টন এবং বিনিয়োগের জন্য সমগ্র আর্থিক ও রাজস্ব সংগতিকে একীভূত করা প্রয়োজন।

এটা সম্ভব হতে পারে যদি প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি করে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক স্থাপন করে সমগ্র রিজার্ভ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো যায়। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক এবং বিভিন্ন রাজ্যের স্টেটব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হলে আর্থিক সংগতি সংগ্রহ দ্রুতহারে বেড়ে যাবে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের বর্তমান বিরোধের একটা প্রধান কারণ দূরীভূত হবে। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-নীতির কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারণ এবং রাজ্যগুলির নিজস্ব প্রয়োজন ও নীতি অনুসারে তা বিনিয়োগ করলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ অন্তর্হিত হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি প্রকৃতই ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার পূর্ণ সুফল জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে চান, তাহলে তাঁকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, বিদেশী বিনিময় ব্যাংক, কিছু কিছু দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। দেশের আর্থিক অগ্রগতির রুদ্ধ ধারাকে খুলে দিতে হলে এখানে থেমে গেলেই চলবে না। ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে দেশে যে-সমর্থন তিনি পেয়েছেন, অন্য জরুরি পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করলে সেই সমর্থন বৃদ্ধি পাবে, অন্যথায় অল্পদিনের মধ্যেই ভুয়া রাষ্ট্রীয়করণের রঙ-মাটি ধুয়ে কাঠামোর খড়কাঠ বেরিয়ে পড়বে। কারণ অর্থনৈতিক সংকট আজ রাজনৈতিক সংকটের পর্যায়ে উত্তরণ করেছে।

পুস্তক-পরিচয়

ভিয়েতনামের স্পন্দন। নাম কাও। ফরাসী থেকে অনুবাদ : অবন্তীকুমার সান্যাল। কথাশিল্প : ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

ভিয়েতনামের সংগ্রাম ইতিহাসের চিরকালের সামগ্রী হয়ে থাকবে। তার অকুতোভয় মানুষ, স্বাধীনতার রক্ষী মৃত্যুঞ্জয় নওজোয়ান, তার দুঃখ-বেদনা, গৌরব-আনন্দ সবকিছু আগামীদিনের মানুষকে আশা জাগাবে, প্রত্যয় চেনাবে। বারুদের ধোঁয়ায়, কান ফাটানো বোমার গর্জনে, অ্যাক-অ্যাকের ধমকে কোন ধরনের শিল্প-সাহিত্য গড়ে তুলছেন তাঁরা? গত বছর আফ্রো-এশীয় লেখকদের সভায় তাসখন্দে ভিয়েতনামের প্রতিনিধি বললেন, শলোকফের সাইক্লো করা 'ভার্জিন সয়েল'-এর কপি স্বাধীনতার যোদ্ধাদের হাতে হাতে ঘুরছে। আমরা শুনেছি, গন্ধকের কথায় গন্ধের মধ্যে জন্ম নিয়েছে নতুন ভিয়েতনামী সাহিত্য।

এক সময় ভিয়েতনামে ক্লাসিক্যাল চীনা সাহিত্যের বড় কদর ছিল। বড় বড় ভূম্যধিকারী, অভিজাত পরিবারের কাছে আকর্ষণের বিষয় ছিল মান্দারীন সংস্কৃতির কিছু ছেঁড়াখোড়া পাতা। তারই পাশাপাশি জাতীয় সংগ্রাম, বিদ্রোহ, বিপ্লবের গল্পও মুখেমুখে, গাথায় গানে কবিতায় ছড়িয়ে যেত। ভিয়েত-নামীদের কাছে কবিতা ও গান অন্নজলের মতোই নিত্য প্রয়োজনীয়। আর বদ্বীপ অঞ্চলে চাষীর মুখে গান, জেলের মুখে গান। রূপকথার। সংগ্রামের। সুন্দরের। প্রকৃতির। মানুষের।

ফরাসীরা সেদেশে উপনিবেশ গেড়েছিল। কিন্তু ফরাসীভাষার সঙ্গে ফরাসীদেশের বিপ্লবী-মানবতাবাদী সাহিত্যের সংস্পর্শেও এসেছেন ভিয়েতনামের বুদ্ধিজীবীরা। কলোনিয়ালিস্ট ফরাসীদের এবং মানবতাবাদের সংস্কৃতিপীঠ আরেক ফরাসী দেশের অন্য মানুষ আর তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে তফাৎ করতে শিখেছে ভিয়েতনামবাসীরা। রোমান হরফে শিক্ষা নিতে গিয়ে ভিয়েতনামের শিশু ইউরোপের সাহিত্যপড়ার হরফের সঙ্গে শৈশব থেকে পরিচিত হয়ে যায়। আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে আধুনিক ভিয়েতনামের সাহিত্য। চীনা মান্দারীন সাহিত্যের গাম্ভীর্য, নিজস্ব লোকসংস্কৃতির কোমল-পেশল মমতা ও পশ্চিম ইউরোপীয় সাহিত্যের বুদ্ধিবাদ ও ব্যক্তিচেতনা, ভিয়েতনামের সাহিত্যে এক বিশেষ বিশিষ্টতার ধারা বইয়ে দিয়েছে। ভিয়েত-নামের সাহিত্যধারা তাই বিপুল বৈভবে, ঐশ্বর্যে উচ্চমানের। আর সংগ্রাম ও শিল্পের সমন্বয় জীবনকে গড়ে তুলেছে শিল্প করে; শিল্পকে জীবন। আমরা

তাই অবাক হই না যখন ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি হো চি মিন-এর প্রথমশ্রেণীর কবিতা পড়ি। পড়ে বুঝি, তিনি প্রথমশ্রেণীর কবিও। বিস্মিত হই না শুনে, নগুয়েন গিয়াপ, দিয়েন বিয়েন ফু-র সেই দুর্ধর্ষ বীর, কবিতায় আলোড়িত হন।

নাম কাও-এর 'ভিয়েতনামের স্পন্দন' পড়তে গিয়ে এ-সব কথা মনে পড়ে গেল।

নাম কাও কেমন লেখক, কি তিনি লিখেছেন, এসব আমাদের জানা ছিল না। 'পরিচয়'-এর পাতায় (জুলাই, ১৯৬৮) প্রকাশিত অবন্তীকুমার সান্যাল-এর অনূদিত 'বুড়ো হাক' গল্পটিই বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প। সে-গল্পটি 'ভিয়েতনামের স্পন্দন' বইটিতে আছে। বইটিতে আটটি গল্প আছে। আর আছে ডায়েরীর পাতা থেকে পথের রোজনামচা, 'পাহাড়ে জঙ্গলে'—একেবারে গল্পের মতো। অর্থাৎ নটিই অসামান্য রচনা। অসামান্য গল্প।

নাম কাও মাত্র দশ বছর লিখেছিলেন। আবার সে-দশ বছরের পাঁচ বছরই কেটেছে পাহাড়ে-জঙ্গলে ফ্রন্টে-ফ্রন্টে। "জীবনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি শিল্পের দায়িত্বকে গৌণ করে ফেলেছিলেন, এমন অভিযোগ ওঠা স্বাভাবিক। সে অভিযোগ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন···শিল্পের দায়িত্বকে অঙ্গীকার করেই তিনি জীবনের দায়কে নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।" 'ভিয়েতনামের স্পন্দন' বইখানি পড়লে এ-উক্তির স্বীকৃতি মিলবে। আর তাই ভিয়েতনামের আধুনিক সাহিত্যরথীদের প্রথম সারিতে যেমন তাঁর নাম, জাতীয় বীর শহীদের তালিকাতেও তাঁর নাম জ্বল জ্বল করছে।

উত্তরের বদ্বীপ অঞ্চলের হা-নামের এক মধ্যচাষীর ঘরে নাম কাও জন্মেছিলেন। দুর্বল স্বাস্থ্য ও হৃদরোগের জন্য তাঁর কলেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। দক্ষিণদেশে, সায়গনে, এসেছিলেন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারে। এখানেই তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি, এখানেই রাজনীতিতে দীক্ষা। সায়গন থেকে কয়েক বছর পর গ্রামে ফিরলেন। বাল্যে যা অভিজ্ঞতার চোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত, রাজনীতি-অর্থনীতি ও সাহিত্যিক দৃষ্টির দাক্ষিণ্যে সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি তাৎপর্য দিয়ে বুঝলেন। দেখলেন গ্রামের মানুষ কোন দুঃখ-বেদনার মধ্যে রয়েছেন। দেখলেন, কোন আনন্দই-বা তাদের জীবন অভিষিক্ত করে। দেখলেন, ফরাসী প্রভুত্বের দিনে গ্রামের ভূস্বামী, মোড়লদের দোর্দণ্ড-প্রতাপের বহর। জানলেন, সেই সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার ধারার মধ্যে কেমন ভাবে বয়ে চলেছে সাধারণ মানুষের ত্রস্ত অস্তিত্ব। গ্রামের এই হতভাগ্য মানুষগুলিকে তিনি ভালোবাসলেন।

সংসারের দারিদ্র্যের চাপে হ্যানয়ে এলেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই দিনগুলি ছিল ইন্দোচীনে জাপানী ফ্যাসিস্ত শক্তির দখলদারির সময়। পত্রপত্রিকায় তখন প্রকাশিত হচ্ছে নাৎসীদের ফরাসী দালাল পেতাঁর স্তোত্র।

সাহিত্যে চলেছে সূর্যবংশ অবতংশ জাপ সম্রাট মিকাদো, আর জাপানী সামন্ত-প্রভুদের অঙ্গসংবাহিনী রমণী গেইসাদের নিয়ে গদ্‌গদ ভাষণ। চলেছে সাহিত্যের নামে ও 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্যে'র নামে জীবনবিরোধী শিল্পের জয়জয়কার। বুদ্ধিজীবীদের কলমে আত্মসমর্পণের দীনতা। এ-সময়েই তাঁর 'চি ফেও' গল্পটি প্রকাশিত হলো (১৯৪১)। আর 'চি-ফেও' গল্পটি থেকেই সংগ্রাম ও বাস্তবতার দিকে ভিয়েতনামের কাহিনী-সাহিত্য মোচড় নিলো। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হলো তাঁর 'সোংমান' উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা বাজেয়াপ্তও হলো। এরপর তিনি ভিয়েতমিন দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আত্মগোপন করতে হলো তাঁকে। ইতিমধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় ও অপরিসীম দারিদ্র্যে গ্রামে তাঁর একটি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নাম কাও বাড়ি ফিরলেন। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিলেন। ১৯৪৫ সালের সশস্ত্র আগস্ট অভ্যুত্থানে তাঁর নায়কতায় দখল হলো জেলার সদর দপ্তর। নির্বাচিত হলেন তিনি জেলা কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

১৯৪৭ সাল থেকে ফরাসীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে তিনি ভিয়েতমিন ফ্রণ্টের মুখপত্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন। জেনারেল গিয়াপের সঙ্গে তিনি ঘুরেছেন ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে এসময় তিনি প্রচারনাটক, গণসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, নিরক্ষর চাষীদের জন্য ভূগোল-ইতিহাস এবং মাঝে মাঝে দু-একটা গল্প লিখেছেন। ১৯৫১ সালের ফরাসীদের চোরা আক্রমণে তিনি শহীদ হন। একটি মহৎ উপন্যাস রচনার সাধ ছিল তাঁর। নাম হবে 'একটি দেশ'। দিনপঞ্জীর পাতায় তিনি লিখেছিলেন " ......বছরের পর বছর, রাতের পর রাত যে বিপুল উপন্যাসখানার কথা ভেবে আসছি, তা কবে ?"

'ভিয়েতনামের স্পন্দন' বইটি নিতে নাম কাও-এর জীবনের তিনটি পর্যায়ঃ সায়গন-হ্যানয় শহর, তাঁর গ্রামদেশ এবং গণযোদ্ধাদের সঙ্গী হয়ে ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে ঘোরা- এ সব কিছুরই ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক জীবনে জারজ চি ফেও-রা কেমনভাবে জীবন কাটিয়ে যায়, কেমন ভাবেই-বা গ্রামের মোড়ল 'শ্রীজ্ঞান মহাশয়'র সমস্ত গ্রামবাসীদের বঞ্চনা করে থাকেঃ এ-সব অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নাম কাও দেখিয়েছেন। আর অস্তিত্বের কোন বিপুল তল থেকে ঘৃণা এসে একসময় মোড়লের উপরে ক্রুদ্ধ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে! আর কাউকে 'সৎ মানুষ' হতে হলে গ্রামের আগাছাগুলোকে সাফ করতে হবেই। 'বুড়ো হাক' কাহিনীটিতে আছে চাষীর জমির প্রতি আজন্ম মমতা। বুড়োর ছেলে রবার বাগানে গিরমিটিয়া কুলী হয়ে গ্রাম ছেড়েছে। আর গ্রামে দরিদ্র চাষীর জীবন যেন কুকুরের জীবনের সামিল "মানুষ কুকুর পোষে হয় খাওয়ার জন্য, নয়তো বেচার জন্য।" বুড়ো হাক না খেয়ে টাকা জমাতে চায়, ছেলে ফিরে এসে বিয়ে করে

সংসার বাঁধবে বলে। কিন্তু কোথায় টাকা? অথচ তার সাধুতার দিকটি অবিসংবাদিত। ছেলের বিয়ের ভোজের জন্য কেনা কুকুরটি তাকে এক সময় বিক্রি করে দিতে হয়। দুর্বহ জীবন থেকে কুকুর-মারা বিষ খেয়ে অব্যাহতি নেয় সে, প্রিয় কুকুর বিক্রি করার প্রায়শ্চিত্ত করে।

সায়গন-হ্যানয়ের, সেই বিপ্লব-পূর্ব দিনের কাহিনী তিনি দরিদ্র, প্রতিষ্ঠাহীন কোনও লেখকের চোখ দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। যে-কোনো বিবেকবান লেখক আর্থনীতিক টানাপোড়েনে পড়ে এস্টাব্লিশমেণ্ট ও জীবনের মধ্যে সমঝোতা খুঁজতে গিয়ে যেমন ভেতরে ভেতরে চূর্ণ হতে থাকে, এ-কাহিনীগুলিতে তার প্রকাশ দেখা যাবে। নাম কাও আশ্চর্য সমবেদনার সঙ্গে দেখিয়েছেন, একদিকে এস্টাব্লিশমেণ্টের চাপে বিক্ষত লেখক শুধু টিকে থাকার জন্য কেমন লড়াই চালায়। একদা-আদর্শবান লেখক এস্টাব্লিশমেণ্ট-নির্দেশিত শিল্পকার্যের মূল্যায়নে, একদিকে বিবেকের চাবুকে আহত, অন্যদিকে স্ত্রী-সন্তানদের অর্ধাশনে ব্যথিত। আর সেই মুহূর্তেই সে আবিষ্কার করে আর্টের জন্য পাগল লেখকের চেয়ে, নিজের ঘরে নিগৃহীত স্ত্রী যে-কৃচ্ছ্র তা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে অন্য সকলের জীবনকে সামান্য সুখী করতে চায়, জীবনের কাছে তার মূল্য অনেক বেশি। এবং বিবেকী লেখকের জীবনের কাছে ফিরে আসাটাই আর্টেরও মুক্তির পথ। এমন কি বিপ্লবী কার্যক্রমের যুগেও পেটি বুর্জোয়া চিত্তবৃত্তির তথাকথিত আর্টসর্বস্ব লেখকের শূন্যতাকে নাম কাও প্রত্যক্ষ করেছেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ কেমন মহান হয়ে ওঠে, এইসব স্বার্থ-সর্বস্ব লেখকদের তা চোখ এড়িয়ে যায়। নাম কাও সেই আর্ট-সর্বস্ব প্রবীণ শূন্যকুম্ভ লেখককে ব্যগ্র হয়ে জানান, "কতকগুলো দিকে চাষীরা এখনো আমাদের কাছে ধাঁধা। আমি ওদের অত্যন্ত কাছে থেকেছি। ওদের এতো অজ্ঞ, এতো দুঃখী, এতো ভীতু, এতো ভাগ্যের পায়ে আত্মসমর্পণ করতে দেখে অন্য সময় প্রায় নির্বাক হয়ে পড়েছি।... কিন্তু সাধারণ অভ্যুত্থানের মুহূর্তে আমি যেন বজ্রাহত হয়ে গেলাম। তা হলে কি আমাদের দেশের চাষীও বিপ্লব ঘটাতে পারে।... আমি দেখেছি সেই হাজার হাজার চাষীকে যারা দাঁতে গালা লাগায়, যাদের চোখ চেরা, যারা গ্রেনেডকে বলে 'রেনেড,' যারা প্যাগোডার ঝিমুনো স্তোত্র পড়া ভিক্ষুর মতো জাতীয় সঙ্গীত গায়, দেখেছি, তারা হঠাৎ কেমন করে লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পালটে গেল, অবিশ্বাস্য বীরত্বে আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।" আর আত্মসর্বস্ব পরিণত ও বিজ্ঞ লেখক হোয়াং এই বিপুল অভ্যুত্থানের নানা খুঁত ধরে, আত্মতৃপ্ত হয়ে রাজা-বাদশাদের-প্রণয় কাহিনীতে ডুবে গিয়ে আশ্রয় খোঁজেন শূন্যতায়।

নাম কাও ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারও চমৎকার শিল্পে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। দিনপঞ্জীতে ও গল্পে। এককথায়, তাঁর সব গল্পগুলিই যেন

আত্মজীবনীমূলক। কি বিপুল মমতায় তিনি দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে দেখেছেন, কি বিপুল সংগ্রাম তাঁর ভেতরে বাইরে। এই সৎ ও মহৎ লেখক শিল্পকে তথাকথিত স্লোগান সর্বস্বতায় রূপান্তর ঘটাননি, আবার সমাজ ও সময়ের সারাৎসার গল্পগুলিতে অঙ্গীকৃতও করেছেন।

নাম কাও-এর 'ভিয়েতনামের স্পন্দন' বাঙলা সাহিত্যে অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। অনুবাদক অবন্তীকুমার সান্যাল ফরাসী থেকে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ ঝরঝরে ও প্রাণবন্ত। অনুবাদ বলে মনেই হয় না। "প্রথম গল্পে কয়েকটি ব্যক্তি নাম এবং অন্যত্র গুটি কয়েক বস্তু-নামের ক্ষেত্রে ঈষৎ স্বাধীনতা নেওয়া ছাড়া, কমা-সেমিকোলন, এমন কি ফরাসী বাক্য-বিন্যাসকেও যথাযথ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি", দাবি করেছেন অনুবাদক।

'ভিয়েতনামের স্পন্দন' আমাদের দেশের লেখকদেরও চোখ ফেরাতে সাহায্য করুক জীবনের দিকে। বিষয়গত জীবন কত নিপুণতার সঙ্গে বিম্বিত, অথচ বিষয়ীর দিকটিও ডায়ালেকটিক সম্পর্কে যথোপযুক্তভাবে প্রকাশিত। বিষয়কে পেছনে রেখে বিষয়ীর ধারা-চিন্তা নয়, বরং চরিত্রকে যথোপযুক্ত রূপ দিতে বিষয়কে উপযুক্ত তাৎপর্যে ধরা হয়েছে। অথচ মনের জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিক্ষোভ বা স্পন্দনও কেমন সমস্ত কাহিনীকে গ্রথিত করেছে। জীবন যেখানে সংগ্রামে স্পন্দিত, রচনাও সেখানে উপযুক্ত তাৎপর্যে মহোত্তম শিল্পধর্মে নন্দিত। আর শিল্পতো জীবনের অভিজ্ঞতারই উদবর্তীত আরেক নাম। সমাজ ও সময়ের সারাৎসারে পৌছবার জন্য আপাত বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতার মধ্যে শিল্পই তো সুশৃঙ্খল বিন্যাস।

তরুণ সান্যাল

রক্তের ভিতরে রৌদ্র। গণেশ বসু। অনুভব প্রকাশনী। দু-টাকা।
বন্ধুর অমল কণ্ঠ। হেমোপম দস্তিদার। সাহিত্যপত্রগ্রন্থ। দু-টাকা।
সমস্তক্ষণ সূর্যাস্ত। গৌরীশংকর দে। মিত্রালয়। আড়াই টাকা।
নিজের সঙ্গে সংলাপ। সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নান্দীমুখ সংসদ। দু-টাকা।

পঠনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একপাশে গণেশ বসুর 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র', এবং অপর পাশে হেমোপম দস্তিদারের 'বন্ধুর অমল কণ্ঠ' নিয়ে বসা ভালো। একমাত্র এই ব্যবস্থাই পাঠককে বেপরোয়া, তেরিয়া উত্তেজনা বা মৃতপ্রায় শৈত্য থেকে বাঁচাতে পারে। 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র'ময় গণেশ বসুর মেজাজ অসম্ভব হাই-স্ট্রাঙ, পাতায় পাতায় কি-অফুরন্ত প্রেরণা, উৎসাহ ও চীৎকারের পুখুরিয়া-খনি, না খুঁড়তেই উপচে পড়ে। উনপঞ্চাশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের

প্রায় কুড়ি বছর পরও এত প্রত্যয় এত প্রাণশক্তি গণেশ বসুর কবিতাকে আমার কাছে প্রচণ্ড সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের বস্তু করে তোলে। আর তারই উল্টোপিঠে হেমোপম দস্তিদারের 'বন্ধুর অমল কণ্ঠ' আমার তালালাগা কানে ফিসফাসের অধিক কিছুতেই বোধ হয় না।

তবু ভালো, 'রক্তের ভিতরে রৌদ্র' আমাদের মতো সাধারণ পাঠক, যাদের প্রায় অ-পাঠকই বলা চলে, তাদের জন্য। কবিতা-প্রেমিকদের কাছে 'প্রতিরোধ' বা 'ঝড়' কবিতা দুটি নিছক স্লোগান বলে মনে হতে পারে, আমাদের কাছে তত্তটা নয়। শিল্প-টিল্পর ঝুটঝামেলা বেশি নেই, ধাঁ ক'রে বুঝতে পারি। 'জঙ্গল সাঁওতাল' কবিতাটি তো খুবই ভালো লেগে যায়। তা ছাড়া আবেগ একটু তপ্ত হলেই আকছার ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন গণেশ বসু, যা আমার একান্ত মনঃপূত। পাতায় পাতায় চোখে পড়ে, '**উদ্ধত ক্রুজার** দ্রুত কাঁপায় প্রস্থানভূমি,' '**স্যাবারে** ক্ষোভের রৌদ্র', 'লাল সূর্য ঘোরে **উদ্ধত স্কোয়াড**', 'আমাদের **ক্রেনের উচ্ছ্বাসে**, চোখের তীব্র **মনিস্কিনে**,, কান্নার **র‍্যাভারে**,' '**রেডিয়েটারের** / বিশাল দাঁতের খাঁজে', ইত্যাদি ইত্যাদি। (বড় হরফ চিহ্নগুলি আমার)। এরই পাশপাশি সংস্কৃত ক্লাসিকের মর্জি কবিতায় নিয়ে আসতে কবি কম পরিশ্রমী নন। হয়তো তিনি বিশ্বাস কবেন, দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বিষয় বা পরিবেশকে এক জায়গায় জড়ো করতে পারলেই কবিতার অত্যাশ্চর্য এ্যালকেমির সৃষ্টি হয়। গ্রন্থের বহুক্ষেত্রে 'দ্রাবিড়' শব্দের প্রতি কবির প্রীতিকে সমর্থন জানিয়েও আমি অবশ্য অসহায় হয়ে পড়ি এ-জাতীয় উপমায়, 'দ্রাবিড়দ্রাঘিমা চোখে'। কি জানি, কবিতা-পাঠকেরা হয়তো বাঙলা কবিতার একহাজার বছর পূর্তির কাছাকাছি সময়ে কবিদের কাছে অনেক বেশি সংযম, সাবজেক্টিভ মানস ও শিল্পগুণের দাবি করেন। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র দেখে প্রসন্ন হওয়ার কোনো কারণ ঘটে না। বস্তুত তাঁর এরকম দায়সারা গোছের কাজ আমার আগে চোখে পড়েনি।

পূর্বেই বলেছি 'বন্ধুর অমল কণ্ঠ'র কবি হেমোপম দস্তিদারের কণ্ঠ রীতিমতো নির্জন ও একান্ত ব্যক্তিগত। 'অমল' শব্দটি বাঙলা কবিতায় ব্যবহৃত হতে হতে পচে গেছে, এটিকে এখন বেশ কিছুকালের জন্য কি নির্বাসন দেয়া উচিত নয়?

বস্তুবিশ্বের ভারে কবি বোধহয় খুব আহত, দুঃখিত। 'টুকরো ছেঁড়া' ব্যথার স্মৃতি, 'ভুবনহীন দীন ভবন', 'অন্ধকারে মৌন মুখ', 'ম্লানমুখ গ্রামীন রাস্তায় নিসঙ্গ হাওয়ার মতো' হাঁটাহাঁটি, 'তৃষ্ণায় দু হাত মেলে / অভিমানে নিজেকে' কাঁদানো, 'অন্তহীন ইচ্ছার আক্ষেপ', 'নিঃসঙ্গ ম্লান হিমসিক্ত শীতের শাসন' ইত্যাদি খুব কষ্টকর সামগ্রী ও অবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছেন

হেমোপমবাবু। এই বিষণ্ণ আত্মচিন্তা আমাকে আবার বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাছে ফিরে যেতে বলে। অবশ্যই এই কাব্যগ্রন্থে অনেক আশ্চর্য ভালো রিলিক-রসাক্রান্ত পংক্তি আছে, রীতিমতো স্পর্শচেতনা আছে, আবার 'মুখ'-এর সঙ্গে 'ট্রক'-এর মতো জঘন্য মিল বা একঘেয়ে অনাবশ্যকভাবে ফেনানো বর্ণনও আছে। এ-জাতীয় দোষ-গুণ একান্ত তরুণ কবির কাব্যে সাধারণত থাকতেই পারে। আমার কথা হচ্ছে, কবিতা কথায় কথায় এত বেশি নুয়ে বা ভেঙে পড়বে কেন? মানুষের চিত্তবৃত্তি তো দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে ইতিমধ্যে অনেক কঠিন অনেক ধাতব হয়ে গেছে।

গৌরীশংকর দে-র 'সমস্তক্ষণ সূর্যাস্ত' ও সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিজের সঙ্গে সংলাপ' কবিতাগ্রন্থদুটির মেজাজে বহুক্ষেত্রে যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। 'সমস্তক্ষণ সূর্যাস্ত' অবশ্য বেশ খোলামেলা, আন্তরিক—অন্তত কাব্যগ্রন্থটির প্রথমাংশের কবিতাবলীতে। ঐ অংশটি একই সঙ্গে একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে রচিত, অতিকথন দোষও যে নেই তা নয়। দ্বিতীয়াংশের কবিতা-গুলিতে আমার জন্য আচমকা বেশ কিছুটা বিস্ময় রক্ষিত ছিল। প্রাক্তন ত্রুটি ঝেড়ে ফেলে কবি এখানে কয়েকটি ঘন-পীনদ্ধ, সত্যিকারে ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন, যেগুলি আমাকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ রেখেছে।

স্বভাবে গৌরীশংকরের স-ধর্ম হয়েও সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'নিজের সঙ্গে সংলাপ' কাব্যগ্রন্থে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক, তাঁর কবিতায় বিষণ্ণতার সঙ্গে তিক্ততা মিলে যায়। ফলে এ-ধরনের পংক্তিনিচয় লিখতে যেন তিনি বাধ্য হন, 'শিয়ালের বিষ্ঠাভাঙা মাটি', 'বই পড়ব, মাছ আনতে যাব,' 'ভাল তবু ষাঁড় অন্ততঃ গরুদের প্রীতি পায়-,' 'দেখেছি প্রৌঢ় অস্থি গোপন যৌন মিলনে পঙ্ক', 'আমরা লালার ক্রীতদাস,' ইত্যাদি। যখন-তখন চমক সৃষ্টি করার দুর্বলতা কবির মজ্জায়, তথাকথিত 'স্ট্রং' কবিতা রচনায় তিনি বিশ্বাসী।

একই সঙ্গে লক্ষণীয় কবির বক্তব্য উপস্থাপনের চাতুর্য, বর্ণনার অভিনবত্ব, নতুন শব্দ ও উপমা সৃষ্টির নিষ্ঠা ও পরিশ্রম। অত্যন্ত দৃঢ় হাতে কখনো কখনো এভাবে কবিতায় নিজের ব্যক্তিত্বের নির্যাস ঢেলে দেন তিনি—'যখন দ্রুততা নামে তখন হত্যার চেয়ে তীক্ষ্ণতম তুমি, / ছবি বিঁধে আটকে যায়, চেপে ধরে তা মৃত মৃত্তিকা, / মৃত রাক্ষসের মৃত দাঁতে দাঁত চেপে বসা চোয়ালের খাঁজে, / উষ্ণ ফোয়ারার মত ঢেলা তুলে ফেনপুঞ্জ দু'ধারে ছড়িয়ে / তখন নিজের ঢাকা নিজেরই গায়ের জোরে গড়ায় ট্রাক্টর, / খেতের সীমান্তে পৌঁছে খুলে ধরবে ঝকঝকে ঠোঁট / শ্বাস ছেড়ে পান করতে এক ঝলক রিক্ত স্বচ্ছ হাওয়া।'

অমিতাভ দাশগুপ্ত

চাঁদে অভিযান

বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনার আনন্দ আমরাও আর সকলের সঙ্গে সমভাবে ভাগ করে নিয়েছি। পৃথিবীর প্রথম দুটি মানুষ কিছুদিন আগে চাঁদের মাটিতে তাঁদের পদচিহ্ন অঙ্কিত করে এসেছেন। এই দুটি মানুষ আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন এবং তাঁদের অপর সঙ্গী কলিন্স, মহাকাশের এই তিন বীর অভিযাত্রীকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চাঁদে নামার প্রথম পব

আমেরিকার কেপ কেনেডি মহাকাশবন্দর থেকে ১৬ই জুলাই এই নবতম মহাকাশ-অভিযানের ঘটনাটি শুরু হয়েছিল। পৃথিবী থেকে দু-লক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের মতো পথ অতিক্রম করে ২০এ জুলাই চন্দ্রগামী মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১ তার তিনজন যাত্রীকে নিয়ে চাঁদের জমির মাত্র ৬০ মাইল উচ্চতার এক বৃত্তাকার কক্ষপথে চাঁদকে পরিক্রমার কাজ শুরু করে।

অ্যাপোলোর মূল অংশ কম্যাণ্ড ও সার্ভিস মডিউলের সঙ্গে যুক্ত ছিল চন্দ্রযান লুনার মডিউল। কম্যাণ্ড মডিউল থেকে একটি ছোট সুড়ঙ্গপথে লুনার মডিউলে এসে প্রবেশ করেন দুজন মহাকাশযাত্রী আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন। তারপর ধনুকের ছিলার মতো এক বিরাট বাঁকা পথে লুনার মডিউল রকেট-ব্যবস্থার সাহায্যে দুজন যাত্রীকে নিয়ে চাঁদের দিকে নেমে আসতে শুরু করে।

চাঁদের 'সি অফ ট্র্যানকুয়িলিটি' বা 'শান্তি সাগর' নামে জমাটবাঁধা লাভার সমুদ্রটির পূর্বনির্দিষ্ট একটি জায়গা লুনার মডিউলের অবতরণ ক্ষেত্ররূপে নির্দিষ্ট হয়ে ছিল। চাঁদে নেমে আসার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর খবরদারির ভার ছিল যে-কম্পিউটার যন্ত্রটির, তার ভুল নির্দেশে চন্দ্রযানটি একটি মৃত ক্রেটার বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মধ্যে নেমে পড়েছিল আর কি! সে জায়গাটি ছিল নিতান্তই ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো এবং ছোটবড় গর্তে ভর্তি। এরকম জায়গায় নামলে চন্দ্রযানটি নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং যাত্রী মানুষ দুটি হয় মারা পড়তেন, নাহয় চন্দ্রযানটিকে নিয়ে চাঁদের জমি থেকে তাঁরা আর উঠে আসতে পারতেন না।

সৌভাগ্যক্রমে কম্পিউটারের ভুলটা আগেই ধরা পড়ে যায় এবং লুনার মডিউলের পাইলট অলড্রিন নিজে চন্দ্রযানটিকে পরিচালনা করে নিরাপদে চাঁদের জমির ওপর এনে দাঁড় করান।

চাঁদে প্রথম মানুষ

চন্দ্রযান লুনার মডিউল চাঁদের জমির ওপর এসে নেমেছিল ২১এ জুলাই ভারতীয় সময় রাত প্রায় একটার সময়। সকাল আটটা বেজে সাতাশ মিনিটের সময় মহাকাশ-পোশাক পরে চন্দ্রযান থেকে একটা সিঁড়ি বেয়ে চাঁদের জমির ওপর এসে দাঁড়ালেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর্মস্ট্রং। মানুষ এই সর্বপ্রথম তার পৃথিবীর বাইরে, সৌরজগতের আর একটি সদস্য পৃথিবীরই আপন সহযাত্রী চাঁদের জমিতে, তার পা রাখল। এটি সমগ্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, সন্দেহ নেই। চাঁদের মাটিতে পা রাখবার পর যে-বিচিত্র অনুভূতি ঐ মানুষটির মনে জেগে উঠেছিল, তা আমরা খানিকটা আঁচ করতে পারি। আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে নেমে আসার আধঘণ্টা বাদে সঙ্গী অলড্রিন এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষ চাঁদের জমিতে দাঁড়িয়ে চাঁদের বিচিত্র প্রকৃতিকে দেখার সুযোগ পেল। চাঁদের দিন তখন সবে শুরু হয়েছে। ভোরের সূর্যের আলো তেরছাভাবে এসে চাঁদের জমির ওপর পড়েছে। তার ফলে চাঁদের জমির ওপর ছোট-বড় প্রতিটি গঠনের প্রোজেকসন বা প্রক্ষেপ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, চাঁদের একটা দিনের পরিমাণ পৃথিবীর চোদ্দটা দিনের সমান। চাঁদের দুপুরবেলা তাপমাত্রা চড়তে চড়তে ২৫০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় পৌঁছে যায়। আবার, চাঁদের একটা রাতের পরিমাণ পৃথিবীর চোদ্দটা রাতের সমান। তাপমাত্রা কমতে কমতে ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহিটে নেমে আসে। চাঁদের যেখানেই ছায়া বা অন্ধকার, সেখানেই তার রাতের হিমশীতল তাপমাত্রা। তাপকে ছড়িয়ে দেবার বাহনরূপী কোনো বাতাস চাঁদে নেই বলেই এই বিচিত্র ব্যাপারটা ঘটছে।

মহাকাশযাত্রী দুটি মানুষ চাঁদে যে-পোশাক পড়ে নেমেছেন—তার ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। পোশাকের যেদিকে সূর্যের আলো পড়ছে, সেদিকটা প্রচণ্ড তাপে তপ্ত হয়ে উঠছে, আবার যেদিকটায় আলো পড়ছে না, সেদিকটায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তাপের এই অসম অবস্থাকে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা ঐ পোশাকের মধ্যে রয়েছে। চাঁদের বায়ুহীন জমির ওপর মহাকাশের বিভিন্ন প্রাণঘাতী রশ্মির মারাত্মক তীব্রতা থেকে এবং উল্কাকণাদের আচমকা সংঘাতের বিপদ থেকেও ঐ পোশাক মানুষ দুটিকে রক্ষা করছে।

চাঁদের ছবি

চাঁদের জমির এক বিচিত্র ছবি দুটি মানুষের চোখে ধরা দেয়। চাঁদের যে-জায়গায় চন্দ্রযানটি নেমেছে, সেটি মোটামুটি সমতল; কিন্তু আশেপাশের জায়গাগুলো মোটেই তা নয়। চারিদিকে অজস্র ছোট ছোট মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ চোখে পড়ে—যাদের ব্যাস এক ফুট থেকে পঞ্চাশ ফুটের মতো। জমির

চেহারাটা ভাঙাচোরা, অজস্র গর্তে ভর্তি—ছোটবড় পাথরের স্তূপ এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। চাঁদের দিগন্ত এক মাইলের মধ্যে। একটা ছোট পাহাড়ও দূরে চোখে পড়ছে।

চাঁদের জমির চেহারা যতটা ভাঙাচোরা এবং গর্ত ও ফাটলে ভর্তি বলে আগে জানা গিয়েছিল, চাঁদের জমির ওপর দাঁড়িয়ে মহাকাশযাত্রীরা বলেছেন, আসলে চাঁদ তার চেয়েও অনেক বেশি ভাঙাচোরা। পৃথিবীর একটা মরুভূমির সঙ্গে চাঁদের এই চেহারার তুলনা চলে। কিন্তু চাঁদের এই বিচিত্র রুক্ষ প্রকৃতিরও একটা বন্য সৌন্দর্য আছে, যা পৃথিবীর দুটি মানুষের চোখকে মুগ্ধ না করে পারেনি।

চাঁদে মহাকাশযাত্রীদের সাবধানে চলাফেরা করতে হয়েছে। কারণ চাঁদের অভিকর্ষ-বল পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের এক-ষষ্ঠাংশ হবার জন্যে পৃথিবীতে একটি বস্তুর যা ওজন, চাঁদে সে ওজন ছ-ভাগের এক ভাগ হয়ে দাঁড়াবে। মহাকাশযাত্রীদের ওপর চাঁদে ক্যাঙ্গারুর মতো পা-জোড়া অবস্থায় আস্তে আস্তে লাফিয়ে চলার নির্দেশ ছিল, যাতে পড়ে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। ওঁরা অবশ্য চাঁদের স্বল্প আকর্ষণ-বলের সঙ্গে খানিকটা অভ্যস্ত হবার পর, সে-নির্দেশ অমান্য করে চাঁদে সামান্য লাফালাফি, কিছুটা ছুটোছুটিও করেছেন।

চাঁদের জমির ওপর হাঁটতে গিয়ে মহাকাশযাত্রীদের মনে হচ্ছিল, কয়লার মতো কালো কিছু গুঁড়ো বস্তু যেন তাঁদের জুতোর সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কোনো ধুলোর স্তরের সন্ধান তাঁরা পাননি। তবে, চাঁদের শিলার ওপর ঠিক পাউডারের মতো কিছু ধুলো যেন ছড়িয়ে ছিল, যার ফলে হাঁটবার সময় পা-টা খানিকটা পিছলে যাবার মতো মনে হচ্ছিল। ভিজে বালির মধ্যে আমাদের পায়ের পাতাটা যেভাবে ডুবে যায়, মহাকাশযাত্রীদের পা ঠিক সেইভাবে চাঁদের মাটিতে আধ ইঞ্চির মতো বসে যাচ্ছিল।

নিকষ কালো মহাকাশের পটভূমিতে দুটি মানুষের কাছে পৃথিবীর বিরাট, উজ্জ্বল গোলোকটি এক আশ্চর্য সুন্দররূপে দেখা দেয়। সেই জন্মদাত্রী, জন্মধাত্রী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মানুষের মনে কি বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

চাঁদে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা

মহাকাশযাত্রীরা চাঁদের জমির ওপর প্রায় তিন ঘণ্টার মতো ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকাজ করেছেন। চাঁদের জমিতে নেমেই প্রথমে তাঁরা একটি অ্যালুমিনিয়ামের চাদর বিছিয়ে 'সোলার উইণ্ড' বা সূর্যের বাতাসের কণিকাদের এবং কিছু গ্যাসীয় উপাদানের নমুনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মহাকাশযাত্রীরা চাঁদের জমির ওপর একটি ভূকম্পননির্দেশক যন্ত্রকে রেখে এসেছেন। সেই যন্ত্রের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বেতারে সঙ্কেত আসতে আরম্ভ করেছে। একটি 'লেসার' আয়নাকে তাঁরা চাঁদের জমির ওপব বসিয়ে এসেছেন। পৃথিবীর কোনো জায়গা থেকে যদি লেসার আলোর রশ্মি ছোঁড়া যায়, তাহলে সেই রশ্মি ঐ আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে একই জায়গায় ফিরে আসবে? এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের মাপকে আগের চেয়েও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

এছাড়া, পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের জোরটা কমে যাওয়ার ফলে চাঁদ আদৌ পৃথিবী থেকে খুব ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে কিনা (যার ফলে চাঁদ একদিন পৃথিবীর অভিকর্ষ-বলের মায়া কাটিয়ে সূর্যের একটি গ্রহ হয়ে বসতে পারে) এবং ভাসমান মহাদেশের তত্ত্ব অনুযায়ী আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পারে অ্যামেরিকা এবং ইয়োরোপ-আফ্রিকার মধ্যেকার দূরত্ব অতি স্বল্পভাবে হলেও ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে কিনা, বিজ্ঞানীদের বহুদিনের সঞ্চিত এসব প্রশ্নের উত্তর লেসার আলোর প্রতিফলনের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পড়বে।

মহাকাশযাত্রীরা চাঁদের জমি থেকে ৬০ পাউণ্ডের মতো শিলা ও মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রহ করে এনেছেন। কিছু মৃত্তিকার নমুনা ভিজে অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার ফলে চাঁদের জমির নিচে বরফরূপে জলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক আলোচনা উঠেছে।

চাঁদে যেহেতু কোনো জল বা বাতাস নেই, তাই সাধারণভাবে চাঁদের জমির কোনো ক্ষয় নেই। যেটুকু ক্ষয় ঘটছে, তা ভূকম্প বা তাপের বিরাট অসাম্য-জনিত অবস্থার ফলেই ঘটেছে। কাজেই চাঁদের জমির বহু জায়গা হয়তো এখনো 'আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো'র মতো চাঁদের জন্মলগ্ন থেকে বহু কোটি বছর পরে একই চেহারা নিয়ে রয়েছে। বিরাট ভৌগোলিক পরিবর্তনের জন্যে পৃথিবীর জন্মলগ্নের কোনো চেহারার নমুনাই এখন আমরা খুঁজে পাই না। কাজেই চাঁদের কোনো শিলা ও মৃত্তিকার নমুনার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা হয়তো চাঁদের জন্ম ও বিবর্তন, একই সঙ্গে পৃথিবী ও সৌরজগতের জন্ম ও বিবর্তন সম্বন্ধে, বহু রহস্যের সমাধানের ইঙ্গিত লাভ করতে পারেন।

চাঁদে করণীয় সব কাজ শেষ করে, অ্যালুমিনিয়ামের চাদরটিকে গুটিয়ে নিয়ে মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের চন্দ্রযানে ফিরে আসেন। তাঁরা তাঁদের মহাকাশ-পোশাক ও টেলিভিসন ক্যামেরা প্রভৃতি যন্ত্র চাঁদের মাটিতে রেখে এসেছেন। কারণ যদি চাঁদের জমির কিছু বীজাণু এই সব বস্তুর সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরে আসে, তাহলে ওরা পৃথিবীরর বীজাণুদের জীবনে কি বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, তা আগে থেকে বলা যায় না।

বারো ঘণ্টা বাদে, অ্যাপোলোর কম্যাণ্ড মডিউল যখন মাথার ওপর এসে হাজির হলো, তখন মহাকাশযাত্রীরা তাঁদের যন্ত্রযানের নিচের অংশটিকে চাঁদের জমিতে রেখে ওপরের অংশটিকে রেট্রো-রকেটব্যবস্থার সাহায্যে পরিচালিত করে ৬০ মাইল উচ্চতায় পৌঁছে কম্যাণ্ড মডিউলের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর চন্দ্রযানটিকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা তাকে নিঃসঙ্গ মহাকাশযাত্রার মধ্যে ঠেলে দেন। তারপর পৃথিবীতে ফিরে আসার পালা।

২৪এ জুলাই তারিখে মহাকাশের তিন বীর অভিযাত্রী পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। তাঁদের প্রায় ২১ দিন সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়। চাঁদের সম্ভাব্য বীজাণুদের দ্বারা তাঁরা আদৌ সংক্রামিত হয়েছেন কিনা সেটা এই সময়ের মধ্যে ধরা পড়ার কথা। অবশ্য পরীক্ষায় কোনো চান্দ্র বীজাণুর হদিস পাওয়া যায়নি।

শঙ্কর চক্রবর্তী

এ-বছরও ২০এ জুলাই দেশে দেশে 'ভিয়েতনাম দিবস' পালন করা হয়েছে। এবার এই দিবসের তাৎপর্য অনেক বেশি। দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট কিছুদিন আগে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেকেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের ঐ যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে ইতিমধ্যেই কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা মনে করি, ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতরাষ্ট্রের বহুঘোষিত জোটনিরপেক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ঐ বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতিদান বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা দাবি করি, অবিলম্বে ভারত সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিপ্লবী সরকারকে পূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করুক।

এ-বছরের ভিয়েতনাম দিবসের বিশেষ তাৎপর্য স্মরণ করে এই সংখ্যা 'পরিচয়'-এ ভিয়েতনামের উপরে একাধিক রচনা প্রকাশ করা হলো।—সম্পাদক

ললিতকলা অ্যাকাডেমির প্রদর্শনী

যতদূর মনে পড়ে ইতিপূর্বে একবারই ললিতকলা অ্যাকাডেমি আয়োজিত সর্বভারতীয় চারুকলা প্রদর্শনী কলকাতায় হয়েছিল। সেজন্য অত্যুৎসাহে আফা গ্যালারিতে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু এতটা হতাশ হতে হবে ভাবতেও পারিনি। এই কি জাতীয় চিত্রকলার মান? একথা বললে ভুল হবে না যে, সন্ত-শিক্ষান্তে সাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন শিল্পীও গড়পড়তায় এঁদের চেয়ে উন্নত শিল্পকলার পরিচয়দানে সক্ষম। তাহলে কি আফা-রই অশুভ উপস্থিতি শিল্পীর সমর্যাদা অংশগ্রহণে বাধাসৃষ্টি করেছে? অবশ্য এ-কথা আমাদের অজ্ঞাত নয় যে, এক শিল্পজননীর যথেচ্ছাচারিতার ফলে তরুণ ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পিদের একটা বড় অংশ আফা-র বার্ষিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন না। কিন্তু ললিতকলাতেও কি সে-রকম কোনো আমলাতান্ত্রিক আতিশয্য আছে? এই প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে।

গোটা প্রদর্শনীর অর্ধেকের বেশি কাজ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ, এমনকি আঙ্গিকগত ও রীতিগত দিকেও অনুপযুক্ত শিল্পপ্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। তেলরঙের কাজের মধ্যে জয়পালা পানিকারের 'প্রাচীন স্মৃতি'র কথা প্রথমেই মনে আসে। কোলাজ রীতির আশ্রয় নিয়ে পুরু রঙ, পুডিং ও মোম দিয়ে ত্রিমাত্রিকতার আভাষ ফুটিয়ে তুলে মোটিফকে তিনি রসগ্রাহী করে তুলতে পেরেছেন। এন. এন. রায়ের কাজও এ-ধরনের। বন্ধুর ক্ষেত্রের (অ্যাব্রেডেড সারফেস) উপরে ব্রাক-এর অনুসরণে কোলাজ রীতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে 'হর হর মহাদেব' বেশি ভালো লাগে, অন্যটি 'অপ আর্ট'-এর লক্ষণাক্রান্ত। এ-ধরনের কাজ দেখলে সুনীলমাধব সেন ও আশ্বিন মোদীর নাম মনে আসে—তাঁরা পেন্টিং-এ রিলিফ এফেক্ট আনার চেষ্টা করছেন। নবীন নানের 'স্মৃতিস্তম্ভ' পোস্ট-ইমপ্রেশনিজম ধর্মী (পিসারো প্রভাবান্বিত)। এ. রামচন্দ্র, সূর্যপ্রকাশ ও অমরজিৎ সিং-এর কাজও চোখে পড়ে। জলরঙে কেবল মিত্রানন্দ মাইথানির 'ভবিতব্য ঠিকুজি' ভালো লাগে। পেন এণ্ড ইংকে সম্পূরিত হওয়ায় কাজটির প্রত্যক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাস্কর্য বিভাগের মান অত্যন্ত গতানুগতিক। বিনীতকুমার রায়ের 'গর্ভবতী রমণী' (ব্রোঞ্জ) কনস্ট্রাকটিভিজম ধর্মী—জ্যাডকিনের প্রভাবযুক্ত। তৎসত্ত্বেও টেনশন ও রিলিজের ভারসাম্যে তাঁর মৌলিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শঙ্খ চৌধুরীর ধাতব 'ভাস্কর্য ১' ও 'ভাস্কর্য ২' প্লাস্টিক ও গ্লিস্টিক (বক্র ও ঋজু অবতল) রীতির মিলনে আঙ্গিকে অভিনব হলেও বিষয়গত দিক থেকে ব্যর্থ। গ্রাফিকস-এ

শিল্পকলার পরিচয় পেলাম। দীপক ব্যানার্জির নন-ফিগারেটিভ এচিং 'স্টাডি ১' শুধু এই বিভাগের নয়, সম্ভবত গোটা প্রদর্শনীর একটি শ্রেষ্ঠ কাজ। গ্রাফিক শিল্পী হিসেবে ইদানীংকালে তাঁর আত্মপ্রকাশ লক্ষণীয়। লক্ষ্মী দত্তর মেৎসোটিণ্ট-এ মিশ্র মাধ্যমে (মূলত ইনট্যাগলিও) 'কম্পোজিশন ১' প্রশংসার্হ। অনুপম সুদের হলুদ ও কালোতে রঙিন প্রিণ্ট 'কম্পোজিশন' উল্লেখযোগ্য। গাঢ় লাল রঙকে মূল টোন হিসেবে প্রয়োগ করে তিনটি প্রাণীর মোটিফে জগমোহন চোপরা নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। মৃদুলা কৃষ্ণার বাটিক 'কম্পোজিশন ১' জ্যামিতিক সৌষাম্যের বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। কিন্তু প্রদর্শনী থেকে বেরুবার পর কিছুই যেন মনে থাকে না—সব কিছু অত্যন্ত বায়বীয় মনে হয়। অপরিকল্পিত পরিচালনা ও আমলাতন্ত্র শিল্পক্ষেত্রেও বাসা বেঁধেছে—এরচেয়ে পরিতাপকর আর কিইবা হতে পারে।

লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চির প্রদর্শনী

সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ে দ্য ভিঞ্চির চিত্রপ্রদর্শনী চারুকলা-রসিকদের কাছে নানা কারণে দুর্বার আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চিত্রকলায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত করার জন্য দ্য ভিঞ্চি অধিকতর স্মরণীয়—যদিও তাঁর বিশ্বখ্যাতি 'মোনালিসা'র স্রষ্টা হিসেবেই। তাঁর এই খ্যাতি পরবর্তীকালে তাঁকে কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত করে! যাহোক দ্য ভিঞ্চির এই প্রদর্শনীটিকে চারভাগে ভাগ করা যায়: প্রথমভাগ 'ম্যাডোনা স্টাডি' 'অ্যাডোরেশন অফ দ্য ম্যাগাই' ও আনুষঙ্গিক অঙ্কনের কাল; দ্বিতীয় ভাগ রমণীমূর্তি, প্রতিকৃতি প্রভৃতি (তার মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে 'ভার্জিন এণ্ড চাইলড উইথ সেণ্ট অ্যানি') অঙ্কনের কাল; তৃতীয় ভাগ 'লাস্ট সাপার', 'ব্যাটল অফ অ্যানঘিয়ারি' ও আনুষঙ্গিক অশ্বাঙ্কনের কাল এবং চতুর্থ ভাগ অ্যালেগরি ও স্যাটায়ার ধর্মী অঙ্কনের কাল। বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে লিওনার্দোর কণ্টিতে অঙ্কিত 'আত্মপ্রতিকৃতি', 'দুইজন অশ্বারোহী', 'চারটি হর্স স্টাডি', 'বামে দৃষ্টিদানব ও রমণী মস্তক' (ভার্জিন-স্টাডি), 'সমুদ্রঅশ্ব চালনারত নেপচুন' (চারকোল), 'প্রলয়' (স্কেচ) প্রভৃতি গবেষণার যোগ্য। 'এনাটমিক্যাল সেন্স' এবং বস্তুর সঙ্গে ভাবনার মিলন (বাস্তবকে বিকৃত না করে) আজও বিস্ময় জাগায়। আজও তাঁর 'হর্স স্টাডি' অবিশ্বাস্য মনে হয়। সব দিক থেকে দেখতে গেলে এই প্রদর্শনীর 'অ্যাকাডেমিক ভ্যালু' অপরিসীম। ফ্লোরেনটাইন ভাবনার সঙ্গতি তাঁকে চিত্রসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বলতেন: "অনুপাতের প্রশ্ন শুধু সংখ্যাগত ও পরিমাপগত অর্থে নয়—শব্দে, ভাবে, স্থান-কালে এবং প্রতিটি শক্তিতে অস্তিত্ববান"।

কেনেথ ক্লার্ক বলেছেন: "The connection between continiuty and scientific rendering of appearances fixes a point at which the demands of grace and truth are one"-এর মধ্যে আধুনিক শিল্পে শুধুমাত্র সত্যতা খুঁজলে চলবে না, শিল্প পেতে হবে।

পরিতোষ সেনের চিত্রপ্রদর্শনী

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে খ্যাতিমান শিল্পী পরিতোষ সেনের প্রদর্শনী হয়ে গেল। খ্যাতি নিয়ে বেশিদিন চলা যায় না। দেউলিয়া হয়ে গেলে মানুষ অনেক 'শর্ট কার্ট' খোঁজেন, যার দ্বারা তথাকথিত সাফল্যের কাল্পনিক সীমা-রেখা স্পর্শ করা যায়। একজন তরুণ শিল্পীর এ-ধরনের কার্যকলাপকে আমরা 'স্টাণ্ট' বলতে পারি। কিন্তু খ্যাতিমান শিল্পীর ক্ষেত্রে একথা বলা চলে না। তখন ভয়ে ভয়ে বলতেই হয়: বোঝা না গেলেও নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। পরিতোষ সেনের কাজ দেখে তাই মনে হলো। অবশ্য রঙের ব্যবহারে তাঁর মৌলিকতা (স্কিমেটিক অ্যাপ্রোচ) অনস্বীকার্য এবং মূলত তিনি ফিগারেটিভ কাজই করেন। কিন্তু সেই বার্বিজন স্কুলের মতো অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, আকস্মিকতা প্রভৃতির সোপান বেয়ে শূন্যে আরোহণের প্রচেষ্টা সচেতনভাবে সমর্থন করা বিবেকের দিক থেকে অনুমোদনীয় নয়। এবারের প্রদর্শনীতে কিছু ড্রয়িং, কিছু 'গুয়াশ' (ওয়েট ওয়াশ) ও বাকি সবই তেল-রঙের কাজ।

আগের মতো এখনো তিনি বড় ক্যানভাসে কাজ করেন এবং 'অর্ফিজম' অর্থাৎ বিশুদ্ধ বর্ণপ্রলেপ রীতিতে সিদ্ধহস্ত। ড্রয়িং ও গুয়াশ (জলরঙে সাদা রঙ ব্যবহারে ম্যাট সারফেস-এর সাদৃশ্য আনা) একটিও উল্লেখ্য নয়, ড্রয়িং-এ ক্যালিগ্রাফিক রীতির আশ্রয় নিলেও তিনি উন্নত কিছু সৃষ্টি করেননি। তাঁর বর্তমান কাজের মধ্যে ৬৩নংটি ভালো লাগে। গুয়াশের মধ্যে 'ক্রুদ্ধ পশু' (৫) হলুদ ও কালো রঙ ব্যবহারের জন্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পরিতোষ সেন মূলত তেলরঙেই কাজ করেন। গত দুবছরে তিনি রীতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়েছেন। 'পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট মনোটনি' থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াসই হয়তো তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু পরিবর্তন মানে কি পশ্চাদাপসরণ? তিনি যে-ধরনের ডিসটরশন ও ইলংগেশন এনেছেন, তা মানসিকতায় না-হলেও রীতিগত দিক থেকে তাঁকে ম্যানারিস্ট শিল্পীদের পর্যায়ভুক্ত করেছে। ডিসটরশনের ভেতরেও যে একটা হারমনি থাকা চাই—এটা পরিতোষবাবু জানেন না, এ হতেই পারে না। তবে কি এটা তাঁর অক্ষমতা? তিনি এবারে ফিগারেটিভ থেকে একটু সরে ননফিগারেটিভ-এর দিকে পা বাড়িয়েছেন। ফিগারকে ডায়াগোনাল লাইনে স্থাপন করার প্রবণতাও এবার তাঁর কাজে লক্ষ্য করা গেল। পেন্টিং-এ ওয়াশ-

এফেক্ট আনার সাফল্যের জন্য 'ভাসমান মূর্তি' (৫) ভালো লাগে। 'লাল রঙের মুণ্ড' (৭) জর্মন এক্সপ্রেশনিস্টদের কথা স্মরিয়ে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন অন্যত্র। রঙের ব্যবহারে সঙ্গতির অভাব বড় পীড়াদায়ক। বড়ে গোলাম আলীর নাকের ওপর গাঢ় লাল রঙ প্রয়োগে কি সার্থকতা লাভ করা গেল তা বুদ্ধির অগম্য। এর মানে এই নয় যে, এক এক বস্তুর জন্য এক একটি টোন প্রযোজ্য। আসলে রঙের ব্যবহারে একটা 'টোন-গ্রুপ' মানা চিউত—টোনের অন্তর্নিহিত ছন্দে তা নাহলে পতন অনিবার্য। আর একটি কথা না-বলে পারছি না। 'গান্ধী শতবার্ষিকী'তে প্রদর্শিতব্য একটি প্যানেলের অংশবিশেষ দিয়ে তিনি কি বলতে চান বোঝা গেল না। এর আগের প্রদর্শনীতেও একটি অসমাপ্ত প্যানেল ছিল, যার সম্পূর্ণতা সাধারণ চিত্র-রসিকের এখনও দেখার সুযোগ ঘটেনি।

আশা করি পরিতোষ সেনের মতো প্রবীণ শিল্পী তাঁর সততা ও নিষ্ঠায় ভবিষ্যতে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবেন।

চারু নেত্র

জসীমউদ্দিন সংবর্ধনা ঃ পূর্ববাঙলা ও আমরা

এ-পারে কচি কলাপাতা সবুজ শাড়ির আঁচল, ও-পারে গাঢ় কমলা রঙের আটপৌরে শাড়ি, মধ্যে যদি বয়ে চলে ইছামতী, এ-পার ও-পার নেই, ফুরফুরে হাওয়ায় বাঁধা পড়বে, বাঁধা থাকবে সবুজ আর কমলা রঙের শাড়ির বন্ধন—হৃদয়ের প্রসন্ন উত্তাপে, ভালোবাসার নিবিড় আবেগে নিঃশব্দ সময় গুণে গুণে প্রতীক্ষা চলবে, ক্রুদ্ধ বর্তমানের সব ভাঙাভাঙি ভাগাভাগির শেষে হয়তো কোনোদিন দুটি হৃদয় কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে ভয়ে ভালোবাসার আমন্ত্রণে আবার দীর্ঘবাহু আলিঙ্গনে জড়াবে নিজেদের, জানবে গঙ্গা আর পদ্মা একই নদীর নাম, শিলাইদহ শান্তিনিকেতন একই আঙিনায়। অন্তত ততদিন এই গ্রন্থি থাক শুভবুদ্ধির প্রতীক্ষায়, সব কিছুর শীর্ষে শিল্পে, কাব্যে, গানে, বাঙলা-ভাষায় অব্যাহত থাক দুই বাঙলার মিলনের উপাসনা।

সেদিন, গত দশই জুলাই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনের অভিজাত মঞ্চে দেখলাম সেই রাখীবন্ধনের আকুতি। পূর্ববাঙলা থেকে বেড়া ডিঙিয়ে এসেছেন বাঙলার কবি জসীমউদ্দিন, তাঁর পাশে সংবর্ধনা-সভার সভাপতি কবি বিষ্ণু দে। এবং তাঁদের ঘিরে সারা মঞ্চ জুড়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাবেশ, বিশাল প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করে মুগ্ধ নরনারী। 'নকৃশী-কাঁথার মাঠ'-এর কবি সেদিন বাঙালি সংস্কৃতির অবিনশ্বরতার প্রতীক হয়ে উঠলেন। স্বল্প সময়ের মধ্যে কবি-সংবর্ধনার এই বিপুল আয়োজন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাধারণ বিজ্ঞপ্তিমাত্র, অনুল্লেখ্য প্রচার—কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ভরে উঠেছিল। উপরে-নিচে হাজার হাজার মানুষ—যেন ভিসা অফিসের ভিড়, আত্মীয়-সংবাদ-শ্রবণে উৎকণ্ঠ জনতা। সেই উদ্বেল প্রাণের উচ্ছ্বাসকে যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন কবি। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি প্রথমেই বললেন—"আজ আমার প্রতি যে-শ্রদ্ধা-ভালবাসা আপনারা নিবেদন করলেন, সে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমার দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে, যাঁরা বহু রক্ত, বহু দুঃখভোগের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।"

সত্যি, এই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা নিবেদনের মালাটা হাতে নিয়ে আমরা হয়তো অনেকদিন ধরেই অপেক্ষা করছিলাম। সেই উনিশ শ বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত দিন থেকে, বাঙলাভাষার সাহস্কার-উচ্চারণের অধিকার ছিনিয়ে নিতে যাঁরা বুকের তাজা রক্ত মাটিতে ঢাললেন, রবীন্দ্রনাথের গানকে কণ্ঠে ধারণ করার দাবিতে যে-দেশের মানুষ নিমেষে ঐক্যবদ্ধ, ষড়যন্ত্রীদের উপর-থেকে-চাপিয়ে দেওয়া সাম্প্রদায়িকতার ছেঁড়া নোঙরা পচা

কাঁথাটাকে তীব্র ঘৃণায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা পদ্মা-কর্ণফুলী-রূপসার কূলে কূলে টগবগ করে ফুটছেন—গণতন্ত্রের বা নব-সংস্কৃতি রচনার সেই পবিত্র কারবালার প্রতি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা নিবেদনের একটা আনুষ্ঠানিক সুযোগ হয়তো আমরা সবাই খুঁজছিলাম। কবি জসীমউদ্দিন সেই বাঙলাদেশ থেকে এসেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়-মিলন।

এবং সেই মিলনের কথাই বললেন বক্তারা। সংবর্ধনা-সভায় ভাষণ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রমা চৌধুরী, নাট্যকার মন্মথ রায়, সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাংবাদিক ও বিধান-সভার সদস্য পান্নালাল দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রসদনের পথ থেকে কবিকে ডালা উপহার দিলেন অমলাশঙ্কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে শিক্ষাসচিব রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পূর্ণ সেট উপহার দিলেন। এ-ছাড়াও বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি, গ্রামোফোন কোম্পানি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ কবির হাতে তুলে দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গানের পরিবেশনা। এ-যুগের উন্মত্ত গানের-প্রলাপে প্রায়-অশ্রুত গীতিকার জসীমউদ্দিনের দুটি গান—সন্তোষকুমার ঘোষ গাইলেন "আরে, ও রঙিলা নায়ের মাঝি" এবং বিমল দত্ত গেয়ে শোনালেন "ও আমার দরদী, আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না।" কবি জসীমউদ্দিনের কবিতা পাঠ করলেন কাজী সব্যসাচী, প্রদীপ ঘোষ। পূর্ববাঙলার উদ্দেশে নিবেদিত স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আরও একটি স্বরচিত কবিতা পড়লেন কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন সুমিত্রা সেন —"ফুল বলে ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির পরে।"

কবি জসীমউদ্দিন তাঁর নিজস্ব ভাষণে গুরু বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্দেশে। বললেন, তাঁর সমগ্র কাব্য-সাধনার প্রেরণা পল্লীবাঙলার অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষ আর লোক-শিল্পী, যাঁরা জলে-ডাঙায় ঘাটে-মাঠে দোতারায় সুর তোলেন।

পূর্ববাঙলার সাহিত্য সম্বন্ধে বললেন যে, বাঙলা সাহিত্যের দীর্ঘকালীন এক অভাব দূরীভূত হতে চলেছে সাম্প্রতিক পূর্ববাঙলার কথাসাহিত্যে। জনজীবনের রূপকার হলেও শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহৎ সাহিত্যিকদের রচনায় যে-মুসলমান সমাজের আনন্দ-বেদনা মূলত অব্যক্ত ছিল, ওপারের বাঙলায় আজ তারই উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। জানালেন, এক ঢাকা শহরেই অন্তত কম পক্ষে দেড় শ ছোট-বড়ো সাহিত্যসংস্থা আছে। 'রূপবান' যাত্রা বলে যে-লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পূর্ববাঙলার সুদূর গ্রামাঞ্চলেও তার ব্যাপক

প্রভাব। এ জনপ্রিয়তা এত বেশি যে, কুখ্যাত মোমেন খাঁ একে বেআইনী ঘোষণা করেও জনসমাদরের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারেননি। এই লোকযাত্রার রেকর্ড প্রায় এক লক্ষেরও বেশি বিক্রি হয়েছে।

পল্লীকবিদের কথা বললেন কবি জসীমউদ্দিন। বললেন, খুলনার বিজয় সরকারের কথা। রেডিও-টেলিভিশন-গ্রামোফোন রেকর্ড-পত্রপত্রিকার আধুনিক প্রচারযন্ত্রের কোনো ঢাক-ঢোলই যাঁর জন্য কোনোদিনই বাজেনি, তবু পূর্ববাঙলার লোকজীবনের অধীশ্বর বিজয় সরকার। বিভিন্ন বক্তার ভাষণে যে-মিলনের আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে ধ্বনিত হলো, সে-প্রসঙ্গে কবি জসীমউদ্দিন তাঁর আত্যন্তিক বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করলেন—পল্লীবাঙলার লোক-কবিদের চেয়ে এত ব্যাপক এবং মহৎ মিলনের গান আর কে রচনা করেছেন? নানাভাবে মার-খাওয়া পীড়িত নিষ্পাপ মানুষগুলির অনুপম মনের অভিব্যক্তি—

"তোদের হলুদ মাখা গা
তোরা রথ দেখতে যা
আমি হলুদ কোথা পাব
আমি ফিরতি রথে যাব।"

অথবা "নানান বরণ গাভীগুলির একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া ছাখলাম আমি একই মায়ের পুৎ।"

অথবা "চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ ভেসে যায় অন্য দেশে।"

দুই বাঙলার হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—সাহিত্যে চিরকাল সীমান্তের বেড়া ভাঙে, জ্ঞানের পথ রুদ্ধ থাকতে পারে না।

সভার সংক্ষিপ্ততম ভাষণে সভাপতি কবি বিষ্ণু দে সহকর্মী কবির দীর্ঘায়ু কামনা করে বললেন যে, ভূগোলের দিক থেকে বাঙলাদেশ যাই হোক, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরস্পর হৃদয়ঘনিষ্ঠ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সেদিনের সান্ধ্য-অনুষ্ঠানে যিনি পৌরোহিত্য করলেন, সহোদরা-বাঙলার প্রতি মমতা এবং তীব্র আকর্ষ তাঁর কবিসত্তায় চঞ্চল। এই কিছুকাল আগেও 'পূর্ববাংলার বাংলা' বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে পত্রান্তরে। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সংবাদ মূলত কাব্য' পূর্ববাঙলার দুই হৃদয়-সংবাদী কবি শামসুর রহমান আর আবুবকর সিদ্দিক-এর করকমলে উৎসর্গীকৃত।

এই প্রাণের আবেগ থেকেই সেদিনের অনুষ্ঠান। কবি-সংবর্ধনার মধ্যেই জেগে ওঠে অবিস্মরণীয় স্বদেশ-প্রতিমা। কবি জসীমউদ্দিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উপলক্ষে যখন পূর্ববাঙলার উদ্দেশেই ভালোবাসা উৎসারিত হয়ে ওঠে, গভীর বেদনায়, মৌনে সে-শ্রদ্ধাঞ্জলিই ভিন্নতর এক গম্ভীর রূপ গ্রহণ করে তার দুঃখে,

শোকে, আর্তিতে। জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক আবদুল হাই-র আকস্মিক মৃত্যুতে শোক এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে এক প্রস্তাব আনেন কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সমগ্র সভা সশ্রদ্ধচিত্তে অধ্যাপক হাই-এর স্মৃতির উদ্দেশে আনতমস্তক নীরবতা পালন করে।

বাঙলার কবি জসীমউদ্দিন দীর্ঘ জীবন লাভ করুন—আমাদেরও আন্তরিক কামনা। বিশেষত যখন নিষেধের সীমানা ডিঙিয়ে সংবাদ আসে, দুর্ঘটনায় অধ্যাপক আবদুল হাই-এর মতো মূল্যবান জীবনের অন্ত, ডক্টর শহীদুল্লাহ্-র জীবনাবসান, আমাদের অসহায়ভাবে ভাবতে হয়, আত্মীয় বিচ্ছেদের সন্তাপে ওপারের ক্ষতিপূরণে আমরা কী করতে পারি? হয়তো বা সে-ভাবনাও স্পর্ধা। এ-পারে যখন নববাবু নববিবিবিলাসের ভবানী বাঁড়ুজ্জে-টাইপ আসর জমছে আধুনিকতার নামে, ও-পারে তখন জীবনের দামে গড়ে উঠছে নতুন মূল্যবোধ, নতুন সংস্কৃতি, চারদিক থেকে গবেষণা চলছে, নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে বাঙলাভাষার, সাহিত্যের, সংস্কৃতির। গ্রামে-নগরে মিছিলে মিছিলে লাখো লাখো মানুষ যখন প্রাণের বিনিময়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিনিয়ে নিতে নিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, ঠিক তখনই যেন আরও অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে ডক্টর শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক আবদুল হাই-এর দিগ্বিজয়ী মনীষা। এই শূন্যতাও ভরে উঠবে একদিন, জানি। সেই বাঙলায় বেঁচে থাকুন কবি জসীমউদ্দিন, দীর্ঘজীবী হোক পূর্ববাঙলার বাঙলাচর্চা।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

একটি গানের ইতিকথা

হঠাৎ কয়েকজন বন্ধু জানালেন, "আপনার অনুবাদ করা 'রেডগার্ড'দের কুচকাওয়াজের 'রেড ফ্লাগ' গানটি একটি নাট্যগোষ্ঠী গাইছেন এবং তাঁদের লেনিন শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রযোজিত 'অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন' নাটকের পরিচয়-পুস্তিকাতে তা প্রকাশিত হয়েছে।"

খবরটা শুনে খুশী এবং খানিকটা কৌতূহলীও হই। অন্তত ঐ পুস্তিকার একটা কপি যাতে পেতে পারি সেজন্য চেষ্টা করি। অনুজপ্রতিম বন্ধু কবি শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন একদিন তার একটা কপি আমাকে দিয়ে যান।

তারপর ঐ পুস্তিকাটি হাতে হাতে ঘুরেছে। অনেকে অন্য সূত্রেও ঐ

পুস্তিকা পেয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, জানতেও চেয়েছেন—কবে কোথায় গানটির অনুবাদ করেছিলাম। স্মৃতিচারণ করে পৃথক পৃথকভাবে জবাবও দিয়েছি।

একজন বন্ধু তখন পরামর্শ দিলেন, "যেহেতু গানটা একটা ঐতিহাসিক গানের বাঙলা অনুবাদ এবং খানিকটা স্বীকৃতিও পেলো, কাজেই তার ইতিকথাটা প্রকাশ করলে তা কাজেই লাগবে।" ভেবে দেখলাম, পরামর্শটা মন্দ নয়। কারণ, তা করতে গেলে ভারতের তথা বাঙলার শ্রমিক ও গণমুক্তি-আন্দোলনের একটা কালপর্যায়ের কতকগুলি কথা আবার অনেককে মনে করিয়ে দেওয়া যাবে। তাই এই লেখা।

তখন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তী কালপর্যায়, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণী আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শ্রমিকশ্রেণী ইতিমধ্যেই বেশ উল্লেখযোগ্য কয়েকটা ধর্মঘট লড়েছে—কলকাতার ডকে হাড্ডিকলে দীর্ঘ লড়াই হয়ে গিয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আনুপাতিকভাবে বে-আইনী করেছে। কিন্তু তাতেও শ্রমিক বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন মুহ্যমান হয়নি। উপরন্তু শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তরফ থেকে সপ্তাহব্যাপী অভিযান চলেছে 'বাঙলার বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি'র দাবিতে।

সুচতুর ইংরেজ শাসকরা তখন এক নতুন কৌশল নেয়। আন্দোলনের বাছা বাছা কর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে রকমফের অভিযোগ সাজিয়ে তাঁদের জেলে পোরে এবং জেলে বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের সাধারণ কয়েদীর মতোই গণ্য করতে থাকে।

ঐ কালপর্যায়ে ১৯৩৫ সালে প্রায় ডজনখানেক এ-রকম সমাজতন্ত্রী বন্দী আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সমবেত হন। এঁদের মধ্যে আবার সবচেয়ে দীর্ঘ দণ্ডকাল ছিল শ্রীনারায়ণ ঝা-র, ৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তারপরই ছিল আমার, ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। অন্য যাঁদের নাম মনে আছে তাঁরা হচ্ছেন আবদুল হালিম, শামসুল হুদা, সরোজ মুখার্জি, ফণী দত্ত, ননী সেনগুপ্ত, মনোরঞ্জন রায়, আবদুর রহিম ও মাদার খান।

যতদূর জানি, এঁদের মধ্যে কমরেড হালিম এবং ঝা-ই আমাদের চিরতরে শোকাহত করে চলে গিয়েছেন। আর সর্বশ্রী ফণী দত্ত, ননী সেনগুপ্ত, আবদুর

রহিম ও মাদার খান রাজনৈতিক দুনিয়া থেকে একেবারেই হারিয়ে গিয়েছেন। কমরেড শামসুল হুদা ও সরোজ মুখার্জি এখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আছেন সি-পি-এম সদস্যরূপে। আর, শ্রীমনোরঞ্জন রায় ('দর্শনের ইতিবৃত্ত' রচয়িতা) সম্ভবত সি-পি-এম সদস্য বা সমর্থক। কেবল আমিই আছি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

আলিপুর জেলে আমাদের সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে গণ্য করায় আমরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আরম্ভ করি। ফলে 'ডাণ্ডা বেড়ী', 'রাতে হাতকড়ি', 'খাড়া হাতকড়ি' ইত্যাদি সাজার পালা চলতে থাকে। একদিন দণ্ডদানের জন্য সুপার শ্রীমণি দাসের কেস টেবিলে দিয়ে গেলে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ জানাই। ফলে সুপারের সামনেই জেলের পুলিশের ডাণ্ডা মাথায় পড়ে আহত হন কয়েকজন—শাস্তি হয় সাময়িক 'সেপারেট কনফাইনমেণ্ট', অর্থাৎ সেলে বাস করার ব্যবস্থা। সেলে এসেও আমাদের লড়াই চলতে থাকে। ক্রমে আমাদের রেমিশন সব নাকচ করে দেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের স্থায়ীভাবে সেলে রাখার ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ আমরা কার্যত রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা আদায় করি।

সেল জীবনে বিশেষত রাতে লক-আপ হবার পর আমরা সবাই কিছু না কিছু গানও করতাম। সঙ্গীতে তেমন কোনো শিক্ষাদীক্ষা না থাকলেও আমার গলা মন্দ ছিল না—রাগ-রাগিনীর সঙ্গেও কিছু পরিচয় ছিল, আর ভাণ্ডারে ছিল কিছু স্বদেশী গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। কমরেড ঝা আমাকে 'সেল মিনস্ট্রেল' বলতেন।

ইণ্টারন্যাশনাল ইংরেজী, উর্দু এবং বাঙলায় নজরুলের অনুবাদ আমরা কয়েকজনই গাইতাম, কিন্তু 'রেড ফ্ল্যাগ' গানটা কেবল কমরেড শামসুল হুদাই জানতেন এবং সাধারণত ইংরেজী ও উর্দু দু-ভাষাতেই গাইতেন। ক্রমে আমিও তা শিখে নিই।

একদিন কথায় কথায় উঠল—নজরুলের ইণ্টারন্যাশনাল গান যতই জোরাল হোক না কেন, কুচকাওয়াজে ওটা গাওয়া যায় না। 'রেড ফ্ল্যাগ' গানটা কুচকাওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে গাওয়া যায়। কিন্তু এ-গানের তো কোনো বাঙলা অনুবাদ নেই, তাহলে কি হবে? তৎক্ষণাৎ আমি তার জোরাল

অনুবাদ করার দায়িত্ব নিয়ে দু-দুটো অনুবাদ করি। একটা উপরোক্ত পরিচয়-পুস্তিকায় প্রকাশিত গানটি। যাতে বেশ কিছু উর্দু শব্দ আছে। অন্যটা একেবারেই নির্ভেজাল বাঙলা। কমরেড হুদার নেতৃত্বে মহড়া দিতে গিয়ে দ্বিতীয়টা নাকচ হয়ে ঐটাই উৎরে যায়।

উৎরে যাওয়া অনুবাদটা দাঁড়ায়:

"কমরেড শোন বিউগল ঐ হাঁকছেরে
তোল কাঁধে নে জঙ্গী হাতিয়ার
আয় আজাদীর জং লড়ি চল ডরছেড়ে
চল এগিয়ে রাস্তা করি বার॥

দিন মজুরের ঘরে যে তোর জনম ভাই
খুন বিকিয়ে ভুখ মিটে না তোর
ভাই ব্রাদারি দোস্তী একাই আজাদী
এই লড়াই-এর কায়দারে মজদুর॥

হুকুমতের তখ্‌ত জুড়ে রয় যারা
কিসের জোরে লাল করে ভাই আঁখ
কামান কার্তুজ আর বেয়নেট
আমরাই তো গড়ি লাখে লাখ॥

ভুখমিছিলের শক্ত বাঁধন তোর তরে
ছাড় দেখি ভাই দীন ভিখিরির ভেক্
উড়ারে আজ লাল ঝাণ্ডা দিল্‌ভরে
আজাদী তোর দোর গোড়ে ঐ দেখ্॥"

সংক্ষেপে এই হলো এ-গানের জন্মলাভের ইতিহাস।

জেলজীবনে বহুদিন আমরা এ-গান গেয়েছি। জেল থেকে বেরিয়ে সিলেট জেলায় পার্টির কাজ করতে গিয়ে আমি তা বিভিন্ন সভা সমাবেশে নিজেও গেয়েছি—কখনও কখনও দলবদ্ধভাবেও গাওয়া হয়েছে। যতদূর মনে

পড়ে ১৯৪২ সালে অথবা ১৯৪৩ সালে শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং আমার যৌথ সম্পাদনায় 'জনযুদ্ধের গান' বা ঐরকমই একটা নাম দিয়ে যে-গানের বই সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—তাতেও এ-গানটি স্থান পেয়েছিল।

শুনেছি কলকাতায় এবং পার্শ্ববর্তী আরও কোনো কোনো অঞ্চলেও আমার ছোটভাই শ্রীগোপাল নন্দী কখনও কখনও এ-গানটি এককভাবে বা দলবদ্ধভাবেও গেয়েছেন। কিন্তু অন্য কেউ কোথাও এ-গান করতেন কিনা জানিনা। তারপর গানটা প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল।

ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এসোসিয়েশন লেনিন শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন' নাটকের যে-পরিচয় পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, তাতে তার পুনরভ্যুদয় দেখে তাই আনন্দিতও যেমন হলাম, তেমনি খানিক সার্থকতাবোধও হলো বৈকি!

জ্যোতির্ময় নন্দী

মুহম্মদ আব্দুল হাই

বাঙলা ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত ধ্বনিতত্ত্ব (phonology) সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে যিনি এদেশে নতুন এক দিগন্তের উন্মোচন করে এই বিষয়ের প্রচলিত পদ্ধতির অনাবশ্যকতা প্রমাণিত করেছিলেন, তিনিই অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই। মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে তিনি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু রাজসাহীতে তাঁর প্রথম জীবনের লেখাপড়া সম্পূর্ণ হয়, সেখান থেকেই তিনি আই. এ. পর্যন্ত পাস করবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. অনার্স পড়বার জন্য ঢাকায় চলে আসেন এবং সেখানে এসে বাঙলা অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন।

যখন আব্দুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় অনার্স নিয়ে এসে ভর্তি হলেন, তখন আমি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন লেকচারার নিযুক্ত ছিলাম। আমি কিছু কাল আগেই সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সংস্কৃত ও বাঙলায় এম. এ. পাস করে সেখানেই লেকচারার নিযুক্ত হয়েছিলাম।

সুদর্শন এবং স্বাস্থ্যবান যুবক আব্দুল হাই প্রথম দিন যখন আমার ক্লাসে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে রাজসাহী থেকে কলকাতায় না গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার কারণ কি তা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার জবাবে বললেন, অনেকদিন ধরেই তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিল, কারণ সেখানে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, পল্লীকবি জসীমউদ্দীন প্রভৃতি সব অধ্যাপনা করতেন, এঁদের নাম তিনি অনেকদিন থেকেই শুনে আসছেন। অবশ্য ভদ্রতাবশত তিনি আমার নামও শুনেছেন বললেন। আমার নাম তাঁর তখনো পর্যন্ত শুনবার কথা নয়, তবু একথা থেকে প্রথম দিনেই তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণের পরিচয় আমি পেলাম। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর চরিত্রের বিনয়গুণে আমি মুগ্ধ হলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই তখন (এবং এখনও) বাঙলা অনার্সের ক্লাস হতো, কিন্তু তাতে তখন পর্যন্ত ৩।৪ জনের বেশি ছাত্র হতো না।

সেইজন্য প্রত্যেক ছাত্রই আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবার সুযোগ পেত, আব্দুল হাই গোড়া থেকেই এই সুযোগটি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁর বয়সের অনেক ব্যবধান ছিল বলে সম্ভ্রমবশত তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকলেও আমার বয়স তখনও বেশি ছিল না বলে আমার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গোড়া থেকে ক্রমেই বাড়তে লাগল। আমার বাড়িতে সর্বদাই তিনি যাতায়াত করতেন এবং পড়াশুনা বিষয়ে নানা পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আমাকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন, তেমনই আমার সঙ্গে সহজভাবে মিশতেন।

আমার সঙ্গে তাঁর সহজভাবে মেলামেশার আর একটি কারণও ছিল। তিনি নাট্যাভিনয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-হস্টেলে আবাসিক ছাত্ররূপে বাস করতেন, তার নাম ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, তার ছাত্ররা প্রতি বৎসরই পুজোর ছুটির আগে বাৎসরিক নাট্যাভিনয় করত। সেই অভিনয়ের পরিচালক থাকতুম আমি। আব্দুল হাই ২।৩ বছরই তার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে আমিই অভিনয় শিক্ষা দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করা নিষিদ্ধ ছিল বলে ছেলেরাই মেয়ে সেজে অভিনয় করত। আব্দুল হাইর চেহারায় এবং কণ্ঠস্বরে একটু মেয়েলীভাব ছিল বলে আমি তাঁকে দু-বছরই এক-একটি প্রধান স্ত্রীভূমিকায় অবতীর্ণ হবার মতো করে শিক্ষা দিয়েছিলাম, দু-বারই তিনি স্ত্রীভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। তখন তাঁর মধ্যে আমি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কোনো অনুরাগের পরিচয় পাইনি, বরং তার পরিবর্তে বাঙলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নাটকে তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় পেতাম।

১৯৪১ সনে তিনি বাঙলা অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। অবশ্য তিনি প্রথম স্থানই অধিকার করেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ জন কি ৪ জন ছিলেন, সেইজন্য তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না, তবে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত তিনি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলা অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কুড়ি বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলায় অনার্স পড়ানো হচ্ছিল, তার মধ্যে মুসলমান ছাত্র হিসাবে এই কৃতিত্ব সর্বপ্রথম তাঁর।

বাঙলায় বি. এ. অনার্স পাস করবার পর যথারীতি তিনি বাঙলায় এম. এ-ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন, তাতেও তিনি প্রথম স্থানই অধিকার করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেখানেও ছাত্রসংখ্যা ৩।৪ জনের বেশি ছিল না। ঢাকায় পাঠ্যজীবন এইভাবে শেষ করে তিনি প্রথম কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে বাঙলার লেকচারার নিযুক্ত হন এবং দেশবিভাগ অর্থাৎ ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সেখানেই অধ্যাপনা করেন। তারপরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদান করেন। সেখানে যোগ দেওয়ার পরই তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন।

লণ্ডন যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর মধ্যে ভাষাতত্ত্ব বা ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে কোনো উৎসাহ ছিল না। পাঠ্যজীবনে তিনি সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু লণ্ডনে বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা অর্থহীন বিবেচনা করে সেখান থেকে সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় শিখে আসাই তাঁর লক্ষ্য হলো। অনেকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙলা সাহিত্যে ডক্টরেট নিয়ে এদেশে এসেও চাকুরী-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন সত্য, তথাপি লণ্ডনে গিয়ে বাঙলা পড়ার চাইতে যে-বিষয় বাঙলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের কোনো ব্যবস্থা নেই—তা-ই অনুশীলন করে তাঁর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকে তিনি সার্থক করে তুলতে চাইলেন। ইচ্ছা করলেই রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের উপর একটি থিসিস দাখিল করে সুলভ এক ডক্টরেট নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এসে চাকুরীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন। কিন্তু নতুন বিষয় পড়তে হবে, নতুন জিনিস জানতে হবে, তবেই লণ্ডনে আসা তাঁর সার্থক হতে পারে, এ-কথাই তাঁর মনে হলো। তিনি তাঁর নতুন বিষয় সেখানে বেছে নিলেন ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাঙলা ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিবিজ্ঞান অত্যন্ত বিস্তৃত বিষয়। তার মধ্যেও বিশেষভাবে পড়বার জন্য তিনি ধ্বনিবিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত বাঙলা অনুনাসিক ধ্বনি এবং অনুনাসিকীকরণ (Nasals and Nasalization in Bengali)—এই বিষয়টি বেছে নিলেন। তিনি বাঙলায় পি. এইচ. ডি. করবার পথ পরিত্যাগ করে উক্ত বিষয়টি বিশেষভাবে পড়বার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসে দু-বছরের জন্য ভর্তি হলেন।

বাঙলাদেশে ভাষাতত্ত্ব এযাবৎ এক সনাতন ধারা ধরে অগ্রসর হয়ে এসেছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুদিন পূর্বেই যে-ধারা পরিত্যাগ করে নতুনতর ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, এ-দেশের ভাষাতত্ত্ববিদগণ তার কোনো সংবাদ

রাখতেন না, এমন কি সংবাদ রাখলেও নতুন করে তার সম্পর্কে কোনো অনুশীলন করতেন না। আব্দুল হাই ভাষাতত্ত্বে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ছাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্য দেশে এই বিষয়ে নতুনতর যে-ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল তার আকর্ষণে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শিক্ষাগুরু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ধারাও পরিত্যাগ করে নতুন পথে শিক্ষা লাভ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় যে-থিসিস দেবার ব্যবস্থা আছে, সেই থিসিসের জন্য তিনি A Study of Nasals and Nasalization in Bangali বা 'নাসিক্যধ্বনি ও নাসিক্যীভবন' বিষয়টিই তাতে গ্রহণ করলেন।

১৯৫২ সনে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব বা distinction নিয়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর দেশে ফিরে এসে দুই বৎসরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা এবং সংস্কৃত বিভাগের রীডার এবং বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি উক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ বা 'প্রোফেসার' পদে উন্নীত হন।

এই সময়ই আব্দুল হাই তাঁর বাঙলা ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার বিষয়ে যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' বইখানি রচনা করেন। যদিও এই গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্ত্য বিশ্লেষণপদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন, তথাপি ভারতীয় প্রাচীন বৈয়াকরণদের প্রতিও যে তাঁর কত সুগভীর শ্রদ্ধা ছিল, তা তাঁর লিখিত উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাটি পাঠ করলেই জানতে পারা যায়। তিনি লিখছেন,

"...যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রমুখ ধ্বনিবিদই ধ্বনিবিজ্ঞানের উদ্গাতা ছিলেন। আড়াই হাজার বছর থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে তাঁরা সংস্কৃত ভাষার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পাণিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো এত বড়ো ধ্বনিবিদ পৃথিবীতে আজও কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিক ব্লমফিল্ডের মতে পাণিনির ব্যাকরণ "অষ্টাধ্যায়ী" মানুষের বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।" (ভূমিকা, পৃঃ ১২)

জ্ঞানের রাজ্যে এই উদারতা না থাকলে কেউ কোনোদিন প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না; আব্দুল হাইর সেই উদারতা ছিল বলেই সর্বত্র তিনি সমান মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ধ্বনিবিজ্ঞান আলোচনার যে-পথের তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, বাঙলা ভাষায় তা ছিল প্রথম। এ-কথা তিনি নিজেও অনুভব করে তাঁর উক্ত ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "বাংলা ভাষার ধ্বনি-তত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় সমস্যা

সম্পর্কে সুশৃঙ্খল আলোচনার এটিই বোধ হয় প্রথম প্রয়াস।" (পৃঃ ৫) তারপর তিনি তাঁর ভূমিকার উপসংহারেও যথার্থই দাবি করেছেন যে, আমাদের জানা মতে বাঙলা ভাষার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। এ-দীর্ঘকালে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে বাঙলা ভাষায় এ-ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ সংক্রান্ত এমন বিশদ ও বর্ণনাত্মক আলোচনা আর হয়নি।

"এ-পথে অগ্রণী হিসেবে নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথিবীর হাতে আমার দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলটুকু সম্পূর্ণ করেছিলাম।"(ভূমিকা পৃঃ ১২)

তাঁর এই উক্তি থেকেই বইখানির গুরুত্ব বিষয়ে কিছু ধারণা করা যাবে।

আব্দুল হাই তাঁর বইখানি আমাকে উপহার পাঠিয়ে বইখানিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা এম.এ-র পাঠ্য তালিকাভুক্ত করবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় এখনও প্রাচীন পথই অনুসরণ করা হয়ে থাকে, সেইজন্য তাঁর এই অনুরোধ আমাদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একদিন নূতন ধারাকে কেউ আর রোধ করতে পারবে না, তখন এই বিষয়ে তাঁর গ্রন্থখানিই মহামূল্যবান এবং একমাত্র গ্রন্থ বলেই সমাদৃত হবে, তখন আপনা থেকেই বইখানি এখানকার পাঠ্য তালিকাতেও নিজের স্থান করে নেবে।

আব্দুল হাই ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে গভীর অনুশীলনে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্র সম্পর্কেও সর্বদা ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।' এটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের একখানি সুলিখিত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। এটি মামুলি সাহিত্যের ইতিহাস মাত্র নয়, গভীর অনুসন্ধানের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলায় যে সকল নূতন নূতন গ্রন্থের তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন, তাদের বিষয়ও এই গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখিত হয়েছে, তাঁর এই বই থেকে নানা নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এর রচনাকর্মেও তাঁকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়।

আব্দুল হাইর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ থেকে 'সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ ও তার সম্পাদনা। এত উচ্চমানের গবেষণামূলক বাঙলা পত্রিকা পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে আর দ্বিতীয় নাই, এ-কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তিনি আমারও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, আমি

তাঁর সে-আগ্রহ পূর্ণ করেছিলাম সত্য, কিন্তু এত উচ্চমানের একটি পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার জন্ত আমি তাতে নিজেই সম্মানিত বোধ করেছিলাম।

আব্দুল হাই রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ছাত্র অবস্থায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে একবার শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন ১৯৩৮ সন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের সকলের একটি আলোকচিত্রও গৃহীত হয়। 'সাহিত্য পত্রিকা'র রবীন্দ্র সম্বর্ধনা সংখ্যায় সেই আলোকচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। 'শ্যামলী'র সামনে গৃহীত সেই আলোকচিত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন। আব্দুল হাই এই আলোকচিত্রটিকে তাঁর জীবনের একটি অতি মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য করতেন।

'সাহিত্য পত্রিকা'র রবীন্দ্র সম্বর্ধনা সংখ্যায় আব্দুল হাই 'ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকায় বিগত তিরিশ বছরে ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনামূলক আলোচনা যেখানে দ্রুত প্রসার এবং বিস্তৃতি লাভ করে, এ-উপমহাদেশে সেখানে বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে জন কয়েক মনীষী প্রধানত ভাষার ইতিহাস-ভিত্তিক আলোচনাতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখেন (সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৮৭, শীত সংখ্যা, পৃঃ ১৮)। তারপর তিনি উল্লেখ করেন, "কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে জানি, সেই কবি রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বর্ণনাভিত্তিক আলোচনার জনক এবং পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন"। (পৃঃ ৬৯) অর্থাৎ তাঁর মতে এ-দেশের ভাষাতত্ত্ববিদগণ যে-পথের সন্ধান দিতে পারেননি, কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্বালোচনার সেই নূতন পথটি খুলে দিয়েছিলেন।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' বইটি নিয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথই এ-দেশে প্রথম করেছিলেন। অন্যান্য যাঁরা ভাষাতত্ত্ববিদ বলে বাঙলাদেশে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁরা আধুনিক কালে পরিত্যক্ত এবং

অপ্রয়োজনীয় একটি প্রাচীন ধারা অনুসরণ করে চলেছেন।

আব্দুল হাই রচিত আর একখানি উল্লেখযোগ্য বই ইংরেজী ভাষায় রচিত, তা Traditional Culture in East Pakistan. বইখানি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের 'লোক-সঙ্গীত এবং লোক-সাহিত্য' এবং 'গ্রাম্য খেলাধূলা' অধ্যায় দুটি আব্দুল হাই রচনা করেছেন, বইয়ের অবশিষ্ট অংশ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের রচনা। তবে 'লোক-সঙ্গীত' এবং 'লোক-সাহিত্য' অংশটি বইয়ের প্রধান অংশ অধিকার করেছে। তাতে তিনি শুধু পূর্ব বাঙলার নয়, বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত বাউল, মুর্শিদ্যা, মারফত, দেহতত্ত্বের গান, বিচ্ছেদী গান, পশ্চিম বাঙলার ঝুমুর গান, গম্ভীরা গান, কবি, তর্জা, বারমাসী গান, জারী গান, মাঝি মাল্লার গান, ভাটিয়ালী, সারি, সাম্পান গান, ঘাটু গান, ভাওয়াইয়া, চটকা ইত্যাদি সম্পর্কে উদাহরণ সহ আলোচনা করেছেন। আলোচনা কেবল বিস্তৃতই হয়নি, রসোপলব্ধিতেও তা সার্থক হয়েছে। লোক-সাহিত্য অংশেও তিনি গীতিকা বা ballad সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় যেমন তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়, গীতিকাগুলির আলোচনায় তেমনই তাঁর মধ্যে সূক্ষ্ম সাহিত্যরসানুভূতির পরিচয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাঙলার লোক-কথা সম্পর্কেও তিনি যে-আলোচনা করেছেন, তাও রস-বিচারে সার্থক হয়েছে।

বাঙলার গ্রাম্য খেলাধূলা নিয়ে এ-পর্যন্ত বিশেষ কিছুই আলোচনা হয়নি। এই অবস্থায় আব্দুল হাইর এই বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত অভিনব এবং নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। বিশেষত পল্লীজীবনের তিনি যে-এক সুনিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলেন, তা বুঝতে পার যাবে। সুতরাং ধ্বনিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি থেকে আরম্ভ করে তাঁর মধ্যে রসবেত্তা এবং তথ্যসন্ধানী একটি মন সর্বদা সক্রিয় ছিল বলে অনুভব করা যায়।

রাজনৈতিক দিক থেকে দুই বাঙলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করবার কার্যে তিনি সর্বদাই সহায়ক ছিলেন। তাঁর কাছে যাঁরা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করত, তাঁদের তিনি আমার নিকট চিঠি দিয়ে প্রথমেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। আমি তাঁদের কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে পড়বার ব্যবস্থা করে দিতাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-

সংগৃহীত পুথির সর্বদাই তিনি অনুসন্ধান করতেন এবং তার বিবরণী সংগ্রহ করে তাঁর গবেষণার কার্যে ব্যবহার করতেন। বহুদিন পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলায় এম. এ এবং থিসিস পরীক্ষার ব্যাপারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আব্দুল হাই অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই গুণটির জন্য সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট থাকত, কেউ তাঁর বিরোধিতা করতে পারত না। তাঁর চিঠি-পত্রগুলো ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ থাকত, জীবনে যখনই তিনি নূতন কোনো উন্নতি লাভ করতেন, তখনই তা আমাকে পত্র দ্বারা জানিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। দেশ-বিভাগের পরও তাঁর সঙ্গে আমার যোগ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি বলেই আমি সর্বদা অনুভব করতাম। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমি কেবল মাত্র আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন ছাত্রকেই যে হারালাম—তা নয়; বাঙলা গবেষণার ক্ষেত্রেও যে ক্ষতি হলো—তা দীর্ঘ দিনে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

আচার্য শহীদুল্লাহ

বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতি-সাধনার বিশিষ্ট পথিক আচার্য ডঃ শহীদুল্লাহ সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। উভয় বাঙলার পক্ষেই এই মৃত্যু প্রায় ইন্দ্রপতনের তুল্য। তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধদের সঙ্গে 'পরিচয়'ও এই বিয়োগে মর্মাহত। আগামী কোনো সংখ্যায় আচার্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

সুখলতা রাও

পরিণত বয়েসে সুখলতা রাও-এর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা ও সুকুমার রায়-এর বোন সুখলতা রাও বাঙলা শিশুসাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তিনি ওড়িয়া ভাষাতেও তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই মৃত্যু তাই আমাদের কাছে অকাল মৃত্যুরই তুল্য। সুখলতা রাও-এর শোকসন্তপ্ত বন্ধু ও পরিজনদের আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সত্য গুপ্ত

'পরিচয়'-এর প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও পরিশ্রমী অনুবাদক সত্য গুপ্ত গত ৯ই আগস্ট ফুসফুসের কর্কটরোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা বিশেষভাবে শোকার্ত। তাঁর পরিবারবর্গ ও বন্ধুজনের সঙ্গে আজ আমরাও স্বজনবিয়োগবেদনায় মূক।

সত্য গুপ্ত কিছুকাল 'নন্দন' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সির সঙ্গে তাঁর ছিল দীর্ঘ সম্পর্ক। শেষ জীবনে তিনি বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন।

আমরা আশা করি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের কথা দেশবাসী ভুলবেন না। সত্য গুপ্তের অপ্রকাশিত রচনাগুলিও ছাপা হওয়া দরকার। আশা করি বন্ধুজন সে-ব্যাপারেও উদ্যোগী হবেন। —সম্পাদক